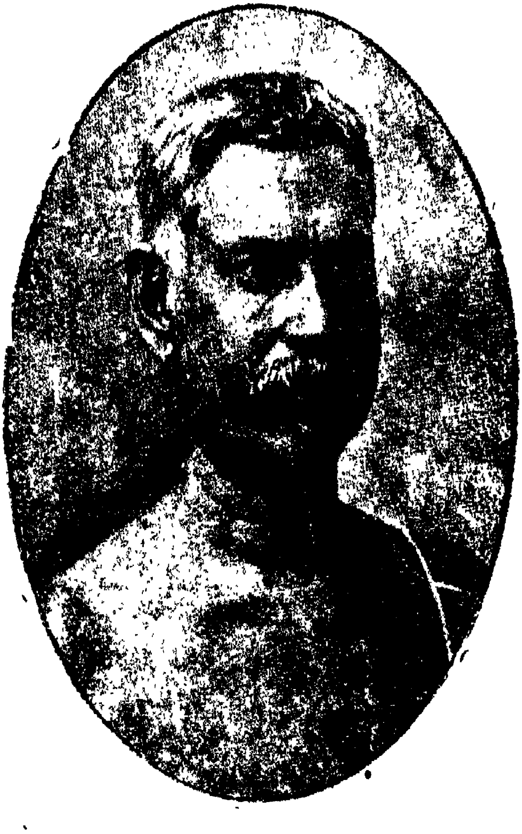
গ্রন্থাবলী



ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যৌবনে।

জন্ম—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬ সাল।

মৃত্যু—৯ই চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

Edited & Published by
Mr. B. Roy,
EDITOR, THE HINDU,
47, Kailash Bose Street,
CALCUTTA.

The Nabakumar Press, 10-B, D. L. Roy Street, Calcutta.

ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী।

১। উৎকৃষ্ট কাব্যম্	৪। ক্ষুদিরাম
২। কল্পতরু	৫। পাঁচু-ঠাকুর
৩। ভারত-উদ্ধার	৬। অন্যান্য রচনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতা,

৬, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

বঙ্কিম-মণ্ডলীর অন্যতম সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গবাসী'র পরম হিতৈষী বন্ধু, সহায় ও উপদেষ্টা ছিলেন। যাহাকে ইংরেজীতে বলে Friend, philosopher and guide, 'বঙ্গবাসী'র পক্ষে ইন্দ্রনাথ ঠিক তাহাই ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর হইতেই, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি ও তাঁহার নামাঙ্কিত অন্যান্য রচনাদি—যাহা 'বঙ্গবাসী'তে ও বিবিধ মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—একত্র সঙ্কলিত করিয়া ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিবার সংকল্প আমাদের মনে ছিল। পরে ইন্দ্রনাথের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান্ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর ঐ সংকল্পে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহিত হই। রসজ্ঞ সান্যাল মহাশয় ইন্দ্রনাথের সর্ব্ববিধ সাহিত্য-প্রচেষ্টায় পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। সুতরাং এই সুবিপুল সঙ্কলন-ব্যাপারে শুধু তাঁহার সহানুভূতি নয়, যথেষ্ট উপদেশ এবং প্রভূত সহায়তা না পাইলে, এ কার্য্য সম্পন্ন করা দুরূহ হইত। এজন্য আমরা সান্যাল মহাশয়ের নিকট অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ আমরা স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট। তিনি নিঃস্বার্থভাবে আমাদিগকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।

সঙ্কলিত গ্রন্থাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত সূচনা এইখানে করিলাম,—

১। উৎকৃষ্ট কাব্যম্—তরুণ বয়সে ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিতে-হাসিতে লিখিত আড়াই পয়সা দামের ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এ সঙ্কলনের আরম্ভে পুনর্মুদ্রিত হইল।

২। কল্পতরু—যৌবনারম্ভে (১২৮১ সালে) রচিত। 'বঙ্গ-দর্শনে'র সমালোচনায় বুঝা যায় যে, এই একখানি গ্রন্থ লিখিয়াই ইন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

৩। ভারত-উদ্ধার—১২৮৪ সালে রচিত। ব্যঙ্গ-কবির এই ব্যঙ্গ-কাব্য খানি প্রকাশিত হইতে হইতেই দেশময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহারও বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

৪। ক্ষুদিরাম—'বঙ্গবাসী'র সহিত ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের পরে 'বঙ্গবাসী'র উপহারের অনুরোধে লিখিত। ইহারও একাধিক সংস্করণ 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতেই প্রকাশিত হয়।

৫। পাঁচু-ঠাকুর—১২৮৬।৮৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথের যে রচনা-মালা “পঞ্চানন্দ” নামে অভিহিত ছিল, গ্রন্থাকারে গ্রথিত তাহারই নাম “পাঁচুঠাকুর।” মাসিক-পত্রিকাকারে প্রকাশিত ‘পঞ্চানন্দ’ হইতে সঙ্কলিত হইয়া পাঁচুঠাকুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ‘বঙ্গবাসী’র সহিত ইন্দ্রনাথের সংস্রবের পরে ‘বঙ্গবাসী’তে প্রকাশিত কিছুকালের পঞ্চানন্দ সঙ্কলিত হইয়া তৃতীয়ভাগ ‘বঙ্গবাসী’ হইতেই প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে ইন্দ্রনাথের আর যত পঞ্চানন্দ-রচনা ‘বঙ্গবাসী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি সঙ্কলিত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম—এই পাঁচকাণ্ডে পাঁচুঠাকুর—এই গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হইল।

৬। অন্যান্য রচনা—‘বঙ্গবাসী’ ও ‘নবজীবন’ প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা হইতে ইন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রন্থাবলীর শেষভাগে সন্নিবেশিত হইল।

এখানে বলিয়া রাখি যে, “হাতে হাতে ফল” নামে একখানি প্রহসন,—যাহা তিনি তাঁহার সাহিত্যবন্ধু ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত একত্রে লিখিয়াছিলেন এবং যাহা চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিতও হইয়াছিল, কিন্তু বাজারে প্রকাশিত করা হয় নাই—সেই প্রহসন খানি এই গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত করা গেল না। ইতি—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

১। ইন্দ্রনাথের স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনী।

["বঙ্গভাষার লেখক" হইতে উদ্ধৃত]

শকাব্দাঃ ১৭৭১। ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার কৃষ্ণা-সপ্তমী শ্রবণা নক্ষত্রে মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময়ে আমার জন্ম। পাণ্ডুগ্রাম আমার বর্ত্তমান বাসস্থান গঙ্গাটিকুরী হইতে ঈষৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ। গঙ্গাটিকুরী,—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী।

পিতাঠাকুর পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। আমার যখন সাত মাস বয়ঃক্রম, তখন পিতামাতার সঙ্গে প্রথম পূর্ণিয়া যাই। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়াতেই থাকিতাম; কেবল বৎসর বৎসর শারদীয় পূজার সময়ে গঙ্গাটিকুরীর বাটীতে আসিয়া মাসেক-দেড়মাস থাকিতাম। পূর্ণিয়ার প্রচলিত ভাষা হিন্দী বা উর্দ্দু।

পঞ্চমবর্ষ বয়সে আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গুরু মহাশয় বলাই সরকার আমাদের সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারই কাছে বিদ্যারম্ভ বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা লেখা-পড়া কিছু ভাল করিয়া শেখা হইল না; বোধ করি, ষষ্ঠবর্ষেই পূর্ণিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। ঐ স্কুলে তখনকার থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। ইংরেজীই পড়িতাম, উর্দ্দু অতি অল্প, বাঙ্গালা মোটেই পড়িতাম না। বাঙ্গালায় অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল, কিন্তু সেকালে শ, ষ, স, ণ, ন, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতির আধুনিক অত্যাচার ছিল না, কাজেই আমিও তখন তদ্দ্বারা উপদ্রুত হই নাই।

পূর্ণিয়াতে পঠদ্দশায় দুইখানি ছাপা বাঙ্গালা বহি দেখা আমার মনে পড়ে,—(১) রবিন্‌সন্ ক্রুশো, (২) পদ্যাবলী। দুই খানিতেই ছবি ছিল; তাহাই দেখিয়াছিলাম; কিন্তু বহি পড়িয়া দেখা মনে হয় না।

আট বৎসর বয়সের সময়ে আমার উপনয়ন,—গঙ্গাটিকুরীতে হইয়াছিল। নবমবর্ষে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাও টিকুরীতে।

পিতৃবিয়োগে আমরা আর পূর্ণিয়া গেলাম না। কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতে গেলাম। যখন ভর্ত্তি হই, তখন সেসনের অন্তিমকাল, সেই কারণে আমাকে সেবেন্থ ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই বাৎসরিক পরীক্ষা উপস্থিত, আমিও অবশ্য পরীক্ষা দিলাম। ইংরেজীর পরীক্ষা যেমন হউক, দিয়াছিলাম; কিন্তু বাঙ্গালা-

তেই আমাকে বিব্রত করিয়াছিল। ক্লাসে বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী' পড়া হইত, কিন্তু আমি তাহা পড়ি নাই; বোধ করি, পড়িবার সুযোগই পাই নাই। বাঙ্গালা পরীক্ষার দিনে 'চরিতাবলী'র এক স্থান আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল, তাহা কোনও প্রকারে আবৃত্তি করিলাম। তাহার পর পরীক্ষক বলিলেন,—'শব' বানান কর।" আমি বলিলাম 'শ' আর 'ব'। কোন্ শ, অর্থাৎ তালব্য, দন্ত্য বিশেষণ দিয়া বলিতে কখনও শিখি নাই, বলিতেও পারিলাম না। এখন যেমন বর্গ্য ব, অন্তঃস্থ ব, বলিতে হয় না, আমি জানিতাম যে, 'শ'এরও সেই দশা। কিন্তু পরীক্ষক, তাহা বুঝিতে পারেন নাই; প্রশ্ন করিলেন—"কোন্ শ?" আমি অম্লান বদনে উত্তর দিলাম—"কোন্ শ?—শ। আর কি?" পরীক্ষক এক প্রস্ত পরাস্ত হইলেন। তিনি পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, "শব মানে কি?" আমি উত্তর দিলাম—"তামাম্"। পরীক্ষক বলিলেন, "বাঙ্গালা শব্দ বল;" আমি তখন বলিলাম,—"বিলকুল"। পরীক্ষা সুসম্পন্ন হইল। এ ঘটনা আমার বিলক্ষণ রূপেই মনে আছে। পরীক্ষান্তে ষষ্ঠ ক্লাসে উন্নীত হইয়াছিলাম।

অধিক দিন কৃষ্ণনগরে পড়া হইল না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরও কৃষ্ণনগরে পড়িতেন, তিনি পীড়িত হইলেন। কঠিন জ্বর-প্লীহাদি। কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলাম। কিছুকাল পরে আমার জ্যেষ্ঠের সহিত বীরভূমে পড়িতে গেলাম। ইহা বোধ হয়, ১২৬৪ কি ১২৬৫ সালে।

বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথমতঃ ভর্ত্তি হই। তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও কিছুকাল সেখানে পড়িয়াছিলাম। মোটের উপর দুই বৎসর কি কিছু কম বীরভূমে পড়িয়াছিলাম। এত কাল পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠ অল্পাধিক পীড়াই ভোগ করিতেছিলেন। মনে হইতেছে, ১২৬৭ সালের কার্ত্তিক মাসে জ্যেষ্ঠের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইতিমধ্যে ১২৬৬ সালের ১০ই ফাল্গুন গঙ্গাটিকুরীর পার্শ্ববর্ত্তী বালুটিয়া গ্রামে ৺বনয়ারিচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমি বিবাহ করি। এই পত্নীই বর্ত্তমান আছেন।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হওয়াতে আর বীরভূমে থাকা হইল না। ভাগলপুরে আমার পূর্ব্ব-পুরুষের সময় হইতে আমাদের বাসনের ব্যবসা ছিল, সেখানে আমাদের লোক জন থাকিত, বিশেষতঃ এক পিতৃব্যপুত্র (জ্যেঠতুত দাদা) সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এই কারণে ভাগলপুরে পড়িতে গেলাম। সেখানে গবরমেণ্ট স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া, ক্রমে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করি।

বীরভূমেই বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করি। ভাগলপুরে বাঙ্গালা শিখিবার সুযোগ ছিল না, উর্দ্দু পড়িতাম। কিন্তু এনট্রান্স পরীক্ষা বাঙ্গালাতেই দিয়াছিলাম। সে কেবল সাহসে বলিতে হইবে। কেননা তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কিছু শেখা হয় নাই।

ইন্দ্রনাথের স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এনট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে গেলাম। আগে কখনও কলিকাতা দেখি নাই। কলিকাতা গিয়া আমার শরীর ভাল ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ৩,৪ মাস পরেই স্কলার্সিপ ট্রান্সফার করাইয়া হুগলী কালেজে আসিলাম।

আমি আজন্মই অলস। পড়া-শুনায় আমার আটা হয় না। ১৮৬৫ সালের ৺শারদীয় পূজার সময়ে বাটী আসিয়া আমার প্রবল জ্বর হয়। অগ্রহায়ণ মাসে পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত আমার জ্বর; কাজেই পড়া হইল না। তথাপি পরীক্ষা দিলাম,যথাবিধি ফেল হইলাম। যে যে বিষয়ে না পড়িলেও পরীক্ষা দেওয়া যায়, তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম—হিষ্টরী এবং মাথেমাটিক্‌সে ফেল হইয়াছিলাম; ইংরেজী, ফিলজফি এবং বাঙ্গলাতে ফেল হই নাই। সেই বারের পরই বাঙ্গালায় পরীক্ষা দেওয়া উঠিয়া গেল।

ফেল হইয়া দুঃখ হইয়াছিল, লজ্জাও হইয়াছিল। হুগলী কালেজে আর ফিরিয়া গেলাম না। কলিকাতায় গিয়া ফ্রী-চর্চ্চে ভর্ত্তি হইলাম। ফ্রী ছাত্র হইয়া ভর্ত্তি হইবার প্রার্থনা করাতে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন যে, "এক মাস তোমাকে ফ্রী রাখিব, যদি মাসিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিতে পার, উত্তম; নচেৎ ইহার পর বেতন দিতে হইবে।" 'তথাস্তু' বলিয়া লাগিয়া গেলাম; কিন্তু পথে দুই কণ্টক—সংস্কৃত জানি না; বাইবেলেও পরীক্ষা দিতে হয়।

বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা ব্যাকরণের কৃপায় স্বল্পকাল মধ্যেই নাগর-অক্ষর-পরিচয় এবং শব্দরূপ কিঞ্চিৎ আদায় করিলাম। বাইবেল সম্বন্ধে একটু ভক্ত-বিটল হইলাম। তাহার ফলে মাসিক পরীক্ষায় উচ্চ স্থানই অধিকার করিলাম। বৃত্তিও পাইলাম। মাসে মাসে এইরূপ বৃত্তি পাইতে থাকিলাম। ক্রমে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিবার পূর্ব্ব রাত্রিতে আমার ভেদ বমি হওয়াতে আমি বড়ই কাতর হইয়াছিলাম। জাড়া নিবাসী যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় আমার সুহৃৎ ছিলেন, তাঁহার এবং অপর এক সুহৃৎ ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শুশ্রূষায় আমি রক্ষা পাই এবং কাতর অবস্থাতেই পরীক্ষা দিই।

হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল Thwaytes (থোয়েটস্) সাহেব আমাকে—আমাকে কেন প্রায় সকল ছাত্রকেই—খুব ভাল বাসিতেন। ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি, দেখিয়া তিনি আমাকে জোর করিয়া হুগলী কালেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। থার্ড ইয়ার্ এবং ফোর্থ ইয়ারের অর্দ্ধেক হুগলী কলেজে পড়িলাম। তখন শতকরা ৭৫ দিন কালেজে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে দেখিলাম যে, আমি হুগলী হইতে বি-এ, পরীক্ষা দিতে পাইব না। অগত্যা একটু নীতি খাটাইয়া কলিকাতার (Cathedral mission) কেথিড্রাল মিশন কালেজে ট্রান্সফার হইয়া গেলাম। সেই খান হইতে বি-এ, পরীক্ষা দিলাম। ১৮৬৯ জানুয়ারিতে আমি গ্রাজুয়েট হইলাম।

পরীক্ষার পর ছয় সাত মাস গঙ্গাটিকুরীতে বসিয়া কাটাইলাম। তাহার পর এ অঞ্চলের তৎকালীন ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে এবং অনুরোধে আমি মাষ্টারি স্বীকার করিয়া বীরভূম জেলার হেতমপুর স্কুলে মাস দুই হেড মাষ্টার হইয়াছিলাম। এমন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার ওকড়সা গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারী পাওয়াতে আমি হেতমপুর ত্যাগ করিলাম। ওকড়সায় বৎসরের শেষ কয় মাস কাটাইয়া ১৮৭০ সালের প্রারম্ভে আবার কলিকাতায় গিয়া (B. L.) বি, এল পরীক্ষার লেক্‌চর সারা করিলাম এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারীতে পরীক্ষা দিয়া নিতান্ত ঠেলাঠেলি করিয়া বি-এল হইলাম। ১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে হাইকোর্টে নাম লেখাইলাম; এবং সেই হইতে হাইকোর্টের জয়পত্র মাথায় বান্ধিয়া ভবের ঘানিতে যোড়া রহিয়াছি।

আমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্থূলকথা এই যে, আমি অল্পই পড়িয়াছি; তবে, অল্প যাহা পড়ি, তাহা সুজীর্ণ করি, তাহাতে অম্লোদ্‌গারাদি হয় না, বলাধানই হয়। আর এক কথা এই যে, আমার পড়া-বিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশী। আমি কুড়াইয়া বহুবিদ্যা লাভ করিয়াছি।

আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্মস্থান পুর্ণিয়াতেই আমি প্রথম ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম। আমার পিতাঠাকুর পারসী ভাল জানিতেন এবং সাতিশয় দান-শৌণ্ড ছিলেন। 'মুন্সীজী' বলিলে, যেন পারিভাষিকরূপে তাঁহাকেই বুঝাইত। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭১ সালের এপ্রিল কি মে মাসে পূর্ণিয়া গিয়া দেখিলাম যে, লোকে আমাকে "মুন্সীজীকা লেড়কা" বলিয়াই চিনিতেছে; এবং পরিচয় করিয়া দিতেছে। তাহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল। পিতৃ-গৌরবে আমার বড়ই গৌরব মনে হয়।

পূর্ণিয়াতে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। মাস দুই মধ্যেই আমি মুনসেফি পাইয়া ঐ জেলায় ভগুগোবা চৌকীতে গেলাম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মুন্সেফ ছিলাম, কিন্তু জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ৺পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া গেলাম না। আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে দিনাজপুরে ওকালতী করিতে গেলাম। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত দিনাজপুরে কাজ করিয়া, হাইকোর্টে ওকালতী করিতে ইচ্ছা হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৮১ সালের জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিলাম। তাহার পর হইতে বর্দ্ধমানে আছি।

আমার বংশ পরিচয় এইরূপ,—প্রপিতামহ ঠাকুর অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাটিকুরীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের গৃহে বিবাহ করিয়া গঙ্গাটিকুরীতেই বাস করেন। পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডের অনতিদূরস্থ গাঁফুলিয়া গ্রামে আমার পূর্ব্বপুরুষদের বাস ছিল।

প্রপিতামহের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ঠাকুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতামহ। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা, তন্মধ্যে ঠাকুর বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতা। বিমাতা ঠাকুরাণীর স্বর্গপ্রাপ্তির পর আমার পিতাঠাকুর পাণ্ডুগ্রামের ঠাকুর ভবানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই আমার পরমারাধ্যা জননী।

ইং ১৮৭০ সালে ইংরেজী এনট্রান্স কোর্সের নোটস্ লিখিয়া গুপ্তপ্রেসে ছাপাইতেছিলাম, সেই সময়ে সেই প্রেসে একখানি বাঙ্গালা নাটকও ছাপা হইতেছিল। মনে হইতেছে, সেই নাটক দেখিয়াই একটুকু ব্যঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইল; অতি ক্ষুদ্রকায় এক কবিতা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম—"উৎকৃষ্ট-কাব্যম্"। গুপ্তপ্রেসেই তাহা ছাপান হইল। যে দিন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্যানিং লাইব্রেরীতে "উৎকৃষ্ট কাব্যম্" আনা হইল, সেই দিনই মনে হইতেছে—অল্প সময় মধ্যে একখান একখান করিয়া ১৬ খান পুস্তক বিক্রয় হইল। পুস্তকের মূল্য করিয়াছিলাম ৴২।॰ সাড়ে বারো গণ্ডা, অর্থাৎ আড়াই পয়সা, তাহাতে ভারি রঙ্গ হইল, প্রত্যেক ক্রেতাকেই অন্যস্থান হইতে আধলা ভাঙ্গাইয়া আনিতে হইয়াছিল; কেননা, কেহ তিন পয়সা দিতে আসিলে তাহা লওয়া হইত না। যাহা হউক, অল্প সময় মধ্যে ।৶॰ দশ আনা পয়সা পাইয়া, আমরা আমোদ করিয়া মিষ্টান্নাদি কিনিয়া খাইলাম। তাহার পর সে পুস্তকের ভাবনা আর ভাবি নাই। আমি বড়ই অলস এবং কতকটা উদাসীন। তাহার পর ১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব বাক্সিনেশন্ আমার প্রিয় সুহৃদ্ "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার সঙ্গে হইত। "স্বর্ণলতা"র এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং "জ্ঞানাঙ্কুরে" লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি "কল্পতরু" লিখি। আমার বাসার উঠানে গুটিকতক ফুলগাছের সম্মুখে দূর্ব্বাঘাস লাগাইয়াছিলাম। অতি সুন্দর দূর্ব্বাবন উৎপন্ন হইয়াছিল; সুশ্যামল, সুদীর্ঘ—বায়ুভরে দোলায়মান তেমন দূর্ব্বাবন আর বুঝি দেখি নাই। প্রত্যহ কাছারী হইতে আসিয়া সেই দূর্ব্বাবনের উপর মাদুর পাতিয়া,—কবিহৃদয়হারী সুকোমল সান্দ্র সুশীতল সেই সুখাসনে বসিয়া, একটী টিনের বাক্সের উপর কাগজ রাখিয়া "কল্পতরু" লিখিয়াছিলাম। "কল্পতরু" লিখিতে ১৮।১৯ দিন লাগিয়াছিল। "কল্পতরু" রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণদাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন; তাহার পর, তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল,—পুস্তক "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত না হইলে তারকনাথ চটিবেন, হয়ত আমিও চটিব;

প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অপ্রিয় কার্য্য হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইলেন। এজন্য আমিও তাগাদা আরম্ভ করিলাম; প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, "কল্পতরু" উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মে"র নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম, "কল্পতরু" ফিরিয়া পাইলাম। তাহার পরে আপন ব্যয়ে কলিকাতায় ছাপাইয়া গ্রন্থকার হইলাম।

গ্রন্থ রচনার ঝোঁক থামিয়া গেল। তবে মধ্যে মধ্যে অক্ষয় দাদার (শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার) "সাধারণী" পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্যিক কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করিতাম।

কলিকাতা হাইকোর্টে যখন ওকালতী করি, তখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কিছুকাল আমার বাসা ছিল। সেই বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিক সঙ্গ হইত। এই সঙ্ঘে ৺অঘোরনাথ কুমার একজন নিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্য-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সমাচার, এবং তদতিরিক্ত রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতাগতির স্থূলসূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অঘোরনাথ নিত্য নিত্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপঢৌকন দিতেন। তাহাতেই কি জানি কেমন করিয়া, আমার কবি-কণ্ডুতির উদ্রেক হইল। ইং ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে "ভারত-উদ্ধার" লিখিয়া ফেলিলাম। "ভারত-উদ্ধার" রচিতে গোটাতিন বৈকালি নষ্ট হইয়াছিল। বৈকালি বুঝ ত? এ অঞ্চলের খাটুনি খাটা লোকে তিন প্রহর কাজ করে; বিকালে অবশিষ্ট বেলাতে যদি কাজ জুটিয়া যায়, তাহাকে 'বৈকালি' খাটা, বা 'বৈকালি' দেওয়া বলে। আমার "ভারত-উদ্ধার"ও সেই 'বৈকালি'র কাজ। যাহা হউক, "ভারত-উদ্ধার" বাজারে বাহির হইল; অমনি দেবগণ মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মলয়জ গন্ধে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ নিবৃত্ত হইয়া, দিবারাত্র কেবল কৌমুদী কেলি হইতে লাগিল;—আমার শুভ্র যশোরাশির ভয়ে ধরণী ভারাক্রান্ত হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলেন। ধরিত্রীকে আমি অভয় দিলাম,—ভয় নাই,—আর বোধ হয়; আমি লেখনী চালাইব না।

অক্ষয় কুমারের আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না; কেন তাহা পত্রে লিখিব না। 'সাধারণী'তে সমালোচনার জন্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার দাদাকে একখানি 'ভারত-উদ্ধার' দিয়াছিলাম। দাদা তাহা আগাগোড়া তুলিয়া 'সাধারণী'র ক্রোড় আলো করিয়াছিলেন।

"ভারত উদ্ধার" সম্বন্ধে বহুরঙ্গ- বার্ত্তা আছে।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসাতেই অক্ষয় দাদা আর আমি দুইজনে "হাতে হাতে ফল" নাম দিয়া এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম। চুঁচুড়াতে তাহা ছাপাও হইয়াছিল,

কিন্তু সাহিত্যের বাজারে তাহাকে ছাড়া হয় নাই। অক্ষয় দাদার বড়োতে সে পুস্তক থাকিতেও পারে।

তাহার পর ঐ বাসাতেই "পঞ্চানন্দে"র সূত্রপাত হয়। অক্ষয় দাদার সঙ্গে একপরামর্শী হইয়া পঞ্চানন্দ লিখিতে আরম্ভ করি; কিন্তু কতক কতক লিখিয়া, যাই চুচুঁড়ায় পাঠাইয়া দিলাম, অমনই দাদা তাহা "সাধারণী"র উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দুই একবার এইরূপ হইবার পর, একবার চুচুঁড়ায় গিয়া দুই জনে একখণ্ড পঞ্চানন্দ লিখিলাম; তাহা ছাপানও হইল। কিন্তু আমাদের উভয়েরই আলস্য এবং ঔদাসীন্য রীতিমত পঞ্চানন্দ চালাইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, একখানি ছাড়া তখন আর পঞ্চানন্দ বাহির হয় নাই।

কলিকাতা হইতে ভবানীপুরে আমার বাসা উঠিয়া গেলে পর, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায়— 'ভূধর চট্টোপাধ্যায় নহেন—প্রভৃতি কতকগুলি যুবক পঞ্চানন্দ বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়াতে আমি লিখিতে সম্মত হইলাম। পঞ্চানন্দ' রীতিমত বাহির হইতে লাগিল।

তাহার পর আমি হাইকোর্ট ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে আসিলাম। বর্দ্ধমান হইতে কয়েক ও পঞ্চানন্দ বাহির করিলাম। কিন্তু রীতিমত কাগজ চালান আমার কাজ নহে, রা রাখিতে পারিলাম না।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু পঞ্চানন্দের লাগিয়া আমাকে আক্রমণ রিলেন। শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়া ও এ আক্রমণে বসুজের প্রবল সহায় ছলেন। আমি পরাভব স্বীকার করিয়া "বঙ্গবাসী"তে "পঞ্চানন্দ" দিতে লাগিলাম।

"বঙ্গবাসী"র উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই। মে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমার গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হইল না। মহা কটে পড়িয়া বর্দ্ধমানে একদিন এক পরিচ্ছেদ 'ক্ষুদিরাম' লিখিয়া ফেলিলাম; কিন্তু র লেখা কোনও মতেই ঘটিল না। অগত্যা 'অজ্ঞাত বাসের' ব্যবস্থা করিলাম; র্দ্ধমান হইতে পলাইয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার বাটী শিব-নিবাসে য়া ৭।৮ দিন থাকিলাম, আর সেই কয়দিনে যতদূর পারিলাম, 'ক্ষুদিরাম' লিখিলাম। হাই ছাপা হইল, 'বঙ্গবাসী'র মান বাঁচিল, আমি বাঁচিলাম এবং পড়িতে হয় নাই লিয়া বোধ করি 'ক্ষুদিরাম' অনেককেই বাঁচাইয়াছে।

এই ত আমার মাতৃভাষার চর্চ্চা। দুই চারিটা প্রবন্ধ রচনাও করিয়াছি, কিন্তু রা ধরিয়া আর কোনও গ্রন্থ লেখা হয় নাই। তবে দিনাজপুরে থাকিতে 'সিরাজ- দ্দৌলা' নামে এক নাটক লিখিয়াছিলাম, তাহা ছাপান হয় নাই। কলিকাতার কে

তাহা আমার নিকট চাহিয়া লইয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি, কে, তাহা আমার মনে নাই "সিরাজ-উদ্দৌলা"ও আর আমাকে জ্বালাতন করেন নাই।

২। ইন্দ্রনাথ-স্মৃতি।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক যোগেন্দ্রচন্দ্র যখন চুচুঁড়ায় অক্ষয়চন্দ্রের "সাধারণী"র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন হইতেই তিনি ইন্দ্রনাথকে জানিতেন। ইন্দ্রনাথ তখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার "অক্ষয় দাদা"র বাড়ীতে আসিয়া দুই এক দিন অবস্থান করিতেন এবং "সাধারণী"র জন্য নানাবিধ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তৎপূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথ "কল্পতরু ও "ভারত উদ্ধার" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। পরে 'পঞ্চানন্দ' নামে একখানি চটি মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকও ইন্দ্রনাথ; ইহাও যোগেন্দ্রচন্দ্র জানিতেন। তাহার পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া "বঙ্গবাসী" বাহির করেন এবং উহার জন্য বড় প্রসিদ্ধ লেখকের সহায়তা পাইবার চেষ্টা করেন। তখন ইন্দ্রনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া বৰ্দ্ধমানে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তখনও "পঞ্চানন্দ" বাহির হইত বটে, কিন্তু অনিয়মিত ভাবে। "বঙ্গবাসী"র আরম্ভে কিছুকাল যোগেন্দ্রচন্দ্র "বঙ্গবাসী"র জন্য ইন্দ্রনাথের লেখা পাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। অক্ষয়চন্দ্রের "সাধারণী" ও ইন্দ্রনাথের "পঞ্চানন্দ" ছিল, বোধ এই ভাবিয়াই দুই জনের কাহারও কাছে তিনি প্রবন্ধাদি প্রার্থনা করেন নাই। তবে "বঙ্গবাসী"র প্রতি উভয়েরই সহানুভূতি ও স্নেহদৃষ্টি ছিল বলিয়াই, ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয়ে আসিয়া "বঙ্গবাসীর" শ্রীবৃদ্ধি ও কুশলবার্ত্তা শুনিয়া সুখী হইতেন।

আরম্ভ হইতেই প্রতি সপ্তাহে "বঙ্গবাসী"র গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। কিছুকাল পরেই এক ঘটনা ঘটিল—তৎকালিক "বেঙ্গলী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিচারক নরীশ সাহেবকে গালি দেওয়ায় তাঁহার জেল হইল। তখন সুরেন্দ্রনাথের বাক্ প্রতিভায় বাঙ্গালার শিক্ষিত সাধারণ ও বিশেষ ভাবে ছাত্রবৃন্দ সচকিত ও মুগ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময়ে হাইকোর্টের সাহেব বিচারককে গালি দিয়া সেই সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে গেলেন। দেশময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল—সভায় সভায় দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল—ছাত্রেরা পিরানের হাতার উর্দ্ধভাগে কালো ফিতা বাঁধিল—হঠাৎ দেশময় যেন এক নূতন কারখানা সংঘটিত হইল।

---

* এই জীবনী সন ১৩১১ সালে লিখিত।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের যেমন সাহিত্যিক বোধ ছিল, তেমনি বিষয়-বুদ্ধিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে ইন্দ্রনাথের সেই "পঞ্চানন্দ" পত্রিকাটুকু আর বাহির হয় না,—বন্ধই হইয়া গিয়াছে। এখন এই হুজুকের সময়ে যদি রসিক ইন্দ্রনাথের রসময় "পঞ্চানন্দ" "বঙ্গবাসী"তে বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে "বঙ্গবাসী"র আদর প্রতিপত্তি হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে, এই ভাবিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র ঐ হুজুকের আরম্ভেই বর্দ্ধমানে গিয়া ইন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্রনাথও "সুরেন্দ্রায়ণ" লিখিয়া সানন্দে "বঙ্গবাসী"র কায়ার সহিত পঞ্চানন্দের ছায়া মিশাইয়া দিলেন। ইহা হইতেই "বঙ্গবাসী"র সহিত ইন্দ্রনাথের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তাহার পর বহুকাল ধরিয়া ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীকে আনন্দদান করিয়া আসিয়াছে। পঞ্চানন্দের শ্লেষাত্মক বিদ্রূপাত্মক রস-রচনা বহুকাল ধরিয়া "বঙ্গবাসী"র বিশেষত্ব ছিল।

"বঙ্গবাসী"র সহিত সংশ্রব স্থাপনের কিছু দিন পর হইতেই ইন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম্মের আচরণে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং যদিও "বঙ্গবাসী"তে হিন্দু-ধর্ম্মের ও সমাজের পোষকতা করা হইত, তবু ইন্দ্রনাথের পরামর্শেই "বঙ্গবাসী" সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে বর্ণাশ্রমাত্মক হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া হিন্দুর মুখপত্র হইয়া উঠিল। ইহাই ইন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। ক্রমে "বঙ্গবাসী"র সহিত ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিল, "বঙ্গবাসী"র শ্রীবৃদ্ধিতে তিনি বিশেষ আনন্দিত ছিলেন। ঘন ঘন কলিকাতায় আসিয়া "বঙ্গবাসী" গৃহে অবস্থান করিয়া "বঙ্গবাসী"র জন্য পঞ্চানন্দ ও অন্যান্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং নানা বিষয়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দান করিতেন। "বঙ্গবাসী"র বিপদে তিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও "বঙ্গবাসী"র জন্য পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। "বঙ্গবাসী"ও তাঁহার পরামর্শকে হিতজ্ঞানে অনুসরণ করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হয় নাই।

সাধারণের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেন যে, ইন্দ্রনাথ "বঙ্গবাসী"তে শুধু পঞ্চানন্দই লিখিতেন; কিন্তু তাহা নহে, পঞ্চানন্দ ছাড়া নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি তাঁহার লিখিত নানা প্রবন্ধ "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইত। সেই সব প্রবন্ধ তীব্র সমালোচনায় যেমন সরস তেমনি জ্ঞান-গর্ভ। দুঃখের বিষয় যে, সে সব প্রবন্ধে তাঁহার নাম না থাকায় এখন তাহা সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য।

"বঙ্গবাসী"র সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার পর হইতে ইন্দ্রনাথ প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন। তাঁহার অবস্থান কালে সকালে বৈকালে "বঙ্গবাসী" গৃহে একপ্রকার সাহিত্যিক সঙ্ঘ বসিয়া যাইত; বলা বাহুল্য, সে সঙ্ঘের মধ্য-মণি ইন্দ্রনাথ। তাঁহার কথায় কথায় রস; সুতরাং সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন এবং মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। তিনি শুধু লেখায় পঞ্চানন্দ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যেন মূর্ত্ত পঞ্চানন্দ। ঘরে বাহিরে কাজে অকাজে সকল অবস্থায় সকল স্থলে সকল সময়েই

তাঁহার পঞ্চানন্দ-মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি দেখা যাইত, রহস্য ও রসিকতা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। এমন যে শুষ্ক হাড়ের ব্যবসায়,—আইন-ব্যবসায়—তাহাতেও তাঁহার রস-বিস্তারের কিছুমাত্র অল্পতা ছিল না। সভা-সমিতিতে তাঁহার বক্তৃতা একরূপ অবিচ্ছিন্ন রস-প্রবাহ বলিলেই হয়—শ্রোতৃবর্গের পক্ষে হাসির বিরামলাভ করা অনেক সময়েই দুর্ঘট হইত। স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্র এবং অন্যান্য লোকের প্রমুখাৎ আমরা একথা শুনিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতায় হাস্য রসের উদ্দীপন বিষয়ের উপর নির্ভর করিত না; যে-কোন বিষয়ে বলিতে উঠিয়াই, তিনি অবিশ্রান্ত হাস্যরসের অবতারণা করিতে পারিতেন। সুরেন্দ্রনাথের জেল হওয়ায় হুগলীতে যে সভা হয়,—তাহাতে ইন্দ্রনাথ (সেদিন তিনি অক্ষয় দাদার বাড়ীতে ছিলেন) সেই সভায় বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়া যতক্ষণ বলিয়াছিলেন, ততক্ষণ সভাশুদ্ধ লোককে অবিচ্ছেদে হাসিতে হইয়াছিল—অথচ বিষয় সুরেন্দ্রনাথের জেল! এক সময়ে কলিকাতা হইতে একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-বক্তা আসিয়া বর্দ্ধমানে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে একস্থলে তিনি, বলেন যে সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ মানিতে হইলে আমাদের জাপান যাওয়া হয় না ইত্যাদি। বক্তার বক্তৃতার পরে ইন্দ্রনাথ ঐ জাপান যাওয়ার ধুয়া ধরিয়া এমন একটী বক্তৃতা করিলেন যে, তাহা শুনিয়া সেই ধর্ম্ম-বক্তাটি ছাড়া সভাস্থ সকলেই ক্রমাগত হাসিয়া অস্থির। বোধ হয়, ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে থাকিতে ঐ ধর্ম্মধ্বজী মহাপুরুষটী আর বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটিতে পদক্ষেপ করেন নাই।

তাঁহার বক্তৃতা লোকের এত ভাল লাগিত, তাহার কারণ এই যে, বক্তৃতায় অনেক কথা খুলিয়া বলিতে হয়, তাই লোকে সহজে বুঝিতে পারে এবং হাসির কথা হইলে হাসে। লিখিত পঞ্চানন্দের রস গাঢ় এবং ভাব ইঙ্গিত-ময়। সুতরাং রসগ্রাহী ও চিন্তাশীল পাঠক ভিন্ন অন্যে পঞ্চানন্দের রস ততটা সহজে উপভোগ করিতে পারে না।

ইন্দ্রনাথ বৈঠকী গল্প আলাপ আদি করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন—লেখা অপেক্ষা কথাবার্ত্তাই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। সেই জন্য বর্দ্ধমানে তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই একটা সান্ধ্য-সঙ্ঘ বসিত, তাহাকে সাহিত্য-সঙ্ঘ না বলিয়া রস-সঙ্ঘ বলিলেই ঠিক হয়। সেখানে নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিত। তিনিও যোগ দিতেন এবং তাঁহার রসিকতার বুকনিতে কাজের কথাগুলিও বেশ রসময় হইয়া উঠিত।

তাঁহার বক্তৃতার কোন লিপি নাই, কথাবার্ত্তাগুলির সংগ্রহই কেহ করেন নাই। তাহা করিলে সেইগুলিতেই একখানি গ্রন্থ হইতে পারিত। সংগ্রহ অভাবে ইন্দ্রনাথের অনেক রসালাপ চিরলুপ্ত হইয়া গেল। আমরা যে দুই চারিটী কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নমুনা স্বরূপ তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তাৎকালিক "বেঙ্গলী"-

সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ যখন 'ন্যাশনাল ফণ্ডে'র সূচনা করেন, তখন "বঙ্গবাসী"র গ্রাহক-সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। একদিন সুরেন্দ্রনাথ ঐ ফণ্ড সম্বন্ধে কথা কহিবার জন্য যোগেন্দ্র চন্দ্রের বাসায় আসিয়াছিলেন। সেখানে সেদিন ইন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের যাহা কিছু কথাবার্ত্তা তাহা ইন্দ্রনাথের সঙ্গেই হইল, যোগেন্দ্রচন্দ্র নীরব ভাবে সকলই শুনিলেন। যোগেন্দ্র চন্দ্র নীরব প্রকৃতির লোক ছিলেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্ত্তার সময়ে ইন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে রসালাপের কিছুমাত্র ত্রুটী ছিল না। পরে যখন সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন, তখন ইন্দ্রনাথ উঠিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রকে বলিলেন—"যোগেন্দ্র বাবু, আপনি এত অল্প দিনের মধ্যে দু' পয়সার বাঙ্গালা কাগজের এমন প্রতিপত্তি করে তুলেছেন যে, ইংরেজী কাগজের সম্পাদকতাভিমানী বিলাতী বাবুরা আপনার মতামত জানবার জন্য আপনার বাসায় আসেন। এর জন্য আপনার কালো পাথরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত।" যোগেন্দ্র চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির জন্য পাথরের রং কিরূপ হওয়া চাই, তাহারও উল্লেখ করিতে ইন্দ্রনাথ ভুলিলেন না। 'কালো পাথর' যোগেন্দ্রচন্দ্রের বর্ণের প্রতি সুন্দর রসময় ইঙ্গিত।

একদিন "বঙ্গবাসী"র সম্পাদকীয় গৃহে ইন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক যুবক ছাত্র আসিয়া পরম্পরায় শুনিলেন, যিনি কথা কহিতেছেন তিনিই ইন্দ্রনাথ। তখন যুবকটী ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়া বসিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ইন্দ্রনাথ—হাঁ পার বৈ কি!

যুবক—বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে কোন্‌খানি আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

ইহার উত্তরে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রনাথ অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"কৃষ্ণ-চরিত্র নামে যে উপন্যাস খানি তিনি সম্প্রতি লিখেছেন, সেইখানিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।" এই উত্তর শুনিয়া সকলেই হাসিল দেখিয়া যুবকটী একটু অপ্রতিভ হইলেন।

একদিন কথা উঠিল, বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার লেক্‌চার দিয়াছিলেন, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—"বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন। তখন গীতার ইংরেজী অনুবাদ হয় নাই। এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি উহা বুঝিবেন কি উপায়ে?"

এক সময়ে রুচিবায়ুগ্রস্ত এক বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছাত্রবৃন্দের কোন একটী কার্য্যের নিন্দা করিতে গিয়া সাধুভাষায় "নিতম্বপক্কতা" শব্দের ব্যবহার করিয়া রুচি রক্ষা করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের কাছে এই কথার উল্লেখ মাত্রেই তিনি বলিলেন,—"ভাব্‌ছ কি? ওরা নিতম্ববধ কাব্য না লিখে ছাড়বে না।"

তাঁহার কর্ম্মস্থান বর্দ্ধমান যেখানে, তিনি জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছেন, সেখানে নিত্য নিত্য ঐরূপ টুকরা রসিকতা তাঁহার মুখ হইতে কত বাহির হইত, কে তাহার সন্ধান করিবে? আদালতে মোকদ্দমা করিতে করিতে রসিকতার অবসর কখনও তিনি অবহেলা করিতেন না। পদ্মমণি নামে এক বেওয়া সাক্ষী দিবার পরে, এক পুরুষমানুষ সাক্ষী দিতে আসিলে, সে পক্ষের উকীল তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসান্তে পেশা জিজ্ঞাসা করায়, এ পক্ষ হইতে ইন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন,—"উনি পদ্মমণির অলি (ওলি।)"

এক তন্তুবায় হাকিমের এজলাসে বিষম গোল হইতেছে দেখিয়া, ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বলিলেন,—"এ যে একেবারে স্যুতোহাটার গোল দেখ্‌ছি।"

পরে ঐ হাকিম স্ব-লিখিত রায়খানি ইন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তাঁহাকে শুনাইয়া, কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—"বুনা হয়েছে বেশ, কিন্তু ধোপে টিকবে না।" বলা বাহুল্য, আপিলে সে রায় টিকে নাই।

এইরূপ রসিকতা আদালতে নিত্য নিত্যই হইত। উকীল-ঘরও তাঁহার রসিকতার প্রধান স্থান ছিল। সহবাস সম্মতি-আইন, লইয়া যখন বঙ্গে হুলুস্থুল বাধিয়াছে, তখন একদিন সম্মতির বয়স লইয়া তুমুল তর্ক উপস্থিত। এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ আসিবা মাত্র সকলে তাহাকেই মধ্যস্থ মানিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করিয়া দিলেন,—"নিদেন এক ছেলের মা না হ'লে কোন মতেই নির্ভয়ে সম্মতি দেওয়া চলে না।" ভুয়া বিষয়ের এইরূপ রস-নিষ্পত্তি করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই শ্রেয়। ইহাই ইন্দ্রনাথ মনে করিতেন। আইনের দ্বারা মানুষের কর্ত্তব্য-বোধের উন্মেষ করিতে যাওয়া একপ্রকার নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র। মনেকর ভোজন সম্বন্ধে এবং অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যাপারে যদি আইনের শাসন বিধান করিতে হয়—তাহা হইলে কেমন হয়? শুধু আইনে কাহাকেও সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় করিতে পারিয়াছে কি? এত আইন সত্ত্বেও মানুষের কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি কিছু হ্রাস হইয়াছে কি? ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন, মানুষকে জ্ঞানদান কর, ধর্ম্মশিক্ষা দাও তাহা হইলেই প্রবৃত্তির দমন হইবে। এবং সেই দমনই স্থায়ী, শাস্ত্রে যাহার নাম সংযম। আইনের শাসনে ক্ষণিক কিছু দমন হ'লেও, তাহা মোটেই স্থায়ী হয়না—শেষে প্রবৃত্তিই জয়ী হয়—তখন আবার কঠোরতর আইনের আবশ্যক। মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে আইনের উপকারিতা নিতান্তই অল্প কেবল লোক নির্য্যাতনের পথ উন্মুক্ত ও সুগম হয় মাত্র। ইন্দ্রনাথের রসিকতার মূলে থাকিত গভীর চিন্তাশীলতা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ ও সমাজের হিতাহিত জ্ঞান; তাই কখনও তিনি অহিতকে কশাঘাত করিতে আর উপেক্ষণীয়কে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে ছাড়িতেন

না। সম্মতি-আইন নেহাৎ একটা তুয়া জিনিস, তাই তিনি সামান্য একটু রসিকতা করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম শিখাইব না, কেবল আইন করিয়া পশুকে মানুষ করিব, এও কি কখন হয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাঁহার প্রায় সব রসিকতা ও বিদ্রূপের মূলে ঐরূপ সুদৃঢ় মত ও বিশ্বাস বিদ্যমান থাকিত, তবে প্রকাশের ভঙ্গী ছিল রসিকতা ও বিদ্রূপ। ইন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাঁহার রসিকতা ও বিদ্রূপের ভিতর দিয়া তাঁহার মতের সন্ধান করিতে হইবে। রসজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তাহা কঠিন নয়। কিন্তু অরসিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই "উদার" অরসিকের দল এককালে ইন্দ্রনাথকে গালাগালি দিবার সময়ে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। যাহারা রসিকতার আবরণ ভেদ করিতে পারে না, ইন্দ্রনাথের রহস্য ও রসিকতা সেই ভোঁতাদের জন্য নহে। যাহারা বিদ্রূপের গূঢ় মর্ম্মভেদ করিতে পারে না, ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র মনে করিতেন।

একবার ইন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুদের অনুরোধে বর্দ্ধমানের "ময়লা ফেলা কামিশনর" হইয়াছিলেন। তখন বর্দ্ধমানে জলের কলের পত্তন হইতেছিল। নানা সুবিস্তৃত ও সুগভীর সায়র-শোভিত বর্দ্ধমানে জলের কলের কোন প্রয়োজন ছিল না, ইহাই ইন্দ্রনাথের মত। তাই তিনি জলের কল প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু-ভোটান রাজ্যে তাঁহার প্রতিবাদ ভাসিয়া গেল; থাকিল কেবল ইন্দ্রনাথের "রাজমার্গে নল প্রদান।" এখন সহরে সহরে এই কার্য্যই হইতেছে। তাঁহার কথাটীও এখন প্রবাদ বাক্যস্বরূপ সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। বলা বাহুল্য, 'ভোটান রাজ্যে' তিনি বেশীদিন থাকেন নাই। পরে আর কখনও ময়লা ফেলা সম্মানের প্রার্থী না হইলেও, সঙ্গীতে ঐ পদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে ভুলেন নাই,—

"আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(যদি বলো, তা কেন চাই?)
আমায় কেউ জানে না, কেউ মানে না,
আমায় কেউ ডাকে না ভানতে ধান;
(তাই) আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(যদি বলো, এ মান হয় কিসে?)
টেঁকে গুঁজে ঘরের কড়ি,
ছুটবো আমি কলুর বাড়ী,
তারি কাছে, তেল কিনে ভাই,
তারি পায়ে করবো দান;
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।

(যদি বলো, তাহাতে লাভ কি?

লাট-মহলে আনাগোনা,
(আর) দশের মাঝে চেনা-শুনা
বালাখানা কি খেতখানা,
সকল ঘরে অধিষ্ঠান;
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।

(আরও লাভ আছে)

ভোটের জোরে কালুয়া (১) গিরি
এতে কি কম বাহাদুরী—
পাই যদি রায়-বাহাদুরী,
হলেমই বা লবেজান;
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।

(যদি বল্লে, ভরসা চাই।)

জল্‌দি কাম বাজাও ব'লে
যদি পিঠের ছিল্‌কে তোলে,
হরিবোল দিয়ে গোলে,
সেলাম ঠুকে ধরবো গান;
তবু চাই, মিউনিসিপাল-মান॥"

সহরের বাবুদের কলের জলের নেশা যখন বেশ ধরিল, তখন আর রাস্তা হইতে জল আনিয়া পোষাইল না। 'হাউস কনেক্‌সনে'র জন্ত রাশি রাশি দরখাস্ত পড়িতে লাগিল। চেয়ারম্যান (রায় বাহাদুর) ভাবিয়া অস্থির—এত জলের সরবরাহ করিবেন কিরূপে। এই সময়ে একদিন উকীল-ঘরে রায়-বাহাদুরকে এই বিষয়ে চিন্তিত দেখিয়া ইন্দ্রনাথ সেইখানে বসিয়াই একটী কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন—

"একি হ'ল উপসর্গ, ঘরে ঘরে সংসর্গ,
জল যোগানো হ'ল বুঝি দায়।
রায়-বাহাদুর, টাক ফুরফুর,
গাড়ু গামছা হাতে করে ভাবছেন উপায়।
কেউ দালানে কেউ প্রাঙ্গণে—ইত্যাদি।

কবিতাটী শুনিয়া উকীল মহলে হাস্তের তরঙ্গ উঠিল। চিন্তাকুল রায় বাহাদুরও সে তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া আনন্দ অনুভব করিলেন। কতকগুলি ইংরেজী কথার

(১) সেকালের যাত্রারঙ্গে ভিস্তির সঙের পরেই মেথরের সং থাকিত—কালুয়া ভুলুয়া মেথরাণী।

যথাযথ বাঙ্গালা অনুবাদে চমৎকার হাস্যরসের উদ্দীপন হয়, ইন্দ্রনাথ এ সন্ধানটী বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার পঞ্চানন্দে ওরফে পাঁচুঠাকুরে ইহার ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

তহবিল তছরুপাতের মোকদ্দমা। প্রতিবাদী পক্ষের উকীল ইন্দ্রনাথ আদালতের অবগতির জন্য বাদী পক্ষ হইতে একখানি খাতা দাখিল করার আবেদন করিলেন পর দিন বাদীর উকীল মহাশয় বোধ হয় ক্রোধ বশে বহু খাতা আনিয়া আদালতের টেবিলে রাখিলে, খাতার স্তূপ দেখিয়া ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বলিলেন—"আমি একটু বিশল্যকরণী চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সুপণ্ডিত বন্ধু একেবারে গোটা গন্ধমাদন এনে হাজির করেছেন"। আদালত-গৃহে আ-হাকিম চাপরাশি পর্য্যন্ত একটা হাসির রোল উঠিল।

এক সময়ে হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ উকীল কোনরূপ হিসাব সূত্রে তাঁহার পিতার নিকট টাকা পাওনা বলিয়া বর্দ্ধমানের সবজজের কাছে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। প্রতিপক্ষে উকীল ছিলেন ইন্দ্রনাথ। একে হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল, তায় বাপের নামে পাওনা টাকার নালিশ—আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এ হেন পুত্রকে দেখিবার জন্য লোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে আদালতে লোকজন এবং গোলমাল যেন আর ধরে না, এমন সময়ে "পুত্র" উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিলেন—"আসুন, আসুন, আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। শাস্ত্রে বলে পিতৃ-ঋণ কেহই শোধ করিতে পারে না। যাহা কেহই পারে না, আপনি তাহা পারিয়াছেন; এমন কি, কিছু ফাজিল পাওনারও দাবী করিয়াছেন—আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাই আপনাকে দেখিবার জন্য আদালতে লোকে লোকারণ্য।"

একসময়ে বাবুদের আস্কারায় জেনানা মিশনের বিষম বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। সময় নাই অসময় নাই, যেন বাঙ্গালীর বাড়ী যাইতে হইলে সময়াসময় বিবেচনার কোন দরকারই নাই, মেমেরা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, আর অমনি অন্তঃপুরময় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, মেম আসিয়াছে বলিয়া সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই নিজ নিজ কাজ ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া শেমিজ চড়াইয়া মেমের কাছে গিয়া বসিতেন এবং তাহার কাছে উলবোনা বা ইংরেজী শিক্ষার ছলে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে, নানাবিষয়ে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতেন। ইহার ফলও সেই সময়ে বর্দ্ধমানে দুই এক বাড়ীতে বিলক্ষণরূপে ফলিয়াছিল। তবুও কি বাবুদের নেশা ছুটে? এই সময়ে একদিন ইন্দ্রনাথ কাছারী হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে কয়েক জন মেম আসিয়া বাড়ীর এদিক্ ওদিক্ উঁকি ঝুঁকি মারিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বুঝি-

লেন যে, এ উঁকি ঝুঁকি খৃষ্টীয় প্রেমের পূর্ব্বরাগমাত্র। এখন গৃহ রক্ষা করিতে হইলে অঙ্কুরেই সাবধান হইতে হইবে। মেমেরা ইন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে দুই এক দিন দুপর বেলায় আসিয়া গৃহপ্রবেশের কোন সুবিধা না পাওয়ায়,—একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া উপস্থিত। ইন্দ্রনাথ তখন বাহিরের বারান্দায় বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছেন এবং চাকরে তাঁহার গায়ে তেল মাখইতেছে। মেমেরা আসিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রনাথ তেলমাখা বন্ধ করিলেন এবং চাকরকে চেয়ার বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। মেমেরা বসিলে ইন্দ্রনাথ প্রথমেই নিজের অনাবৃত দেহের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন ;—

ইন্দ্রনাথ। আপনারা আমার বাড়ীতে আসায় আমি নিজেকে বড়ই বাধিত অনুভব করিতেছি। আপনাদের জন্য কি কার্য্য করিতে পারি, আজ্ঞা করুন।

মেম। আমরা আপনার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে পাইলে বড়ই সুখী হইব।

ইন্দ্রনাথ। ইহা আপনাদের অতি অনুগ্রহের কথা। আমার স্ত্রী ইহা শুনিলে খুবই খুসী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনারা আমাকে অর্দ্ধ মিনিটের জন্য মার্জ্জনা করুন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি—তিনি আপনাদিগকে এখন অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন কি না?

বিলাতী মেমেরা দয়া করিয়া বাঙ্গালীর বাড়ীতে পদার্পণ করিলে সে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত কি না, (তা যে সময়েই তাহারা আসিয়া থাকুন না) এরূপ কথা তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না; সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথের মুখে এরূপ অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া মেমেদের মুখ কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেও, তাঁহারা সভ্যতার খাতিরে সস্মিত বদনে এ কথা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন ইন্দ্রনাথ দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে গিয়া অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া মেমদিগকে বলিলেন—"আপনারা দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া আমার স্ত্রী অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি এ সময়ে আপনাদের সহিত দেখা করিবার সুবিধা করিতে পারিবেন না বলিয়া ভয়ঙ্কর রূপে দুঃখিত হইলেন। প্রাতঃকালে সমস্ত ঘর জল দিয়া ধৌত করা হইয়াছে, তিনিও স্নানাদি শেষ করিয়া তাঁহার প্রাত্যহিক পূজা আদির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমতাবস্থায় আপনারা বাড়ীর মধ্যে গেলে পরে সমস্তই আবার ধৌত করিতে হইবে এবং তাঁহাকেও পুনরায় স্নান করিতে হইবে। অগত্যা আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকারের আনন্দ লাভে বঞ্চিত হওয়াতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের সুবিধা মত এক রবিবারের বৈকালে আসিলে তিনি বড়ই বাধিত হইবেন।" *

* রবিবারে আসিতে বলার ইঙ্গিতটুকু খুলিয়া বলিতে হইতেছে। খৃষ্টান মেমেরা—বিশেষতঃ

ইহার পর মেমেরা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বলা বাহুল্য যে, ইন্দ্রনাথের স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে ইহার পরে—আর কোন মেমেদেরই ব্যস্ততা লক্ষিত হয় নাই।

ইন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই রসিক ও সপ্রতিভ ছিলেন। গল্প আছে যে,—তাঁহাদের গ্রামে এক যাত্রার দল আসিয়াছিল। সেকালের যাত্রারঙ্গে "ভিস্তির সং" এক উপভোগ্য অভিনয় থাকিত। সে দলের ব্যক্তি যে ব্যক্তি ভিস্তি সাজিত, সে জ্বরে কাতর হইয়া পড়ায় সেদিন ভিস্তি বাদ দিয়া যাত্রা হইবে, এইরূপ কথা উঠিলে, ইন্দ্রনাথ তখন স্কুলের ছাত্র ও বাড়ীতে ছিলেন, ভিস্তি সাজিতে ও ভিস্তির গান গাহিতে সাহসী হইলেন, এবং ভিস্তি সাজিয়া আসরে নামিয়া গাহিয়া সে রাত্রির--কাজ চালাইয়া দিলেন।

তাঁহার ছাত্রাবস্থার আর একটী কথা শুনা গিয়াছে। বার্ষিক পরীক্ষা হইতেছে। বাঙ্গালা পরীক্ষার দিন লিখিত পরীক্ষা শেষ করিয়া পরে মৌখিক পরীক্ষাও দিতে হইত। ইন্দ্রনাথ লিখিত কাগজ পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদান করিলে, তিনি মৌখিক প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন।

পণ্ডিত।—বল দেখি, বিপদ্ আর আপদে প্রভেদ কি?

ইন্দ্রনাথ।—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) উদাহরণ দিয়া বলিতে পারি।

পণ্ডিত।—আচ্ছা, তাহাই বল।

ইন্দ্রনাথ। আজকার লিখিত পরীক্ষায় একরূপ মহা বিপদেই পড়িয়াছিলাম বলিতে হয়। কোন রকমে যদি সে বিপদ্ কাটাইয়া উঠিলাম, এখন আবার এই মৌখিক পরীক্ষার আপদে পড়িয়াছি।

বলা বাহুল্য, পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের মুখে এরূপ সপ্রতিভ ও সরস কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থার আর একটী কথা প্রচলিত আছে। ছাত্রেরাই একে একে মুখে মুখে একটী ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতেছে। ইন্দ্রনাথের পালায় পড়িল "ও ডটার অব ফেথ, অ্যাওয়েক, অ্যারাইজ,"—ইন্দ্রনাথ অনুবাদ করিলেন—"ওগো বিশ্বাসের মেয়ে জাগো, উঠ।" ইংরেজীর যথাযথ শব্দানুবাদ করিলে কখন কখন তাহা চমৎকার হাস্যজনক হয়, এ তথ্যটুকু বাল্যাবধি ইন্দ্রনাথের জানা ছিল। পরে পরিণত বয়সে পঞ্চানন্দে উহার চরম পরিণতি হয়। পাঠকগণ 'পাঁচুঠাকুরে' তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাইবেন।

খৃষ্টান মিশনের মেমেরা—রবিবারে কোন কাজ করেন না। এমন কি, কেহ বাড়ীতে গেলেও দেখা করেন না; কারণ রবিবার তাঁহাদের পূজার দিন। হিন্দুর গৃহে প্রাতঃকালে প্রতিদিনই পূজা। বোধ হয় এরূপ দৈনিক ব্যবস্থাকে তাঁহারা অসভ্যতা বলিয়া মনে করেন। হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রতিদিন প্রাতঃকালই রবিবার।

এই আজন্ম রসিক মহাপুরুষ তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ মুমূর্ষু গৃহে অন্তিম শয্যায় শয়ান, দেহ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, অথচ জ্ঞান বিদ্যমান, শেষ মুহূর্ত্ত সন্নিকট দেখিয়া যখন তাঁহার জননী ও স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন সেই মৃতপ্রায় রসিক মহাপুরুষের মুখ হইতে যে করুণ রসিকতাটুকু বাহির হইয়াছিল, তাহা একান্তই অসাধারণ। পার্শ্বে বসিয়া জননী ও স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকিলে, মুমূর্ষু ইন্দ্রনাথ ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"মা, তোমরা আর কাঁদিও না, একজন আমাকে ওদিকে টানিতেছে, এখন তোমরা এ দিকে টানিতে থাকিলে, আমি দোটানায় পড়িয়া মারা যাব—তোমরা আর কাঁদিও না।" তাঁহাদের ক্রন্দনে সজ্ঞান ইন্দ্রনাথ কষ্ট অনুভব করিতেছেন বুঝিয়া তাঁহারা রোদন বন্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে মহাপুরুষের প্রাণ বায়ু মহাকাশে লীন হইয়া গেল। ১৩১৭ সালের ৯ই চৈত্র এই ঘটনা ঘটে। মৃত্যুকালে ইন্দ্রনাথের বয়স হইয়াছিল ৬১ বৎসর মাত্র।

আমাদের এই রসাল বঙ্গভূমিতে কোন কালেই রসিকের অভাব হয় নাই। বঙ্গ—সাহিত্যেও রস-রচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচনা বহুদিন হইতে অল্প বিস্তর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু গভীর রহস্যাত্মক ও বৈচিত্র্যময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একটা সুবিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন কেবল মাত্র ইন্দ্রনাথ। তাঁহার উপন্যাস "কল্পতরু," তাঁহার কাব্য "ভারত উদ্ধার," গল্পিগল্প 'ক্ষুদিরাম,"—এগুলির অস্থি মজ্জা ও রস তীব্র বিদ্রূপ। তাহা ছাড়া, "পঞ্চানন্দ" ওরফে "পাঁচু ঠাকুর" সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রত্নাকর বলিলেই হয়। 'কার্টুন' অর্থাৎ এদেশে ব্যঙ্গচিত্রসমূহেরও প্রবর্ত্তক ইন্দ্রনাথ। এইবার আমরা তাঁহার গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

৩। গ্রন্থ-পরিচয়।

উৎকৃষ্ট কাব্যম্—এই ক্ষুদ্র রস-রচনাটুকু ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-রচনার 'হাতে-খড়ি' বলিলেও হয়। তখন তাঁহার তরুণ বয়স এবং ছাত্রাবস্থা। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার ব্যঙ্গ প্রতিভার প্রথম রশ্মি-পাত,—তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শক্তির প্রথম উন্মেষ এবং তাঁহার শ্যেনদৃষ্টির প্রখরতা সুস্পষ্টই লক্ষিত হয়।

কল্পতরু—এখানি বাস্তব তন্ত্রের বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস। ইন্দ্রনাথের বয়স যখন চব্বিশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়া লোক সমাজে যথোচিত যশস্বী হইয়াছিলেন। এই অল্প বয়সেই সমাজের অনাচার-ব্যভিচারাদির প্রতি তাঁহার তীব্রকটাক্ষ, বিচিত্র বিচিত্র লোক-চরিত্রের পুঙ্খানু-

পুস্তক পর্য্যালোচন, বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার অদ্ভুত অধিকার এবং সর্ব্বোপরি মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ করিবার অসাধারণ শক্তি—এ সমস্তই একটা অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। ১২৮১ সালে যখন "কল্পতরু" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন "বঙ্গ-দর্শন" পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র উহার সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সম্রাটের সেই সমালোচনাটী আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কল্পতরু (শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী। ১২৮১)। গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র। মনুষ্য-চরিত্র ঘোরতর বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পর দুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র্য বিশিষ্ট; এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থ-বিস্মৃত পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্গুণের ভাগই অধিক, অসদ্গুণের ভাগ অল্প; সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি। যাহার সদ্গুণের ভাগ অল্প, অসদ্গুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বি-প্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্য চরিত্রই দ্বি-প্রাকৃতিক, দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্য হৃদয় বিভক্ত।

"কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতি-বিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কবি, একভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্য চরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটী যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া শিখা কর্ত্তব্য, তেমনি মনুষ্য-চরিত্রের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্য-চরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিকটর হুগের গদ্য কাব্যাবলী। যাঁহারা অসদ্ভাব গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্য লেখক। ইঁহাদের চূড়ামণি সার-বন্টিস্ (Cervantes)। ইঁহাদিগের গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য।

"এই সম্প্রদায়ের কেবল দুইজন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত; প্রথম টেকচাঁদ

ঠাকুর; দ্বিতীয় হুতোম-পেঁচা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি।

"বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্য-পটুতায়, —মনুষ্য-চরিত্রের বহুদর্শিতায়—লিপি-চাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপি-কৌশল, যে রচনা-চাতুর্য্য, তাহা 'আলালের ঘরে দুলালে'র নাই—সে বাক্ শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শন-প্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা-প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত 'বেলেল্লা গিরি'তে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সুসেব্য। 'কল্পতরু' বঙ্গ ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

"যাহাকে অসম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এ গ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিভূত অথচ ভীরু, নির্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়-পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লুব্ধ, অপরিণামদর্শী, বাচাল, 'চালাকদাস', দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তুগণ অনতিপূর্ব্বকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ ধরে, তাহারা জাজ্বল্যমান; এবং ধরপত্নী গৃহিণীর চূড়া, গবেশচন্দ্র নায়কের চূড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, অস্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয়—পাঠক স্বয়ং লইবেন!

"এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তি ঘটিত কার্য্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্য্যই আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই, যে আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট নহে।

"মনুষ্যহৃদয়ের যে সকল সৎ প্রবৃত্তি, গ্রন্থকার তাহা গ্রন্থ মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মধুসূদন ভ্রাতৃ-বৎসল, এবং নিতান্ত নিরীহ—তদ্ভিন্ন গ্রন্থোক্ত

নায়ক নায়িকার কাহারও কোন সদ্‌গুণ নাই। মনুষ্যহৃদয়ের সদ্‌গুণের পরিচয়ও লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে।

"গল্পটি অতি সামান্য; সহজে বলিতে ছত্র দুই লাগে। 'আলালের ঘরের দুলাল' ইহা অপেক্ষা বৈচিত্র্য বিশিষ্ট। আর 'আলালের ঘরের দুলাল' উচ্চনীতির আধার—ইহা সেরূপ নহে। 'আলালের ঘরের দুলালে'র উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরুর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ আলালের ঘরের দুলালের লেখক মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনুষ্য-চরিত্র দেখিয়া ঘৃণাযুক্ত। 'কল্পতরু'র অপেক্ষা 'আলালের ঘরের দুলালে'র সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশয়তা আছে।

"যে গ্রন্থের আমরা এত প্রশংসা করিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া লেখকের লিপি-প্রণালীর পরিচয় দিব। যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা করি, অন্যান্যগুণে প্রীত হইয়া পাঠক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ্রির মত, এই অপবাদে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারংবার 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়' বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এইজন্য প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যতদিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একেবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

"তিনমাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজ দেহের কুশল লিখিতেন। একবার, বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই, এবং বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপ জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪.৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাটী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন।

'একে পিসী, তায় বয়সে বড়; সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহী পাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের 'পরমারাধ্য পরম পূজনীয়' পিতামহের চির-বিধবা কন্যা থাকেন, তবেই—আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

"দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের ভাই 'নরেন্দ্র' বাটী আইসে না। রাত্রি যায়—

দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার 'নরেন' ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই, তাহারা না চাইতে আইলে, না চাইতে যায়।

"আমাদের 'নরেনে'র পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায় পিসী কোন্ ছার?

"মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় দিলেন। উত্তর আসিল যে, অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

"তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাক ঝাড়াতে উঠান সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোনা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

"পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছেন, তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিলেন। এখন গবেশ বিদেশে গিয়াছেন। সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

"একদিন রাত্রি প্রভাতে পিসীমা ভারি মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ গুণ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য জলের বাটী গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের উত্তর পাড়ার একটী স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল, যে মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবি কল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল রাতে বাড়ী এসেছিল, সকাল-বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে' যাহাকে দেখে, এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পৌঁছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলে বলিতেছে 'অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহারই মধ্যে কেহ আর একজনের নিকট 'সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি চক্ষু ছলছল, কেহ যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা একভিঙ্গে একভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্ক একটী স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল 'বেটী বসে কাঁদ্‌ছে, যেন আলকাৎরা-মাখান বড় চরকা ঘুরছে।'

"একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটী একটী কথা কহিতে লাগিলেন। 'আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়। ভাই মরেছে, মরেছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হলে, আমার সকল দুঃখ যাবে,—পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ দূর হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের অগম্য।

"পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন, আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল। 'নরেন আমার পিসীমা বৈ বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না! এখন আমি কোথায় যাই?

"নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে একজন বৃদ্ধা বলিল, 'যা হয়েছে, তা ফেরবার নয়,—এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্ব্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল; কাঁদলে কি হবে। শুনলে কবে? এ দারুণ কথা ব'ল্লে কে, কেমন ক'রেই বা বল্লে?'

"পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—'ষাট! ষাট! বুড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই; তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।'

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুইজন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। 'নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রিশেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাট সিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসীমা বলিলেন 'জাত যাক' তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস'—নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল। অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ। ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্ গুণ্ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটান।

"অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল: আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।"

—(বঙ্গদর্শন,—পৌষ, ১২৮১ সাল)

ইহার পরে চৈত্র মাসের বঙ্গদর্শনে "কল্পতরু" সম্বন্ধে একটি রসাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়। এ বিজ্ঞাপনটী বঙ্গদর্শনের মুদ্রাকর ও প্রকাশক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনিই দিয়া থাকুন, ইহার রচনাটি যে ইন্দ্রনাথের সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাই আমরা বিজ্ঞাপনটী এখানে উদ্ধার করিলাম।

কিনিতে হইবে—

কল্পতরু!

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটের ক্যানিং লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। ১৸৹ সমেত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র লিখিতে হয়।

কেন কিনিতে হইবে? কারণ আছে। নহিলে, হয়—বঙ্গদর্শনের মান যায়, নয় বঙ্গবাসীর মান যায়। "বঙ্গদর্শন" ইন্দ্রনাথের "কল্পতরু" সমালোচনায় বলিয়াছেন;—

"যিনি তমোভূত অথচ ভীরু, নির্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়পরবশ, আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লুব্ধ, অপরিণামদর্শী, বাচাল, "চালকদাস" দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বঙ্গজন্তুগণ অনতিপূর্ব্বকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ ধরে তাহারা জাজ্বল্যমান; এবং ধরপত্নী গৃহিণীর চূড়া। গবেশচন্দ্র নায়কের চূড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, অস্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয় পাঠক স্বয়ং লইবেন।"

কৈ আজ তিন মাস হইল, হে বঙ্গদর্শনের পাঠক! কেন আপনি স্বয়ং পরিচয় লইলেন না? যদি ঐ অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে 'বঙ্গদর্শনে'র আর মান থাকে না, আর যদি 'বঙ্গদর্শনে'র কথা গ্রাহ্য করিয়া পয়সার মায়া ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ভয়ানক কৃপণতা দোষ বর্ত্তে, সুতরাং আমাদের বাঙ্গালী জাতির মান থাকে না—তাহাতেই বলিতেছি।

কল্পতরু

কিনিতেই হইবে

আমি গ্রন্থকার বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো বা প্রকাশক বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যো নহি, আমি একজন 'কল্পতরু'র গোঁড়া, বিক্রয়ের গোপন খবর রাখি, হারাণ বাবুকে * কয়টি রৌপ্যমুদ্রা দিতে স্বীকার করায় এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইল।

ভারত-উদ্ধার—'কল্পতরু' লেখার দুই বৎসর পরে "ভারত-উদ্ধার" রচিত হয়। ইন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"কলিকাতা হাইকোর্টে যখন ওকালতী করি, তখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কিছুকাল আমার বাসা ছিল। এই বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিক মজ্‌লিস হইত। এই সঙ্গে ৺অঘোরনাথ কুমার একজন নিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্য-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সমাচার, এবং তদতিরিক্ত রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতাগতির স্থূল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অঘোরনাথ নিত্য নিত্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপঢৌকন দিতেন। তাহাতেই কি জানি কেমন করিয়া, আমার কবিকণ্ডূতির উদ্রেক হইল। ইং ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে "ভারত উদ্ধার" লিখিয়া ফেলিলাম। "ভারত উদ্ধার" রচিতে গোটাতিন বৈকালি নষ্ট হইয়াছিল। বৈকালি বুঝেন? এ অঞ্চলের খাটুনিখাটা লোক তিন প্রহর কাজ করে; বিকালে অবশিষ্ট বেলাতে যদি কাজ জুটিয়া যায়, তাহাকে 'বৈকালি' খাটা, বা 'বৈকালি' দেওয়া বলে। আমার "ভারত উদ্ধার"ও সেই 'বৈকালির' কাজ। যাহা হউক 'ভারত উদ্ধার' বাজারে বাহির হইল; অমনি দেবগণ মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মলয়জ গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ নিবৃত্তি হইয়া দিবারাত্র কেবল কোয়েলী কেলি হইতে লাগিল;—আমার শুভ্র যশোরাশির ভয়ে ধরণী ত্রাহি ত্রাহি

* তাৎকালিক "বঙ্গদর্শনে"র প্রিণ্টার ছিলেন হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। ধরিত্রীকে আমি অভয় দিলাম,—ভয় নাই,—আর বোধ হয়, আমি লেখনী চালাইব না। অঘোর কুমারের আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না ; কেন, তাহা পত্রে লিখিব না। 'সাধারণী'তে সমালোচনার জন্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার দাদাকে একখানি 'ভারত উদ্ধার' দিয়াছিলাম। দাদা তাহা আগাগোড়া তুলিয়া 'সাধারণীর' ক্রোড় আলো করিয়াছিলেন। ভারত উদ্ধার সম্বন্ধে বহু রঙ্গবার্ত্তা আছে।'

এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্য খানি নির্জ্জলা অখণ্ড ব্যঙ্গরসে ভরা। ইহার প্রথম ছত্র হইতে শেষ ছত্র পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন হাসির উৎস। বঙ্গে যখন "রাজনৈতিক আন্দোলন" নামে এক রকম বিলাতী 'প্রেটি য়টিসমে'র আঁটির চারা আমদানি হইল এবং এই বাঙ্গালার মাটীতে তাহার পরিপুষ্টির জন্য কলসে কলসে বীররসের ছড়াছড়ি হইতে আরম্ভ করিল, শেষে যাহাতে মুকুল ধরিল,—আবেদন, নিবেদন আর ভিক্ষা এবং ফল ফলিতে লাগিল,—টক্, আঁসে ভরা, আর পোকা ধরা ;—এই ব্যঙ্গকাব্য খানি সেই আন্দোলনের সূত্রপাতেই লিখিত। বীর-রসে ভিক্ষা বাস্তবিকই ব্যঙ্গ-কবির পক্ষে পরম উপাদেয় উপাদান বস্তু। এ-হেন কাব্য-কুসুমের পাপড়ি ভাঙ্গিয়া, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া, আমরা ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে চাহি না। আমরা এখানে এইটুকু বলিতে চাই যে, ইহা প্রকাশিত হইতে হইতেই দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা লোকের এতই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল যে, প্রকাশ মাত্রেই ইহার কোন কোন পংক্তি বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতা, সর্ব্বজন কর্ত্তৃক প্রবাদের মত ব্যবহৃত হইতে থাকিল। সেই "আজীর্ণ দ্বিতল গৃহে," যেখানে "আর্য্য কার্য্যকরী সভা" বসিত, কলিকাতার সে গৃহ যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কাব্যে সে গৃহের বর্ণনা পড়িয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না—বর্ণনা এমনি 'গ্রাফিক !' তাহার টানাপাখার বর্ণনা—

"বিলম্বিত টানা-পাখা—চীর আবরিত।
পড়িত সে এতদিন, কেবল সন্দেহ,—
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।'

এই "দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে" বাঙ্গালায় প্রবাদ-প্রায় হইয়া গিয়াছে। তারপর, "বঁটাইয়া দিব যত পাষণ্ড ইংরেজে"—রাজনৈতিক বীরগর্ব্বের প্রতি চমৎকার বিদ্রূপ ! বঁটি ভিন্ন অস্ত্রান্তর নাই, কাজেই মাইকেলী ছন্দে 'বঁটানো' ছাড়া আর উপায় কি ?

গভীর নিশায় মন্ত্রণা-সভা বসিল, বীররসে বক্তৃতা আদি হইয়া গেল। অবশেষে—

"ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
যে যার বিবরে গেল গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।"

পরদিন প্রাতে ভারত-উদ্ধার হেতু যুদ্ধ হইবে। প্রধান নায়ক বিপিন যুদ্ধে যাই-

বেন। তাঁহার স্ত্রী নানা কথায় মানা করিলেও যখন বিপিন ক্ষান্ত হইলেন না, তখন সেই প্রাতঃকালে খালিপেটে কি করিয়া স্বামীকে বিদায় দিবেন? তাই বলিলেন—

"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয় বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কাঁদিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলুভাতে ভাত তবে দিই চাপাইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে। বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।"

এই "আলুভাতে ভাত তবে দিই চাপাইয়া" বঙ্গে বিদ্রূপাত্মক প্রবাদ-বাক্য হইয়া গিয়াছে। "উদ্ধারো নাম শেষ সর্গে" কলিকাতা গড়ের মাঠে ইংরেজ ও বাঙ্গালীর যে অপূর্ব্ব যুদ্ধবর্ণনা আছে, তাহা ব্যঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। পাঠকগণ তাহা কাব্যে পড়িয়া উপভোগ করুন। আমরা এখানে 'আমিষ্টিস' ও রফাটুকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"তথাপি উকীল-সৈন্য বটি হস্তে করি,
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়ন পর
আপনি যাইয়া এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক হারিল ইংরেজ।
শান্তির প্রস্তাব সবে করিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া; থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে ভারতের করিবেক সেবা।
—যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত উদ্ধার যবে হৈল হেন মতে
হউক বা না হউক, ভারত উদ্ধার,
চারি আনা পাই, সদ্য এই উপকার।
ভারত উদ্ধার কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥"

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।"

আমরা আর একটী কথা বলিয়া 'ভারত-উদ্ধার'-কথা শেষ করিব। ইহার স্থলে

স্থলে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকিলেও এই ব্যঙ্গকাব্য খানি একেবারেই ব্যক্তিগত নহে, এ কথা পাঠকের মনে রাখা উচিত। যেখানে বিষয় ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেখানে বিষয়ের কথায় ব্যক্তির ইঙ্গিত না আসিয়াই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ব্যক্তিগত বলিলে চলিবে না। এমন পাঠক আছেন, যিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে একটু ব্যক্তিগত স্বাদ পাইলে পরমানন্দে তাহা উপভোগ করেন;—আবার এমন পাঠকও আছেন, যাঁহার কাছে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্তিগত বিদ্রূপও একেবারেই অসহ্য। এই দুই শ্রেণীর পাঠকই কিন্তু এ কাব্যের প্রকৃত রস গ্রহণে বঞ্চিত। তাই এই দুই শ্রেণীর পাঠককে সাবধান করিবার জন্য স্বয়ং কাব্যকারই গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে যে দুইটী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, গ্রন্থ পাঠের পূর্ব্বেই তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। সেই ইঙ্গিত স্মরণ রাখিয়া কবিকে অনুসরণ করিলে, এই চমৎকার ব্যঙ্গ-কাব্যখানির পূর্ণ রস উপভোগ করিতে পারা যায়।

প্রথম,—"One must understand a thing to be able to enjoy it,—

প্রকৃত বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিলে, তবেত' তাহাতে আমোদ পাইবে, শুধু একটু ব্যক্তিগত ব্যঙ্গে দন্তবিকাশ করিলে কি হইবে?

দ্বিতীয়,—"Every man is a caricature of himself when you strip him,—

তবে একটুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যঙ্গে চটো কেন? আবরণ উন্মোচন করিলে সব মানুষকে বিকৃত দেখায়। পাঠক এই দুইটী ইঙ্গিত মনে রাখিয়া এই চমৎকার ব্যঙ্গ কাব্যখানি পড়ুন;—দেখিবেন, ইহার ছত্রে ছত্রে রস উচ্ছলিত হইতেছে।

এই কাব্যখানি যে কেবলমাত্র বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যরসোদ্দীপক নহে, গ্রন্থকার তাহার সুন্দর ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহাকে (ভবিষ্য ইতিহাসের একপৃষ্ঠা)—এই ব্যঞ্জনা দ্বারা এই "ভবিষ্য ইতিহাস" নিশ্চয়ই গ্রন্থকারে মনশ্চক্ষুতে জাজ্বল্যমান প্রতিভাত হইয়াছিল, নতুবা তাঁহার এই কাব্যখানিকে সেই ভবিষ্য ইতিহাসের "একপৃষ্ঠা" বলিলেন্ কোন সাহসে? ভারতের এই "ভবিষ্য ইতিহাস" এখনও না লিখিত হইলেও এই কাব্যখানি যে তাহার "একপৃষ্ঠা," এ তত্ত্বটুকু—"বুঝা লোক যে জান-সন্ধান।" একটী পরম তত্ত্ব-কথা এই কাব্যখানিতে আছে, যাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত;—"সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই"! অধঃপতিত ভারতের ইহাই চরম দুর্ভাগ্য।

ক্ষুদিরাম—এখানি ইন্দ্রনাথের প্রবীণ বয়সের রচনা। তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে এসম্বন্ধে আছে—"বঙ্গবাসী"র উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই। ক্রমে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমার গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হইল না। মহা সঙ্কটে পড়িয়া বর্দ্ধমানে একদিন এক পরিচ্ছেদ 'ক্ষুদিরাম' লিখিয়া ফেলি-

লাম; কিন্তু আর লেখা কোন মতেই ঘটিল না। অগত্যা 'অজ্ঞাতবাসে'র ব্যবস্থা করিলাম, বৰ্দ্ধমান হইতে পলাইয়া, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার বাটী শিবনিবাসে গিয়া ৭।৮ দিন থাকিলাম, আর সেই কয় দিনে যতদূর পারিলাম, 'ক্ষুদিরাম' লিখিলাম। তাহাই ছাপা হইল, 'বঙ্গবাসী'র মান বাঁচিল, আমি বাঁচিলাম এবং পড়িতে হয় নাই বলিয়া বোধকরি 'ক্ষুদিরাম' অনেককেই বাঁচাইয়াছে।"

এই ক্ষুদ্র 'ক্ষুদিরাম'কে গ্রন্থকার 'গালগল্প' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অর্থাৎ গ্রন্থকার গল্প করিয়া যাইতেছেন, আর 'কমলিনী'নাম্নী সুশিক্ষিতা, স্বাধীনা সৌখীনা সুরুচি-মাৰ্জ্জিতা, কুসংস্কার-বর্জ্জিতা উচ্চ-হৃদয়-গর্ব্বিতা বিদুষী এক নারী কল্পিতা প্রণয়িনীরূপে তাহা শুনিতেছেন এবং কখন কখন মধুর হাস্যের সহিত সমালোচনাচ্ছলে বাধাও দিতেছেন। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার যে, একটী 'পূর্ব্বাভাস' দিয়াছেন, তাহাতেই ভাবুক পাঠক আভাস পাইবেন যে গ্রন্থকার এ গ্রন্থে গল্পচ্ছলে ও বিদ্রূপচ্ছলে হাসিতে হাসিতে গুরুতর বিষয়েরই অবতারণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সে পূর্ব্বাভাসটি এই;—

"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, শ্মশানক্ষেত্রের উপর দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্য সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব! কে এমন সময়ে শবসাধনে নিযুক্ত হইবে?"

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুকরণে এদেশে যে ধর্ম্ম-বিপৰ্য্যয়,—কৰ্ম্ম-বিপৰ্য্যয়,—সমাজ-বিপৰ্য্যয়,—মানব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ-বিপৰ্য্যয় ইত্যাদি বিবিধ বিপৰ্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এ দুর্দ্দিনে এ সব ঘোর সমস্যার সমাধান কবে হইবে, কে করিবে, তাহার ঠিকানা নাই। তবে এ বিপৰ্য্যয়গুলি যে কি গভীর কি ব্যাপক, ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাই বা করিতেছে কে? সকলেই স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতেছে। দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় একটী সামাজিক বিপৰ্য্যয়ের একটু খণ্ডিত অংশ বিদ্রূপাত্মক গল্পচ্ছলে এই গ্রন্থখানিতে বিবৃত হইয়াছে। তাই, গালগল্পটী ("ভগ্নাংশ")।

এই যে এদেশে ধৰ্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষার অবাধ প্রচলন হইয়াছে, ইহাতে সমাজ উলট্-পালট্ হইয়া একটা বিচিকিৎস্য ব্যাপারে দাঁড়াইতেছে, তাহারই ক্ষুদ্র এক অংশ এই 'ক্ষুদিরামে' প্রদর্শিত। জেলের ছেলে ক্ষুদিরাম ইংরাজী পড়িয়া 'ক্ষুদিরাম বাবু' হইয়া উঠিল! সে আর পল্লীগ্রামে বাড়ীতে আসিতে চায় না, কারণ দেশে তাহার স্বজাতির মধ্যে আসিতে তাহার লজ্জা হয়। যাহাদের পেটে ইংরাজীর অন্ততঃ এ, বি, সি, ডি,ও নাই, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে ক্ষুদিরাম অপমান বোধ করে। তাহার জননী,—পদ্ম জেলেনী—সে নিজের প্রায় সমস্ত অলঙ্কারগুলি বেচিয়া ক্ষুদিরামকে কলিকাতায় ইংরাজী পড়াইয়াছে,—সেই জননী এখনও মাছ বেচে বলিয়া—

ক্ষুদিরাম বাবু বাড়ী আসিতে চাহেন না। যদি কখনও বা আসেন, তবে গ্রামের পোষ্ট বাবুর কাছেই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহেন, কেননা পোষ্ট বাবুর পেটে যা হোক যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজীর আমেজ আছে। মায়ের সাধ ক্ষুদিরামের বিবাহ দিবেন, সেই জন্য ক্ষুদিরামের মা প্রাণ ধরিয়া একখানি ছোট অলঙ্কার বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—বধুকে দিবেন বলিয়া। কিন্তু মায়ের সাধ হইলে কি হয়! এত আর ইংরাজী কপ্‌চানী, নভেল্ পড়ুনি, চেয়ারে বসুনি, সুশিক্ষিতা মা নয়। এ যে মাছ বেচুনী সত্য সত্য মৎস্যগন্ধা! তাহার আবার মনের সাধ কি? ক্ষুদিরাম কি এত ইংরাজী পড়িয়া সেই চেলীর পুঁটুলী জেলের মেয়েকে বিবাহ করিতে পারেন?—কখনই না!

ক্ষুদিরাম কলিকাতার ভুসীভোজন বাবুর সহিত একবাসায় থাকিয়া বিধবা বিবাহ, স্বাধীনমত, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি বড় বড় সমস্যার সমাধান এবং ভুসীভোজন বাবুর কাছে "ঈশ্বরের অভিপ্রায়", "বিবেক," "নীতি" ও "যুক্তি" বিষয়ে অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করিতে থাকিলেন। এই সব জ্ঞানের ফলে ক্ষুদিরাম সহস্র বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া বিধবা শ্রীমতী নিরমণীর সহিত পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জগতে সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে ইংরাজী শিক্ষিত প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাগণ, আপনারা ক্ষুদিরাম বাবুকে ধন্য ধন্য করুন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু "দোহাই আপনাদের ইংরাজী শিক্ষার,— একবার ক্ষুদিরামের জননীর কথা ভাবিয়া দেখুন দেখি. আপনাদেরও চক্ষে জল আসে কিনা? যাহা হউক, এই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে গ্রামে গ্রামে একটী দুইটী নয়—পালে পালে ক্ষুদিরামের সৃষ্টি হইতেছে। বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি যে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য-শ্রী বাড়িতেছে, না, দেশময় অসন্তোষ, অবসাদ, অনাহার, ও হাহাকার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে? ইংরাজী শিখিয়া তোমরা হিন্দুর জাতিভেদ নষ্ট করিতে চাও, কিন্তু তোমরা যে অশিক্ষিতকে ঘৃণা করিয়া থাক, অশিক্ষিতকে অপাংক্তেয় করিতে পারিলে ছাড়িতেছ না! হিন্দুর জাতিভেদে কথায় কথায় তোমরা 'ঘৃণার' কথা তুলিয়া থাক, কিন্তু তোমরা ইংরাজী শিখিয়া অশিক্ষিতকে ঘৃণা কর কেন? নিমন্ত্রণ রক্ষায় মোটা মাহিয়ানার হাকিমগণ গরীব আমলাদের সহিত বসিতে অনিচ্ছুক কেন? হিন্দু নিম্নজাতিকে ঘৃণা করে না; বরং এই ইংরাজী আমলে ইংরাজী না-জানা লোককে তোমরাই ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছ; অর্থের দাস তোমরা, অর্থকেই পরমার্থ ভাবিয়া দরিদ্রকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছ। তোমরা নিজেকে 'পেট্রিয়ট' বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তোমরাইতো ইংরাজী শিখিয়া জনক-জননীকে ভুলিতে পারিয়াছ, আত্মীয়-কুটুম্বকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছ, নিজেদের ধর্ম্ম, নিজেদের কর্ম্ম ত্যাগ করিতে কুণ্ঠা বোধ কর না; মাতৃভাষা তোমাদের 'গোমাংস' স্বরূপ, বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিয়া 'সাহেব' না সাজিলে সম্ভ্রম প্রাপ্তিতে তোমাদের পরিতৃপ্তি হয় না,—অথচ তোমরাই

'পেট্রিয়টির দোহাই দাও! বলিহারি তোমাদের আত্মপ্রবঞ্চনায়। ইংরেজী শিখিয়া ক্ষুদিরামও মাতৃত্যাগী, গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী, সমাজত্যাগী, ধর্ম্মত্যাগী। ইহাই এখন "উন্নতি" বলিয়া চলিতেছে।

এই ক্ষুদিরামের পাশাপাশি এক বামুন ঠাকুরের চিত্র এই গল্পে দেখান হইয়াছে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের বামুন—ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম বটে, কিন্তু বহু পুরুষ ধরিয়া শিক্ষা-দীক্ষা-বর্জ্জিত। তবু তাহার ভিতরে যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারটুকু এখনও বিদ্যমান, তাহার তুলনায় ক্ষুদিরাম ও ভুষী ভোজনকে বরং বর্ব্বরই বলিতে হয়। বামুন ঠাকুর 'ঈশ্বরের অভিপ্রায়' সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখে না, "'বিবেকের অস্তিত্ববোধ' থাকা দূরে থাকুক, বিবেকের নাম পর্য্যন্ত তাহার সাতপুরুষের মধ্যে কেহ অবগত ছিল না; আর 'নীতি' ও 'যুক্তি' কি পদার্থ, বামুন ঠাকুরের তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; অথচ বামুন ঠাকুর গৃহস্থ নিজে অবিবাহিত থাকিয়া ভাইকে বিবাহ দিয়া সংসার বজায় রাখিয়াছে, গৃহ-বিগ্রহের নিত্য সেবা আছে। বামুন ঠাকুর শৌচাচারসম্পন্ন ও উন্নতমনা। বামুন ঠাকুর বাড়ীর কৃষাণকেও পরিবার মধ্যে গণ্য করে শুনিয়া কমলিনী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কমলিনীর হাস্য দেখিয়া গল্পকার বলিতেছেন,—"কৃষাণকেও পরিবার মধ্যে ধরিয়াছি, তাই বলিয়া হাসিয়া পাগল হইলে যে কমলিনি? সে কি তোমার আমার মত সভ্য লোকের পরিবার? তা নয়। তোমার আমার পরিবার একমেবা-দ্বিতীয়ং—বদ্-বদল, বাহার-বরতরফ থাকিলেও গুণিতিতে একটিমাত্র, তাহা আমি জানি! দাস-দাসী, মা-মাসী থাকিলেও থাকিতে পারে;—পাটক, পরুক, তাহাও দেওয়া যাইতে পারে; তথাপি তাহারা পরিবারভুক্ত নহে, তাহা জানি। যিনি সর্ব্বস্ব, যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব, যিনি ইহকাল-পরকাল, সকাল-বিকাল—সর্ব্বকালের মহাকাল, তিনিই একমাত্র পরিবার, তাহা জানি। যাহার জন্য আমি জুতার গোলাম, যিনি কাছে থাকিলে আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহার কৃপাবলে সেকরা আমায় মুখ খাবড়া দেয়, যাঁহার জন্য বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ও মূল্য চায়, যাহাকে বিধবা-বিবাহের গোড়া বলিয়া আমি প্রাণপণে জীবন ধারণ করি, তিনিই যে আমার পরিবার, আর কেহ পরিবার নয়, পরিবার হইতেও পারে না,—তাহা আমি জানি। যোড়ে যেমন পাখোয়াজ, ডিগে যেমন তবলা বাঁয়া—তোমায় আমায় যে পরিবার তা এম্নি জিনিস। কিন্তু আমরা যে সভ্য, বামুনঠাকুররা যে অসভ্য।":

বামুনঠাকুরের দেহ বলিষ্ঠ এবং "পাড়াপ্রতিবাসীর যখন যেখানে যেমন কাজ পড়ুক না কেন, বামুনঠাকুরের বিশাল স্কন্ধ, বজ্রবাহু, এবং পবনগতি পদদ্বয় সেইখানে উপস্থিত। কাহারও পীড়া হইলে কেবল পাচন সংগ্রহ করিয়া বামুনঠাকুরের পরিতোষ হয় না, স্বহস্তে পথ্য পাক না করিয়া দিয়া ছাড়েন না। কোথাও ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, বাজার করা অবধি পাত ফেলা পর্য্যন্ত বামুনঠাকুরের বিরাম নাই। কাহারও লোকবল

নাই, বাটীতে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক আছেন, বামুনঠাকুর স্বয়ং তাহারই দরজায়—কি জানি যদি রাত্রিকালেই ধাত্রী ডাকিতে হয়। মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে হইবে, বামুনঠাকুর সেখানে অগ্রণী। এই সকল বিষয়ে বামুনঠাকুরের দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই, ঝড় বৃষ্টি বোধ নাই, দিবারাত্রি ভেদ নাই। ইহাতেই বামুনঠাকুর সদানন্দ।"

পাড়ায় এক প্রতিবেশীর গৃহ শূন্য হইল,—(থুড়ি! এরূপ অসভ্যদের স্ত্রী মরিলে, কমলিনীর মতে 'গৃহ-শূন্য' বলা শোভন হয় না।)—আচ্ছা, তাহার কাচ্ছাবাচ্ছার মা-ই মরিয়াছিল। ছোট ছেলেটীর বয়স তখন তিন বৎসর। বামুনঠাকুর ছেলেটীকে নিজে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিয়া গিলেন, ক্রমে এই ছেলেটীর বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জনের আশায়—বামুনঠাকুরের কলিকাতায় আগমন এবং ক্ষুদিরাম ও ভুষীভোজন বাবুর বাসায় চাকরী স্বীকার।

এই হইল বামুনঠাকুর। এখন পাঠক-পাঠিকাগণ একবার "ক্ষুদিরাম" ও "বামুন ঠাকুর" এই দুইখানি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া দেখুন দেখি; আর সত্য করিয়া বলুন দেখি, সমাজকে সুখের ও শান্তির সমাজ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, সেই সমাজে ক্ষুদিরামের দল ভাল, না বামুনঠাকুরের দল ভাল? তবু এই "বামুন-ঠাকুর" গলিত-পলিত হিন্দু সমাজের—একটা অবজ্ঞাত, তমসাবৃত অঞ্চলমাত্র। প্রকৃত উন্নতি চাও, তবে এই সকল—শুধু বামুনঠাকুরের দল নহে, হিন্দুর সকল শ্রেণীর লোককেই গুণকর্ম্মানুসারে শিক্ষিত কর, নতুবা ইংরেজী শিক্ষার অহঙ্কারে মত্ত ক্ষুদিরামের দল পুষ্টি করিলে, সমাজে কেবল অশান্তিই বৃদ্ধি হইবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে এই জীবনমরণের সমস্যাই রসাল বিদ্রূপের ভঙ্গীতে দেখান হইয়াছে। মহা চিন্তার কথায় পরিপূর্ণ। হাস্যের আবরণ ভেদ করিয়া যিনি ইহার গভীর মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত করিতে পারিবেন, তিনিই ইহা পড়িবার প্রকৃত অধিকারী। তখন তাঁহার মনে সামাজিক ইতি-কর্ত্তব্যতা বিষয়ে না-া গভীর চিন্তার উদ্রেক হইবেই হইবে। এই জন্যই গ্রন্থকারের ইচ্ছা, গ্রন্থখানি অরসিকের হাতে না পড়ে।

"ইতর-তাপ-শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরাননম্।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ॥"

গ্রন্থে আর একটী চিত্র আছে—সেটী মেসের ঝি। এই ইংরেজী আমলের নাগরিক সভ্যতার অবান্তর অথচ অবশ্যম্ভাবী ফল By-product বলিলেও চলে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহাদের "উদ্ধার" করিলেই ত হয়। হয়, তা জানি, কিন্তু তা হইলে ভুষীভোজনের দলের গতি কি হইবে?

লোকেরা মধুরেণ সমাপয়েৎ করে, কিন্তু এস্থলে আমাদের সে সুযোগ হইল না এখানে একটু ছারপোকার কথা না বলিয়া আমরা এ গ্রন্থখানিকে বিদায় করিতে পারিতেছি না। গৃহস্থের গৃহে ছারপোকা সত্যসত্যই অমরত্ব লাভ করিলেও বঙ্গ সাহিত্যে উহাকে অমর করিয়া দিয়াছেন ইন্দ্রনাথ। ছারপোকার এই অভিনব অমরত্বের পরিচয়টুকু পাঠকপাঠিকাদিগের গোচর না করিয়া "ক্ষুদিরাম" বন্ধ করি কেমন করিয়া ?

"তিনখানি তক্তপোষই প্রায় একজাতীয় আচ্ছাদনে সজ্জিত ;—এক এক উলঙ্গ তোষক, একটি একটী উলঙ্গ বালিশ, আর, সেই তোষক আর বালিশের লজ্জা নিবারণের জন্ত আপাদ-মস্তক একখানি একখানি বিছানার চাদর। তোষক বালিশের লজ্জা নিবারণ,—তামাসা নহে। চাদর ঢাকা না থাকিলে, সেই আমসত্বের মত চেহারা দেখাইতে তোষক-বালিশের যদি লজ্জা বোধ নাই হয়, যাহার তোষক বালিশ তিনি যে, অবশ্যই লজ্জিত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু লজ্জা-রক্ষাও নহে, চাদরের কল্যাণে দেহ-রক্ষা বিষয়েও প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। তোষকের অঙ্গ যেখানে কুঞ্চিত, বালিশের যেখানে কোণ, তক্তপোষের যেখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক, সেইখানেই সপরিবারে সবলবাহনে ছারপোকার শিবির সংস্থাপিত। ক্লান্ত মানব সেই অনন্ত-শয্যায় আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া একটু অসাবধান হইলেই, একে একে ঝাঁকে ঝাঁকে নররুধির-লোলুপ ছারপোকাগণ তাহাকে আক্রমণ করে। চাদরের ভয়ে তাহারা আক্রমণ করে না, এমন নয়, কিন্তু গুপ্ত আক্রমণে বাধা পায় ; মায়াবী নিশাচরের ন্যায় মেঘের অন্তরালে থাকিয়া শত্রুকে উত্যক্ত করার যে সুবিধা তাহা আর পায় না। চাদর থাকাতে প্রায়ই সম্মুখ সমর,—সুতরাং ছারপোকা পক্ষের বহুতর 'বীরচূড়ামণি' রণক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য। সেই চাদর-ক্ষেত্রকে রণক্ষেত্র বলা অত্যুক্তি নহে। সহস্র তুমুল সংগ্রামের সহস্র চিহ্ন তাহার রক্তাক্ত কলেবরে দেদীপ্যমান।

'নর-মৎকুণের ভীষণ রণ বর্ণনে আমার প্রায় সাধ হইতেছে। কিন্তু তাহা ত পারিব না। কেহই যাহা করিতে সাহস পায় নাই, আমি সামান্ত ব্যক্তি, কেমন করিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব ? নিরাপদ কন্দর হইতে ছারপোকার সেই উদ্যমপূর্ণ নিষ্ক্রমণ, সেই নিঃশব্দ পদসঞ্চার, মানব-গ্রীবার উপর সেই অভ্রভেদী অবার্থ সন্ধান, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইতে না-হইতে বিদ্যুৎগতিতে সেই অন্তর্ধান,—এ সব বর্ণন করা কি আমার সাধ্য ? বাস্তবিক, ছারপোকার যোড়া নাই, ছারপোকার তুলনা নাই, ছারপোকার উপমা পাওয়া যায় না। বাঘ ভয়ানক জন্ত বটে, কিন্তু দূরে—গভীর বনে বাস করে ; কদাচ লোকালয়ে উপস্থিত হইলে, সন্ত্রস্ত জনগণ সাধারণ শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত পরস্পর সাহায্য করে ; সকলের কাজ সকলে মিলিয়া সারিয়া লয়। কিন্তু ছার-পোকা ?—সর্ব্বনাশ ! স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিছানাতেই ছারপোকার বাস—শত্রুকে শিয়রে করিয়া শয়ন ; যখন তুমি নিশ্চিন্ত, তখনই তাহার দৌরাত্ম্য ; সভা-সমিতি, কিম্বা সিপাই-শান্ত্রী হইতে সিকি পয়সার সাহায্যের প্রত্যাশা নাই, উপায় নাই। একি কম কথা ? কিন্তু কম হউক আর বেশী হউক, আমি নাচার। স্পষ্ট কবুল-জবাব দিতেছি, ছারপোকার সংগ্রাম, ছারপোকার কার্য্যকলাপ বর্ণন করিতে এখনও আমি সক্ষম হই নাই। বড় বড় ছারপোকা, মানুষের চামড়া গায়ে দিয়া সমাজ-শয্যায় উপদ্রব করিতেছে, আমিও তাহাদের উপর অনেক দিন হইতে হাত

মকুব করিতেছি, কিন্তু এখনও ছারপোকা ধরিতে সাহস হয় নাই। যাহাদের সাথে যুদ্ধে হারিলে ঘাড়ের রক্ত যায়,—যাহাদিগকে যুদ্ধে হারাইলে লাভের মধ্যে হাতে গন্ধ হয় সে ছারপোকা ত সহজ জন্তু নহে। কাজেই কবুল করিতে হয় যে, আমি নাচার। তিনখানা তক্তাপোষের কথা বলিতেছিলাম। ছারপোকার জ্বালায় কমলিনী সারা হইলেন, আমি সারা হইলাম, অথচ সেই তক্তাপোষের কথা সারা হইল না। ছার-কথায় ঐ ত দোষ।"

পাঁচু-ঠাকুর—"ভারত-উদ্ধার" লেখার পরে ইন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে বাসা উঠাইয়া ভবানীপুরে আসিলে, ৺কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ-প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবক ইন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে একখানি ব্যঙ্গাত্মক মাসিক-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ লিখিতে সম্মত হইলে, "পঞ্চানন্দ" নামে মাসিকপত্রিকা বাহির হইতে লাগিল। শুধু ব্যঙ্গাত্মক লেখায় মাসে মাসে একখানি পত্রিকা পূরণ করিয়া প্রকাশ করা বড় সোজা কথা নহে। তাহাতে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুবন্ধ, প্রেরিতপত্র, সমালোচন, কবিতা ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্য থাকা চাই, অথচ সবই বিদ্রূপাত্মক। এদিকে লেখক এক ইন্দ্রনাথ বলিলেই হয়। ইন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী বলিয়াই পত্রিকাখানি কখনও নিয়মিত কখনও বা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া দুই বৎসরের অধিককাল চলিয়াছিল। হাইকোর্ট ছাড়িয়া ইন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে গেলেও সেখান হইতে কিছুকাল পঞ্চানন্দ চালাইয়াছিলেন। ক্রমে ওকালতীর পসারে লিখিবার সময়াভাবে উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে ৺ যোগেন্দ্র চন্দ্রের অনুরোধে ইন্দ্রনাথ "বঙ্গবাসী"তে লিখিতে আরম্ভ করেন। "বঙ্গবাসী"র প্রথম পঞ্চানন্দ "সুরেন্দ্রায়ণ"। তার পর প্রায়ই "বঙ্গবাসী"তে ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ বাহির হইত। রসজ্ঞ লোকের কাছে তাহা বড়ই উপাদেয় ছিল এবং সেকালে ঐ পঞ্চানন্দটুকুর জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া "বঙ্গবাসী"র প্রতীক্ষা করিত। ইন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া "বঙ্গবাসী"তে পঞ্চানন্দ লিখিয়াছেন। পরে যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ এবং গুরুতর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য পঞ্চানন্দ লিখিতে পারিতেন না, তখন নানাজনে পঞ্চানন্দ লিখিতেন। ইন্দ্রনাথ আর পঞ্চানন্দ লিখিতেন না।

"বঙ্গবাসী"র সহিত ইন্দ্রনাথের সংস্রব হওয়ার কিছুদিন পরেই যোগেন্দ্রচন্দ্র পুরাতন মাসিক পঞ্চানন্দ হইতে প্রবন্ধাদি সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, ইন্দ্রনাথ অনুমতি দেন। ইন্দ্রনাথ ঐ সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম রাখিলেন "পাঁচু ঠাকুর।" প্রথম ভাগ প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হইলে, পুরাতন পঞ্চানন্দের বাকী অংশ পাঁচুঠাকুর দ্বিতীয় ভাগ নামে প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যে "বঙ্গবাসী"তে যে সকল পঞ্চানন্দ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি সঙ্কলিত করিয়া পাঁচুঠাকুর তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। তাহার পরে, ইন্দ্রনাথের লিখিত যে সকল পঞ্চানন্দ এতকাল

"বঙ্গবাসী"র গর্ভেই আবদ্ধ ছিল, এই সংস্করণে সেই সকল পুনর্মুদ্রিত হইয়া পাঁচকাণ্ডে পাঁচুঠাকুর সম্পূর্ণ হইল।

এই পঞ্চানন্দ ওরফে 'পাঁচু ঠাকুর' ইন্দ্রনাথের এক প্রকার আজীবন-ব্যাপী বঙ্গ-সাহিত্য-প্রচেষ্টা। ধারাবাহিকরূপে কোন-কিছু লেখা তাঁহার ধাতুতে ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার মত পসারী উকীলের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও ছিল না। ক্রমে বৈষয়িক ব্যাপারেও তাঁহার অবসরাভাব ঘটাইয়াছিল। এরূপ স্থলে "পঞ্চানন্দ"-আকারেই তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টা অভিব্যক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে ধারাবাহিকতা রক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া, তাহার গূঢ় রহস্য সুতীব্র বিদ্রূপের আকারে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা—ইহাই "পঞ্চানন্দ" এবং যৌবনারম্ভ হইতে জীবনের প্রায় শেষাবধি প্রধানতঃ ইহাই তাঁহার ব্যঙ্গ-রচনার নামান্তর ছিল। ঘটনাক্রমে সে সময়ে বিদ্রূপের বিষয়েরও অপ্রতুলতা ছিল না। বরং সুপ্রতুলতাই ছিল বলিতে হইবে। এখনও যে নাই, তাহা নহে—এখনও আছে, তবে এখন নাই কেবল ইন্দ্রনাথ।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীর ছেলে দিবানিশি ইংরেজী ঝাড়িতে লাগিল। যদি বিলাতে গেল, তবে একেবারে 'সাহেব' সাজিয়া আসিল!—বাঙ্গালা লেখা দূরে থাকুক, মুখে বলিতেও চায় না; হিন্দি বলিবে, তবু বাঙ্গালা বলিবে না; বাঙ্গালা বুঝিতে চায় না, "বাবু" সম্বোধনে মারিতে আসে; উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে, হাঁচিতে-কাসিতে, এমন কি, মল-মূত্র ত্যাগেও উৎকট সাহেবিয়ানা! ক্রমে দেখা-দেখি বিলাতে না গিয়াও বাঙ্গালীর ছেলে এসব অনুকরণ করিতে থাকিল। যদি একটু মোটা মাহিয়ানার চাকরী হইল, তবে অমনি 'সাহেব' সাজিয়া বসিল। ভিতরে সাহেবের গুণ যদি একটু মাত্রায়ও থাকিত, তাহা হইলেও না হয়, একটা প্রবোধ দেওয়া চলিত। কিন্তু তাহা কৈ? এযে একেবারে কেমিক্যাল-সাহেবের দল! সাহেবী গুণ একরতিও নাই—শুধুই উপরে চ্যাকন্-চোকন্—হ্যাট্-কোট্-নেকটাই. আর মুখে সিগারেট্‌ই সার! এই সব অসার, অপদার্থ কেমিক্যাল্ সাহেবের দল দিন-দিন দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। ইহারা বুঝে না যে, অন্ধ অনুকরণে মানুষ হয় না, শুধু হনুকরণই হইয়া থাকে। এসব দেখিয়া কি ব্যঙ্গ-কবি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি গান ধরিলেন;—

"দে গো তোরা দে, আমায় দে,
বিলাত পাঠায়ে।
কালো কোটে অঙ্গ ঢাকি,
কালো বরণ লুকিয়ে রাখি,
এই—কালা মুখে সাবান মাখি,
কালো জনমটা ঘুচিয়ে।

নে গো ঢিলে ধুতি খুলে,
নেটিব আর রবনা মূলে,
আমি—ভার্ণাকুলার যাব ভুলে,
চেয়ারে পা ঝুলিয়ে।
মিসেস্ পাঁচী গাউন পরা,
ধরাকে দেখিবে সরা,
ওসে—হলো হলো উক্তি পরা,
নেবে ত বিবি হয়ে॥

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনুকরণে শিক্ষিত বাঙ্গালী হঠাৎ ধর্ম্মধ্বজী হইয়া উঠিল। হিন্দুর প্রতিমাপূজা হইল "পুতুল পূজা," 'কুসংস্কার' ও 'বর্ব্বরতা'র চিহ্ন। উনবিংশ শতাব্দীর পুচ্ছভাগে কি আর এরূপ ঘোর অসভ্যতা চলে? তাই,—

"ধরেছি ধর্ম্ম-ধ্বজা—
মানিনে পরব-পূজা,
সার ক'রে চক্ষু বোঁজা,
একটী লাকে ব্রহ্মজ্ঞান।"

কোথায় সেই জীবনব্যাপী ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা-সাধনায় সমাধি লাভ, আর কোথায় রাস্তার ধারে, মোড়ের মাথায়, স্ত্রীপুরুষে জটলা করিয়া বক্তৃতার চোটে "ব্রহ্মোপাসনা"। ব্যঙ্গ-কবির পক্ষে একি কম প্রলোভনের বস্তু? এমন যে কতকটা নিরীহ গোছের হাসির গানের কবি ডি, এল্, রায়, তিনিও এ প্রলোভন এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

"নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে দেখলাম অতি স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন আর নাইক কোনই কষ্ট।
কাচিৎ ভগিনী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,
এমন সময় হয়ে গেল বিয়ে হিন্দু কর্ম্মে।"

যাহা হউক, এই বিষম ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে পাদরীর ধুয়া ধরিয়া ঘরের ছেলে পর হইয়া দাঁড়াইল, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ব্যঙ্গ-কবির চক্ষে এ অনুপম দৃশ্য যথার্থই কাব্যের বস্তু!

কাণ টানিলে মাথা আসে। হনূকরণ-বৃত্তি যখন পাইয়া বসে, তখন একটা বিষয় লইয়াই ক্ষান্ত হয়না। বাবুরা "সাহেব" সাজিলে, মেয়েরা "বিবি" না সাজিলে "মাণিক-জোড়" হয় কি করিয়া? বিলাতী ধরণে "স্ত্রী-শিক্ষা" আরম্ভ হইল। আনুসঙ্গিক হারমোনিয়ম্ ও গান-বাজনাও চলিতে লাগিল। যেরূপ গতিক, তাহাতে নাচের আর বড় বিলম্ব নাই। তখন, বাবু গান ধরিবেন,—

"ফের, নাচে গানে, তানে মানে,
ঘরে পাই এলাহি জ্ঞান।"

প্রাণপণে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ইংরেজী শিখিয়া এখন বাঙ্গালীর ছেলে "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে, তবু নেশার এমনই গুণ যে, সেই ইংরেজীর একটু কপ্‌চানি মেয়েদের না শিখাইলেই নয়! রমণীর মুখে একটু-আধটু ইংরেজী-বুলি বাবুদের কাণে এমনই অমৃত বর্ষণ করে।

তার পর, এমন শিক্ষিতা নারী কি কুসংস্কারাবিষ্টা শাশুড়ীর সাহচর্য্যে,—প্রাচীর-বেষ্টিত অবরোধে কাল যাপন করিবার জন্য? কখনই না। তবে, ভাঙ্গ অবরোধ, দাও "স্ত্রী-স্বাধীনতা"।

"জেনানা কারাগারে, রমণী কি থাকৃতে পারে?
তাই, কুলে থেকে বাহির ক'রে, স্বাধীনতা করি দান
আমি আপনি গেলাম, গেলাম গেলাম,
ভাবিনে তায় অপমান।"

হনুকরণের উন্নতি, উল্লম্ফনের উন্নতি, রাতারাতি উন্নতি, এ সব উন্নতি ভুঁইকোড়ের উন্নতির মত কখনই কাজের হয় না, এই জন্য বাঞ্ছনীয়ও নয়। সে সময়ে যে কয়টী "পঞ্চকন্যা" স্মরণীয়া হইয়া উঠিলেন, তাহাতেই লোকের আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল। বিলাতে যাহাদের দেখিয়া বাবুরা এইরূপে কেহ কুল ভাঙ্গিলেন, কেহ বা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন ও এখনও হইতেছেন, তাহারা কিন্তু নিজেদের দেশে "New Woman"এর জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তবু নেশার এমনি মোহ যে, এদেশে বাবুরা সেইরূপ "নব্যা রমণী" প্রস্তুত করিবার জন্য বিষম ব্যস্ত! বিলাস-বাবুগিরি ও গান-বাজনার সঙ্গে নব্যারা নাটক-নবেলে যেরূপ প্রেমের পালার চর্চ্চা করিতেছেন তাহাতে গরীব বাঙ্গালীকে ক্রমে উদ্বাস্ত হইতে হইবে;—বিবাহ করাই বুঝি উঠাইতে হয়। তখন বাবুদের সাধের "সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী"র পতাকা পত-পত-শব্দে উড্ডীন হইবে। শিক্ষা-দীক্ষার খর স্রোতে, অনুকরণ-প্রভাবের অনুকূল পবনে, আর বাবুদের কর্ণধারত্বে উন্নতির নৌকা চলিয়াছে। কাহার সাধ্য উহার গতি ফিরায়? কিন্তু তবু যে হিন্দুর মন বুঝে না; তাই বারণ করে, বিদ্রূপ করে। ইন্দ্রনাথ হিন্দুত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাই, তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যময় ছিল না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু মরিবার নহে; বিলাতী মদের নেশা কাটিয়া যাইবে, মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই তিনি নেশা কাটাইবার জন্য, নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সে চেষ্টা নিষ্ফলও হয় নাই। তাঁহার কশাঘাতের চোটে অনেককেই চক্ষু মেলিতে হইয়াছে। আবার পাশমোড়া দিলেও সে অজগরের নিদ্রা আর নাই। এখন অনেকেই সজাগ, অনেকেই ঘর সামলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখনও যাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন, তাঁহারা শিবের অসাধ্য।

তারপর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, যাহা "রাজনৈতিক" নামে চলিতেছে, 'ভারত-উদ্ধারে'র পরিচয়ে আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি। এখানে আর সে-সব কথার পুনরুক্তির আবশ্যক নাই। যাঁহারা স্বদেশের কিছুই ভাল বাসেন না, তাঁহারাই সাজিলেন "স্বদেশপ্রেমিক"। বাস্তবিক বিলাতী "পেট্রিয়টিজম" স্বাদেশিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাতে এক ফোঁটা প্রেম না থাকিলেও চলে। বাবুদের পুঁজি কিন্তু তাহাই, এবং তাহাও ধার করিয়া! তাঁহারা ঐ মাল এদেশে চালাইতে লাগিলেন, "স্বদেশপ্রেম" বলিয়া। কিন্তু জহুরীর কাছে এ বুজরুকী কয়দিন চলে? আরম্ভেই ইন্দ্রনাথ সে কালের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাহারই ফল "ভারত-উদ্ধার" এবং 'পঞ্চানন্দে'র প্রায় শেষাবধি তাঁহার কশাঘাতের বিরাম ছিল না।—

"জুটিয়ে হাটের নেড়া,
ছেলেদের বানিয়ে ভেড়া,
ভারতে ভারত-ছাড়া,
করতে আমি যত্নবান্।
আমার প্রেট্রিয়টী, নেহাৎ খাটি,
গোটা ভারত লবেজান॥'

মোটের উপর, যে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের মুলে স্বদেশ-প্রেম নাই, তাহার ফলও অষ্টরম্ভা বা ঈষৎ মুল্যবান্ বস্তুই হইয়া থাকে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" এখানে বলা আবশ্যক, যে, এখন যেন ঐ ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিতেছে। ভরসা হয়, ক্রমে "শাখা পল্লব হবে তার ছায়াতে প্রাণ শীতল হবে।"

ইন্দ্রনাথ যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন বাঙ্গালায় যে-সব ব্যাপারের অভিনয় চলিতেছিল, তাহা তাঁহার তীব্র দৃষ্টির গোচরীভূত হইল। তিনি ব্যথিত হইলেন। এক স্থলে পঞ্চানন্দ স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন;—

"যাঁহারা পঞ্চানন্দের পরম বন্ধু, তাঁহারা একটা অনুযোগ করিয়া থাকেন, সেটার উল্লেখ অগ্রে করা আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চানন্দের অনেক কথা বোঝা যায় না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিব, দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ তোমাদের বুদ্ধির, আর দোষ তোমাদের ভাষার। বাস্তবিক কিন্তু অনুযোগটাই অমূলক। বাঙ্গালা ভাষা বুঝিলে নাকি ভারি নিন্দার কথা, সেই জন্য বুঝিয়াও অনেকে বলেন যে, বোঝা গেল না। তাহার এক প্রমাণ এই যে, স্কুলে কাঁকড়া, ছেলে ছোকরা, পালে-পালে, দলে দলে, যখন টৌনহলে রাজনীতির বিষম সমস্যার বিজাতীয় বিভণ্ডা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, তখন ত কেহ বলেনা যে, আমি বুঝিনা, তবু আসিয়াছি। বাগ্মীও বলেন না যে, কেহ বোঝে না, তবু আমি বকিতেছি। ভাই, আসল কথা কি জানো, পঞ্চানন্দ নাকি বাঙ্গাল, তাই অনেকে বুঝিতে পারেনা। আর তা ছাড়া, যে বাপা বোঝেনা, সে কি কথা বুঝিতে পারে?"

এই "ব্যথা" বুঝাই হইল পঞ্চানন্দ বুঝিবার কল-কাঠি। শুধু পঞ্চানন্দ কেন, তাঁহার কল্পতরু, ভারতউদ্ধার, ক্ষুদিরাম এবং পঞ্চানন্দ—এ-সবই সেই মর্ম্মব্যথার অভিব্যক্তি মাত্র।

পঞ্চানন্দ তাঁহার ৩০।৩২ বৎসর ব্যাপী প্রচেষ্টা। ইহার মোটামুটি বিষয়গুলি উপরে উল্লিখিত হইল। তাহা ছাড়া, এই ৩২ বৎসরে পঞ্চানন্দে যে কত বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুবন্ধ, কবিতা ও গান আছে,—তাহার সকল গুলির পরিচয় এ ভূমিকায় দেওয়া অসম্ভব। রসপিপাসু পাঠক তাহাদের পরিচয় এই গ্রন্থাবলী হইতেই লইবেন। ফলতঃ এই ৩২ বৎসর ব্যাপী পঞ্চানন্দে (ওরফে পাঁচুঠাকুরে) বিষয়-বৈচিত্র্যের ও রস-বৈচিত্র্যের সীমা নাই।

পাঁচুঠাকুর পড়িতে হইলে পাঠক-পাঠিকাগণকে কি-কি কথা মনে রাখিতে হইবে এবং কি-কি কথা মন হইতে দূর করিতে হইবে, এখানে আমরা সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। প্রথমতঃ পাঁচুঠাকুর স্বয়ং তাঁহার 'মুখপাতে' কি বলিয়াছেন, শুনুন ;—

"রহস্য ও রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কিনা, বলিতে পারিনা। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা দেন পাঠক মহাশয়দের, এখন আবার বলিতে হয়, পাঠিকা মহাশয়দের মনে থাকে। বাঙ্গালায় এখনও হাসিবার কিম্বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোক হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে।"

সুতরাং পাঠক-পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন যে, পাঁচুঠাকুর পড়িয়া শুধু একটু হাসিলেই পড়া সার্থক হইল, তাহা নহে। পাঁচুঠাকুরের ভাষায় ও ভঙ্গিতে হাসির তরঙ্গ উঠিবে, তাহা ঠিক। কিন্তু সেই হাসির ভিতর দিয়া পাঠক যদি উহার নিগূঢ় মর্ম্মের সন্ধান করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মনে-মনে নানাবিধ গভীর প্রশ্ন উদিত হইবে, হয়ত বা সমাধানের উপায়ও পাইতে পারিবেন। রস ও রসিকতার আচ্ছাদন ভেদ করিয়া যিনি উহার রহস্যের সন্ধান পাইবেন, তাঁহারই পাঁচুঠাকুর পড়া সার্থক এবং তাঁহাদের জন্যই পাঁচুঠাকুর। ইন্দ্রনাথের পাঁচুঠাকুর এবং অন্যান্য পুস্তক ও প্রবন্ধাদি সকলই অতি গভীর স্বদেশপ্রেমিকতার অনুপ্রাণিত। একটীমাত্র উদাহরণ দিব। পাদ্রী পঞ্চানন্দকর্ত্তৃক প্রদত্ত "পরকালের উপদেশ" পড়িলে কে ভাবিবে যে, উহা "স্বদেশী" আন্দোলনের ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বের লেখা? কিন্তু হায়, শিক্ষিত বাঙ্গালী কি তখন বাঙ্গালা পড়িত। তারপর পাঁচুঠাকুর-গ্রন্থের উপর্য্যুপরি তিন সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাবুরা কি সংবাদ রাখেন যে, ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চানন্দ পাদ্রী সাজিয়া কি জলন্ত ভাষায় "স্বদেশী" উপদেশ দিয়াছিলেন! কিন্তু সে উপদেশ যে বাঙ্গালায়! তাও আবার হাত-পা নাড়িয়া, দাড়ি দোলাইয়া, বুক ফুলাইয়া, চীৎকার ত নহে! পঞ্চানন্দের কথা শুনে কে? এই অতি স্থূল স্বদেশ-প্রেমিকতার কথাটা

২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাবুদের মাথায় ঢুকে নাই। সাধে কি ইন্দ্রনাথ গভীর দুঃখের সহিত বলিতেন—'পাতরের গায়ে পড়িয়া আমার বিদ্রূপ-বাণগুলি বৃথা গেল!" একবার পঞ্চানন্দে "ভঙ্গ-টিয়ারী কাব্য" প্রকাশিত হইলে, উহা এতই লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। সাক্ষাৎ হইলে ইন্দ্রনাথকে তিনি বলিলেন যে, ঐরূপ তীব্র বিদ্রূপে লোকমত তাঁহাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন যে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি এতকাল পাতরের গায়ে বাণবর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন, ঠিক তাহা নয়। পঞ্চানন্দের বাণে যখন বেদনা বোধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর বেশীদিন পঞ্চানন্দ লিখিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। ঐ "বোধটুকু" জাগাইতে পারিলেই পঞ্চানন্দের কার্য্য শেষ হইল। বাস্তবিক, পঞ্চানন্দ শুধু হাসির ব্যাপার নয়,—ইন্দ্রনাথের এই জীবনব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টা শুধু লোকের দন্তরুচির কৌমুদীলীলা দেখিবার ও দেখাইবার জন্য নয়। উহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য,—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া বিপথগামীদের মনে আঘাত দিয়া প্রকৃত দেশাত্ম-বোধের প্রতিক্রিয়া (Reaction) সম্পাদন করা। পঞ্চানন্দ একস্থলে নিজেকে যে উপদেশ করিতেছেন, তাহাতে পঞ্চানন্দের মহৎ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। 'পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদেশ' এইরূপ,—

"যাও, উত্তম পুরুষ, সাবধানে যাও। ঐ যে দূরে, বহু দূরে আলোক দেখিতেছ, উহাকে লক্ষ করিয়া যাও। পর-নিম্ন অন্ধকার। তাহার উপর দিয়া তোমার পথ। বুঝিয়া,—বুঝাইয়া চলিবে। কিন্তু লক্ষ্য ভুলিও না। ঐ আলোক সত্য। তোমার শঙ্কা নাই।

'অন্ধকারে পাদবিক্ষেপ করিতে হইবে। অতএব সন্তর্পণে চলিবে, অতি কোমল ভাবে পদ সঞ্চালন করিবে; দেখিও তোমার অস্থির পদদলনে ক্ষুদ্র কীট যেন বিনষ্ট না হয়। সামান্য বাধাকে বিঘ্ন মনে করিয়া যথায় তথায় খড়্গ উত্তোলন করিও না। যাহা অধম, যাহা তুচ্ছ, যাহা ঘৃণা করিলেও পর্য্যাপ্ত আত্মাবমাননা করা হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিও না। অসমানে যুদ্ধ-সজ্জা করিও না। দুর্ব্বলকে দয়া করিও, অজ্ঞানকে শিক্ষা দিও।

"নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও। তোমার পথে বহুতর বিভীষিকা আছে—দণ্ডবিধি, মুদ্রণবিধি প্রভৃতি কত মূর্ত্তি ধরিয়া তাহারা তোমাকে ভীত করিতে, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু ভয় নাই। মহাব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত দেবদত্ত মহাস্ত্র তোমার হস্তে দিয়াছি। বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে, সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। যে পাপী সেই ভয় করে। তুমি পাপীর শাস্তি বিধান করিবে। তোমার যদি ভ্রম হয়, মার্জ্জনা করিব। জানিয়া শুনিয়া পাপে লিপ্ত হও, পঞ্চত্বেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

"পঞ্চানন্দ মনোযোগপূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করিয়া বলিল—'হুঁ', তা কি আর ব'লতে?"

এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া যিনি পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি যে আজীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার লেখনীকে

কলঙ্কিত করিয়া গেলেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তবে ভারত-উদ্ধার কথায় যাহা বলা গিয়াছে, অন্যান্য বিষয়েও সেই কথা অর্থাৎ যে বিষয়ের সহিত যাঁহার নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, যেখানে বিষয় হইতে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা যায় না, সেখানে ব্যক্তি বাদ দিয়া বিষয়কে বিদ্রূপ করা অসম্ভব বলিলেও হয়। ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধান নায়ককে ব্যঙ্গ-চিত্রে উজ্জ্বল করিয়া না দেখাইলে কখনই সে চিত্র পরিস্ফুট হয় না। অবশ্য সেই প্রধান নায়কে বা উপনায়কে বিদ্রূপের উপযোগী বস্তু থাকা চাই।

এই সব কথা মনে রাখিয়া পাঁচুঠাকুর পড়িলে, পাঠক উহার স্বদেশ-প্রেমিকতায় মুগ্ধ হইবেন, উহার মৌলিক চিন্তাশীলতায় চমৎকৃত হইবেন এবং এই অধঃপতিত দেশের উপর দিয়া যে সকল তাণ্ডব-লীলার অভিনয় হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইবেন।

পাঁচুঠাকুরে চুট্‌কীরও অভাব নাই। ক্রমাগত বড় বড় ব্যাপার ও সমস্যার প্রবন্ধ কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে গুরুপাক হইতে পারে,এইজন্য ইন্দ্রনাথ পাঁচুঠাকুরে কিছু কিছু চুট্‌কী-চাটনীর ব্যবস্থাও করিয়াছেন। পুস্তকাকারে প্রথম সঙ্কলনের সময়ে সে গুলি একত্র করিয়া দ্বিতীয় কাণ্ডে সন্নিবেশিত করা হয়। এই গ্রন্থাবলীতেও পাঠক পাঁচুঠাকুর দ্বিতীয় কাণ্ডে তাহা পাইবেন। চুটকীর একটা উদাহরণ দিতে ইচ্ছা হইতেছে।

"পঞ্চানন্দ" বাহির হয়, লোকে পড়েও, এমন কি "শনিবারের পালা" মুখস্থও করে, কিন্তু কেহই দাম দেয় না,—"অগ্রিম মূল্য"ত দূরে আস্তাং। পঞ্চানন্দের চলে কিসে, তাহা কেহই একবার ভাবে না। ঠাকুর এক ফন্দি করিলেন। বাঙ্গালী, বিজ্ঞাপন পড়িয়া পেটেণ্ট ঔষধ খাইতে বিলক্ষণ ব্যগ্র। পঞ্চানন্দ ভাবিলেন, একটা ঔষধের বিজ্ঞাপন দিলে বাঙ্গালী কিনিবেই কিনিবে। পঞ্চানন্দের দাম নাই দিল; "যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ পদাম্বুজম্।" পঞ্চানন্দের বিজ্ঞাপন বাহির হইল—"পঞ্চানন্দের এণ্টি-বোকামি মিকশ্চার অর্থাৎ বোকামি নাশক আরক।" *

ঠাকুর বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এক হাত মারিয়া দিলেন, এই এক পেটেণ্ট ঔষধেই রাতারাতি বড় মানুষ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" যে নিজের বোকামী নিজেই বুঝিতে পারিল, সে আর বোকা কি করিয়া? ফলতঃ পঞ্চানন্দের মিকশ্চার কেহই কিনিল না। তবু এই ফিকিরে ঠাকুর বাঙ্গালী বুদ্ধিমানদের

---

* এই অপূর্ব্ব মহৌষধটীর গুণাগুণ পাঁচু ঠাকুরে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। পাঠক, স্বয়ং তাহা পড়িয়া লইবেন। তবে, দরকার হইলেও ঔষধটি এখন আর পাইবার উপায় নাই। এজন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু নাচার।

একটা সেন্সস্ পাইলেন, ইহাই পঞ্চানন্দের লাভ। এরূপ চুট্‌কী যে বেশ মুখরোচক, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই প্রকার হরেক রকমের চাট্‌নীর মধ্যে এমন জিনিষও আছে যাহা শুধু মুখরোচক নহে, বিলক্ষণ সারবান্‌ও বটে। উদাহরণ-স্বরূপ "সূক্ষ্ম বিচার" নিবন্ধটীর উল্লেখ করিলাম। পড়িয়া দেখুন, গঙ্গারামের "আনন্দাশ্রু" দেখিয়া পাঠকের চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইবে, (অবশ্য পাঠকের যদি চক্ষু ও হৃদয় ও রসবোধ থাকে)।

পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, ইন্দ্রনাথের এক ক্ষমতা ছিল, তিনি ইংরেজীর যথাযথ অনুবাদ করিয়া হাস্যজনক করিতে পারিতেন। পাঁচু ঠাকুরে অনেক স্থলে তাহার উদাহরণ আছে। একটা স্থলের উল্লেখ করি। পিণ্ডিতে (রাউল্‌পিণ্ডিতে) আমীরকে লইয়া দরবার হইতেছে। একদিন ইংরেজী কাগজে তারের সংবাদে বাহির হইল—If every thing goes on well at Pindi, then the relation of Amir with our Queen will be settled. কাগজখানি পড়িয়া ইন্দ্রনাথ পঞ্চানন্দের জন্য উহার যথাযথ অনুবাদ করিয়া দিলেন,—যদি পিণ্ডিতে গোল না বাধে, তাহা হইলে আমীরের সহিত আমাদের মহারাণীর সম্বন্ধ নির্ণয় নিশ্চিত। ইহা যথাযথ অনুবাদ, অথচ যেন বাজীকরের হাতে কি জিনিষ নিমেষের মধ্যে কিসে পরিণত হইল। পাঁচ কাণ্ড 'পাঁচুঠাকুরে' যে কত বিষয় আছে, শুধু তাহার উল্লেখ করিতে গেলেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাবলীতে তাহা দেখিবার ভার পাঠকের উপরে সমর্পণ করিয়া, আমরা 'পাঁচুঠাকুরে'র কথা এইখানে শেষ করিলাম।

অন্যান্য রচনা—পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ও পঞ্চানন্দ (পাঁচুঠাকুর) ছাড়া, ইন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রবন্ধ যে কত লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। যৌবনারম্ভে "পঞ্চানন্দ" প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহার "অক্ষয় দাদা"র (৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের) 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তাঁহার বিস্তর প্রবন্ধ ও রসরচনা প্রকাশিত হইত। 'সাধারণীর' সে-সব প্রবন্ধ স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। পরে, যখন 'বঙ্গবাসী'তে ইন্দ্রনাথ "পঞ্চানন্দ" লিখিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতে 'বঙ্গবাসী'র জন্য অন্যান্য প্রবন্ধও লিখিতেন। প্রধানতঃ সে-সব প্রবন্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক।

জীবনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'বঙ্গবাসী'তে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। উপরোধ-অনুরোধে তিনি কখন-কখনও মাসিক পত্রিকাতেও প্রবন্ধ লিখিতেন। বাঙ্গালা ভাষা ঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ এবং অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে' প্রকাশিত 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র সমালোচনা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওকালতিতে এবং স্বোপার্জ্জিত বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত

হইলেও, যে বিপুল সাহিত্য-প্রচেষ্টার নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই অবাক্ হইতেও হয়! অবশ্য এ সঙ্কলনে কেবল-মাত্র তাঁহার নামাঙ্কিত প্রবন্ধগুলিই সঙ্কলিত হইয়াছে। সেইগুলি পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, স্বদেশের ভাষা,ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য তিনি কিরূপ গভীর অথচ মৌলিক ভাবে চিন্তা করিতেন। সাহিত্যে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বা অন্যের প্রবর্ত্তিত পথে বিচরণ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার এই সব প্রবন্ধ বেশ সতেজ ও সরল ভাষায় রচিত এবং মধ্যে মধ্যে রসের বুক্নী থাকায় চমৎকার সুখপাঠ্য। প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত পড়িলে পাঠকের মনে নানা চিন্তার উদ্রেক ও নূতন ভাবে নানা সমস্যার উদয় হইবে, অনেক স্থলে সমাধানের উপায় ও ইঙ্গিতও পাঠককে পুলকিত করিবে। এক কথায়, প্রবন্ধগুলি কাজের কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং মন দিয়া পড়িলে এবং তদনুসারে চিন্তা করিতে থাকিলে জ্ঞানোদয় ও বলাধান দুইই হইবে. উপন্যাস-প্লাবিত দেশে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে ঐ প্রবন্ধগুলি অমূল্যনিধি। উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ ভাবে আমরা "স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি। সুপ্রসিদ্ধ 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনখানি প্রকাশিত ও অভিনীত হইবার অল্পদিন পরে ইন্দ্রনাথ 'নবজীবনে' উহার একটী নাতি হ্রস্ব সমালোচন করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনে তিনি কেমন নিপুণ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, সমালোচনটী পড়িলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যাঁহারা উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রসে বঞ্চিত অথবা যাঁহারা উহার মধ্য দিয়া মর্ম্ম ও রহস্যের সন্ধান করিতে অসমর্থ নহেন, তাঁহারা এই সকল প্রবন্ধ পড়িয়া বিলক্ষণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। অবশ্য যাঁহাদের ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মত, তাঁহাদের 'গোঠ'ও ভিন্ন। পঞ্চানন্দের তাঁহারা কেহই নহেন; পঞ্চানন্দও তাঁহাদের কাছে 'পঞ্চতিক্তে'র নামান্তর মাত্র।

উপসংহারে মোটের উপর বক্তব্য এই যে, বিলাতের অনুকরণে এ দেশে সকল বিষয়েই যে একটা উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব আসিয়াছে, দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই ভাব প্রযুক্ত হওয়ায়, কি ধর্ম্মের ব্যাপারে, কি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, কি রাজনৈতিক আন্দোলনে, এই যে বিষম বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ ইহার বিরোধী ছিলেন;—তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-প্রচেষ্টাই ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করি-তেছে। ধর্ম্ম-সংস্কারের নামে যে পথে ধর্ম্মের গতি ফিরাইতে গিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাহা 'জগা-খিচুড়ী'তে পরিণত হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও অগ্রাহ্য হইয়া উঠিল, বিলাতী অনুকরণে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে চালাইতে না চালাই-তেই যে পথে "Beware" লিখিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিতে হইল, দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে এ দেশে বিলাতী রাজনীতির উগ্র নেশা ধরাইতে গিয়া পাত্র-বিশেষে

তাহা যেরূপ ভীষণ কণ্টকিত পথে চালিত হইল,—এ সব পথে সুখশান্তি নাই। হিন্দুর পক্ষে এ সব পথ কুপথ এবং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তাই তিনি এই সকল উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল নীতিকে বিদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই উদ্দাম-নীতি 'উদার-নীতি'র মুখোস পড়িয়া সংস্কারের নামে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ ইহারই বিরোধী এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার অক্ষয়-তূণের চোকা-চোকা বাণগুলি এই উদ্দাম-নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, নিশ্চয়। কিন্তু তাহার মানে এ নহে, যে তিনি উন্নতির বিরোধী। ব্রাহ্মণের অবনতি দেখিয়া তিনি "নবদ্বীপ-সমাজ" গঠনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে ত ব্রাহ্মণের উন্নতি সাধনের জন্যই। ব্রাহ্মণ উন্নত হইলে সমাজের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইবে, এই আশায়। তাঁহার মতে সংস্কার, উন্নতি, যাহা প্রয়োজন তাহা কর। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুভাবে প্রভাবিত হইয়া, প্রকৃত দেশপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া। নতুবা তোমার উদ্দাম-নীতিকে 'উদার-নীতি' বলিয়া ভবীকে ভুলাইতে পারিবে না। এই যে দেশময় অশান্তি, অসন্তোষ ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, এ সব ত তোমাদের তথাকথিত ঐ উদার-নীতিরই ফল। তোমাদের ধর্ম্মান্দোলনে কি ফল হইল, তোমরাই চক্ষু মুদিয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। তোমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে কি ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও কি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হইবে? তোমাদের স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতার শোভাযাত্রা বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এ গরীবের দেশে বিলাস চালাইতে গেলে, কেবল অভাবেরই সৃষ্টি করা হইবে। অভাব হইতেই অশান্তি। তবে আর উদ্দামে উদারে প্রভেদ কি? তবে আর তোমাদের 'উদারকে' 'উদ্দাম' বলিলে চটো কেন? তাই বলি, ভাই 'উদার-নীতিক'গণ! ক্ষান্ত হও। গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া সংস্কার করিতে পার ত কর,—গণ্ডীর বাহিরে যাইও না। গণ্ডীর বাহিরে পা দিলে, শেষে লঙ্কাকাণ্ড না হইয়া থামিবে না, প্রাচীন কাব্যের এ উপদেশ মনে রাখিও। ইহাই ইন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল ও সার কথা।

এইখানে আমরা ইন্দ্রনাথের ও তাঁহার কীর্ত্তি-কথার শেষ করিলাম। তিনি বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। বঙ্গবাসী চিরদিনই তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আজ আমরা তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ একত্র করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমাদের কৃতার্থতা। ইন্দ্রনাথের আত্মা যদি আমাদের এই কার্য্যে কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ করেন, তাহা হইলেই আমাদের এই প্রযত্ন সার্থক হইবে।

———

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

উৎকৃষ্ট-কাব্যম্।

শ্রীমতী গ্রন্থকর্ত্রী এণ্ড কোং

বিরচিতং।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

"শিশিরে কি ফলে ধান্য বিনা বরিষণে ?
কত লোকে কত বলে সকলে কি শুনে॥

"যস্মিন্ দেশে যদাচার—
....

১২৭৮—মূল্য (সাড়ে বার গণ্ডা পঞ্চাশ কড়া) মাত্র।

ঈশ্ তাহার।

যেহেতু প্রকাশ থাকে যে, "সোমপ্রকাশে"র বয়স উপনয়নকালাতি-
ক্রমী হইয়াছে, তাহার বিবাহ হওয়া শীঘ্রই আবশ্যক। 'মধুকেরী'
কালিকাটা দিবরী। সেইটী কন্যা স্থির হইল। অকতুবারু মাহার পর
কেশব সেন ফিরিয়া আসিলে

নোটিশ।

এই পুস্তক ২০ আইনের বিধানানুসারে রেজিষ্টরী করা গেল না; যেহেতু পড়াশুনার
বেশি বেশি চাপ পড়াতে আমার তত অবকাশ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া, কেহ মনে
করিবেন না যে, গ্রন্থ কখনই রেজিষ্টরী কৃত হইবে না।

অতএব সকলকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, যদি কোন মুদ্রাকর (অর্থাৎ ছাপা-
ওয়ালা—কারণ এমন অনেক মহাপাণ্ডত আছেন যে মুদ্রাকর শব্দের অর্থ জানেন না)
আমার বিনা অনুমতিতে—(আর এই খানে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, আমি কে, তাহা
কেহই ঠাওরাইতে পারিবেন না, সুতরাং আমার অনুমতি পাইবেন না)—এই পুস্তক
মুদ্রিত করেন, তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপগ্রস্ত হইবেন। আমি শারীরিক ভাল আছি।
ধর্ম্মতিপর্ব্বাবিত্তেনেতি।

সন ১২৭৭ সাল।
১১ই শ্রাবণ।

গ্রন্থপ্রণেতুঃ।

মুখবন্ধ।

একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, কোন গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে, প্রণেতা শ্বেত কি কৃষ্ণচর্ম্মাবৃত, ইত্যাদি, ইত্যাদি জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে আমাকেও এই স্থলে অগত্যা কতক কতক আত্মকথা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতে হইল।

পাঠক! হরিতাল যদি বিষাক্ত পদার্থ না হইত, আর ঐ বর্ণই যদি মহাপ্রভুর না হইত, তবে আমি গৌরপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতাম। পরন্তু সেই কারণ বশতঃই হউক, বা অমুকের চামড়ার সহিত—(সে একটু ক্যাক্‌শা অর্থাৎ ফরসা জেয়াদা)—মিলাইয়া অপ্রতিভ হওয়াতেই হউক, অথবা সত্য সত্যই আমার রক্ত কিছু পুরু হওয়া প্রযুক্তই হউক, গৌরেতি পদেন নাহং বিশিষ্যে। আমি পরিমিত দীর্ঘাকার—বাজারে যে হাত-কাঠি প্রচলিত, আমি তার ঠিক সাড়ে তিনটী।

আমি মোটা নহি—পক্ষান্তরে আমার হাড়গুলিও জুল্‌জুল্‌ করে না। হাত পা বেশ লম্বা লম্বা; মাজা সরু, কাপড় যদি খুব কসিয়া পরি, তাহা হইলে ইহার গাণিতিক উপপত্তিও দিতে পারি। উরু সুঠাম, পাছায় মাংস অল্প। "মেদশ্ছেদকৃশোদর" ইত্যাদিনা। এইবার মুখখানি—কেশগুলি উত্তম—ঘন, কোমল, কপাল পার্শ্বে আকুঞ্চিত। জ্রযুগলে আরও অল্প চুল থাকিলেই ভাল হইত। নয়নদ্বয় কিছু বসা বসা, এ কারণ একটু ছোটও দেখায়। বলা বাহুল্য, যে হনুদ্বয় কতক উচ্চ হওয়াতে গাল দুখানি সুগোল নয়; নাসিকার মধ্যস্থল এরূপ স্থূল না হইলে, বাঁশীর মত নাক। অধরোষ্ঠ বিম্ববৎ স্থূল বা রক্তিম নয়; জামপাতার মত পাতলা বা কালও নয়;—আর কেনই বা কাল হইবে? আমি ত গুলি খাই না। যাহাই হউক, কোন কোন পাড়ায় আমি সুপুরুষ মধ্যে গণ্য। চেহারা দেখিলে অনেকেই বলে, আমি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্‌। বয়স কুড়ি বৎসর, দুইমাস, নয় দিন; সোমবার আমার জন্ম বার। বাস কোন পল্লীগ্রামে; সে গ্রামের নাম জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয়? বোধ করি হয়—but I am determined not to tell you that. For other particulars the reader is referred to the piece headed "আমার কত ক্ষমতা!"

এই বইখানি দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই লেখা। ইহার ভাষা উত্তম; কারণ, আমি দিব্য লেখাপড়া জানি; বুঝিতে পারিলে সারগর্ভ।

এই পুস্তকের নাম "দিল্লিকা লাড্‌ডু" দিতে দিতে দিলাম না। সে নামের কারণ এই যে, যিনি পুস্তকখানি পড়িবেন, তিনি পরিতাপ করিবেন; আওর্‌ যো শপথ্‌ নেঁহি পড়েঙ্গে, উওভি পস্তাওয়েঙ্গে।

উৎকৃষ্ট-কাব্যম্।

প্রথম উদ্গার।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

কেন বঙ্গভাষে! ভাস নয়নের জলে আর;
যবে দেখিতেছি, সদ্যঃস্ফুট জনমিলা, অমনি
কবিতাইলা, কত কবি-সুত তব; তীক্ষ্ণবুদ্ধি-রূপ
সূতা যোগে যারা গাঁথিয়া গৌড়ীয়া গড্ডা
(যার অর্থ মালা) (বেলফুল দলে যেম
নূতন বাজারে কত মালী) পরাইলা তব গলে,
বালে! বয়স এখন তোর কাঁচা, ও লো ধনি!
এর মধ্যে দত্ত-দত্ত অমিত্রে, তোমার কণ্টক
পদ্যের মিল দেখ পরিষ্কৃত;—মিউনিসিপালিটির
গুণে দেখ যথা জঙ্গল।—মুছিয়া দেখ আঁখির
সলিল, অদূরে সুকাব্য-রবি উদি, আলোকবে
ভাল তব; দূরাইবে মিলের বারিদে!
এই নাও! আমিও দি একগাছী মালা;
সস্তা বলি ঠেলি ফেলি দিওনা লাথিয়া।

দ্বিতীয় উদ্গার।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

স্বাধীনতা কাল হ'ল,
কত রঙ্গ দেখাইল,
হায়! প্রেয়সীর হাত
যে সে এসে ধরে যে।

কবিতা কোমল বধূ,
ছিল তো আমার শুধু,
[illegible] (১) তারে করে ধর্ষণ,
দেখে ভয় করে রে।

অসাজে সাজায় তারে,
যতন কতেক করে,
নব্যদলে, দেশ ছাড়া
করিবারে মোরে রে।

গিয়াছে সুখের দিন,
সহায় সম্পত্তি হীন,
ভ্রমিতেছি এবে আমি
কাঁদিয়া কাতরে রে।

ভারতের ভাগ্য পোড়া,
নহিলে ভারত ছাড়া,
ভারতের কাল, বল
কখন কি করে রে ?

মদন-মোহন ধন,
গেল আঁধারি ভুবন,
মানস কমলে শোক-
কীট জরজরে রে।

প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত,
জনমের মত সুপ্ত,
ভাসায়েছে বাছা মোরে
দুখের সাগরে রে।

বালক দ্বারকানাথ,
[illegible] সবার সাধ,
বল এবে কবিরের
হাতে কেবা ধরে রে !

---

(১) [illegible]।

তৃতীয় উদ্‌গার।

বই লেখা।

মানস গোলাপ ফুলে, "বইলেখা" পোকা
কি কুক্ষণে পশিয়াছে, তাই ভেবে বোকা
হইলেন বঙ্গদেশ, আমি একা নই।
এ ভাল জঞ্জাল হতে কিসে মুক্ত হই ?
বাছিয়া কেলিয়া কীটে যদি মনে করি,
পাপড়ি ছিঁড়িবে পাছে, এই ভেবে ডরি।
বঙ্কিমের মত নাই কলমের জোর,
নবাখ্যা (১) লেখা হ'ল না, এ রাতি ত' ভোর।
ওই দেখ দীনবন্ধু! তোমায় দেখিয়া,
নাটক লিখিতে যান কত কত মিয়া!
শিকায় তুলিয়া মান, কাণ কাটা যত
দুই গালে চূণ কালি লেপি অবিরত,
লেখনী সিঁধের কাটি হাতে, চুরি করি,
বই না বাহির হ'তে হয় ধরা ধরি!
নাটক লিখিয়া কেন খাটিব ফাটক ?
মজা করে কাব্য (২) করি, নাহিক আটক।
কোন বর্ণ যদি মিলে, বটতলা আছে।
না মিলিল, বয়ে গেল, বসুজ্জার (৩) কাছে।
বস্তু পরিচয় দিতে সাধ যদি চিতে,
গোল কর, কেশব হইবে আচম্বিতে!

---

(১) Novel.   (২) শ্রাব্য (পদ্য) কাব্য।

জা—I. C. Bose. ঈশ্বরচন্দ্র বসু। কলিকাতা বহুবাজারে ইঁহারই 'ষ্টান্‌হোপ' নামক
ইকেল মধুসূদনের যাবতীয় পুস্তক ছাপা হইত। সে কালে বটতলা হইতে "কি মজার
কি দুঃখের সোমবার" ইত্যাদি নানাবিধ রঙ্গরসের ছোট ছোট পুস্তক বাহির হইত। সে
ধার হবে। উৎকৃষ্ট কাব্যের কবি ভাবিতেছেন, তাঁহার হাত দিয়া মিত্রাক্ষর বাহির
মিত্রাক্ষর বাহির হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, যদি মিত্রাক্ষর হয়; তাহা হইলে ছাপিবার
াই, বটতলা আছে; আর যদিই বা অমিত্রাক্ষর বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ভয়
দের অমিত্র-ছন্দী কাব্যাদি যিনি ছাপিয়াছেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বসু আছেন।

উৎকৃষ্ট-কাব্যম্‌।

শুধু যদি বই লিখে বড় হতে চাও,
ছোট আড়া কাগজেতে চৌদ্দ আঁক দাও।

চতুর্থ উদ্‌গার।

আমার কত ক্ষমতা!

প্রস্তাবের প্রারম্ভেতে বলিতে উচিত,
গ্রন্থকার-উক্তি, যাহা নিয়ে সুরচিত।
প্রয়োজন মতে, লোকে কেহ পঞ্চমুখ,
কেহ দশ, কেহ শত মুখে পায় সুখ।
প্রমাণ তাহার চাহ? আমি দিতে পারি
(কেনই বা বলি হেন, কথাও ত ভারি,
প্রমাণ বিহনে কেবা আদালতে যায়?)
মহাদেব গাইলেন পঞ্চ রসনায়
ধরণীর কথা; আহা! সেই মহাদেব,
যিনি শূলপাণি শিব, ভূত-মোসাহেব,
শ্মশাননিবাসী—(হেন কত বিশেষণ
আছে, তাহা দিয়া ফল বল কি এখন?)
যাউক সে কথা—আর দেখ যে অনন্ত
কতেক ধরিলা ফণা, মুখে কত দন্ত!
—(পদ্য অনুরোধে মাত্র এ কথাটী বলা।)
আরো দেখ, গগনের চাঁদ ষোলকলা।
ইত্যাদি ইত্যাদি নানা সদুদাহরণ;
সবগুলা বলিবারে কিবা প্রয়োজন?
দেড় পাতা পুস্তকে ভূমিকা তের পাত
বিস্তর থাকিতে বল, "কিস্তি" মাত্রে "মাত"
যথা শতরঞ্চ খেলে;—সেইরূপ মম
এ সমস্ত কথা বলা, কর্কশ বিষম।
কিন্তু নিবেদন এই, কি সাধ্য আমার?
"অদৃষ্টে"র ফল সব, আমি ত নাচার।

বলে দিই, এ অদৃষ্ট পাঠকের। নহে
গ্রন্থ-কর্ত্তার ; যার তরে এত সহে
ভেঁড়ার সদৃশ শান্ত পাঠকের পাল।
ক্ষমতা শুন রে এবে সামাল ! সামাল !
আমার যতেক বিদ্যা, একে একে বলি ;
মন দিয়া শুন, যত কাব্য-মধু-অলি।
মম বিদ্যা দুই মতা—সকলেরই তাই।
স্বাভাবিকী, উপার্জ্জিতা, বুঝে দেখ ভাই।
উপার্জ্জিতা বিদ্যালতা করে ঝক্‌মক্ ;
ইঙ্গরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ; কতক
উরুদু মিশাল তাহে ;—দেখ সহৃদয়।
গীত বাদ্য নৃত্য আদি কভু ছাড়া নয়।
স্বাভাবিকী বিভাজিতা দুই উপভাগে,
সহজা চ অলৌকিকী—যাতে মজা লাগে।
সহজা বিশেষ সবে জানে সবিশেষ,
ভোজন, শয়ন, আদি, ভ্রমণ অশেষ।
অলৌকিকী কথা অতি বিচিত্র শ্রবণে,
যে দেখেছে সেই ভাবে—"ভুলিব কেমনে ?"
পেট ফুলাইতে পারি, বুকে গর্ত্ত করি,
উদরে সারঙ্গ কিবা আহা মরি মরি।
চক্ষু দুটী টেরা হয়, ঘাড়ে ওঠে পদ
গলার দেখিতে শিরা, অদ্ভুত-আস্পদ।
সকলে দেখেছে মোরে, কেহ নাহি চিনে,
বয়সের সঙ্গে বিদ্যা বাড়ে দিনে দিনে।
গ্রন্থ লিখিবারে পারি, লেখাও হয়েছে,
কিন্তু না বিকায় কভু, দোকানে রয়েছে ;
তাই এইবার পুনঃ লিখিলাম বই।
কর্ণরূপ মুখে খাব যশোরূপ দই।
পড়িয়া আমারে যদি কেহ করে দ্বেষ,
পড়ি কিবা কাজ তার—এই উপদেশ।

শ্রীশ্রীমহামতি উপাধ্যায়।

মুদ্রাকরের পরিশিষ্ট।

এই গ্রন্থখানি যে যন্ত্রে মুদ্রিত হইল, তাহার নাম যদি গুপ্ত না হইত, তাহা

অবশ্যই প্রকাশ করিতাম।

কল্পতরু।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

————————Et me fecere poetam
pieridos : * * * * : me quoque dicunt
vatem pastores ; sed non ego credvlus illis :
Name neque adhuc Varo videor, nec dicere Cinnt
Digna, sed argutos inter strepere anser olores." Virgil.

ক্যানিং লাইব্রেরী ; কলিকাতা।

সন ১২৮১ সাল।

কল্পতরু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।"

এই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময় তৃতীয় শ্রেণীর একখানা ভাড়াটে গাড়ী হাটখোলার একটি দোতালা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, রণবাদ্য বন্ধ করিল। ঘোড়া দুইটার মধ্যে একটার খাড়াই আধ হাত কম, কিন্তু তাহার লাগামের নীচে দিয়া যে পরিমাণ জিহ্বা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে খর্ব্বতার মত সুদ ক্ষতিপূরণ হইল। বাম-চক্ষুহীন অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ নেত্র হইতে দর-দরিত ধারা বিগলিত হইতেছিল; গর্দ্দভশ্রবা বুঝি এই ভাবিয়া কাঁদিতেছিল যে, "এখন ত আবার চাবুকভরে চলিতে হইবে, তবে একেবারে আরম্ভ করিয়া ইহ অশ্বজন্মের শেষ পর্য্যন্ত চালাইয়া লয় না কেন? মাঝে মাঝে থামাইয়া বিদ্যুৎ-আলোকিত অমা-রজনীর ন্যায় গাড়ীটানা জীবনকে দ্বিগুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে কেন?" আহা! পাঠক মহাশয় যদি সহৃদয় হন, অবশ্যই ইহার দুঃখে দুঃখী হই-বেন; যদি ইহার সুখ থাকিত, তবে সুখের সুখীও হইতে বলিতাম। এ পক্ষ (গ্রন্থকার) প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—"মুনস্সুফী স্বীকার করিব, হাল আমলের ডিপুটি হইব, তথাপি ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া হইতে পারিব না"; আপনি বলুন,—"তথাস্তু"!

গাড়ী থামিল, নরেন্দ্রনাথ সলম্ফে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন, পাছে গাড়ীর চরণাধারে পা দিলে ভাঙ্গিয়া পড়ে অর্থাৎ তিনি চাকার উপর পড়েন—তাহা হইলে চাকার দাম লাগিবে। কলিকাতার গাড়ীর অধিষ্ঠাতৃদেবগণের শরীরে মমতা অল্প। নরেন্দ্রনাথ, গরপেটের চায়না-কোটের বুকের পকেট হইতে ঘড়ী টানিয়া বাহির করিলেন; ঘড়ীর ডালা খুলিলেন, ঘড়ী কর্ণে সংলগ্ন করিলেন, মুখ (নিজের) কিঞ্চিৎ বিকৃত করিলেন, বলিলেন "ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট"। একখানি রুমাল বাহির করিয়া গোটা সিকি এবং আনী পয়সা গাড়োয়ানের সমক্ষ-কর-

কমলে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গাড়ওয়ান বলিল, "ঘণ্টা ভরসে বেশী হুয়া"। নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "সমস্ত দিন লাগে নাই, এই পরম লাভ, কিন্তু আমি তার দায়ী হইতে পারি না," বলিয়া সিঁড়ির উপর উঠিলেন। পলাণ্ডু-সুবাসিত গালিকা-পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে, রথাধিষ্ঠাতা গালের মধ্যে এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ অনির্ব্বচনীয় শব্দ বাহির করিল, রণবাদ্য করিতে করিতে পুষ্পক-রথ জড় পদার্থের নিশ্চেষ্টতা সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ উপরে গিয়া বিছানায় নিজ স্থূল কলেবর স্থাপিত করিলেন; যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি পশ্চাতে তাকিয়া, সম্মুখে ভূঁড়ি ও তদগ্রে একটী বাক্স লইয়া বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রও সেই বাক্স সম্মুখে করিয়া বসিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা (বা ভাড়াটিয়া কর্ত্তা, কারণ তিনি একজন মহাজনের প্রধান কার্য্যকারক) আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "বস, ভাল আছ ত? অনেক দিন যে দেখা নাই?"

নরেন্দ্র। "আজ্ঞে, পরীক্ষা সম্মুখে, অবকাশ অল্প, তাই আস্‌তে পারি নাই। বাইশ দিন পরে পরীক্ষা হইবে।" নরেন্দ্রনাথ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা দিবেন। ইঁহার বয়স বাইশ বৎসরের বেশী হইবে না।

উভয়ে আলাপ হইতেছে, নরেন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে বাটীর নূতন দাসী তামাক সাজিয়া হুঁকা হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল, ইহা তাঁহারা দেখেন নাই। দাসীও আসিয়া কোন কথা কহে নাই, কেবল কালো গাল দুখানি ফুলাইয়া কলিকার আগুনে ফুঁ দিতেছিল, আর তাহার নেত্র, (নেত্রদৃষ্টিতে বোধ হয়) নরেন্দ্রের রূপ কল্পনা করিতেছিল, কারণ দাসী ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পরের অপরিচিত। নরেন্দ্রনাথের রূপ বাস্তবিক অদর্শনীয় নহে। তবে, ইট, চূণ, শুরকী, কাঠ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে যেমন অট্টালিকার শোভা অনুভব করা দুষ্কর, তদ্রূপ অঙ্গে অঙ্গে বর্ণন করিলে নরেন্দ্রের মূর্ত্তিও ঠিক করা দুঃসাধ্য।

গ্রন্থকারেরা, বিশেষতঃ নবাখ্যান-লেখকগণ গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের রূপ বর্ণন না করিলে পাছে ধুমের ব্যাঘাত হইবে, এই আশঙ্কায় একটী কুদৃষ্টান্ত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমার খ্যাতিচন্দ্র, নিন্দা-রাহুগ্রস্ত না হন, এই ভাবিয়া আমিও আবশ্যকমত রূপবর্ণনা করিতে থাকিব। "ক্ষীরগ্রাহী মরাল পাঠকগণ নীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দোষ মার্জ্জনা করিবেন"।

অন্যান্য মানুষের ন্যায়, নরেন্দ্রনাথও একটা মাংসপিণ্ড। প্রভেদের মধ্যে এই যে, কাহারও কাহারও হাড়ের ঠিকানা, দেখিলেই করা যায়, নরেন্দ্রনাথের অস্থিনির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। নরেন্দ্রের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, যেমন মেটে পাথর। কপাল ছোট, গড়ের মাঠের মত প্রশস্ত নয়। ভ্রূযুগলের সহিত নিবিড় গহন কাননের তুলনা হয় না, কে জানে, কে জোড়ে বলিতে পারি না। যদি গজেন্দ্রগমনে ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক নায়িকা প্রশংসা

লাভ করিতে পারিয়াছেন, তবে আমার নরেন্দ্রনাথও গজেন্দ্র-নয়নের জন্য অবশ্য প্রশংসা পাইবেন। নাসিকা ছোট্ট, দীর্ঘে দুটী তিল ফুলের সমান; আস্তে আস্তে নাকের মণ্ডল নিরূপিত হইতে পারে না, এমনি সুগোল। যাহারা পৃথিবীর মানচিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নরেন্দ্রনাথের গালের বর্ণন করা বাহুল্য-মাত্র। ওষ্ঠাধর বিম্ববৎ, কেবল পাণ খাইলে লাল না হইয়া তামার মত দেখাইত। নরেন্দ্রনাথ গজগ্রীব, গজস্কন্ধ, গজ-দেহ, গজপদ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে গজ বলা যায় না; কারণ সকলেই তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারে, গজভ্রম কস্মিনকালে কাহারও হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ যে সুশ্রী, তাহা আমরা একবাক্যে নিশ্চয় করিতে পারি, কারণ "রণে, বনে, শত্রুসনে, হুতাশনে বা বিজনে" কখনই তাঁহার মনে, সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথ দাসীকে দেখিলেন। দাসীর বয়স, যৌবনের হাত ছাড়াই ছাড়াই করি-তেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নরেন্দ্র বলিলেন,—"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কি দুর্দ্দশা! রাজরাণী হইলেও অন্তঃপুরে বন্দী, নয় পথের কাঙ্গালিনী। এ অবস্থা কি যাইবে না?" কর্ত্তা গদিয়ান বাবু কোন কথা কহিলেন না; নরেন্দ্র যে নবীন ব্রাহ্ম, তাহাও তিনি জানিতেন না। পরে অনেক আলাপাদি করিয়া কর্ত্তার হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া নরেন্দ্র দুইবার বাহিরে তামাক খাইয়া আসিলেন; দ্বিতীয় বারে কর্ত্তার হস্তে হুঁকা দিয়া বাসায় যাইবার অনুমতি লইবেন, এমন সময়ে সিংহ-শৃগাল-নাদ করিতে করিতে রামদাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামদাস 'ভূশিমালে'র দালালী করিত; মলিন বস্ত্র পরিধান, পায় জুতা নাই; গা খোলা, একখানি মলিন মলমলের চাদর বামস্কন্ধে দোদুল্যমান; যখন রামদাস ঘরে প্রবেশ করিল, তখন চাদরের এক কোণে চারিটী গম, এক কোণে আতপ চাউল, এক কোণে ছোলা। হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামদাস গদিয়ান বাবুর হাত হইতে হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে বসিল। রামদাস যেন শশব্যস্ত। সুমধুর গর্জ্জনস্বরে বলিল,—"আর মশায়, চার পয়সা উপর দিতে চাইলাম, তাও দিলেন না। ঐ নন্দী শালাই আপনাদের ভাল। মহাশয় গরিব ব'লে কটাক্ষে দেখতে হয়।" গদিয়ান বাবু বলিলেন—"রাম বাবু সে কথা হবে; তুমি একজন প্রধান দালাল, কত জায়গায় সওদা করবে। এখন, আমা-দের নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন দিন আলাপ হয়েছে?"

রাম। ইনিই নাকি! হায়, হায়, হায়! ইনি ত "মাই ডিয়ার ছোকরা"। (নরে-ন্দ্রের প্রতি) "বাবু বলতে হয়, এক দেশে বাড়ী; গরিব বলে পায়ে ঠেলতে হয় না।

নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন, অপরিচিত লোকে এ প্রকার আলাপ করে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যও বোধ হইল, কিন্তু সকল মনুষ্য সমান জ্ঞানবান্ হইতে পারে না, এই ভাবিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে কখন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, এখন অবশ্যই বিশেষ পরিচয় হইবে।"

রামদাস—এই ত 'মাই ডিয়ারে'র মত কথা। বাবু, আপনি কত বড় লোক! না হবে কেন? গরিব বলে পায়ে ঠেলবেন না, কটাক্ষ রাখা উচিত। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসচি। আজকেই আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার বাসা দেখিয়া আসিব।"

নরেন্দ্র কি করেন, বসিয়া থাকিলেন।

রামদাসের বয়স ৩০।৩২ বৎসর। গলা অবধি হাঁটু পর্য্যন্ত তাহার দৈর্ঘ্য সওয়া গজ; মাথা অবধি পা পর্য্যন্ত ধরিলে দুই গজের ন্যূন হইবে না। বক্ষঃস্থলে শরীরের বেড় এক গজের কিছু বেশী বেশী। মাংসপেশী সমস্ত বিলক্ষণ পুষ্ট, হাড় খুব মোটা মোটা। কেশ মোটা ও রুক্ষ। শরীরের রং কালো আবলুশ কাষ্ঠ হইতে ফরসা, কিন্তু কর্কশ। দশ পনর দিন অন্তরে নাপিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, সুতরাং মুখ প্রায়ই পরিপাটী দেখাইত না। কটমটে চোখের তারা দুটী ভ্রমরের মত কালো কিম্বা একরঙ্গা নয়, রামধনুর মত সাতরঙ্গাও নয়, মাঝামাঝি। ইহার শরীরের আয়তন এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আমরা যে প্রকারে জানিলাম, তাহা পাঠকবর্গের অগোচর রাখা অকর্ত্তব্য। একটা চাপকান তৈয়ার করিবার জন্য একজন দরজীকে রামদাস বরাত দিয়াছিলেন; তৈয়ার হইয়া আসিলে পর কিছু কশাকশি হইয়াছিল বলিয়া রামদাস দরজীর নিকটে চাপকান কাড়িয়া লন, এবং তাহার বেতনের পরিবর্ত্তে গালি দিয়া বিদায় করেন। চাপকানের কাপড় দরজী নিজ হইতে দিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামদাস দালালী করিত। রামদাস কুলীন ব্রাহ্মণ, কলিকাতায় তাহার শ্বশুরের বাসায় আহারাদি হইত, সুতরাং যাহা উপার্জ্জন, তাহাই সঞ্চয়। রামদাস দালালী ভিন্ন অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিত কি না পরে দেখা যাইবে।

রামদাস ফিরিয়া আসিল। সে চুলে যে পারিপাট্য সম্ভবে তাহা করা হইয়াছে। লাল-ফিতে-পেড়ে ধুতি মলিন বসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। গায়ে একটা শাটিনের ফতুই। যেখানে নরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, সেইখানে বাক্সের ভিতর আতর ছিল, রামদাস সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। গদিয়ান বাবু উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এক জোড়া শাল গায় দিল; এক জোড়া জুতা পড়িয়া ছিল, রামদাস পায় দিল। যাহার জুতা, তিনি নিষেধ করিলেন। রামদাস "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে," এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে রামদাস বলিল, "বাবু! সঙ্গে টাকা আছে ত? না থাকে, ধার করিতে হয়! মেছোবাজারের ভিতর হইয়া ত যাইতে হইবে। বাবু, তোমরা ত লক্কা পায়রা। বড় লোক, লাড্‌কেনি মার, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াও। হায়, হায়, হায়, হায়! রং দাও, বাক্সি দাও!"

নরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াও বুঝিলেন না। নবীন ব্রাহ্মের সংস্কার ছিল, কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কি জানি রামদাসের বিরুদ্ধ-বাদী হইলে পাছে তাহার মনে ক্লেশ জন্মে; বিশেষতঃ সাধু অভিপ্রায়ে নরক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, বরং যাওয়াই উচিত—নরকের যদি কোন হিত করিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে,—"কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।"

আবার নরেন্দ্রের মনে এই ছিল, তিনি সুশ্রী।

কতদূর পদব্রজে গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। দুইজনে গাড়ীতে উঠিলেন। কিন্তু সে গাড়ী বাসা পর্য্যন্ত যায় নাই, তাহা আমরা জানি, আর কিছু বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুষ্টের দমন।

পর দিন সূর্য্য উঠিল। আজি সূর্য্যের নিজের বার, বোধ হয় সেই জন্য অদ্য আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। অন্যান্য দিন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইত, অদ্য তাহা হইল না দেখিয়া সূর্য্যের রাগ হইল। গলির ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণ-দূত আসিয়া গোলদীঘীর ধারে নরেন্দ্রকে পাইল না; উত্তর দিকে রাস্তা পার হইয়া নরেন্দ্রের প্রাঙ্গণেও তাহাকে পাইল না। তখন ছাদের উপর উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিল, নরেন্দ্র খাটের উপর নিদ্রিত। নরেন্দ্রের মুখে রবিকর স্পর্শ হইল। নরেন্দ্রনাথ জাগিলেন। চক্ষু দুটী বড় কঁুচের মত শোভা পাইতে লাগিল। তখন বেলা নয়টা।

নরেন্দ্রনাথ স্নান আহার সমাপন করিলেন। সূর্য্য উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিলেন না, অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আকাশেও কি এ দুর্দ্দশার বারবার আছে।

ক্রমে ক্রমে বেলা ৩টা বাজিল। নরেন্দ্রনাথ ঘরের দক্ষিণ দিকের দ্বার বন্ধ করিলেন। উত্তরদিকের জানালার খড়খড়ি তুলিয়া একবার দেখিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মুখভঙ্গীতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ঘড়ীটা মিলাইবার জন্য বাহির করিলেন; ভালা ভুলিয়া মুখ-বিকৃতি করিলেন। গত কল্য গাটখোলায় এইরূপ তাঁহার বদন-মণ্ডলে কপিভাব জন্মিয়াছিল। ইহার কারণ আছে।

ঘড়ীর কাঁটা শিথিল হইয়া কখন কোন্ খানে থাকিত, তাহার স্থিরতা ছিল

না। তথাপি সেই ঘড়ী দেখিয়া—অথবা সেই ঘড়ীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস করিয়া নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর ভাড়ার হিসাব করিতেন। তাঁহার সংস্কার ছিল, আত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য যখন এত ভাণ করে, এত মিথ্যা কথা বলে, তখন এই নির্জীব পিত্তলময়ী ঘটিকার এইরূপ ব্যবহার হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? অনেকেই—সময়ে সময়ে নরেন্দ্রনাথও—ইহার পাল্টা যুক্তি অবলম্বন করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

ঘড়ীর দম দিয়া অথবা মনকে দম দিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় খড়খড়ি তুলিয়া উত্তর দিকে উঁকি মারিলেন। কিন্তু এ সময়ে ছাদে আসিয়া বসিয়া থাকে, নরেন্দ্র ভিন্ন এমন গরজ কাহারও ছিল না। সংসারের অসারতা ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, নরেন্দ্রনাথ স্বীয় অভ্যাস-মত উত্তরের জানালার নীচে, উত্তরমুখে পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন; এক এক বার নরেন্দ্রের কটাক্ষ-বাণ কাষ্ঠের খড়খড়ির ফাঁক ভেদ করিতে লাগিল। ইহার নিগূঢ় কারণ জানিবেন?

যে বাটীতে নরেন্দ্রের বাস, তাহার ঠিক উত্তরে দেড়হাত এক গলি ব্যবধান, অটোল বাপান্তবাগীশের একতালা বাড়ী; সোণাগাছি, সিদ্ধেশ্বরতলা প্রভৃতি স্থানে বাপান্তবাগীশের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত যজমান ছিল। এই উপলক্ষে হরিদাস ঘোষ ইস্কোয়ার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তাঁহার নিকটেও বিশেষ আদৃত হইতেন ও টাকাটা সিকেটা পাইতেন। বাপান্তবাগীশ, দিনমানে প্রায় যজমানের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, সন্ধ্যার পর যে দিন যেমন, কিছু হাতে করিয়া, আলয়ে আসিতেন। বাটীতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের এক ব্রাহ্মণী, সাত বৎসরের এক কন্যা, সাড়ে সতর বৎসরের একমেটে, ঝুনবা, বড়ীনাকা এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ, আর ছত্রিশ বছরের বেঁটে চুল-কটা চোখ-কটা রং-কটা গোলাকৃতি বামা নাম্নী এক পরিচারিকা।

বামা প্রতিদিন বিছানা রৌদ্রে দিতে ছাদে আসিত, কাপড় মেলিতে এবং তুলিতে ছাদে আসিত, কোন কাজ না থাকিলে সে দিন কেবল ছাদ ঝাঁট দিতে আসিত; আবার সন্ধ্যার পরেই নরেন্দ্রনাথের জানালার পাশে বসিয়া কখন কখন বায়ু ভক্ষণ করিত। বামার দৃঢ় বিশ্বাস, নরেন্দ্র ফাঁদে পা দিয়াছে।

নরেন্দ্র কচি ছেলে নয়, তায় ধর্ম্মজ্ঞান-বিশিষ্ট। সন্ধ্যার পর দাসীকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গের উপদেশ দিতে নরেন্দ্রনাথের ত্রুটী ছিল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে মাছের তেলে মাছ ভাজিবার একটু মতলব ফল্গুনদীর মত তাঁহার হৃদয় মধ্যে নিয়ত প্রবাহিত ছিল। নরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন,—যে দাসী, সে সহায়-সম্পত্তি-বিহীনা, তাহার ব্রাহ্মিকা হইলেই কি আর না হইলেই কি? তবে পৃথিবীশুদ্ধ যদি হয়, তবে প্রকৃত মঙ্গল বটে। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন তাঁহার উপদেশের প্রকৃত পাত্রী স্বতন্ত্র, যথা, বাপান্তবাগীশের ভ্রাতৃবধূ।

পুস্তক-হস্তে, ছাদ-পৃষ্ঠে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন। বামা ছাদের কাপড় শুকাইল কি না, দেখিবার জন্য রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে নরেন্দ্রের জানালার নিকট আসিয়া আলিসার উপর বসিল। নরেন্দ্রনাথের উপদেশ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ পরে ভ্রাতৃ-বধূও আসিয়া উপস্থিত। দাসীর নিকটে তিনিও উপদেশ শুনিতে বসিলেন। "মনুষ্য-মাত্রেই ভাই এবং—এবং ভগিনী—এবং আপন পর ভেদ রাখা মহাপাপ; তুমি আমার, আমি তোমার," ভ্রাতৃবধূর মুখপানে খড়-খড়ির ভিতর দিয়া অতি মৃদুস্বরে শান্তভাবে নরেন্দ্রনাথ এই প্রকার উপদেশ বর্ষণ করিতেছিল; এমন সময়ে নেপথ্যে "বামা হেথায় আয় না, কাপড় তুলতে ক' দিন লাগে?" ইত্যাকার ধ্বনি হইল। বাপান্তবাগীশের ব্রাহ্মণী ডাকিয়াছেন, সুতরাং মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে ব্যস্ত হইয়া বামাকে উঠিয়া যাইতে হইল। দুই জনের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের স্বর্গীয় সুখ জন্মিয়াছিল। উঠিয়া যাইতে হইল বলিয়া বামার মনের সুখ সরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে যোগ দিল। ভ্রাতৃবধূকে একলা পাইয়া নরেন্দ্রনাথ আত্মপর-রহিতের উপদেশ গাঢ় করিয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাপান্তবাগীশের কন্যা আসিয়া "কাকী, মা যে ডাকৃছে"। নরেন্দ্রনাথের দ্বারেও আঘাত হইল। দ্বার খুলিবামাত্র, রামদাসের প্রবেশ। রামদাস গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বাবু শুনেছি, শুনেছি। আপনাদের এই কাজ! ছি!" অন্যত্রে যিনি যাহা করুন, তাহাতে রামদাসের লাভের সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্যে নয়। রামকমল ডাক্তার ও রাজা গোলোকেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া রামদাস "মাই ডিয়ার লক্কা পায়রা"কে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিল। ভ্রাতৃবধূর অন্তর্দ্ধান অল্প অল্প দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রামদাস সে বিষয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিল না। নরেন্দ্রনাথের নিকট বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু "আজি সমাজে যাইতে হইবে" বলিয়া নরেন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামদাস অগত্যা ফিরিয়া গেল, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত দমনের পন্থা না করিয়া গেল না।

বাসায় ফিরিয়া যাইবার সময়, রামদাস বাপান্তবাগীশের বাটী হইয়া গেল। বাপান্তবাগীশের জন্য অপেক্ষা করিয়া তাঁহার বাটীতে বসিয়া থাকিল। ভট্টাচার্য্য বাটী আসিলে ইঙ্গিতে তাঁহাকে কিছু বলিল। অগ্নিশর্ম্মা বাপান্তবাগীশ রামদাসের কথা শুনিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। "শুওটা জানে না—এত বড় স্পর্দ্ধা—সর্প-মস্তকে হাত, হরিদাস বাবুকে বলে দিয়ে শুওটার সর্ব্বনাশ করব, জানে না, শুওটা পাপিষ্ঠ নরাধম। একি অন্য কারুকে পেয়েছে?" বলিতে বলিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ব্রাহ্মণী আগুন খাইয়া বসিয়া আছেন; মুখে ঝড় বহিতেছে। কন্যার মুখে ব্রাহ্মণী এ কথা শুনিয়াছেন জানিতে পারিয়া বাপান্তবাগীশ অধৈর্য্য হইলেন। বামা বলিল "আমরা কারুকে ত কিছু বলিনি—এতে যদি এই হয়, নয় ছাদে যাব না।" জড়িত

অঙ্গারের রাশিতে জল ঢালিয়া দিলে যেমন হয়, সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া বাপান্তবাগীশ বলিলেন, "পাষণ্ডি! তাম্বুল-করঙ্কবাহিনি। তুই গুওটি এ পাপের মূল। যথাশাস্ত্র তোর দণ্ডবিধান না করিয়া কল্য যদি জলগ্রহণ করি, তবে আমার দশম পুরুষ যেন নরকস্থ হয়।" তৎকালের জন্য অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। তথাপি ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল। স্থিরভাবে বাপান্তবাগীশ এক সঙ্কল্প করিলেন; মস্তিষ্ক-বহিষ্কর একগাছি লাঠির সংযোগ করিয়া শয়নগৃহের এক কোণে রাখিয়া দিলেন।

নরেন্দ্রনাথ যথাকালে সমাজে গেলেন। যখন বক্তৃতা হয়, তখন আমাদের দেশের দুর্দ্দশা, স্ত্রীগণের অধীনতাই যাহার দেদীপ্যমান সাক্ষী স্বরূপ—এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সমাজের কার্য্য শেষ হইল। তখন আর কয়েকটি ভ্রাতা, "কৃষ্ণমোহন লাহিড়ীর বন্ধু সমাজগৃহ হইতে বাটী যাইতেছেন, সপ্তাহ কাল আর এখানে আসিবেন না," এই মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন; এবং ডাইনে বামে কে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। যিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, তিনি দরজার পাশ থেকে কি একটা কাপড়ের ভিতর ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাটী আসিলেন। তাঁহার সেই দিনকার ভাব দেখিয়া অনেকে বলিয়াছিল, তিনি শীঘ্র উপাচার্য্য হইবেন।

বাপান্তবাগীশ নরেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা করিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। তাঁহার তন্দ্রা আসিলে পর ব্রাহ্মণী একবার বাহিরে যান। যেমন ফিরিয়া আসিতেছেন, বাপান্তবাগীশ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং ঘরের কোণ হইতে লাঠি লইয়া বিক্রমের সহিত এক আঘাত বসাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণীর গায়ে আঘাত না লাগিয়া ব্রাহ্মণীর চুড়ির উপর দিয়া গেল। "গুওটা মাতাল, বোতল হাতে করে আমার বাড়ী! একি অন্য কারুকে পেয়েছ, গুওটা পাষণ্ড নরাধম," বলিতেছেন, এমন সময়ে বাপান্তবাগীশের জ্ঞান হইল যে, তাঁহার ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, নরেন্দ্র নহে। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণীর মোহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু বাপান্তবাগীশ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "নরেন্দ্র কেন, নরেন্দ্রের চৌদ্দপুরুষ আসিলেও আর গায়ে হাত দিব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

শ্রীরামচন্দ্র যখন হনুমানকে মুক্তার হার প্রদান করেন, তখন মর্কটবর তাহার সমুচিত আদর না করিয়া ফেলিয়া দেন। বিভীষণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন যে, বানরে হারের মূল্য কি বুঝিবে? হনুমান্ উত্তর দিলেন, যাহাতে রাম নাম নাই, তাহা আমার গ্রাহ্য নহে। বিভীষণ প্রত্যুত্তরে বলেন "তবে শরীর কেন ধারণ কর, তাহাতে ত রাম নাম নাই?" হনুমান ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় বক্ষ বিদারণ করিয়া, দেখাইল যে, তাঁহার হৃদয়মধ্যে রাম নামের অভাব নাই।

গ্রন্থ-লেখকগণ এক পক্ষে হনুমানের তুল্য। কাজের কথা ভিন্ন আমরা অন্য কিছু গ্রহণ করি না। অনেক পাঠক মনে করেন, গ্রন্থমধ্যে অমুক কথাটা থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু সে বিষয় আমরা বেশী বুঝি বলিয়া উপরি লিখিত উপন্যাসটী তাঁহাদের নিকট বলিতে হইল। উপমান্ উপমেয় বিষয়ে আমরা যেরূপ সতর্ক, তাহাতে প্রত্যাশা রাখি, পাঠক মহাশয়েরা আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না।

আর এক পক্ষ, গ্রন্থকর্ত্তারা শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ, পাঠকবর্গ "মা যশোদা"। কারণ শ্রীকৃষ্ণের উদরে (কিম্বা মুখ—আমাদের বিশেষ স্মরণ নাই) যশোদা ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন। আমরা যতক্ষণ মুখ ব্যাদান না করি, ততক্ষণ পাঠকগণ কিছুই টের পান না। শুদ্ধ পাঠকগণ কেন, অটোল বাপান্তবাগীশের বাটীতে রাত্রিতে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আমাদের ঘরের লোক নরেন্দ্রনাথও তাহা জানিতে পারেন নাই।

প্রভাতে উঠিয়া নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, বাপান্তবাগীশের ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ। বেলা হইল, তবু দরজা যেমন তেমনি থাকিল। নরেন্দ্রনাথ কেবল বিয়ৎকালের জন্য দরজার ভিতর দিকে ঠক্ঠক্ শব্দ শুনিলেন; কিন্তু জানিতে পারিলেন না যে, বাপান্ত-বাগীশ ভিতর থেকে পেরেক্ মারিয়া জন্মের মত দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর সকলকে ছাদের উপর উঠিতে বিশেষরূপ নিষেধ করিয়াও অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উক্তরূপ কার্য্য করিলেন।

সেই দিন বিকালে, রামদাস, বাপান্তবাগীশের বাটী আসিল। এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আকর্ণবিশ্রান্ত মুখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন মশায়! যা বলেছিলাম, তা হয়েছে কি না? কালেজের ছোঁড়াগুলাকে একটুও বিশ্বাস করিবেন না। ওটা আবার বয়াটের সর্দ্দার—ব্রহ্ম সভায়—।

রামদাসের কথা শেষ হইতে না হইতে ব্রাহ্মণ উগ্রচণ্ডা হইয়া উঠিল; বলিল,

"গুণ্ডটা নরাধম, পাষণ্ড, দানব-দলন; অকাল-কুষ্মাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, বেটা পাজি।—তোমার ঠাকুর কুকুর সমান, গুণ্ডটা মাতাল?—আমার সঙ্গে বিদ্রূপ—আমাকে অকথ্য কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ?—হরিদাস বাবুকে বলে দিয়ে তোর সর্ব্বনাশ করব, জানিস্ নে গুণ্ডটা দোর্দ্দণ্ড! একি অস্ত কারুকে পেয়েছ?—প্রলাপ বাক্য ব'লে আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত?—গুণ্ডটা মহিষাসুর—তোর কথায় তো কাল সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলাম। বেরো গুণ্ডটা বেরো—এখন বেরো। এক দণ্ড যদি তিষ্ঠিবি, তবে ভস্ম করব, গুণ্ডটা জাননা?" কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বাপান্তবাগীশ ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। বাপান্তবাগীশের রাগ হইলেই কাপড় খুলিয়া যাইত, নচেৎ অদ্য রামদাসকে ধনঞ্জয় দেখাইতেন।

বেগতিক দেখিয়া, দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া, রামদাস সরিয়া পড়িল। এরূপ ব্যবহার রামদাসের অভ্যাস্ত ছিল সুতরাং বাপান্তবাগীশের বাড়ী হইতে সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, এ সমস্ত কথাই রামদাসের মন হইতে সরিয়া গেল।

রামদাস নরেন্দ্রনাথের বাসায় উপস্থিত হইল। নরেন্দ্র পুস্তক সম্মুখে, দক্ষিণ হাঁটুর উপর দক্ষিণ গাল রাখিয়া বাপান্তবাগীশের সিঁড়ির দরজার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। রামদাসের হুহুঙ্কারে তাঁহার চৈতন্য হইল।

রামদাস। বাবু, তোমরা "মাইণ্ডিনারি" লোক, তা বলে আমাদের ঘৃণা করিবেন না। কটাক্ষ রাখতে হয়, অধীন ব'লে মনে করিতে হয়, পায়ে ঠেলতে নাই। রামকমল ডাক্তার বলেন, দশ ইয়ারের মজাই মজা। এসেছ এসেছ, দুদিন মজা কর। লক্কা পায়রার মত ঘুরে বেড়াও—মাছের জলপিপি খাও, আর রং দাও, রং দাও। হায় হায় হায়।" শেষোক্ত শব্দ কয়টী রামদাস প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসিত, এবং বিশেষ ঘন করিয়া উচ্চারণ করিত। তাহার সংস্কার ছিল, এরূপ করিলেই রসিকতা হয়; অন্ততঃ মানুষ মাটী হয়। অনেকস্থলে কাজেও তাহাই ঘটিত।

নরেন্দ্রনাথ রামদাসের নিকট মুখ পাইতে পারিলেন না; তাঁহাকে মনে দুঃখ। উপদেশ দ্বারা সংসারের উন্নতি করিবেন, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আত্ম-ক্ষতিও স্বীকার করিলেন, নরেন্দ্রের অন্তঃকরণে—এইরূপ শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কিন্তু সকলেই (তাঁহার) সমান জ্ঞানবিশিষ্ট নয়, এই সান্ত্বনা মনে ধারণ করিলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামদাসের ভ্রমণ করিতে যাইবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পঁচিশ টাকা পুঁজি ছিল, রামদাসের কথায় তাহার পনর টাকা সঙ্গে লইলেন। বাহিরে গেলেন। বিধাতার পার্থিব সহকারী পাচক ঠাকুরকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার নিমন্ত্রণ আছে, রাত্রে বাসায় আসিবেন না।

পর দিনও পূর্ব্ববৎ গেল। সমস্ত দিনমান বাপান্তবাগীশের দ্বার খুলিল না। তখন শোকভরে (জানালার গরাদের ভিতর দিয়া যত দূর সম্ভব) নরেন্দ্রনাথের সে

মুখচন্দ্র খুলিয়া পড়িল। দৃষ্টি, গলির ভিতর পড়িয়া গেল। যাহা পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহা দেখিতে পাইলেন; আনন্দে মুখ তুলিলেন। মুখ ঈষৎ বিকৃত হইল, গাল-দুখানি সহজ অপেক্ষা ঈষৎ উচ্চ হইল। উপর পাটীর সম্মুখে গুটিকতক দাঁতের মধ্যে স্থল দেখা গেল। এই সকল দেখা গেল কিন্তু কেবল গ্রন্থকর্ত্তাই দেখিলেন, আর কেহ দেখিতে পাইল না। নরেন্দ্রনাথ মনে মনে একটী সঙ্কল্প করিলেন।

রাত্রিতে আহারের পর নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য দিন অপেক্ষা চারিটা পান বেশী খাই-লেন; আর্শী লইয়া চুল ফিরাইলেন; গরণেটের চায়না-কে টটা গায় দিলেন। তাহার উপর কাশ্মীরার চাদরে মোহন মূর্ত্তি আবরিত করিলেন। আবার পান খাইলেন, রুমালে ঠোঁটের কোণ মুছিলেন, আবার আর্শীতে মুখ দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দুই প্রহর হইল। অবৈধ সমাজিক নিয়মে বিধবাকে—অবলাকে কষ্ট দিবে, ইহা অসহ্য বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইলেন।

আবার ফিরিলেন। নরেন্দ্র মনে করিলেন, যখন সংসারের উপকার-ব্রতে ব্রতী হই-লাম, তখন আত্মত্যাগ স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দশ টাকা অবশেষ ছিল, তাহা লইয়া বাহির হইলেন। "আমার যাহা আছে, হে প্রেয়সি, সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমাকে তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক—তোমার উপস্থিত দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিব। আমার ধন যাউক, মান যাউক, শীল যাউক, বন্ধু যাউক, স্বজন যাউক, আমি নিশ্চিত তোমার উদ্ধার করিব। ধর্ম্মের জন্য কত মহাত্মা দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমি এই সামান্য ত্যাগস্বীকার করিতে পারিব না?"—এই সংকল্প দৃঢ় করিয়া নরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

সদর রাস্তার দিকে বাপান্তবাগীশের বাটীর পার্শ্বে গলির মুখ খোলা। সেই গলির ভিতর দিয়া যাইতে পারিলে, বাপান্তবাগীশের বাটীর একটী ছোট দরজার নিকট যাওয়া যায়। সে দ্বার দিয়া বাটীর ভিতর যাওয়া যাবে কি না, নরেন্দ্র এ প্রশ্ন করিলেন না। দ্বার অত্যন্ত ছোট বলিতে হইবে, তাহার মধ্যে নরেন্দ্রের তনু প্রবেশ করিবে কি না, এ প্রশ্নও তাঁহার মানস স্রোতের বাধা জন্মাইল না। নরেন্দ্রনাথ নিজ গৃহ হইতে এই দ্বার দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই দ্বার দেখিয়াই তিনি আনন্দে হাসিয়াছিলেন।

সাহসে ভর করিয়া, গলির মুখে ইতস্তত দৃষ্টি করিয়া নরেন্দ্রনাথ গলির ভিতর, সেই দ্বারোদ্দেশে—তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সেই সোপান উদ্দেশে—সেই ধর্ম্মব্রত-প্রতিপালন উদ্দেশে—আত্ম বিসর্জ্জন দিলেন। কতকদূর গিয়া সোজা হাঁটিয়া যাওয়া কষ্টকর হইল। আহা! মূর্খ স্থপতি, তুমি যদি পূর্ব্বে জানিতে, তাহা হইলে কখনই এমন মূর্খত্ব করিতে না। অথবা তোমারই বা দোষ কি? ধর্ম্মের পথে যদি সুখই থাকিবে, তবে জগতে অধার্ম্মিকের দশা কি হইবে?

নরেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিলেন; তাহাতেও গায়ের কাপড় দেওয়ালে

ঘর্ষণ হইতে লাগিল। আর একটু হইলেই উদ্দিষ্ট দ্বারে পঁহুছিতে পারেন, কিন্তু অনুভবে বুঝিলেন যে, নর্দ্দমার উপরিস্থ আচ্ছাদন কাষ্ঠের উপর দিয়া তিনি হাঁটিতেছেন। সতর্কে চলিতে লাগিলেন, ভারি করিয়া পা ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। জীর্ণ কাষ্ঠ মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ চরণ পঙ্কে নিমগ্ন হইল। নরেন্দ্র ভয়ে ওঁ আঁ করিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাপান্তবাগীশ এত রাত্রিতে কি জানি কেন উঠিয়াছিলেন,—"কে রে? ভওটা চোর বুঝি; ধর ভওটাকে; ধর বেটাকে" শব্দ করিয়া উঠিলেন। নরেন্দ্র হাঁশফাঁশ করিয়া পলাইতে লাগিলেন। যখন দক্ষিণপদে ষ্টাকিঙের উপর জুতার পরিবর্ত্তে কর্দ্দম লইয়া নরেন্দ্র দৌড়িয়া পলাইতেছিলেন, তখন বাপান্তবাগীশ প্রদীপ লইয়া গলির মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রকে দেখিয়া, তাঁহাকে চেনা দূরে থাকুক, বাপান্তবাগীশের হস্তের প্রদীপ পড়িয়া গেল এবং "রাম। রাম! ত্রাহি ত্রাহি!" করিতে করিতে তিনিই পলাইয়া গেলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা হইল, ভট্টাচার্য্য চিনিয়াছে। তিনি বাসার দিকে না ফিরিয়া উত্তরমুখে এক পায় জুতা লইয়া দৌড়িলেন। কতক দূর গিয়া জুতা ও ষ্টাকিং ফেলিয়া দিলেন, পরে পশ্চিমমুখে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"উথলিল শোক-পারাবার।"

৺বিশ্বনাথ ঘটকের স্বর্গীয় পিতাঠাকুর রাণাঘাটে বাস করিতেন। যুবা বয়সে একটু মন্দ অভ্যাস হওয়ার দোষে, তাঁহার পিতা থানার মুন্সীগিরি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সমস্তই অল্পে অল্পে শেষ হইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ঋণ পাওয়াতে অভ্যাস প্রবল হইল। পরিশেষে ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা তিনি মহাজনের লেখার অনুকরণ করেন। কিন্তু বিচারালয়ের ভ্রম-প্রযুক্ত তাঁহার চরিত্রে অন্যায় সন্দেহ আরোপিত হওয়াতে তাঁহার ঘৃণায় জম্বুদ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে হয়। দ্বীপান্তরে দশ বৎসরকাল বাস করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন রাণাঘাটের দুশ্চরিত্রদিগের সংবাসে থাকা লজ্জাকর জ্ঞান করিয়া তিনি অগ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন। কিছুদিন পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন বিশ্বনাথের বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। শঙ্করী নামে বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী চিরবিধবা সুতরাং তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল।

বিশ্বনাথ, বাল্যকালে পিতৃবিরহ প্রযুক্ত সরস্বতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করেন নাই; সুতরাং পিতার কাশীগমনের পর উপায়-হীন হইয়া একজন বাসনের মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাসনের দোকানে মাসিক তিন টাকা বেতন হইল এবং মস্তকে বাসন লইয়া পাড়া করিতেন। এ অবস্থায় কিছু ক্লেশ বোধ হওয়াতে তিনি চারি বৎসর পরে নিজের উপার্জ্জিত পাঁচ শত টাকা লইয়া স্বয়ং বাসনের কারবার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বিবাহাদি হইল; এবং কালক্রমে দুই পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠের নাম মধুসূদন, কনিষ্ঠ, আমাদের পরিচিত নরেন্দ্রনাথ। বিশ্বনাথ, বিদ্যায় একপ্রকার বঞ্চিত ছিলেন, সুতরাং পুত্রদ্বয় তাঁহার মত না হয়, এই অভিপ্রায়ে উভয়কেই গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন! শেষে কারবার বাড়াইবার ইচ্ছা করিয়া কলিকাতা যান; তথা হইতে বহুতর বাসন (কিছু নগদ—অবশিষ্ট ধারে) নৌকাযোগে আনিবার সময় ঝড়ের সাহায্যে বিশ্বনাথ, বাসন, নৌকা, ধার, নগদ সমস্তই এককালে ভাগীরথীর উদরে জীর্ণ হইয়া গেল।

বিশ্বনাথের জলপথে পরলোক যাত্রার সংবাদ পাইয়া, মধুসূদন কিছু কাতর হইলেন। এবং সংসারের—অর্থাৎ পিসীর এবং কনিষ্ঠের ভার তাঁহার উপর পড়িল দেখিয়া বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলেন, এবং সামান্য গোছের একটী চটের দোকান করিয়া সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন।

মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফরির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারম্বার "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়" বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতি-বার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে, অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একেবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুইমাস আড়াই মাস অন্তর নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজ দেহের কুশল লিখিতেন। একবার বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই. বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপে জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ

হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন

"একে পিসী, তায় বয়সে বড়", সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহি পাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের "পরমারাধ্য পরমপূজনীয়" পিতামহের চির রথবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের "ভাই নরেন্দ্র" বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার "নরেন" ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির স্নেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের "নরেনের" পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন, পিসীমার অনুরোধে তাহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে, অগ্রহায়ন মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাক ঝাড়াতে উঠান্ সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশে গিয়াছেন, সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

এক দিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি-মুখ ভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। বেলা সাড়া হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের জন্য তেলের বাটী গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বাম হস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ায় একটী স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। "ঠাকুরের নরেন্দ্র কালরাত্রে বাড়ী এসেছিল," সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে,

তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে;" যাহাকে দেখে, এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পঁহছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে, "অমন ছেলে হয় না, হবে না।" ইহারই মধ্যে কেহ আর একজনের নিকট "সুদের পয়সা কটা" চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন পিসীর দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা একদিকে একভাবে বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈলক্ষণ্য নাই। অল্পবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, "বেটী ব'সে কাঁদছে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চড়কা ঘুরছে"।

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটী একটি কথা কহিতে লাগিলেন।

"আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে। এমন ছেলে কি কারও হয়। তাই মরেছে, মরেছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে"—পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার করিলেন; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল;—"নরেন্ আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন্, তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না; এখন আমি কোথায় যাই?"

নানা ছাদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন; কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল, "যা হয়েছে, তা ফেরবার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল; কাঁদলে কি হবে? গুন্লে কবে? এ দারুণ কথা ব'ল্লে কে, কেমন ক'রেই বা বল্লে?"

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ষাট্! ষাট্; বুড়ীর দাদ আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই, তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, এ কথা তখন জানিতে পারিয়া দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

"নিজের ভাল দেখিলে, মন্দ হয়" তাহাতেই পিসীর এক শোক দুন উপস্থিত

হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে, মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাট-হস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসী মা বলিলেন; "জাত যা'ক্, তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস"। নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল, অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ গুণ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ গুণ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল। আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা।"

এদিকে পিসীর রোদন, তাহাতে নিজের মনের টান, মধুসূদন সহোদরের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটী হইতে একাকী বিদেশ যাওয়া কিরূপে হইতে পারে? গ্রামে এমন কোন উপযুক্ত কি সাহসী লোক নাই যে, মধুসূদন তাহাকে সঙ্গে লন; তবে উপায় কি? ভ্রাতার অনুসন্ধান না করিলেও নয়।

আহার করিতে বসিয়া মধুসূদন এই প্রকার ভাবনা করিতে লাগিলেন। সেদিন ব্যঞ্জনের সুবিধা ছিল না। কিন্তু মনের দুর্ভাবনায় সে বিষয়ে ভাবে কে? মধুসূদন ভ্রাতৃচিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া অগত্যা দুই বারের অন্ন একাসনেই উদরগত করিয়া ফেলিলেন। তথাপি তিনি যে আহার করিলেন, এরূপ তাঁহার বোধ হইল না। হায়! এমন সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা যদি কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!

সুখ যেমন চিরদিন থাকে না, দুঃখও সেইরূপ। যদি উপর্য্যুপরি ছয় মাস দিন হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস কাল রাত্রিও হইবে। এখন যে স্থানে রৌদ্র, সময়ান্তরে সেখানে অবশ্যই ছায়া হইবে। অদ্য যে ঘরে আগুন লাগিল, একদিন না একদিন, অবশ্যই তাহার উপর বৃষ্টিপাত হইবে। ফলতঃ সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন আছে। কল্প পত্রের লেখা পড়িতে পড়িতে আমার মুখের জল শুষ্ক হইয়া মুখে ধূলি উড়িতেছিল

বলিলেই হয়, আজি আবার আমিই গ্রন্থকার—মহারাজ চক্রবর্ত্তী ; "পাঠক !" "পাঠক !" করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কাণ ঝালা পালা করিতেছি, কাহারও কথাটী কহিবার যো নাই। অবস্থাপরিবর্ত্তনের এতদপেক্ষা সাধুতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

মধুসূদন আহার সমাপন করিয়া তিন ছিলিম তামাক মাটী করিলেন, তথাপি ভাবনার কূল পান না। এমতকালে, শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র রায় আসিয়া উপস্থিত। হাবুডুবু খাইতে খাইতে পদ্মার জলে ভাসিয়া যাইবার সময় তুলার বস্তা পাইলে যেমন সুখ, অন্ধকার গলি-রাস্তার ভিতর, লণ্ঠন হস্তে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গ পাইলে যেমন সুখ ; নিদ্রিত গৃহস্থের দ্বার অনর্গল পাইলে, চোরের যেমন সুখ ; মালিনীর সহিত আলাপ হইলে সুন্দরের যেমন সুখ, বাড়ীর সম্মুখে শুঁড়ির দোকান প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাতালের যেমন সুখ ; এবং পরের ব্যয়ে পুস্তক প্রচারিত হইতে পারিবে, ইহা শুনিতে পাইলে গ্রন্থকারবিশেষের যেমন সুখ, গবেশ রায়কে পাইয়া মধুসূদনের তদপেক্ষাও অধিক সুখ হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আবশ্যক হইলে গবেশ রায় যমপুরেরও বার্ত্তা আনিয়া দিতে পারেন।

বাস্তবিক গবেশ রায় যে একজন অসমসাহসিক লোক, ইহা তদীয় মূর্ত্তিদর্শনেই প্রতীয়মান হয়। মস্তকের কেশ হৃষ্টপুষ্ট, যেন যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত, কোন রকমে শুকর-কেশর-সম্মার্জ্জনীর শাসনে অল্প প্রতিনিবৃত্ত। চক্ষু দুটী প্রকাণ্ড, যেন পান্‌সী নৌকার পিতলের চোক। কাণের পরিবর্ত্তে, যেন দুর্গাপ্রতিমার হস্তস্থিত পিতলের ঢাল কাড়িয়া লইয়া দু আধখান করিয়া মস্তকের দুই ধারে বসাইয়া রাখিয়াছে। গালের মাংস সরিয়া গিয়া নাকে যোগ দিয়াছে, সুতরাং নাকটি যেন চিতল মাছের পিঠ। গোঁপের নীচে দাঁত, দাঁতের নীচে চিবুক। ঠোঁট ভিতরে ভিতরে আছে, কিন্তু দেখা যায় না। গণ্ডার-চর্ম্মী গবেশের দেহে অস্থি থাকাতে শরীর যেন ঢেউখেলান। বর্ণ পিতলের মত। গবেশ রায় না বেঁটে, না লম্বা।

কালাপেড়ে ধুতি-পরা নিমুর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং হাতের অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত আবৃত ; পান চিবাইতে চিবাইতে গবেশ রায় মধুসূদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তামাক খাইতে খাইতে গবেশ আপনা হইতেই বলিল, "এর জন্য ভাবনাটা কি ? কচি ছেলে নয় যে কেউ হাতের বালা কেড়ে নেবে। তবে এত দিন খবর পাও নাই, এই কথা ; কিন্তু তার স্বভাব ত জানই। কল-কাতা সহর, কোথায় কোন বয়াটের দলে ভর্ত্তি হয়েছে আর কি ? যদি তোমার এতই ভাবনা হইয়া থাকে, আমায় বল্লেই হ'ল যেখানেই থাকুক, খুঁজলে বেরোবেই বেরোবে।"

মধুসূদন। যাই হউক, একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; কিন্তু জানই ত, সে বিষয়ে তুমিই আমার ভরসা। একা যেতে পারিব না, তাই তোমার প্রতীক্ষায় ভাবছি

কাকের মত বসেছিলাম। বলি, গবেশ বাড়ী এলে, অবশুই আমার এ উপকার করিবে। তুমি পৌঁছিলে কখন?

গবেশ রায় স্বর গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "এই মাত্র বাড়ী এসেই মামার কাছে শুনিলাম, নরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ না পেয়ে, তোমরা বড় চিন্তিত আছ, আর পিসী আজকে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র করেছে। অমনি, এলাম, বলি দেখি আসি।" প্রকৃত-পক্ষে গবেশ রায় বাটী পৌঁছিয়াই এ কথা শুনিতে পান; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের নিকট না আসিয়া স্নান আহার সমাপনান্তে, একটু যৎসামান্য নিদ্রার পরেই এখানে উপস্থিত হইতে যে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল, এই মাত্র।

গবেশচন্দ্রের পিত্রালয় বনবিষ্ণুপুর। অতি শিশুকালে তাঁহার পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়াতে মাতুলালয়ে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ছেলে বেলায় গবেশের যাহাতে সাধ হইত, ইঁহার মাতুলেরা তৎক্ষণাৎ তাহাই দিতেন। গবেশ যখন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিবেন, সেই সময়ে গুরুমহাশয় একদিন তাঁহাকে প্রহার করাতে, মাতুলগণ গবেশকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লন। সুতরাং গবেশ-চন্দ্রের সরস্বতী "পাতা" ছাড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের সহিত তিন চারি দিন ক্রমাগত আলাপ হওয়াতে গবেশচন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের সরস্বতীকে জয় করিলেন। ইংরাজী ইংরাজদের বিদ্যা, এই পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ করিয়াই সেক্সপিওরের লেখার গুণাগুণ বিচার; দুই বার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বলে কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া গবেশ-চন্দ্র হঠাৎ একজন দুর্দ্দান্ত "ভদ্র" লোক হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ যেমনই কেন প্রসঙ্গ উপস্থিত হউক না, গবেশের তাহাতে কিছু না কিছু বক্তব্য থাকিবেই। একে বাল্য-কালের আদুরে ছেলে, তাহাতে এইরূপ ভদ্রলোক হইয়া উঠাতে, গৃহে অন্নাভাব সত্ত্বেও শ্রমকাতরতা, ধোপার পয়সা সংস্থানের ক্ষমতা না থাকিলেও মলিন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মোটা বস্ত্রাদির উপর ঘৃণা, ইতর লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার পক্ষ যারা গু ড়ির সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বাঙ্গালী-ভদ্রের সমস্ত অঙ্গগুলিই তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

গবেশচন্দ্র কেবল ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য মধুসূদনের নিকট গিয়া-ছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের অনুনয় বিনয় দেখিয়া তাঁহাকে অগত্যা বিরক্ত হইতে হইল। বলিলেন, "এক্ষণ তোমাদের ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কোন কাজের নয়। দুদিন গেলেই সারিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে ভয়ঙ্কর রৌদ্র, আজি কালি বাড়ীর বাহির হওয়াই দুষ্কর।" নাটক অভিনয়ের একটী দল হইবে শুনিয়া এই রৌদ্রে গবেশচন্দ্র কালনায় গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়াছেন, একথা তিনি মনে করিলেন না। মনে করিলেও, এখন দুই এক দিন পুনরায় পথ হাঁটিতে কষ্ট হইবে,

এরূপ অলীক আপত্তি করা তাঁহার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না। এইজন্যই রৌদ্রের ওজর করিলেন।

মধুসূদন নিরুপায়! মুখের কথায় যদি কাজ হইত, তবে গবেশের সাধ্যপক্ষে ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিধির বিপাকে উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হইতে পারে না; মধু-সূদন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে অন্য উপায়ের অভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। তামাকের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল; উপকার করিতে পারিবেন না মনে করিয়া গবেশচন্দ্র দুঃখিতহৃদয়ে একখানি আসনের উপর বসিয়া থাকিলেন।

উভয়ে নীরব; কিন্তু বাক্য-বিষয়ে কৃপণতা মানুষ মাত্রেরই হয় না, বিশেষতঃ গবেশের মত মানুষের। অতএব গবেশ কিয়ৎক্ষণ পরে একটা পান চাহিয়া শান্তি ভঙ্গ করিলেন। মধুসূদন ভাবিবার বিষয় পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। গবেশ যাইতে স্বীকার না করাতে তাঁহার চিত্ত আলকাৎরার ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সেই গবেশ আবার পান চাহিল, ইহাতে তাঁহার মনে যেন ঝাড়ের আলো হইল। "পান? শুধু পান? কেন, জল খাবে না?" মহাব্যস্তে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন। গবেশ বাধিত হইলেন। "খেলেই হল" বলিয়া মধুসূদনকে অনুগৃহীত করিলেন। এ সংসারে কত জন যে এইরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, গত লোক-সংখ্যাতে তাহার কি কোন নিদর্শন আছে? না থাকিলে, থাকা উচিত।

মধুসূদনের সুপারিস মত পিসীমা জলখাবার আনিয়া দিলেন। যেই গবেশের সম্মুখে আসিয়াছেন, অমনি পিসীর নয়ন-সমুদ্রের লবণাম্বু দু ফোটা জলাধারে পড়িল। ভাগ্যে গবেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না! পিসী খাদ্যসামগ্রী ভূমিতে রাখিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

"আহা বাছা আমার কোন দৈবে পড়েছে! তা না হ'লে কি এমন হয়? নরেনের সকল এক দিক্, আমি এক দিক্। সে কি অভাগীকে সাধ ক'রে দুঃখ দেবে? ওরে মধু, বাবা তুই যা, আমার নরেনকে এনে দে। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না, নইলে আমার কি সাধ আর বাঁচতে! বাবা গবেশ! তুমি নয় একটু দুঃখ সও, আমার আঁধারের মাণিক এনে দাও। গবেশ বড় ভাল ছেলে, গবেশ কি আমার কষ্ট চেয়ে দেখবি না? বাপ আমার, তুমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেখেছ, এ তোমারই কাজ। তুমি সেদিনকার ছেলে, তবু এই বয়সে কত দেশ দেখ্‌লে, একবার কল্‌কাতা দেখেছ, দু বার কালনা দেখলে, কাটোয়া ত হাতের মুটে! এ তোমারই কাজ। আমার মাথা খাও, আমার কথা রাখ। যদি পয়সা থাকত, পাত্রী ক'রে দিতাম। তা কোথা পাব? আমার মরা মুখ দেখ, মধুর সঙ্গে যাও, তুমি যা নেবে, মধু তোমায় তাই দেবে, নরেন্দ্রের দেখা পেলেই তারে নিয়ে বাড়ী ফিরে এস তাকে আমি কিছু মনে করব না, তুমি আমার প্রাণদান দাও।"

ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়শাস্ত্র একত্র করিয়া তুলাদণ্ডের একদিকে রাখিলে যত ভারী হয়, গবেশের চক্ষে "তুমি যা চাবে, মধু তাই দেবে,"—পিসীর এই যুক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক ভারী বোধ হইল। গবেশ ভাবিল, "এমন অবস্থায় পরের উপকার করা নিতান্তই আবশ্যক। বিশেষ, যখন কলিকাতা যাইতে হইবে, তখন এমন সুযোগ ছাড়া যাইতে পারে না, পরের ব্যয়ে দুদিন পেট ভরিয়া ইয়ারকি দিতে পারিলে মন্দ কি? সেখানে আবার দশজন ভদ্রলোক আছে। এ পাড়াগাঁয় কেবল গাছ, আর ধুলো। আর গরু, মানুষত নাই। পথে একটু কষ্ট হইল হইলই। যাব", মনে করিয়া গবেশ সম্মত হইলেন; বলিলেন, "তুমি (অর্থাৎ পিসীমা) যখন বলিতেছ, তখন আমার আপত্তি করা সাজে না। মধু, তুমি নেহাত ভ্যাবা গঙ্গারাম, এই কলিকাতায় যেতে তোমার সাহস নাই; তুমি ক'রে খাবে কিসে, আমিত বুঝতে পারি না। এই সারগর্ভ উপদেশ কটাক্ষের সহিত মধুকে দিয়া, গবেশচন্দ্র "পরশু" যাইবেন স্থির করিলেন।

উভয়ে বাটী হইতে নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে বাহির হইলেন, কতদূরে গিয়া গবেশ বলিলেন, "আমার সকালে কিছু খাওয়া অভ্যাস আছে।" মধুসূদন, যাহা পাইলেন, কিনিয়া দিলেন। বেলা দশটার সময়ে উভয়ে এক চটিতে পৌঁছিলেন; গবেশ আর রৌদ্রে হাঁটিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার ফরমাএশমত মধুসূদন তাঁহাকে পাকাদি করিয়া খাওয়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রাম।

বেলা পড়িল; দুইজনে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক গ্রামে পৌঁছিয়া গবেশ অন্ধকারের আশঙ্কা করিয়া সেইখানেই রাত্রিবাসের প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদন সম্মুখ-জ্যোৎস্না সত্ত্বেও, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া এক দোকানে বাসা লইলেন; গবেশের "অভ্যাস" ভঙ্গ ভয়ে গ্রাম খুঁজিয়া দুগ্ধ আনিয়া দিলেন। রাত্রিতে পাকাদিও করিয়া দিলেন। দোকানী শয্যার নিমিত্ত একখানি মাদুর দিল। গবেশের তাহাতে "ঘুম হইবে না," এই জন্য মধুসূদন নিজের সমস্ত বস্ত্রাদি দিয়া তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন; আপনি একপার্শ্বে "অর্দ্ধগঙ্গাজলী"র ন্যায় পড়িয়া সঙ্গসুখের বিষয় সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অগ্রদ্বীপ হইতে মেমারি যাইতে তাঁহাদের পাঁচ দিন লাগিয়াছিল। পথে গবেশের অত্যন্ত কষ্ট হয়। গবেশ ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কষ্টে আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

(ইতি গোবিন্দ অধিকারী।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"যাকে রাখ, সেই রাখে।"

বেলা এক প্রহরের সময়ে মধুসূদন ঘটক ও গবেশচন্দ্র রায় মেমারি পৌঁছিলেন। কলিকাতার গাড়ী আসিবার বিলম্ব আছে জানিতে পারিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী দোকানে ক্ষণকালের জন্য বাসা লইয়া গবেশের পরামর্শ অনুসারে মধুসূদন তাড়াতাড়ি মাছের ঝোল ভাত পাক করিলেন, এবং বকপক্ষবৎ শুভ্র তরল দধির সহায়তায় ভাত কটা নাকে মুখে গুঁজিলেন। গবেশ রায়ের অম্লরসে অত্যধিক প্রবৃত্তি ছিল। "তিন্তিড়ী-ঘ্রাণমাত্রেণ অন্নং চলতি পঙ্কবৎ," গবেশচন্দ্র যখন তখন এই কবিতার্দ্ধ আওড়াইতেন; এই জন্য দধির কথা আমরা বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম; রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে সচরাচর কিরূপ জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা দেখাইবার জন্য নহে।

ভোজন সমাপনান্তে, পান চিবাইতে চিবাইতে দুই জনে দ্রুতগতি ষ্টেশনে চলিলেন, গবেশ রায় কষ্ট বোধ করিতে করিতে, এবং মধুসূদন কি ভাবিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে। ষ্টেশন গৃহের বাহিরে গিয়া দুইজনে বসিলেন; সেখানে আরও অনেকগুলি যাত্রী বসিয়া রৌদ্রে তামাক খাইতেছিল। গবেশ মধুসূদনকে বলিলেন, "মোট সাবধান।" ইঁহাদের সঙ্গে বস্ত্রাদি যে কিছু ছিল, একটী মোট করিয়া মধুসূদনকে তাহার সমুদায়ই লইতে হইয়াছিল। "মধু ভ্যাবা-গঙ্গারামকে ঠকাইয়া লইবে" বলিয়া সঙ্গের টাকা কয়টী ও একগাছি ছড়ি গবেশ লইয়াছিলেন। গবেশ মধুসূদনকে পুনরায় বলিলেন, "তামাক খাবে ত, কলিকাটা চেয়ে নাও না কেন?" পিসীর শাসন-বাক্য অনুসারে মধুসূদন গবেশের "যে আজ্ঞা"র চাকর, একজনের নিকট কলিকা চাহিয়া লইলেন, গবেশ আগে খাইলেন, পরে গবেশের অনুগ্রহে মধুও বঞ্চিত হইলেন না! গবেশচন্দ্র আবার মোটের বিষয়ে মধুকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়; সময় রেলের গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত চলে, সুতরাং সময় গাড়ীর অপেক্ষা করে না, গাড়ীই সময়ের অপেক্ষা করে। সময়ের শাসন-ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সেনানীর তুরিধ্বনি শুনিলে যেমন সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় থাকুক, তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া দাঁড়ায়, ঘণ্টার শব্দমাত্রে যাত্রিগণের মধ্যে সেইরূপ, গৃহপ্রবেশের জন্য একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। টিকিটের ঘরে টিকিট আদান প্রদানের জন্য একটী ছোট দ্বার কাটা থাকে; সেইটি যেমন উদ্‌ঘাটিত হইল, অমনি একটা মৃতদেহ পাইলে শকুনির পাল ও গঙ্গাতীরের শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ইতর ভদ্র সকলেই সেই

দ্বারের দিকে ঝুঁকিল,—অগ্রে টিকিট লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত; একটী ছেলে, লোকের চাপে কাঁদিয়া উঠিল; এক জন প্রাচীন, যাত্রীদের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল, অপর এক জন "ছোট লোক" তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইল।

সকলে যে সময়ে বাহিরে বসিয়াছিল, তখন মধুসূদন কৌতূহল-পরবশ হইয়া তারের ঘরে তারের খবর দেখিতে গিয়াছিলেন। তারের বাবু সে সময় বেঞ্চের উপর চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ছিলেন, মধুসূদনের প্রবেশ মাত্রে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। মোট-হাতে মধুকে দেখিয়া রক্তিম-লোচন বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; বলিলেন; "কে তুমি?" মধু বলিলেন, "আজ্ঞে এই দেখতে এসেছি।" "আপন বাড়ী গিয়া দেখ" এই মিষ্ট বিদায় দিয়া মধুকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য বাবু এক জন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন।

কতকটা এই অপমান স্মরণ করিয়া, কতক টিকিট চাহিবার পাঠ না জানাতে, কতক কতক বা আপনা হইতে গবেশের ক্ষমতা ও সাহস অধিক জানিয়া মধুসূদন টিকিট লইবার সময়, রাধিকার মানের সময় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, চোরের মত মোটটা হাতে করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গবেশ টিকিট লইতে সেই ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট গেলেন। "কলিকাতার হুখান" বলিয়া একটী টাকা ও একটি দু-আনী হাত বাড়াইয়া দিলেন। টিকিট বাবু সংগৃহীত টাকার মধ্যে গবেশের টাকাটী ফেলিলেন। গবেশকে বলিলেন, "আরও চাই"। গবেশ শশব্যস্ত হইয়া মধুকে ডাকিতেছেন, এমন সময় "এ দু-আনী চলিবে না" বলিয়া টিকিট বাবু ক্ষুদ্র দ্বার পার করিয়া সগর্ব্বে দু-আনী ফেলিয়া দিলেন। অল্পপ্রাণা দু-আনী মনের দুঃখে গবেশের হাত ছাড়াইয়া অন্যান্য টিকিটগ্রাহীদের চরণতলে শরণ লইল। মধুকে ডাকিবেন কি, গবেশচন্দ্র দু-আনীর উদ্ধারে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া দেহ বক্র করিয়া, হেটমুণ্ডে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ যাত্রিগণ টিকিট লইতে লাগিল, গবেশ ততক্ষণ দু-আনী পাইলেন না, কিন্তু মুখও তুলিলেন না। সকলের টিকিট লওয়া হইলে ক্ষুদ্র দ্বার রুদ্ধ হইল। গবেশ দু-আনী পাইলেন, কিন্তু হায়! মুখ তুলিয়া দ্বার খোলা পাইলেন না। তাঁহার টাকাটী লক্ষ্মীর চঞ্চলতা দেখাইবার জন্য ঘরের ভিতর রহিল। মোট হাতে মধুসূদন বিনা বাক্য ব্যয়ে এক পাশে যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনি রহিয়া, পিসীর অনুশাসনের শোধ তুলিতে থাকিলেন, "নির্ব্বাত-নিষ্কম্পামিব প্রদীপম্।"

"আট পয়সার ফলার করিতে গিয়া আট আনার ঘটটা ফেলে আসা" যেমন, গবেশচন্দ্র তদবস্থ হইয়া ষ্টেশনের ভিতরে প্লাটফর্ম্মে (নির্জ্জলা বঙ্গজ! এ শব্দটীর ব্যবহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন) যাইবার জন্য দ্বারের নিকট যেই গেলেন, অমনি, একজন প্রহরী, "টিকিট কাঁহা?" করিয়া উঠিল, তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বরং তাহার গাত্রে কিঞ্চিৎ বলপাত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদনও

এইবার স্থানভ্রষ্ট হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া গবেশের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কিন্তু নির্দ্দয় দ্বাররক্ষক! গবেশের যত্নে তাহার হৃদয়ে যে রাগের সঞ্চয় হইয়াছিল, ভাল-মানুষ মধুর উপকারার্থ দ্বারবান্ তাহা ব্যয় করিল। মধুর মোটে হাত দিয়া "ওজন্ নেহি হুয়া, মৎ যাও"-যুক্ত দুটো মিষ্ট কথা বলিল; অগত্যা মধুসূদন গবেশের সঙ্গলাভের দুরভিসন্ধি কিয়ৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন; দুপা সরিয়া যথাপূর্ব্বস্থানে মোটহস্তে দাসের ছবির মত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ওদিকে গাড়ী আসিল, যে পারিল সে চড়িল; একজন ষ্টেশন-প্রহরী ধাক্কা দিয়া দুটী স্ত্রীলোককে গাড়ী চড়া বিষয়ে সাহায্য করিল, তাহাদের একটী বোচকা গাড়ীর নীচে রেলের উপর পড়িয়া গেল, কেহ তাহা তুলিয়া দিল না; গাড়ী সময়ের অনুরোধে শুভাশুভ কাল বিবেচনা না করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

যাহাদের রেলওয়ে গাড়ীতে যাওয়া অনিবার্য্য, তাহারা যেন ভিক্ষা করিয়াও একটা পেণ্টালুন আর একটী কোট (তদভাবে ছোট, কাল রঙ্গের চাপকান) সংগ্রহ করিয়া রাখে; একটী শোলার টুপি হইলে "চূড়ার উপর ময়ূর পাখা" হয়; আমরা এই উপলক্ষে পাঠক অপাঠক সকলকেই এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া রাখিতেছি। আমাদের কথায় অবজ্ঞা করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটী করেন, প্রতিফল হাতে হাতে। আমরা দোষে খালাস। মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র এই মহাবাক্য শুনেন নাই অথবা জানিতেন না, এজন্য তাঁহাদের যে দশা, তাহা আমাদের পক্ষে পোষক নজীর। এই উপলক্ষে আর একটী আমাদের আপন গরজের কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং আমরা সে সুযোগ ছাড়িতে পারি না। যাঁহারা এই গ্রন্থের সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা নিন্দাই করুন, বা প্রশংসাই করুন, ইত্যাদি, এই স্থলটী যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক উদ্ধৃত করেন। তাহা হইলেই উল্লিখিত উপদেশ বাক্যের খাতিরে, অনেকে এই পুঁথি কিনিতে পারেন। আমরা লাঙ্গুল উপমার পক্ষপাতী, এই হেতু তদ্রূপ উপমা হস্তগত হইলে তাহা সুসংলগ্ন হইবে কি না, এ সন্দেহে মস্তিষ্ক চালনা করিতে ভাল বাসি না। আপাততঃ একটীর প্রয়োগ আবশ্যক হওয়াতেই এই ভূমিকা। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিয়া পরে আপনার মুখ পোড়ান। গবেশ রায় লঙ্কা পোড়াইতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ পুড়িল। তাহা এইরূপে।

গাড়ী চলিয়া গেলে গবেশচন্দ্র ষ্টেশন বাবু বা টিবিট বাবুকে ধরিয়া বসিলেন। কি মহাশয়! আমি টিকটও পেলেম না, গাড়ীও বেড়িয়ে গেল, এখন কি করি বলুন দেখি? যা হ'ল তা হ'ল, এখন আমার টাকাটী ফেরত পেলে, রাত্রি পর্য্যন্ত বাজারে গিয়ে অপেক্ষা করি। যা'হয় করুন, মশায়, আর দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারি না।" ষ্টেশন-বাবু বলিলেন, "তোমার টিকিট কৈ?" গবেশ বিস্মিত হইলেন; টিকিট কিসের? আপনি টিকিট দিলেন কখন? টিকিট গেল, টাকাটী পেলে যে বাঁচি; এ বেলা

যাওয়া ত বিলক্ষণই হল'।" ষ্টেশন-বাবু এ কথার উত্তর দিলেন না, একজন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, গবেশের নিকট রাণীগঞ্জের ভাড়া আদায় না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া না দেয়। গবেশকে লইয়া প্রহরী সেই খানে বসাইয়া রাখিল। মধুসূদনকে লইয়া হস্তবুদ্ধিদেব তাহার মোটের নিকট বাহিরে বসাইয়া রাখিলেন। ষ্টেশন-বাবু এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে ষ্টেশন-বাবু প্রবেশ করিলেন, আর কয়টি বাবু ক্রমে ক্রমে সেই ঘরে আসিয়া জুটিলেন। যথাকালে তবলার চাটি ঘরের ভিতর উঠিতে আরম্ভ হইল; যথাকালে সেই কুঠরী হইতে রমণীকণ্ঠ আসিয়া গবেশের চিত্তটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে প্রহরীর হস্তে গবেশচন্দ্র দেহ হারাইয়াছিলেন, এখন মনটিও গেল। গবেশ থাকিয়া না থাকা হইল।

যদি গবেশের শরীরে শরীর রহিল না, মনে মন রহিল না, তবে তাহার লজ্জা, মান, ভয়, কিরূপে থাকিবে? স্থান, কাল, পাত্র সকলই ভুলিয়া গিয়া, মল্লার রাগের ফল যে বৃষ্টি, বৃষ্টির ফল যে ভেকসংগ্রহ, ভেকসংগ্রহের ফল যে ইংরাজী যন্ত্রবিশেষের শব্দ-বিশেষ, সেই শব্দকে নিন্দা করে যে স্বর, সেই স্বরে গবেশ রায় প্রহরীর শাসনকে নিমগ্ন করিয়া, "ওরে বিধি তোরে যদি বিরলেতে পাইরে" ইত্যাদি সুমধুর গান ধরিলেন। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের (আবার সেই শব্দ) টিন লোহার ছাদ ভেদ করিয়া গবেশের স্বর উঠিল; স্বর দিগন্ত ব্যাপিল; স্বর ষ্টেশন বাবুদের কেলিকুঞ্জে—রাসমন্দিরে প্রবেশ করিল। রসে ডগমগায়মান একটি বাবু ঘর হইতে গবেশের সমীপে চুম্বকে লৌহবৎ আকৃষ্ট হইলেন। বাবু আসিয়া বলিলেন "অন্ধের যষ্টি, নির্ধনের ধন, আঁধারের মাণিক, গোবরের পদ্মফুল, তোমায় আমি এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই? আমার অপরাধ ক্ষমা কর, ঘরে চল। তুমিই আমার উপায়, তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার অবলম্বন।" এই বলিয়া বাবুটী গবেশের গলা জড়িয়া ধরিলেন। গবেশের তখন পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইল; বাবুকে বলিলেন,—"আমায় কয়েদ করে রেখেছে, আমার সঙ্গের একজনকে কোথায় তাড়িয়ে দিলে, তাও জানি না।" বাবু বলিলেন,—"তোমার আবার সঙ্গ? সঙ্গের অভাব কি? আমি তোমার সঙ্গ, তুমি আমার সঙ্গ।" বাবু গবেশকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রহরীকে বলিয়া গেলেন "বাবা, শীকারে বঞ্চিত করিতে চাই না; আমার দেবদেব মহাদেবের যে সঙ্গী বাহিরে আছে, তারে তুমি খুঁজে আন, আপনার কাছে বসিয়ে রাখ। এবারকার মত যা হ'ল, আর আমি চাইলেও ছেড়ে দিও না, কোন শালা চাইলেও ছেড়ে দিও না।"

প্রহরীও তাহাই করিল। বাহিরে মধুসূদনকে পাইয়া তাহাকে আপন জিম্মায় রাখিল। এদিকে গবেশ রায় বাবুদের সুরার্চ্চনার বহুতর সাহায্য করিলেন। যে "জগ্রম্প" শিক্ষার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, অদ্য তাহার গুণ ধরিল। ইহাতেই

মহাজন বাক্যে আছে, "যাকে রাখ, সেই রাখে।" রাত্রির গাড়ীতে টিকিট পাইতে কোন কষ্ট হইল না; মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র সুখস্বচ্ছন্দে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নষ্ট-নির্ণয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে আমরা নরেন্দ্রনাথকে পলায়ন-পরম্পরায় হ করিয়াছিলাম। কিন্তু যাবজ্জীবন দৌড়িতে কাহারও সামর্থ্য নাই, সুতরাং নরেন্দ্র-নাথেরও নাই। তবে নরেন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন?

আর কোথায় যাইবেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে, দৌড়িতে দৌড়িতে শঙ্কাবিনাশী, চিন্তাপহারী বাষ্পীয় শকটের আশ্রয় গ্রহণাভিলাষী হইয়া সেই রাত্রিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ খাঁটি পরোপকার করিবার জন্য নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এইজন্য রাত্রি-শেষে গঙ্গা পার হইতে তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। যে টাকা দিয়া পরের হিত করিতেন, অন্ততঃ তাহাতে তাঁহার নিজের হিত হইবে, ইহাতেই বৈচিত্র্য কি?

ভোরের গাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ রীতিমত চড়িলেন। গাড়ীর বেগে নরেন্দ্রের ভয় ও ভাবনা, তারের আশ্রয়ীভূত প্রোথিত শালকাষ্ঠ শ্রেণী, নরেন্দ্রনাথের শঙ্কা-উৎপাদী দেশের ঘর, দ্বার, গাছ পালা সকলই পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল; শেষে নরেন্দ্রনাথ তাহাদের ভয়ে পলাইবেন কি, বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারাই নরেন্দ্রের ভয়ে পলাইয়া যাইতেছে; যেন গাড়ী এবং গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ নরেন্দ্রই হিমালয়ের ন্যায় অচল, অটলভাবে যেখানকার সেইখানে রহিয়াছেন। গাড়ী ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছিল। হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমস্ত পথ নরেন্দ্রনাথ অবিচলিত-ভাবে একখানি গাড়ীর একখানি বেঞ্চ যুড়িয়া ছিলেন; একবার মগরা ষ্টেশনে একজন অসাবধান, অতি ব্যস্ত যাত্রী তাঁহার উপর বসিবার উপক্রম করাতে ঈষৎ বিকট অথচ মধুর শব্দ করিয়াছিলেন মাত্র।

বাঙ্গালা নগরের সূতিকাগৃহ বা ধাত্রীক্রোড়-স্বরূপ বর্দ্ধমানে নরেন্দ্রনাথ যান হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বঙ্গীয় কবিগুরুর কল্পনারোপিত বকুল বৃক্ষ যদি এ পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথ তাহার তলা ভিন্ন অন্য স্থানে গিয়া বসিতেন না। এক্ষণে তাহা ছিল না বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান ষ্টেশনের বাহিরে এক বটবৃক্ষমূলে আত্মাকে স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ-শীতল করিলেন। কেহ কেহ ভাবনাগ্রস্ত হইতে পারেন,

এই হেতু আমরা স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছি যে, যাবৎ নরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া রহিলেন, তাবৎ জল আনিতে কক্ষে গাগরী লইয়া কোন নাগরী, বা ফুল তুলিতে কোন মালিনী তথায় উপস্থিত হইল না। সুন্দরের কৃতি-কীর্ত্তি যদি সে সময়ে নরেন্দ্রের মনে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, "ম্লেচ্ছরাজ্যে আমাদের অনেক প্রকার সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।" কবিকেশরী রায়-গুণাকর প্রথমতঃ সুন্দরকে "বর্দ্ধমানপুরী," তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া পরে অন্য অন্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সে গড় নাই, সে থানা নাই, সে বর্দ্ধমানই নাই; সুতরাং নরেন্দ্রনাথকে সে প্রকারে নগর দেখাইবার প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন থাকিলেও বড় সুখ নাই। বর্দ্ধমানের রাজমার্গ সমুদয় রক্তকর্দ্দমময়, পঞ্চাশ হাত চলিতে হইলেই জানু পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠে। এই সকল হেতুবশতঃ নরেন্দ্রনাথ বড় একটা কোথাও গেলেন না। একজোড়া জুতা কিনিবার প্রয়োজন হওয়াতে নরেন্দ্রনাথ এক-বার বাজারে গিয়াছিলেন; কিন্তু নিতান্ত "পেটের দায়," না হইলে ভদ্রলোকে জুতার দোকানে যায় না, আমরা ত কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত নহি, অতএব নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাজারে যাইবার আবশ্যকতা নাই। পাছে কেহ ধরিয়া রাখে, বোধ হয় এই জাতীয় কোন আশঙ্কাপ্রযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মহারাজার চিড়িয়াখানা দেখিতে যান নাই।

একজন ভদ্রলোকের বাসায় নরেন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেখানে দুই দিবস থাকিলেন, কিন্তু পরে কি কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পতঙ্গ আপনা আপনি অগ্নিশিখায় গিয়া পড়ে; নরেন্দ্রনাথ পতঙ্গ নহেন, এজন্য কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত বোধ হইল না। পরীক্ষার পর বাটী যাইবার কথা, সুতরাং এ সময় বাটী গেলে, অনেক জবাবদিহিতে পড়িতে হয়; তাহাও ত হইল না। বর্দ্ধমানে থাকিতে হইলে, তাহার একটা উপায় বিধান করিতে হয়। এইরূপে প্রদীপের শিখার ন্যায় নরেন্দ্রনাথের চিত্ত এদিক্ ওদিক্ করিতেছে, এমন সময় ঝড় আসিয়া সে প্রদীপ নিবিয়া গেল; একখানি সংবাদপত্র আসিয়া তাঁহার সকল বুদ্ধি লোপ করিল। নরেন্দ্রনাথ পড়িলেন—

"পুলিশের অসামান্য কৌশলে গোলদীঘীর ধারের এক গলিতে সন্দেহসূচক অব-স্থায়, সন্দেহজনক এক খণ্ড জুতা বাহির হইয়াছে। কতদিন অবধি চর্ম্মপাদুকা সে অবস্থায় ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। পাদুকার অধিকারী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পাদুকা পুনর্গ্রহণ করিবেন না, অবস্থা দৃষ্টে এবং কঠোর অনুসন্ধানের দ্বারা পুলিশ ইহা অবধারণ করিয়া সংবাদ দিয়াছেন, যদি কেহ ফেরারী জুতার মালিককে ধরিয়া দিতে পারেন, অথবা যাহাতে ধরা যায়, এমত সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, অথবা যাইতে পারে, এমত সম্ভাবনা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

সংবাদপত্র নরেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে পড়িয়া গেল। বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বাপান্তবাগীশ তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল; মাথা ঘুরিতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; বাম-হস্তে মুখ চাপিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চক্ষুর শ্বেতভাগ সমস্ত বাহির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্র অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিলেন না। তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই মন এক প্রকার স্থির করিলেন। সংসার অসার, ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিলেই তাহাতে বহু বিঘ্ন নিশ্চিত, সাধুপথে অনেক কণ্টক, এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, বিকালে কাহাকেও না বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সে বাসায় অদৃশ্য হইলেন। অন্যদেশে গিয়া কাল-যাপনার সংকল্প করিয়া দ্বিতীয়বার রেলওয়ের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষী হইলেন; এবং তদনুসারে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাত্রিতে গাড়ী পাইলেন না। পর দিবস সকালে রাণীগঞ্জের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ষ্টেশনের একটি রসিক বাবু নরেন্দ্রকে দেখিয়া বলেন যে, ওজন করিয়া তাঁহাকে মালগাড়ীতে বোঝাই করা উচিত।

হু হু শব্দে বাষ্পীয় রথ নরেন্দ্রনাথকে ঘৃণিত দেশ হইতে লইয়া চলিল। তাঁহার মন বাপান্তবাগীশময়, এ জন্য তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, (ধান্যাদি-বর্জ্জিত) মাঠ সকল তাঁহারই দুঃখে দুঃখী এবং বাপান্তবাগীশের ভয়ে ভীত হইয়া সেরূপ শুষ্ক-ভাব, ম্লান-ভাব অবলম্বন করিয়াছে। অবশেষে বাপান্তবাগীশের ভয়ে বিব্রত হইয়া রথ আর পথ ঠিক করিতে পারিল না; রাণীগঞ্জে হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা বেলা দুই প্রহরের সময় নরেন্দ্রনাথ নিজের পথ দেখিতে গাড়ী হইতে নামিলেন। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে তিন চারি রসি অন্তরে একটী মুদির দোকান আছে জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ সেই দিকে দেহ-রথ চালাইলেন। মুদীর দোকানে পৌঁছিলেন।

ডালার উপর একটি ছিদ্র কাটা, লোহার কজায় দেহ প্রায় আবৃত, একটা কাঠের বাক্স সম্মুখে করিয়া, সেই বাক্সের উপর, একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণে বটতলার কারিকরগণ যে সকল মুদ্রা-দোষ সংগ্রহ করিয়াছিল, মুদি সুরসংযোগ করিয়া সেইগুলিকে জাজ্বল্যমান করিতেছিল। সুতরাং তাহার পাঠপ্রণালীতে নরেন্দ্রনাথ যে, একটি শব্দও আগাগোড়া বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, তাহাতে কতক গৌরব মুদির, কতক তাহার সুরের এবং অবশিষ্ট "ছাপাওয়ালার ভূতের।" নরেন্দ্রকে দেখিয়া, পুঁথির মধ্যে একগাছি তৃণ দ্বারা স্থানের নির্দ্দেশ রাখিয়া মুদি মহাশয় স্বপ্রণীত বাঁশের মাচা হইতে ভূমিষ্ঠ হইল। নরেন্দ্রকে বসিতে দিয়া (ব্রাহ্মণ জানিয়া) করযোড়ে একটি প্রণাম ও তামাক সাজিয়া দিল। কোথা হইতে আগমন, কোথায় বা গমন ইত্যাদি প্রশ্নের অসন্তোষকর উত্তরে মুদি সন্তুষ্ট হইয়া নরেন্দ্রনাথের পাকের ব্যবস্থা

করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সেই সময় স্নান করিয়া আসিলেন। "ঘাটে আহ্নিক সারিয়া আসিয়াছেন" মুদির প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ গলা ঝাড়িয়া ইহা জানাইলেন; এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদি লইয়া জঠরাগ্নি দমন করিলেন ও পাক করিবার অগ্নি জ্বালিয়া, রন্ধন আরম্ভ করিয়া, গলায় কড়ি-ঝুলান-হুকা-হস্তে দোকানের বাহিরে এক খানি টুলের উপর বসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন এবং এক এক বার জাল ঠেলিয়া আসিতেছেন; এমন সময়ে চারিটা বাহকের স্কন্ধে, এবং অতিরিক্ত আট জন সঙ্গে এক খানি পাল্কী আসিয়া দোকানের সম্মুখে থামিল। পাল্কীতে এক পাল্কী মানুষ বোঝাই, কিন্তু মানুষ একজন মাত্র। যিনি পাল্কীর অভ্যন্তর দেশ ব্যাপিয়া ছিলেন, তিনি অতি কষ্টে পাল্কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া পাল্কীতে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। এ ব্যক্তি স্থূল কি সূক্ষ্ম, আমরা সে বিষয় কিছু বলিব না! তবে একবার ইনি হস্তি-পৃষ্ঠে যাইতেছিলেন, একজন দুঃখিনী স্ত্রীলোক তাহার কোলের ছেলেকে সেই সময়ে হাতী দেখিতে বলায়, গোপাল (সেই ছেলের নাম) জিজ্ঞাসা করে, "মা। কোন্‌টা, যেটা নামোয়, না যেটা উপরে?" পরে জানা গেল, ইহার নাম কালীনাথ ধর। ধর মহাশয়ের চারিখানি গাল ও একাদিক্রমে তিনটী পেট। মস্তকের উপরিভাগ অপেক্ষা চিবুকাদি সহিত নিম্নভাগ প্রায় দ্বিগুণ প্রশস্ত; হস্তপদাদি শরীরের অনুরূপ; হস্তাঙ্গুলি যেন এক একটী পেয়ারা। ধরজীর বর্ণ কেমন নিশ্চয় করা দুরূহ; কলিকাতার রাস্তায় নূতন পাথর ফেলিলে যেমন কর্কশ দেখায়, দদ্রু দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া প্রযুক্ত ইঁহার কলেবর সেইরূপ শোভা পাইতেছিল। ইঁহার বয়স ৫৬।৫৭ বৎসর।

মুদি নমস্কার করিয়া ধরজীর নিকট দণ্ডায়মান হইল, এবং সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রকার আলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুদী নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া দিল, "ধর মহাশয় দেশমান্য ব্যক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, জমীদারি আদিতে বহুতর আয়, দোল দুর্গোৎসব সমস্ত দেবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা আছে, ইত্যাদি"। এই সময়ে ধরজী মুখ-বিকৃতি সহকারে মনকে দদ্রুকণ্ডূয়নে নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং মুদীর কথা শুনিলেন কিনা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু মুদীর কথা শেষ হইবামাত্র নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ষাঁড়-লাঞ্ছিত স্বরে, অর্দ্ধচন্দ্রনিন্দিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ?" এবং নিশ্চয়াত্মক "আজ্ঞা" পাইয়া যুগ্মহস্তে শিরস্পর্শ করিলেন। হাত যোড় করা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথেরও একছড়া কলা মনে পড়িল।

কালীনাথ ধর মহাশয়ের মুদী যেরূপ পরিচয় দিল, তাহা প্রায়ই সত্য। ধরজী পূর্ব্বে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন; কুড়ি টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপায় অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবশেষে কালাকাল না মানিয়া স্থানাস্থান-কণ্ডূয়নের দোষে বা গুণে, সাহেব তাঁহাকে অলসবৃত্তি (পেন্সন) দিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর

প্রদান করেন। ধরজী কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠা খাওয়া ছাড়িয়া একজন গোঁড়া বৈষ্ণব হন। সুতরাং তন্ত্রাদি-উক্ত শক্তিপূজা সমুদয় ভিন্ন সকল পর্ব্বেই ইঁহার বাটীতে উৎসব হইত। রাণীগঞ্জের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে রাজহাট গ্রামে ইঁহার বাস।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব দেখিয়া ধরজী নিজ সন্তানদের ইংরাজী শিখাইবার মানস করেন; কিন্তু আদরের ছেলেকে বিদেশে রাখা অসম্ভব বিবেচনায় সে মানস এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা যে, গ্রামে রাখিয়াই ছেলেটীকে লেখাপড়া শিখান। নরেন্দ্রনাথ ইংরাজী জানেন, শুনিয়া অদ্য নরেন্দ্রের নিকট সেই বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। নরেন্দ্রনাথ অনেক ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু বাপান্তবাগীশের কথা মনে পড়াতে ইঁহার আর বিচারশক্তি রহিল না। তখন অগত্যা কুড়ি টাকা বেতনে এবং ঠাকুর বাড়ীতে সরকারী খরচে ভোজন ও বাসা ভাড়া না লাগিবার বন্দোবস্তে ধরজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ধরজী কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া পাল্কী উঠাইতে বলিলেন; ধরজীর ভার হতভাগ্য বাহকদের স্কন্ধে পড়িল।

নরেন্দ্রনাথ আহারাদি সমাপন করিয়া বিকালে রাজহাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন; সন্ধ্যার পরেই ধরজীর বাটীতে পৌঁছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গের সোপান।

বেলা অনুমান ছয় দণ্ডের সময় শ্রীল শ্রীযুক্ত কালানাথ ধর মহাশয় "বার দিয়া বসিলেন, বাহির দেওয়ানে।" বাটীর প্রধান কর্ম্মচারী রামকুমার দত্ত, পাড়ার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণুলাল অধিকারী ও মনোহর ঘোষাল, পুরোহিত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া বসিল। বিছানা হইতে কিছু অন্তরে ভূশয্যায়, গ্রামের নফর মণ্ডল, বলহরি কৈবর্ত্ত ও হানিফা সেখ উপবিষ্ট। ধরজী প্রস্তাব করিলেন, "ম্যাষ্টর আনা গেল, এখন ইহার একটা বন্দোবস্ত করিতে হয়।" একটা মেষ জলে পড়িলে, পালের সমস্তগুলাই যেমন তাহার অনুকরণ করে, ধরজীর প্রস্তাবে সকলেই সেইরূপ সম্মতি প্রকাশ করিল। কেবল হানিফা শ্বাস দমন করিয়া বলিল, "কর্ত্তার মর্জ্জী" এবং নফর মণ্ডল কোন কথাই কহিল না। যদিও ইঁহাদিগকে এই কার্য্যের জন্য ডাকিয়া আনা হয়, কিন্তু এ সময়ে তাহাদের মতামতের অপেক্ষা করা কাহারও বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হইল না। ধরজী নিজ গ্রাম সেপক্রনী লইয়াছিলেন।

বন্দোবস্তের কার্য্য চলিতে লাগিল। গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির নামে চাঁদা ধরা হইল। ব্যক্তি-বিবেচনায় কাহারও মাসিক আট আনা, কাহারও চারি আনা, কাহারও দুই আনা পর্য্যন্ত ধরা হইল। গ্রামের মধ্যে ভবী বামণী ও পদী চাঁড়ালের শরীর অলক্ষ্য রহিল, চাঁদার কাগজে তাহাদের নাম উঠিল না। সম্পত্তির মধ্যে ব্রাহ্মণীর এক চরকা-কল চলিত; চাঁড়ালকন্যা মাঠের সমস্ত গোবর সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করার ভার পাইয়াছিল এবং ব্যবসায়টিতে তাহারই এক প্রকার একচাটিয়া হইয়াছিল।

বন্দোবস্ত যথারীতি অগ্রসর হইতে লাগিল। ধরজী প্রত্যেক প্রজার জমার উপর টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে বিদ্যালয়-খরচার ব্যবস্থা দিলেন। নফর মণ্ডলের উপর ফাঁসির হুকুম জারী হইলেও তাহার ঠোঁঠ এত শুকাইত না, চক্ষু এরূপ বসিয়া যাইত না, কপাল এ প্রকার কুঞ্চিত হইত না। নফর এক নিশ্বাসে সাত নিশ্বাসের কাজ করিল। "মামুকে যাইয়া বলি, পাস্তীও উঠিল"—এই বলিয়া হানিফা উঠিয়া গেল; নফরও আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, হানিফার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া চলিল।

রক্তের সংস্রব প ইবামাত্র সর্পবিষ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া উঠে। ধরজীর বিদ্যালয়-খরচার প্রস্তাবে নফর ও হানিফা বাটীর প্রাঙ্গণ ছাড়াইতে না ছাড়াইতে রামকুমার দত্ত তাহাদের সঙ্গ ধরিল, এবং মৃদুমন্দ স্বরে বলিল, "শালারা আদত গরু কি না। যে ডালে বসিস্, সেই ডাল কাটিস্! যখন পেয়াজ পয়জার দুইই হবে, তখন তোরা পথে আস্‌বি। আমায় একটা কথা বল, কর্ত্তাকে নগদ কিছুখানা ক'রে দে, দেখ, এক কথায় তোদের অর্দ্ধেক কমাইতে পারি কি না?" হানিফা ও নফর দুই জনে অনেক পরামর্শ করিল, অনেক ভাবিল, অনেক বিতণ্ডা করিল এবং অবশেষে স্থির করিল যে, তাহাদের দ্বারা এ কথার কিছুই স্থির হইবে না। তখন রামকুমার দত্তের সহিত একটা বন্দোবস্ত হইল; সেই বন্দোবস্তের বলে, উভয়ে দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পুনরায় ধরজীর নিকট ফিরিয়া গেল। প্রজাবর্গের মধ্যে নগদ দুই শত টাকা উঠাইয়া দিবে, জমার প্রত্যেক টাকায় দেড় পয়সা হিসাবে বিদ্যালয়ের জন্য দিবে, কিন্তু তাহা খাজনার কবজে জমার মধ্যে লেখা যাইবে না, এইরূপ কথাবার্ত্তা নিশ্চয় করিয়া হানিফা ও নফর মণ্ডল চলিয়া গেল। জমীদার মা বাপ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ হইল না।

ধর মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে ডাকিবার জন্য এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন। বাটীর বাহিরে দরজার পার্শ্বের এক কুঠরীতে নরেন্দ্রনাথকে বাসা দেওয়া হইয়াছিল। সে ঘরে অনেক দিন হইতে কেহ বাস করে নাই দেখিয়া এক দল মশা সেই খানে বাসা লইয়াছিল; নরেন্দ্রনাথ রাত্রিতে একটি বিছানা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মশারি পান নাই। সুতরাং মশাগণ একে একে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার সহিত আলাপাদি করাতে, শিষ্টাচারের অনুরোধে তিনি রাত্রিকালে নিদ্রার অবকাশ পান নাই।

প্রভাতে উভয় পক্ষ বিশ্রামগ্রহণ করেন, এই জন্য নরেন্দ্রকে যখন ডাকিতে গেল, তখন তিনি যমের কনিষ্ঠের হেফাজতে ছিলেন। অনেক উপরোধ বিরোধের পর নরেন্দ্র ইহলোকে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মুখ ভার করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান যোগ হইলে, মুখে জল দিয়া চক্ষু মুচিতে মুচিতে আসিয়া ধরজীর সভায় কলেবর সমর্পণ করিলেন।

ধর মহাশয় যদিও চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সংসারের নিকটেও অবসর পাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, তথাপি রসিকতার হাত এড়াইতে পারেন নাই। নরেন্দ্রনাথ এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন, এই জন্য দুই চারিটি কঠোর ব্যঙ্গের ভাগী হইলেন। উপস্থিত-বুদ্ধি নরেন্দ্র মশার উপর দিয়া ধরজীর রসিকতার ধার ফিরাইয়া দিলেন। অন্যান্য পাঁচ কথার পর, ধরজী নরেন্দ্রনাথের হস্তে চাঁদার কাগজ দিয়া বলিলেন, "বিদ্যালয়ের টাকার ত এই উপায় করিয়াছি, এখন আপনি কাজের ভার লইলেই হয়।"

নরেন্দ্র চাঁদার ফর্দ্দে একটিও পরিচিত নাম দেখিলেন না, (সে স্থানে তাঁহার পরিচিত একমাত্র ধরজী)—কিন্তু তাঁহার বেতনের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা ফর্দ্দে দেখিয়া শীঘ্র বেতন বাড়িতে পারিবে, এই সম্ভাবনায় আহ্লাদে গদগদ হইয়া বিস্মিত হইতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার উপর দেশহিতৈষী ধর মহাশয় যখন বলিলেন যে, সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা যাইবে, তখন নরেন্দ্রনাথ কেন ঘুটিফাটা হইলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

আর দুইটি কথার মীমাংসা হইলেই নরেন্দ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রথম কথা এই যে, ধর মহাশয় চাঁদার কাগজ নরেন্দ্রের হস্তে দিয়া তাহাকে বলিলেন যে, "টাকা আপনাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে।" বহু আন্দোলন, অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষ এই হইল যে, নরেন্দ্র তাহাতে অক্ষম, এজন্য ধরজী নিজের লোকের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া দিবেন, কিন্তু লোকের বেতন ঐ টাকা হইতে কাটা যাইবে। একটা বিষম গুরুতর কথার এরূপ সন্তোষকর নিষ্পত্তি হইবে, এ প্রত্যাশা কাহারও ছিল না; এজন্য উভয় পক্ষ ইহাতে ভয়ঙ্কর তৃপ্তিলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই;—বহুকাল হইতে গ্রামের একজন গুরুমহাশয় রাজহাটের ছেলের শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে পাঠশালা থাকা অসম্ভব; এমন কি, থাকিলে চলিতেই পারে না; সুতরাং গুরুমহাশয়কে বালকদের হাতছাড়া করা আবশ্যক। যখন এ প্রস্তাব হইল, তখন কয়েক জন নিদর্শ্মা সভাসদ্ ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিল। কিন্তু যেমন আগুন লাগিলে খড়ের চাল নিশ্চিত পুড়িয়া ছাই হয়, সেইরূপ ধর মহাশয়ের বাক্যে ইহাদের আপত্তি নির্ব্বিবাদে খণ্ডিত হইয়া গেল। পরন্তু প্রথম কথা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যে প্রকার কৌশল করিয়া টাকা আদায়ের

ভার ধরজীর উপর ফেলিয়া দেন; গুরু তাড়ান বিষয়ে সেরূপ ঘটিয়া উঠিল না। গুরু মহাশয় অগত্যা তাঁহারই ঘাড়ে পড়িলেন।

যখন কথার শেষ হইয়া গেল, তখন শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয়, বিবেচনা করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই নরেন্দ্র একজন লোক সঙ্গে পাঠশালায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরু মহাশয় তিনকড়ি সরকার দক্ষিণ হস্তে কঞ্চির ছড়ি, বাম হস্তে তামাক সাজা হুকা লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া আছেন। গুরু মহাশয় খর্ব্বাকৃতি, কৃশ, বাল্যকালে বসন্ত হইয়াছিল বলিয়া মুখে যেন ডায়মণ্ড-কাটা, কৃষ্ণবর্ণ, বয়স ৩৭।৩৮ বৎসরের অধিক নয়। চতুর্দ্দিকে ছেলেরা যার যেখানে ইচ্ছা, বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছে; কোথাও একজন সর্দ্দার ছেলে দুই তিনজন শিশুকে মাটির উপর খড়িতে লিখিয়া এবং লেখাইয়া অঙ্ক এবং ধুলা মাখা শিখাইতেছে; আর এক স্থানে একটি শিশু কলুর বলদের মত দাগা অক্ষরের উপর নিয়ত খড়ি চালাইতেছে; অন্যত্রে অনেকগুলি বালক তাল-পাতায় "মৃত্যুঞ্জয়" "উপেন্দ্রকৃষ্ণ" প্রভৃতি কঠিন কঠিন নাম-লেখা শিখিতেছে; কেবল একজন "হলধর ঘটক" লিখিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় এক দণ্ডে একটি পাতাও শেষ করিতে পারিতেছে না। বাহিরে ঢোলের বাদ্য শুনিয়া একত্রে পাঁচটী ছেলে "গুরুমহাশয়, পেচ্ছাব করে আসি", বলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে; তিন চারি জন অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালক মুখভঙ্গীর সহিত কাগজ লিখিতেছে। গুরুমহাশয় নরেন্দ্রকে দেখিয়া মোড়া ছাড়িলেন না, কিন্তু অভ্যর্থনা করিয়া একটী বালকের প্রতি তামাক সাজিবার আদেশ করিলেন। নরেন্দ্রের পেটের খবর গুরুমহাশয় যদি জানিতেন, তাহা হইলে তামাকের পরিবর্ত্তে ছড়ি দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা হইত, আমাদের এই বিশ্বাস। নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন, গুরুমহাশয় তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, কর্ম্ম, বেতন, এই সকল কথার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

চক্রী নরেন্দ্রনাথ স্থান কালাদি অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তৎপর সুযোগ বুঝিয়া তিনকড়ি সরকারের অন্ন মারার প্রসঙ্গ অতিশয় মাধুর্য্যের সহিত আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন,—"বালক ও বালিকা শিক্ষা বড় সহজ ব্যাপার নয়; এবং বিশেষতঃ শিক্ষার উপর ধর্ম্মের নির্ভর, যেমন কলসীর উপর জল। সুতরাং কলসীতে ছিদ্র থাকিলে জল পড়ে; অতএব শিক্ষা প্রবল চাই। এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের হীনাবস্থা, যুধিষ্ঠিরাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ 'বিধবা বিবাহ'—(নরেন্দ্র এ কথা জন্মে ভুলিবেন না)—ব্যবস্থা দিয়া করিয়া দিয়াছেন। অতএব এ সমস্ত গুরুতর বিষয় অসভ্য গুরুমহাশয়ের হস্তে রাখা যাইতে পারে না। পরন্তু ইংরাজ রাজ্যে এই সমস্ত চলিবার যোগ্য হইতে পারে না। অতএব আমি ইংরাজী বিষয়ে যথার্থ বিদ্যা এবং জ্ঞান এবং

সভ্যতা এবং নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত ধর মহাশয়কে ভূয়োভূয় ধন্যবাদ দিতে হয়।”

গুরুমহাশয় কিতাবতী লেখা পড়া জানিতেন মাত্র; এবং অল্প ব্যয়ে, ক্ষুদ্র লোককে অল্প বিদ্যা দান করিয়া পাটওয়ার, নায়েব ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেন; নরেন্দ্রনাথের ন্যায়ের গাঁথনির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, “আপনি কি মাষ্টার হয়ে এসেছেন? তা বেশ ত, আমায় এখন কি করিতে হইবে?”

নরেন্দ্রনাথ ইহার অন্য সদুত্তর স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন “ধর মহাশয়ের নিকটে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।”

* * * * * * *

যথাকালে পাঠশালাটি ভাঙ্গিয়া গেল, নরেন্দ্রনাথ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; বালকেরা নামতা, কড়ানে ষট্‌কে ইত্যাদি ভুলিতে লাগিল; হাতের লেখা অপাঠ্য হইতে লাগিল; রাজহাট হইতে “পরম পূজনীয়” শিরোনামা এবং “সেবক শ্রী——” পাঠ উঠিয়া গেল; ভবিষ্যতে দুই চারি জন শুঁড়ির প্রতিপালন হইবে, তাহার বুনিয়াদ হইল। তিনকড়ি সরকার মুদীখানা করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল; আমার লেখনী কিঞ্চিৎকালের জন্য বিরাম লইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

যার কেউ নাই, তার হরি আছে।

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, বিদ্যার ন্যায় ধন নাই; অন্য বস্তু আগুনে পোড়ে, জলে ডোবে, চোরে লয়, এবং বিনা বিয়ে ব্যবহার করিলেও ক্ষয় পায়। কিন্তু বিদ্যার সে সমস্ত বিড়ম্বনা নাই; ব্যবহারে পরিমার্জ্জিত এবং দানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। আমরাও ভ্রমররূপে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া বিবিধ বিদ্যালয়রূপ পুষ্পবৃক্ষে স্কুং বেস্কুং অধ্যাপকরূপ পুষ্প হইতে টিপ্পনী সংক্ষিপ্তসার ধাতু, ও “সমান্তরাল বাক্য *” প্রভৃতি-রূপ মধু মুখস্থ করিয়া খাতারূপ মৌ-চাকে সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষকরূপ দুষ্ট বালকগণ অধিকাংশ মধু গালিয়া লইয়াছিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পত্রলেখা-রূপ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে তাহাও গিয়াছে; এমন কি, গ্রন্থকার একখানি পত্র লেখাতে তাঁহার একজন স্পষ্টবাদী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত

* Parallel passages.

পত্রে যে মধু খরচ হইয়াছে, গ্রন্থকার মহোদয় ছয় মাসেও তাহার পূরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কোন্ মধু ছড়াইবার আশায় গ্রন্থকার এই পুস্তক লিখিতে সাহস সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা তোমার আমার-মত লোকের কর্ম্ম নয়। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চিত বিদ্যানের ক্ষয় আছে; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পণ্ডিতগণের বাক্য আমাদের পক্ষে খাটে না। কিন্তু বঙ্গদেশ যেমন সমগ্র পৃথিবী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও সেইরূপ বিদ্যার ব্রহ্মাণ্ড নয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, সম্ভবতঃ আমাদেরই বেলা ব্যভিচার, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র পণ্ডিতগণের উক্ত কথাই নিয়ম। আমাদের এ বিশ্বাস জন্মিবার কারণ এই যে, আমাদেরই দলের দুই এক জন আমাদের অবস্থার ব্যতিক্রম দেখাইয়া থাকেন। নরেন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

কঠোর করিয়া অকাতরে নরেন্দ্রনাথ রাজহাটের বালকদিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। দুই মাস চাকরী করা হইল, নরেন্দ্রনাথ এক পয়সাও বেতন পাইলেন না; ঠাকুরবাড়ীতে দুই বেলা খাইতে পাইতেন, তাহাতে "গ্রাসের" জন্য চিন্তা ছিল না; কলিকাতা হইতে যাহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাতেই এই পর্য্যন্ত তাঁহাকে আচ্ছাদনের কষ্ট পাইতে হয় নাই। তথাপি কর্ম্মত্যাগের দুরভিসন্ধি একবারও তাঁহার পবিত্র মনকে কলুষিত করে নাই। এই জন্যই আমরা বলিলাম যে, "কঠোর করিয়া" এবং "অকাতরে," এবং "বিদ্যাদান" নরেন্দ্রনাথ এ তিনই করিতেছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, নরেন্দ্রের শরীর বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিছুই ক্ষীণ হইল না। সত্য বটে, নরেন্দ্রনাথ রাজহাটে সকলের নিকট স্পষ্টাক্ষরে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতেন, "ব্রাহ্মের" নামোল্লেখ করিতেন না; কিন্তু ধর্ম্মের যে সমস্ত মূলতত্ত্ব, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে দেশের উন্নতি, যাহার পথ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি; তাহা নরেন্দ্রনাথ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ তাঁহাকে বাপান্তবাগীশের মৃত্যুসংবাদ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হওয়ার সমাচার আনিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতা গিয়া ধর্ম্মসাগরে আত্মাকে জন্মের মত ডুবাইতেন। আর নরেন্দ্রনাথের বিদ্যা?—তাহা ত পুরুভুজের মত বাড়িতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের ইংরাজী-শিক্ষকের মত হতভাগ্য জীব আর দ্বিতীয় নাই; গ্রামের লোকের সংস্কার থাকে, "ম্যাষ্টর"-কুল চৌদ্দ ভুবনের খবর দিতে বাধ্য। কেহ গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিল; প্রাণভয়ে ম্যাষ্টরের একটা-না-একটা উত্তর দিতেই হইবে। কেহ অশৌচ ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে। কেহবা শরা অনুসারে আবদুল খালেকের ফুকার জায়দাদ, কৌত হইলে কে পাইবে জিজ্ঞাসা করিল। গ্রামের লোকের নামে ডাকে যে সমস্ত পত্র আইসে, তাহার প্রায় সমস্তই শিক্ষক বাবুকে পড়িয়া দিতে হয়। ফলতঃ লাঙ্গল এবং ঘানি ভিন্ন পাড়াগাঁয়ে শিক্ষক সকল কাজেই লাগেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা এই উপলক্ষে বিদ্যা বাড়াইয়া লন; যাহারা বোকা, তাঁহারা জীবন

এবং শিক্ষকতা একার্থবোধক করিয়া লন। নরেন্দ্রনাথ আপাততঃ উভয় দলে থাকিলেন।

রাজহাট বিদ্যালয়ের বালকগণকে নিয়ত "গরু" এবং "গাধা" বলিতে বলিতে শিক্ষকজাতির অনিবার্য্য নিয়মানুসারে নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে প্রকৃতই "গরু" এবং "গাধা" বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু জড়ভরতের কথা তাহাদের উপরেও যে খাটে, এটা তাঁহার বোধগম্য হইল না। পক্ষান্তরে ধরজীর ডাকের চিঠির ঠিকানা লিখিতে লিখিতে নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কেরাণীগিরির বীজ রোপণ করিতেছিলেন; ধরজীর জ্ঞাতিকুটুম্বের ছেলের কাঁথা শেলাই এবং পরিবারস্থ সকলের রিফুর কর্ম্ম করিয়া নরেন্দ্রনাথ সূচীকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্বোপরি গ্রামস্থ দুই চারিজনের নাড়ী টিপিয়া, তিনিও একজন ওলাওঠা সর্পদংশন প্রভৃতির মধ্যে হইয়া উঠিলেন। যখন নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, গ্রামের চাঁদার টাকা ইত্যাদি সমস্ত (অবশ্য তাঁহারই ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য) ধরজীর হস্তে বা শরীরের অন্য কোন দেশে মজুত হইতে লাগিল, তখন ছাত্রদত্ত বেতনের টাকায় রাণীগঞ্জ হইতে ঔষধাদি আনাইয়া দেশে কস্মিন্‌কালেও দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে আরও একটি ফল হইল। নরেন্দ্রনাথ ঔষধের বলে অনেক পরিবারের মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস অজ্ঞাত, একজন বিশিষ্ট কুলীনের সন্তান। ইঁহার প্রথম বিবাহের পর শিবত্বপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইনি আবকারীর মুরুব্বী হইয়া উঠেন। অর্থের কিছু অনাটনপ্রযুক্ত বিষ্ণুরাম একদা "পর-দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" জ্ঞান করেন এবং সেই উপলক্ষে ইহার আত্মপরে তুল্যবোধ দেখিয়া কোম্পানী বাহাদুর ইহাঁকে যত্নের সহিত নিজ ভবনে রাখিয়া ছয় মাস কাল পরিচর্য্যা করেন। যে কারণেই হউক, ছয় মাস গত হইলে একমাত্র কোম্পানীকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করিয়া বিষ্ণুরাম গাঙ্গোপাধ্যায় বহুপ্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া বিক্রমপুরের ভাগ্যধর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনেক টাকা লইয়া সেখানে নিজের কুল ভাঙ্গিলেন। টাকা চির দিন থাকে না, কিন্তু টাকার গরজ চিরদিনেও যায় না, সুতরাং বিষ্ণুরাম বেগের সহিত বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্ব সমেত পঁয়ত্রিশটি বিবাহ হইয়া গেলে, তিনি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অপরিচিত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পাঁচশ বৎসরের এক বালিকাকে কুমারী দেখিয়া, বিষ্ণুরাম সদর্পচিত্তে "বোঝার উপর শাকের আটি" করিলেন, এবং ত্রিরাত্র এখানে বাস করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। বিবাহের অষ্টম মাসে বিষ্ণুরামের নবপরিণীতার গর্ভে এক নব কুমারী জন্মিল। নবকুমারী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় যথাকালে আসিয়া নবকুমারীকে আট চল্লিশ নম্বরে বিবাহ করিল। নবকুমারীর নাম বিমলা; বয়স এক্ষণ তেইশ বৎসর। ইহার মধ্যে

রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় দুইবার রাজহাট আসিয়াছিল। রামকিশোরের শেষবার আগমনের পর দেড় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল।

সাত বৎসর বয়স্ক অতুলচন্দ্র নামে বিমলার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। আমাদের দেশের প্রথা এই যে, স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে, এবং অপরিচিত—(এমন কি, কখন কখন পরিচিত) পুরুষের সম্মুখে তাহারা কখনই আইসে না। পাঠক-সম্প্রদায় যে নিতান্ত অপরিচিত, এ কথা ভুলিয়া গিয়া বা মনে না করিয়া অনেক প্রশস্ত-চিত্ত গ্রন্থকার দেশের রীতির বিপর্য্যয় করিয়া তুলেন। আপনি ঘরের খবর জানেন বলিয়া বিশ্বাসহন্তা গ্রন্থ-লেখক, নায়িকা, উপনায়িকা, অনায়িকা, আবশ্যক, অনাবশ্যক সমস্ত স্ত্রীলোককে সশরীরে পাঠকগণের সমক্ষে টানিয়া আনেন। আমরা ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি, যখন তখন ব্যবহারের বিরোধ করিতে পারিব না। বিমলা দেখিতে শুনিতে কেমন, ইহা জানাইবার প্রয়োজন সত্বেও আমরা তাহাকে বাহির করিতে পারিব না। অতুলের চেহারা দেখিয়া লক্ষণাদি দ্বারা যদি কেহ বুঝিতে পারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, দোষও নাই, আর যিনি বুঝিবেন তাঁহাকেও দোষ দিব না। (আর একটু ধৈর্য্যভিক্ষা) ভাই যদি কুৎসিত হয়, তাহা হইলে সে ভ্রাতার চেহারা দৃষ্টে ভগিনীর রূপের অনুমান বিষয়ে দুই এক জন কখন কখন ঘোরতর আপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অকপট চিত্তে বলিতে পারি যে, সেরূপস্থলে আপত্তিকারীর পক্ষপাত জন্মিবার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবেই থাকিবে। সাক্ষী,—আমাদের প্রতিবেশী বাবু।

অতুলের মা অতুলকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সাত বছরের ছেলে শ্রীমান্ অতুল বাপাজীবন কাপড় পরিতে ভাল বাসিত না; এজন্য প্রায়ই তাহার বিদ্যা-লয়ে যাওয়া ঘটিত না; ঘুন্‌শী-কোমরে অতুলচন্দ্র বাটীর সম্মুখস্থ পেয়ারা গাছে উঠিয়া থাকিত। অতুল যখন গাছে থাকিত, তখন তাহাকে স্থানভ্রষ্ট বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইত না। অতুলের চুল এবং ভ্রূ কটা, মুখের ছাঁদ বাঁদুরে।—নাক কিছু চাপা, কাণ দুখানি পাতলা এবং বড়, রং লোমাবৃত হনুমানের ন্যায়। মহাদেবের বংশে মস্তকের কিছু বাড়াবাড়ি; স্বয়ং শিবের পাঁচ মস্তক, কার্ত্তিকের ছয়টা, গণেশের ত হাতীর মাথা। চারি-দিক্ বিবেচনা করিয়া আমাদের ভরসা জন্মিয়াছে যে, অতুলের মস্তকটী দুটা মাথার সমান হইলেও কেহ তাহাকে অযত্ন করিবেন না। অতুলের হাত দুখানি মহাভারতে বর্ণিত রাজাদের হাতের মত, সরু এবং লম্বা।

নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানী, শাস্ত্রের নজীর মানিতেন না। এই জন্য অতুল দশে পাঁচে বিদ্যালয়ে গেলে নরেন্দ্রনাথ ছড়ি দিয়া অতুলের পিঠের রং পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। প্রিয়তম নরেন্দ্র, আমাদের কথা শুন, অতুলের সঙ্গে আর এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না; আর, যদি আমাদের কথা এখন না মান, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যেন অতুলের সঙ্গে এমনি ব্যবহার থাকে!

রবিবারের সূর্য্য রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কেন, তাহা বলিতে পারি না। সমস্ত দিনমানের মধ্যে রাত্রি আসিল না দেখিয়া সূর্য্য কিছু ব্যস্ত হইল, কিছু রাগান্বিত হইল; রজনী লুকাইয়া আছে বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ধরিবার আশয়ে (—এটা আমাদের অনুমান মাত্র—) সূর্য্য আন্ধার-গৃহে প্রবেশ করিল। অমনি চাতুরী-রহস্যপ্রিয়া সদ্যঃপ্রবিষ্টযৌবনা কামিনীর ন্যায় সন্ধ্যা আকাশময় দীপ জ্বালিয়া দিল, এবং সূর্য্যকে সমস্ত রাত্রি রজনীর অন্বেষণে ঘুরাইয়া অপ্রতিভ করিবার মানসে, রজনীকে জগতে আনিয়া রাখিয়া আপনি কোথায় চলিয়া গেল।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নয়ন মুদিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। মুখে আহার লইয়া ঢোঁড়া সাপ যেমন এক একবার গোঁ গোঁ শব্দ করে, নরেন্দ্রনাথ সেইরূপ মাঝে মাঝে অস্ফুটধ্বনি করিতেছিলেন। তাঁহার একজন সুহৃদ্ একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র উপাসনাকালে এইরূপ শব্দ করিতেন; কিন্তু সুহৃদের কথায় বিশ্বাস করা, না করা, পাঠকবর্গের ইচ্ছাধীন। যাহা হউক, কিঞ্চিৎকাল পরেই নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিলেন; দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় ছাত্র অতুলচন্দ্র উলঙ্গবেশে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অদ্ভুত সমবেদনার বলে অতুলের মুখশ্রী নরেন্দ্রনাথের মুখে প্রতিবিম্বিত হইল। নরেন্দ্র একখানি পুস্তক, একগাছা ছড়ি, একটা কোনকিছু হাত বাড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, অথচ সম্মুখের গুটিকতক দাঁত অল্প বাহির করিয়া, অতুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন ঘাড় বাঁকাইয়া ডান হাতে, ডান কাণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে চুলকাইতে একটু ফোঁস্ ফোঁস্ সুরে অতুল বলিল, মা ব'ল্লে, "ম্যাষ্টর মশায়কে ডেকে নে আয়, দিদীর ব্যামো হয়েছে, তাই আমি—"। কথা শেষ না হইতেই অতুল প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নরেন্দ্রনাথ অমনি গলিয়া গেলেন; "তুই আবার কাঁদিস্ কেন? যা তোর মাকে বল্‌গে আমি যাচ্ছি।" মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে, আড় চোকে চাহিতে চাহিতে অতুল ত চলিয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র! "দিদীর ব্যামো", শুনিয়া তুমি ননীর পুতুলের মত হইলে কেন?

অতুল চলিয়া গেল; নরেন্দ্রনাথ যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। আর এক রবিবারের রাত্রিতে—পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে।—নরেন্দ্রনাথ যেরূপ বেশভূষা করিয়াছিলেন, আজিও সেই অঙ্গের একটু সাজ করিলেন, গর্ণেটের চায়নাকোট অবশ্যই গায়ে দিলেন। বাস্তবিক সেদিন যেমন, আজিও সেইরূপ শুভ উদ্দেশে নরেন্দ্রের যাত্রা; প্রভেদের মধ্যে সেদিন মন্ত্র এবং বাহুবল আবশ্যক, অদ্য বড়ী আর গুঁড়ী আবশ্যক।

নরেন্দ্রনাথ অতুলের বাটীর বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া "অতুল, অতুল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; অতুল তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া বাড়ী ফিরিয়া আইসে নাই, সুতরাং কেহ তাহার ডাকে উত্তর দিল না। চলিয়া যাওয়াটা ভাল হয় না, বিবেচনা করিয়া, দরজার বাহিরে নরেন্দ্রনাথ, আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার মত মাটী খুঁড়িতে লাগি-

লেন,—হাতে নয়, পায়ে। অধিকক্ষণ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া কষ্টভোগ করিতে হইল না, সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই অতুলের দাসী, ক্ষীরো, একটা ঠোঙ্গা হাতে করিয়া বাহির হইতে আসিল। নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন? আমি যাই মাকে বলিগে।" নরেন্দ্র যাহা করিতেছিলেন, তাহাই করিতে থাকিলেন।

একটু পরে ক্ষীরো আসিয়া নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। একটা ঘরে জলখাবার সাজান ছিল, এবং সেইখানে, একখানা গালিচার আসন পাতা ছিল। ক্ষীরো নরেন্দ্রনাথকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেল। স্রোতের মধ্যে কঞ্চি, কি সেই প্রকার অন্য কোন বস্তু পোঁতা থাকিলে তাহার উপরটা যেমন করে, নরেন্দ্রনাথ আসনে বসিলে পর তাঁহার চক্ষু সেইরূপ করিতে লাগিল। "খাই কি না খাই, কার কথায় খাব," নরেন্দ্র এই প্রকার ইতস্তত করিতেছেন, এমন সময়ে ফুস্ ফুস্ শব্দে "খাওনা, বাবা, তুমি ঘরের ছেলে, তোমার আবার লজ্জা কি?" তাঁহার কাণে বাজিল; এত মিষ্ট কথার জন্য কাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, এই নিশ্চয় করিবার অভিলাষে শব্দের দিকে, তাঁহার নয়নে যতদূর হইতে পারে আড় করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দীপছায়ায় প্রথমে দেখিতে পান নাই যে, তাঁহার সাড়ে চারি হাত অন্তরে বাম দিকে, নাকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ঘোমটায় ঢাকিয়া একজন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। নরেন্দ্র যখন তাহাকে দেখিলেন, তখনই তাহাকে অতুলের মা বলিয়া নরেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল; বাস্তবিক তিনি অতুলের মা। নরেন্দ্রের জলযোগ চলিতে লাগিল।

ফুস্ ফুস্ হইতে ক্রমশঃ প্রায় গর্জ্জন পর্য্যন্ত অতুলের গর্ভধারিণীর গলা উঠিল, এবং তাহার মধ্যে অনেক বিনয়ের সহিত এই কথাগুলি বলা হইল,—"অতুল শিশু, অতুলের অভিভাবক কেহই নাই; বছর ঘুরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার বছর যাইতেছে, তবু জামাইটীর কোন খবর পাওয়া যায় নাই; তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও জানা নাই, তা না হ'লে অতুলকে পাঠান যেত; অতুলের লেখা-পড়া কিসে হবে, বাড়ীর খরচপত্রই ভালরূপ চলে না; বিমলার অসুখ, খেতে রুচি নাই, খেলেই বমি হয়, মুখ শপ্ শপ্ করে, দিন দিন যে কেমন হয়ে যাচ্ছে, রং হচ্ছে যেন কাঁচা হলুদ বাঁটা, গায়ে যেন রক্তমাত্র নাই; এখন কি যে হবে, ভেবে অস্থির; যাতে মেয়েটী বাঁচে; আর ছেলেটী মানুষ হয়, তা নরেন্দ্রকে করিতেই হইবে। নরেন্দ্র না করিলে আর কে করিবে? এখন ছেলে আর মেয়ে নরেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ, রাখিতে হয়, নরেন্দ্র রাখিবেন, মারিতে হয় নরেন্দ্রই মারিবেন; মেয়ে মানুষের সহায়ও নাই, সম্পত্তিও নাই।"

নরেন্দ্রনাথ কিছুই খাইতে পারিলেন না; যাহা মুখে দেন, তাহাই যেন গালের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়; আহ্লাদেই তাঁহার পেট ভরিয়া গেল; একটা সন্দেশ আস্ত

গিলিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথের চক্ষুর্দ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নরেন্দ্র মনে করিলেন, "আহা! ইহাদের কি সৎ স্বভাব। অনায়াসেই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনা যাইবে। পাপময় কুলপ্রণালীতে ইহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপায় নাই। এখন যাহাদিগকে উদ্ধার করিলে দেশের মঙ্গল, তাহারা আর হীনাবস্থায় হিন্দুকুসংস্কারের জালে জড়িত হইয়া কষ্ট না পায়, ইহা করা চাই" এই সঙ্কল্প করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "পরের হিতের জন্য মনুষ্যের জন্ম; ধর্ম্মই আমার ব্রত; আপনি স্বয়ং আমাকে ডাকাইয়া বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছেন। আপনার হিতের জন্য আমি প্রাণপণে যত্ন করিব, তাহার চিন্তা নাই। অতুল পড়িতে যায় না, কিন্তু ছেলে মানুষ, একটু জ্ঞান হইলে অবশ্যই যাইবে। যাই হউক, যতদিন না যাইতে চায়, আমি অবকাশক্রমে সন্ধ্যার পর আসিয়া প্রত্যহ তাহাকে পড়া বলিয়া দিয়া যাইব, সে জন্য ভাবিতে হইবে না। আর বিমলার অসুখ, তা, তা অবশ্যই শীঘ্রই সারিয়া যাইবে; তবে কিনা, এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু একবার দেখিলে ভাল হয়; পীড়াটা কি, তার নিরূপণ করিবার জন্য রোগী দেখাটা দরকার।"

নরেন্দ্রনাথ এক গুলিতে হাজার কাক মারিলেন। এক কোপে বল্লাল এবং অবল্লাল সকলেরই চৌদ্দ পুরুষকে কাটিবার জন্য খড়্গ তুলিলেন। নরেন্দ্রনাথের দল হইতেই ভারতবর্ষ আলোকে ঝলসিয়া যাইবে। সাধু! সাধু!

অতুলের মা ব্যগ্রভাবে নরেন্দ্রের কথায় সম্মতি দিলেন; অন্য একটা ঘরে গিয়া বিমলাকে দেখাইলেন; বিমলা ঘাড় তুলিল না, কথা কহিল না। সে দিনকার মত নরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। তার পর অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র অতুলদের বাড়ীতে ঘড়ির কাঁটার মত হাজির হইতেন। কিন্তু অতুল নরেন্দ্রের পূর্ব্ব প্রেম ভুলিতে পারে নাই; সে জন্য অতুল বিকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকিত না, শেষে নরেন্দ্রনাথও তাহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদের বাটীতে থাকিতেন, তাহাকে না পাইয়া কাজে কাজেই রোজ ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তথাপি অতুলের বিদ্যাবুদ্ধি বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিদ্যালয়ে দেখিতে পাইলে, আর পূর্ব্বের ন্যায় মারিতেন না, বরং সকল বালক অপেক্ষা তাহাকে আদর ও স্নেহ করিতেন; ইহাতেই আমরা বুঝিয়াছি যে, অতুলের বিদ্যা বাড়িতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"অঘটন ঘটালে বিধি।"

পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় দিন যায়, রাত্রি আইসে! পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ অতুলদের বাড়ী যান, এবং বাসায় আইসেন! যে কারণে নরেন্দ্রনাথ যান, তাহার কার্য্য কি হয় বলা যায় না, কিন্তু কারণের ধ্বংস হয় না। অতুলের বিদ্যা বিলাতী বটের আটার মত স্থিতিস্থাপক, নতুবা একদিন গিয়া নরেন্দ্রনাথ যে টুকু বাড়াইয়া আইসেন, তাহারই জন্য আবার যাইতে হইবে কেন? আর বিমলার পীড়া?—তাহা ত শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় প্রতিক্ষণেই বাড়িতেছিল। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যদি পীড়ার কোন আনুষঙ্গিক উপসর্গ হইত, নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই তাহার প্রতীকার বা দমন করিতেন, তাহা না হইলে প্রতিদিন তাঁহার তত্ত্ব লইয়া ফল কি হইত?

ভাল মন্দ দুই প্রকারেরই লোক সকল স্থানেই আছে! রাজহাটের ৫।৭।১০ জন লোক (ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক) নরেন্দ্রনাথের কথা লইয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল; কাজেই সে কথার একটু জানাজানিও হইল। কিন্তু রাজহাটের অধিকাংশ ব্যক্তিই ভদ্র, এজন্য অতুলদের বাটীর কোন প্রসঙ্গ লইয়া কেহ কোন গোলযোগ করিল না। গ্রামের এক ব্যক্তি বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথের উপচিকীর্ষার গৌরব করিতে লাগিলেন।

গ্রামের লোকের ভদ্রতা ব্যতীত গোলযোগ না হইবার আরও একটী কারণ ছিল। কালীনাথ ধর মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের পনর দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে যেন ভূমিকম্প হইতেছিল; এজন্য লোকের অন্য অন্য বিষয়ে মন দিবার অবকাশ অতি অল্প ছিল।

ধরজীর পুত্র একটী মাত্র। যে পুত্রের বিদ্যার শিক্ষার জন্য অসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিয়াও ধর মহাশয় রাজহাটে বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, সে ছেলের বিবাহে কিছু ধুমধাম হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। ছেলের বয়স নয় বৎসর, শরীর কিছু রুগ্ন, পেটে একটু পাত পিলে, চোক দুটী একটু কাঁওলা কাঁওলা, গলা কিছু সরু, হাত পাও একটু সেই রকম; কেবল পেটের ভিতরে পিলে, উপরে চামড়া, মাঝে কতকগুলি শির থাকাতে পেটটী কমে নাই। এইরূপ বিবিধ কারণবশত ধরজীর শূদ্রাণী (ব্যাকরণ-বিশারদ! ক্ষমা করিবেন) ছেলেকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং মরিবার পূর্ব্বে বড়ঘরের বৌ আনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ধরজীও ছেলেটীকে ভাল বাসিতেন, দেহের অনিত্যভাবও স্বীকার করিতেন; প্রপৌত্রাদির মুখ দেখিতেই ইহার উৎকট বাঞ্ছা ছিল; যাহার

ঐশ্বর্য্য থাকে, ছেলে-মেয়ের সকালে-সকালে বিবাহাদি না দেওয়া তাহার মহাপাপ; এবং তিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ ও তাঁহার দরিদ্র ভায়ারা অনেকগুলি, এ সমস্ত জ্ঞানও ধরজীর ছিল। সুতরাং ধরপত্নী নানারূপ ছল-কৌশলে স্বামীর মন লওয়াইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে দুজনের মনে চাঁদ-চকোরের মিলন হওয়াতে, বিবাহের কথা নিশ্চিত হয়।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাত্রী স্থির করা হইল। বিবাহের জন্য প্রজাদের নিকট চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। গ্রামস্থ লোক ধরজীর প্রজা; এজন্য বলা হইয়াছে, পনর দিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সাত দিন থাকিতে বিদ্যালয় বন্ধ হইল, নরেন্দ্রনাথকে উৎসবে মাতিতে হইল। নৌবৎ বসিল, তেল-হলুদের ছড়া-ছড়ি হইতে লাগিল। বৃহৎ ব্যাপার, কেহ খাইতেছে, কেহ গালি দিতেছে, কেহ উপ-বাস করিয়াই দিন কাটাইতেছে, কেহ জল তুলিয়া কুলাইতে না পারিয়া বকিতেছে, কেহ বা অকারণে কলসী কলসী জল ঢালিয়া উঠান কাদা করিতেছে; একটী স্ত্রীলোক চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া ভাতের হাঁড়ি যেই নামাইতে গিয়াছে, অমনি কেন পড়িয়া তাহার দুই পা পুড়িয়া গেল, ভাত উনলে পড়িয়া গেল, পাড়ার একটী গুজরাটী-বউ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সেই দিকে দৌড়িতেছিল, উঠানে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, আর দশজনে হাসিয়া উঠিল, গিন্নী গোছের একজন দেখিতে আসিল, তাহার খোপার ফুল ভাঙ্গিয়াছে কি না; একজনকে ডাকিয়া ডাকিয়া আর কয়জনের গলা চিরিয়া গেল; কতকগুলি আলস্যহীন স্ত্রীলোক, ধরপত্নীর বন্দোবস্তের প্রশংসা করিতে লাগিল। এ গণ্ডগোল একদিন নয়, ক্রমাগত সাত দিন হইতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের দিবস উপস্থিত। সে দিনকার বন্দোবস্তের গুণে, কেহই কাহাকেও কিছু বলিতে বা কাহারও কোন কথা শুনিতে পারিল না। যে গ্রামে বিবাহ হইবে, তাহার নাম নিশ্চিন্তপুর, রাজহাট হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ। সুতরাং মধ্যা-হ্নের পূর্ব্ব হইতে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। হাতী, ঘোড়া, পাল্কী সব যুটিতে লাগিল; এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আদেশ দিতে, পরামর্শ করিতে যখন সকলেরই গলা বসিয়া গেল, এবং কেবল মুখ খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে পরস্পরের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তখন——(সন্ধ্যার পরক্ষণেই) রাজহাট হইতে বিবাহ রওনা হইল। পূর্ব্বাবধি মহণা স্থির করা ছিল, সুতরাং নরেন্দ্রনাথ একজন বরযাত্রী হইয়া একখানি পাল্কী অধি-কার করিলেন; গর্ণেটের চায়না কোটটী ছাড়িলেন না। বহুতর লোক সঙ্গে চলিল, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ধর মহাশয় স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া চলিলেন।

বাদ্যভাণ্ড এবং আতস বাজী অনেক প্রকার হইয়াছিল—"বিস্তারে বর্ণিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।" ইংরাজী পরিচ্ছদের সপ্তম নকলে ভূষিত হইয়া কতকগুলা মসীকৃষ্ণ পুরুষ লাল-বনাতের অন্তরাল হইতে "গড়ের বাদ্যের" পরিচয় দিতেছিল। কেবল

তাহাদের মধ্যে একজন একটা প্রকাণ্ড জয়ঢাক পিঠে করিয়া আগে আগে যাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে হস্তদ্বারা চক্ষুর জল মুছিতেছিল। একটা মুদ্গর হস্তে অপর একজন সেই জয়ঢাকের উপর আঘাত করিতে করিতে চলিয়াছিল। যাহার পৃষ্ঠে জয়ঢাক, যাহার উপর আঘাত, কেবল তাহার পোষাক ছিল না; ইংরেজের দলে সেই একমাত্র বাঙ্গালী। বিবাহকাণ্ডের মধ্যে ইহার তুল্য অবস্থা আর একজনের—সে কালীনাথ ধরের পুত্র—বিবাহের বর।

বিবাহের লগ্নভ্রষ্ট হইবার অতি সামান্য কাল পরেই, রজনী তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, যথাসময়ে নিশ্চিন্তপুরে বিবাহ পৌঁছিল। গ্রামের মধ্যে যে পথ দিয়া বিবাহ যায়, তাহারই দুই পার্শ্ব হইতে অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূগণ—(গণ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া কন্যাপক্ষীয় কেহ যেন ব্যাকরণের দোষ ধরিয়া, বিবাহসভায় একটা লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত না করেন)—উঁকি দিয়া দেখিতে থাকে, এবং আমোদপ্রিয় দশ অবধি বিশ বর্ষবয়স্ক বালকগণ লোষ্ট্র নিক্ষেপণ দ্বারা বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির পরীক্ষাও করিতে থাকে। পাল্কীর দরজা খুলিয়া চিৎ হইয়া নরেন্দ্রনাথ ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইতেছিলেন। সোণার বেণের মন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোমল ইষ্টকার্দ্ধ আসিয়া তদীয় উদরের উপর ধপ্ করিয়া পড়িল. তিনি জাগিয়া উঠিলেন, ক্ষেপণ-কর্ত্তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন, এবং স্থির করিলেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই একজন "ভ্রাতার" মধ্যে, নচেৎ বিনাস্বার্থে তাঁহার এ প্রকার উপকার করিবে কেন? অর্থাৎ এই ইটখানি না থাকিলে এ গ্রামে (নিশ্চিন্তপুরে) কতকগুলি স্ত্রীলোক স্বজাতির দুর্দ্দশা এবং সংসারের দুর্গতি এবং অবনতির সাক্ষী স্বরূপ আছে. তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন না।

বিবাহের বাটীতে সকলে একে একে পৌঁছিল। ধর মহাশয় এবং নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বশেষে পাল্কী হইতে বাহির হইলেন। চতুর্দ্দিকে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি করিতেছিল, ইহাদের দুই জনকে দেখিয়া সকলে এককালে নিস্তব্ধ হইল। ইঁহারাও ক্রমে সকলের সহিত আসন গ্রহণ করিলেন। নিশ্চিন্তপুরের একজন যুবক আপ্যায়িত করিয়া নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়দের ক পুরুষ এ রকম?" আর একজন চীৎকার করিয়া উঠিল "এমন বরযাত্র কটী"? তৃতীয় এক ব্যক্তি উত্তর দিল,—"জয়ঢাক সমেত তিনজন।" বর কন্যা উভয় পক্ষের প্রায় ২০।২৫ জন সেখানে বসিয়াছিল, সুতরাং নানা প্রকার বিদ্যাঘটিত আলাপ এবং বৈবাহিক-সরস-কথোপকথনে সেস্থানে একটী ছোটখাট হাট উপস্থিত হইল এবং সুশৃঙ্খলরূপে সকল কথার মীমাংসা হইতে লাগিল। দুইটী বাবু কলিকাতা হইতে ধানগাছ দেখিতে আসিয়াছিলেন; এবং অদ্যকার বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া জানিতে পারেন যে, তখন ধানের সময় নয়; সুতরাং ধান্য একেবারে রোপিত হইলে চিরদিন বাড়িতে থাকে না;—এই কথা শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হন, এবং অদ্য তাহাই লইয়া খেদ করিতে-

ছিলেন, নিশ্চিন্তপুরের পাঁচ ব্যক্তি অবহিতচিত্তে ইহা শুনিতেছিল এবং বাবুদ্বয় ধানের কলম লইবার যে বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছিল।

এইরূপে শ্রেণীমত গোল হইতেছে, এমন সময়ে একজন আসিয়া করযোড় করিয়া বলিল, "বাড়ীর মধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ, অনুমতি হয় ত পাত্র সভাস্থ করা যায়।" এই জিজ্ঞাসাটী বিবাহের অঙ্গের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে; ইহার উত্তরও তদ্রূপ—"কন্যা দেখব না ত কি, তোমাদের দেখতে এসেছি না কি ?" পাত্রকে একজন কোলে করিয়া লইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে বাটীর মধ্যে যাইবার জন্য আর কয়জন উঠিল,—তন্মধ্যে—(বলিতে সাহস হয় না)—নরেন্দ্রনাথ! ইহারা যাইবার উপক্রম করিতেছে, অমনি গর্জ্জন করিতে করিতে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "একি ইয়ারকি? ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ীর মধ্যে যাবে কি? বড় একখান চালাকি করবে ত একে একে গলাটিপি দিয়ে সকলকে টের পাইয়ে দেব।" মিষ্ট অভ্যর্থনা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে সকলের পশ্চাতে সরিয়া পড়িলেন; তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া একে একে সকলেই বসিয়া পড়িল, এবং পরস্পর কেহই যেন আসন ত্যাগ করে নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বেশীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মুখ আটা-আটা করিতে লাগিল;—তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন, বিকটপুরুষ তাঁহার হাটখোলার মিত্র—রামদাস।

স্তম্ভিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বসিয়া রহিলেন। নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে কেহ যেন জাগাইয়া দিল, নরেন্দ্রনাথ বাপান্তবাগীশকে একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আজি রামদাসকে দেখিয়া ইহার মন বাপান্তবাগীশময় হইয়া উঠিল। রামদাস কেন এখানে আসিল, কিরূপেই বা আসিল, নরেন্দ্রনাথ কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গোড়াগুড়ি রামদাসকে তিনি ভয় করিতেন; এখন মনে হইল, নিশ্চিত বাপান্তবাগীশ, রামদাসকে তাহারই অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে।

বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল, বর বাসরগৃহে গেল; বাসরঘরে অনেক স্ত্রীলোক জমা হয়, এবং তাহারা সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহে না, ও স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার করে না। তাহারা আমাদিগকে লজ্জাভয় না করে, নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ভরসা করি, কোন পাঠকের বে-আদবী আমাদিগকে মাফ করিতে হইবে না।

ক্রমে আহারাদির জন্য স্থান করা হইল; বাহির বাটী হইতে সকলকে ডাকিয়া আনা হইল; কেবল নরেন্দ্রনাথ রামদাসের ভয়ে রাত্রি প্রভাতের আপত্তি করিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাইবে? রামদাস বহুতর পরিশ্রমে কাতর হইয়া, সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে আইসে। রামদাসকে পুনর্ব্বার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ হাল ছাড়িয়া দিলেন।

রামদাস প্রথমবারে "মাইডিয়ারকে" দেখিতে পায় নাই। এবার দেখিতে পাইল: চীৎকার করিয়া উঠিল। রামদাসের বিশ্রাম-লালসা দূর হইল।

হতাশ্বাস হইয়া নরেন্দ্রনাথ রামদাসের সহিত আলাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামদাস-পক্ষে আলাপের ঝড় বহিতে লাগিল, নরেন্দ্রপক্ষে আলাপের প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া এদিক্-ওদিক্ করিতে লাগিল। বিস্ময়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের সমুদায় অবস্থার কথা রামদাস জানিতে ইচ্ছা করিল; নরেন্দ্র যথাসম্ভব উত্তর দিয়া মৌনী হইলেন।

রামদাস কলিকাতার সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিল। গল্পের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ একটী সুমিষ্ট সংবাদ জানিতে পারিলেন। সংবাদটী এই;—কলিকাতায় এবার ওলাউঠার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, হরিদাস ঘোষ ইস্কোয়ের, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সেই ভয়ে কিছু অধিক পরিমাণে সুরা সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন।... এক রাত্রিতে * * * এর বাটীতে আমোদের ছড়াছড়ি হইতেছিল, রামদাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। হরিদাস বাবুও ছিলেন, কিন্তু ওলাউঠার প্রতীকার অধিক পরিমাণে তাঁহার উদরস্থ হয়। সেই জন্য হরিদাস উড়িবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু বহুকালের এই প্রস্তাবে আজি পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়া রামদাস প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব অপারগতা জানাইল। হরিদাস ক্ষান্ত হইল না, উড়িল। অমনি বারাণ্ডার উপর হইতে রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। একজন পাহারাওয়ালা পরক্ষণেই উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায়, হরিদাস মৃদু জড়িত স্বরে উত্তর দেন, "বাবা, পক্ষী জাতি রাত্রিকালে অন্ধ হয়, একথা মনে ছিল না। এই ভোর হ'বে, আর উড়্ব।" সত্য সত্যই তাহাই হইল; প্রভাত হইবামাত্র হরিদাসের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। একটা মানুষের মত মানুষ—তার একজন প্রধান যজমানের মৃত্যু হইল, উপরন্তু, কলিকাতার নানারূপ আপদ্-বিপদ্,—উপস্থিত ওলাউঠা,—চারি দিক্ বিবেচনা করিয়া, উক্ত ঘটনার দুই দিন পরেই, বাপান্তবাগীশ সপরিবারে, কাশীবাস করিতে চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। হরিদাসের মৃত্যুবিষয়ে অনুসন্ধান হওয়াতে আরও দুই তিন জনের নাম অকারণে উপস্থিত হইয়াছে এবং পুলিশ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। ৫।৬ দিন সেখানে থাকিয়া আগুন নিবিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত রামদাস নিজ শ্বশুরালয় নিশ্চিন্তপুরে থাকিবেন; আর দুই জন ভদ্রলোক যাহাদের নাম হইয়াছিল, তাহারাও রামদাসের সঙ্গে এইখানে আসিয়াছেন। কলিকাতার এক চিঠিতে রামদাস সংবাদ পাইয়াছে, আর কোন গোলমাল নাই। অতএব সত্বর কলিকাতা যাইবার সম্ভাবনা। নরেন্দ্রনাথ আর কত দিন এ দেশে থাকিবেন? নরেন্দ্র তাহা নিশ্চিত বলিতে পারেন না।

আজিকার মিলনে এত সুখ হইবে, ইহা নরেন্দ্রনাথের স্বপ্নের অগোচর। "সত্যমেব জয়তে'—বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদে, গলিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্দেশ্য।

রেলের গাড়ীর সহিত শূকরীর বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই একগুঁয়ে; বেগে দৌড়িয়া যায়, এবং যাইবার সময় সম্মুখ ভিন্ন পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপও করে না, এবং অভিমুখ পথের এক পাও এদিক্ ওদিক্ ব্যতিক্রম করে না। তদ্ভিন্ন একবার মাত্র প্রসব করিলে উভয়েই এক একটী ষষ্ঠীদেবীর প্রতিপালন করিতে পারে।

হে বাষ্পীয়-শকটারোহি-পাঠকবৃন্দ! এবম্বিধ অলঙ্কার প্রয়োগ দেখিয়া এ অধীনের প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইবেন না। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে গাড়ীর গর্ভে নিহিত করিয়া, আমরা অন্যান্য কথা বলিতেছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ভোগের কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের জন্য উপরি উক্ত উপাদেয় উপমার সমাবেশ করা হইয়াছে।

গাড়ী-শূকরী প্রসববেদনায় কাতরা হইয়া হাওড়া ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তিনী হইলে মন্থর-গতিতে চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ এ-দিকেই গুটীকতক শ্বেতসন্তান বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে যখন ষ্টেশনের ভিতরে গাড়ী গেল, তখন অন্যান্যের পর মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে টানিয়া বাহির করা হইল। ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলে কোলাহল করিতে করিতে দৌড়িল; এবং আমাদের বন্ধুদ্বয় আর দশজনের সঙ্গে গঙ্গাপার হইয়া মহানগরীতে উপস্থিত হইলেন।

তখন ভোরের সম্মানে তোপ পড়িল। একদল ব্যবসাদার আধলা পয়সার রাশি করিতে লাগিল; ভারবহনে ভগবতীর অংশসকল কলিকাতায় বায়ান্নপীঠে চলিতে লাগিল: বসাচোখ শুষ্কমুখ,-ঈষট্টলপদ বাবুগণ, পাগড়ীরূপে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আপন আপন বাসার দিকে চলিতে লাগিল; অধিকাংশ ব্যক্তি একে একে জাগিতে লাগিল, একশ্রেণীর লোক ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। গবেশচন্দ্র একবার মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল, "হাটখোলার কোন্ রাস্তা," এবং "একখানা গাড়ী না হইলে যাওয়া যাইবে না" ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। একটা টাকা অকারণে গেল, মধুসূদন তাহাই ভাবিতে-ছিল। অবশেষে গবেশ মুখ ফুটিয়া গাড়ীর কথা বলিল, মধু সাহস করিয়া তাহার প্রতি-বাদ করিল। অগত্যা একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহারা দুই জনে উত্তরমুখে চলিল।

হাটখোলায় পৌঁছিয়া একজন দোকানদারকে গবেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিয়া দিল, "হাটখোলা ফেলে এলে, বরাবর দক্ষিণমুখে যাও।" উপদেশমতে উভয়ে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু একরশি পথ যাইতে না যাইতে আহিরীটোলার ঘাটে একখানা

গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া গবেশের অত্যন্ত কষ্টবোধ হইয়া উঠিল, আর হাঁটিতে পারিল না। ছয় আনা ভাড়া সুস্থির করিয়া উভয়ে হাটখোলা যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিল। সুবুদ্ধি গবেশচন্দ্র মধুকে বলিল, "এ কলিকাতা, এখানে তোমার মত লোকের কর্ম্ম নয়; তুমি যদি একলা হইতে তাহা হইলে এইটুকু পথের জন্য এক টাকা, অভাবে বার আনা ভাড়া তোমার গালে চড় মারিয়া লইত।" "আমি হেঁটে যেতাম" বলিয়া মধুসূদন নীরব হইল। নিমেষমধ্যে গাড়ী হাটখোলায় পৌঁছিল; কিন্তু গাড়োয়ান দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাদের নিরূপিত বাটীর সম্মুখে ইহাদিগকে নামাইয়া দিয়া, একটু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লইল।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত গদিয়ান বাবুর নিকটে গবেশ রায় এবং মধুসূদন উপস্থিত হইলে, উভয়েরই আনন্দের সীমা রহিল না; গবেশ পথের ক্লেশ হইতে এবং মধুসূদন মোটের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল; অনেক আলাপ আপ্যায়িত ইত্যাদি শিষ্টাচার প্রদর্শনে কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে না পারিয়া, অগত্যা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নরেন্দ্রনাথের কথা পড়িল। বিবিধ সন্দেহ, অনেক তর্কবিতর্ক এবং আন্দোলনের পর স্থির হইল যে, আপাতত নরেন্দ্রনাথের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং এখানে থাকিয়া দুই একদিন দেখা কর্ত্তব্য। এই পরামর্শ স্থির হওয়াতে মধুর কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিল; যে কয়দিন সহোদরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, সে কয়দিন সহোদরের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। গবেশের পরম আহ্লাদ হইল; এই দুই চারি দিবসে যেমন হউক দশ জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ও আমোদ প্রমোদ হইতে পারিবে।

মধুসূদন এবং গদিয়ান বাবু বিকালে নরেন্দ্রনাথের বাসাবাটীতে গেলেন। সেখানে নরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না, নরেন্দ্রের কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে বামাস্বরে "কে গা?" শুনিয়া ইহারা প্রবেশ করিতেও পারিলেন না। গবেশ ইহাদের সঙ্গে যান নাই; "ইতিমধ্যে" নরেন্দ্র যদি হাটখোলার বাসাতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখিবে কে? অগত্যা গবেশ গদিয়ান বাবুর বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। প্রতিদিন অনুসন্ধান হইতে লাগিল। মধুসূদনের কষ্টের পয়সা; মধুসূদন পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতার গলি গলি যেখানে যেখানে নরেন্দ্রনাথের যাইবার ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিতে লাগিল; যে ব্যক্তিকে মধু যেদিন সঙ্গে লইত, সে আর দ্বিতীয় দিন মধুর সহিত আলাপ করিত না। গবেশচন্দ্রের নিকট মধুসূদনের "যথাসর্ব্বস্ব" ছিল; সুতরাং মধুর উপকার না করিলে কৃতঘ্নতা হইবে ভাবিয়া গবেশও প্রতিদিন গাড়ী করিয়া গড়ের মাঠে, রাজেন্দ্র মল্লিকের বৈঠকখানায় এবং চিড়িয়াখানায়, সাতপুকুরের বাগানে এবং আরও বহুতর স্থানে নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত।

একদিন স্নানাদির পর গদিয়ান বাবু মধুসূদন ও গবেশচন্দ্র রাস্তার দিকে বারাণ্ডায়

দাঁড়াইয়া তামাকের ধুঁয়ায় স্ব স্ব অন্তরাকাশে উদিত নরেন্দ্রের জন্য ভাবনা-মেঘের বৃদ্ধি করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই গবেশের ফুস্ ফুস্ হইতে প্রবোধ-বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। "খুঁজিলেই যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবনা কি? আমি কি রাজ্য খুঁজি না? (মধুর প্রতি) তুমি কি চটের দোকান ছাড়িয়া একটু বড় গোছের কারবার খোঁজ না? এ ত দুরাশা নয়, তবে কেন হয় না?—ভোগ, যত দিন পূর্ণ না হয়, তত দিন ভুগিতে হয়। এ কথা তোমার আমার মত লোকের নয়, মিশরদেশীয় একজন মহাকবি, ঊনপঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে একথা বলিয়া গিয়াছেন। আর এক কথা;—বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকা উচিত, যখন যাহা আছে, তখন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে—(গবেশের নিকট মধুর কয়েকটী টাকা এখনও আছে)—এ কথাও একজন মার্কিনদেশীয় পণ্ডিতের। দেশ ছাড়িয়াই বা কাজ কি? স্বয়ং—পরাশর বলিয়াছেন, 'আত্মতুষ্টে জগৎ তুষ্ট'। তবে কেন? যাহার যাহা আছে, তাহাতেই ক্ষান্ত হইবে। এখন আমাদের নরেন্দ্র নাই, সুতরাং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। না হও, ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইবে অর্থাৎ আন্তরিক অসন্তোষ, মনের অসুখ নিশ্চিত ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য আমি বলি যে, বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাউক, সময়ে অবশ্যই নরেন্দ্রকে পাওয়া যাইবে। একে ত নরেন্দ্রের জন্য আমাদের মনের কষ্ট, তাহার উপর শরীরে কষ্ট দিলে ক্ষতি বই লাভ নাই! আমার কথা শুনিতে না চাও, উত্তম, কিন্তু আমি আর ঘুরে ঘুরে বেড়াইতে পারি না।"

গবেশ! তোমার পেটে এত সার! হে অম্মদ্! হে উত্তম পুরুষ! তুমি কেন এত লিখিয়া তোমার অঙ্গুলিকে কষ্ট দিতেছ? যে জন্য লিখিতেছ, তাহা কি খুঁজিলে পাইবে? যখন পাইবার হইবে, আপনিই পাইবে! তবে কেন? আবার কেবল তোমার কষ্ট নয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" নির্জীব পক্ষীর পালক কে কাটিয়াছে, চিরিয়াছে; তাহাতে মর্দন করিতেছ। তোমাকে উপদেশ দিতেছি, লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার কথায় না ছাড়, শেষে সমালোচক মহাশয়ের তাড়ায় ছাড়িবে; তাহা কি তোমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে? অহং ত তখন ঘাড় তুলিতে পারিবে না? নিজের কিছু অর্থ এবং সুখ্যাতির লোভে এবং দেশের উপকারে যদি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও বলি, ঢের হয়েছে, এখন ইস্তফা দাও। অনেক উপায় আছে, যদ্দ্বারা দেশেরও কল্যাণ হয়, আপনারও হিত হয়। ইহার মধ্যে একটী অবলম্বন কর, দোষ দিব না। ঐ দেখ পাঠক! বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী,—তাহারাও ত লেখা-পড়া রীতিমত করিয়াছে?—কেমন অজ্ঞানতিমিরাবৃত দেশে বোতল বোতল সভ্যতা ও জ্ঞানের আমদানি করিয়া মাতৃ-ভ্রাতাদের (অর্থাৎ সুবিমামার দেশের লোকের) নিকট দিনে দিনে পরিবর্দ্ধনশীল আদর লাভ করিতেছে, পয়সাও পাইতেছে। আরও উপায় আছে; রাধাচরণ থানাদার হ'লে হয় না; প্রাণান্তে কাহারও সম্মান করে না, কল কথা, কাছে পাইলে কাহাকেও

ছাড়ে না। তাহার বিরুদ্ধে কেন বিনামী দরখাস্ত দাও না ? সে বশীভূত হউক না হউক—আর হইবে না, এ কথাও নিশ্চিত—তোমার ত কাজ হইবে। দেখ দেখি, ভবানীরঞ্জন ঐ পথ অবলম্বন করিয়া কি না করিল ? দশ জনে চিনিল, গৌরব বৃদ্ধি হইল, গরিবউল্লার সর্ব্বনাশ করা হইল, নিজের কিছু লাভও হইল। এক এক করিয়া কত বলিব ? এমন দশ হাজার সত্নপায় আছে। কোনটাই ভাল না লাগে তুমিই উৎসন্ন হইবে।

এত বলিলাম, উত্তম পুরুষ মানিল না। গবেশ এত উপদেশ দিল, সব "ভস্মে ঘৃত" হইল। আমি লিখিতে থাকিলাম, গদিয়ান বাবু এবং মধুসূদন নরেন্দ্রের জন্য ভাবিতে লাগিলেন।

গদীয়ান বাবু বলিলেন,—"রামদাস কিছু দিন হইতে নিরুদ্দেশ, নতুবা তাহার নিকট সন্ধান পাইলেও পাওয়া যাইতে পারিত। আমার বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ তাহারই খপ্‌পরে পড়িয়াছে।"

এইরূপ সকলে ভাবিতেছেন, পরামর্শ করিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে—বিধাতার কৌশল! —গদিয়ান বাবু দেখিলেন, রামদাস পথ দিয়া যাইতেছে। রামদাসকে উচ্চস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু রামদাস শুনিয়াও শুনিল না, ফিরিয়াও চাহিল না। গদিয়ান বাবুর এক যোড়া শাল লইয়া যাওয়া অবধি,রামদাস তাঁহার সহিত আলাপ করিত না, তাঁহার মুখাবলোকন করিত না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত। পুনঃপুন আহ্বান করাতে রামদাস শুনিতে পাইল, কিন্তু ঘাড় না তুলিয়াই "আস্‌ছি—এই একটু কাজ আছে" বলিয়া চলিতে লাগিল। তাহাতেও গদিয়ান বাবু ছাড়িলেন না, অগত্যা রামদাস সাহসে ভর করিয়া উপরে আসিলেন।

রাম। "কি মহাশয় ? নয় আমরা দুঃখী লোকই, তা বলিয়া কি পায়ে ঠেলতে হয় ? কি এমন করেছি, যে দশ জনের সাক্ষাতে, যা নয় তাই—।"

গদিয়ান। "কৈ রাম বাবু, আমি ত তোমায় কিছুই বলি নাই। শালের কথার কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই। তবে চট কেন ? তোমায় দেখ্‌তেই পাই না, তা বলব কবে ? এখন সে কথার জন্য তোমায় ডাকি নাই ; নরেন্দ্রনাথের কোন খবর বলিতে পার ?"

রাম। "আপনাদের নরেন্দ্র আপনারাই জানেন, আমি গরিব লোক, আপন লই-য়াই শশব্যস্ত, পরের কথায় আমার কি কাজ। আমরা জল-পুরিয়াও খাই না, বাবু বাবড়ার খবরও রাখি না।"

গদিয়ান বাবু বুঝিলেন। শাল কখনও ফিরিয়া পাইবেন, তাঁহার এ দুরাশা কোন দিন হয় নাই। এজন্য রামদাসকে সে শাল ছাড়িয়া দিলেন, এবং পুনর্ব্বার বিনয়পূর্ব্বক নরেন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছু ইতস্ততঃ

করিয়া এবার রামদাস বলিয়া দিল। পর দিবস সকালে গবেশ ও মধুসূদন নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রাজহাট যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধ পূরিল।

কালীনাথ ধরের পুত্রের বিবাহ হইয়া গেলে বর, কন্যা, বরযাত্রী প্রভৃতি সকলে রাজহাটে আসিল। বেলা দেড় প্রহরের সময়ে বাদ্যভাণ্ড করিতে করিতে ইহারা যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন আগন্তুক কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিলে চৈত্র মাসের সঙের ব্যাপার অবশ্যই মনে করিত। দলের মধ্যে কাহারও আগাগোড়া সাদা কাপড় ছিল না। কেহ আপাদ মস্তক লাল, কেহ গোলাপী, কেহ চিতা বাঘের মত লোহিত, পীত, কপিশাদি বিবিধরাগ-রঞ্জিত। একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আধপোড়া হাঁড়ীর মত দেখাইতেছিল, এবং তাহার নিতম্বের উভয় পার্শ্বে পরিধেয় বস্ত্রোপরি দুইটী সিন্দুরাভ ফুল কাটা হওয়াতে তাহার রূপ যেন সত্য সত্যই ফাটিয়া পড়িতেছিল। সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, এই বিবাহের উপলক্ষে কন্যাপক্ষীয়ের বহু টাকার চূণ, হরিদ্রা, ম্যাজেণ্টা, হাঁড়ীর কালী, লাউএর বোঁটা প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে।

বিবাহ ধর মহাশয়ের বাটী পৌঁছিল। হুলুধ্বনিতে পাড়া নিস্তব্ধ হইল; একটী বালোকের ক্রোড়ে শিশু কাঁদিতেছিল, বোধ হইল যেন শিশু অকারণে হাঁ করিয়া আছে, ক্রন্দনের যে কিছু শব্দ, তাহা হুলুতে ডুবিয়া গিয়াছিল। যখন বর-কন্যা বাটীর অভ্যন্তরে আসিল, তখন শব্দ দ্বিগুণ বাড়িল। বোধ হইল সহস্র সহস্র চিল কাক পরস্পরের সহিত যোগ-সাজশ করিয়া একবাক্যে কাকলির পঞ্চম দেখাইতেছে। বস্ত্রাভরণভীষণা ধরগৃহিণী হেন কালে বউ ঘরে লইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রমণীর কোমল হৃদয়ে কত সহ্য হইবে? ধরপত্নী বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন!—পুত্রবধূ শ্যামোজ্জ্বলাঙ্গী সম্মিত-পল্লব-বিশাল-নয়না বাটালি-কাটা নাসা; বালিকার ঠোঁটদুখানি পাতলা, রাঙা সস্মিত-মুখে দন্ত দেখা যাইতেছে, যেন শুক্তির ভিতর মুক্তা। এই বউ লইয়া ধরগৃহিণী কি করিবেন? এই কালো বউ লইয়া কি তিনি জন্ম জ্বলিবেন? তাঁহার মরণ কেন হয় না? ঐ ছেলের কি এই বউ? এই সোনার-চাঁদের এই বানরী? আ কপাল! এই জন্য কি তাঁর এত সাধ? আর এত সাধে কি এই বাদ, বিধাতার মনে ছিল! যাহার মন হয় লউক, ধরগৃহিণী এ বউ লইবেন না। এ বউ লইয়া এক দিনের—এক বেলার তরেও ঘরকন্না

করিবেন না; ঘর ছাড়িতে হয়, দেশ ছাড়িতে হয়, বনে যাইতে হয়, তাহা যাইবেন, সব করিবেন, এই বউ লইয়া এক ঘরে, এক বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার কপাল এত মন্দ, তাহা তিনি জানিতেন না।

নারী-মহলে কলরব—কোলাহল উঠিল। ধরগৃহিণীর দুঃখে সকলেই কাতরা হইল, অধীরা হইল; তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বধূনিন্দা করিয়া সকলে প্রবোধ দিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে লাগিল। সেই নয়ন-মেঘের ঘটায় যেন সদ্যবর্ষা উপস্থিত হইল, তাহাতে নিশ্বাসস্বরূপ প্রবলবায়ু এবং প্রবোধচ্ছলে ঘনগর্জ্জন। কি একটা কাণ্ডই উপস্থিত হইল; কলরব বাহির বাটীতে প্রবেশ করিল। ধরমহাশয় বাটী পৌঁছিয়া আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ অন্দরে আসিলেন। বালিকা নববধূ কাঁদিয়া উঠিল। ধর মহাশয় প্রথমে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না: নির্জীব স্তূপাকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে হৃদয়াধিকারিণী প্রেয়সীর রোদনমধ্যে এই মর্ম্ম বাছিয়া বাহির করিলেন যে, বধূ তাঁহার মনোমত হয় নাই, এবং একমাসের মধ্যেই পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে হইবে। অগত্যা ধর মহাশয় তাহাতেই প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সব গোল চুকিয়া গেল। বর্ষা গতে শরৎ আসিল; বাটীতে সকলেই হাসিতে লাগিল, সকলের নয়নের নিম্নভূমি শুষ্ক হইল; শোভাময় ধান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, বাটীতে আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল।

অনেক গ্রন্থকার পাঠক পাঠিকাদিগকে কাঁদাইতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের কোমল চক্ষুর জল বাহির করিবার জন্য যত্নও করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। কিন্তু অসাধারণ সৌভাগ্যবলে, আমাদিগকে সে বিষয়ে প্রয়াস পাইতে হইবে না। যিনি ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন, তিনি সহজেই রোদন করেন। আর, অর্থব্যয় করিয়া আমাদের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিলেও যাহার কান্না না পায়, তিনি পরমহংস, কোন প্রকারের উপাখ্যানেই তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিবে না, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস। এসকল বিবেচনা করিয়া, নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে, আমরা করুণরস লইয়া বড় একটা টানাটানি এপর্য্যন্ত করি নাই। বস্তুতঃ আমরা উক্ত রসের পক্ষপাতী নহি, এজন্য পরেও তাহা লইয়া একটা গণ্ডগোল করিব না। নিম্নে যে বৃত্তান্তের সমাবেশ হইতেছে, তাহা কাহাকেও খিন্ন বা রোরুদ্যমান করিবার মানসে নহে; প্রকৃত কথার অপহ্নব করা যাইতে পারে না বলিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ হইল; যেন ইহাতে কোনরূপে দুঃখিত না হন।

ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে ধর মহাশয়ের গৃহলক্ষ্মী অনেক সাধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বউ কালো হওয়াতে সে সাধে বিবাদ জন্মিল; তাঁহার সুখের পথে কাঁটা পড়িল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নববধূ বাস্তবিক গৌরাঙ্গী নহে; নাক, মুখ চোক যেমনই হউক' রংটা ফরসা নয়; সুতরাং ধরকর্ত্রীর দুঃখও অলীক বলা যায় না। আপন

ছেলেকে কেহ কখনও মন্দ বা কুরূপ দেখে না, এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়াই সাধারণ মাতৃকুলের ন্যায়, ধর মহাশয়ের পুত্রের গর্ভধারিণী বউকে বিষনয়নে দেখিয়াছিলেন। একে তাঁহার এই মনঃকষ্ট, তাহার উপর তদীয় মত বিরোধ করিয়া যন্ত্রণার বৃদ্ধি করা অন্যায় এবং অসঙ্গত বিবেচনায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ধর মহাশয় দ্বিতীয় পাত্রীর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন; নানা দিক্ হইতে বার্ত্তা আসিতে লাগিল; অবশেষে একস্থানে কথাবার্ত্তা এক প্রকার স্থির হইল, এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ হইবে, এইরূপ মন্ত্রণাদি চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের কর্ত্তা গিন্নীর মত হইল, কিন্তু কার্য্যগতিকে এই বিবাহটী ঘটিয়া উঠিল না।

ধর মহাশয়ের পুত্রের নাম গোবিন্দ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোবিন্দের পেটে প্লীহা ছিল, কিন্তু বালকের পীড়া বলিয়া কেহ সে বিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয় নাই। বিবাহে অনেক ধুমধাম হওয়াতে গোবিন্দের বড় আমোদ হইয়াছিল। রৌদ্র, জল কিছুই না মানিয়া গোবিন্দ যেখানে ইচ্ছা এ কয়দিন সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইত; যখন যাহা পাইত, তাহাই খাইত; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিত না, কেহ নিষেধ করিলেও মানিত না। এই সকল কারণে গোবিন্দের পীড়া কিছু প্রবল হইল। সেই অবস্থাতেই বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহের পর গোবিন্দ শয্যাগত হইল। তখনও দ্বিতীয় বিবাহের কথা চালাচালি হইতে লাগিল। ক্রমে কবিরাজ না ডাকিলে আর চলিল না। কবিরাজ আসিল, দেখিল, মাথা নাড়িল, চলিয়া গেল। এক কথা বলিয়া গেল "রোগ ভাল করিতে পারি, কিন্তু আয়ু দিতে পারি না।" বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই, বাস্তবিক এক্ষণ গোবিন্দের এই অবস্থা।

তখন গোবিন্দের পিতামাতার চৈতন্য হইল। তখন বিবাহ গেল, কন্যা গেল, এককালে সকল ঘুরিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নব্য প্রাচীন, সকল মতের চিকিৎসক আসিতে লাগিল। কিন্তু মানুষে কি করিবে? বালক দিন দিন অধিকতর রুগ্ন হইতে লাগিল; চক্ষু পীতবর্ণ, সর্ব্ব শরীরে শিরা উঠিল, প্রত্যহ জ্বর,—জ্বরের বিরাম নাই। তখন ধর গোষ্ঠীর সকল সাধ এতদিনে ফুরাইতে চলিল। চিকিৎসকবর্গ একে একে জবাব দিয়া গেল। সেই দিন বৈকালে গোবিন্দের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল। রাত্রিতে আরও মন্দ; প্রভাতকালে বালক পুনর্ব্বার সুস্থ হইল। পিতামাতার দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া বালক বলিল "আমি আর বাঁচব না?" বালকের ক্ষীণ তীক্ষ্ণ স্বরে পিতামাতার মর্ম্মভেদ হইল, কেহ কোন উত্তর করিল না। বালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কেন বে দিলে?" যম ইহাকে এই বিষম বাক্য বলাইল। বালকের সুস্থভাব ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল। দীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ উজ্জ্বল হয়, গোবিন্দ সেইরূপ সুস্থ হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে বাক্যের জড়তা জন্মিল; মুখে ঘর্ঘরি ডাকিতে লাগিল; প্রাণবায়ু জন্মের

মত নিরুদ্ধ হইল। বিবাহ-প্রিয় পিতা-মাতা চিরদিনের জন্য শিক্ষা পাইল। আর কি করিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।"

কালীনাথ ধরের পুত্রের জীবন এবং রাজহাটের বিদ্যালয়ের জীবন এককালে শেষ পাইল। একত্রে উভয়ের "পঞ্চে পঞ্চ" মিশাইল। ধর মহাশয়ের বাটীতে বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল। সুতরাং যে যার ছেলে, সে তার ঘরে গেল। নরেন্দ্রনাথের রাজহাটে থাকিবার উপলক্ষটী লোপ পাইল। এদিকে বিমলার পীড়া দিন দিন বাড়িতেছিল; এজন্য উভয়ে (বোধ হয় কোন পরামর্শ না করিয়াই) এক দিবস রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গা তুলিলেন। সূর্য্য যখন উদিত হইল, তখন পীড়াক্রান্ত এবং ধর্ম্মাক্রান্ত রাজহাটের চতুঃসীমার ২।৩ ক্রোশের মধ্যে অদৃশ্য। শুনিতে পাওয়া যায়, সেই রাত্রিতে একজন লাল-পাগড়ী নীল-জামাওয়ালা কিছু "হাত" করিয়াছিল; এবং নারী মাত্রেই "স্ত্রী" পদ বাচ্য বলিয়া নরেন্দ্রনাথ স্বীয় বিদ্রোহী ধর্ম্মবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে গবেশ রায় ও মধুসূদন ঘটক রাজহাট পৌঁছিলেন, এবং যথাসময়ে অনুসন্ধানাদি দ্বারা জানিলেন যে, এখানকার বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে, এবং নরেন্দ্রনাথ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! নরেন্দ্রকে এখানে পাওয়া যাইবে কিনা, মধুসূদন সমস্ত পথ তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন; এই সংবাদে তাঁহার সমস্ত ভাবনা দূর হইল। গবেশ কেবল পথের কষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি ওই সকল চিন্তা ত্যাগ করিলেন। উভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া তখন পরামর্শ করিতে বসিলেন। দুই জনের মতের বহু প্রকার বিভিন্নতা হওয়া প্রযুক্ত, পরিশেষে উভয়ে নির্ব্বিরোধে এই মীমাংসা করিলেন যে, গবেশের সঙ্গে মধুসূদন পারিবেন না; অতএব কলিকাতা যাইবার প্রয়োজন নাই, বরাবর বাটী যাওয়াই কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক। নরেন্দ্রনাথ রাজহাটের একটী কলঙ্ক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, রাজহাটের সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ! এই জন্য তাঁহার স্বদেশীয় লোককে—বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তিকে তাঁহার অনুরূপ সম্মান সকলেই করিল। তাহাতে মধু এবং গবেশকে সে রাত্রিতে কাহারও ঘরের ভিতর কারারুদ্ধের ন্যায় থাকিতে এবং নিয়মবদ্ধরূপে আহারাদি করিতে হইল না; দুই জনে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খোলা জায়গায়

রজনী-সুন্দরীর গাঢ় আলিঙ্গনে শুইয়া থাকিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিলেন। ইঁহারা যখন স্বদেশাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন বিরহচিন্তায় রজনীর মুখ পাংশুবৎ হইল।

কিরূপে ইঁহারা রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলেন, কেমন করিয়া ইঁহারা মেমারি ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলেন, কখন কি অবস্থায় ইঁহাদের তথা হইতে তিরোভাব হইল, এ সকল বিবরণ ইতিহাসে সবিস্তারে বর্ণিত আছে, এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যিনি এক মুহূর্ত্তে এই সমস্ত কথা অবগত হইবার মানসে সাত আট দিনের মধ্যে এই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাদিগকে (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন।

যাহা হউক, গবেশ এবং মধুসূদনের পুনর্ব্বার মেটে রাস্তা অবলম্বনীয় হইল। নির্ব্বিঘ্নে তিন দিন পথ বাহিয়া গিয়া অবশেষে দুই জনে অগ্রদ্বীপে পৌছিলেন। তাঁহাদের পথের দ্বিতীয় দিবসের বিকালে যে একটু ঘটনা হইয়াছিল, আমরা তাহাকে বিঘ্ন মধ্যে গণনা করি না; কিন্তু "বাহ্য জগতের সন্তোষার্থ" তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটী এই,—পথের ধারে একটী দোকান ছিল; গ্রাম সেখান হইতে কিছু অন্তরে। যাহার দোকান, অল্প দিন হইল তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল, এই কারণে তাহার মৃতপত্নীর এক বিধবা ভগিনী সেই দোকানে থাকিত, এবং মুদী স্বয়ং দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিত।

একটু মেঘ দেখিয়া গবেশ এবং মধুসূদন এই দোকানে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। গবেশের সকল বিদ্যাতেই পারদর্শিতা ছিল, স্ত্রীলোকের দোকান দেখিয়া, তাহার সহিত একটু রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, গবেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, দোকান তাহার কি না? তাহাতে স্ত্রীলোকটী বলে, দোকান তাহার ভগিনীপতির। "তবে তুমি শ্যালী? কুটুম্বের টেক্কা," মিষ্ট আলাপে তুষ্ট হইয়া রমণী বলিল, "আমর! এ মিন্‌সে কে রে?" এমন সময়ে বোঝা মাথায় মুদী আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীকে কিঞ্চিৎ বিব্রত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। গবেশ হুকা চাহিলেন; মুদী তদুত্তরে বলিল, "হুঁকায় কাজ নাই আর, এর পর ঘাড়ে ধ'রে বের ক'রে দিলে সে ভাল হবে?" সেই সময়ে একটু ঝড় উঠিল। মুদীর কথায় এবং ঝড়ে গবেশ ও মধুসূদনের পক্ষে মণিকাঞ্চন যোগ হইল। তাঁহারা সেই যোগে সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন।

ঝড় বাদলের কত গুণ, তাহা বর্ণিয়া শেষ করা যায় না। কেহ ত্রিতল হর্ম্ম্যোপরি দ্বিরদ-রদ-কারু-কার্য্য-খচিত-মেহাগনি-দারু-নির্ম্মিত-পর্য্যঙ্ক-বিস্তৃত-বিনিন্দিত-দুগ্ধ-ফেন-শয্যায় শয়ন করিয়া রুদ্ধ বাতায়নপথে প্রবেশার্থী বায়ুর বিনয়মধুর বেণু-বিগঞ্জিত

অনুযোগ শ্রবণ করেন; কখন বা ঝটিকা তাড়িত-নীরশীকরসমূহকে নিজ কক্ষায় সাধ করিয়া আশ্রয় দেন। কেহ বা কুটীরের ভিতরে থাকিয়া বৃষ্টির জলে প্লাবিত হইতে থাকে, এবং ঝড়ের সঙ্গে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়। কেহবা গাছ চাপা পড়িয়া, কেহ বা চাল চাপা পড়িয়া মরে। কেহ দিন বুঝিয়া বিবিধ বিধানে আহারের ফরমাশ করেন। যে ব্যক্তি "দিন আনে, দিন খায়" সে বিনা আয়োজনে উপবাস করিয়া ঝড় বৃষ্টি অতিবাহিত করে! আবার যদি রাত্রিতে এরূপ হয়, তবে কত নাগর নাগরী বিদ্যুৎ-ঝলালোকিত পথে বারিসিক্ত হইয়া বিরহযন্ত্রণা অথবা প্রণয়-সুখের বিশেষ স্বাদ গ্রহণ করে। কখন বা কোন গ্রন্থকার ঝড়বাদলে আপন পুঁথি বোঝাই করিয়া লন। যাহার যে ইষ্টানিষ্ট হউক, বক্ষ্যমাণ ঝড়ে আমাদের কোন উপকার দর্শিল না; বরং কত মাঠের কত নিরাশ্রয় পথিকের মত, আমাদের প্রিয় গবেশ এবং প্রিয়তম মধুসূদন মুদীর দোকান হইতে দূরীকৃত হইয়া কতদূর যাইতে না যাইতে ভিজিয়া ঢ্যাপঢেপে হইয়া গেলেন। আহা! বর্ষার কাকের ন্যায় তাঁহাদের দুই জনকে সে সময় দেখিলে কাহার না সমবেদনা উপস্থিত হইত, কাহার চক্ষের জলে বক্ষ না ভাসিয়া যাইত?

মধুসূদন ও গবেশচন্দ্রকে নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, পিসী তাবৎকালের জন্য ভাবনাকে বিরাম দিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তাঁহার কান্নাও স্থগিত ছিল। কিন্তু পিসীর এই একটী রোগ ছিল যে, তিনি না কাঁদিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং এবার কিছু অধিক কাল ব্যাপিয়া কাঁদিবার অবকাশ না পাওয়াতে পিসীমা কিছু স্ফীত হইয়াছিলেন। যখন মধুসূদনের মুখে নরেন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা পাইলেন, তখন পিসীমা ছয় মাসের কান্না এক দিনে কাঁদিলেন; শরীরের-অনেকটা দূষিত জল বাহির হইয়া গেল, কিন্তু পিসীর শরীর, তাহাতে টুটিল না। লোণা জল পিসীর বুকে বসিয়াছিল; সে জন্য পিসী সর্ব্বদা কাসিতে আরম্ভ করিলেন। পিসীর এক অঙ্গ ছাড়িয়া এক অঙ্গ ফুলিতে লাগিল, পিসী তাহাতে কাতর হইলেন। গ্রামবাসী নফর কবিরাজের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ হইল। নফর মলা তুলিয়া যে সকল বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল, তাহাতে পিসীর তাদৃশ উপকার দর্শিল না। কাসের এবং স্ফীতির উন্নতিই হইতে লাগিল।

কবিরাজ কিছু বিরক্ত হইল; মধুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল যে, লক্ষণ ভাল নহে, সুতরাং মধুর মত হইলে চূড়ান্ত ঔষধি প্রয়োগ করা যায়। মধুসূদন দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইল। রাত্রিতে মহৌষধ দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঔষধির গুণ ধরিল। পিসীর শরীরের সমস্ত জল, এবং কাসাদি ঔষধিতে শুষিতে লাগিল। পিসীর জল টান ধরিল। শেষে জলে কুলায় না; সমস্ত রাত্রি জলদান করিয়া প্রভাতে জল বন্ধ করা হইল। সে দিন একাদশী।

যে পিসী জলভাণ্ডার হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ঔষধের মহিমায় দাবানল জ্বলিতে

লাগিল। বিকালে পিসীমার প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; সুতরাং প্রাণহীনা পিসী সংসারে থাকিবেন কেন, তৎক্ষণাৎ কাশী গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে কেহ তাঁহার দেহ লইয়া গেল না, বাটীর প্রাঙ্গণেই "শ্রীশ্রী৺তীরে ৺স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার ৺প্রাপ্তি" হইল। অগ্নি দ্বারা সৎকার হইল, কিন্তু একাদশীর দিনে কেহ তাঁহার চিতা ধৌত করিল না।

নরেন্দ্রনাথ! তুমি কোথায় রহিলে?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বড় গোপনীয় কথা।

রাত্রি প্রভাত হইল। সংসারের চোখ ফুটিল। কতকগুলা কাক কা কা স্বরে পরামর্শ করিয়া সরল এবং নির্ব্বোধ বালক-বালিকার উদ্দেশে একটা গাছ হইতে উড়িয়া গেল। ইহারা বিলক্ষণরূপে জানে যে, সকালেই ছেলের পাল ইহাদের জন্য উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া বাড়ীর উঠানে এবং পথে পথে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কাকের দল উড়িয়া গেল দেখিয়া আনন্দে একটা কোকিল কোন অদৃশ্য স্থান হইতে কুহু কুহু করিয়া উঠিল; বুঝি সে 'কাকের বাসা কখন খালি হইবে' সমস্ত রাত্রি তাহাই ভাবিতেছিল। আর কতকগুলা পাখী কোকিলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্যাচ ম্যাচ করিয়া এক মহা কলরব তুলিল; ইহারা হয় বড় ধার্ম্মিক; নয় নিতান্ত দ্বেষপরবশ;—সংসারে ইহাদের মত লোক অনেক। একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর তীরে এই ব্যাপার হইতেছিল। সেই পুকুরের জলে নক্ষত্রকুল সমস্ত রাত্রি নিজ নিজ মুখ দেখিতেছিল। পক্ষীদের কলরবে একটা বড় মাছের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাছটা অমনি জল হইতে শূন্যে লাফাইয়া উঠিল; কি দেখিল, কি বুঝিল, বলা যায় না, কিন্তু তখনই আবার জলের ভিতর ডুব দিল, আর তখন উঠিল না। একটা মাছ লাফাইল, কিন্তু সমস্ত পুকুরের জল তোলপাড় করিতে লাগিল, একজন মাত্র ইংরাজের মুখের কথায় সমুদায় বঙ্গদেশ টলিয়া উঠে;—এ সব পরাক্রমের কাজ। জল চঞ্চল হইল, আর মুখ ভাল দেখা যায় না, এজন্য নক্ষত্রগণ কোথায় সরিয়া পড়িল।

এই পুষ্করিণীর ধারে, যে গাছে কাক ছিল, সেই গাছের তলায়, এই সময়ে দুটী লোক বসিয়া; এখনও গ্রামের লোক উঠে নাই, উঠিলেও এই মাঝ মাঠে আইসে নাই। গ্রামও এস্থান হইতে আধ ক্রোশের কম নয়। সুতরাং এ দুজন নিশ্চিতই নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের লোক নয়। তবে ইহারা কে? আমরা বলিতে পারি।

ঐ যে গার্ণেটের চায়নাকোট গায়—বোধ হয় আর বলিতে হইবে না—উনি নরেন্দ্রনাথ। চাদরখানা পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধা। নরেন্দ্র দুই হাতে দুই হাঁটু বেষ্টন করিয়া, দুই পা যোড় করিয়া বসিয়া আছেন। আর যখন গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে বসিয়াছি, তখন বলিতে ভয় কি,—নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে বামজঙ্ঘা মাটীতে পাতিয়া, বিমলা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ডানি পায়ের নখ খুঁটিতেছেন; চক্ষু নখের উপর, সুতরাং বিমলা ঘাড় হেঁট করিয়া আছেন। ইঁহারা উভয়ে রাতারাতি এতদূর চলিয়া আসিয়াছেন। বিমলার আর চলিবার শক্তি নাই; নরেন্দ্র কিছু ব্যস্ত হইলেন। দিন উঠিল, এখন লোকে দেখিতে পাইবে, পাইলে চিনিতে পারিবে; তাহা হইলে স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার এ জন্মে মোচন হইবে না, নরেন্দ্রের এই ভাবনা! হায়, কি পরিতাপের বিষয়! এই পাপ-সংসারে ধর্ম্মের উন্নতি নাই, ধার্ম্মিকের অব্যাহতি নাই।

ভাবনার বিষয় বটে, কিন্তু ভাবিলে কি হইবে? গ্রামেও যাইবার যো নাই; মাঠে মাঠেই বা দুই জনে কত ঘুরিয়া বেড়াইবেন? আবার মাঠেও এখনি লোক যাতায়াত আরম্ভ হইবে। যাইবেন বা কোথায়? রাত্রিকালে কোন্ পথে কত দূর আসিয়াছেন; ইঁহারা তাহার কিছুই জানেন না। বিমলাও আর চলিতে পারে না; এখন উপায়? বসিয়া থাকাও অবিবেচনার কাজ, এই বলিয়া দুই জনে সেখান হইতে উঠিলেন। সম্মুখে কতক দূরে একটা বন দেখা গেল; দুই জনে সেই বনের দিকে চলিলেন। বাসনা, দিনমান বনের মধ্যে থাকিয়া রাত্রিতে যাহা হয় এক প্রকার করা যাইবে। নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্য অপেক্ষা হিংস্র জন্তুগণ ধর্ম্মভয়ে অধিকতর ভীত। আমাদেরও সময়ে সময়ে এ কথায় বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

যখন নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা বনের নিকটে গেলেন, তখন সেটা যে সিংহ-ব্যাঘ্রের আবাস নয়, এ কথা নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধির অগোচর রহিল না। বনের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী অপ্রশস্ত, কিন্তু সুপরিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইয়া ইঁহারা দুই জনে সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। বনের সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাল, তেঁতুল, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, প্রভৃতি ফলের গাছ; লতা-গুল্মাদি খুব অল্প। বনের মধ্যে একটী পুষ্করিণী, তাহার জল নির্ম্মল। ঘাট একটীও নাই; কিন্তু যে দিকেই নামো, পুকুরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত কোথায়ও পায়ে একবিন্দু কাদা লাগিবে না, জলের ভিতর সমস্তই কঙ্করময়। পুকুরের এক পাড়ে কতকগুলি গরু চরিতেছিল; এখন তাহাদের প্রথম গ্রাস, সুতরাং কেহ কাহারও দিকে ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া ছিল না। ইহারা সময়ের মূল্য বুঝে। একটী রাখাল বালক মানুষের লজ্জাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য কটির নিম্ন হইতে জঙ্ঘার উপর পর্য্যন্ত সুমলিন একটুখানি কাপড়ে আবৃত করিয়া, পাঁচনির উপর ঠেশ্ দিয়া (ত্রিভঙ্গ না হউক) ভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া গান করিতেছিল এবং সেই স্থানকে গোকুলত্ব প্রদান করিতেছিল। বনের ঠিক মধ্যস্থলটী অতিশয়

মনোহর ; তিনখানি ছোট ছোট মেটে ঘর ; তার মেজে অবধি উঠান পর্য্যন্ত সমস্তই তক্ তক্ করিতেছে ; যেন মুখ দেখা যায়, যেন সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। আবার এমন স্থান, পাছে সূর্য্যের খরদৃষ্টিতে পড়ে, এই জন্ম একটা প্রাচীন বট গাছ ঘরের চালের উপর দিয়া ডাল পালা বাড়াইয়া ইহাকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই আশ্রয়ে নানা রকমের কতকগুলি ফুলগাছ প্রতিপালিত হইতেছিল এবং কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্ম সর্ব্বদা পুষ্পোপঢৌকন লইয়া প্রস্তুত থাকিত।

যখন নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে সঙ্গে করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল, একটু ভয়ের সঞ্চয় হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সম্মুখে একটি মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার এ ভাব দূরে গেল, ভাবনা করিবার অবকাশ রহিল না। শ্রীরূপ-দাস বাবাজী নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইবামাত্র অবিচলিতভাবে বসিয়াই রহিলেন ; যখন বিমলাকে দেখিলেন, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই জনকে বসিতে বলিলেন।

বাবাজী দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। মস্তকে লম্বা লম্বা চুলগুলি মধ্যস্থলে সংযমিত, বাবাজীর নাকে মাটী চাপান, এজন্ম নাসার গঠন ঠিক বুঝা অসাধ্য, ছোট ছোট দুটী চক্ষু যেন কোন অভাগা কপোতের কাছে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ঠোঁট গোঁপ-দাড়ির মধ্যে লুকান, যেন অশোকবনে সীতা। গলার কিছু ঠিকানা হইবার যো নাই, মালায় আচ্ছন্ন, তাহার উপর দাড়ি দেখিলেই এই মাত্র অনুমান হয় যে, একটা কাঠের পালার উপর যেন একখানা কম্বল কেহ পাতিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পরিধানে বহির্ব্বাস। বাবাজী তিনটী তিন প্রকারের সেবাদাসীকে আশ্রয় দিয়াছেন ; প্রথমটি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, মস্তকে খুব খাট খাট চুল, গোঁফ-দাড়ি থাকিলেই পুরুষ বলিয়া এক প্রকার চালান যাইতে পারে ; ইনি তুর্কুড়ি শীতের খবর দিতে পারেন। মধ্যম খুব বেঁটে, খুব কাল, খুব মোটা ; ইহার দাঁত পর্য্যন্ত কাল, যেন তরমুজের বিচি। ইহার বয়স ৩৫।৩৬। তৃতীয় পাঁচপাঁচির মধ্যে, আহা ও নয়, ছিছিও নয়। দেখিলে বোধ হয়, অল্পদিন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, এখনও শিকলি-কাটা রকমটা যায় নাই।

নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা ভূতলে আসন গ্রহণ করিলে, সেবাদাসীরা তাঁহাদের নিকট আসিয়া যুটিল এবং ইহাদের দুই জনকে বেষ্টন করিয়া বসিল। বহুতর আলাপ হইতে লাগিল এবং কথাবার্ত্তার আদান প্রদানে নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন যে, এই বনের নাম "আখড়া গোপালপুর" গ্রাম-গোপালপুর এখান হইতে অতি নিকট, আধক্রোশের মধ্যে। নরেন্দ্র আরও জানিলেন, বাবাজী সংসার ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে বনের পাখীর সঙ্গী হইয়া "প্রেমভক্তি" বিলাইয়া থাকেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সেবাদাসী গ্রামে গ্রামে যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া আনে, তাহাতেই বাবাজীর জীবনধারণ হয়। কখন কখন কনিষ্ঠা সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী স্বয়ং ভিক্ষায়

যাইতেন এবং হরিগুণ ও কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য গান করিয়া সাধ্যানুসারে সকলকে বিশেষতঃ অবলা জাতিকে ভক্তির পথ শিক্ষা দিতেন। এই সকল শুনিয়া নরেন্দ্রের মন গলিয়া গেল; জলে জল মিশিয়া গেল, সংসারের মধ্যে "তিনি এবং বাবাজী" দুই জনেরই এক প্রকার উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি বাবাজীর সহিত প্রণয়-বন্ধনের চেষ্টা করিলেন। শুদ্ধাত্মা রূপদাস বাবাজীও নরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র, নরেন্দ্রের সহচরীর প্রতি বারেক দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহাঁদের দুইজনকে সেইখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "আমি আর তুমি; বরং আমার চেয়েও তুমি। আহা! সত্যমেব জয়তে; ওঁ তৎসৎ", এইটুকু মনে মনে বলিলেন।

দিনমান নরেন্দ্রনাথ এবং বিমলা সেই আখড়ায় থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরূপ-দাসের সহিত বহুবিধ সাধুপ্রসঙ্গে দিন কাটাইতে লাগিলেন; প্রেমের জন্য প্রকৃতির সৃষ্টি, শ্রীশ্রীরাসলীলামৃত হইতে অনেক উদাহরণ দেখাইয়া, বাবাজী এই কথা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন; এবং অবলাগণের উদ্ধারের জন্য পুরুষের সৃষ্টি, নরেন্দ্র-নাথ বেদের মন্ত্রাদি নিজের "আর্ষ"মতে আবৃত্তি করিয়া সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুজনেরই পরস্পরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ প্রভৃতি জন্মিতে লাগিল। এ দিকে বিমলার যাহা কিছু পেটের খবর, প্রধান বৈষ্ণবী তাহা ছলে, কৌশলে (বলে নয়) টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সংসারের যাবতীয় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রধান বৈষ্ণবী বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং বিমলার পীড়ার কথা যখন জানিল, তখন বৈষ্ণবী তাহাকে সকল চিন্তা দূর করিতে বলিল, এবং কহিল, "তুমি যদি কিছুদিন এখানে থাকিতে পার, তাহা হইলে আমিই তোমায় ভাল ক'রে দিই; আমি এক অষুধ জানি, একদিন খেতে হয়, কিন্তু পনর কুড়ি দিন একটু নিয়মে থাকিতে হয়।" বিমলা এক প্রকার সম্মত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছার উপর সেই মীমাংসার নির্ভর জানিয়া নরেন্দ্রনাথকে এ বিষয় জানাইল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নরেন্দ্র কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; বলিলেন "আচ্ছা দেখা যাবে।" বাবাজীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের অচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি উপস্থিত বিষয়ে তিনি সহজে মনের কাঁটা খোঁচা সরাইতে পারিতেছিলেন না; অথচ বিমলার পীড়া, বিমলার ইচ্ছা প্রভৃতি মনে করিয়া এ সম্বন্ধে স্পষ্ট অসম্মতি ব্যক্ত করিতেও তাঁহার সাহস হইল না; অগত্যা কিছুকালের জন্য নরেন্দ্রনাথ ত্রিশঙ্কুর শিবের ন্যায় শূন্যেই রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আখড়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দুই একটী করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; ইহাদের বয়স গড়ে ২৩।২৭ বৎসর; সর্ব্বকনিষ্ঠার ১৮।১৯, সর্ব্বজ্যেষ্ঠার ৩৫।৩৬ বৎসর। আসিয়া সকলেই এক

একে বাবাজীর চরণ স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব মস্তকে বুলাইল, কেহ বা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নিজের জিহ্বাস্পর্শ করিল। এই অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া সকলে বাবাজীর সম্মুখে কাতার দিয়া বসিল। বাবাজী শ্রীরাসলীলামৃত হইতে তত্ত্বকথা সকল উদ্ধৃত করিয়া ইহা-দিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ সাঙ্গ হইলে প্রদীপ নির্ব্বাণ করা হইল এবং কৃষ্ণভক্তিময় গীতের তরঙ্গ উঠিল। গীত সমাপ্ত হইলে, আখড়ার প্রধান বৈষ্ণবী ইহা-দিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিল; পরে ইহারা বাবাজীকে পুনর্ব্বার প্রণি-পাত করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, শ্রীকৃপদাস একজন সামান্ত ব্যক্তি নহেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, বৈরাগ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রশস্ত ধর্ম্ম আর নাই,সুতরাং তৎকালের জন্য তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। বাবাজীর বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিত করিলেন, এ ধর্ম্ম-ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বিমলাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া ধর্ম্মতঃ অসাধ্য; বিশেষতঃ তিনি অসহায়, এখন আপনি কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন, তাহারই স্থিরতা নাই; বিমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি কি করিবেন?

যখন এই পরামর্শ স্থির হইল, তখন নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একণে পীড়িত এবং এখানে পীড়া নিবারণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অতএব তোমার ইচ্ছায় আমি সম্মত হইলাম; তুমি এখানে কিছুদিন থাক; এই সময়ের মধ্যে আমি একবার কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসি, এবং সেখানে এক রকম থাকিবার আয়োজন করিয়া পরে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" বিমলা এ কথায় দ্বিরুক্তি করিল না।

বাবাজীর নিকট এ কথার প্রস্তাব করা হইল; প্রধান বৈষ্ণবী প্রস্তাবের পোষকতা করিল; বাবাজী প্রসন্নচিত্তে বিমলাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। সকল পক্ষে সন্তোষ জন্মিল। নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, রাজহাটের কেহ এ কথার সূচ্যগ্র স্থান পাইবে না, তিনি স্বয়ং বিষয়চেষ্টার অবকাশ পাইলেন, অথচ যখন আসিবেন, তখনই বিমলাকে পুণ্যলোকে লইয়া যাইতে পারিবেন। নরেন্দ্রনাথ বাবাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, দশ হাজার সাধুবাদ দিলেন, বাবাজী কেবল বলিলেন, "প্রভুর ইচ্ছা।" হে বাবাজিন! তোমারই ত্যাগ স্বীকার ধন্ত! তোমারই বৈরাগ্য সার্থক!

রাজহাট হইতে আখড়া-গোপালপুর প্রায় ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিম-দক্ষিণ। রেলওয়ে স্টেশান হইতে অতি নিকটে, এমন কি দেড় ক্রোশের ঊর্দ্ধ হইবে না। নরেন্দ্রনাথ পর দিন বাবাজীর হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। আমরা দায়ে পড়িয়া গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ-বন্ধন।

৺শঙ্করী ঠাকুরাণী, ওরফে পিসীমার পরলোক গমনে মধুসূদন অত্যন্ত দুঃখিত হই-লেন। গৃহকার্য্য কে করিবে, রন্ধনাদি কে করিয়া দিবে, এ দিকে দোকানই বা কিরূপে চলিবে, মধুসূদন এই সকল ভাবনায়, স্রোতে পতিত তৃণের ন্যায় হইলেন। যদি এই বিপদ্‌কালে গবেশ রায় না থাকিত, তাহা হইলে মধুসূদনের দশা কি হইত বলা যায় না। পিসীর মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে গবেশ রায় সান্ত্বনা-বাত্যা প্রবাহিত করিয়া মধুসূদ-নের চিন্তা-সাগরকে তোলপাড় করিতেছিল। গবেশ যথার্থ সময়ের বন্ধু; সেই বিষম দিন হইতে, এক বেলার জন্য মধুসূদনকে ছাড়িয়া যায় নাই। এমন কি গবেশের গাঢ় আসক্তিতে মধু যে মধু, সেও বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রণয়ের অপার মহিমা।— অদ্ভুত শক্তি! জোঁকের তৃপ্তি জন্মিলে জোঁক সেব্যবস্তুকে ছাড়িয়া দেয়, গবেশ স্বীয় প্রণয়পাত্র মধুসূদনকে কিছুতেই ছাড়িল না। মধুর বাটীতেই গবেশের আহার, গবেশের শয়ন এবং বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। একদিন গবেশের মাতুল তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, এবং দুই তিন দিন অবধি বাটী না যাওয়াতে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। গবেশ অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল, "মামার বিবেচনার লেশমাত্র নাই; মধুসূদনের এই বিপদ উপস্থিত, ঘরে দ্বিতীয় লোক নাই; এ সময় কেমন করিয়া যাইতে পারা যায়? মধুর দুঃখ হইতে কি বাড়ী বড় হইল?" মধু যেমন "পাক-শাক" করিতেছিলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন, গবেশ যেমন "খাওয়া দাওয়া" করিতে-ছিল, তাহাই করিতে থাকিল। এইরূপে দিন যায়, এইরূপে রাত্রি যায়; যায় না কেবল মধুর মন হইতে ভাবনা এবং মধুর বাড়ী হইতে গবেশ রায়।

পিসীমার ত্রিরাত্র কৃত্য মধুসূদন এক প্রকার সম্পন্ন করিলেন। আয়োজনের সমস্ত কার্য্য করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন; ব্যবস্থা যেরূপ করা আবশ্যক, তাহা গবেশচন্দ্র করিয়া দিল। এই উপলক্ষে একবার মাত্র আমরা গবেশকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মধুর বাটীতে থাকিয়া বন্দোবস্ত করিবার সময় গবেশ বলিয়াছিল, "একলা ব'সে থেকে কোমর ধরে গেল, ভ্যাবা গঙ্গারামটা বাড়ী এলে যে বাঁচি। কাজ ভারি, তার বাজার করাই ফুরায় না।"

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল; ইহার মধ্যে গবেশ দুইবার মাত্র তাহার মাতুলের বাটীতে গিয়াছিল। আরও এক দিন গেল; সন্ধ্যার পরে একটু মেঘ হইল, গবেশের কিছু আনন্দ হইল! এমন দিনে খিচুড়ি খাইতে কোন্ পামরের না ইচ্ছা হয়? গবেশের ইচ্ছা হইল, মধুসূদনের সম্মতি হইল। মধু সেইরূপ পাকাদি করিলেন।

সুযোগের উপর সুযোগ, ভারি এক পশলা বৃষ্টি সেই সময়ে হইয়া গেল। মধুসূদন পাক সমাপন করিয়া গবেশকে রন্ধনশালায় ডাকিলেন; অকারণে জলে ভিজিয়া যাইতে গবেশ স্বীকার করিল না। অগত্যা শয়নগৃহে মধুসূদন খাদ্য সামগ্রী সমুদায় বহন করিয়া আনিলেন; দুই জনে আহার করিয়া ক্রমে শয়ন করিলেন।

আহারটা কিছু গুরুতর হইয়াছিল, এজন্য গবেশের নিদ্রা আসিল না; গবেশ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বলিল, "মধু, মধু, ঘুমুলে নাকি? আ ছিঃ! এর মধ্যে এত ঘুম!" গবেশের ডাকাডাকি ঠেলাঠেলিতে পরিশ্রান্ত মধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বৃষ্টি ধরিয়াছিল, কিন্তু মেঘ পরিষ্কৃত হয় নাই। বাদলের হাওয়ায় বোধ হয় বিধাতা পুরুষের গুড়ুক খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি চকমকি ঠুকিতেছিলেন। নতুবা মধ্যে মধ্যে চমক দিয়া আকাশে আলো হইবে কেন? গবেশের তামাক খাইতে বাঞ্ছা হইল, মধু তামাক সাজিল। দুই জনে তামাক খাইতে খাইতে এ কথা সে কথা, পাঁচ কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কথোপকথন হইলে পর গবেশচন্দ্র যথার্থই মধুসূদনের হিতকর একটী প্রস্তাব করিল। প্রস্তাবটী এই—গবেশের মাতৃষ্বসা এক কন্যা লইয়া বিধবা হইলে পর তাঁহাকে এক প্রকার নিরাশ্রয় দেখিয়া গবেশের মাতুল স্বীয় ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে নিজ বাটীতে আনিয়া রাখেন; কিছু দিন পরে বালিকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বহু কষ্টে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু বালিকার দক্ষিণ চক্ষুর তারা শ্বেতবর্ণ ঈষদুন্নত হইল, এবং মুখমণ্ডল অবিরল বসন্তাঙ্কে সমাচ্ছন্ন হইল। ইতঃপূর্ব্বে বালিকা, সুন্দরী এবং লাবণ্যময়ী ছিল, রোগের সঙ্গে সে রূপ এককালে অপগত হইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বালিকার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর। বালিকার নাম সূর্য্যমুখী।

গবেশচন্দ্র মধুসূদনকে বলিল, 'মধু' এমন করিয়া কত দিন যাইবে? আমি বিষয়চেষ্টা একবারে ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া থাকিতে পারি? আমার ইচ্ছা বটে যে, চিরকাল তোমার দুঃখের দোসর হইয়া থাকি, কিন্তু তাহা চলে কৈ? তুমি যদি এক কাজ করিতে পার, তাহা হইলে তোমারও ভাল, সকলকারই ভাল। সূর্য্যমুখীকে বিবাহ করিতে পারিলে, মাসী এখন তোমার বাড়ী এসে থাকেন, তোমার ঘর চলে, তুমি দোকান দেখিতে পার। তাই বলি যে, তুমি মামাকে এ কথা বল। আর না হয় আমি বলিব। বোধ করি অল্পে করিয়াও দিতে পারিব; এখন তুমি সম্মত হইলেই হয়। আর দেখ, তাহা হইলে আমি তোমার পর রহিলাম না, কত বিষয়ে কত প্রকার উপকার করিতে পারিব, এবং করিতে আন্তরিক যত্ন হইবে। আমার বিবেচনায়, মামাকে যদি লওয়াইতে পারি, তবে তোমার তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।" মধুসূদন অবহিত চিত্তে গবেশের এই সৎপরামর্শ শুনিলেন। সূর্য্যমুখীর মুখের কথা মনে করিয়া একটু ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন চারিদিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন এ

কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। প্রথমতঃ অল্প পয়সায় বিবাহটা হইতে পারিবে; দ্বিতীয়তঃ ঘরে অন্য লোক কেহ নাই, সুতরাং শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বাটীতে থাকিলে কোন বিষয়ে কষ্ট পাইতে হইবে না; অথচ নিজের বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিবে; তৃতীয়তঃ রূপ চিরকাল থাকে না, এবং সুরূপ হইতে কুরূপ কোন কোন অংশে অধিকতর বাঞ্ছনীয়;—কুৎসিত হইলে মুখরা হইতে পারে না, স্বামীর বশীভূত থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মধুসূদন সম্মত হইলেন। পর দিন গবেশ রায় মাতুলকে বার্ত্তা জানাইল। মাতুল মহাশয় সহজেই সম্মত হইলেন। বিধবা ভগিনীর ভাত-কাপড়ের দায় এড়াইবেন, সূর্য্যমুখীর জন্য পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, তদ্ভিন্ন মধুসূদনের টাকা কয়টীও এই উপলক্ষে হস্তগত হইবে। গবেশকে কতক কথা বলিলেন, কতক বলিলেন না। ক্রমে গবেশের মাতুলের সঙ্গে মধুসূদনের সাক্ষাৎকার হইল। কথাবার্ত্তা সকল সুস্থির হইল; মধুসূদন সাড়ে তিন শত টাকা পণ দিবেন, অন্যান্য ব্যয় কিছু লাগিবে না, অলঙ্কার সামান্যরূপ দিলেই হইবে, আর দশ দিন পরেই বিবাহ হইবে।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গবেশচন্দ্র কিছু বিরক্ত হইল, কিছু রুষ্ট হইল। গবেশ মনে করিয়াছিল, এই মরসুমে সেও মধুসূদনের দশ টাকা হস্তগত করিয়া লইবে, মাতুলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হওয়াতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এই কারণে গবেশ প্রতিজ্ঞা করিল "ভাল, আমি না পেলাম, নাই। কিন্তু মধুর যাতে আর দশ টাকা লাগে, তা আমার করা চাই।"

বিবাহের "ধার্য্য" দিনে মধুসূদন যথাশাস্ত্র উপবাস করিয়া থাকিলেন; কিন্তু সেই অবস্থায় সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিতে হইল বলিয়া, তিনি কিছু কাতর হইলেন। সন্ধ্যার পর রীতিমত বিবাহ করিতে গেলেন, বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গণে বসিবার আসন হইয়াছিল। সেইখানে একটা বালিসের উপর ভর দিয়া মধুসূদন উপবিষ্ট হইলেন। গ্রামে গ্রামে বিবাহ, এই জন্য বড় ধুমধাম হয় নাই; পাড়ার দুই চারি জন ব্যক্তি বিবাহসভায় উপস্থিত ছিল মাত্র; কিন্তু স্ত্রীলোকের সমাগমটা তথাপি অল্প হয় নাই; যেন কোথাকার অপরিচিত বর বিবাহ করিতে আসিয়াছিল।

স্ত্রীলোকেরা গোলমাল করিতেছে, এমন সময়ে গবেশচন্দ্র নিজ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় করিল। ঘরের ভিতর হইতে গবেশের মাসী কাঁদিয়া উঠিল; সকলে সেই দিকে ধাবমান হইল, মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রোদনের কারণ শেষে এই নির্ণীত হইল যে, গবেশের মাসী মধুসূদনকে কন্যা দিতে পারিবেন না, যেহেতু মধুসূদনের কোমর ভাঙ্গা, এবং মধুসূদন কুব্জ, নতুবা মধু অমন করিয়া বসিবে কেন?

মধু গ্রামের লোক, মধুকে সকলেই জানে, সকলেই চিনে!—গবেশের মাসীর নিকট যে যত অনুরোধ বিরোধ করিল, সমস্তই পণ্ড হইল। অবশেষে এই নিষ্পত্তি হইল যে,

মধু যদি উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে। মধুসূদন অগত্যা তাহাই করিল, কিন্তু সমস্ত দিন উপবাস এবং পরিশ্রমের পর দাঁড়াইয়া থাকিতে কাহার সাধ্য? মধুসূদন বসিয়া পড়িয়।

তখন বিবাহ বন্ধ, লগ্ন ভস্ম হয়, এই জন্ম সকলে থাকিয়া এই মীমাংসা করিয়া দিল, মধু যদি আরও পঞ্চাশ টাকা "অঙ্গবাটা" দেন, তাহা হইলে, বিবাহ হইতে পারে। গবেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল; গবেশের মাসী সম্মতি প্রকাশ করিল; মধুসূদনও তাহাই স্বীকার করিল। মধুসূদনের বিবাহ হইল। পরদিন হইতে গবেশের মাসী, সূর্য্যমুখী এবং প্রায়শঃ গবেশচন্দ্র, মধুসূদনের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এই বিবাহে মধুর সঞ্চিত ধনের ধ্বংস হইল; অধিকন্তু কিছু ঋণ হইল। তথাপি কষ্ট স্বীকার করিয়া মধুসূদন দোকান হইতে কোনরূপে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনেক সত্য কথা, কিন্তু গুরুতর নয়।

ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার পূর্ব্বসূচনা কিছু-মাত্র হয় না। সুপরিষ্কৃত গৃহের অভ্যন্তরেও হঠাৎ তৃণ জন্মে; কূপের মধ্যেও মৎস্য জন্মে; রাজাধিরাজেরও অন্দরমহলে চোর প্রবেশ করে; রবির ন্যায় অগণিত কর দিয়াও বঙ্গদেশ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়কে জন্মের মত বিদায় দিতে ইচ্ছা হয়; নতুবা একমাত্র বিস্ময় ভিন্ন ভাবান্তর মনোমধ্যে স্থান পায় না,—প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেক কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতে জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। অতএব ২৩।২৪ বৎসর পরে কুলীনকেশরী বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় যে রাজহাটে দেখা দিলেন, ইহাতেও বিস্ময় প্রকাশ করা অন্যায়। গঙ্গোপাধ্যায় জীবিত আছেন, এ সংশয় বোধ হয় কেহই করেন নাই। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবিতব্যের কথা কে বলিবে?

বক্ষ্যমাণ কালের প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে, রাজহাটে অপরিচিত মুখোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখস্থ পথে, একদিন প্রভাতে উচ্ছিষ্ট শালপত্র পড়িয়াছিল; সেই পথ দিয়া যাইবার সময়, অমোঘ ভট্টাচার্য্যের পত্নী, সেই শালপত্রের উপর দৈবাৎ (না দেখিয়া) পদার্পণ করেন। পরক্ষণেই শালপত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন তাঁহার রাগ জন্মিল এবং তিনি বিবিধ প্রকারের বিশেষণ-বাণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, এবং দৌহিত্রীর (অর্থাৎ বিমলার মা এবং বিমলার) উপর তীব্রবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তিনী এক নাপিতবধূ আসিয়া এই বলিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিল যে, "গত রাত্রিতে অনেকগুলি লোক সঙ্গে বিষ্ণুরাম গাঙ্গুলী এসেছিলেন, সেই সঙ্গের লোকেরা পাত। ফেলিয়া গিয়াছে।" ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর ক্রোধ গেল, অধিকন্তু কিছু আহ্লাদ জন্মিল। আক্ষেপের বিষয় এই, বিষ্ণুরাম ঠাকুর এ কথার বাষ্পবিন্দু জানিতেন না; অথবা কালধর্ম্মে, তাঁহার এ কথা স্মরণ ছিল না। যাহা হউক, এবার যে তিনি আসিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ হইবার স্থল নাই।

বিষ্ণুরাম অনেক কষ্টে নিজ শ্বশুরালয় চিনিয়া লন, বস্তুতঃ ২।৪ জনকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি বাড়ী চিনিতে পারেন নাই। পরে বাড়ী চিনিয়া লওয়া হইলে, আপন ব্রাহ্মণীকেও চিনিয়া লইলেন। ইহাও পূর্ব্ববৎ। বহু দিন—ও বিষ্ণু—বহু বৎসর পরে প্রণয়ী এবং প্রণয়িনীর সম্মিলন হইল; প্রণয়ী প্রণয়িনীর দেহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মানের সময় নয়, মানের অবকাশ নাই, মান করিলে পাছে আবার হারাইতে হয়, মানে পাছে অপমান হয়, এই ভাবনা করিয়া "প্রেয়সী" অতি সাহসিনী হইয়া মুখরার ন্যায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। দেহের কুশল বলিবার অগ্রে, শাখা-দেহের (অর্থাৎ বিমলার এবং অতুলের) কথা বলিলেন। বিষ্ণুরাম এ সকল বড় বুঝিলেন না, বুঝিলেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটু আগুন চাহিয়া লইলেন, একটী ছোট কলিকার মস্তকে সেটুকু অর্পণ করিলেন, এবং এক টানে কলিকার উদরস্থ পদার্থ এবং বিমলার মাতার কথাকে ধূমরূপে পরিণত করিলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই সন্ধ্যা হইল। বিমলার মাতা বিষ্ণুরামকে ঘরের ভিতর বসাইয়া জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া নিজ দুঃখ বলিতে লাগিলেন; বলিলেন—"এত দিন পরে, তোমার যে মনে হইবে তাহা আমার মনে ছিল না। আর কিছু দিন না আসিলেই আমাকে দেখিতে পাইতে না; আমার শরীর অসুস্থ; বিমলার ব্যারাম (ভাগ্যে আমার দিদি তাহাকে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছে)। ঘর চলে কিসে, তাহার কিছুই উপায় নাই। আবার যখন অতুল হল, তখন কত লোকে কত কথা বলিল; কি করি, সহ্য করিয়া থাকিলাম। এখনকার লোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই; ইহারা—

অফলাকে ফলায়
অবোলাকে বলায়,
সতীকে পতি দেয়,
যতিকে মাছ খাওয়ায়।

তা কি করি, সকলই সহিতে হইল।" এমন সময়ে, চিবুক, কনুই পর্য্যন্ত দুই হাত এবং বক্ষঃস্থল হইতে উদর পর্য্যন্ত রসাভিষিক্ত করিয়া, একটা আম্রলেহন করিতে করিতে অতুলচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল; শুভ্রকেশ ব্রাহ্মণকে গৃহমধ্যে দেখিয়া অতুল

বিকট মুখশ্রী-বিকাশ করিল। অমনি অতুলের জননী বলিলেন,—"এই লও, তোমার সন্তান লও, যাহা করিতে হয় কর, নহিলে অন্ন অভাবে আমাদিগকে মরিতে হইবে।" বিষ্ণুরাম যেন ধবল-গিরি, তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলেন না। কোন কথা না কহিয়া, কলিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র। বিমলার মাতা কি করেন, একটু অগ্নি আনিয়া দিলেন। এইবার কলিকা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুরাম ঠাকুর প্রিয়ার সঙ্গে যথার্থ প্রণয়-সম্ভাষ আরম্ভ করিলেন, "আমার ত আর চলে না। টাকা কড়ি কিছু থাকে ত দিয়া উপকার কর; না থাকে অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া আমাকে কিছু আনিয়া দিতে হয়; নইলে চলিবে না। আর আমি আজি রাত্রি ভিন্ন কল্য থাকিতে পারিব না। যাহা হয় শীঘ্র ইহার একটা উপায় কর।" বিমলার মাতা যে জন্য বাঁধ বাঁধিতেছিলেন, তাহা বিফল হইল। বিষ্ণুরাম ঠাকুর ভুলিল না, টাকা চাহিল। "সর্ব্বনাশ! কোথায় পাব?" প্রভৃতি গুটি দশ কথা, এবং সেই পরিমাণ দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যয় করিয়া বিমলার মাতা পাকের চেষ্টায় গেলেন। বিষ্ণুরাম হুঁকা কলিকা লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। কিছু প্রাপ্তির আশা নাই জানিয়া গঙ্গোপাধ্যায় সহজেই যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর, নূতন পাইয়া "বাবা, বাবা" করিয়া অতুলচন্দ্র তাঁহাকে পঞ্চমের উপর তুলিয়া দিল।

বিষ্ণুরাম ঠাকুর ধূমপান করিতে থাকুন, আমরা এই অবকাশে "ইতোমধ্যের" কিছু ঘটনা বলিয়া লই।

নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে গোপালপুরের আখড়ায় রাখিয়া কলিকাতায় যান, এবং সিমলায় একজন বন্ধুর বাটীতে থাকিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। কত স্থানে ঘুরিলেন, তাহা বলা যায় না। কোথাও "কালেজের ছোক্‌রা, কাজ কর্ম্মের কিছুই জানে না" বলিয়া আপত্তি হইল; নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষণীয় অবস্থায় থাকিবার প্রার্থনা করিলেন, মিনতি সহকারে বলিলেন, "কর্ম্ম না পাইলে কর্ম্ম কেমন করিয়া শিখিব, কেমন করিয়াই বা দেখাইব? জলে না নামিতে পাইলে, কেমন করিয়া সাঁতার শিখা যায়?" কিন্তু সাঁতার না জানিলে জলে নামিতে দিবেন না, এটী কর্ম্মদাতার স্থির সঙ্কল্প। কোন কার্য্যালয়ে বা নির্দ্ধারিত সময়ে ৩।৪ দিন উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সন্দর্শনলাভ এক দিনও করিতে পারিলেন না; অধ্যক্ষ সে সময়ে নিশ্চিতই হয় অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত, নতুবা কার্য্যালয় হইতে অনুপস্থিত থাকিতেন! প্রায় অধিকাংশ স্থানেই নিরাশ হইতে হয় নাই, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের জন্য তৎকালে কর্ম্ম যুটিল না বলিয়া কিঞ্চিৎ সমদুঃখতা লইয়া নরেন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে হইল। অবশেষে রেলওয়ের ষ্টেশনে একটি কর্ম্ম পাইবার সম্ভাবনা হইল, কিন্তু তাহাতেও "আজি নয়, কালি।" নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দিন দিন সেই স্থানে গতায়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন নরেন্দ্রনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনে নিয়মমত গিয়া-

ছিলেন, এবং অপরাহ্নে ৪টার সময়ে বড়বাজারের মধ্য দিয়া আবাসে যাইতে-ছিলেন, চকের সম্মুখে একজন ফেরীওয়ালা, তাঁহাকে পাইয়া বসিল। "রজস্ ছুরী, আসল রজস্ উত্তম, নূতন আমদানী, ছ আনা ডজন" এইরূপ অনর্গল বক্তৃতা তাঁহার নিকট করিতে লাগিল। পথ লোকাকীর্ণ, কে কাহাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই; রাস্তার এ ধার একবার, ও ধার একবার করিয়া নরেন্দ্রনাথ ফেরী-ওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। একবার একখানা কাপড়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; সেই সঙ্কীর্ণ দোকানঘরের ভিতর দোকানদার একজন বস্ত্রক্রয়া-র্থীর নিকট নিজ সত্যবাদিতার পরিচয় দিতেছে। দোকানদার বলিতেছে "আঃ, দেখুন দেখি, আপনার কাছে যদি এক পয়সা বেশী লই, তা হইলে আমার বাপের মুখে—রাধাকৃষ্ণ, আর কি বলিব, মহাশয় ভদ্রলোক, বিশেষ জানা শোনা; মহাভারত! আপনার নিকট কি প্রবঞ্চনা করা যায়?" নরেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, এ ব্যক্তি যুধিষ্ঠির, কলিতে দোকানদাররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার এ ভাব পৌত্তলিকতাসংস্কৃত; এজন্য তিনি মনে মনে লজ্জিত হইলেন, পূর্ব্ব-ভাব সংশোধিত করিয়া ভাবিলেন, তাহাও কি কখন হয়? না যুধিষ্ঠির নামে কোন ব্যক্তিই ছিল, না তাহার জন্মপরিগ্রহই সম্ভব, না মহাভারতই সত্য। আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনুষ্য মাত্রেরই হয়। আহা! "একমেবাদ্বিতীয়ং, ওঁ তৎসৎ" মনে করিয়া ফেরীওয়ালার সহিত ছুরীর, কাঁচির দর করিতে এবং তাহার অন্য অন্য সামগ্রী সকল দেখিতে লাগিলেন। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া ইহাদের দুইজনের নিকট দাঁড়াইল, এবং সেও ছুরী কাঁচি দেখিতে ও তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং অধিক পরিমাণে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য দিতে স্বীকার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আর এক জন কতকগুলা রঙ্গীন কাপড়ের জামা লইয়া সেইখানে যুটিল। ক্রমে আর আর বিবিধ বস্তুর বিক্রেতা আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তখন নরেন্দ্র-নাথে নির্ম্মল চিত্তে একটু সন্দেহ প্রবেশ করিল, নরেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সঙ্কালন দৈব সুযোগে—"ন চ দৈবাৎ পরং বলং"—রামদাস সেই পথে যাইতেছিল, এবং কৌতূহলের বশীভূত হইয়া সেই গোলের ভিতর প্রবেশ করিল। অমনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া রামদাস ব্যাঘ্রবৎ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিল, এবং পলকের মধ্যে ফেরীওয়ালাদের শিকার ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। ফেরীওয়ালারা ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পুনর্ম্মিলনে দুই জনের সুখ-সাগরে ঢেউ খেলিতে লাগিল, দুই জনে কত কথা হইল, রামদাস কত অট্টহাসি হাসিল। নরেন্দ্রনাথ নিজ বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত আনু-পূর্ব্বিক সকল কথা বলিলেন। এক্ষণে কোন চাকরী নাই, জানিয়া রামদাস বিকট হাসিয়া দুঃখ জানাইল, এবং বলিল "তার জন্য ভাবনা কি? এত দিন আমায় বলিতে,

তাহা হইলে কোন্ দিন তুমি মহারাজচক্রবর্ত্তী হইতে। যা হউক, একটা কর্ম্ম এখনও হাতে আছে, চল দেখি, সেইটার চেষ্টা করিয়া আসি।"

কলী ব্রাদারের বাড়ীর মুৎসুদ্দী বিকু বাবু (আসল নাম বৃকোদর মল্লিক) বৌ-বাজারে বাস করিতেন; তাঁহার বাটীর উদ্দেশে রামদাস নরেন্দ্রনাথকে লইয়া চলিল। লালবাজারের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, স্বভাবমত্ত এবং মদমত্ত কত জাহাজী গোরা নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া কৌতুক করিতে লাগিল। এক জন গোরা এইরূপে হাসিল, আর একজন কি কারণে বলা যায় না, ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রথম গোরার কর্ণ-মূলে মুষ্টি প্রহার করিল, অমনি দুইজনে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল, মুষ্টিযোগের গুণে উভয়ের নাক হইতে অজস্র রক্তস্রাব হইতে লাগিল। একদল গোরা সেইখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে লাগিল, তথাপি ইহাদিগকে ছাড়াইয়া দিল না। কেহ কেহ বরং নীলবর্ণ কুর্ত্তীর আস্তিন গুটাইয়া জাহাজ গাছ হিজি বিজি আঁকা হাত দিয়া ভূপাতিত একতর বীরকে উঠাইয়া দিল এবং যুদ্ধে উৎসাহ দিতে লাগিল। রাস্তার মধ্যস্থলে বিবাদ, কাহার সাধ্য, ইহাদিগকে পার হইয়া চলিয়া যায়? দুই পার্শ্বে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ এবং রামদাস একটা জুতার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই গজকচ্ছপীয় ব্যাপারের শেষ পরীক্ষা করিতেছিলেন, দোকানদার দুই চারি বার ইহাদিগকে পাদুকা ক্রয় করিতে উপরোধ করিল। ইহারা শুনিলেন না, তখন দোকানদার এক যোড়া জুতা আনিয়া নরেন্দ্রনাথের মুখের নিকট ধরিল, এবং তাঁহাকে কিছু বিরত করিল; নরেন্দ্রনাথ বার বার "জুতা কিনব না", বলাতে দোকান-দার মিষ্ট স্বরে তাঁহাকে বলিল "এখান হ'তে সরে যাও, খদ্দের বন্ধ ক'রে দাঁড়িও না!" এমন সময়ে একজন সার্জ্জন আসিয়া গোরা দুটীকে ধরিয়া লইয়া গেল, পথ পরিষ্কৃত হইল, নরেন্দ্রনাথ ও রামদাস যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। মুৎসুদ্দী বাবুর সহিত ইহাদের দেখা হইল, বাবু ভরসা দিলেন এবং পর দিন কার্য্যালয়ে যাইতে আদেশ করিলেন। রামদাস এই হৌসের দালালী করিত, এ জন্য তাহার সুপারিসে ফল হইবার আশা জন্মিল। সে দিবস নরেন্দ্রনাথ সিমলায় গেলেন, রামদাস হাটখোলায় গেল।

পর দিন চাকরী সুস্থির হইল; কিন্তু আপাততঃ পনর দিন নরেন্দ্রনাথকে অন্তত্রে থাকিতে হইবে, তৎপর তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। এই পনরদিন নিরব-চ্ছিন্ন বসিয়া থাকিতে হয়, এ জন্য রামদাস পরামর্শ করিল যে, এই অবকাশে বিমলাকে এখানে লইয়া আসা নরেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্য। নরেন্দ্রেরও তাহাই মানস ছিল, এজন্য সহজেই তিনি সম্মত হইলেন, কিন্তু একাকী যাইতে অনিচ্ছুক হওয়াতে রামদাস তাঁহার সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিল।

পর দিবস দুই জনে যাত্রা করিলেন, এবং সময় মত গোপালপুরের আধ্ড়ায়

পৌঁছিলেন। বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল; কিন্তু বিমলাকে ইঁহারা দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করাতে, বাবাজী বলিল যে, বিমলার পিত্রালয়ের লোকে জানিতে পারিয়া বিমলাকে লইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ সহজেই এ কথায় বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু রামদাসের প্রত্যয় হইল না। রামদাসের কথায় কি হইবে? তাহাতে আবার বাবাজী ইঁহাদিগকে সত্বর আখড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিল। কেন তাহা বলা যায় না।

যখন ইঁহারা গোপালপুর হইতে বিদায় পাইলেন, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। তাড়াতাড়ি দুইজনে চলিতে লাগিলেন, এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই রাজহাটের সমীপস্থ হইলেন। এখন কি বলিয়া বিমলার সন্ধানে তাহাদের বাটী যাইবেন? গ্রামের বাহিরে বসিয়া, দুই জনে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। একটা পরামর্শ স্থির হইল, দুই জনে উঠিলেন। যে পথ ধরিয়া ইঁহারা চলিলেন, তাহাতে সর্ব্বদা লোকের গতায়াত হয় না; এজন্য তাঁহাদের সৌভাগ্যবলে, কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। রামদাসকে বাহিরে রাখিয়া, নরেন্দ্রনাথ "অতিথি" বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম গঙ্গোপাধ্যায় কিরূপ অবস্থায় প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। "অতিথি" শুনিবামাত্র তিনি চটিয়া উঠিলেন, "আপনি পায় না, শ্রাদ্ধ শঙ্করা। আমার গাঁজার পয়সা যোটে না, আবার অতিথি। তুই কে রে?" নরেন্দ্রনাথ অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া বিব্রত হইলেন; হতবুদ্ধির ন্যায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। এমন সময় অতুলচন্দ্র নাচিয়া উঠিল। "মা, সেই মাষ্টার মশায় এসেছে ওমা! দিদি কোথায় জিজ্ঞাসা কর না," বলিয়া চীৎকার করিল। গঙ্গোপাধ্যায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি তাঁহার ভয়ঙ্কর রাগ বাড়িল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া "বেরো আমার বাড়ী থেকে" বলিয়া গর্জ্জন করিলেন, এবং পানসী নৌকার মত এক পাটি নাগরা জুতা ফেলিয়া নরেন্দ্রনাথকে প্রহার করিলেন। সেই আঘাতে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন। বাহিরের দরজার পাশে রামদাস দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকেও কথা কহিলেন না, কেবল দৌড়িতে লাগিলেন; অগত্যা রামদাসও তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িল। গ্রামের বাহিরে গিয়া নরেন্দ্রনাথ কতক স্থির করিলেন, এবং রামদাসকে কতক কথা বলিলেন। রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, "ধনঞ্জয় না কি?" কিন্তু সে বিষয়ে উত্তর পাইল না, তথাপি বুঝিল।

সে রাত্রি দুই জনে নিকটবর্ত্তী অন্য এক গ্রামে গিয়া বাস করিলেন। পরের কথা পরে বলিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"বিধাতা কণ্টক দিয়া গড়িল মৃণালে।"

নরেন্দ্র বিমলাকে গোপালপুরের আখ্ড়ায় শ্রীরূপদাস বাবাজীর "জিম্মায়" রাখিয়া কলিকাতা গেলে পর, বিমলার সম্বন্ধে কি কি ঘটনা হইল, তাহা জানিতে পাঠকবর্গের অবশ্যই কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবেক। সেই কৌতুহল চরিতার্থ করিয়া পাঠক মহাশয়-দের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ সাধ আছে; তদ্ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মভয় বড়ই প্রবল, পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া কোন জুগুপ্সিত তত্ত্বেরও অপহ্নব করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এই দুই কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের লেখনীর বিষয়ী-ভূত উপস্থিত ইতিহাসের সমুদয় প্রসঙ্গই "সরকারী কাগজাৎ মোলাহেজায়" এবং অতি নিবিড় গভীর এবং সাভিনিবেশ অনুসন্ধানে যেমন আমরা জানিতে পারিয়াছি, অবিকল তদনুরূপ লিপিবদ্ধ করিব। যদি কেহ এই গ্রন্থের কোন বিবরণের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দি-হান হন, তাহা হইলে তিনি "বঙ্গ শতাব্দীর" উনপঞ্চাশৎ অবধি ত্রিসপ্ততিতম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখিয়া নিজ ভ্রম দূরীকৃত করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ যে দিবস কলিকাতা গেলেন, তাহার পরদিন বিমলা, প্রধান বৈষ্ণবীকে "ওষুধের" জন্য ধরিয়া বসিল। বৈষ্ণবী যদিও তাহা দিতে সম্মত ছিল, কিন্তু তখন দিল না। বলিল, "তা কি আমার কাছে আছে? খুঁজে পেতে আন্‌তে হবে, তবে পাবে; দুদিন দুবেলা তিষ্ঠিয়ে থাক, তার পর দেখা যাবে।" বিমলা কিছু ক্ষুব্ধ হইল। পুনর্ব্বার অধিকতর অনুনয় বিনয় করিল। এবার ফল দর্শিল। বৈষ্ণবী বলিল, "আচ্ছা তা দেওয়া যাবে। আজকার দিন তোমায় উপবাস করিতে হইবে। রাত্রে আমি ওষুধ তুলিয়া রাখিব। কালি সকালে আড়াইখানি গোলমরিচ দিয়া বেঁটে খেতে হবে।" বিমলা সেইরূপ করিয়া দিনমান রহিল। সন্ধ্যার পর বড় বৈষ্ণবী শ্রীরূপদাসের সঙ্গে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিয়া, একা বনের মধ্যে গেল। পর দিন সকালে বিমলা নিয়মমত "জড়ি বুটি" খাইল।

ঔষধি উদরস্থ হইতে না হইতে বিমলা অস্থির হইয়া উঠিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আগুনে পুড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অতিশয় কাতর হইল। একটা ঘরের ভিতরে বড় বৈষ্ণবী তাহাকে শোয়াইল। ঘরের ভিতর তাহার পর কি হইল বলিতে পারি না। এক বার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় বড় বৈষ্ণবী একটা হাঁড়ি হাতে ঘর হইতে বাহির হইল, এবং পুকুরের দিকে চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পরে খালি হাতে আর্দ্র-বস্ত্রে বৈষ্ণবী ফিরিয়া আসিল। কতকটা আগুন করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

তিন দিন পরে বিমলা ঘর হইতে বাহিরে আসিল। তখন আর সে বিমলা নাই; কণ্ঠহাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে বসিয়াছে, ঠোঁট দুখানিতে কেহ যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, শরীরে রক্তের লেশমাত্র নাই বলিলেই হয়। বৈষ্ণবী অকপটে তাহার সেবা করিতে লাগিল। বিমলাকে হলুদ মাখাইত, স্নান করাইত, সকালে রাঁধিয়া খাওয়াইত। বৈষ্ণবীর প্রতি বিমলার ভক্তি এবং ভালবাসা হইল। বিমলা দিন দিন সুস্থ হইতে এবং বল পাইতে লাগিল।

সাত, আট, দশ দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। বিমলা অল্প অল্প কাজ কর্ম্ম এখন করিতে পারে।

একদিন বাবাজী বড় এবং মেজো বৈষ্ণবীকে ভিক্ষায় পাঠাইয়া দিয়া, ছোটকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিতেছিলেন। ছোট বৈষ্ণবী তাঁহার নিকটে বসিয়া তুলসী কাষ্ঠের এক গাছি মালা গাঁথিতেছিল, এবং অতি মৃদু গুণ গুণ স্বরে, একচিত্তে বাবাজীর উপদেশ কর্ণগত করিতেছিল। ইহার এখনও "রাধাকৃষ্ণ" বলিবার বিলম্ব ছিল, কপচান ছাড়ে নাই। বিমলা আর এক ঘরের বাহিরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে বামপদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মাটী খুঁড়িতেছিল, এবং তাহাই দেখিতেছিল। বিমলা তখন কিছু ভাবিতেছিল কি না, তাহা বিমলার মন জানে, কিন্তু সে সময়ে যদি কেহ তাহার নিকটে থাকিত, তাহা হইলে সে মধ্যে মধ্যে একটী একটী নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইত; এবং বিমলার আকুঞ্চিত অপাঙ্গ দেখিয়া, তাহার হৃদয়ের বিষাদের অনুমান করিত। এই সময়ে বাবাজী তাহাকে ডাকিলেন। বিমলা চমকিয়া উঠিল; ঘাড় তুলিয়া, অথচ মাটীর উপর চক্ষু রাখিয়া, বাবাজীর দিকে মুখ ফিরাইল। বাবাজী বিমলাকে আদেশ করিলেন "একটু তামাক সাজ দেখি—গুড়ুক নয়" এ কথায় বিমলার মন উঠিল না; দেহও উঠিল না। পুনর্ব্বার রসসিক্ত করিয়া বাবাজী আদেশ করিলেন, বিমলা পূর্ব্ববৎ। ঋষিগণও রিপুর ধ্বংস করেন নাই, দমন করিয়াছিলেন মাত্র। বাবাজীও সেইরূপ, সুতরাং বাবাজীর ক্রোধ তাঁহার সরস্বতীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তদীয় আদেশ বাক্যকে কিঞ্চিৎ তিক্তস্বাদ করিল। তাহাতে বিমলার পিত্ত জ্বলিয়া গেল; বিমলা আর বিলম্ব না করিয়া, যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে দু-ফোঁটা চখের জলের চিহ্ন রাখিয়া শ্রীরূপদাসের আদেশ প্রতিপালন করিতে উঠিল, এবং কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বসিল। প্রভেদের মধ্যে এবার নেত্রজলের কিছু বাড়াবাড়ি।

বড় বৈষ্ণবী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে, বিমলা তাহাকে সকল কথা বলিল; এবং সে সময়ে যেমন কাঁদিয়াছিল, যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়াছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহার সহিত বিমলার একটু ভালবাসা জন্মিয়াছিল, বিমলা এ ভালবাসার পরিশোধও পাইত। বড় বৈষ্ণবী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, এবং

তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাবাজীকে দুই চারি কথা বলিল। বাবাজী বড় বৈষ্ণবীর নিকট সকল বিষয়ে "প্রভুর ইচ্ছা" খাটাইতে পারিতেন না, মনে মনে তাহাকে ভয় করিতেন। কিন্তু আজিকার কথায় বাবাজী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং লাল চোখ আরও রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "তুমি আপন চরকায় তেল দাও, পরের খবরে কাজ কি? ও ত আর কচী খুকী নয়, আপন কাজ আপনি বোঝে। খাটবে খাবে, আমি এই বুঝি।" বড় বৈষ্ণবী দ্বিরুক্তি করিল না, মন এবং মুখ ভারী করিয়া নীরব হইল। বাবাজীরও রাগ মনে মনে ধুঁয়াইতে লাগিল; কি কারণে, বলা যায় না, ছোট বৈষ্ণবী বিকাল বেলা হইতে সেই রাগে ফুৎকার দিতে লাগিল; বিমলার দুর্ভাগ্যক্রমে ছোট বৈষ্ণবী তাহাকে বিষনয়নে দেখিয়াছিল।

সন্ধ্যার পরে বাবাজী বিমলাকে ডাকিয়া পদ-সেবা করিতে বলিলেন। বিমলা অসম্মত; বাবাজী কটু-সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন, ছোট বৈষ্ণবী টুন্ টুন্ করিয়া সেই সঙ্গে যোগ দিল। বিমলার অসহ্য বোধ হইল। বিমলাও নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া দুই চারি কথা বলিয়া ফেলিল। বাবাজীও উঠিয়া তাহাকে মধ্যম গোছের একটী পদাঘাত করিলেন। বিমলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বড় বৈষ্ণবী তাহা হাতে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া গেল।

বড় বৈষ্ণবী যথার্থই মনে বেদনা পাইল; এবং "বিমলা কুলীন কন্যা, বিমলার পিত্রালয়ে অভিভাবক পুরুষ কেহ নাই, সুতরাং বিমলা সেখানে ফিরিয়া গেলে বোধ হয়, তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিবে না, বরং আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। এখনও উপায় আছে, ইহার পর অনুতাপ সম্বল হইবে;" ইত্যাদিরূপ উপদেশ বিমলাকে দিল। আমরাও বলি বিমলা, তুমি সাপের মণি আছে শুনিয়া ভুলিও না, মণি না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ আছে এটা নিশ্চিত।

সেই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বড় বৈষ্ণবীর অনুগ্রহে এবং সাহায্যে বিমলা আখড়ার সীমা ছাড়াইল। কিন্তু পিত্রালয়ে যাইবে কি না, এবং অপরিচিত পথে কেমন করিয়াই বা যাইবে, এই সব ভাবিতে ভাবিতে বিমলা কতক দূর চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র প্রখর হইল; বিমলার কাতর শরীর, সহজেই ক্লান্ত হইয়া উঠিল। কোন্ দিকে কতদূর আসিয়াছে, বিমলা তাহার কিছুই জানে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একখানি গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গ্রামের বাহিরে বাঁধাঘাটবিশিষ্ট একটী পুকুর, ঘাটের উপরেই এক প্রকাণ্ড বটগাছ, বিমলা সেই গাছের তলায় বসিল।

তখন বেলা দুই প্রহর; পুকুরের ঘাটের এক পাশে বসিয়া তিনটী চাষা স্ত্রীলোক তেল মাখিতেছিল, একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু জলের ভিতরকার পৈঠে ধরিয়া সন্তরণের অনুকরণ করিয়া পা ছুড়িতেছিল, এবং জল ছিটাইতেছিল। একজন ব্রাহ্মণকন্যা

বামকক্ষে পিত্তলকলসী এবং দক্ষিণহস্তে একখানি উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র লইয়া সেই ঘাটে আসিলেন। শূদ্র রমণীগণ শশব্যস্ত হইয়া আরও একপাশ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া ক্রীড়াশীল শিশুর পৃষ্ঠে ধপ্ করিয়া এক চড় মারিল এবং তাহার বাহু ধরিয়া টানিয়া লইল। বিপ্রনারী থালা ধুইয়া প্রথমে সেই খানে রাখিল, জলে ঢেউ দিয়া কলসী জলে পূর্ণ করিয়া কক্ষে লইল এবং থালাখানি পুনর্ব্বার জলে ডুবাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিমলাকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল; বিমলা একটু কাঁদিল, উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণকন্যা চলিয়া গেল। যাহারা ঘাটে তেল মাখিতেছিল, তাহারাও স্নান করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় বিমলার নিকট একবার দাঁড়াইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল; উত্তরে বিমলা আবার চক্ষের জল ফেলিল, কথা কহিল না। তাহারাও চলিয়া গেল; বিমলা বসিয়াই রহিল।

কিঞ্চিৎকাল পরেই একজন প্রৌঢ়া রমণী সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিল। বৃক্ষতলে বিমলাকে দেখিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। বিমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, বিমলা ইহাকেও কিছু বলিল না। কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ও একটু অশ্রু ত্যাগ করিল। প্রৌঢ়ার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না। সে বিমলার নিকট বসিল, এবং তাহার পর প্রশ্নবৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমলা নিরুপায় ভাবিয়া আত্ম-পরিচয়ে এইমাত্র বলিল যে, তাহার কেহই নাই, এই জন্য গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। প্রৌঢ়া অধর-প্রান্তে একটু হাসিল আর কিছু বলিল না। সত্বর স্নান সমাপন করিয়া বিমলার নিকট পুনর্ব্বার আসিল এবং তাহার সঙ্গে যাইতে বহুতর অনুরোধ করিল। বিমলা সম্মত হইল, প্রৌঢ়ার বাটীতে গেল। যাহার বাটী গেল, তাহাকে সকলে "রামের মা" বলিয়া ডাকিত। এক একটা পুকুরে তাল গাছের চিহ্ন মাত্র না থাকিলেও যেমন "তালবনা" নাম হয়, এই রমণীও সেইরূপ; রাম নামে তাহার কখন কোন সন্তান ছিল কি না, অধিকাংশ লোকে সে বিষয়ে কিছু জানিত না, কখন অনুসন্ধানও করে নাই।

বিমলা জাতিতে বৈষ্ণব, এইরূপ পরিচয় দেওয়াতে রামের মা তাহাকে নিজের রাঁধা অন্ন ব্যঞ্জন দিল। বিমলা বিস্মিতচিত্তে রামের মাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। বিকালে কতকগুলি যুবা পুরুষ, রামের মার বাড়ীতে আসিয়া তাস লইয়া খেলা এবং নানা প্রকার আমোদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিমলার মনে সন্দেহ হইল; ভাবিল,—"আমি ভাল হইব মনে করিলে কি হয়, বিধাতা হইতে দেয় কৈ? যাই হউক, যাহা ছিলাম, এ তাহা অপেক্ষা ভাল। আর, আর যে আমাকে মেয়ে মানুষ করিয়াছেন, সে করিয়াছে কেন? আমি যা, তা ত হবই।"

বিমলার মন একবার মাত্র হীন-সাহস হইয়াছিল। এক্ষণে আশ্রয় পাইয়া স্ত্রী-জাতির কর্ত্তব্যসম্বন্ধে নীতিধ্বংসিনী ভাবনা পুনরায় তাহার মনের উপর অধিকার ব্যাপ্ত করিল। বিমলা নিশ্চয় করিল, "ইহকালের সুখই সুখ।" এক্ষণ যদি রামের মা কিছু

দিন আশ্রয় দেয়, তাহা হইলে বিমলা সেখানকারও ভাবগতি দেখিয়া লয়। পরে যাহা হয় হইবে, বিমলার ভয় ভাবনা কিছুই রহিল না।

বিমলা এইখানেই রহিয়া গেল, কেহ তাহাকে যাইতে বলিল না। রামের মা তাহাকে বেশী বেশী আদর করিতে লাগিল।

যে গ্রামে বিমলা থাকিল, তাহার নাম বলরামপুর, রাজহাট হইতে গোপালপুর যাইবার পথে। রাজহাট এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর।

আমরা পূর্ব্বে পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, রামদাস এবং নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে গোপালপুরের আখড়ায় দেখিতে পান নাই। বাস্তবিক বিমলা সে সময়ে রামের মার বাড়ীতে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সীতানাথ বাবু।

ভরত ঘোষ বলরামপুরে বাস করিত। বাল্যকালে ইহার পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়াতে অনন্যোপায় হইয়া এ ব্যক্তি একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভৃত্যভাবে সেইখানে থাকিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত-করণ বিষয়ে তাঁহার সহকারিতা করিত। যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন ভরত ঘোষ চাকরী ছাড়িয়া পুনর্ব্বার নিজ গ্রামে আসিয়া বাস করিল ও চিকিৎসকের ব্যবসায় অবলম্বন করিল, এবং এতদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে দিন যাপন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব প্রভুর নিকট অন্য বিষয়ে যেমন হউক, ভরত ঘোষ বসন্ত রোগের একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ শিখিয়া লইয়াছিল। এইরূপে যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতিশালী হইলে ভরত ঘোষ সুরূল গ্রামে বিবাহ করিল। যে সময়ে ভরতের বিবাহ হয়, তখন তাহার শ্বশুর জীবিত ছিল না; এবং অভিভাবকের ভার লইয়া সংসার চালায়, শ্বশুরালয়ে এরূপ কোন ব্যক্তিও ছিল না; সুতরাং শিশু-শ্যালকের তত্ত্বাবধান ভরতকে করিতে হইত। ভরত প্রতিবর্ষে দুই তিন বার শ্বশুরালয়ে যাইত, এবং এক একবার ২০।২৫ দিন সেখানে বাস করিত। এই জন্য সে গ্রামেও ভরত চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হয়, এবং বসন্ত রোগের চিকিৎসায় ভরতের বিশেষ পারদর্শিতা থাকাও সকলে জানিতে পারে।

ক্রমে শ্যালক বড় হইল, ভরতেরও এক পুত্র হইল, এবং তাহার সর্ব্বদা সুরূল যাওয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তথাপি সুরূলের লোকের অনুরোধবশতঃ ভরতকে বৎসরে বৎসরে অন্ততঃ ২।৪ দিনের নিমিত্তেও সেখানে যাইতে হইত।

বর্দ্ধমানের উত্তর দিকে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার সময়ে, সুরুলে রেলওয়ে সংক্রান্ত এক "কারখানা" হয়, এবং অনেক প্রধান প্রধান ইংরাজ সেখানে বাস করিতেন। এই সাহেবদিগের অধ্যক্ষের একটি পুত্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ভরত ঘোষ সুরুল আসিয়াছিল। তাহার কথা সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সাহেব তাহাকে আপন কুঠীতে লইয়া যান, এবং ভরত তাঁহার সন্তানের চিকিৎসায় নিয়োজিত হয়। ভরতের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; বালক আরোগ্যলাভ করিল; সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না। ভরতকে সমুচিতরূপে পুরস্কৃত করিবার মানসে সাহেব তাহাকে রেলওয়ের ঠিকা লইতে বলিলেন। ভরত অর্থাভাবের আপত্তি করিল, কিন্তু সাহেব তাহাকে সে বিষয়ে ভাবিতে নিষেধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার ভাগ্যের উপর লক্ষ্মী স্থাপনা করিয়া দিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ভরত "বড়মানুষ" হইয়া উঠিল, এবং আরও কত বড় হইত বলা যায় না, কিন্তু দুই বৎসর শেষ না হইতে হইতেই যম তাহাকে লক্ষ্মীর হাতছাড়া করিল।

মৃত্যুকালে ভরত বার্ষিক সহস্র মুদ্রা লাভের ভূসম্পত্তি, বহুতর নগদ টাকা এবং তদুপরি সীতানাথ নামক সপ্তদশ বর্ষীয় এক মূর্খপুত্র রাখিয়া গেল। সীতানাথ, পিতার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিল, ভরতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই "বাবু" নাম পাড়াইল, অনেক দাস দাসী রাখিল, এবং অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্ন এবং উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। রামের মা ইহার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রী।

দুই চারি দিবস রামের মার বাটীতে থাকিতে থাকিতেই, বিমলা "দশ ইয়ারে"র রসনাপথে, সীতানাথ বাবুর কাণে উঠিল। সীতানাথ বাবু অগৌণে রামের মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার নিকট বিমলার সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন। অনেকবার ইতস্ততঃ মস্তক চালনার পর, রামের মা বিমলার অস্তিত্ব স্বীকার করিল, কিন্তু বিমলার সহিত সাক্ষাৎকার হওয়া বিষয়ে বাবুকে নিশ্চেষ্ট হইতে অনুরোধ করিল। সীতানাথ বাবু অর্থের লোভ দেখাইলেন, কিন্তু কার্য্য সিদ্ধ হইল না; রামের মাকে ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও রামের মা সম্মত হইতে পারিল না, এবং কাতরভাবে তাহার অসম্মতির কারণ বাবুর সমীপে জানাইল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই কথাবার্ত্তা হয়।

সেইদিন বিকালে সীতানাথ বাবুর নায়েব হলধর দাঁ রামের মাকে বিমলার জন্য বলিয়াছিল। রামের মা রীতিমত বিমলার সতীত্ব, অসুস্থতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বহু প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলে পর, হলধর তাহাকে এই বলিয়া ভয় দেখায় যে, রামের মা অসম্মত হইলে তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া দিবে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, অদ্যই তাহার বাটী গিয়া দেখিবে, তাহার কোন্ বাপে তাহাকে রক্ষা করে।

সীতানাথ বাবুর ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; বোধ হইল, সে অনলে "লঙ্কাকাণ্ডের"

পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ না হইয়া যায় না। অনলশিখার উত্তাপে রামের মা সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, ঘরে আগুন না লাগে, এই বিষয়ের উপায় করিবার জন্য প্রস্থানোন্মুখী হইল। কিন্তু বাবু তাহাকে যাইতে দিলেন না, সেইখানেই বসাইয়া রাখিলেন। নায়েবকে ধরিয়া আনিতে দুইজন দূত প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নায়েবকে পাওয়া গেল না।

সীতানাথ বাবু আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না; ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "এখনি গিয়া রামের মার ঘর লুট করিয়া, বিমলাকে সেখান হইতে লইয়া আইস।" মুখ হইতে কথা বাহির হইবামাত্র তিন চারি জন রামের মার বাটীর দিকে দৌড়িল। তাহাদের আস্ফালন এবং হুহুঙ্কারে সকল লোক চকিত হইল, এবং কত জন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

রামের মার বাড়ীর ভিতর ইহারা প্রবেশ করিবে, এমন সময়ে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিল; কিন্তু বহু লোকের বলের প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ক্ষণেক পরেই দ্বার ছাড়িয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। সীতানাথ বাবুর লোকেরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া বিমলাকে টানিয়া বাহির করিল এবং তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। বিমলা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আবার বিমলা তীব্রতর চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই সীতানাথ বাবুর ভৃত্যের হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। একজন দৌড়িয়া গিয়া আলো আনিল; তখন সকলে দেখে বিমলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে গাঢ় আঘাতের চিহ্ন হইয়াছে, তাহা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হইতেছে, এবং সেই স্থলে রক্তাক্ত এক খণ্ড দাও পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎদিক্ হইতে একজন ভৃত্যের মস্তকে এক ব্যক্তি বিষম লগুড়াঘাত করিল, ভৃত্য অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে বিব্রত; কেহ পলাইতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেবল এক ব্যক্তি অনতিদূরে ক্রোধ-কষায়িত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া স্তম্ভবৎ দাঁড়াইয়া। সে, হলধর দাঁ। তখন সকলে তাহাকে ধরিল, তথাপি হলধরকে কিছুমাত্র বিকলচিত্তবৎ দেখাইল না।

নিকটে বদনগঞ্জের থানা। একজন চৌকীদার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া থানায় খবর দিল। থানা হইতে সব ইনস্পেক্টর কনষ্টেবল প্রভৃতি সত্বরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তদারক আরম্ভ হইল। সবইনস্পেক্টর দুই তিন বার সীতানাথ বাবুর বাড়ী গেল, এবং পরিশেষে হলধর দাঁ ও সীতানাথ বাবুর এক জন ভৃত্যকে থানায় "চালান" করিয়া দিল। বিমলা ও সীতানাথ বাবুর আহত ভৃত্যকে বাঁকুড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পর দিবস থানা হইতে হলধর দাঁ ও বাবুর ভৃত্য বাঁকুড়ায় প্রেরিত হইল। থানার

যে রিপোর্ট সেই সঙ্গে গেল, তাহাতে সীতানাথ বাবুর নামগন্ধ থাকিল না, আমরাও ভবিতব্যের ভবিতব্যতা দেখিয়া ভাবনা হইতে উদ্ধার পাইলাম। আমাদের শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে, এই কোমল বয়সেই সীতানাথ বাবুর উৎসন্ন যাইবার পথ বন্ধ হয়। পুলীশ তোমাকে ধন্যবাদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মেঘ চাইতে,—জল।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জু শাযোগের পর, রামদাস এবং তিনি রাজহাট হইতে চলিয়া আসিয়া অন্য এক গ্রামে থাকেন। সে খানে পথের ধারে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের দোকানে বাসা লইয়া পাকাদির আয়োজন করিবেন, এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। অগত্যা তাঁহারা বৃষ্টি ছাড়িবার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন, এবং রামদাস এই অবকাশে "বিনামার" বার্ত্তাটা বৃকোদর নরেন্দ্রনাথের পেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

স্ত্রী-রত্ন লাভে বঞ্চিত হওয়াতেই রামদাসের পর্য্যাপ্ত রাগ জন্মিয়াছিল, আবার এই কথা শুনিয়া রামদাসের তপ্ত তৈলে জল ঢালা হইল! রামদাস নরেন্দ্রনাথকে বলিল —"আমার স্থির বিশ্বাস, পাজি বৈরাগী বেটা তারে লুকিয়ে রেখেছে। এ যদি না হয় তবে আমার সব মিথ্যা। যদি নাই হবে, তাহা হইলে বেটা অমন তাড়াতাড়ি আমাদের বিদায় করিবে কেন? সেটা বুঝ্‌ছ না? যাই হউক, ফের বেটার কাছ দিয়ে যেতে হবে, বেটাকে দেখিয়ে যাব, আমি রামদাস শর্ম্মা, কোন অবতারের অবতার।" এইরূপে রামদাস রাগে ফুলিতেছে, জ্বলিতেছে, বকিতেছে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" দিয়া, কখন বা শ্রীরূপদাস বাবাজীর পিতৃমাতৃ-কুলের সপ্তপুরুষান্ত করিতেছে; একবার একবার অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, কিন্তু বৃষ্টি যেমন তেমনই—সেইরূপ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া পড়িতেছে, কাহার সাধ্য এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে যায়। জলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু রামদাসের ক্রোধানলে জঠরাগ্নির যোগ হওয়াতে বৃষ্টির জলে তাহার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। আবার এই আগুনের উপর পতঙ্গ আসিয়া পড়িল;—এখন দেখা যাউক, অগ্নিই নির্ব্বাণ হয়, কি পতঙ্গই পুড়িয়া মরে।

এই বৃষ্টির সময়ে ভিজিতে ভিজিতে একজন ভদ্রলোক ইতর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া এই দোকানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রামদাস চটিয়া উঠিল; রাম-

দাসের বিশ্বাস হইয়াছিল, এ দোকানে যে পরিমাণ সামগ্রী থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাতে তাহাদের দুইজনের কষ্টে রাত্রি যাপন হইতে পারে; আবার যখন আরও লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রিতে অন্নাভাবেই মরিতে হইবে। এই জন্য রামদাস বলিল, "তুমি কে হে, এখানে জায়গা হ'বে না, স্থানান্তরে যাও।" ভদ্রলোকটা এ কথায় কর্ণপাত করিয়া অমর্য্যাদা স্বীকার করিল না। তাহার এক জন অনুচর কেবল বলিল, "এ কে রে? তোর বাড়ী কোথায় রে বাপু? মানুষ চিন্‌তে পারিস্ নে?"

রামদাস যে রামদাস, সেও একটু অপ্রতিভ হইল; বুঝিল এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহার নাম ধাম জাতি ব্যবসায় এক প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিল।

আগন্তুক ভদ্রলোক তাহার কথায় উত্তর না দিয়া গাত্রের আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং দোকানের অধিকারিণীকে বলিল "একটু আগুন নে আয় ত বাছা।" আগুন সে সময়ে কোথায় পাইবে, এ জন্য, চক্‌মকি, তামাক, টিকা, প্রভৃতি বাহির করিয়া দিয়া বৃদ্ধা বলিল "বাবা তোমাদের বড় দুঃখ হয়েছে। এ জল, এখন কি ঘর থেকে বেরুতে হয়। আহা! দেখ দেখি, ভদ্রলোকের ছেলে একি সামান্যি কষ্ট।" আগন্তুক উত্তর করিল "বেরুই কি সাধে? কোম্পানীর চাকর, কাজ পড়লেই যেতে হয়, আমাদের কি আর ঝড় বাদল আছে?

"কোম্পানীর চাকর" শুনিয়া রামদাসের কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইল। রামদাস পুনর্ব্বার আগন্তুকের প্রতি প্রশ্ন-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। তামাক খাইতে খাইতে আগন্তুক এবার উত্তর দিল। নাম, নবীন ঘোষ; বদনগঞ্জের থানার সবইনস্পেক্টারী কর্ম্ম উপলক্ষে সেইখানে থাকা হয়। একটা দাঙ্গার তদারকে বলরামপুর যাওয়া হইয়াছিল; অন্য গ্রামে একটু কার্য্য থাকায়; সেই স্থান হইয়া, এই পথ দিয়া থানায় প্রতিগমন হইতেছে।

নবীন বাবু সবইনস্পেক্টার ইহা জানিতে পারিয়া রামদাসের মনে মনে আহ্লাদ হইল; রামদাস মনে মনে ইহাও সঙ্কল্প করিল যে, ইহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিল, "হ্যাঁ বাবু, এই যে সম্প্রতি একটা খুন হয়েছে,—হাঁ, খুনই বটে, তা না হলে মানুষটাকে গুম্ করিল, সন্ধান পাওয়া গেল না, ইহার ভাব কি?—অবশ্যই খুন করেছে। তা আপনারা ত সবিশেষ জানেন, তার কি হ'ল বলিতে পারেন?" রামদাসের ইচ্ছা যদি তাহার কথায় থানা হইতে বিমলার অনুসন্ধান হয়, তাহা হইলে ভালই হইবে।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলিল—"কৈ, আমি ত ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না।"

রামদাস উত্তর করিল "সে কি মহাশয়। না, আপনি আমায় ফাঁকি দিচ্ছেন,

বসছেন না। এই ত সে দিনকার ঘটনা; একটী ভদ্রলোক একটী স্ত্রীলোককে গোপালপুরের—" কথা শেষ না হইতে নরেন্দ্রনাথ রামদাসকে বাধা দিলেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, রামদাস বিমলার সম্বন্ধে এই কল্পিত ঘটনার বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নরেন্দ্রের মনে হইল "অকারণে মিথ্যা কথাটা রটনা করা ভাল নয়; এই জন্ত অঙ্গুলি দ্বারা রামদাসকে টিপিয়া নরেন্দ্র বলিল—"আঃ সে কি কথা। কাজ কি তোমার ঐ সব বিষয়ে একটা গোলমাল উপস্থিত করিয়া?"

যে অভিপ্রায়ে নরেন্দ্রনাথ এরূপ বলিলেন, তাহা সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। নবীন ঘোষ বুঝিল যে, প্রকৃত ঘটনা গোপন করিবার মানসে, নরেন্দ্র এমন বাধা দিতেছে। নবীনের ঔৎসুক্য অত্যন্ত প্রবল হইল, এবং নবীন রামদাসকে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে কহিল।

তদনুসারে রামদাস এই মাত্র নবীনকে জানাইল যে, গোপালপুরের আখড়ায় একটী স্ত্রীলোককে রাখিয়া তাহার সঙ্গী ভদ্রলোক স্থানান্তরে যান; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাকে পাইলেন না এবং জনশ্রুতিতে জানিলেন যে, স্ত্রীলোকটীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

নবীন ঘোষ এ কথা শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া রামদাস এবং নরেন্দ্রনাথকে সে স্থান হইতে উঠিয়া নিজ সঙ্গে যাইতে বলিল। বৃষ্টি তখন বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু অন্ধকার অতিশয়, মেঘও অপরিষ্কৃত হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ উঠিতে অস্বীকার করিলেন, রামদাসও আহারাদি না হওয়ায় আপত্তি করিল। নবীন নরেন্দ্রনাথকে কটুবাক্যে উত্তর দিয়া তাঁহাদের দুই জনকেই আর সে স্থলে তিষ্ঠিতে দিল না। অগত্যা ইহারা দুইজনে সেই সময়ে নবীন ঘোষ ও তাহার অনুচরদ্বয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। সে রাত্রি সকলেই বদনগঞ্জের থানায় অবস্থিতি করিল। নরেন্দ্রের উপর দৃষ্টি রাখিতে একজন প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল।

প্রভাতে নবীন ঘোষ, দলবল সহিত রামদাস ও নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া গোপালপুরের আখড়ায় গেল। নবীন সর্ব্বাগ্রে কোন কথা না কহিয়াই শ্রীরূপদাসের বক্ষে পদাঘাত করিয়া তাহাকে বান্ধিয়া ফেলিল। পরে বৈষ্ণবীদিগকে বন্ধনদশায় রাখিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। ঘর ঘর, বৃক্ষমূল, ঝোঁপ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল; কোথাও কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া গেল না। রামদাসের কথা মিথ্যা হইবার উপক্রম হইল।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, আখড়ার পুষ্করিণীর তটে একটা রাখাল একদিবস সকালে গোরু চরাইতেছিল। বস্তুত সে প্রতিদিবস এই স্থানে গোরু চরাইতে আসিত। অদ্যও আসিয়াছিল। আখড়ার মধ্যে গোলমাল শুনিয়া বালক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেইখানে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু থানার পেয়াদা দেখিয়াই

সেই মুখেই ফিরিয়া পালাইবার উপক্রম করিতেছিল; এমন সময়ে রাখাল নবীনের দৃষ্টিতে পড়িল। নবীন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া আনাইল, এবং সহসা গুরুতর তর্জ্জন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যে খুন হয়েছে, তার তুই কি জানিস্?"

"কিছুই জানি না" বলিয়া রাখাল কাঁদিয়া উঠিল। নবীন তাহাকে পুনর্ব্বার ভয় প্রদর্শন করিল। বালক ফাঁপরে পড়িল। বাস্তবিক যে কথা কখন শুনেও নাই, তাহার সম্বন্ধে কি বলিবে? যাহা তাহা একটা কিছু বলিলেই ছাড়িয়া দিবে, বিবেচনা করিয়া রাখাল কান্দ কান্দ স্বরে বলিল "আমি ত আর কিছু জানি না, দেখিও নি, শুনিও নি, আমি আর কি জানি, আমি এঁ এঁ। আমি—"রাখালের কণ্ঠাবরোধ হইল।

নবীন তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালক আবার বলিতে আরম্ভ করিল। "আমি ত কিছু জানি না যে বলিব। তা বল্‌ছি, তা আমি কেবল দেখেছি যে—আমি ত কিছু দেখিও নি, শুনিও নি।" নবীন সত্য সত্যই বালককে সামান্য গোছের একটী চড় মারিল। বালক কান্দিয়া উঠিল, কান্দিতে কান্দিতে বলিল "অ্যাঁ—অ্যাঁ আমি—আমি, ঐ বড় বৈষ্ণবী ঐ—ঐ—একদিন—অ্যাঁ—অ্যাঁ—বিকেল বেলা—ঐ ঐ পুকুরে—জলে—একটা হাঁড়ি পুতেছে—আমি আর জানি না—দেখিও নি—অ্যাঁ অ্যাঁ শুনিও নি—তোমার পায়ে পড়ি—আমায় ছেড়ে দাও।

নবীন বালকের নিকট যথেষ্ট পাইল। হর্ষে নবীনের নয়ন ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। বালককে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিল; বালক অগ্রে অগ্রে চলিল, পশ্চাতে নবীন এবং আর দুইজন লোক। বালক স্থান দেখাইয়া দিল, নবীনের একজন অনুচর খুঁজিতে খুঁজিতে একখান খোলা, একটা কঞ্চী, ছাই ভস্ম তুলিতে লাগিল, এবং অবশেষে হাঁড়ি একটা পাইল। জল ছাড়া হইবামাত্র হাঁড়ি হইতে বিষম দুর্গন্ধ উঠিল। কষ্টে হাঁড়িটা ডাঙ্গায় আনা হইল। হাঁড়ির মধ্যে কতকটা দূষিত পদার্থ ছাই মাটির সহিত মিলিত। পদার্থটা কি, তাহা ঠিক করা গেল না। নবীন সেই হাঁড়ি সঙ্গে লইতে একজনের প্রতি আদেশ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া নবীন বড় বৈষ্ণবীর বন্ধন মোচন করিল, এবং তাহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া দোষ স্বীকার করিতে বলিল। বড় বৈষ্ণবী বলিল, "বাবা আমায় যাতনা দিলে কি হবে, আমি ত ইহার কিছুই জানি না। নবীন বড় বৈষ্ণবীকে "যাতনা" দিল না, মিষ্ট বাক্যে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া দোষ স্বীকার করিতে বলিল। বৈষ্ণবী তাহাতেও স্বীকার করিল না। তখন "যাতনা" আরম্ভ হইল; "যাতনা" প্রণালী কিরূপ, তাহা বলিতে আমাদের নির্জীব লেখনীও লজ্জিত এবং ইহার পক্ষে কণ্টকিত হয়। আমরা তাহা বলিতে পারিলাম না।

যখন সেখান হইতে বড় বৈষ্ণবীকে আনা হইল, তখন সে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিল যে, শ্রীরূপদাসের উপদেশানুসারে শ্রীরূপের প্রদত্ত একটা মূল, দ্বিতীয় বৈষ্ণবী বিমলাকে বাঁটিয়া খাওয়ায়, তাহাতে বিমলার গর্ভপাত হয়, এবং পরিশেষে বিমলার মৃত্যু হয়, বাবাজী সকলের অগোচরে দেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে!

শ্রীরূপদাস কোন কথাই—এমন কি, বিমলার সেখানে আগমন পর্য্যন্ত স্বীকার করিল না, কেবল কহিল "প্রভু জানেন।" মধ্যম বৈষ্ণবীও কোন কথা স্বীকার করিল না, কেবল কান্দিল। ছোট বৈষ্ণবী আসামীর শ্রেণীভুক্ত হইল না, তথাপি নবীন তাহাকেও "হেপাজতে" থানায় প্রেরণ করিল।

নবীন এখানকার অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া আসামী ও সাক্ষিগণকে থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিল, এবং স্বয়ং স্থানান্তরে চলিয়া গেল। পরদিবস নবীন থানায় আসিল না; এজন্য তাহার আদেশ মত ইহারা সেদিন থানায় থাকিয়া তাহার পরদিবস বাঁকুড়ায় প্রেরিত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট-লিপি।

কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,—কোন্ অভাব পূরণের অভিপ্রায়ে, সংসারে মনুষ্যের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ হয়, কেহই তাহা জানেন না। তথাপি, স্বভাব—মানুষের স্বভাব, পশুর স্বভাব, তরুর স্বভাব, লতার স্বভাব, সংক্ষেপতঃ সজীব নির্জীব সকলেরই স্বভাব—পরীক্ষা করিয়া লোকে স্থির করে, অমুক কর্ম্ম কর্ত্তব্য, অমুক কর্ম্ম অকর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনের পরিণাম কি?—অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে কেন প্রতিনিবৃত্ত হইতে বল?—জিজ্ঞাসা করিলেই তর্ক উপস্থিত হইল, সংসার-গ্রন্থে মানব-অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসা পাইবে না। তাহাতেও ত কর্ত্তব্যের অনুসরণ এবং অকর্ত্তব্যের নিবারণ কতক পরিমাণে হইতেছে। এরূপ কেন হইতেছে?—ফল না জানিতে পারিলেও সে বৃক্ষের মূলে জলসেক করি কেন?—ইহার সন্তোষকর উত্তর নাই।

যাহারা অধিক ভাবিতে ভাল বাসে না, তাহারা "অদৃষ্ট" নামে একটী বস্তুর কল্পনা করে এবং সমস্তই তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, ভাবনার সমীপে অবসর লয়। যিনিই যত পাণ্ডিত্যের অভিমান করুন, ইহাদিগকে নিরবচ্ছেদে দোষ দিতে কেহই পারিবেন না। কোন একটী কর্ম্ম করিতে উদ্যত বা প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্ম্মের পরবর্ত্তী ঘটনা-শৃঙ্খলের কতদূর তুমি সে সময়ে দেখিতে পাও? অদ্য কলিকাতা

হইতে কাশী যাত্রা করিলে; কিন্তু পথে যে যে কাণ্ড হইল, তাহার কয়টী তুমি জানিতে পারিয়াছিলে? তবে অদৃষ্ট দর্শাইয়া সে গুলির ব্যাখ্যা করিলে দোষ কি?

যাহা হইবে, তাহা হইবে;—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে;—সংসারে এই মাত্র নিশ্চিত, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিশ্চিত। সংসারে যদি মনুষ্যের জন্ম না হইত, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত কি না, বলা যায় না; কিন্তু যে মানুষটী জীবন ধারণ করে, তাহার জীবিত কালে, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে। কি ঘটিবে তাহা "অদৃষ্ট" জানে। ইচ্ছা, যত্ন, কিছুতেই তাহার বারণ বা অন্যথা হইবে না।

জীবন প্রদীপের তুল্য। প্রদীপে আলোক হইতেছে, ইহা যেমন সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি, অমুক বাঁচিয়া আছে, তাহাও সেইরূপ সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি। প্রদীপ যেখানেই থাকুক, নির্ব্বাণ হওয়া পর্য্যন্ত আলোক দিতে থাকিবে; মনুষ্য যে অবস্থাতেই থাকুক, কার্য্য করিতে থাকিবে। স্থান-বিশেষে প্রদীপ রাখ, তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে; আর এক স্থানে রাখ, তাহার তৈলশক্তি যতক্ষণ থাকিবে প্রদীপ ততক্ষণ জ্বলিবে, কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থর্ থর্ কাঁপিবে, একবারও স্পষ্ট বা পরিষ্কৃত আলোক হইবে না; অন্যত্র প্রদীপ উত্তম জ্বলিবে, কিন্তু কীট পতঙ্গের এতই সমাগম, তাহার নিকটে যায়, বা গিয়া তিষ্ঠিতে পারে, এমন কাহারও সাধ্য নাই। এরূপ স্থলে হয় ত তোমার ইচ্ছা হইবে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেই ভাল—তোমার বিবেচনায় সেরূপ আলোক অপেক্ষা অন্ধকার বাঞ্ছনীয়! আবার এমনও হইতে পারে, প্রদীপ উত্তম জ্বলিতেছে, কিন্তু ক্ষেত্র-গুণে তাহার আলোক তোমার পক্ষে অসহ্য বা তোমার বিবেচনায় অকারণ এবং নিরর্থক। কিন্তু তথাপি সকলে ইচ্ছা করে না, সে প্রদীপ নির্ব্বাণ হউক। যত দিন জ্বলে, জ্বলুক; যখন নিবিবে, তখন নিবিবে। মানুষের জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ। যতই বল, বাস্তবিক দোষ কাহারও নহে। অদৃষ্টের যদি কোন মূল থাকে, সে মূল দেশ এবং কাল; ব্যক্তি নহে। যদি তাহাই না হইবে, তবে শোক, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব কি প্রকারে এককালে সংসারে বিচরণ করে?

অদৃষ্টবশে বিমলার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। কেহ ইহাতে প্রীত হইবেন, কাহারও বা দুঃখ হইবে। কিন্তু প্রীত ব্যক্তি যেমন ইচ্ছাবলে ইহা ঘটাইতে পারেন নাই, দুঃখিত ব্যক্তিও সেইরূপ ইহার নিবারণ করিতে পারিতেন না। অদৃষ্টে যাহা হইবার ছিল, তাহাই হইল।

অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়া প্রযুক্ত বাঁকুড়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে, পথেই বিমলা বিবশা হইয়া পড়ে। বিমলা যখন চিকিৎসালয়ে নীত হইল, তখন অতি কষ্টে তাহার কথা বাহির হইতেছিল, এবং তাহারই মধ্যে মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অচেতনা তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। চিকিৎসালয়ে বিমলা প্রবিষ্ট হইবামাত্র চিকিৎসক বুঝিলেন, তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। এই হেতু অগৌণে মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ গেল।

মাজিষ্ট্রেট আসিলেন এবং বিমলার মুমুর্ষূক্তি লিপিবদ্ধ করিলেন। সেই দিন বিকালে বিমলা সংসারের সমীপে চিরবিদায় গ্রহণ করিল; একবিন্দু অশ্রুপাত করিয়াও কেহ বিমলার জীবনের সম্মান করিল না! বিমলা মরিবে, এ সিদ্ধান্ত সকলেই করিতে পারে, করিয়াও ছিল, কিন্তু অদ্য, এই স্থানে, এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহা কে জানিত?

বিমলার এ প্রকার মৃত্যু কাহার দোষে বা গুণে হইল? কেবল অদৃষ্টের। এমন অদৃষ্ট কেন হইল? দেশ-কালের গুণে; নিশ্চিত কোন ব্যক্তির দোষ গুণে নয়। দেখিতেছ না, অন্যত্র মরিলে নিশ্চিতই বিমলার জন্য কেহ কাঁদিত এবং অন্য কেহ হাসিত? এবং এস্থানে এখন কেহ হাসিলও না, কাঁদিলও না। এ ত্রিবিধ ব্যক্তির মধ্যে কেহই ত বিমলার মৃত্যুর নিদান নহে।

মৃত্যুর পূর্ব্বে বিমলা মাজিষ্ট্রেটকে নিজ সম্বন্ধে এইরূপ বলিল;—বিমলার নিবাস রাজহাট, বিমলা কুলীনকন্যা, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ দেহে জীবিত কুলঙ্ককে আশ্রয় দেয়, এবং নরেন্দ্রনাথকে নির্ব্বোধ বুঝিয়া তাহার উপর মিথ্যা জাল বিস্তার করিয়া কলিকাতা যাইবার মানসে তাহার সাহায্য গ্রহণ করে; গোপালপুরে বিশেষ সুযোগের অনুমান করিয়া সেইখানেই রহিয়া যায়; পরে আখড়ার বাবাজীর সঙ্গে বিবাদ হওয়াতে সেখান হইতে চলিয়া যায়; বলরামপুরে থাকিবার সময় তাহার বর্ত্তমান দশা উপস্থিত হইয়াছে।

তিন চারি দিবস পরে হলধর দাঁ ও সীতানাথ বাবুর ভৃত্যের বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হয়। হলধর দাঁ নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করে, কিন্তু তাহাতেও তাহার ফল দর্শিল না। হলধর দাঁ ও সীতানাথ বাবুর ভৃত্য সেশনে বিচারার্থ অর্পিত হইল।

সেই দিবস অন্য একজন বিচারক শ্রীরূপদাস বাবাজী এবং তাহার মধ্যম বৈষ্ণবীকে সেশনে অর্পণ করেন। ইহাদের অপরাধ দ্বিবিধ স্থিরীকৃত হয়; প্রথম, গর্ভস্রাবের কারণ হওয়া, দ্বিতীয় নরহত্যা। বড় বৈষ্ণবীকে মহারাণীর সাক্ষী করা হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার! ২৩শে শ্রাবণ ১২—

অদ্য শ্রীরূপদাস এবং তাঁহার বৈষ্ণবীর বিচার হইবে। বিচারালয় জনাকীর্ণ; দোকানদারেরা সকালে সকালে আহার সমাপন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; বাজারে অদ্য মুটে মজুর পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ; বাজে নিষ্কর্ম্ম ভদ্রলোক কত আসিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই—উপস্থিত বিষয়ে তাহাদের আলস্য বোধ হয় না, তদ্ভিন্ন সকল বিষয়েই হয়; বিদ্যালয়ের কত বালক বাম হস্তে পুস্তক লইয়া বিচারগৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের বিদ্যা বাহিরে বাহিরেই হয়। এই সকল ব্যতীত উকীল, মোক্তার, দালাল, অর্থী, প্রত্যর্থী, বিনাকার প্রভৃতি আদালতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যথা-নিয়মে বিরাজ করিতেছে। সকলেরই আমোদের সীমা নাই। কেবল জনকয়েক লোক বিচারগৃহের এক পার্শ্বে প্রহরায় বসিয়াছিল, তাহাদের মুখে হাসি নাই, কোন কথা নাই। ইহাদেরই মধ্যে শ্রীরূপদাস, এবং একপার্শ্বে ঘোমটা টানিয়া, মুখ ফিরাইয়া তাহার মধ্যম বৈষ্ণবী।

সীতানাথ বাবুর নায়েব হলধর দাঁ গত পরশ্ব তারিখে বহুতর ব্যয় করিয়া উকীল প্যারী বাবুর যত্নে, মোক্তার রসময় ঘোষালের পরিশ্রমে, এবং শেরেস্তাদার ও দাওরার মোহরের ও আর কয়েকজন আমলার দক্ষিণার উপযুক্ত অনুগ্রহে অব্যাহতি পাইয়া গিয়াছে। প্যারী বাবু নিজ প্রসিদ্ধ দক্ষতার সহিত আদালতকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হলধরের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; রসময় ঘোষাল মোক্তার বিশেষরূপ পরিশ্রমের সহিত সাক্ষী প্রমাণের তদ্বির করিয়া দিয়াছিল; শেরেস্তাদার মহাশয় বিচারকালে মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িয়াছিলেন, (তন্দ্রাবশতঃ কি অন্য কোন কারণে তাহা বলা যায় না) দাওরার মোহরের নথী পড়িয়া দিয়াছিল, এবং অন্য অন্য আমলারা মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড কাগজ লইয়া গিয়া জজ সাহেবের নিকট স্বাক্ষরিত করিয়া আনিয়াছিল। বাস্তবিক এরূপ যোগাড় করিয়া এতগুলি ক্ষমতাশীল লোক জমায়েৎবস্ত হইয়া উদ্‌যোগ যত্ন এবং পরিশ্রম না করিলে এমন সঙ্গীন মামলায় হলধরকে খালাস করিতে কাহার সাধ্য?

শ্রীরূপদাসের এত যোগাড় ছিল না সত্য, কিন্তু প্যারী বাবুর সুখ্যাতি এবং রসময়ের কার্য্যদক্ষতার কথা শুনিয়া অবধি প্রাণের দায়ে ইহাঁদিগকে নিজ পক্ষে নিযুক্ত করিবার জন্য বাবাজী ব্যস্ত হইয়া উঠে। এবং জেলখানার দারোগাকে কাকুতি মিনতি সহকারে আপন অভিপ্রায় জানাইলে পর, তিনি (যৎকিঞ্চিদ্দীয়মানের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া) রসময় ঘোষালকে জেলখানায় আনাইয়া দেন।

রসময় যথেষ্ট নম্রতার সহিত শ্রীরূপদাসের নিকটে নিজের গুণানুবাদ করিয়া এবং "মোক্তার যে পর্য্যন্ত যোগাড় না করিয়া দেয় ততক্ষণ উকীলের কোন সাধ্যই নাই" ইত্যাদি নীতি কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, অবশেষে বাবাজীর সহিত এই চুক্তি করিয়া লইল যে, বাবাজীকে মুক্ত করিয়া দিতে পারিলে বাবাজী উকীল মোক্তারের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক শত টাকা দিবে। এবং এই মর্ম্মে এক খণ্ড মোক্তারনামা লেখাইয়া লইয়া রসময় সেইখানে তজ্বিজ্‌ করিয়া লইল এবং বাবাজীর নিকট নগদ যাহা কিছু ছিল তাহাও হস্তগত করিল। প্যারী বাবুর নিকটে গিয়া রসময় বলিল যে, বাবাজী ভিক্ষুক নিতান্ত দুঃখী অথচ নিরপরাধ এবং এবার, শুদ্ধ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য প্যারী বাবুকে এই মোকদ্দমাটী চালাইয়া দিতে হইবে, এবং যদি মঙ্গল হয় ও বাবাজী অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে রসময় অবশ্যই প্যারী বাবুর বিষয়ে বিবেচনা করিবে, বরং সে জন্য রসময় প্রতিভূ থাকিতে প্রস্তুত; প্যারী বাবুও এ কথায় সম্মত হইলেন।

অদ্য বিচারের দিনে যথাসময়ে জজ সাহেবের গাড়ী আসিয়া আদালতের সম্মুখে থামিল, জজ এজলাসে উঠিলেন, নিজ আসন গ্রহণ করিলেন; একটা চুরটে আগুন ধরাইয়া দাঁতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং সেই অবস্থাতে ধূম ও বাক্যে মিশ্রিত করিয়া হুকুম দিতে লাগিলেন, এবং বাজে দস্তখৎ ইত্যাদি সারিলেন। তখন শ্রীরূপদাস ও তাহার বৈষ্ণবীকে আসামীর কাঠরার মধ্যে প্রবেশ করাইল, সাহেব নূতন চুরট ধরাইলেন, গবরমেণ্টের উকীল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং কপালের উপর চুল বাহির করিয়া তদুপরি শালের পাগড়ী দিয়া, গলায় সাড়ে তিন হাত কার ঝুলাইয়া, চাপকানের উপর "রামনারাণী" চোগা গায়ে গবেশাক্ষ বিশালদন্ত, স্থূলমধ্যনাস শীর্ণ-গণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট খর্ব্বাকৃতি প্যারী বাবুও আসিয়া যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

বিচার বিষয়ে সহকারিতা (আসেসরী) করিবার জন্য কতক গুলি লোককে আদালত হইতে পদাতিক দ্বারা আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছিল, ইহারাও এজলাসের এক-পার্শ্বে অন্তর অপরাধীর শ্রেণীর ন্যায় কাঁদো কাঁদো মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার মোহরের একে একে ইহাদের নাম ডাকিতে লাগিল। উপস্থিত মোকদ্দমায় তুইজনের প্রয়োজন—"নিত্যানন্দ দাস!"

"আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, অধীনের ঐ নাম। ধর্ম্মাবতার, আপনি মা বাপ, সব কর্‌তে পারেন, কিন্তু আমার কোন অপরাধ নাই। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি এর কিছুই জানিনে—কোন প্রসঙ্গের মধ্যে আমি নাই—সূচাগ্রে মৃত্তিকের সম্বন্ধ রাখি না!" যোড়করে গললগ্নী-কৃতবাসে, নিত্যানন্দ দাস, জাতিতে তন্তুবায়, ব্যবসায় বস্ত্রবয়ন, জজ সাহেবের সমক্ষে নিজ প্রার্থনা জানাইল। জজ বুঝিলেন, এ ব্যক্তি রীতিমত সময়ে উপস্থিত হয় নাই, সেই জন্য এ প্রকার করিতেছে; বুঝিয়া বলিলেন,—'কেবল

টোমার জন্ম আইন নহে, সাডরণের জন্ম হইয়াছে, অটেব দোষ কোরিলে সাজা লইটে ওইবে। আমি টোমার পচাশ রোপেয়া জোরমানা কোরিল।” নিত্যানন্দ ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, “ধর্ম্মাবতার আমার কোন অপরাধ নাই, আমার ভাত কামাই হবে, আমি তাতেও কিছু বলিতাম না, কিন্তু একটী মাতৃহীন (নিশ্বাস ছাড়িয়া) শিশু সন্তান একা ঘরে আছে, দোহাই ধর্ম্মাবতার আমায় ছেড়ে সে এক তিল থাক্‌তে পারে না, আর কেউ নাই, মরে যাবে, দোহাই আপনি মা বাপ! দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। রাখ্‌লে রাখতে পারেন, মার্‌লে মারতে পারেন।” মোহরের এবার জজ সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, এ ব্যক্তি আসেসর হইতে চাহে না। জজ সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “উহা ওইটে পারে না, টুমি উঠিয়ে আইস এবং আসন গ্রহণ করে।”

নিত্যানন্দ অধিকতর বিব্রত হইল। অতি দীনভাবে “ধর্ম্মাবতার, অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি পামর জন, ওখানে গিয়ে কি বসিতে পারি?”

জজ সাহেব ধমক দিলেন; নিত্যানন্দ অগত্যা যোড় হাত করিয়া এজলাসের উপর উঠিয়া সাহেবের পদতলে উপবেশন করিতে উদ্যত হইল। সাহেব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,—“টোম পাগলা নেহি হায়, যডি বারভাগর এরূপ কোরিবে, টোমার সাজা ডিয়া আমি নজীর করিবে, এবং পাগলা গার্ডে ভেজ ডেবে।” একজন আমলার নির্দ্দেশানুসারে, নিত্যানন্দ তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিল।

দ্বিতীয় আসেসর রামধন দত্ত, জাতিতে গন্ধবণিক্, অন্য ব্যক্তির অভাবপ্রযুক্ত দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়াছিল; এবং ভরসা করিয়াছিল, জজ সাহেবের নিকট এ বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া দোকানে ফিরিয়া আসিবে। ভাবগতি দেখিয়া রামধন কথাটী কহিল না; নাম-ডাক হইবামাত্র জজ সাহেবের পার্শ্বে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। জজ স্থির করিয়া রাখিলেন “বাবু রামধন দত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি।”

বিচার আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে রাখাল বালকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল; বালক পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিল, তাহার ন্যূনাধিক কিছুই বলিল না। প্যারী বাবুর কূট প্রশ্নে এই কথা বাহির হইল যে, বড় বৈষ্ণবী হাঁড়ি লইয়া যে দিন পুকুর ধারে যায়, তাহার পূর্ব্বে রাখাল বিমলাকে দেখিয়াছিল, এবং প্রথম দেখিবার সময় বিমলার উদর কিছু স্ফীত বোধ হইয়াছিল। বাস্তবিক, বালকের এ সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল না, কিন্তু প্যারী বাবুর তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভীত হইয়া সে এইরূপ বলিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাক্তার সাহেব। হাঁড়ির বস্তু পরীক্ষা করিয়া এবং পুলীশের লোকের মুখে অবগত হইয়া তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, পাঠকবর্গও তাহাই বুঝিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সাক্ষী স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। তাঁহাকে ডাকিবামাত্র, তিনি সেই গোল ঠেলিয়া, আজিমগঞ্জ-রেলওয়ে-গতিতে, সাক্ষীর আসনে গয়া দাঁড়াইলেন, একবার চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া লইলেন, দুইবার গলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অধোবদন হইলেন। তৎক্ষণাৎ একজন প্রহরী তাঁহাকে শপথ করাইতে অগ্রসর হইল।

প্রহরী। "বল. আমি যা বলি, তাই বল; বল—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—"

নরেন্দ্র নিঃস্পন্দ, নিঃশব্দ। প্রহরী পুনরায় বলিল—"বল না?" গবরমেণ্ট উকীল বলিলেন, "শপথ করুন, মশায়, সত্য কথা বলিতে উপস্থিত হয়েছেন, সত্য বলিবেন, তাহার আর কি? শপথ করুন।"

প্রহরী পুনর্ব্বার শপথের পাঠ আবৃত্তি ক'রতে আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রনাথকে তখনও নিরুত্তর দেখিয়া জজ সাহেব বিরক্ত হইলেন, এবং ভ্রূভঙ্গী করিয়া একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নরেন্দ্রের চক্ষু এতক্ষণ তাঁহার জুতার উপর ছিল, গবরমেণ্টের উকীলের বাক্য কর্ণগত হইবামাত্র, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া মুখ তুলিলেন, এবং তাঁহার নাসাদণ্ড ছাদের কড়ির সমান্তরাল হইল। জজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছ ভাষায় একটু প্রীতি-সম্ভাষণ করিলেন; নরেন্দ্র তাহা বুঝিলেন, প্যারী বাবু একটু হাসিলেন, সমানুভাবের গুণে দশজন বাজে লোকও হাসিয়া উঠিল। অমনি একজন পেয়াদা ব'লল "চোপ্ চোপ্" দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পেয়াদাও "চোপ্ চোপ্" করিয়া উঠিল, এবং তাহাতে মূল গোলমালের নিবৃত্তি না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইল। ক্ষণেক পরে পুনর্ব্বার শান্তির আবির্ভাব হইল।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এ প্রকার শপথ করিতে পারি না। পরমেশ্বরকে "প্রত্যক্ষ" কিরূপে ব'লতে পারি?" নরেন্দ্রনাথ কাঁচা ছেলে নয়, তায় বিজ্ঞান-পড়া ব্রাহ্ম। কিন্তু ইতর লোকে তাঁহার উত্তরের গাঢ়তা বুঝিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল; আবার গোল হইল, আবার থামিল।

জজ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন "তুমি পরমেশ্বর মানে না?" নরেন্দ্র বলিলেন "একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এ দুটী মানি না।" একটু বিতণ্ডার পর নরেন্দ্রনাথকে অনুমতি দেওয়া হইল যে, তিনি সত্য বলিবেন, এই কথা স্বীকার করিলেই হইবে। নরেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিলেন।

সরকারী উকীলের প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "বিমলা আমার সঙ্গে আখ্ড়ায় গিয়াছিল, তখন তাহার পীড়িত শরীর, কি পীড়া বলিতে পারি না; পীড়া কত দিন অবধি হইয়াছিল বলিতে পারি না, তাহার সহিত আমার তিন চারি মাস অবধি পরিচয় হইয়াছিল; বিমলার চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; নিতান্তই যদি বলিতে হইবে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সে দোষ তাহার নহে, দোষ আমাদের

দেশের ব্যবহার এবং রীতি-নীতির, তাহাকে আখড়ায় রাখিয়া আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিতে পাই নাই, শ্রীরূপদাসের বড় বৈষ্ণবী তাহাকে ঔষধ দিতে চাহিয়াছিল, দিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না; আমার সম্মুখে দেয় নাই। যখন কলিকাতা হইতে আসিয়া শ্রীরূপদাসকে বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন শ্রীরূপদাস বলিল, বিমলা নিজ পিত্রালয়ে গিয়াছে, সে কথায় আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমি বিমলার পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম, বিমলাকে সেখানে পাই নাই।" সরকারী উকীল ঈষৎ হাসিয়া বসিলেন।

প্যারী বাবুর কূট প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস যে, বাবাজী সাধু ব্যক্তি, বিমলাকে খুন করার কথা জানি না, এবং আমার বিশ্বাস হয় না, বিমলার বাড়ী রাজহাট গ্রামে, বিমলা আখড়া হইতে কোথাও গিয়াছে কি না তাহা জানি না, বিমলা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তাহাও জানি না। বিমলাকে যখন আখড়ায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, তখন আমার সঙ্গে বিমলা একা ছিল, অন্য কোন বাবু ব্যক্তি ছিল না।" প্যারী বাবু বসিলেন, সরকারী উকীলের মুখ একটু ম্লান হইল।

জজ সাহেবের খাদ্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল, অধিকাংশ লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কেহ কেহ বা ঘরের বাহিরেও গেল না, ভিতরেও রহিল না, দ্বারে দাঁড়াইয়া সব্যসাচী সাহেবের উভয় হস্তস্থিত ভোজন-যন্ত্র চালনা বিষয়ে ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া লোলুপমনে সাহেবকে সাধুবাদ দিতে এবং তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। উকীল মোক্তার প্রভৃতি সকলে একবার বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ হইল।

রাজ-সাক্ষী বড় বৈষ্ণবীর সাক্ষ্য গৃহীত হইল। বড় বৈষ্ণবী বিমলার মৃত্যু ঘটনা ব্যতীত সকল কথা স্বীকার করিল, এবং প্রাথমিক বিচারালয়ে কেবল পুলিসের শাসনে এবং ভয়ে বিমলার মরণের কথা বলিয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ করিল, এবং বলিল যে, আখড়ায় বিমলার মৃত্যু নিশ্চিত হয় নাই, বিমলা আখড়া হইতে চলিয়া গিয়াছিল। প্যারী বাবুর কূট প্রশ্নে বৈষ্ণবী প্রকাশ করিল যে, একা নরেন্দ্রনাথ বিমলাকে রাজহাট হইতে আনিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে রামদাস আহূত হইল। বিচারালয়ের বাহিরে একটী বটবৃক্ষতলে কতকগুলি লোক তামাক খাইতেছিল, এবং হুঁকাটী একবার পাইবার আশায় রামদাস তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। এখানে তাহার আসিবার বিলম্ব দেখিয়া সরকারী উকীল পুনর্ব্বার "রামদাস সাক্ষীকে" ডাকিতে বলিলেন, একটা বাঙ্গালী কনেষ্টবল "আমদাস সাক্ষী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বাহিরে এক জন হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল ছিল, সে "ওমদা সাক্ষী হাজির হ্যায়" বলিয়া বারম্বার চেঁচাইতে লাগিল, অগত্যা সব-ইন্‌স্পেক্টার স্বয়ং দৌড়িয়া গিয়া রামদাসকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া আসিল

সে সময়ে রামদাস হুঁকাটি পাইয়াছিল মাত্র, সুতরাং প্রাণান্ত পর্য্যন্ত একটান টানিয়াই তাহাকে আসিতে হইল। সাক্ষীর আসনে উঠিয়া সাহেবের দিকে রামদাস মুখের ধুঁয়া ছাড়িয়া দিল,জজ্র সাহেব একটু কপাল কুঞ্চিত করিলেন, রামদাসকে কিছু বলিলেন না।

শপথ করাইবার সময় রামদাস বলিয়া উঠিল "সত্য বলিব না ত কি মিথ্যা বলতে এসেছি? গঙ্গাজলী মনে করিও না।"

"মন্দ নয়" বলিয়া প্যারী বাবু একটু হাসিলেন। রামদাস, সরকারী উকিবের প্রশ্নে বলিতে আরম্ভ করিল "বিমলাকে রাজহাট হইতে চিনিতাম। বিমলা আর আমি আর নরেন্দ্র বাবু একত্র গোপালপুরের আখড়ায় আসিয়াছিলাম, বিমলা তখন পূর্ণগর্ভা হয় নাই, কিন্তু প্রায় বটে। বিমলার ব্যারাম হইয়াছে মনে করিয়া নরেন্দ্র বাবু বাবাজীর নিকট ঔষধ চাহিলেন, বাবাজী সম্মত হইল; আমার কিছু সন্দেহ হওয়াতে আমি নিষেধ করি, কিন্তু নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "বিমলার ব্যারাম বটে, অন্ত কিছু নয়, বাবাজীর ওষুধে সারবে" কাজেই আমি কি করি, মধ্যম বৈষ্ণবী কি একটা ঔষধ বাঁটিয়া খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে বিমলার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইল, এবং বার তারিখ মনে নাই, একদিন বিকালে সেই দিনেই বিমলার গর্ভপাত হইল, তার পর বিমলা বড় কাতর হইল, আমি বলিলাম, 'বাবাজী হ'ল কি? করিলে কি? এখন যে সর্ব্বনাশ হয়।' তাতে বাবাজী কোন উত্তর দিল না, সেই রাত্রি বিমলা মরে মরে হইল। আমরা আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না, সকালে উঠে ভয়ে কলিকাতা চলিয়া গেলাম, এবার ফিরিয়া আসিয়া আর বিমলাকে দেখিতে পাইলাম না, মেরে ফেল্‌লে কোথায় পাব?"

প্যারী বাবুর প্রশ্নের উত্তরে রামদাস বলিল "হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখিয়াছি না ত কি আপনার চোখে দেখেছি? হ্যাঁ স্বচক্ষেই দেখেছি।"

প্যারী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলাকে মরিতে দেখিয়াছ, না আন্দাজে বলিতেছ যে, সেই ঔষধ খাওয়াইবার পরে বিমলার মৃত্যু হ'ল?"

রামদাস ঘাড় চুল্‌কাইতে লাগিল।

প্যারী। "ঘাড় চুলকুলে কি বেরোবে? যা জান তা বল।"

রামদাস ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্যারী বাবু বলিলেন "ছাদে লেখা নাই, সাহেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে যা জান তা বল।"

রামদাস বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া বলিল "হ্যাঁ মশায়, দেখেছি, দেখেছি, মরতেই দেখেছি। আপনি কি বলেন, বিমলা মরে নাই? আচ্ছা যদি বেঁচে আছে, তবে তাকে কৈ আনুন দেখি?"

প্যারী বাবু চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ করিয়া রামদাসকে ধমকাইলেন, বলিলেন, "তোমায় তর্ক করিবার জন্য আনা হয় নাই, যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও, বেশী কথা বলবেত তোমার বিপদ ঘটবে" এই বলিয়া হলধর দাঁর মোকদ্দমার নথী আনাইবার প্রার্থনা

করিলেন, এবং তাহা হইতে বিমলার মুর্দ্ধ্যুক্তি বাহির করিয়া জজ সাহেবকে দেখাইলেন। রামদাসকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রামদাস সাক্ষীর আসন হইতে নীচে দাঁড়াইল। জজ সাহেব রামদাসকে একজন প্রহরীর জিম্বায় রাখিবার আদেশ করিলেন।

প্যারী বাবু বলিলেন যে, তাঁহার মওক্কেলের অনুকূলে অতিরিক্ত কোন প্রমাণাদি তিনি দিতে চাহেন না, এবং এই বলিয়া বক্তৃতা করিলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে, হত্যা সম্বন্ধে প্যারী বাবুর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, আদালত সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই। এজন্ত প্যারী বাবু কেবল অবশিষ্ট অভিযোগ সম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"প্রাজ্ঞ বিচারপতি এবং সুবিজ্ঞ আসেসর মহোদয়গণ!" নিত্যানন্দ যোড়হস্তে বলিল "এমন আজ্ঞা করিবেন না, আমরা কীটাণুকীট, অধম জন, মহাশয়ের দাসানু—" জজ সাহেব কুপিত হইয়া বলিলেন "ভিক্ মট্ করো।" প্যারী বাবুর বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

"এই দুই আসামী অদ্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কেন হইয়াছে? যেহেতু অদ্য আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে ইহারা ন্যায় পাইবে;—ইহাদিগের নিরপরাধ, দিনের আলোর ন্যায়, আপনাদের মুখের উপরিস্থিত নাসিকার ন্যায়, আমার এস্থলে দাঁড়াইয়া থাকিবার ন্যায় জাজল্যমানরূপে প্রকাশ পাইবে। যদি এইরূপ হস্তে সুবিচার না পায়, তবে কোথায় পাইবে? রাস্তায় না মুটেদিগের সভায়?—আমি সরলভাবে এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস এবং ভরসা ও প্রত্যাশা করি, কখনই না। অবশ্য এইখানেই পাইবে। ইহাদের উপর এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সুখের বিষয়, উহা যে পরিমাণে ভয়ঙ্কর সেই পরিমাণে মিথ্যা। ইহাদের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে? কিছুই না। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায়, ইহাদের অপরাধ হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রমাণ আবশ্যক। সে প্রমাণ কোথায়? নিশ্চিত নথীতে নাই। যদি নথীতেই না থাকিল, তবে আর কোথায়? আমি বলি, তাহা কুত্রাপি নাই, এবং আপনারা আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন। বালক সাক্ষী কিছুই বলে না; যাহা বলে, তাহাতে যে বৈষ্ণবীকে সাক্ষী করা হইয়াছে, সেই অপরাধ করিয়াছে। রামদাস যাহা বলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত তাহা একটী মিথ্যার রেক্তা গাঁথুনি। আপনারা তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু তাহার কথা সত্য নয়, মিথ্যা। এবং আমার মক্কেলের চরিত্র তাহা মূল করিয়াদি—যাহার এই স্ত্রীলোক বইত—প্রত্যুৎপন্নমতি, সাক্ষী হলে স্বীকার করিয়াছেন—পুনরায় বলি, এ চরিত্র নির্মল, গঙ্গার জলের ন্যায় নির্মল এবং খাঁটি এবং বিশুদ্ধ। নরেন্দ্রনাথের নিজের কথা কি?—'বাবাজী সাধু ব্যক্তি'। আমি অধিক

কিছু বলি না, কেহ কিছু বলি না, আমিও তাহাই বলি। তবে এরূপ স্থলে আসামী-দিগকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন, দিবেন, আমি তাহাতে কিছু বলিতে চাহি না। কেবল ইহাই বলি, এ ব্যক্তিদ্বয় নির্দ্দোষ, এবং উক্ত বৃত্তান্ত ফরিয়াদীর সাক্ষীর দ্বারাই সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব আমি ভরসা করি, আপনারা আমার সহিত এক মত অবলম্বন করিয়া, আসামীদিগকে নির্দ্দোষ খালাস দিয়া, ন্যায় এবং যুক্তির গৌরব করুন, কারণ আমার মক্কেলও যাহা, আঘাত প্রাপ্ত নিরপরাধও তাহাই। এই দুই কোন মতে ভিন্ন বলা যাইতে পারে না।" প্যারী বাবু রুমাল দিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে বসিলেন।

জজ সাহেবের পাখা যে ব্যক্তি টানিতেছিল, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হওয়া প্রযুক্ত হস্ত-স্থিত রজ্জু লোল হইয়া সাহেবের স্কন্ধে পড়িয়াছিল এবং গলায় জড়াইয়া গিয়াছিল। সাহেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন, রজ্জুর পাকে তিনিও নয়নো-ন্মীলন করিলেন। তখন প্যারী বাবু নিস্তব্ধ হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ দাস অবসর বুঝিয়া সাহেবকে মিনতি সহকারে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আপনি গরীবের মা বাপ। আমার যে জরিমানার হুকুম দিয়াছেন, তাহা কোন মতে আমা হইতে সরিবে না, আমি নিতান্ত দুঃখী, হুজুরেরও তাতে কিছু হবে না, পান সুপারির দাম কুলাবে না। বিচার করিতে আজ্ঞা হয়, নিতান্ত গরিবমারা হয়েছে।"

জজ সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বস্ বস্ নেহি ডেনে হোগা। টোমার রায় বোলো।"

রামধন এই উপলক্ষে সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে বলিল, "আমাদের আবার রায়। হুজুরের যে মত আমাদেরও সেই মত।"

সাহেব বলিলেন, "সে ওইটে পারে না। আলাহেডা রায় ডিটে ওবে।"

অগত্যা রামধন বলিল "প্যারী বাবু একজন মস্ত লোক; তিনি যা বলেন, তা কখনই মিথ্যা নয়, বাবাজী আর বৈষ্ণবী এ কথার কিছুই জানে না, দুজনেই খালাস্।"

নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমিও তাই বলি।" উভয় আসেসর রিহাই পাইল।

জজ সাহেব একটী চুরুট মুখে দিয়া বলিলেন "রূপডাস ডো বরস্, বাসেহে নট্-বষ্টবী খালাস।"

সেই দিনেই মিথ্যা সংবাদ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে রামদাসের বিচার হইল। রামদাস সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইল।

সমাপ্তি।

নরেন্দ্রনাথ আর এক দিনও বাকুড়ায় তিষ্ঠিলেন না। সত্বর কলিকাতা পৌঁছিলেন, তথায় একটী ভদ্রলোকের সাহায্যে শীঘ্রই পঁচিশ টাকা বেতনের একটী চাকরী পাইলেন।

পূজার সময়ে নরেন্দ্রনাথ বাটী গেলেন। গিয়াই মধুসূদনের সঙ্গে বিবাদ করিলেন, এবং পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করিলেন; দশ জনকে বলিয়া বেড়াইলেন, যুক্ত পরিবারের নিয়ম হইতেই আমাদের সামাজিক সমস্ত অনিষ্ট উদ্ভূত হয়। মধু অনেক ঋণ অকারণে করিয়াছে বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মধুকে পৈত্রিক সম্পত্তির কোন অংশ দিলেন না, ঋণগুলি ও ঋণগ্রস্ত চটের দোকান মধুর রহিল। মধু অক্ষুণ্ণ মনে তাহাতেই সম্মত হইল।

গত বৎসর আমরা সংবাদ পাইয়াছি, মধু সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছে, এবং দিন দিন তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে। গবেশ এখন কর্ম্মশীল হইয়াছে, এবং মধুর বাড়ী ঘর তদারক করে। মধু ব্যবসায়ের জন্য এখন প্রায়শই বিদেশে থাকে।

নরেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় প্রার্থনা করি। নরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে অনেক দেখাইলেন। যাহা দেখিয়াছি, আমরা তাহাকে কল্পতরু বলি, কারণ তাহাতে নাই, এমন প্রায় কিছুই নাই। নাই, কেবল আমাদের ন্যায় লেখক।

ইতি।

ভারত-উদ্ধার।

অথবা

চারি আনা মাত্র।

[ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা]

শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত।

"One must understand a thing to be able to enjoy it"

"Every man is a caricature of himself when you strip him"

সন ১২৮৪ সাল।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীপেষু—

"কল্পতরু"তে আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং আপনার শিষ্টাচারেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তাদৃশ নীচ-প্রকৃতিক কিনা, লোকে তাহার বিচার করুক, এই উদ্দেশ্যে এই মহাকাব্য আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। আপনি আমার নাম ব্যবহার করিবার সময়ে আমার অনুমতি লয়েন নাই, আমিও মহাশয়েরই অনুকরণে অনুমতির অপেক্ষা করিলাম না। 'ভারত-উদ্ধারে'র যদি সুখ্যাতি হয়, আমার পর্য্যাপ্ত প্রতিশোধ হইবেক; অখ্যাতি হয়, স্বকার্য্যের ফল ভোগ করিবেন। ইতি—

কলিকাতা
বড়দিন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরামদাস শর্ম্মা।

ভারত-উদ্ধার।

প্রথম সর্গ।

গাও মাতঃ সুরময়ে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ—
তৈলহীন, সলতে-হীন, আভাহীন এবে—
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্ত্তা; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে
আছে কি না আছে তা'রা এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে; (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তা'রা ত মা মরা!)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ-ধ্যান মাতঃ বর্দ্দাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মূর্ত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,

বাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব-বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সকল কর্‌য়া জন্ম, তোমার, আমার।
কালেজের পড়া শুনা সব করি শেষ
দু মাস ছ মাস ধরি, আফিসে আফিসে
নিতি নিতি যাই আসি; কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
কেকো উঠিতেছে মুখে সাধি' জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
খাবার কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর;
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নহিলে কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ!
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নম্র কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল,
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।
তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি
পলাইনু নিজ ঘরে। অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্ত্তমান হেন;—কিসে ভারত-উদ্ধার
কবে হৈল কোন মতে কাহার দ্বারায়

স্মরি স্বরীশ্বরী সরস্বতী সবিনয়ে,
গাইতে কহিনু তাঁরে উপর্য্যুক্ত মতে।
আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন;—
"কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতিকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ ?
হইল বয়স কত, বার্দ্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলী কম্পিত হয়; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরেতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হুদদদ কয়।
আর কি সে দিন আছে? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাও রে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয়
ফুৎকারে তোমার, সব হয় জড় সড়;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও সঙ্গীত;—
আমা হ'তে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি।
দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি,
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিতে হয় বল? কবে ফুরাইবে,
দশদিক্ অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাও রে গীত, ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ।

একদা আষাঢ় মাসে, আষাঢ়ান্ত দিন,—
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়—
কষ্ট কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
মৃদুল মলয় বায়ু, পরিমল-বহ,
বঙ্গোপসাগর-নীর-শীকরেতে তনু
সিক্ত করি, ধীরি ধীরি মহানগরীতে
আসিয়া পৌঁছিল; তথা, চতুরঙ্গী পল্লী
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পরিমাণে
শৈত্য কি সুগন্ধ লাগে, বাঁটি বাঁটি দিল
পরিমল বিতরণে পবনের ভার
লঘু না হইল কিন্তু; অঙ্গারাম্ল বাষ্পে
পূরিত হইয়া পুনঃ উত্তরে পশিল;—
হায় যথা গোপবধূ এক কেঁড়ে দুধ
পানা পুকুরের জলে সমান রাখিয়া
যোগাইয়া ফেরে বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি'
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে;
—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দন কাননে।
ভাবিছে বিপিন;—"হায়! গত কত দিন
এই ভাবে; আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা; বঙ্গ কত কাল রবে,
বঙ্গবাসি-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে?
আমি ত মরিব আগে, ক্রমে বংশলোপ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন রবে!
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,

পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধনিল!
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—মা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তাও; যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।
—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য
পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া দূর দেশান্তরে যাই,
তাও ত পারি না, প্রাণ থাকিতে এ দেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট" পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না,
অসহ্য হৈতেছে ক্রমে রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হল রসাতলে
কষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে; যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে

—হায় রে লজ্জার কথা, অস্ত্র অস্ত্র নাই!—
—হায় রে দুঃখের কথা অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি-দেহে!—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
স্তম্ভিত বিপিন! মুখে একমাত্র বোল
—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
বামজুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ
করিতেছে বিপিন দ্রৌপদী-পরাক্রমে
—না সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম-পরাক্রম—
সঘনে "বঁটাস" যত "পাষণ্ড ইংরেজে"।
বিপিনকৃষ্ণের বাহু বিসম দুলিছে,
লাটিম ছাড়িছে যেন কল্পনার বলে,
মুখে শুধু "বঁটাইছে পাষণ্ড ইংরেজে"
বিপিনের তদানীন্তন মুখের ভঙ্গিমা,
অন্ধকার হেতু নাহি পারি বর্ণিবারে
—হায় রে কল্পনা-নেত্র নাহিক আমার—
কিন্তু অনুভবে বুঝি, দন্তকিটিমিটি,
অধর-দংশন, আর ললাট-কুঞ্চন,
কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে বিপিন
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
কামিনীকুমার প্রিয়বন্ধু বিপিনের
হেন কালে চুপি চুপি তথা উপনীত।
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পশ্চাতে পশ্চাতে
অগ্রসরি সমীপেতে গিয়া বিপিনের
ছুঁইল তাহার স্কন্ধ; চমকি বিপিন,
ভাবিয়া পুলিশ, আর না চাহিয়া ফিরে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িবারে পাইল প্রয়াস।
দৌড়িছে বিপিন; আর, কামিনীকুমার
আশ্বাসিতে বন্ধুবরে দৌড়িছে পশ্চাতে।
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদের শর
—নশ্বর আশুগ শর—মৃগেন্দ্র-পশ্চাতে
তাড়া করি ধরে বিন্ধে, জরজরি পাছে

মৃগরাজে ভূমে, হায় তেমতি কামিনী
সে করাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি-ঘাটে
পাড়িলা বিপিনে, আর মড় মড় রঙ্গে
ধপাৎ করিয়া তার উপরে পড়িলা।
বিপিন, অসিত-কান্তি, হেঁট-মুণ্ড, ভূমে
গৌরাঙ্গ কামিনী সহ যায় গড়াগড়ি;—
কবির উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
দূর্ব্বাদলে শেফালিকা রাশি রাশি পড়ি;
অথবা, পর্ব্বতশৃঙ্গ গোধূলির আগে
স্বর্ণকান্তি তপনের কিরণে মণ্ডিত;
কিংবা যথা সুধাকর কৃষ্ণা ত্রয়োদশী-
শিরে দেয় কুতূহলে কৌমুদী ঢালিয়া।
কবির আমোদ কিন্তু বিপিনের ক্লেশ,
—লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক।
আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত,
নাসায় নিশ্বাসবায়ু বহে কি না বহে।
গা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী.
চিত্তাইলা বন্ধুবরে, তার্থ একদেশে
টানিয়া, তুলিয়া কিংবা, শোয়াইলা তারে,
উড়ুনীর উপাধানে, গলার বোতাম
পিরাণের খুলে দিয়া ব্যজনিলা তায়,
আনিয়া শীতল বারি খুঁট ভিজাইয়া
সিঞ্চিলা বিপিন-মুখে; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিলা বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা।
কহিল কামিনী—"কেন ভাই এত ভয়?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাধিলে লড়াই আজি দুশমনের সনে
তুমি অগ্রবর্ত্তী হবে; দেশের কল্যাণে
মুণ্ড দিতে মুণ্ড নিতে ভয় নাহি পাও;
তবে এ নগরমাঝে, জাগ্রত সকলে,
সিপাই সান্ত্রী হেথা ইঙ্গিত করিলে,

কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে?
পড়া শুনা করিয়াছ, তুত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা,
সাগর লঙ্ঘিতে পারি, গোস্পদে ডুবিলে?
তবে ত ভারত মাটী, ইংরেজের (ই) জয়!"

আশ্বাসিলা, বিলপিলা, হেন মতে যদি
কামিনী-কুমার, স্বর পরিচিত বুঝি,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল
—ইংরেজনিধন যাহে, ভাগ্যের লিখনে।

সাহসে বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা,
কামিনীরে বুঝাইলা মাথার ব্যারাম।
পুনঃ দোঁহে ধরাধরি দোঁহাকার হাতে
চলিলা নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর।

কামিনী বিনয়ে অনুরোধিলা বিপিনে
বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ।—
"কি হেতু একাকী আসা, কিবা সে ভাবনা;
হস্তের ঘূর্ণন যাহে, পদ-বিক্ষেপণ;
সহসা আগ্নেয় গিরি কেন উৎপাতিল,
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল;
গভীর জীমূতমন্দ্র হর্তেছিল কেন;
ইংরেজ-নিপাত শীঘ্র বুঝিনু নিশ্চয়।"

বহুক্ষণ দুই জনে হৈল কাণাকাণি,
বহু ভাবে বহু কথা বিচার করিলা
বন্ধুদ্বয়; ভারতের ভাবনা ভাবিয়া
বিসর্জ্জিলা অশ্রুনীর; সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্যহানি তায়।
কহিলা বিপিন, "আর বিলম্ব না সহে;
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিংবা সভায় বিলয়।"
দুই বন্ধু দুই দিকে করিলা প্রয়াণ,

নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দু'জনে
"ভারত-উদ্ধার প্রাতে"—ভাবিয়া শুইলা।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে সঙ্কল্পো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমের মত,
অনন্ত কালের অঙ্গে মিশাইল কাল,
আহৃত সিকতা-মুষ্টি স্তূপে মিশাইল।
কোথা পূর্ণবয়া পুত্র, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত,
ত্রিভুবন আন্ধারিয়া, জননীর ক্রোড়
শূন্য করি, অশ্রুবাণ শিশুরে ফেলিয়া,
পতির চরণ ভিন্ন গতি নাহি যার
এ হেন বধূরে করি চির-অনাথিনী
ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠুরের প্রায়,
মুছাইতে অশ্রুনীর না চাহিল ফিরে।
বিচারমন্দিরে কোথা—ধর্ম্মাধিকরণে—
রাজস্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
ভিক্ষাভাণ্ড ভিক্ষিবারে পশিল সংসারে,
কোন মহাজন,—ন্যায়-কূটের প্রসাদে।
অদোষ, অপাপ, কোথা, না জানি না শুনি,
চক্রান্ত-অনলে দিছে জীবন আহুতি,
মূর্ত্তিমান যমরাজ নররাজে দেখি।
কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।

কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে!
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই,
সুখের শৈশব, তবে চাহি না কি আর?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায়?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোত সম?
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত।
নগরে আফিস-মুখে গাড়ী ঘুড়ী কত
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তরিত পথে।
"দাণ ধকা, বাম ধকা, ধাই কুড়" করি,
উড়ে মেড়া ছুটে কত "পাল্কী" লইয়া।
ক্রমে ঠন্ ঠন্ রবে চারিটা বাজিল।
আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে; তাই ইট দেখা যায়;—
শোভিছে সুরম্য; রাজপথের উপরে
আঁকা বাঁকা; উচু নীচু কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী,
আবৃত অলিন্দ তার ম্লানভাবে ঝুলি,
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত কচিৎ।
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান; মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে।
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া,
বিলম্বিত টানা-পাখা, চির আবরিত

পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে।
এ হেন মন্দিরে "আর্য্য-কার্য্যকরী সভা"
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ!
ধন্য অনুরাগ! যাহে এ প্রাণ-সঙ্কটে,
স্বদেশ-বাৎসল্য-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া,
ভারত-কল্যাণে..হেথা সশরীরে আসে।
চারিটা বাজিবামাত্র, এক দুই ক্রমে
পঞ্চ সভ্য উপস্থিত সভার মন্দিরে।
আরব্ধ হইল কার্য্য; গতোপবেশনে
কে কে উপস্থিত 'ছিল, কি কার্য্য সম্পন্ন,
কি..প্রস্তাব হয়েছিল, কে বা দ্বিতীয়িলে
ঐকমত্যে উঢ় তাহা হইল কেমনে,—
রীতিমত বিবরিত, হৈল দৃঢ়ীকৃত,
সভ্যদল-সম্মোদনে, অদ্যের সভায়।
উঠিল বিপিন তবে চেয়ার ছাড়িয়া,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাঁকোচ সুস্বরে,
উঠন্ত বিপিনে ধন্যবাদিল চেয়ার।
কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্বোধিয়া সবে,—
"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
আজি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু;
যে প্রস্তাবে নির্ভরিছে সবার কল্যাণ;
দেহ প্রাণ নিজ হবে, রবে বা পরের
চির-জন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে;
ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে;
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভরে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালার, ভারতের ভাবী।"
নিস্তব্ধ সকল সভ্য, বিস্ফারিত আঁখি
এক ভাবে সংগ্রথিত বিপিনের মুখে;

নিস্তব্ধ সে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা
শব্দ তার শুনা যায় বিনা আকর্ণনে।
ত্রিলোকের একমাত্র শ্বাস হয় যদি,
সেই এক শ্বাস রোধি ত্রিলোক-নিবাসী
আরম্ভে কুম্ভক যোগ, একাসনোপরি,
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সঞ্চরে বায়ু,
গ্রহ উপগ্রহ নাহি করে চলাচল,
তথাপি না হয় স্তব্ধ সভাতল সম।
বলিলা বিপিন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত;—যথা পুরাকালে
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বলি,
'হায় রে ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত গুহায়'—
যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রয়োজন না হইবে কভু,
মরমে পশিবে বজ্র জরজরি তনু।"
করতালি পদতালি সঘনে সভায়,
বৈশাখের মেঘে যেন করকা-নির্ঘোষ।
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরম্ভিল কথা,—
ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত
কাহারো এ সভাক্ষেত্রে; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম-দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য-উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার;
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যার
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাইছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন্ অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে,

হৃদয়ে থাকে হে যদি, শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন
—শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার।
এ নিগড় খুলিবে না, তুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ?" পুনঃ করতালি।
"নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যদি থাকে
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
হায়! শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে।
—অসাধ্য বাঁচায় আর না নিন্দিবে কেহ।
হায় ঘৃণা! হায় লজ্জা! হা ধিক্! হা ধিক্!
হা কষ্ট! হা দুরদৃষ্ট! ভাগ্য ভারতের!
চীৎকারিছে দিবানিশি কবি নাট্যকার,
তবু না ভাঙ্গিল ঘুম অকালকুষ্মাণ্ড
কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তরে!
বিলম্ব না সহে আর।" বলিতে বলিতে
ভীমবেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কসিল।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিলা বিপিন,—
"বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার, যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেইদিন হইতে তটস্থ
কম্পমান-কলেবর ইংরেজের কুল।
ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!—"
  বিপিনের কথা শেষ হইবার আগে
উঠিলা সুরেশ;—"যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি প্রশ্ন এক সুধাই এ স্থলে।
স্বীকার, ইংরেজ-কুল কাপুরুষ বটে;
স্বীকার ইংরেজ হেন অত্যাচার করে;

উড়াইতে ফরফরি ভারত-আকাশে,
তবে সে সকল জন্ম। পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব মা গলে ফাঁসি; কি ভয় হে তবে?—
করাইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বল নাহি পারে কেহ।
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক্ সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভারত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার
কামিনীকুমার পুনঃ গ্রহিলে আসনে।
কোন্ ভাবে কার্য্যারম্ভ, কি কৌশলে কোথ
কখন করিতে হবে, কিবা আয়োজন,
কোন্ কার্য্যে কোন্ জন হৈবে নিয়োজিত
প্রয়াণিবে কোন্ জন কোন্ অভিমুখে,
প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈলা সভ্যবৃন্দ।
দংশিল রে কালফণী সুষুপ্ত মানবে,
শোণিতে মিশিল বিষ!—কে রক্ষিতে পারে
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
যে যার বিবরে গেল গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।

ভি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে মন্ত্রণা নাম তৃতীয়ঃ সর্গ.

চতুর্থ সর্গ।

নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কবি-গুরু-পদে
বার বার; গাঢ়-ভক্তি-প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি তাঁহারে, দাসে না বঞ্চিয়া যাহে,
দয়িয়া কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদ-রজঃ,
কবিত্বের চোরা বালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে বিম্নক্ষত, পাড়ি জমি যায়
তালয় তালয়। হায়, সদা সশঙ্কিত,
কবিত্ব—প্রবল—পদ্মা—তরিব কেমনে?
বিষয়—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম
পুত্তলিকা হৈয়া চাহি বাঁধিতে বারণে।
ললিত লবঙ্গলতা, মঞ্জু কুঞ্জবন,
বংশীধর দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজায়,
গোপিনীমনোমোহন, গোপী-মন হরি,
হায় রে কদম্ব-ফুল মলম্বা অম্বরে
সুস্বন স্বননে উড়ে যথা মধুমাসে,
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব
—এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি শিখিয়াছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি; কিসে
বর্ণনিব ভারতের উদ্ধার বারতা?
কবিগুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হইবে প্রয়াস,—ভয়ে হতেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি, সকরুণে, কবিগুরু, আমি;
কিন্তু সে কি কবিগুরু, যার ধ্যান করি?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌরাণিক কেহ,
সমিল-পদ-সূদন শ্রীমধুসূদন
—মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু
—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,
নবীন, প্রবীণ কিংবা; কেহই সে নহে।
বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে
কাহারেও নাহি মানি। কেন বা মানিব?

আপনি লিখিব কাব্য পরিশ্রম করি,
সুযশ অযশ যাহা হইবে আমার,
অনাদৃত কাব্য যদি, ক্ষুদ্রাবয়ব মম,
তবে কেন অন্য জনে গুরু হেন মানি?
তথাপি এ স্তুতি ধ্যান করিলাম কেন?
সুধাও আমারে যদি, অবশ্য উত্তর
সন্তোষ-জনক তার প্রদানিতে পারি;
'—গ্রন্থ-কলেবর শুধু করিতে বর্দ্ধন।
এখন (ও) রজনী আছে। নীরব অবনী,
শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায়
সারাদিন খেলা-ধূলা নিতি নিতি করি,
ধাতার আদুরে মেয়ে, হাসিমাখা মুখে,
(অলকার পাশে পাশে মুক্তা-বিন্দু হেন
স্বেদ-বিন্দু শোভা করে) শ্রান্তি দূর করে,
গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমতি
ঘুমাইছে। দেবকন্যা তারকার দল,
(ইহুদী জিনিয়া রূপে) দিবাভাগে যারা
লোক-লাজ হেতু থাকে অন্তঃপুর-মাঝে,
উন্মোচি গবাক্ষ যত স্বর্গ-নিকেতনে,
দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণ্ডল,
কেমন এ মর্ত্ত্যভূমি—না পড়িতে তোপ,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি, নিদ্রা পরিহরি,
কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পরিয়া পিরাণ গায় কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার-ব্রতে উৎসর্জিল তনু,
বাহিরিল গৃহ হৈতে! হায় রে সে সাজে

কন্দর্প ভুলিয়া যায়, জয় কোন্ ছার!
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে!
সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন।
কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ
সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়া তারা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আসিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মেলে
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,
ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা?
বিপিন বলিল, "ছাতু, খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যাবে আফগান দেশে"।
ইংরেজ না ভুলি তায়, বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হবে ইহা, নতুবা ছাড়িয়া
দিব না একটী বস্তা। তথাস্তু বলিয়া,
নিয়ম করিয়া পরে এক মাস কাল,
বিপিনক চলিয়া গেল আফগানস্থানে।
সীমান্তরক্ষক ছিল মিষ্টার জনস্;
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া

এক এক করি, তার তথাপি সংশয়
না মিটিল। রাসায়ন-পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,
তাদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া
বহু পরীক্ষার পরে জনশ-সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—'দহ্যমান নহে'।

বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, রক্ষণ পীড়ন
নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত উদ্ধার,
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত-সীমায়,
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুএজ-খালের ধারে অযুত গুদাম
ভাড়া করি, ছাতু দিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।

হেথা কলিকাতা ধামে মহা হুলস্থুল,
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বাঁটি নিরমাণে,
সুন্দরীর কাঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,
বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারী।

চিতপুর-খাল-ধারে কুম্ভকার দল
মাটী তুলিবার ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিয়া
চলিল গড়ের মুখে। গড়ের তলায়,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, নানা স্তূপাকৃতি
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশিযোগে
কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,
সব কিনি, মসলে তার ছিঁড়িয়া লইয়া,

পটকা লতার স্তূপে মিশাইয়া দিয়া,
রক্ষিত সপত্তের সূত্র সুড়ঙ্গের মুখে।
দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্‌যোগ,
শেষ হৈল এক দিন কার্ত্তিক মাসেতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্‌যোগো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাঙ্গলায় বিভাবরী হইল প্রভাত!
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।
কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ, আশঙ্কা, আশা, নৈরাশ্য পর্য্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তারা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনী-কুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি।
দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত হও—
বিপিন বিশুষ্কমুখ, উঠিলা বসিয়া
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে; ধরিয়া চরণ
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা-মুখপানে চাহি,
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমার,

কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুতলি?"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।
"সে কি প্রাণনাথ! দেখি এ কি কুলক্ষণ?"
উঠিয়া বলিল সতী, পতি-কর ধরি,
"কোথায় যাইবে তুমি? কেন হেন ভাব?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায়; কি দুঃখে বা কান্দ?
নাহিক চাকুরী, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ! কাটনা কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার!
অবশ্যই কোনমতে দিন কেটে যাবে।
"তা নয় প্রেয়সি" ব'লে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে, হায় রে যেমতি
নব-বর্ষা-সমাগমে—"তা নয় প্রেয়সি
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা-ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।"
"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে, সর্ব্বাঙ্গ তার কাঁটা দিয়া উঠে—
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হতেছ হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার?

এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, নব শিরঃ পাতি,
আমি তব চিরদাসী।" "ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন, বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি।
কৌশলের যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে;
নিশ্চিন্ত যাইব রণে উদ্যম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোনো কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,"
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গবীরবৃন্দ।
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে-ভাত দুটো।
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
বিল্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।

আইল তাড়িত বার্ত্তা—"ফেলা হইয়াছে,"—
বুঝিলা সে বীর-বৃন্দ, নিরূপিত দিনে
পূর্ব্বের সঙ্কেতমত, সুয়েজে যে ছাতু
বিপিন আসিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া,
তথাকার কর্ম্মচারী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে, সুয়েজের খালে,
শুষিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে
আনন্দে বিষম রোলে হৈল করতালি,
"জয় ভারতের জয়" শব্দ সভাতলে;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।
চলিলা সে যোদ্ধদল মহাতেজে ভরি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপরি
রঞ্জিত বাসন্তি রঙ্গে, মদন-মূরতি
সুলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে রণ-বাদ্য তবলার চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সেতার, ফ্লুট, বীণ, ঘুঙুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীম পিচকারী,
কাহার বা বঁটি হাতে,—চলে বীরদাপে,
কাঁপাইয়া শক্রহিয়া কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভীদল গোষ্ঠের সময়ে।
গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি, অপূর্ব্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি, চতুকোণ, অর্দ্ধচন্দ্রপ্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি, শ্রবণ অন্তরে,
রুমাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে

পটকা এক এক হাতে। বিপিন-আদেশে,
প্রসারি দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার,
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
কলসে পটকা পুরি, সংযোজি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
ভাবিয়া তামাসা কিছু হইছে বাহিরে,
ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তারা, অদৃষ্টের বশে,
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পুরি পিচকারী
হানিল বাঙ্গালী-সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি, কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল।
পুনশ্চ ইংরেজ-সৈন্য বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ সশস্ত্র এবে; বন্দুক, শঙ্গিন,
ঝকঝকি ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হয় কিরিচ-ঝঞ্ঝনা
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি ক্ষণিক।
সেনাপতি-আদেশেতে, অরাতির দল
করিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙ্গালী অর্দ্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অর্দ্ধবল, আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সলতে ছিল সুরক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
চটপট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ
সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইয়া ক্ষিতি বিদারিয়া

গাঁজিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা দগ্ধ করি,
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক্,
প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হায় খক্ খক্ খকে
কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাচ ফ্যাঁচ ফ্যাচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।
তদুপরি বালি-জলে পড়ে পিচকারী
কাতর ইংরেজ-কুল; খসিয়া পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।
সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমণী—
কাহারো চশমা চক্ষে, গৌন পরা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর,
মখমলে ঊর্ণা-ফুল,—দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহারে দেখাইয়া বীরে বাখানিছে,
কেহ বা হেরিয়া মুগ্ধ, দেখিছে নীরবে ;
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য রে বাঙ্গালী-'শিক্ষা' ধন্য রে কৌশল।
ধন্য রণ বাঙ্গালীর! ধন্য বীরপনা!
বিচিত্র সাহস তার কেমনে বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য, দেখি বাঙ্গালী-বীরতা.
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে,
করিল মন্ত্রণা ঘোর অর্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়" কাঁপিল ইংরেজ।
মাচায় জন্মিয়াছিল অলাবুর লতা,
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির

অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙ্গালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু-প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালীসৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনা
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি বদন লক্ষ্য; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বটি হস্তে করি,
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্ হারিল ইংরেজ!
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকিল সম্মতি দিল, হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া; থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
যে—যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত-উদ্ধার যবে হৈল হেনমতে।
হউক্ বা না হউক্ ভারত-উদ্ধার,
চারি আনা পাই, সদ্য এই উপকার।

ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান্॥

ইতি শ্রীভারতোদ্ধারকাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।

ক্ষুদিরাম।

গাল-গল্প।

(ভগ্নাংশ)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

"ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্ত নিবেদনম্
শিরসি মালিখ, মালিখ, মালিখ।"

কলিকাতা,
৬, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

ক্ষুদিরাম।

পূর্ব্বাভাস।

"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। শ্মশানক্ষেত্রের উপর দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্য সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরু-পাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে।

বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে

গুরুদেব! কে এমন সময়ে শব-সাধনে নিযুক্ত হইবে?"

১। মুখে মিঠা, হাড়ে চটা।

নানা কারণে ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা।

শ্রীমান্ ক্ষুদিরাম বিশ্বাস, জাতিতে কৈবর্ত্ত। অর্থাৎ কুসংস্কার-মাখা, কুশিক্ষা-প্লাবিত, কুবুদ্ধি-পুষ্ট বঙ্গদেশ—এই বঙ্গদেশে ক্ষুদিরামের আদি বৃত্তান্ত যে কেহ অবগত ছিল, সেই বিশ্বাস করিত যে, ক্ষুদিরামের পূর্ব্বপুরুষেরা কৈবর্ত্ত; এক পুরুষ, দুই পুরুষ নহে, সাত পুরুষ, চৌদ্দ পুরুষও নহে, ক্ষুদিরাম যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের আদিপুরুষ অবধি খোদ ক্ষুদিরাম পর্য্যন্ত একাদিক্রমে সকলেই কৈবর্ত্ত।

ক্ষুদিরামের জাতিত্ব সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস এইরূপ। যে কথায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে; সুতরাং ক্ষুদিরামের কোন পুরুষে কেহ কৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য জাতি ছিল কি না, ইহা বলা অসম্ভব। তবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, ক্ষুদিরাম নিজেও অকপটচিত্তে বিশ্বাস করিতেন, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ধীবরপাড়া-নিবাসী বিশ্বাসেরা নির্ভাজ কৈবর্ত্ত। বলা বাহুল্য যে, ধীবর-পাড়াই ক্ষুদিরামের পৈতৃক বাসস্থান।

লোকের কাছে এই পরিচয় এবং নিজের মনেও এইরূপ ধারণা,—ইহাতেই ক্ষুদিরাম হাড়ে হাড়ে সংসারের উপর চটা। ক্ষুদিরাম মনে মনে করিতেন—"জন্মের পূর্ব্বে আমার যদি এ বিষয়ে কিছুমাত্র হাত থাকিত, তাহা হইলে কৈবর্ত্ত-কুলে আমি কখনই জন্ম-গ্রহণ করিতাম না। ভাল, আমি না হয় সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, আর দশ জন ভদ্রলোকেরও ত নিষেধ করা উচিত ছিল। কিন্তু নিষেধ করিবে কে? এ দেশে কি ভদ্রলোক আছে? দেশের সকল বেটাই স্বার্থপর, সকল বেটাই ছোটলোক!'

মনের কথা মনেই থাকে। ক্ষুদিরাম কখন এ সব কথা প্রকাশ করিয়া কাহারও কাছে বলেন নাই। সকলেই জানে, ক্ষুদিরামও জানেন যে, যে ব্যক্তি মনের কথা মুখে আনে, সেই পাগল। ক্ষুদিরাম পাগল নহেন; বুদ্ধিমান বলিয়াই ক্ষুদিরামের খ্যাতি।

জাতিতে কৈবর্ত্ত হইলে কি হইবে? ক্ষুদিরামের চেহারা-খানি ভাল। দশ বার বৎসর বয়ঃক্রমে যখন খালি পায়ে, ছোট একখানি আধময়লা চাদর গায়ে, ডান-নাকে মাকড়ি-পরা ক্ষুদিরাম বই বগলে করিয়া ধীবরপাড়ার মধ্যম-শ্রেণী ইংরেজী ইস্কুলে পড়িতে যাইতেন, তখন তাঁহাকে যে দেখিত, সেই বলিত—"কিবা ছেলেটী! চেহারা দেখে কে বল্‌বে জেলের ছেলে? ঠিক যেন ভদ্রলোকের ছেলে।"

চেহারার প্রশংসায় মন বড় খুশি হয়। ক্ষুদিরামও তখন খুশি হইতেন বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর কেমন যেন কি একটা হইয়া উঠিত। বয়সের পরিপাকের সঙ্গে সেই "কেমন যেন কি-একটা" ভাবেরও পরিপাক হইতে লাগিল। এখন, বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে—"ভদ্রলোকের ছেলে"—এই কথাগুলি কাণে গেলে কিম্বা মনে হইলে, ক্ষুদিরামের অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। "কেন, ভাল চেহারা কি ভদ্রলোকের ছেলের একচেটে করা আছে নাকি?"—ক্ষুদিরামের মুখে এমন কথা অনেকবার শুনা গিয়াছে।

ক্ষুদিরামের পিতা যখন ক্ষুদিরামকে রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছিল, তখন ক্ষুদিরাম সাত আট বৎসরের ছেলে। তাহার পর গ্রামে ইস্কুল হইল। ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র সকলেই ইস্কুলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল যে, গ্রামের সমস্ত ছেলেরা যদি লাট-সাহেব না হইতে পারে, জজ-ম্যাজিষ্টর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত পক্ষে, ইস্কুলে-পড়া ছেলে যে দরিদ্র হয় না, তাহার ত ভুলই নাই। কাজে কাজেই ক্ষুদিরামের মাতা পদ্ম জেলেনীও এই ইস্কুল-তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারিল না। সোনার বাজু, রূপার পৈঁচা, রূপার বালা, রূপার গোট—ক্রমে ক্রমে সমুদয় বেচিয়া এবং সংসারের নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যথারীতি নিত্য নিত্য মাছ বেচিয়া, পদ্ম-জেলেনী ক্ষুদিরামকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদিরামের মাতা কেবল একটী সোণার নথ রাখিয়া দিয়াছিল। ক্ষুদিরামের বিবাহ দিয়া যখন বউ আনিবে, তখন শাশুড়ীর গহনা দিয়া তাহার কল্যাণ করিবে, এই ভাবিয়াই সে নথ বেচিতে পারে নাই। কোথায় পুত্রবধূ, কবে পুত্রবধূ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, কথাই নাই; কিন্তু মাতার এমনই মন,—পুত্রবধূর কল্যাণে পুত্রের কল্যাণ হইবে জানিয়া, পদ্ম জগৎসংসার এক দিকে, আর সেই নথ এক দিকে করিয়া রাখিয়াছিল।

ক্ষুদিরামও ছেলে ভাল। গ্রামের পাঠ সাঙ্গ করিয়া ক্রমে ক্রমে বি, এ, পর্য্যন্ত পাশ দিল। কিন্তু তাহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ পরিচয় দেওয়া আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। বিদ্যা শিখিয়াও মাতা-পিতার উপর ক্ষুদিরামের সাতিশয় রাগ;—মা এখনও মাছ বেচে, এই জন্য মাতার উপর রাগ, এবং পিতা কেন ধনসম্পত্তি রাখিয়া যায় নাই, এই বলিয়া পিতার উদ্দেশে রাগ। ধন থাকিলে জাতি ঢাকে: ক্ষুদিরামের পিতার দোষেই ত তাহা ঘটিতে পারে নাই। এ দিকে ব্যবসায়ে জাতি জাগাইয়া রাখে; ক্ষুদিরামের মাতা আজিও সে পক্ষে শত্রুতা সাধন করিতেছে।

সাধে কি ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা? তবু সকল কারণ বলা হইল না। বলিব মনে করিলেও বলা যায় না। "যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা"—এ কথা লাখ কথার মধ্যে এক কথা। আসল কথা এই যে, ক্ষুদিরাম সংসারকে "দেখ্‌তে নারে।" তা, কারণ ভিন্ন যখন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এবং "দেখ্‌তে নারা" একটা "কার্য্য", তখন ইহার কারণ অবশ্যই আছে। মোটামুটি এই একটা কারণ সকলেই দেখিতে পায়, তেমনি এই একটা কারণের উল্লেখ আমিও করিলাম। খুঁটিয়ে সকল কারণগুলি বলিবার চেষ্টা করিলে লোকেও আমার উপর চটিয়া যাইবে। অতএব আর বাহুল্য না করাই ভাল। তবে যে এ কথা কয়টা বলা, সেও বাজে লোকের জন্য নহে। কার্য্য-কারণদর্শী বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতেরাই ইহার সারবত্তা বুঝিবেন।

যাউক। ক্ষুদিরাম চটা বলিয়াই যে অহরহ লোককে জ্বালাতন করিয়া থাকেন, তাহা নহে। বরং তাঁহার ব্যবহার অমায়িক। প্রায়ই একটু মুচকি-হাসি না হাসিয়া ক্ষুদিরাম কাহারও সঙ্গে কোন কথাই আরম্ভ করেন না; যখন যে কথা বলেন, তাহাতেই তাঁহার সংসারের উপকার করিবার একটা ইচ্ছার কি আভাস পাওয়া যায়; আর, সংসার যদিও তাঁহাকে তিক্ত বিরক্ত করিবার জন্য সংকল্প করিয়াই যেন আগাগোড়া চলিয়াছে, চলিতেছে এবং চলিবে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়; তথাপি ক্ষুদিরাম যে সংসারকে কৃতজ্ঞতাসাগরের গভীরতম-প্রদেশে না ডুবাইয়া ছাড়িবেন না, ক্ষুদিরামের এরূপ অভিপ্রায়ের পরিচয় বরাবর পাওয়া গিয়াছে।

মানুষের তিন পর্দ্দা। এক পর্দ্দা মুখে, এক পর্দ্দা মনে, শেষ আর এক পর্দ্দা হাড়ে। ক্ষুদিরামও মানুষ, সুতরাং ক্ষুদিরামেরও সেই তিন পর্দ্দা। প্রথম পর্দ্দা, মুখে ক্ষুদিরাম সংসারের পরম বন্ধু। দ্বিতীয় পর্দ্দা, মনে ক্ষুদিরাম সংসারের মুরুব্বি। আর তৃতীয় পর্দ্দা, হাড়ে ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা।

নহিলে, তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে অমন অজ্ঞাতকুলশীলা—কে জানে? কে চিনে? কোথায় বাড়ী? কোন জাতি?—অমন একটা নরাধম স্ত্রীলোক—অমন আধ-বয়সী বলিলেই হয়—অমন একটা বাজে-মার্কা মেয়ে মানুষ,—বাসাড়ের বাসার ঝী বৈ ত নয়?—সেই ঝীর সঙ্গেও ক্ষুদিরাম কখনও একটু কড়া সুরে কথা কহেন নাই কেন?

কিন্তু ঝীর কথা এখন থাকুক। যথাকালে সে কথা ত বলিতেই হইবে, এখন অবধি ফাঁস করা কেন? এখন বরং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পত্তন করি।

২। বড়ই বিরক্তিজনক।

"অ ঝী। ঝী! ও—ঝী!"

সাড়া শব্দ কিছুই নাই।

পুনর্ব্বার,—অবশ্য একটু অপেক্ষা করিয়া, কিন্তু পূর্ব্ব অপেক্ষা সুর একটু চড়াইয়া—"ও ঝী! দুওরটা খুলে দিয়ে যাও তো।"

তবুও সাড়া শব্দ নাই।

তখন সেই যুবা পুরুষ—যিনি ডাকাডাকি করিতেছেন,—তিনি যে যুবা পুরুষ, ইহা বুদ্ধিমতী পাঠিকা অবশ্যই মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছেন। নহিলে, কিসের বুদ্ধিমতী? বিশেষতঃ আমার এ গ্রন্থ উপন্যাস বলিলেই হয়, সুতরাং যুবক যুবতী লইয়াই কারখানা পোড়া-সংসারে দুঃখের অভাব নাই,—রোগে দেশ ছারখার, অন্নাভাবে সর্ব্বত্র হাহাকার, টেক্সর জ্বালায় লোকের টেকা ভার,—এমন অবস্থায় উপন্যাসেও যদি রূপ, যৌবন, সুখ, সম্পদ, আমোদ, প্রমোদ না থাকিবে, তবে প্রত্যেক নর-নারী আত্মহত্যা না করিবে কেন?

কমলিনীর কোমল প্রাণ। কমলিনী, অর্থাৎ এখনকার সুশিক্ষিতা বাঙ্গালিনী রমণী। যে কালে গৃহকার্য্য ছিল, শিল নুড়ি, হাতা বেড়ি,সরা হাঁড়ি, রান্না বান্না, কুটনো বাটনা, এক কথায় ঘরকন্নার সকল ভারই মেয়েদের উপর ছিল, যে কালে শাশুড়ী-ননদের মন যোগাইতে, কচি ছেলেদের দুধ খাওয়াইতে, ভাসুর-দেবরের সেবা করিতে, অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত, সে কালেও কুলকামিনীর কোমল প্রকৃতি। এত নিঠুর কঠোর কর্কশ ব্যবহারেও কামিনীর প্রাণ কঠিন করিতে পারে নাই। তবু তখন অভ্যাসের জ্বালায়, আগুনের আঁচ সহিত। এখন ত আর তাহাও নাই! এখন কেবলই কোমল,—কাল কাটে কিসে? তখন যদি এলাইত, মাথার বেণীই এলাইত। এখন, শরীর, মন, প্রাণ সবই এলাইয়া পড়িতেছে। এখন, শুধুই "সখি, ধর ধর।" এখন রোদ উঠিবে, ভোর হইবে শুনিলে ভয় হয়, কমলিনীর গায়ে কাঁটা দেয়। আর এখন ভৈরবীও ভাল লাগে না,—চাই কেবল বেহাগের সোহাগ। কাঠের বাক্স করিয়া আঙ্গুর রাখে, কিন্তু আঙ্গুর থাকে তুলার ভিতর। কঠোর সংসারেও কমলিনী আছেন, কিন্তু সে কেবল উপন্যাসের স্তর-বিন্যাসে। সেই জন্যই ত উপন্যাস; আগে একেবারেই ছিল না, এখন রাশি রাশি।

অতএব, নিশ্চয় বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি দ্বার খুলিবার চেষ্টায় চীৎকার করিতেছে

ছিল, সে যুবা পুরুষ বটে। তাই বলিতেছিলাম যে, সাড়া শব্দ না পাইয়া সেই যুবা পুরুষ রুদ্ধদ্বারের কড়া ধরিয়া খিটি খিটি খিটি খিটি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে কথা বলিতে না-বলিতে কৈফিয়ৎ দিতে হইল, কথারও ক্রমভঙ্গ হইয়া গেল। এইবার আবার বলি।

যুবা পুরুষ কড়া ধরিয়া খিটি খিটি শব্দ করিতেছেন, তথাপি কেহ উত্তর দিল না,—দ্বার ত খুলিলই না। "এমন বিপদেও মানুষে পড়ে?"

পথ দিয়া একটা ছোঁড়া যাইতেছিল। যুবার বিপদ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইয়াছিল কি না, ভগবান্ই জানেন। কিন্তু সেই ছোড়া একটুখানি চলিয়া গিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া ঠোঁটের কোণে ফিক্ করিয়া আধখানি হাসি হাসিয়া বলিল—

"বাড়ী ভুল হয় নি ত? না হয়, আর এক বাড়ী দেখলে হত না?"

ছোড়া চলিয়া গেল। যুবা পুরুষ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন কিনা, জানি না, কিন্তু তাহার দিকে দৃক্পাত করিলেন না, ইহা শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি। তবে, ইহাও স্বীকার করি যে, যুবা পুরুষের মুখের ভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইল; যুবা নিজের দক্ষিণ-ওষ্ঠপ্রান্তে স্পষ্ট দন্তাঘাত করিলেন, এবং সজোরে ঘন ঘন দ্বারাঘাত পূর্ব্বক, স্বর গম্ভীর করিয়া ডাকিলেন;—

"ঠাকুর! অ ঠাকুর! কে আছ! দুওর খুলে দিয়ে যাও।"

সংসার নিস্তব্ধ। এইরূপই সংসারের রীতি। প্রয়োজনের সময়ে প্রায়ই কিছু পাওয়া যায় না। অবিরাম কামনার উদয় হইতেছে, কিন্তু কাম্য বস্তু কোথায়, তাহার সন্ধানই হয় না। এই জন্যই ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ধৈর্য্যে সুখ না হউক, সন্তোষ হইতে পারে। কিন্তু এ সব দর্শনশাস্ত্রের কথা; প্রিয় পাঠিকা কমলিনীকে ত ইহা ভাল লাগিবে না।

শুধু কমলিনীকে ভাল লাগিবে না বলাও ভাল হইতেছে না। সেই যুবা পুরুষকেও ভাল লাগিতেছে না। তিনিও ক্রমে অধীর হইতেছেন, বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু বিরক্ত হইলে কি হইবে? ব্যস্ত হইলেই বা কি হইবে? সংসার যেমন নিস্তব্ধ, তেমনই নিস্তব্ধ।

সংসার নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্ন-আকাশে মরীচিমালী মার্ত্তণ্ডদেব মনের সুখে মজা করিতেছেন, তবু সংসার নিস্তব্ধ। রৌদ্রে জগৎ ভাসিতেছে, ত্রিলোক হাসিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। পথিক চলিতেছে, শিশু খেলিতেছে, গাড়ি ছুটিতেছে, কেরাণী খাটিতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। কোথাও প্রণয়ের ফুল ফুটিতেছে, কোথাও বিরহী মাথা কুটিতেছে, কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও ক্ষোভের তপ্তশ্বাস, কেহ কাজ লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাজের অভাবে ত্রস্ত; কেহ বা পাইতেছে, কাহারও বা যাইতেছে, বেচা কেনা, লেনা-দেনা সবই হইতেছে, তবু সংসার নিস্তব্ধ। এই ইহারই মধ্যে

সেই যুবা পুরুষ, সেই দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অধৈর্য্য হইতে হইতে, কত ফেরি-ওয়ালা কত রকম ডাক ডাকিয়া, কত দিক্ হইতে কত দিকে চলিয়া গেল। তবু সংসার নিস্তব্ধ। "পয়সে কা পচাস্ সুই"—"সলবে-জুতিয়ে"——"টব-কম-উও"——"মুংক-ডাল"—স্ফুট, অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট, সুবোধ, অবোধ, দুর্ব্বোধ নির্ব্বোধ, কত ডাকাডাকি কত হাঁকাহাঁকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি সংসার নিস্তব্ধ।

ইহাই সংসার। এইরূপই সংসারের নিয়ম। উপন্যাস-লেখকের শব্দবিন্যাস নহে, কবি-কল্পনার অলীক জল্পনা নহে, প্রকৃত সংসার ত এই। যখন একটি পয়সা, কিম্বা এক লক্ষ টাকার চিন্তায় তুমি উন্মত্ত, যখন তোমার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই; যখন না জানিয়া, না শুনিয়া, কিম্বা না মানিয়া তুমি ধর্ম্মবিষয় নিঃসঙ্কোচে পদদলিত করিয়া যাও, যখন তুমি মনে কর যে, এ সংসারে তোমার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই,—তখন বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞাসা করিলে, কিম্বা অন্তরাত্মায় উদিত হইলে "কি করি, সংসার চলে না" বলিয়া তুমি যে উত্তর দাও, সে কোন সংসারকে উদ্দেশ করিয়া? ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে, গুরুজনের অবজ্ঞা না করিলে, বিলাসে বাধা পড়িলে, কিম্বা অভীষ্টে বিঘ্ন ঘটিলে, সত্যই কি সংসার অচল হয়? সংসার কি তোমারই হাত পা লইয়া চলে? তুমি যখন কর্ম্মক্ষম হও নাই, তখন কি সংসার চলিত না? তুমি ছাড়িয়া গেলে সংসার যদি নিতান্তই ক্রন্দন করে, তাহা হইলে কি অনন্ত দেশ, অনন্ত কাল দাঁড়াইয়া কাঁদিবে? তাহা নহে। সংসার পূর্ব্বেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে, পরেও চলিবে। যাঁহার সংসার, তিনিই চালাইতেছেন, পরে তিনিই চালাইবেন। তুমি চলিয়া যাইবে, তখনও সংসার চলিবে। গ্রহ, নক্ষত্র, দেশ, বায়ু, নদী, পাহাড়, দিক্, দেশ, কাল,—কিছুই অচল থাকিবে না, সকলই চলিবে। সংসার তোমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে, তথাপি সংসার চলিবে। তবে কেন বল যে "সংসার চলিবে না?"

তবু তুমি মিথ্যা বল না। তোমার যেমন জ্ঞান, তাহাতে তোমাকে লইয়াই সংসার! তুমিই এ সংসারের কর্ত্তা। ঘটে ঘটে সংসারই ত এইরূপ।

তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের সেই যুবা পুরুষ দ্বারে দাঁড়াইয়া যখন অধৈর্য্য হইতেছিলেন, তখন সংসার নিস্তব্ধ। কেন না, সেই যুবার কথায় কর্ণপাত করে, এমন লোক তাঁহার সংসারে ছিল না। সংসার যখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না, তখন সংসার নিস্তব্ধ বলিব না ত কি বলিব?

ভরসা করি, এইবার পাঠিকা ঠাকুরাণী, পাঠক ঠাকুর, পাড়াপ্রতিবাসী, আত্মীয় স্বজন সমগ্র সংসার আমার উপরেও বিরক্ত হইয়াছেন। অতএব একা সেই যুবা পুরুষ, আর কেন বিরক্ত থাকিবেন! ক্ষণেক পরেই দ্বার খুলিল।

যুবাকে যে বহুক্ষণই সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে

লিখিতে কিম্বা বলিতে নাকি অনেক সময় লাগে, সেই জন্যই এত বিলম্ব বোধ হইয়াছে।

ফল কথা, দ্বার খুলিল। যুবা পুরুষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুনরপি দ্বার বন্ধ হইল।

৩। বাড়ী, বিছানা ও ব্যক্তি।

গড়কাটা-গলির মোড় থেকে তিনখানা বাড়ী পার, ডান-হাতি সেই একটা ছোট দোতালা-বাড়ী ছিল, তাহা মনে পড়ে কি? সদর দরজার উপর ছোট একটু বারান্দা, বড়জোর দীঘে চারি হাত, প্রস্থে হাত দুই, তাহার দেড় দিকে কাঠের গরাদের রেল দিয়া ঘেরা—গরাদেগুলা শৈশবে সাব কারিগর লাল রং মাখিয়াছিল, ক্রমে বয়স-দোষে কালবশে সন্ন্যাসীর চুলের মত কটা হইয়া গিয়াছে—দেড় দিকে সেই গরাদে, এক-দিকে লম্বা, তাহাও ছাঁদ-ছাড়া হইয়াছে, কেবল নীচের নর্দ্দমায় পড়িয়া যাইবার ভয়ে কোন রকমে খুঁটি বাঁধা ঝুঁকিতেছে—বাকি আধখানা এক বাখারি দিয়া ঘেরা,—সেই বারান্দা-ওয়ালা বাড়ীটা মনে পড়ে কি?

এখন সে বাড়ী নাই, নূতন বাড়ী হইয়াছে। কিন্তু আমার কাজ সেই পুরাতন বাটী লইয়া। মনে করে, অন্য ভিন্ন উপায় নাই, সেই বাড়ীই যেন আছে, এই মনে করিয়া বাড়ীখানার পরিচয় দেওয়া যাইবে।

সদর দরজার কপাট-যোড়াটির উপমা নাই, নহিলে উপমা দিয়াই বুঝাইতাম। সেই নাক-নাই অথচ গোঁফ মিলে নাই, সেই [illegible] অথচ-কাঠ-চেনা-যায়-না, সেই বুকে-হাড়-বসান কপাটের কি উপমা হয় বলিতে পারি না। ফল কথা, সদর দরজায় সেই কপাট। ঠিক তাহার উপরেই সেই বারান্দা। বারান্দার গায়ে দক্ষিণদ্বারী এক কুঠারী, অথবা সেই কুঠারীর গায়েই বারান্দা, তাহার সংলগ্ন উপরে নীচে পূর্ব্বদ্বারী দুটি দুটি চারিটি ঘর। উপর তলার তিনটি ঘরের সামনেই ভিতরদিকের বারান্দা—নিরবলম্ব শূন্যে দোদুল্যমান বারান্দা। সিঁড়ি সেই বারান্দা দিয়াই কাটিতে হয়, এবং সিঁড়ি দিয়া উঠিতে প্রথমেই দক্ষিণ বারান্দায় যাওয়া যায়। উপরতলার দক্ষিণ-দ্বারী ঘরটি উহারই মধ্যে প্রশস্ত; নিম্নে সদর-দরজার দালানের পথে কতকটা জায়গা গিয়াছে, বাকি জায়গায় একটু ছোট ঘর, রাস্তার দিকে তাহার একটা ছোট জানালা আছে, কিন্তু কাঠ কয়লা রাখা ভিন্ন অন্য কাজ তাহাতে হইবার উপায় নাই।

বাটীর জন্ম-পত্রিকা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, সে আমলের লোকও কেহ জীবিত নাই, সুতরাং সে বাড়ীর বয়স বলা অসম্ভব। ঈষৎ ঢেউখেলান গোছের ছাদ এবং স্থানে স্থানে বালি চুণ খসিয়া পড়াতে ভিতর দিকের সেই খোলস-ছাড়া-

ভাব দেখিয়া কেহ যদি বয়সের অনুমান করিতে পারেন, করুন, আমি তাহাতে অস্বীকারও করিব না, স্বীকারও করিব না।

এই ত বাড়ী। এখন, বাড়ীর আসবাব সম্বন্ধে কিছু বলিলেই এ পালা সাঙ্গ হয়। উপরের পূর্ব্বদ্বারী একঘরে দুখানি, আর একঘরে একখানি কেওড়া কাঠের তক্তপোষ। তিনখানি তক্তপোষই যেন এক মায়ের পেটে জন্মিয়াছিল,—এক চেহারা এক ভাব, এক সুর। তুমি মনে করিতে পার যে, তক্তপোষের আবার সুর কি? কিন্তু তক্তপোষেরও সুর আছে,—অন্ততঃ এ কয়খানির আছে। কেহ চড়িলে—ক্যাঁচ; শোয়ামানুষ পাশ ফিরিলে—ক্যাঁচ; নামিতে গেলেও—ক্যাঁচ। অথচ, বোধ হয় যে, ইহাদের জন্মাবধি "ক্যাঁচ" করাই অভ্যাস। কেননা, এই তিনখানি তক্তপোষ কত হাতই ফিরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, অথচ কখন সওয়ারকেও ফেলিয়া দেয় নাই, আপনিও ভূমিসাৎ হয় নাই। মানুষের মধ্যে যেমন যাত্রার দলের ছোকরা, যানের মধ্যে তেমন তৃতীয় শ্রেণীর ছক্কড়, খট্টাঙ্গের মধ্যে তেমনি এই কেওড়া-কাঠের তক্তপোষ;—দেখিতে যেন গঙ্গার আড়লি, কিন্তু কাজে বিশ্বকর্ম্মা।

তিনখানি তক্তপোষই প্রায় এক জাতীয় আচ্ছাদনে সজ্জিত;—এক এক উলঙ্গ তোষক, একটী একটী উলঙ্গ বালিশ, আর, সেই তোষক আর বালিশের লজ্জানিবারণের জন্য আপাদমস্তক একখানি একখানি বিছানার চাদর। তোষক-বালিশের লজ্জা-নিবারণ,—তামাসা নহে।—চাদর ঢাকা না থাকিলে, সেই আমসত্ত্বের মতন চেহারা দেখাইতে তোষক-বালিশের যদি লজ্জা বোধ নাই হয়, যাহার তোষক বালিশ তিনি যে, অবশ্যই লজ্জিত হন, তাহার সন্দেহ নাই। শুধু লজ্জা-রক্ষাও নহে, চাদরের কল্যাণে দেহ-রক্ষা বিষয়েও প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। তোষকের অঙ্গ যেখানে কুঞ্চিত বালিশের যেখানে কোণ, তক্তপোষের যেখানে কিঞ্চিৎ ফাঁক, সেই স্থানেই সপরিবারে সবলবাহনে ছারপোকার শিবির সংস্থাপিত। ক্লান্ত মানব সেই অনন্ত-শয্যার আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া একটু অসাবধান হইলেই একে একে, ঝাঁকে ঝাঁকে নরশোণিতলোলুপ ছারপোকাগণ তাহাকে আক্রমণ করে। চাদরের ভয়ে তাহারা আক্রমণ করে না, এমন নয়, কিন্তু গুপ্ত আক্রমণে বাধা পায়; মায়াবী নিশাচরের ন্যায় মেঘের অন্তরালে থাকিয়া শত্রুকে উত্ত্যক্ত করার যে সুবিধা, তাহা আর পায় না; চাদর থাকাতে প্রায়ই সম্মুখ-সমর,—সুতরাং ছারপোকা-পক্ষের বহুতর "বীর চূড়ামণি" রণক্ষেত্রে দেহবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য। সেই চাদর-ক্ষেত্রকে রণক্ষেত্র বলাও অত্যুক্তি নহে, সহস্র তুমুল সংগ্রামের সহস্র চিহ্ন তাহার রক্তাক্ত কলেবরে দেদীপ্যমান।

নর-মৎকুণের ভীষণ রণ-বর্ণনে আমার প্রায় সাধ হইতেছে। কিন্তু তাহা ত পারিব না। কেহই যাহা করিতে সাহস পায় নাই, আমি সামান্য ব্যক্তি, কেমন করিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব? নিরাপদ কন্দর হইতে ছারপোকার সেই উদ্যমপূর্ণ নিষ্ক্রমণ,

সেই নিঃশব্দ পদসঞ্চার, মানব-গ্রীবার উপর সেই অভ্রভেদী অব্যর্থ সন্ধান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন হইতে না-হইতে বিদ্যুৎ গতিতে সেই অন্তর্ধান,—এ সব বর্ণন করা কি আমার সাধ্য? বাস্তবিক, ছারপোকার যোড়া নাই, ছারপোকার তুলনা নাই, ছারপোকার উপমা পাওয়া যায় না। বাঘ ভয়ানক জন্তু বটে, কিন্তু দূরে গভীর বনে বাস করে; কদাচ লোকালয়ে উপস্থিত হইলে, সন্ত্রস্ত জনগণ সাধারণ শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম পরস্পর সাহায্য করে, সকলের কাজ সকলে মিলিয়া সারিয়া লয়। কিন্তু ছারপোকা? —সর্ব্বনাশ! স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিছানাতেই ছারপোকার বাস—শত্রুকে শিয়রে করিয়া শয়ন; যখন তুমি নিশ্চিন্ত, তখনই তাহার দৌরাত্ম্য; সভা-সমিতি, কিম্বা সিপাই-সান্ত্রী হইতে সিকি পয়সার সাহায্যের প্রত্যাশা নাই, উপায় নাই। এ কি কম কথা? কিন্তু কম হউক, আর বেশী হউক, আমি নাচার। স্পষ্ট কবুল-জবাব দিতেছি, ছারপোকার সংগ্রাম, ছারপোকার কার্য্যকলাপ বর্ণন করিতে এখনও আমি সক্ষম হই নাই। বড় বড় ছারপোকা, মানুষের চামড়া গায়ে দিয়া সমাজ-শয্যায় উপদ্রব করিতেছে, আমিও তাহাদের উপর অনেক দিন ধরিয়া হাত মক্স করিতেছি, কিন্তু এখনও ছারপোকা ধরিতে সাহস হয় নাই। যাহাদের সহিত যুদ্ধে হারিলে ঘাড়ের রক্ত যায়, যাহাদিগকে যুদ্ধে হারাইলে লাভের মধ্যে হাতে গন্ধ হয়, সে ছারপোকা ত সহজ জন্তু নহে। কাজেই কবুল করিতে হয় যে, আমি নাচার। তিন খানা তক্তপোষের কথা বলিতেছিলাম। ছারপোকার জ্বালায় কমলিনী সারা হইলেন, আমি সারা হইলাম, অথচ সেই তক্তপোষের কথা সারা হইল না। ছার-কথার ঐ ত দোষ।

তিন তক্তপোষে তিন বিছানা, তিনটিই অনন্তশয্যা। সে শয্যা কেহ কখন কাহাকেও তুলিতে দেখে নাই। চাদর এ-পিট ও-পিঠ, ফের আবার সেই পিঠ ফিরিয়াছে, কখন বা ধোবার বাড়ী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু মূল বিছানা অচল, অটল। সেই তক্তপোষের চামড়ার মত তক্তপোষের গায়ে লাগিয়াই আছে।

আরও দুইটি শয্যার কথা বলিতে হইবে। যে ঘরে একখানি তক্তপোষ, সেই ঘরে শুধু মেঝেতে শপের উপর এক বিছানা রাত্রিকালে পড়ে, আবার ভোর হইতে না হইতে গা তুলিয়া পাট হইয়া দাণ্ডার উপরে দিন কাটায়। আর সেই শপখানি ভাল মানুষের মত জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া নীরবে নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, অথচ আবশ্যক হইলে ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়িয়া প্রশস্ত বক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক বসিবার স্থান করিয়া দেয়। বাস্তবিক শপের স্বভাব এবং সতের স্বভাব একই প্রকার। উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া, নিজের জন্ম অত্যল্পমাত্র স্থান অধিকার করিয়া, সংসারে অবস্থিতি করেন; কিন্তু যখন পরের কাজ করিতে হয়, যখন পরকে আশ্রয়

দিতে হয়, তখন অকাতরে অদ্ভুত প্রশস্ততা দেখাইয়া স্বীয় পরিসর কেমন সুন্দর ভাবে বাড়াইয়া, কতই সহিষ্ণুতা সহকারে লোকহিতার্থে বক্ষঃ পাতিয়া দেন। যেমন সতের কোলে, তেমনই শপের কোলে,—কত লোকই শীতল হয়। পরোপকার যাঁহার ধর্ম্ম, তিনি এইরূপে নীরবেই পরের উপকার করেন; আর পরোপকার যাহার ভাণ, পরোপকার যাহার ভণ্ডামির ভাণ্ড, সে কেবল মুখের বাচালতা করিয়া সংসারকে বঞ্চিত করে, আপনিও বঞ্চিত হয়।

আর এক বিছানা সেই বারান্দাওয়ালা দক্ষিণদ্বারী ঘরে। পৌনে দু-হাত পরিসর পালঙ্কে নারিকেল-ছোবড়ার গদির উপর রচিত,—সে বিছানার বর্ণন করা আমার মতে রুচিবিরুদ্ধ। সে বিছানার পরিপাটী কিছু বেশী, কেননা সে বিছানার প্রতি ঝীর কিছু শুভদৃষ্টি, কেননা—এই রকম কেননা, কেন-না করিয়া ক্রমে কত জনে কত কথাই তুলিতে পারে; হয়ত কেঁচো খুঁড়িতে কাঁকড়া বাহির হইতে পারে। তাই বলি, সে বিছানার বর্ণন না করাই ভাল। বিছানা ভাল, সে ভালই। যাহাকে শুইতে হয়, কিম্বা যে শুইতে পায়, তাহারই ভাল; তাহাতে তোমারই বা কি, আর আমরাই বা কি?

এই খাটের পাশেই একটী ছোট দু-দেরাজি টেবিল; টেবিলের সম্মুখে একখানা বসিবার আর একখানা হাত-পা ছড়াইবার,—এই দুইখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে বই-টই থাকে, সেই সঙ্গে সাড়ে দশ আনা দামের এক আর্শী, আট-আনার এক বুরুশ, আর সাতপয়সার এক চিরুণীও থাকে। টেবিলের দেরাজের ভিতর কি আছে, না আছে জানি না, তবে ঝী একদিন বৌবাজারে কাঁকড়া কিনিতে গিয়া দত্তদের বাড়ীর ঝীকে একযোড়া আশ্চর্য্য ও বহুমূল্য তাসের কথা বলিতেছিল; ইহা আমাদের প্রায় স্বকর্ণেই শোনা। চক্ষে কখনও সে তাস দেখি নাই, কেহ সে তাসে কখনও খেলাও করে নাই, সে তাসের কি যে আশ্চর্য্য, আর কেনই যে বেশি দাম, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? যাহা জানি তাহা বলিলাম, কমলিনীর যদি বেশি কিছু জানা থাকে, বেশি বুঝুন; কিন্তু এই তাসের ভাবনায় মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আমি দেখি না।

সুতরাং এই বাড়ীতে সাত জন লোকের বাস। এক খাট, তিন তক্তপোষ, মেজেতে এক বিছানা—এই পঞ্চ-শয্যার সমাচার দিয়াছি, অতএব ইহারই দরুণ পাঁচ জনকে পাওয়া গেল, ইহার উপর ঝী আছেন, আর বামুন ঠাকুরও আছে। "সুতরাং" বলাতে দোষ হইল কি?

আমার চৌদ্দপুরুষের জলপিণ্ড-লোপ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, কমলিনী বিদ্যাবতী হইয়াছেন; সুতরাং বাড়ীর, বিছানার এবং ব্যক্তির বর্ণনায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে। সোজাসুজি কান্ত-কান্তার কোমল কথোপকথনে কর্ণের

সুখ-সম্পাদন করিবেন, ইহাই কমলিনীর কামনা; কিন্তু আমি করি কি? যুবা পুরুষ যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সে বাড়ীর কথা না বলিলে আমার যে চলে না।

৪।—"গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

যুবা পুরুষ বরাবর উপরে গিয়া সেই দক্ষিণদ্বারী ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিবামাত্র ঝী একটা পান হাতে করিয়া, খিলি করিতে করিতে বারান্দায় আসিল; আসিয়া, পানের খিলি গালে পুরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সেই যুবা পুরুষ ক্ষুদিরাম নহেন। তিনি ক্ষুদিরামের পরমবন্ধু শ্রীমান বাবু ভুসী-ভোজন রায়, ওরফে ভুসী বাবু। আমার বিস্তর সন্ধান, তাই আমি ভুসী বাবুর উপাধি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি: কিন্তু লোকে তাহাকে ভুসী বাবু বলিয়াই জানে। তিনি রায়, কি মজুমদার, কি বন্দোপাধ্যায়, কি ঘোষ, কি জোলা, কি মুচী—লোকে তাহা জানে না, জানিতে ইচ্ছাও করে না। যে সভ্যতা বিলাত হইতে খাশ আমদানিতে আসিয়াছে, সে সভ্যতার আইন অনুসারে জাতিকুলের তত্ত্ব লওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ। সেই জন্ত লোকসমাজে ভুসী বাবু বলিলেই যথেষ্ট পরিচয় হয়।

শুধু পরিচয়ই বা কেন? নামের কিনারে বাবু যুড়িয়া দিলে সকল কাজও চলিয়া যায়। জলযোগে ত কথাই নাই, পংক্তি-ভোজনেও কেহ প্রশ্ন করে না। আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, সবই যদি চলে, তাহা হইলে উপাধির উপসর্গ মিছামিছি কেন লোকে বহিয়া মরিবে? যদি বল বিবাহ,—তাহাও বোধ হয় বড় একটা বাধে না! কলিকাতার কীর্ত্তি-কারখানা কাহারই বা জানা নাই? অতএব বাবুতেই বস্।

বাবু সেকালেও ছিল, কিন্তু এমন ছিল না, এত বেশীও ছিল না। তখন একটা সহরগ্রাম খুঁজিয়া এক ঘরে বেশী বাবু মেলা ভার হইত: বাবুগিরির খরচও ছিল! অতিথি-অভ্যাগতের আশ্রয়, ব্রাহ্মণ সজ্জনের সম্মানকর্ত্তা, দীন-দুঃখীর অন্নদাতা, দাস-দাসীর প্রতিপালক, লোকসমাজের পরিচালক—এ সব না হইলে আর বাবু হইত না। কিন্তু এখনকার দিনে বাবু হইতেও যেমন সুবিধা, হইলেও তেমনি সুবিধা; যাহার পাটকরা চুল, পাটভাঙ্গা জামা, আর পায়ে বুটজুতা, সে ত এখন পহিলা নম্বরের বাবু। জাতি লুকাইবার প্রয়োজন থাকিলে, পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ হইলে—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ—বাবু হওয়া। বাপ পিতামহ চাই না, ভিটা ঘর চাই না, বাস্তু-ভিটা চাই না, বার তিথি চাই না, আচার বিচার চাই না—শুধুই বাবু। তাই এখন

আদালতের আমলা বাবু, কারখানার কেরাণী বাবু, মালগুদামের মার্কা বাবু, পাড়াগাঁয়ে পোষ্ট বাবু। তবে আমার ভুসী বাবুরই দোষটা কি?

ভুসীভোজন অবশ্যই একজন ভ্রাতৃভাবাক্রান্ত ভদ্রলোক। অর্থাৎ জগতের ছোট বড় উচ্চ নীচ লঘু গুরু ইত্যাদি বৈষম্যসূচক সম্বন্ধের সারবত্তা তিনি স্বীকার করেন না! একবার এক অসভ্য ব্যক্তি তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় ভুসী বাবু উত্তর দিয়াছিলেন—"পরমেশ্বরই সকলের একমাত্র পিতা, আবার পিতা কে?" এই কথা প্রচার হইবার পরে দিনকতক ভুসী বাবুর খুব খোশনাম রটিয়াছিল। এমন কি কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহাকে "ভ্রাতা ভুসীভোজন" নামে অভিহিত করিয়া ভক্তি ও ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল।

ভুসীবাবুর বাল্যলীলার বিশেষ বৃত্তান্ত বহু অনুসন্ধানেও বাহির করিতে পারি নাই। এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, যৌবনের প্রথম জোয়ারে তিনি কলিকাতার এক কায়স্থ বাড়ীতে বাস, গ্রাস এবং আচ্ছাদনের বিনিময়ে গুপ্ত শিক্ষকতা করিতেন এবং বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন। সেই অবস্থায় সেই বাড়ীর একটী বিধবা "ভগিনী"র বৈধব্যের প্রতিবিধান করিয়া তিনি কিছু বিব্রত হন। পরের দুঃখ মোচন করিতে গেলেই নিজের দুঃখ অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী। বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঐ সূত্রে ভুসীবাবুর মতভেদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া নবপ্রণীতা "ভগিনী"র সহিত এক স্বাধীন বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিলেন। শুধু সেই বাড়ী ত্যাগ করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে নশ্বর সংসারের সমস্ত আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, নিজের বিদ্যাশিক্ষাও বিসর্জ্জন করিলেন। উপাধির প্রতি উপেক্ষা করিয়া নিষ্কাম প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। ভ্রাতৃজগতের উদ্ধারভার ভুসীবাবু নিজে গ্রহণ করিলেন; কাজে কাজেই তাঁহার "ভগিনী"কে ভগিনী-রাজ্যের ভার লইতে হইল। বলিয়া রাখি, ভুসী বাবুর এই স্বোপার্জ্জিত "ভগিনী"র নাম শ্রীমতী নিস্তার।

গুরুতর কার্য্যে যে কিছু গোলযোগ, তাহা গোড়াতেই হয়; প্রথম ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, আর কে কারে পায়? শীতের দিনে গা খুলিয়া তেল মাখিতে এবং ঘাটে গিয়া জলে নামিতেই যত ভয় এবং ভাবনা; তাহার পর একবার কোন প্রকারে গায়ে জল দিতে পারিলেই, তখন গা গরম হইয়া উঠে, আত্মা কত আরাম পায়। ভুসী বাবুদেরও সেই অবস্থা। যতক্ষণ দুটিতে চকা-চকীর মত কূলের কিনারায় বসিয়াছিলেন, ততক্ষণ ক্ষণে লজ্জা, ক্ষণে ভয়, তাঁহাদিগকে কতই কাতর করিয়া রাখিতেছিল। যখন কূলের মায়া কাটিল, লজ্জার ছায়া হটিল, ভয়ের ভ্রূকুটী ভাঙ্গিল, তখন কাল-জলেই তাঁহারা কোল পাইলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

প্রথম প্রথম দুদিন দশদিন, কিছু ক্লেশ হইল বৈ কি? তাহার পর, ফুল যখন ফুটিল, সৌরভ তখন ছুটিল, ভ্রমরও জুটিল। সময়ে সকলই সয়, সময়ে আবার সকলই

হয়। যে আকাশে অমা, সেই আকাশেই পূর্ণ-চন্দ্রমা। শিশির কাটিয়া গেলে, বসন্ত আপনি আসে—কেহ তাহাকে ডাকিতে যায় না। তখন, মলয়ানিল আপনি বয়, আপনি মুকুল দেখা দেয়, আপনি অলি আকুল হয়। তখন আপনি কোকিল কুহু করে, আপনি পরাণ হুহু করে, আপনি আঁখিতে লহু ঝরে।

হাঁ, লহুই ঝরে! কিন্তু ঝরিবে কি তোমার? না, ঝরিবে আমার? যাহার ঝরে, তাহারই ঝরে। মনে যেন থাকে যে, আমি এখন কবিত্ব করিতেছিলাম। তোমার আমার মতন শুক্‌নো আমড়া গাছে কেবল কাঠ-ঠোক্‌রাতেই বাসা করে, তাহা আমি জানি,—এতে কোকিলও বসে না, কবিতাও আসে না, তাহাও জানি। কিন্তু তোমাতে আমাতেই কি জগৎ? শীত বর্ষাতেই কি বৎসর?—না, কমলিনি! বড় সময়েই বড় মুখখাবড়া দিলে? ঠা-কুনের মিঠা হাতটুকু কেবল আসি-আসি করিতেছিল;—এমন সময়ে এই কাজ? ছিঃ! প্রাণটা বড় চটিয়া গেল।

গেল গেলই। সাদা কথায় সাধ মিটাইতে কেহ ত বাধা দিতে পারিবে না। নাক শিট্‌কাও কেন? তোমার রুচিতে না কি শুচি-বাই ধরিয়াছে, তাই তুমি ভাষার চাট্‌নিতে চটিয়া যাও। এ দিকে সর্ব্বগ্রাসে যে সর্ব্বনাশ,—সেটা কেন একবার ভাব না? সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, এই যে উদয়াস্ত আর অস্তোদয় "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" বলিয়া তোমার বৈরাগীর ঝুলি খুলিয়াই রাখিয়াছ—ইহা কি তোমার মনে হয় না? দোষ নাই তোমার হাড়কালিকরা কষে, আর যত দোষ কি আমার এই রসনার রসে?

তাই হউক। কিন্তু চট কেন? সত্য সত্যই কিছু শ্রীমান্‌ ভুসীভোজন এবং শ্রীমতী নিস্তারের বাড়ী ফুলও ফুটে নাই, সৌরভও ছুটে নাই, অলিও জুটে নাই। সে সব কিছুই হয় নাই। তবে হইতে এই হইল যে, তাঁহারা যখন ঘরকন্না পাতিলেন, তখন কিছুদিন পরে কাজে কাজেই পাঁচ-পরের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল, পাড়ায় পাড়ায় তাঁহাদের সৎসাহসের সুযশ ঘোষিল, সহস্র জনে জানিল, দশ জনে মানিল, দুজন বা চিনিল। ক্রমে শ্রীমান্‌ এবং শ্রীমতী উভয়েরই পুরুষপল্লীতে প্রবল পসার, মহিলা-মহলে মস্ত মান দাঁড়াইয়া গেল।

যে বাড়ীতে ইঁহারা থাকেন, তাহার নাম হইল "প্রেমনিকেতন"—প্রচার-কার্য্যের প্রকাণ্ড কেন্দ্র। এমন অবস্থায় শ্রীমতীর ভার শ্রীমান্‌কে, শ্রীমানের ভার শ্রীমতীকে বহিতে হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। উভয়েই স্বয়ং সিদ্ধ,—কেহই কাহারও অধীন নহে। যাহার যেদিন যেমন মন, তাহার সে দিন তেমনই যায়। কেননা, উভয়েই আপ-খোরাকী, আপ্‌-পোষাকী, আপনভাবে আপনি ভোর। অন্যের আনিতে কিম্বা অপরকে দিতে, উভয়ের উপায় আপন আপন।

এক গাছে দুটী পাখী; তাহার একটী পাখী গাছের ফল চাখে; অন্য পাখীটী

শুধু চেয়ে দেখে,—উপনিষদে তাই আছে। ইহারা উপনিষদের উপর উঠিয়াছেন; —এক বাড়ীতে থাকেন; দু-জনেই চাখেন, দু-জনেই দেখেন, কাজে কাজেই ইঁহাদের বাড়ী "প্রেমনিকেতন।" বাড়ীর বাহির হইলেই শ্রীমতী লোকের অন্দরে যান, শ্রীমান্ সদরেই লোককে পান।

এহেন মাণিকযোড়ের, এমন যুগল-মুক্তার যোড় ভাঙ্গিতে ব্যথা বোধ হয়। তবু পৃথক্ করিয়াই ত দেখিতে হইবে। তাই এখানে উপস্থিত, সেই দুটীর মধ্যে একটী—ক্ষুদিরামের পরমবন্ধু শ্রীমান্ ভুসী বাবু।

মনে আছে ত? ভুসী বাবু যখন উপরতলার দক্ষিণদ্বারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়েই ঝী বাহির হইয়া পান গালে করিয়া নীচে গেল।

আমি ইতিহাস বলিতেছি, যাহা সত্য তাহা বলিব, যাহা প্রিয় তাহা বলিব, আর যাহা অপ্রিয় তাহাও বলিব। কাজের কথা ত কোনমতেই লুকাইতে পারিব না। তবেই বলিতে হইল যে, সেই দক্ষিণদ্বারী ঘর, সেই খাট, সেই গদি, সেই বিছানা, সেই টেবিল,—সবই ক্ষুদিরামের বটে। ক্ষুদিরাম সেইখানেই থাকেন, তখনও সেইখানেই ছিলেন।

ক্ষুদিরাম ঘরেই আছেন, তা থাকুন। ভুসীবাবুও সেই ঘরেই প্রবেশ করিয়াছেন, তা করুন। দুই জনে—দুই স্বজনে, সেই নির্জ্জনে প্রেমসম্ভাষণ, কথোপকথন, যাহা হইবে হউক। ঝী যে পান গালে করিয়া নামিয়া গেল, সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করা ভাল।

ঝী আধবয়সী বটে। তাহাতে আমার দোষ কি? বয়স ত কাহারও হাত-ধরা নয়! কিন্তু আধবয়সী বলিয়াই যে, মনে মনে এত আতঙ্ক করিতে হইবে, তাহারই বা মানে কি? চিরদিন কিছু ঝী এই আধবয়সী নহে। তোমার আমার সকলেরই যেমন বাল্য, কৈশোর, যৌবন হইয়া গিয়াছে, কিম্বা হইবে, ঝীরও ত তাহাই হইয়াছে। তবে কিসের আতঙ্ক? বরং মনকে প্রবোধ দাও যে, ঝীর অর্দ্ধেক বয়স গিয়াছে মাত্র, এখনও অর্দ্ধেক বাকী আছে। ভাবনা কিছু নাই। ভরসা ভরপুর।

অর্দ্ধেক বয়স গিয়াছে,—কিন্তু কত? কাহারও মতে, কুড়ী গেলেই বুড়ী; সে কি কাজের কথা? হাজারে একজন এক-শ বছরও বাঁচে,—তাহাও ত ধর্ত্তব্য নয়। বরং মানি; বাইবলে যাহা বলে,—মানুষের বয়স সাড়ে-তিনকুড়ি। তাহা হইলে এই আধাবয়সেও ঝী হদ্দ পঁয়ত্রিশ। এমন বেশি বয়সই বা কি? দাদাঠাকুর সাদার উপর কালির আঁচড় দিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—বয়সে রসের পরিপাক হয়। ইহার পর, আর ওজর করা সাজে কি?

হয় হউক, ঝীর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তত দেখায় না। ঘুণধরা-চোকে কিসে কি দাঁড়ায় তাহা জানি না, কিন্তু ক্ষুদিরামের মত টাট্‌কা, সতেজ, সরল দৃষ্টিতে এই

পঁয়ত্রিশ, একদিন পঁচিশ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সেও অধিক দিনের কথা নয়। বড় জোর কুড়ি বাইশ দিন হইল, ভুসীবাবুর সঙ্গে ক্ষুদিরামের ঘোর তর্ক উপস্থিত হয়,—স্ত্রীলোকের বয়ঃক্রম লইয়া তর্ক। ঝীও স্ত্রীলোক, সুতরাং প্রসঙ্গাধীন, ঝীর বয়সের কথাও আপনা-আপনি উঠিল। ভুসী বাবু দু-পাটি দাঁত সুস্পষ্ট বিকাশ করিয়া, দাড়ি-মাখা মুখের ভিতর হইতে নিঃশব্দ সরল হাসি হাসিয়া, বলিলেন—

"ত্রিশের কম কখনই নয়।"

ক্ষুদিরামের চোখের কোণ কুঁচকে গেল। দক্ষিণ-হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, ক্ষুদিরাম বলিলেন—

"পঁচিশের নীচে, তবু উপরে নয়।"

তখন অগত্যা ভুসীবাবু চসমা খুলিলেন। বাম-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্যে চসমার বাম দিকের সেই স্বচ্ছ-আয়স-শলাকার সন্ধিস্থান সন্তর্পণে ধারণপূর্ব্বক স্বীয় নাসাদণ্ড হইতে চসমাকে উত্তোলন করিয়া, দক্ষিণ-হস্তের সাহায্যে অঙ্গ-রক্ষার নিভৃত-কক্ষ হইতে রুমাল আবিষ্কার করত, সেই রুমালের দ্বারা চসমার কাচ-ঘর্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। কাচ-ঘর্ষণ-প্রকরণ সমাপনানন্তর চসমাকে পুনশ্চ নাসাদণ্ডে স্থাপন করিলেন, তদনন্তর, জগতের সমস্ত জ্যোতিঃ এক চুমুকে পান করিবার মত নেত্র-দ্বয় বিস্ফারণপুরঃসর নেত্রদ্বয়ের আয়তন যথাসাধ্য বর্দ্ধিত করিয়া গ্রীবা উত্তোলন করিয়া, চসমার কাচভেদী দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে সংন্যস্ত করিয়া, স্বীয় উদার হৃদয়োপরি বাহুদ্বয়ের বন্ধন করিয়া, শ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অচল অটলভাবে স্বীয় নাসাদণ্ড ক্ষুদিরামের নাসাদণ্ডের উপর লম্ব-সমদ্বিখণ্ড-রূপে * ক্ষুদিরামের সম্মুখীন করিয়া কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন। পুনরপি সেই নাসাদণ্ডের--

রও। সোজা কথায়,—যেমন কথায় বলিলে মানুষে বুঝিতে পারে, তেমন কথায় বলিতে কোন দোষ আছে কি? না কি, এমনই জটিলভাব, এতই গূঢ় গভীর অভিপ্রায় যে, সোজা করিয়া বলিবার যো নাই?

দোষও নাই, যোও আছে। কিন্তু সবই যদি সোজা কথায় বলিতে হইবে, তবে তোমারই বা গ্রন্থ লেখায় কাজ কি?

বড়-লোকেই বলিয়াছে যে, মনের ভাব লুকাইবার নিমিত্তই মানুষে কথা কয়। তত-বড়লোক হই না হই, আমিও বড়-লোক বটে। সেই জন্য, মনের ভাব একেবারে

---

* ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বের একাদশ অধ্যায় এবং প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই স্থলটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না। করিলে আমি ফলাফলের জন্য দায়ী হইব না।

গোপন করা সম্বন্ধে যাহাই হউক, ভাবের উপর ভাষার আবরণ দিতি আমিও একটু ভালবাসি—

"রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ?"—

কবির এ-কথা কি কম কথা ? রসবোধ যাহার আছে, রসের আস্বাদন যে জানে, সে কখনও ইক্ষুর কঠিন ত্বকে ভয় পায় না, বরং তাহাতেই তাহার আমোদ হয়। ইক্ষুর পীড়নেই ত দন্তের সার্থকতা! পীড়িয়া রস-নিকাশের সামর্থ্য যাহার নাই, সে কি রসগ্রাহী ? তাই, আমার মন আমাকে বলে—

দিও না রস-দণ্ড অ-দন্ত জনে।

ইক্ষু চিবাইতে দাঁত চাই, আমার বই পড়িতেও বুদ্ধি চাই! যাহার নাই, তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করি। মিছরীর পানা এবং "উপাচার্য্যের উপদেশ" দিদীমা তাঁহার জন্ত তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি স্থানে গমন করুন। বৃদ্ধের জন্ত বোধোদয়, বালকের জন্ত বিদ্যাসুন্দর রচিত হয় নাই। যত আপদ, অনধিকার-চর্চ্চায়; অধিকার বুঝিয়া কাজ করিলেই কোন গোল থাকে না। তোমার দুর্ম্মতি, তাই তুমি এমন কথাও মান না। ভাবিয়া দেখ, দেশ-কাল-পাত্রভেদ সকল বিষয়েই আছে, থাকাও উচিত।

আরও বলি সোজা কথায় সংসার চলে না; এক কথাতেই কাজ ফুরাইয়া যায়। সবই যদি সোজাসুজি বলি, তাহা হইলে কতক্ষণ বলা চলে ? ক্ষুদিরামের এই ক্ষুদ্র কাহিনীর কলেবর কত কাহিল হইয়া পড়ে, একবার ভাব দেখি ? কাজে-কাজেই, ভাষার ছটায়, ভাবের ঘটা করিতে হয়। কথার আবরণ দিয়া কৌতূহলের উদ্দীপন করিতে হয়। অনেক অপ্সরা আছে, যাহার অলঙ্কার কাড়িয়া লইলে কাল্‌পেঁচা হইয়া দাঁড়ায়! তবে আমার বেলা এমন আপত্তি কেন ?

ভাবিয়াছিলাম,—আমি যেখানে বক্তা, কমলিনী যেখানে শ্রোতা, সেখানে কথান্তর কিছু হইবে না। কিন্তু কপাল যাবে কোথা ? তা, কাজ নাই আর কচকচিতে, কথাকটাই বলি।

ভুসীভোজনে আর ক্ষুদিরামে ঝীর বয়স লইয়া কতক্ষণ কোন্দল করিলেন, কেন করিলেন, কোথায় করিলেন, কেমন করিয়া কি মীমাংসাই বা করিলেন, এই সামান্ত কথা লইয়া কান্দাকাটা পর্য্যন্ত করিলেন কি না,—সে সব কথা বলিয়াই কাজ নাই।

ফলতঃ ঝী আধবয়সী বটে, তবে দেখায় কম। তা আশ্চর্য্যই বা কি ?

"যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ"
রবে না চেহারা খান,—
তা কি কভু হয় ?

অবশ্যই রয়। ঝী একটু যত্ন করিত, একটু মাজা-ঘসা করিত, কাজেই ঝীর চেহারাও চুপসিয়া যাইতে পারে নাই।

এমন ঝী যখন পান চিবাইতে চিবাইতে নীচে আসিল, তখন বামুনঠাকুর চটিয়া লাল।

৫। ইতিহাস ও বিজ্ঞান। কোথাকার জল কোথায় মরে?

ঝীর উপর আজি যে এই সর্ব্বপ্রথমে হঠাৎ বামুনঠাকুর চটিলেন, তাহা নহে।

অনুরাগ-বিরাগের সূত্রপাত "শুভ-দৃষ্টিতেই" হইয়া থাকে। জলিবা উঠিতে যত কাল যাইবে যাউক, আগুন লাগে, তাহার অনেক আগে। এ ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিন মাসের উপর হইল, ঝী এ বাসায় আসিয়াছে। সেই প্রথম আসার প্রথম দিনের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই বামুনঠাকুর বিরক্ত।

বসন-ভূষণে সাজ-সজ্জায় ঝী কিছু ছিমছাম, ফিট্‌ফাট,—বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। ঝী সাদা কাপড় পরে না, চওড়া কালো-পাড়ের প্রতি ঝীর বিশেষ আসক্তি,—বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। ঝীর হাতে সোণার বালা, বাহুতে সোণার তাগা, গলায় সোণার দানা,—বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। ঝী একটু হেলে দুলে চলে, নাকি-টেনে কথা কয়, তালে বেতালে মুচকে হাসে,—বামুনঠাকুর তাহাতে বিরক্ত। বামুনঠাকুর নিতান্ত অসভ্য কি না?

রাণীগঞ্জের দেশে বাড়ী, খর-কাটা মাথায় ঘুঁটীর মত টীকী, গোঁফ-দাড়ী কামানো, বেয়াল্লিশের বেশি বয়স, খাটো কাপড় পরে, গামছা পরিয়া "শৌচে" যায়, বার বার হাতে পায়ে মাটী লয়, রোজ দুবার স্নান করে, সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ-তপ করে, পৃথক্ হাঁড়িতে রেঁধে খায়, হাই উঠিলে হরি বলে, হাঁচি টিক্‌টিকির বাধা মানে, সকলের শেষে শোয়, রাত থাকিতে উঠে,—যে বামুনঠাকুরের এত উপসর্গ, সে ত অসভ্য হইবেই।

কমলিনী মনে করিতেছেন, এমন বামুনঠাকুরকে রাখে কেন? পাপ বিদায় করিয়া দিলেইত হয়! হয় বটে, কিন্তু সংসার বড় কুপল্লী-স্থান, ষোল-আনা মনের মত কিছুই যে এখানে হয় না। ট্রাম-গাড়ীতেও টিকিট চায়, ইলিশ মাছেও কাঁটা হয়, স্বামীও আফিসে যায়, শাশুড়ী অথর্ব্ব হয় (তাহাতে রন্ধনের ব্যাঘাত),—সংসারের দুঃখের কথা কও কেন, কমলিনি!

এমন যে অসভ্য বামুনঠাকুর, কিন্তু খরচার খেজালৎ খুব কম, অথচ খাটুনি যত খাটাইতে পার। অধিকন্তু ঝী যে-সামগ্রী দু-পয়সায় আনে, বামুনঠাকুর তাই আনিয়া দেয়, এক পয়সায়। ইতিহাসটা বলিলেই ইহার হেতু বুঝিতে পারিবে।

উপর-তলার একটা কুঠরীতে শুধু মেঝের উপর মাদুরে একটা বিছানা করা হয়,

সে বিছানা দিনের বেলা দাণ্ডার উপর তুলিয়া রাখা হয়, মাদুরখানা গুটাইয়া কোণে ঠেকান থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই বিছানা একটি বালকের। যে গ্রামে বামুনঠাকুরের বাস, সেই গ্রামে সে বালকেরও বাস।

বামুনঠাকুরেরা দুই সহোদর, বামুনঠাকুরই জ্যেষ্ঠ। বিঘা দশ বারো লক্ষীছাড়া লাখেরাজ আছে বটে, কিন্তু তাহার উপরেও উপসর্গ, পৈতৃক দুর্গোৎসব, এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনের নিত্যসেবা। কাজেই জমার-জমী চাসের উপরেই প্রধান নির্ভর। তবে, বাড়ীতে খাইবার লোক বেশি নয়, সুতরাং খরচও কম। দুই সহোদর, এক মা, এক বিধবা পিসী—পিসী বিধবা না হইলেও বাস্তুদেবতার মধ্যেই পরিগণিত, কেননা, বামুনঠাকুরের পিসে মহাশয় এই পিসীর পাণিগ্রহণ করিয়াই স্বকৃত-ভঙ্গ হইয়াছিলেন,—আর এক কৃষাণ, পরিবারে এই পাঁচটি মাত্র লোক। কৃষাণ, জাতিতে বাগ্দি, কিন্তু সম্পর্কে বামুনঠাকুরের ভাইপো. নহিলে তাঁহাকে বড়-খুড়-ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন?—

কৃষাণকেও পরিবারের মধ্যে ধরিয়াছি, তাই বলিয়া হাসিয়া পাগল হইলে যে, কমলিনি। সে কি তোমার আমার মতন সভ্য লোকের পরিবার?—তা নয়। তোমার আমার পরিবার—এক-মেব-দ্বিতীয়ং—রদ-বদল নাহাল বর্তরফ থাকিলেও, গুণ্তিতে একটি মাত্র, তাহা আমি জানি। দাস-দাসী, মা-মাসী থাকিলেও থাকিতে পারে, খাউক, পরুক, তাহাও দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি তাহারা পরিবারভুক্ত নহে, তাহা জানি। যিনি সর্ব্বস্ব, যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব, যিনি ইহকাল, পরকাল, সকাল-বিকাল, সর্ব্বকালের মহাকাল তিনিই একমাত্র পরিবার তাহা জানি। যাহার জন্য আমি জুতার গোলাম, যিনি কাছে থাকিলে আমার ইষ্টদেবতা, যাহার কৃপাবলে সেকরা আমায় মুখথাবড়া দেয়, যাহার জন্য বাঙ্গালা-সংবাদপত্রেরও মূল্য চায়, যাহাকে বিধবা-বিবাহের গোড়া জানিয়া আমি প্রাণপণে জীবন ধারণ করি, তিনিই যে আমার পরিবার, আর কেহ পরিবার নয়, পরিবার হইতেও পারে না,—তাহা আমি জানি। যোড়ে যেমন পাখোয়াজ, ভিন্নে যেমন তবলা-বাঁয়া—তোমার আমার যে পরিবার, তা এমনি জিনিস। কিন্তু আমরা যে সভ্য, বামুনঠাকুরেরা সে অসভ্য!

কথায় কথায় কোথায় গিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু করি কি? আমার কলম যে কমলিনীর বশে!

বলিতেছিলাম যে, কৃষাণ-সমেত বামুনঠাকুরদের পরিবারে পাঁচটি লোক, কিন্তু খরচ কম, কাজেই কষ্ট ছিল না। দুঃখের বিষয় বামুনঠাকুরেরা বংশজ ব্রাহ্মণ, যাহা কিছু বিপদ, শুধু বিবাহের জন্য! মা, পিসী দু-জনেই বরাবর ছোট ভাইয়ের বিবাহের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতা কিছুতেই কাটিল না; ব্যাকুল অবস্থাতেই অগ্র-পশ্চাৎ তাঁহাদের ৺প্রাপ্তি হইল। লাভের মধ্যে, তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি

করিতে বামুনঠাকুরদের যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল।

কিছুকাল গতে বামুনঠাকুর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষার উপায় করা উচিত; পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড লোপ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু দু-জনের বিবাহ করিতে হইলে ব্যয়-বাহুল্য হয়, সঙ্গতিতে কুলায় না। কাজেই কনিষ্ঠকেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কনিষ্ঠও দাদার ভাই, দাদাকেই অগ্রে বিবাহ করিতে বলিলেন। বলিলেন—"আমার বিয়ের তরে কিসের ব্যস্ত। তোমাকে থাকৃতে আমাকে বিয়ে করা মানাবেক্ ক্যানে দাদা? লোকেই বা বোল্‌বেক কি?"

বামুনঠাকুর কিন্তু এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন না। বরং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমাকে চাইতে তোর বড়া বেশি বুদ্ধি হইচে, বটে! তোকে বিয়ে মানাবেক্ নাই, আর আমাকেই মানাবেক্। ঐ যে বলে ধড়া খুলে মাথায় পাশ—তু আমাকে সেইটো শিখা করাইতে আইচিস্ হ।"

কনিষ্ঠ আর প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না, মৌনী হইয়া রহিলেন। বামুনঠাকুরও রাগভরেই উঠিয়া গিয়া লোকের বাড়ী-বাড়ী কনিষ্ঠের অবাধ্যতা দোষের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কোথাও বলেন—"জানো না হে, উ জন্মকারের মাতা ঠারো। কখনো কারু ভালো কথাটি শুনলেক্ নাকো।" কাহাকেও বলেন—"বাপ ক্যানে হোক, হক্ কথা বল্‌বো। উটো মুষল হইচে, জ্যাষ্ঠ দাদার কথা রাখবেক্ ক্যানে হে? পৈত্রিক কিৰ্‌-কাণ্ড সগুলি উয়াতে হেৎকে রহিত হবেক্ কি না।" কখন বলেন,—"বিয়ে যদি না কচ্ছে ত আমারও এই হেৎকে পোদবোদ ঘরকেও যাবো নাই, খেলেক্ কি না খেলেক্ সিও সুধাবো নাই, কিসকের ঘর, কিসকের দুয়ার হে।"

এই ভাবে ছ-মাস ন-মাস কাটিয়া যায়। বামুনঠাকুর রান্ধেন বাড়েন, আপনি এক-মুঠা খান, ভাইকে খাইতে দেন, কৃষাণকেও খাইতে দেন, কিন্তু ভাল করিয়া কনিষ্ঠের সঙ্গে কথা কহেন না। কনিষ্ঠও ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই ভঙ্গ হইবে না, গ্রামের লোকেও তাঁহাকে সেই ভাবে বুঝাইল। তখন অগত্যা তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন; কিন্তু দাদাকে তাহা বলিতে পারিলেন না, অন্যান্য লোকের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

সম্মতির সমাচার পাইয়া বামুনঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। সকলের সমীপেই সহোদরের যশোগান করেন, আর কথা কহিবার সময়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলেন। বলেন—এতটুকু হোৎকে উ আমার রাম-লোক্ষ্মণ ভাই বটে। কখন খোড়কের-ডগে আমার আবৃটী কথা ঠেলে নাই। যিটী বোল্‌বো এণ্ডয়ে সিটী কোরবেক্, তবে জলগ্রহন।" ইত্যাদি।

ক্রমে পাত্রীর সন্ধান হইল, অর্থ সংগ্রহ হইল, কনিষ্ঠের বিবাহ হইল, বামুনঠাকুর নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ-দেহে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইল। গৃহস্থের কাজে ভরপুর পরিশ্রম করেন, কিন্তু তাহাতে খেদ নিবৃত্তি হয় না। পাড়া-প্রতিবেশীর যখন যেখানে যেমন কাজ পড়ুক না কেন, বামুনঠাকুরের বিশালস্কন্ধ বজ্রবাহু, এবং পবন-গতি পাদদ্বয় সেইখানেই উপস্থিত। কাহারও পীড়া হইলে কেবল পাঁচন সংগ্রহ করিয়া বামুনঠাকুরের পরিতোষ হয় না, স্বহস্তে পথ্য পাক না করিয়া দিয়া ছাড়েন না। কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজন হইলে, বাজার করা অবধি পাত ফেলা পর্য্যন্ত বামুনঠাকুরের বিরাম নাই। কাহারও লোকবল নাই, বাটীতে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোক আছেন, বামুনঠাকুরের শয়ন তাহারই "দরজায়,"—কি জানি যদি রাত্রিকালেই ধাত্রী ডাকিতে হয়। মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে হইবে, বামুনঠাকুর সেখানে অগ্রণী। এই সকল বিষয়ে বামুনঠাকুরের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, ঝড়-বৃষ্টি বোধ নাই, দিবা-রাত্রির ভেদ নাই। ইহাতেই বামুনঠাকুর সদানন্দ।

এই সময়ে, প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের গৃহ শূন্য হইল। তখন স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল না, স্ত্রীশিক্ষা ছিল না, ঠাকুরাণীরা বিলাতী মোহন-বাঁশী বাজাইতেন না, ঘেমটাওয়ালীরাই ঘেমটা নাচিত, বাইজীরাই গান গাইত,—তথাপি, তখন, সেই বর্ব্বরতার যখন পূর্ণ-প্রভাব, তখনও পত্নীবিয়োগে "গৃহশূন্য" হইত। পাগলের প্রলাপ! ইহাও কি হইতে পারে? সর্ব্বসাধারণ জনগণ-সমীপে আমি সানুনয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, আমি এবং কমলিনী, আমরা উভয়ে—অর্থাৎ সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য সমগ্র জগৎ—এ কথায় বিশ্বাস করিতে অক্ষম। সেকালে স্ত্রীলোক ছিল কি না, আদৌ ইহাই সন্দেহের স্থল। সন্তানাদি প্রসবের কল ছিল, ইহা মানি; কিন্তু তাহাকে স্ত্রীলোক বলে না, অন্ততঃ বলা উচিত হয় না।

স্ত্রীলোক কি, জান? সে তোমার বেদে নাই, পুরাণে নাই, তন্ত্রে নাই, স্মৃতিতে নাই, দর্শনে নাই, কোথাও নাই। অধিক কি, বোপদেব যে বোপদেব, তাহাতেও নাই। স্ত্রীলোক চেতন নহে, অচেতন নহে, উদ্ভিদ্ নহে,—তিন প্রকারের পদার্থের কোন পদার্থই নহে। স্ত্রীলোক, অপদার্থ। স্ত্রীলোক পৃথিবীতে হয় না, কেবল আকাশে ফোটে। এক যুগ, অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর মাত্র, স্ত্রীলোকের পরমায়ু; সহসা, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্ত্রীলোকের উদয়; পঁচিশ পার হইতে না হইতে অস্ত; কিছুকাল গোধূলি থাকে বটে, কিন্তু তাহা গোহাল হইতে গোষ্ঠে যাইবার, এবং গোষ্ঠ হইতে গোহালে ফিরিবার জন্য। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে শব্দ হয় না, কেবল সঙ্গীত হয়; নেত্রে দৃষ্টি হয় না, কেবল কটাক্ষ হয়; রসনায় রস জন্মে না, শুধুই সুধা; ওষ্ঠাধরে হাসি নাই, কেবল বিজলি; নাসায় নিশ্বাস নাই, কেবল মলয়ানিল; ঐ যে বাহু মনে করিতেছ, উহা বাহু নহে, অশ্বমেধের অশ্ব বান্ধিবার নিমিত্ত বনলতা; তুমি যাহাকে পাদচারণ মনে

করিতেছ, তাহা পাদচারণ নহে, উহা জ্যোতির লীলা মাত্র ; উহাই দেখিবার জন্য আকাশে চপল চমকে—আমি আবার স্ত্রীলোক জানি না ? যদিও আগে জানিতাম না স্বীকার করি, কিন্তু যে অবধি—হে কমলিনি ! তোমার করুণাকটাক্ষ আমার কাণের কাছ দিয়া ছন্‌ন্‌ন্‌—করিয়া ডাকিয়া গিয়াছে, সেই অবধি আর কি স্ত্রীলোক চিনিতে বাকি থাকে ? হাঁ, এমন স্ত্রীলোকের বিরহে "গৃহ-শূন্য" হয় বটে !

হরি ! হরি ! তাই বলিয়া কি গৃহস্থের রাঁধুনী, অতিথির চাকরাণী, ছেলে পুলে মানুষ করে, হাতে খাড়ু লোহা ধরে, গুণচটের মতন কাপড় পরে, কপালে এক ধাবড়া সিন্দূর ঢালে, পায়ে চোখ রেখে পথে চলে—এইরূপ একটা কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ার মরিলেও "গৃহশূন্য" বলিতে হইবে ? আরে ছ্যাঃ। তাও কি হয় ?

আচ্ছা আমার ঘাট্ হয়েছে,—বামুনঠাকুরের প্রতিবেশীর "গৃহশূন্য" হয় নাই, তাহার কাচ্চা বাচ্চার মা-ই মরিয়াছিল।

যাহা হইবে হউক, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িল। ব্রাহ্মণের অনেকগুলি সন্তান, বাড়ীতে আর স্ত্রীলোক নাই, তাহার উপর কোলের ছেলেটির বয়স তিন বৎসর মাত্র। তাহাকে লইয়া থাকিতে গেলে, কোন কাজই হয় না, অন্য ছেলেগুলি মারা যায়।

বামুনঠাকুরের ইহাই অবসর ; তিনি এই সুযোগে আস্তে আস্তে কোলের ছেলে-টিকে অনুগত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ছেলেটির নাম রামরেণু।

রামরেণুর মাতার পরলোকের পর, পনর দিন যাইতে না-যাইতে, বামুনঠাকুর তাহাকে এক প্রকার পিত্রালয় ছাড়া করিলেন বলিলেই হয়। রামরেণুকে খাওয়ান বামুনঠাকুর ; ঘুম পাড়ান বামুনঠাকুর ; রামরেণুর সঙ্গে ছেলে-খেলা করেন বামুনঠাকুর। এত খেলাও কি বামুনঠাকুরের আসে ?

বামুনঠাকুর কখনও আপন গলায় দড়ি বাঁধিয়া,রামরেণুকে সেই দড়ি ধরাইয়া আপনি ঘোড়া হইয়া হামাগুড়ি দিয়া হাঁটেন, এবং ঘাস খাওয়ার অভিনয় করেন। কখনও ঘরের কোণে দৌড়িয়া গিয়া "কু" দিয়া রামরেণুর সঙ্গে "লুকোচুরি" খেলেন। রামরেণু যদি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে, তাহা হইলে কাঁদিয়া উঠে ; তখন বামুনঠাকুর দৌড়িয়া আসিয়া রামরেণুর মুখ চুম্বন করিয়া তাহার চক্ষের জলে নিজের চক্ষের জল মিশাইয়া দেন। কখনও ঘাস, পাতা, ধুলা লইয়া রন্ধনের অভিনয় করেন, রামরেণুকে ব্রাহ্মণ ডাকিতে পাঠান,পাতে পাতে পরিবেশন করেন,রামরেণু তাঁহাকে খাইতে বলিলে, ধমক দিয়া বলেন—"র রে, এগুয়ে বামুনদের খ হোক, তা বাদে আমরা ঘরের লোক সব খাবো।" কখনও রামরেণুর বিবাহের গল্প হয়, রাঙা শাশুড়ী হইবে, বামুনঠাকুর তাহার দুধ খাইবে, এই প্রস্তাব হয় ; রামরেণু "ছাছুনীর" দুধ নিজে খাইবে বলিয়া আপত্তি করে, তাহাতে দুইজনে ঝগড়া হয়। দিনরাত্রি একত্র বাস, দিন রাত্রি খেলা। রামরেণু পিতা ভুলিল, ভ্রাতা ভুলিল, ভগিনী ভুলিল,—চিনিল কেবল "দাদাকে"। রামরেণুর

পিতা বামুনঠাকুরকে খুড়া বলিতেন, সেই সম্বন্ধে বামুনঠাকুর রামরেণুকে দাদা বলিতেন, কাজেকাজেই রামরেণুও বামুনঠাকুরকে "দাদাই" বলিত। ক্রমে রামরেণুর বিদ্যারম্ভ হইল, উপনয়ন হইল, বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইতে লাগিল, বামুনঠাকুরের ব্যয়ে। ক্রমে এল্ এ, পড়িবার জন্য রামরেণুকে কলিকাতায় আসিতে হইল, অগত্যা সেই সূত্রে বামুনঠাকুরও আসিলেন। রামরেণুর পড়াশুনাও হয়, চাল-চলনও না বিগড়ায়।

রামরেণুর বিদ্যাশিক্ষাও বিনা-ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়, ইহাই বামুনঠাকুরের সঙ্কল্প। বামুনঠাকুরের বেতনের তত প্রয়োজন নাই, যাহা পান, তাহাতেই পরিতুষ্ট; কেননা, যাহা পান, তাহাই থাকে, তাহাতেই আবার নিজ বাটীর দুর্গোৎসবের, শালগ্রামের নিত্য-সেবার, কথঞ্চিৎ সাহায্য হয়। যত্ন-সন্ধান করিয়া বামুনঠাকুর এক বৎসর হইল ক্ষুদিরামের এই আড্ডার আবিষ্কার করেন। ক্ষুদিরাম তখনও বি, এ, পাস্ দেন নাই। রামরেণুর ঘর ভাড়া লাগিবে না, আবশ্যক মত পড়া বলিয়া লইবার সাহায্য হইবে, ইহাতেই বামুনঠাকুর মাসিক দেড় টাকা বেতন এবং খোরাক-পোষাক পাইবার সর্ত্তে, এই বাসার বামুনঠাকুর হইলেন।

ঘোরতর অসভ্য হইলেও, এমন সুবিধার বামুনঠাকুর সর্ব্বদা মিলে না। বুঝিলে কমলিনি! কেন এ বামুনঠাকুরকে রাখিতে হয়? কেন এ পাপ বিদায় করায় লাভ নাই?

ভাল, কমলিনি। তুমি ত বামুনঠাকুরকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলে; এখন এত কৈফিয়তের পর একটু ঠাণ্ডা হইলে আমি কি এইবার জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি পাইতে পারি যে, কিজন্য বামুনঠাকুরের বিরাগ-বর্দ্ধিনী সেই ঝী-সুন্দরীকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় না?

ঝী যখন এ বাসায় প্রথম পায়ের-ধূলা দেন, বামুনঠাকুর ত তৎক্ষণাৎ তাহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

"তোরা কুন্ জাত বটিস?"

বামুনঠাকুরের বাঁকা কথা শুনিয়া, ঝী হাসি রাখিতে পারিল না। এক ঝলক হাসিয়া, ঝী বলিল—"কেন? কায়েস্থ।"

"তোর বাপের ঘর কুথা বটে।"

"মেদ্নীপুর।" (আর সেই হাসি।)

"তোর শ্বশুরঘর কুন্ গাঁ বটে?"

ঝী এবার উত্তর দিতে পারিল না; আঁচলের আধখানা মুখের ভিতর পুরিয়া, ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়া-দুলিয়া খল্ খল্ হাসিতে লাগিল, আর যেন এলাইয়া "কে ধরে" "কে ধরে" গোছ হইল।

বামুনঠাকুর পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন—"তু কারসাথে হেতা আইছিল? কোল-কাতাকে আইছিস্ কবে?"

ঝীর দম্ আট্‌কাইবার আয়োজন হইল।

"ও মাঃ! গেলুম। যাই কোতা মা? পেটে ব্যাথা ধোবে গেল যে? ও মাঃ—"

এমন সময় উপরের বারান্দা হইতে ক্ষুদিরাম যেন উঁকি মারিলেন। ঝীর কিছু উচু নজর, অমনি তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন মুখের কাপড় খুলিয়া, পরণের কাপড় একটু সারিয়া সুরিয়া পরিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—

"হ্যাগা বাবু, আমায় রাখবে, না আমি যাব?" সঙ্গে সঙ্গে একটু মুচকি মোহন-হাসিও হাসিল।

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"যাবে কেন? একটু তামাক সেজে নিয়ে এস, দেখি।"

ঝী তামাক সাজিতে উদ্যত হইল। বামুনঠাকুর তাহাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না; কেবল আপন মনে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন "মাগীত ছিনেরপারা দেখ্‌ছি বটে!"

এ আজ কিছু উপর, তিন মাসের কথা।

ঝী রহিয়া গেল, কিন্তু সে যে "কায়েস্ত" বামুনঠাকুর তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বামুনঠাকুর বর্ব্বর কি না? তাহার অবিশ্বাসের দরুণ, ক্ষতি হইতে তাহারই ক্ষতি হইল, গৃহস্থের কোন ক্ষতি হইল না। ঝীর ত বরং লাভই হইল।

বামুনঠাকুর রন্ধনে, পানে, ঝীর জল গ্রহণ করেন না, ঝীকে বাটনা বাটিতে দেন না, নিজে উনন ধরান, হাট-বাজারও প্রায় করেন; ঝীর ধোয়া বাসন পর্য্যন্ত আবার জল দিয়া লন্—ইহাতে ঝীর লোক্‌সান কি? ঝী বাসন মাজে, তামাক সাজে, সময়-বিশেষ বাজার করে—এই মাত্র। বামুনঠাকুরই ত বোকা, ঝী সেয়ানা।

ঝীকে তাড়াইতেই যদি বামুনঠাকুরের ইচ্ছা, তাহা হইলে তামাক সাজা, আর বাসন মাজা—এই দুইটা কাজ স্বহস্তে লইলেই ত হয়? তাহাতে বামুনঠাকুর অসম্মত; উচ্ছিষ্টপাত্রস্পর্শের ত কথাই নাই। বামুনঠাকুর কাহারও হুঁকা ছোন না, কাহাকেও তামাক সাজিয়া দেন না এবং জুতা পায়ে দিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে কাহাকেও দেন না। কাজে কাজেই ঝী নাহলেও চলে না।

তবে এ ঝী, না হয় অন্য ঝী। তা, এ ঝী নাকি খোদ ক্ষুদিরামের আনা; আর পাঁচ জনের বাসা হইলেও, ক্ষুদিরামই এক-প্রকার বাসার কর্ত্তা, তখন এ ঝীকে বিদায় করাই বা কি প্রকারে হইতে পারে? বুঝিলাম।

বুঝিলাম যে, কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোথাকার ক্ষুদিরাম, কোথাকার ঝী, কোথাকার বামুনঠাকুর, কোথাকার রামরেণু, কেমন করিয়া, পরস্পরে আবদ্ধ হইয়া, একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, এতক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম।

কিন্তু ক্ষুদিরাম কেমন করিয়া, কি সূত্রে, কোথায় এ ঝীকে পাইল, তাহা ত এখনও জানা গেল না।

কি উৎপাত। সকল কথাই কি একেবারে এক নিশ্বাসেই জানিতে হইবে? তা কি জানা যায়? না, জানিলেই বলা যায়? একটু ধৈর্য্য ধর না।

এ দিকে, ঝী পান চিবাইতে চিবাইতে নামিয়া আসিলে পর, তাহাকে দেখিয়া বামুনঠাকুর যে চটিয়া লাল হইয়াছেন, তাহা মনে আছে কি? সেই কথাটাই আগে হউক না?

৬। বিবাদের পর বনপর্ব্ব।

ঝীকে দেখিয়া বামুনঠাকুর বলিলেন—"উপরেই আছিলিস্ তু?"

প্রথম প্রথম, বামুনঠাকুরের কথা কাণে পড়িবামাত্র ঝীর কাণে যে সুড়সুড়ি লাগিত,—অর্থাৎ বামুনঠাকুরের বাগ্‌যন্ত্র-প্রতিহত কণ্ঠধ্বনি বায়বিক তরঙ্গ-তাড়নে ঝীর কর্ণপটহে আঘাত মাত্র, শ্রাবণিক স্নায়ুসহযোগে মস্তিষ্কে নীত হইয়া, তথা হইতে মেরুদণ্ডের মজ্জা অবলম্বন করিয়া, কৈশিকী ধমনীজালের সাহায্যে ফুস্‌ফুসের আক্ষেপিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া উৎপাদনপূর্ব্বক, ঝীর হৃদ্‌যন্ত্রাদির পেশীসমূহে আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনাদির দ্বারা কণ্ঠনালীতে যে বিকার উপস্থিত করিত,—

একবর্ণও বুঝিতে পারিলে না,—বটে? আচ্ছা, সে কি আমার দোষ, না তোমার দোষ? বই পড়িতে ইচ্ছা হয়, লেখাপড়া শিখিতে ইচ্ছা হয় না কেন?

বাস্তবিক কিন্তু তুমি বুঝিয়াছ, কেবল আমাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য তামাসা করিতেছ মাত্র। তুমি বেদের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন কর; দর্শনের সমালোচন কর; পুরাণের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রতিপাদন কর; তুমি আবার এই কথা কয়টা বুঝিতে পার নাই, ইহাও কি সম্ভব? দেখ, দশ বিশ পাতা অন্তরে এক-আধবার আমার বিদ্যা চাগাড় দিয়া উঠে, তাহাতেও যদি তুমি তামাসা কর, তবে আমি দাঁড়াই কোথায়? সুড়সুড়িটা কিরকম সামগ্রী, তাহাতে শরীরের মধ্যে কোন্ খান দিয়া কোন্ ক্রিয়া কেমন করিয়া হয়, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, তোমার ভাল লাগিল না, উত্তম; আমিও ক্ষান্ত হইলাম।

ব্যাপার এই যে, প্রথম প্রথম বামুনঠাকুরের কথা শুনিয়া ঝীর বড় হাসি পাইত। ক্রমে কাণ ভোঁতা হইয়া গেল; বামুনঠাকুরের কথাগুলা যে বাঁকা-বাঁকা ঝীর এখন তাহা মনেই হয় না। অভ্যাসের ধর্ম্মই এই।

অতএব, "উপরেই আছিলিস্ তু?"—বামুনঠাকুরের এই প্রশ্নে ঝী ত হাসিলই না, বরং উত্তর দিল—

"উপরে ছিলুম না ত গেলুম কোথা? তুমি বুঝি, ঠাউরে রেখেচ যে, মাগী গ্যাছে নিমতলার ঘাটে?"

"নিমতলাকে যাবি কেন গো? এগুয়ে সব্বাইকে খাবি; তবে তু যাবি। ঐ যে গদাই কাকা বোল্‌ত 'দুও কুল ধুয়ে যায়, তবু হুড়পা রৈঁয়ে যায়' তু বিটীও তাই। চার যুগের বর লিয়ে আইছিস্‌, তু কিস্‌কে যাবি?"

—"মিচি মিচি গাল দিও না ত, দুপুর বেলা, বল্‌চি।"

—"বাখান্‌টো বড্ড বাজলো, বটে?"

—"উনি গাল দেবেন, আর লোকে তাই সয়ে থাক্‌বে, কথাটি কইবে না,—কি মজার কথা গা? আবার 'বাখান্‌টো বাজল'—বাজবে না? কেন আমায় গাল দিচ্ছ বল ত?

—"চেঁচাস্‌ না গো, চেঁচাস্‌ না, টুঁটি চিরে যাবেক। গদাই কাকা বোল্‌ত কি না, 'ঢাকে ঢোলে বিয়ে, লুকাবি কুন্‌ ঠিঁয়ে।' রা আছে ত' ভুসী বাবু যৎক্ষণ হাঁকাহাঁকি পাড়্‌ছিল,তখন রা দিতে কি হইছিল?"

ঝী উপরে ছিল, অথচ ভুসী বাবু যখন ডাকিতেছিলেন, তখন সাড়া দেয় নাই, ইহাই বামুনঠাকুরের অদ্যকার রাগের কারণ। যে ঝগড়ার গোড়াপত্তন করা হইয়াছে, তাহাও এই নিমিত্ত। কিন্তু "ঝগড়ার আগে ঝড় চলে না," অর্থাৎ ঝড় অপেক্ষা ঝগড়া সর্ব্বাংশেই প্রবলতর। সেই ঝগড়া অবিকল বর্ণন করা সম্ভব নহে, সম্ভব হইলেও সুখকর নহে। সেই জন্য আজিকার ঝগড়ার সারমর্ম্ম সহজ কথায় সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ করিতেছি। ইহাতে কোমলপ্রাণা কমলিনীর প্রতিও করুণা প্রকাশ করা হইবে।

উপরের ঘর হইতে উত্তর না দিবার অনেক কারণ, ঝী দর্শাইল; তন্মধ্যে প্রধান কারণ তিনটি;—প্রথম, স্ত্রীলোক উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিতে পারে না। গলা সরু বলিয়াই হউক, লজ্জা বেশি বলিয়াই হউক, অথবা যে জন্যই হউক, কথাটা যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কখনও কোন স্ত্রীলোককে জোরে কথা কহিতে দেখা দূরে থাকুক, আমি ত কখনও শুনিও নাই। বোধ করি কেহই শুনে নাই। (জনান্তিকে,—কমলিনী আমারই কাছে এখন বসিয়া আছেন।)

দ্বিতীয় কারণ,—ঝী একে মেয়েমানুষ, তায় ঝী; ভুসী বাবু ভদ্রলোক, তায় অপরিচিত বলিলেই হয়। কি বলিয়া সাড়া দেয়? পূর্ব্বে কোথাও ভুসী বাবুর সঙ্গে ঝীর আলাপ পরিচয় ছিল কি-না,তাহা কেমন করিয়া জানিব। কিন্তু এ-বাড়ীতে আসা-অবধি ভুসী বাবু কতদিন কতবার এখানে আসেন যান,তা কখনও—"কি ঝী, ভাল আছ?"—এই কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া, ভুসী বাবু ঝীর সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কহেন নাই; আর ঝী ত "রাম" "গঙ্গা" কিছুই বলে নাই। আবার ঐ যে কুশল জিজ্ঞাসা, তাহাও ভুসীবাবুর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এমনই তাঁহার স্বভাবের গুণ, এতই তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য এবং মিষ্টতা যে, চেনাই কি আর অচেনাই কি, মানুষ দেখিলেই, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত

মন্দভাগ্য যাহার, এমন মেয়েমানুষ অর্থাৎ কি না যাহাকে দেখিলে আপনা আপনি,—স্বভাবতঃ—বিনা হেতুতেই—দয়া হয়, দাক্ষিণ্য হয়, দর-বিগলিতধারা নয়নে ধায়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বুক ফেটে যায়, চিত্ত চঞ্চল হয়, মন ব্যাকুল হয়,—এমনই যাহা, যাহা হইবার কিম্বা না হইবার আছে, সে সমস্তই হয়—(আমি ত সব জানি না যে, বলিব ; ভ্রাতা ভুসীভোজনকেই জিজ্ঞাসা করিও না কেন ? তাঁহার সাধা-বিদ্যা, তিনি এখনই বলিয়া দিবেন।) এই রকম মেয়েমানুষ দেখিলেই আকর্ণ-দন্ত বিকাশ এবং একঘেয়ে কুশল জিজ্ঞাসা,—এই দুটি কাজ ভুসী বাবু করিবেনই করিবেন। ঝীকে অন্যায় দোষ দিলে চলিবে কেন ? ঝী ত তেমন লোক নয়। (জনান্তিকে,—বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করিতে করিতে ঝী ঝাঁটা হাতে করিয়াছে,—অবশ্য ঘর ঝাঁট দিবার জন্যই বটে, তথাপি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা ভাল।)

ঝী উপর হইতে উত্তর দেয় নাই, তাহার তৃতীয় কারণ—(গণনায় তৃতীয়, কিন্তু গুরুত্বে প্রথম)—ক্ষুদিরাম তখন খাটের উপর—নিদ্রিত ; জাগিয়া ছিলেন না, নিদ্রিত ;—আমিও ত তাহাই বলিতেছি, নিদ্রিত। কাজ কর্ম্ম না থাকিলে, অথবা কাজের অধিক চাপাচাপি হইলে, মধ্যাহ্ন ভোজের পর, বালিশে মাথা দিয়া, হাত-পা ছড়াইয়া বিছানার উপর যদি চিন্তামগ্ন হওয়া যায়—হাতে বই থাকুক আর না থাকুক—ঘুম যেন আসিবেই আসিবে। অতএব প্রমাণ হইল যে, ক্ষুদিরাম নিদ্রিত। ঝী যদি তখন কথা কয়, ক্ষুদিরামের ঘুমখানি তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়। কেমন, কাঁচা ঘুমে কথা কহিলে, ঘুম ভাঙ্গে কি না ? তুমিই বল কর্ম্মলিনি ! তুমিই বল। বিচারের ভার তোমারই উপর।—আর, তখন ঘুম ভাঙ্গিলে কত কষ্টই হয়।

তখন নামিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল না কেন ?—ঝী সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বামুনঠাকুর কেন দুয়ার খুলিয়া দেন নাই, তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। বামুনঠাকুর তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন, উঠিলে আর আহার হয় না—ঝী এ সংবাদ জানিত না, কিম্বা ভুলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সরল প্রশ্নের সমুচিত উত্তর পাইয়া ঝীও বামুনঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর দিল—"আমিও এই মাত্তর দুটি ভাত মুখে দিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে, উপরে গিয়ে, সুপুরি-টুপুরি কেটে এই একটা পান সাজ্‌ছিলুম—"

বামুনঠাকুর এই উত্তরেই সন্তুষ্ট হইবেন, অন্ততঃ ঝীর সঙ্গে বকাবকিতে প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, এমন সময়ে ঝী আবার বলিয়া ফেলিল—

"ও ঘরে পান না রাখ্‌লে বাবু যে রাগ করে,—পান-টান ছড়িয়ে কে কম্‌নে যে কি সব নষ্ট কোরে—"

ইত্যাদি, ঝী বোধ হয় দীর্ঘ বক্তৃতাই করিত, কাজেই বামুনঠাকুরকে আবার কথা কহিতে হইল। কিন্তু সেই কর্কশ-কণ্ঠের কাটখোট্টা কথা শুনাইয়া আর তোমার

কোন ঝালাপালা করিব না, কেবল এইমাত্র বলিব যে, বিবাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ক্ষুদিরামকেও বারান্দার বাহির হইয়া দাঁড়াইতে হইল।

ঝীতে আর বামুনঠাকুরে বিবাদ; হাতাহাতি মারামারি না হইলেও, মতান্তর এবং কথান্তর বটে। সেও ত বিবাদ! বামুনঠাকুরকে যদি ভালমানুষ বল, তথাপি পুরুষ; ঝী হাজার প্রবলা হউক না কেন, তবু অবলা। সমানে সমানে বিবাদ কোন মতেই বলা যায় না; তবেই বলিতে হয়—বিষম বিবাদ! এমন অবস্থায় তুমি আমি যাহা করি, সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সভ্যতামোদিত নর-নারী মাত্রেই যাহা করেন, ক্ষুদিরাম তাহাই করিলেন। ঝীর পক্ষই অবলম্বন করিলেন। তাহা করুন, কিন্তু এমন বিবাদের ক্ষেত্রেও ক্ষুদিরামের ভাবটি কত মনোহর। কড়া কথা নাই, চড়া আওয়াজ নাই, আস্তে আস্তে বামুনঠাকুরকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি—ক্ষুদিরাম নয়, বামুন-ঠাকুর—অতি অসভ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন গণ্ডমূর্খ, কাহার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, সে বোধ নাই, পাচক-ব্রাহ্মণ বাবুর্চ্চির জাত—স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা বুঝে না; ইংলণ্ডে, আমেরিকাতে, এমন কি জাপানে এই কাণ্ড হইলে বামুনঠাকুরকে নিশ্চয় চাবুক খাইতে হইত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বামুনঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"উ বিটী কি মেয়ালোক? উ ত মেয়ালোকের বাপ বটে।"

ঝী আর তখন সম্বরণ করিতে পারিল না। "ঝী-সংস্করণে"র অভিধান হইতে খুটি চেক বাছাই বাছাই পুরাতন শব্দ এবং বাক্য বাহির করিয়া, বামুনঠাকুরের প্রতি প্রয়োগ করিল।

এমন সময়ে, বাটীর সম্মুখস্থ সুন্দরি-কাষ্ঠের দোকানদার রঙ্গভূমিতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ঝীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এ বেটী আবার কায়স্থ কবলায় রে! বেটীর চোদ্দপুরুষেও কেউ কায়স্থ নয়,—তা না হোলে এমন মেচুনির মুখ হয়? মুখ ত নয়, যেন হাড়ির কোদাল।"

আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব, কাষ্ঠওয়ালার কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম রণে ভঙ্গ দিলেন। "কাজ নাই ছোটলোকের সঙ্গে কোন্দল কোরে,—ঝী, তুমি তামাক সেজে নিয়ে উপরে এস"—বলিতে বলিতে ক্ষুদিরাম পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে অন্তর্ধান হইলেন। ঝীও বেগতিক বুঝিয়া তামাকের তল্লাসে তৎপর হইল। আর সেই দোকানদার—"আসুন ঠাকুরমশাই, এ বেটীর পর্ব্বে আমাদের 'বনপর্ব্ব' পড়া বন্ধ থাকে কেন?"—এই বলিয়া বামুনঠাকুরকে লইয়া বাহিরে গেল। আমিও বাঁচিলাম।

৭। তুলনায় সমালোচন। কার্য্যকারণের পরিচয়।

মহাজনের বাক্য আছে—"যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বন।" বামুনঠাকুরের কৃপায় "বনপর্ব্বে"র উল্লেখ হইয়াছে, ইত্যবসরে আমিও ভারত-কথার কিয়দংশ বলিয়া রাখি। কমলিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃদয়রঞ্জন! ক্ষুদিরাম এখন কলিকাতায় কেন? বি, এ, পাশ ত হইয়া গিয়াছে, চাকরিরও চেষ্টা দেখি না, বসিয়া ত কেবল বাসাখরচ। ক্ষুদিরাম কেন এখানে থাকেন, কেমন করিয়াই বা তাঁহার কাল কাটে, কিসেই বা সংসার চলে? এই সকল বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

আমি কহিলাম,—সাধু! কমলিনি, সাধু! তুমি অতি সৎপ্রসঙ্গেরই অবতারণা করিয়াছ। কিন্তু সকল সমস্যার পূরণ করা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তথাপি, হে সুরসিকে। সাধ্যমতে তোমার কৌতূহলের সেবা করিতে আমি অবশ্যই বাধ্য। হে চারুশীলে চতুরে! এখন তুমিই আমার চতুর্ব্বর্গ। তোমার যাহা মনে ধরে তাহাই আমার ধর্ম্ম; তোমার অলঙ্কারই আমার অর্থ; তোমার করুণাই আমার কাম; এবং তোমাকে রাখিয়া মরিতে পারিলেই আমার মোক্ষ। তুমি চিন্ময়ী, কেননা তোমাকে চিনিয়াই আমার চৈতন্য হইয়াছে। তুমি বিদ্যা, কেননা তোমার চক্ষে আমিও সুন্দর। তুমি কৃষ্ণ-কথায় কর্ণপাত কর না, কেবল এই ক্ষুদিরামের খাতিরে। হে সুমধ্যে! অবধান কর, আমি যাহা জানি তাহা অবশ্যই বলিব।

বি-এ-পাশের পর ক্ষুদিরাম একবার বাঁয়রপাড়ার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিরাত্রের বেশি বাস করিতে পারেন নাই, কারণ বাড়ীতে কড়ই কষ্ট। বৈঠকখানা নাই, বসিবার বিছানা নাই, বন্ধু-বান্ধবের সম্বর্দ্ধনা করিবার কোন বন্দোবস্তই নাই। রান্নাঘর নিয়ে মোটে দুখানি মেটে ঘর, তাহাও নিতান্ত ছোট। নিত্য নিত্য নিকায় বলিয়া সে ঘরও যেন স্যাঁত স্যাঁত করে, তায় আবার গোবরের গন্ধ, মা এখনও মাছ বেচে. আমিষের ঘ্রাণে বাতাসও যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। দুটা-দশটা মাছিও উড়িতেছে।—সকল দিকেই স্বাস্থ্যরক্ষার বিষম ব্যাঘাত। এমন ভয়ঙ্কর স্থানে, ভদ্রলোকে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে?

পূরা দুই বৎসর পরে ক্ষুদিরাম বাড়ী গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর কালেজে এল্-এ পড়ার সময়েও ক্ষুদিরাম বৎসরে একবার করিয়া বাড়ী যাইতেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিবার পর বিএ-পাশ না দিয়া আর বাড়ী গেলেন না।

কলিকাতায় আসিবার সময়ে, ক্ষুদিরামের মা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যে, ছুটী হইলেই যেন বাড়ী আসা হয়। পদ্ম-জেলেনীর বাম-হস্ত ক্ষুদিরামের দক্ষিণ-স্কন্ধে, দক্ষিণ-হস্ত ক্ষুদিরামের চিবুকে, চক্ষে জলধারা, ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত, কণ্ঠ গদ্গদ—ক্ষুদিরামকে কলিকাতা পাঠাইবার কালে পথিমধ্যে পদ্মের সেই সকরুণ ভাব! "চাঁদমুখ" দেখাইবার

জন্য অনুরোধ—আসিলে, থাকিতে হইবে না, পড়ার ক্ষতি করিতে হইবে না—কেবল, দেখিয়া প্রাণ যুড়াইবার জন্য ভগ্ন স্বরে সেই অনুরোধ; ভবিষ্যতে প্রাণাধিক পুত্রের মঙ্গলের আশা, সংপ্রতি প্রবাস-বাসে অদর্শন জন্য মর্ম্মযাতনা, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পদ্মের সেই ব্যাকুলতা; একমাত্র পুত্রমুখ নিরখিয়া পদ্ম প্রাণধারণ করিতেছে—আর যে পদ্মের কেহই নাই;—পড়িতে দিয়া পদ্ম বুঝি ভাল কাল কাজ করে নাই, কাঙ্গালীর ছেলে কাঙ্গাল হইয়া তবু ত কাছে থাকিত?—ক্ষুদিরামের যাত্রাকালে পদ্মের সেই কাতর ছবি আজিও আমার বুকের মধ্যে আঁকা আছে। অশিক্ষিতা রমণী কি না, অল্পেই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ভ্রান্তির অশেষ দোষ। পদ্ম-জেলেনী, সেই যাত্রার সময়ে দেবতাকে এবং দেবতার স্থানে, এবং দেবতা স্মরণ করিয়া, ক্ষুদিরামকে প্রণাম করিতে বলিল; পদ্ম নিজে কত দেবতার নাম করিতে লাগিল, করযোড় করিয়া কত দেবতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিল, কত স্থানে ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া, মনে মনে দেবতার চরণ-ছায়ায় পুত্রকে সঁপিয়া দিল—পদ্মের কাছে ইহা ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করা যাইবে?—একে শিক্ষা নাই, তায় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ!

কিন্তু ক্ষুদিরাম তখন কি করিলেন? অবশ্য দেবতাকে প্রণাম করিলেন না,—ক্ষুদিরাম ত ক্ষেপেন নাই! মিথ্যা-কথাও কহিলেন না,—বিবেকশূন্য বোকা-ছেলের মত—"তা আসব বৈ কি, মা"—বলিয়া প্রবঞ্চনা-পূর্ণ প্রবোধ দিয়া, মাকে সান্ত্বনা করিতে ক্ষুদিরাম কেন সম্মত হইবেন? বরং ঈষৎ হাসিয়া—"পড়া কামাই কোরে কি আসা যায়?—আর, এসেই বা কি দরকার?"—এই কথা বলিয়া প্রাজ্ঞের ন্যায়, বীরের ন্যায়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, একবারও মুখ না ফিরাইয়া হট্-হট্ শব্দে চলিয়া গেলেন। পদ্ম-জেলেনী বার-হাত কাঁকুড়,—দুঃখে ফাটিয়া গেল; ক্ষুদিরাম তেরো-হাত বিচি,—ধরা দিলেন না, পিছলিয়া পলাইলেন। জ্ঞানে আর অজ্ঞানে এই প্রভেদ।

ক্ষুদিরাম চলিয়া গেলেন. পদ্ম সেই পথেই দাঁড়াইয়া রহিল। পদ্ম চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া রহিল, ক্ষুদিরাম চলিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পদ্মের চোখ ঠিকরিয়া গেল, তখনও পদ্ম দেখিতে লাগিল। আর দেখা যায় না, তখনও পদ্মের দৃষ্টি সেই পথে। তাহার পর পদ্ম নিশ্বাস ফেলিল,—সে নিশ্বাস গুরু, গভীর এবং তপ্ত, কেননা পদ্মের প্রাণ পুড়িতেছিল। ক্রমে পদ্ম বাড়ীর দিকে ফিরিল; পদ্ম ফিরিল, কিন্তু পদ্মের মন ফিরিল না,—এক-পা করিয়া যায়, আবার পদ্ম ফিরিয়া চায়। পদ্ম একবার মনে করিল যে ক্ষুদিরাম এখনও দৃষ্টির বাহির হয় নাই, কেবল চোখের জলে বুঝি দেখিতে দিতেছে না; সাবধানে চক্ষু মুছিল, কিন্তু জল শুখাইল না—বাঁধ-ভাঙ্গিয়া যেন দ্বিগুণ বহিল।

পদ্ম সে দিন কিছু খাইতে পারিল না,—ক্ষুদিরামের সঙ্গে ক্ষুধাতৃষ্ণাও বুঝি বিদেশে গিয়াছিল। দুই দিন পদ্ম মাছ বেচিতে গেল না।

পদ্ম কি ইহাতেই ক্ষান্ত? ডাক-হরকরা যখনই গ্রামে আইসে, পদ্ম তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া ছাড়ে না। পত্রের প্রত্যাশা পদ্মের ছিল না; পদ্ম জানিত যে বড়-লোকের এবং ভদ্রলোকেরই পত্র আইসে। তা, নাই বা আসিল পত্র, পত্রবাহক ত আইসে,—সে ত ক্ষুদিরামকে দেখিতে পায়, তাহার কুশল ত বলিতে পারিবে। তাই পদ্ম সেই পত্রবাহকের সঙ্গে দেখা করে, পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করে, কখনও বা তিরস্কৃত হয়, কখন পত্রবাহক তাহার পরিতোষের জন্য বলে, "ভাল আছে"—তাহাতেই পদ্ম স্বর্গ পায়।

এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—ের কর ছাই! দেখ ত কমলিনি,—আমার চোখে বুঝি কি পড়িল।

যেমন কথা; তেমনি কাজ। সেই যে ক্ষুদিরাম গিয়াছিলেন, তাহার পর তত্ত্ব নাই, বার্ত্তা নাই, চিঠি নাই, পত্র নাই, একেবারে বি-এ-পাস করিয়া বিদ্বান হইয়া ক্ষুদিরাম বাড়ী আসিলেন; কিন্তু বাড়ী ত নয়, ঠেঙ্গার বাড়ী। গৃহ ত নয়, গ্রহ। তবু এক উপগ্রহের কথা এখনও বলি নাই। এইবার বলি না কেন?

বাড়ী আসিবার সময়ে এক বিষম-সমস্যা ক্ষুদিরামের হৃদয়ে উদয় হয়। সমস্যা এই যে "মাকে প্রণাম করি কি না?"

ক্ষুদিরাম বিতর্ক করিতেছেন, প্রণাম, পদার্থটা মন্দ বলা যায় না, উপযুক্ত-পাত্র হইলে প্রণাম করাই বরং উচিত। কিন্তু আমাদের প্রণাম করিবার প্রণালীটা বড়ই বিশ্রী,—ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কোনমতেই তেমন করিয়া প্রণাম করা যায় না। পাছা উচু করিয়া, ঘাড় নীচু করিয়া, দুই হাতের ফাঁকে মাথাটা গলাইয়া, পায়ের ভিতর দিয়া পিছন-দিকে পৃথিবী দর্শন না করিলে ত প্রণাম করা যায় না;—একবার সেই সঙের মতন মূর্ত্তিখানা মনে কর দেখি। যথার্থ বল দেখি, লজ্জা করে কি না? ভাবো, সেই সময়ে এক জন সাহেব সেইখানে উপস্থিত! উঃ! কি ভয়ানক! মাথা কাটিয়া ফেলিলেও অমনতর প্রণাম করা যায় না। সাহেবেরাও ত প্রণাম করে।—কেমন বিনয় করিয়া, হাসি হাসি মুখে, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর সহিত মাথা নামাইয়া, মুখে "হাডু-ডুডু" * বলিয়া পরস্পরের যে করমর্দ্দন করে, সেও ত প্রণাম। প্রণাম, একপ্রকার প্রেমসম্ভাষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমরাও সেইরূপ না করিব কেন? না হয়, আমাদের ভিন্ন ভাষা বলিয়া "হাডুডুডু"র বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করিলেই হয়। কোন প্রকারে অন্তরের আত্মীয়তা প্রকাশ হইলেই হইল।

ক্ষুদিরামের বিতর্ক চলিতে লাগিল;—আমাদের সমাজে কতকগুলা বদ্‌খৎ নিয়ম

---

* "হাডুডুডু"—(Anglice) How d'yo do.

আছে, তাহা জানি। সে নিয়ম অনুসারে সমানে সমানে যেমন সম্ভাষণ, গুরু-লঘুর সম্ভাষণ তাহা হইতে অন্যরূপ। কিন্তু এই যে গুরু-লঘুর ভেদ, ইহা স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম;—ছেলেবেলা মায়ের মাথায় চড়িলেও দোষ নাই, অথচ বড় হইলে মায়ের পায়ে পা ঠেকিলেও পাপ হইল, ইহা কি প্রাকৃতিক নিয়ম? কখনই না। যাহাই হউক, মাকে ভালবাসা উচিত, মান্য করা উচিত, এ-কথা কে না স্বীকার করে? কবি কাউপর্ মাতার চিত্র উল্লেখে কেমন কাব্যই লিখিয়াছেন। এমন কবিতা কত-শত আছে, যাহা পাঠ করিতেও রোমাঞ্চ হয়। আমরাই কি মাতাকে ভক্তি করিতে চাহি না? তাহা নহে। তবে (Abstract) মাতাকে—অর্থাৎ যে সকল গুণের সমবায় লইয়াই মাতৃত্ব, সেই গুণসমষ্টির মূর্তিরূপা মাতাকে—আন্তরিক প্রীতি করা এক পদার্থ আর (Concrete) মাতাকে—অর্থাৎ অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা-শোণিতবিশিষ্ট মানুষী-মাতাকে—শরীর বিকৃত করিয়া প্রণাম করা আর এক পদার্থ। এমন স্থলে, তেমন প্রণাম না-ই বা করিলাম।

ক্ষুদিরাম যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং মাতাকে দর্শন দিলেন, তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিতর্কের শেষ হয় নাই। সেই জন্যই প্রণাম করা হইল না। মাকে প্রণাম করিব না, এমন প্রতিজ্ঞা তিনি করেন নাই; প্রণাম করা অবৈধ, তাহাও অবধারণ করেন নাই। তবে তখন পর্য্যন্ত প্রণামের প্রণালী সম্বন্ধে না-কি কোন মীমাংসাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। যুক্তির দ্বারা মীমাংসা না করিয়া হঠাৎ একটা কর্ম্ম করিয়া ফেলিলে বিবেকশক্তির কাছে জবাবদিহি ত করিতে হইবে?

চুলোয় যাক্। ক্ষুদিরাম প্রণাম করিলেন না। পদ্ম তাহা লক্ষ্যই করিল না। অনেক দিন পরে ছেলে কোলে পাইয়া, মা, ক্ষুদিরামকে ছাড়িয়া দিল না, রাত্রিতে আপন নিকটেই রাখিল। ক্ষুদিরামকে খাইতে যাহা দিল, ক্ষুদিরাম তাহা খাইতে পারিল না; শুইতে বলায় ক্ষুদিরাম শুইল, কিন্তু সমস্ত রাত্রিতে তাহার নিদ্রা আসিল না। একখানি নূতন মাদুর যত্নের সহিত তাকের উপর তোলা ছিল; সে মাদুরেও ক্ষুদিরামের নিদ্রা আসিল না।

ক্ষুদিরাম! এক ডেলা আফিম্ খাইতে পার নাই? তাহা হইলে তোমারও যন্ত্রণা হইত না, আমারও যন্ত্রণা হইত না।

পর-দিন প্রত্যূষে ক্ষুদিরাম ভদ্র-লোকেদের পাড়ায় বেড়াইতে গেলেন,—ভয়, পাছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়।

পাড়াগাঁয়ে আবার ভদ্রপল্লী। ভদ্রলোকই নাই, ভদ্র-পল্লী হইবে কোথা হইতে? যাহার যাহার বাড়ী ক্ষুদিরাম গেলেন, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিল, তত্ত্ব-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু বিছানায় কেহ বসিতে বলিল না। ক্ষুদিরামও

কোথাও বসিলেন না;—সাহস হইল না?—সাহস হইবে না কেন? গোঁয়ার সঙ্গে তিনি খুঁসি লড়িতে পারেন। অভিমান হইল?—তাহাও নহে, মুর্খের কাছে কিসের অভিমান? ঘৃণা হইল, দুঃখ হইল, করুণা হইল! কু-সংস্কার, কু-ব্যবহার, কু-শিক্ষা দেখিলে যাহা হয়, তাহাই হইল।

তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্ষুদিরাম গ্রাম্য-ইস্কুলের মাষ্টার বাবুর বাসায় বেড়াইতে গেলেন। যাঁহার কাছে তাঁহার বিদ্যারম্ভ, সে মাষ্টার এখন নাই। গোয়াড়ীর-কাছে বাড়ী, এম্‌,-এ,-ফেল, মাইনে-পান-বাইশ-টাকা, রসীদে-লেখেন-পঁচিশ, রাশি-নাম নসীরাম নাথ, ডাক-নাম নসী বাবু—তিনিই এখন মাষ্টার! আলাপ-পরিচয় আগে ছিল না, তবে উভয়েরই শব্দ-পরিচয় পরস্পর জানা ছিল, আজ কেবল চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন। আলাপ-পরিচয় হইল, সুখ-দুঃখের অনেক কথাই হইল, দেশের দুর্দ্দশার সমালোচন হইল, এ-বেলা এইখানেই ক্ষুদিরামের আহার হইল.

মধ্যাহ্নে বিদ্যালয় পরিদর্শন, বালকদের পরীক্ষা, ছেলেদের পরস্পর টেপাটিপি, ক্ষুদিরামের আত্মগৌরবের অনুভব এবং ক্ষুদিরামের সম্মানার্থে বিদ্যালয়ে 'অর্দ্ধ-পর্ব্ব' অর্থাৎ হাপ-ইস্কুল।

ক্রোশখানেক তফাৎ কেশবপুরে পোষ্টাপিস। ক্ষুদিরামে আর নসীরামে বিকালে সেইখানে বেড়াইতে গেলেন। উভয়েরই ভারি খাতির। পিওনের একটি পাঁটা ছিল, সেইটি কেবল মারা গেল; রাত্রিতে পাঁটার মাস, সকলে মিলিয়া পোষ্টাপিসেই রাত্রিবাস।

পরদিন বাসি পাঁটাটুকু সাবাড় করিয়া বিকাল বেলায় ক্ষুদিরাম পোষ্টাপিস হইতে প্রস্থান করিলেন, সন্ধ্যার পরে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। এতক্ষণ মাঠের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন।

ক্ষুদিরামের গতিবিধি সম্বন্ধে পদ্ম আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইয়াছিল, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া আহারাদি করিয়াছিল। ক্ষুদিরামের অভাবে পদ্মের দুঃখ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদিরাম এখন মান্যগণ্য হইয়াছে, বুঝিয়া মনকে সহজেই প্রবোধ দিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য ক্ষুদিরাম ফিরিয়া আসিলে, পদ্ম বলিল—"হেঁ বাবা, এমনি কোরে নি-উদ্দেশ হোয়ে কি যেতে হয়? কত খুঁজে খুঁজে য্যাখন জান্‌লাম যে, তুমি মাষ্টে-বাবুর বাড়ী গিয়েলে, আবার বেইকেলে পোস্ত-বাবুর কাছে যাবা, ত্যাখন্ কোল্‌জেয় বাতাস নাগ্‌লো। তা বাবা, তুই কি এমন বড়লোক হোয়েচ? মা রক্ষে-কালী তোরে বাঁচিয়ে রাকুন, এদ্দিনে আমার সকল দুঃখু ঘুচলো। একবার মনে কোরেলাম, বলি ভদ্দরলোকের কাছে আমার ক্ষুদিরাম বোস্‌তে দাঁড়াতে শিখেচে, [illegible] একবার দেখিই আসি। আবার মনে কল্‌লাম, বলি না, তা যাবো না, ছেলের [illegible] হয়,—মনে—"

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"তোমার কি সে বোধ আছে না কি? তা হোলে এখনো মাচ ব্যাচো কেন?"

পদ্ম। "না বাবা, অমন কথা মুখে আনতে নেই, মাচই আমাদের লক্ষ্মী। মাচ না হোলে তোমায় মানুষ কত্তাম কি দিয়ে, চাঁদ?"

ক্ষুদিরাম দেখিলেন, বৃথা বিতণ্ডায় লাভ নাই। একে মেয়ে-মানুষ, তায় মূর্খ—তাকে বুঝাইবার ক্ষমতা তাঁহার হইয়া উঠিবে না। তখন, একেবারে, কল্য কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিলেন। না, প্রস্তাব নয়, প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। মায়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"সে-কি-রে বাবা, কাল্ যাবি কি-রে? তা কি বোল্‌তে আছে? অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। কত-কাল পরে তোমার চাঁদমুখ দেখলাম, দেখা দিতে না-দিতে তুই চোলে যাবি?"

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"তুমি মিছে জেদ্ কোচ্চো। আমার মোটেই থাকবার যো নেই, সেখানে কত কাজ নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে!"

পদ্ম। "তোমার, বাবা, কত কাজ। তা হোক কাজ নষ্ট, আমি এখন দশ-দিন যেতে দেবো না। আমার কি কাজ নেই, ক্ষুদিরাম? একটী কোনে দেখে রেখেচি, তারা দেখ্‌তে আস্‌বে; পরশুই বোলে পেটিয়েচি যে, ক্ষুদিরাম ত বেশি দিন বাড়ী থাক্‌তে পার্‌বে না, বিয়ে দিতে হয় ত এই বেলা দেখে যেতে বোলো। তারা বলেচে আজ মঙ্গলবার আজ ত হবে না, কাল বুধ, পরশু লক্ষ্মীবার, তার পর দিন শুক্কুরবারে, তারা আস্‌বে, তাই বোলেচে। দিব্বি বউটি হবে, আমি দেখে এয়েচি কি-না? এখন, দাগর ছোঁড়াটি হয়েচ, বউ না হলে কি সাজে? আমি বা আর একা পারবো কেন? তাই মনে করেচি, বলি সাড়ে ন-গণ্ডা টাকা আছে, ক্ষুদিরামের বিয়ে দিয়ে, বউ এনে, সেই টাকা কড়া নিয়ে—আরো দু-পাঁচ টাকা হবে—তাই নিয়ে একবার শ্রীক্ষেত্তর কোরে আস্‌বো। কোন্ কালেই বা কি হবে?"

যদি বা ক্ষুদিরাম কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া দুই এক দিন থাকিতেন, বিবাহের কথা শুনিয়া তাঁহার হাড়ের ভিতরের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। মা এক মৎস্যগন্ধা, তাহাতেই অস্থির; আবার মৎস্যগন্ধা পত্নী লইয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? জাতির জন্য তত আইসে যায় না, কিন্তু মৎস্য ব্যবসায়ের সম্পর্কে থাকিতে, ক্ষুদিরাম কোন মতেই প্রস্তুত নহেন। অতএব মায়ের কথায় বাধা দিয়া ক্ষুদিরাম বলিলেন—"আমায় ডিপুটীর পরীক্ষা দিতে হবে, এখন কি বোসে থাকতে পারি?"

ডিপুটী শুনিয়া পদ্ম অবাক্ হইল। এক মুহূর্ত্ত সামলাইয়া বলিল—"ডিবুটী? এই যে, চু ও জাজায় হাকিম আচে বলে, সেই ডিবুটী নাকি? তা হেঁ ক্ষুদিরাম, তুমি কি

দিবুসী হোতে পার্‌বা নাকি? তত নেকা-পড়া শিকেচ না কি?—" পদ্মর মুখে আর কথা সরিল না, চক্ষে কেবল জল আসিল।

তাহার পর পদ্ম সমস্ত রাত্রিই কথা কহিল। ক্ষুদিরামকে কত বুঝাইল, কত সাধ্য-সাধনা করিল, কত কাঁদিল। কিন্তু ক্ষুদিরাম কিছুতেই মানিলেন না। রাত্রিতে দুই জনেরই নিদ্রা হইল না, যেহেতু পদ্ম কেবল কান্দিতে লাগিল, আর সেই ফোঁশ ফোঁশানিতে ক্ষুদিরামেরও নিদ্রা আসিতে পারিল না। আর, শয্যা ত সেই মাদুর।

পরদিন প্রত্যুষে, ক্ষুদিরাম কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

৮। রহস্য—অল্পের ভিতর অধিক রস।

ক্ষুদিরাম কি সূত্রে কলিকাতায়, তাহা ত বুঝিলে? কিন্তু কলিকাতায় কেন? কলিকাতায় করেন কি? কলিকাতায় চলে কিসে?

কাম-কলানিধি আমার এই কর্মালিনী! কিসেই বা কৌতূহল নাই? এ যে দেখিতেছি, মশাটি পর্যন্ত পাশ কাটাইয়া পলাইতে পায় না।

পর-চর্চ্চা কি ভাল? পড়্‌শীর ছাচতলায় দিন রাত্রি আড়িপাতিয়া থাকা কি উচিত? যাহার যেমন পর্দ্দা, তাহার তেমন পসার; পর্দ্দার পাশ ফাঁক করিয়া উঁকি মারিলে, কয় জনের ইজ্জত থাকে বল দেখি? "অন্তে পরে কা কথা," তোমার আমারই থাকে কি?

গুমরে চলে চৌদ্দ আনা। ভাঙ্গিয়া দেখ, কত কপিত্থই গজভুক্ত। পোড়াইয়া দেখ, কত গহনাই গিল্টি হইবে। বিনয় করিয়া বলিতেছি, সকল হাঁড়ি হাটের মাঝে ভাঙ্গিব না। ক্ষুদিরামের সকল খবর জিজ্ঞাসা করিও না।

এমন কথা বলিতেছি না যে, ক্ষুদিরামের কোন খুঁত আছে। খুঁত থাকুক আর না থাকুক, তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি? আমারই বা প্রয়োজন কি?

তুমি ত জান যে, ক্ষুদিরাম ছেলে ভাল। এল-এ তেও জলপানি পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর এখন?

এখন কি, তাহা আমি জানি না; জানিলেও বলিব না। ক্ষুদিরামের চেহারা ভাল, তাহা তুমিও জান, আমিও জানি; একথা বলাই অনাবশ্যক। ক্ষুদিরামের ডেপুটী হইবার গল্প, গল্পও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। কত তেড়াকাস্ত মহ-মূর্খও তাহা পর্যন্ত পাইতেছে; ক্ষুদিরাম—ডিপুটী হওয়া কোন্ বিচিত্র? কত দিগ্‌গজ বিদ্বান্ পথে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; ডিপুটী না হইলেও ত ক্ষুদিরামের অপমান নাই।

যাহাই হউক, ক্ষুদিরাম এখন কলিকাতাতেই আছেন। সকাল সন্ধ্যা বেড়াইতে যান, পাঁচ সাত ঘণ্টা বাহিরে থাকেন, বাকি সময় প্রায় বাসাতেই কাটে। মনেরও উদ্বেগ দেখি না, টাকা-কড়িরও টানাটানি দেখি না। স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, ইহাই দেখিতে পাই।

সকালে বিকালে কোথায় বেড়াইতে যান, তাহা তুমিই কেন বুঝিয়া লও না?

ইসারায় যদি বলিতে দাও, তাহা হইলে আমি বলি—ক্ষুদিরাম বোধ হয়, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে যান না।

৯। দুর্ব্বোধ না নির্ব্বোধ।

ক্ষুদিরাম এবং ভুসীভোজন উপরের ঘরে বসিয়া আছেন। চল একবার তাঁহাদের কাছে যাই।

উপন্যাসে, কথা পাড়িবার প্রণালী এইপ্রকার; কিন্তু ইহাতে দুটী গোল আছে।

প্রথম গোল,—আমার এই গল্প উপন্যাস নহে, গাল-গল্প। শর্ম্মার সঙ্গে সম্মানিনার অর্থাৎ কমলিনীর বৈঠকে আলাপ। উপন্যাসের রীতি অবলম্বন করিলে আমার চলিবে কেন?

দ্বিতীয় গোলই গণ্ডগোল। কমলিনী একে লজ্জাবতী, তায় যুবতী; ক্ষুদিরাম এবং ভুসী-বাবু উভয়েই পুরুষ মানুষ, বয়সেও কেহ বুড়া নহে। আমি যেন বলিলাম—কমলিনী, চল। কমলিনী যান কেমন করিয়া? আর যদি কমলিনীই যাইতে সম্মত হন, আমি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে একযোড়া যোয়ান মানুষের সম্মুখে হাজির করিয়া দিই? যাহা পারিব না তাহা স্পষ্ট বলাই ভাল।

স্ত্রী-স্বাধীনতায় আমার আপত্তি নাই; বরং প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু স্ত্রীটী যদি পরের হয়, তবেই; নচেৎ নয়। অন্যের কাঁটাল পাই, অন্যের মাথা পাই, তাহা হইলে মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া আমিও খাইতে পারি। একা আমিই বা কেন? আমার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদেরও ঐ মত।

পরের বেলা স্বাধীনতার পক্ষ, নিজের বেলা বিপক্ষ—ইহা বলিলে উদারতার পরিচয় দেওয়া হয় না, সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার বড় বিষম এক উপসর্গ আছে, তাহার কি? গিন্নীটীর হাতে স্বাধীনতা গেলে, কর্ত্তাটির স্বাধীনতায় যে বাধা পড়িবে। আবার উভয়েই যদি অপ্রতিহত-গতি হয়, তাহা হইলে লাভের মধ্যে উভয়কেই উভয়ের পশ্চাতে ফেউ-ফেউ করিয়া ফিরিতে হইবে।

স্বাধীনতাই হউক, আর অন্য কিছুই হউক, সকল বিষয়েই খুব পাকা-লোকের দরকার;—সংসারে তত পাকা-লোক মেলা ভার। বানরকে কলা দিলে খোসা সমেত

খাইয়া ফেলে। ছেলে মানুষের হাতে তেলের ভাঁড় দাও, তেলেরও ছড়াছড়ি, ভাঁড়েরও গড়াগড়ি।

কমলিনী আমাকে কহিলেন,—হে দগ্ধানন! তুমি যে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিলে? আগা নাই; গোড়া নাই; স্থান নাই, অস্থান নাই—ক্রমাগতই কেবল বখামি করিতেছ। পার যদি ত গল্প পাড়, না পারত ক্ষান্ত হও। বেধড়ক বখামি ভাল লাগিবে কেন?

আমি কহিলাম—কমলিনি! কোপ করিও না, আমার কৈফিয়ৎ আছে। ভাল লাগুক, এই মনে করিয়া আমি সর্ব্বদা আমার লৌহ-লেখনী চালাই না। ভাল লাগে, ভালই; মন্দ লাগে, তাহাও ভাল। লাগে ত? লাগিলেই আমার শ্রম সফল হয়, আজিও ইহা বুঝিতে পার নাই? তুমি যাহা বখামি মনে করিতেছ, তাহাও বখামি নয়,—কাজের কথা। গল্পের সঙ্গে লাগ্‌তা নাই, তাহাও মনে করিও না;—ক্ষুদিরামের সঙ্গে ভুসীবাবুর ঐ কথাই হইতেছিল, ঐ স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়াই আলাপ হইতেছিল। ভুসী-বাবু এই কথা বলিলেন, তাহাতে ক্ষুদিরাম এই উত্তর দিলেন, আবার ভুসী-বাবু এই প্রত্যুত্তর করিলেন—ইত্যাদি রূপে নাটকের মত কথাগুলি না সাজাইয়া, তাঁহাদের বিচারের সার মর্ম্মই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। বেধড়ক বখামি, কি গ্রন্থেরই গাঁথুনি, আগে বুঝিয়া বলিলে কি ভাল হয় না?

রঙ্গোময়ি! চাঞ্চল্যে রসভঙ্গ করিও না। ভিক্ষা করিতেছি, কমলিনি! একটু ধৈর্য্য শিক্ষা কর। সবুরেই মেওয়া ফলে, ধৈর্য্যে তোমারও সুখ, আমারও সুখ।

দুইজনে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, হেনকালে ঝী তামাক লইয়া উপস্থিত। ঝীর বাঁ-হাতে কলিকা, তাহার ভিতরে তামাক, তামাকের উপর আগুন, আগুনের আধ-হাত ানেক উর্দ্ধে ঝীর ফুঁ-ফুলান মুখ,—হুঁকোটি ঝীর ডান-হাতে ঝুলিতেছে। আচ্ছা,—ঁকোর মুখে ধুঁয়া কেন?

হুঁকোর মুখে ধুঁয়া কেন?—সে কথায় তোমার কাজ কি? তুমিত ও হুঁকোয় তামাক খাইবে না। বলে,—

> "যার বিয়ে তার মনে নাই,
> পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই।"

তবে ক্ষুদিরাম যদি জিজ্ঞাসা করিত যে—"হাঁ ঝী, হুঁকোর মুখে ধুঁয়া কেন?"—ঝীও তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তর দিত—"বাসাড়ের হুঁকোয় এমন হয়।" জবাব গাঁথা না থাকিলে কি হুঁকোর ধুঁয়া আসে?

ফুঁ-দেওয়া সমাপ্ত করিয়া কলিকাটি ধরিয়া, হুঁকোর উপর বসাইয়া, ডান-হাতে করিয়া হুঁকোটি ধরিয়া বাঁ-হাতে হুঁকোর মুখ মুছাইয়া—সদ্য না কি জল—ফিরান হইয়াছে—ঝী, ক্ষুদিরামের মুখের কাছে হুঁকোটি ধরিল।

সুতরাং ঝীর মুখের উপর ক্ষুদিরামের দৃষ্টি পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া ঝীর চক্ষুও ছল্‌ছল করিয়া উঠিল। ঝীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া, ক্ষুদিরাম বলিলেন,—

"তুমি কিছু মনে করো না, ঝী; বামুনটা ওম্নি গোঁয়ার, তা ত তুমি জান?"

কাজেকাজেই ঝীকে কান্দিতে হইল। দেবতার বরই হউক, আর দৈব-বিদ্যাই হউক, কান্নাটুকু কামিনীকুলের স্বভাবসিদ্ধ! শুধু ঝী কেন? কোন সুন্দরীকেই ক্রন্দনের বিদ্যা সাধিয়া আদায় করিতে হয় নাই। আজ্ঞাপালনে, স্বামীরও বরং শৈথিল্য আছে; কিন্তু চোখের জল—চাহিবা মাত্র।

ঝী কান্দিয়া বলিল—গোঁয়ার আছে ও আপনার আছে। আমার কি? ও কে যে, আমায় অমনতর কোরে যা-না তাই বোল্‌বে? আমি কি ওর খাই, না ওর পরি যে, ও আমায় কথা কইবে?"

ভুসী-বাবু গম্ভীর-ভাবে বলিলেন—"ছাদ্দাখ ঝী; অশিক্ষিত ব্যক্তির কথা শুনে রাগ করা কখনও উচিত হয় না,—"

ভুসীবাবুর বাক্য শেষ না-হইতেই ঝী আবার আরম্ভ করিয়া দিল,—"আমি তক্ষুণি বাবু, বোলেছিলুম যে, ভাল-মন্দ পাঁচটা পাঁচ রকমের লোক আছে, তোমাদের হেথা থাকা আমার পোষাবে না, তা—"

ক্ষুদিরাম (ব্যস্ত হইয়া)—"সে কি কথা? বামুনঠাকুর কোথাকার কে যে, তার কথা শুনে তুমি রাগ কোরে যাবে? দোবো অখন ওরে শাসন কোরে, তুমি—"

ভুসী।—"তার স্বভাব যখন মন্দই দেখা যাচ্ছে, তখন বিদায় কোরেই কেন দেওয়া হোক্ না? আমি বিবেচনা করি যে—"

ঝী।—"হ্যা, আমার স্বভাব মন্দ বৈ কি? তা দাও না আমায় বিদেয় কোরে? আমি থাক্‌লে আমার খাবার ভাবনা কি?—"

ভুসী। (হাসিয়া)—"জগদীশ! আমি সেই কাপুরুষের স্বভাবের কথা বোল্‌ছিলেম' জগদীশ! আমি কি তোমায় দোষ দিতে পারি ঝী? আমি প্রস্তাব কোচ্ছিলাম যে পাকের কার্য্য তোমার দ্বারা অনায়াসে নির্ব্বাহ হোতে পারে, সেই ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত কল্লিই বিবাদেরও সম্ভাবনা থাকে না, সকল দিকেই সুন্দর হয়। জগদীশ! তুমি কি ভ্রমেই পড়েছিলে ঝী।"

ঝীরও একটু হাসি পাইল, কিন্তু ঝী হাসিল না; ক্ষুদিরাম কথা কহিতে আরম্ভ করায়, ঝী সেই সাবেক সুর বজায় করিবার সুযোগ পাইল।

ক্ষুদিরাম কহিলেন,—"বামুনটা ভারি বেয়াড়া, ওরে তাড়ানই উচিত। কিন্তু কথাটা কি জানেন, একালে গরীব-দুঃখী লোকের কাজ কর্ম্ম যোটা বড়ই কঠিন ব্যাপার হোয়েচে তাই ভাবি, বলি লোকটাকে তাড়িয়ে দোবো, কোথায় গিয়ে কষ্ট পাবে—"

চুরি করে না, অথচ দেড়-টাকা মাহিয়ানা, এমন বামুনঠাকুর এ রাজ্যে অধিক মিলে না, ক্ষুদিরাম একথা বলা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ভুসী।—"দয়া করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আমাদের বিবেক বোল্‌চে যে, দয়ার পাত্র কে, দয়ার অপাত্রই বা কে, তা বিবেচনা করা উচিত। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না কোল্লে, পাপের প্রশ্রয় হয়, আলস্যের প্রশ্রয় হয়।—"

ঝী তখন সামলাইয়াছে। বলিল—"তোমাদের যা কোত্তে হয়, কোরো অখন, আমায় বাবু বিদেয় দাও, আমি থাকব না।" ঝী তখন দুই হস্তে অঞ্চলের প্রান্ত ধরিয়া সুতাগুলি ফাঁক করিতেছিল।

ভুসী।—"ঝী, তুমি রন্ধন কোত্তে পারো?"

এবারে ঝী সামলাইতে পারিল না। ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। চুপি চুপি বলিল—"মিন্‌সের এত রঙ্গও এসে?"

ক্ষুদিরাম।—পাক করা বড় পরিশ্রমের কাজ। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকে পাক করে বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, এটা বড়ই কুপ্রথা।

ভুসী।—"ঝী, তুমি কাজ করোগে যাও। ক্ষুদিরাম বাবুকে ত্যাগ করো না; এমন সৎসংসর্গ তুমি আর কোথাও পাবে না; জগদীশ।"

ক্ষুদিরাম।—"ঝী, দু-আনার জলখাবার নিয়ে এস দেখি, বেশ গরম কচুরি, আর আলুর দম-টম যা পাও—বেশ ভাল জলখাবার নিয়ে এস।" এই বলিয়া টেবিলের দেরাজ থেকে একটী দু-আনী বাহির করিয়া, ঝীর হাতে দিলেন। ঝীও রাগ রোষ রাখিয়া দিয়া, জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের কিপ্রকার ব্যবহার করা উচিত, ক্ষুদিরামে আর ভুসী-ভোজনে তখন সেই কথাই চলিতে লাগিল।

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"স্ত্রীলোক যেন এ দেশে ক্রীতদাস।"

ভুসীভোজন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কেবল বলিলেন "জগদীশ।"

ক্ষুদি।—"এই দেখুন না, এক অবরোধ প্রণালীই কি ভয়ঙ্কর। স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাইরে যেতে পায় না; পাঁচীরের ঘেরার ভিতরে থেকে মানুষ ক'দিন বাঁচে? ব্যায়ামের ত কথাই নাই, বিশুদ্ধ-বায়ু একটু, তাও শরীরে লাগাতে পায় না। অথচ বাতাস আর ব্যায়ামই হোলো গিয়ে মানুষের জীবন বোল্লেই হয়।"

এখন যদি আমি বলি যে, ক্ষুদিরামের মা পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে হাটে-বাজারে মৎস্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়; তাহা হইলে, ঐ ভুসী বাবু—অত যে ধার্ম্মিক, অমন সত্য-ভক্ত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, দেশহিতৈষী ভুসী বাবু—উনিই ক্ষুদিরামকে ভজাইয়া উকীল কৌন্সুলী খাড়া করিয়া, ক্ষুদিরামকে দিয়া আমার নামে পুলীশ-আদালতে মানহানির নালিশ করাইয়া দিবেন। ক্ষুদিরামের মা মাছ বেচে, তাহাতে

মানহানি হয় না; আর যত মানহানি, আমি সেই কথা বলাতে। তুমি হয় ত বলিবে—করিলই বা নালিশ, সত্য কথা প্রমাণ করাইয়া দিলেই হইবে।—সত্য কথা হইলেই বুঝি প্রমাণ করিতে পারা যায়? প্রমাণ করা কি সোজা কথা গা? যদি প্রমাণ হইল, তাহাতেই কি সহজে নিস্তার আছে নাকি? তখন কৌঁসুলী চাচা ফেচাং তুলিবেন যে, ক্ষুদিরামের মাতার মৎস্য বিক্রয়ের সমাচারে সাধারণের কি প্রয়োজন আছে? সাধারণের তাহাতে ইষ্টই বা কি আছে?—অবরোধ, অপকার, হেন তেন বলিয়া, ক্ষুদিরাম বিশ্বাস, গোটা দেশটার দুর্নাম করিতেছেন, আর কুড়ি-বুড়ি ন্যাকামা মিথ্যা কথা বলিয়া, কচি-কচি ছেলেগুলির মাথা খাইবার উদ্‌যোগে আছেন,—তাহাতে দেশের ইষ্টানিষ্ট দেখিতে হইবে না, যত ইষ্টানিষ্ট আমার ঐ সত্য কথাটিতে। তাহার উপর নালিশ হইলেই আমার খেজালত খরচা, আর কাজের ক্ষতি। কাজ নাই কোন কথায়, ক্ষুদিরাম যাহা বলিতে হয় বলুন।

ভুসীভোজন একটু হাসিয়া বলিলেন—"হি হি—তথাপি আপনি—হি হি—স্ত্রী-স্বাধীনতার সাপক্ষে—হি হি—সম্পূর্ণরূপে মত দেন না—হি হি। জগদীশ্বর। হি হি।"

ক্ষুদি। "সে স্বতন্ত্র কথা। অবরোধ আর স্ত্রী-স্বাধীনতা, কথাটা বুঝলেন না?—এই ভাবুন, মিল—জনষ্টুয়ার্টমিল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের অধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েচেন, কিন্তু সকলকে কি বুঝুতে পেরেচেন? ইংল্যাণ্ডে অবরোধ নাই, অথচ স্ত্রীস্বাধীনতাও যে আছে, তা বলা যায় না। ও কি জানেন? মতভেদ সকল বিষয়েই হোতে পারে, তবে মতভেদের সীমা আছে,—তবে কি না—"

ভুসী। "তিন বিষয়ে লক্ষ্য কোত্তে হবে। প্রথম, ঈশ্বরের অভিপ্রায়, দ্বিতীয় বিবেক, তৃতীয় নীতি, চতুর্থ যুক্তি। প্রত্যেকের উপরেই প্রত্যেকে নির্ভর করে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি? না, স্বাধীনতা। বিবেক তাতে কি বলে? সেই স্বাধীনতাই বলে। যুক্তির দ্বারাও তাই আসচে, কেননা পুরুষের আত্মাতে যেমন স্ফূর্ত্তির আবশ্যক স্ত্রীলোকের আত্মাতেও সেইরূপ স্ফূর্ত্তির আবশ্যক, তবে, যখন আত্মায় আত্মায় পবিত্র মিলন হোয়ে যায়" ভুসীভোজন এইখানে বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী অঙ্কুশের ন্যায় আটকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া, বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, তাহা আর বুঝা গেল না। বুঝা গেল, কেবল একটি নিশ্বাসের সঙ্গে "জগদীশ।"

ক্ষুদি। "কিন্তু, নীতি? নীতিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন।"

ভুসী। "হাঁ, আমিও তাহা স্বীকার করি। সেই জন্য সুনীতি, আর কুনীতির প্রভেদ করা আবশ্যক। ইহাকেই নীতির সংস্কার বলিতে হয়।"

ক্ষুদি। "কথাগুলি বড় শক্ত, এই দেখুন, এক ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমি ত কিছুই ঠিক কোত্তে পারি নে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানা যাবে কিসে?"

ভুসী। "জগদীশ। ক্ষুদিরাম বাবু, ঈশ্বরের অভিপ্রায়—হি হি—জানা শক্তও বটে—ই হি—জানা সহজও খুব। বিবেক আছে কেন?—হি হি।"

ক্ষুদি। "পরিষ্কার হোলো না।"

ভুসী। "তা হবে না। আত্মায় মলিনতা থাকলে অনুতাপের দ্বারা আর উপাসনার দ্বারা—হি হি—যখন চিত্তের আত্মপ্রসাদ হয়, এবং পবিত্র ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়, হি হি—তা আপনি একটু অনাস্থা করেন কি না সেই জন্যই জগদীশ!"

ক্ষুদি। পষ্ট ধারণা না হোলে কি আস্থা হয়? এই ধরুন না স্ত্রীলোকেরই—

ভুসী। "ধরুন, তাই ধরুন। বালিকার বিবাহ,—কে না স্বীকার করে যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়? যুবতীর বৈধব্য —ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কখনই হোতে পারে না।

ক্ষুদি। "তাই ত বুঝতে চাই।"

ভুসী। "বুঝুন। কুৎসিত সমাজের কুৎসিত আচরণ একবার ভুলে যান্। তাতে কি হলো? না, পাশব প্রকৃতির চরিতার্থ সাধন করা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু সমাজ কি কোচ্চে? প্রচ্ছন্ন-পাপের স্রোতে ভারতবর্ষ কি ভেসে যাচ্ছে না? ...নের বছরের বালিকা সন্তান প্রসব কোরে, বুড়ীর মত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাচ্ছে না? বাইশ বছরের যুবতী বিধবা হোচ্ছে না? মরুভূমে কমল ফুটেচে, তার পরিমল কোথায় দিয়ে চোলে যাচ্ছে না? এ দৃশ্য কি সহ্য হয়? ক্ষুদিরাম বাবু, আপনিই বলুন, সমাজের এই সব পাশব-প্রকৃতির ঘোরতর পাশবপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত, কি উচিত নয়?"

ক্ষুদি।—"বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটু গোল আছে, তা আপনাকে অনেক বার বোলেচি। আমার কেমন মনে হয় যে, যুবতী বিধবাদের বিবাহ হবার আগে, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার কেমন সন্দেহ হয়। মাফ্ কোরবেন, কিন্তু যা মনে হয়, তা আগেও বোলেচি, এখনও বল্‌চি।"

ভুসী।—"কখনও কখনও পবিত্র প্রণয় হয়, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ভ্রাতা ভগ্নীদের চরিত্র বিষয়ে, জগদীশ! অধিক কি বোল্‌বো ক্ষুদিরাম বাবু, আমি নিজে দায়ী হোতে প্রস্তুত আছি। বিবেচনা কোরে দেখুন, পাপ আর পুণ্য কেবল প্রবৃত্তি ভেদে বৈ ত নয়। পবিত্র প্রণয় হোলো ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাতে আত্মার তৃপ্তি হয়, সেই জন্যে বিবেকের বিদ্রোহ হয় না, কিন্তু চিত্ত যদি পশুভাবে আক্রান্ত হয়, তাতে আত্মার সম্বন্ধ নাই, দেখুন তা হোলে কি ভয়ানক অবস্থাই ঘটে। নরক ত আর কিছু নয়, ঐ নরক।—এই দেখুন, সে দিন যে, ভগ্নীর কথা বোলছিলেন—"

জলখাবার লইয়া আসিয়া, নীচে একখানি থালা, দুটী গেলাস হাতে করিয়া ঝী যখন সিঁসড়িতে উঠিতেছে, তখন এই সকল কথা হইতেছিল। ঝী সেই জন্য সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করা উচিত বোধ করিল না। বারান্দা পর্য্যন্ত উঠিয়া, উহারই মধ্যে

একপাশে বসিয়া, একটু অন্তরাল হইয়া, ঝী সেই থালায় জলখাবার সাজাইতে লাগিল; আর—আর—"বিধবা ভগ্নীর" কথার কিছুকিছু শুনিতে পাইল বৈ কি?

আড়িপাতিয়া কথা শুনা বড়ই মন্দ। আমার সে দোষ নাই, তা তুমি জান; তোমারও নাই, তাহা আমি জানি। আমাদের পরিচিত লোকের মধ্যে কাহারই বোধ হয় এ দোষ নাই। তবে এত বড় গর্হিত কার্য্য ঝী করে কেন?

ঝীও বাস্তবিক আড়িপাতে নাই। ঘরে কথা হইতেছে, ঝী কাজে আছে, কাণদুটি ত পথে ফেলিয়া আসিতে পারে না?

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"হাঁ, হাঁ, সে দিন বোলছিলেন বটে, তিনি কি এসেচেন? খুব নাকি সুন্দরী তিনি?,,

ভুসী।—"ক্ষুদিরাম বাবু, আপনি রাগ কোর্‌বেন করুন, কিন্তু আমি না বোল্লেও পারি না; আপনার কুসংস্কার দূর করা উচিত। একেবারে আপনাকে বিবাহে সম্মত হোতে বোল্‌চি না, আপনি দেখুন, আলাপ পরিচয় করুন,—"

কথা শেষ না হইতেই জলখাবারের থালা লইয়া ঝী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। থালাখানি বিছানার উপর রাখিয়া দিয়া, সেই ঘরের এক কোণে, ঝী গিয়া পান সাজিতে বসিয়া গেল।

খাবার আনিতে ঝীকে পাঠান হইয়াছে, ভুসী বাবু কি ক্ষুদিরাম কাহারই এ কথা মনে ছিল না। সুতরাং সহসা ঝী প্রবেশ করাতে উভয়েই যেন চমকিয়া উঠিলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ পানে চাহিলেন, তাহার পর দুইজনেই ঝীকে চকিতের ন্যায় দেখিয়া লইলেন, বোধ হইল যেন ঝীর মুখ লাল হইয়াছে।

জলখাবার আনিবার জন্য রৌদ্রে যাইতে আসিতে হইয়াছে, মুখ ত লাল হইতেই পারে।

ক্ষুদিরাম এবং ভুসীভোজনের কথার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। একটু পরে, খাইতে খাইতে, ভুসীভোজন বলিলেন—"নিকেতনে আপনি অনেক দিন যান নাই।"

আদখানা আলু তখন ক্ষুদিরামের গালে। কাজে কাজেই ক্ষুদিরাম কিছু বলিলেন না।

ঝীর কি সর্দ্দি হইয়াছে? পান তৈয়ার করিতে করিতে ঝী কাসিল কেন?

১০। দুশ্চিন্তা ও নিবারণ।

উভয়ের জলযোগ সমাপ্ত হইল।

পাক করা জিনিস্, দোকান হইতে আনিয়াছে ঝী, বিছানায় বসিয়া, এক পাত্রে খাইয়া দুই জনে ভক্ষণ করিলেন। গেলাসে জল খাইয়া, সেই গেলাসের মধ্যে হাত

পুঁছিয়া হাত ধুইলেন, সেই হাত একবার মুখে বুলাইয়া মুখ ধুইলেন। কোঁচার খুঁটে মুখ-হাত মুছিয়া যথারীতি শুদ্ধ হইলেন। ভালই ত, কিন্তু বামুনঠাকুর এই সব দেখিয়া শুনিয়া বড় বিরক্ত হয়।

বামুনঠাকুর বলেন যে, বিছানা হইতে উঠিয়া, পৃথক্ আসনে বসিয়া, শুদ্ধাচার ব্যক্তির প্রস্তুত এবং অজ্ঞাত-অপরিচিত লোকের স্পৃষ্ট নহে, এইরূপ অন্নই ভোজন করা বিহিত; ভোজনান্তে গৃহের বহির্ভাগে গিয়া, দন্ত-মলাদি শোধন করিয়া মুখ এবং হস্তপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

বলিহারি বামুনঠাকুর! এত বিদ্যা না হলে বামুনঠাকুর কি বামুনঠাকুর হয়। এমন বেয়াদব, বেয়াড়া লোকের কি করা উচিত, বল দেখি?

বামুনঠাকুর যদি অশিক্ষিত এবং অসভ্য না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ব্বরের সঙ্গে বিচার ত চলে না। ভুসী বাবু এবং ক্ষুদিরাম, দুই জনেই, দেখ, রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সভা-সমিতিতে সর্ব্বদাই গতি-বিধি করেন, কথাটি পাড়লেই যুক্তির দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া তথ্য-নিরূপণ করেন; তা ছাড়া কষ্টি-পাথরের মত বিবেক ত আছেই,—ইহারা ভাল-মন্দ বুঝেন না, ভাল-মন্দ চিনিলেন বামুনঠাকুর। ইহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে বঙ্গদেশের কপালে এত বিড়ম্বনা কেন?

না চলুক বিচার বামুনঠাকুরের সঙ্গে; তবু, কি জানি কোন্ দিক্ দিয়া কাহার মনে কখন্ কুসংস্কার প্রবেশ করে, দুই-একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। কি বল, কমলিনি?

গোড়াতেই ধর, ক্ষুদিরাম এবং ভুসী বাবুর ব্যবহার বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। বিজ্ঞানে যাহা কিছু আছে, কিম্বা থাকা উচিত, কিম্বা ভবিষ্যতে থাকিবে, তাহার সমস্তই ত তোমারও জানা আছে, আমারও জানা আছে। কৈ, দেখাও দেখি, কোন্ বিজ্ঞানে বারণ আছে? চালাকি করিলে চলিবে না, বিজ্ঞান চাই।

আরও দেখ, আহারেই আত্মীয়তা। ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র যাঁহারা আহারাদি করিয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাদের কতই আত্মীয়; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহাদের আহার-ব্যবহার নাই, ঈশ্বর কি তাঁহাদের পর নহেন? পাড়াগাঁয়ে মাতা-পুত্রে, পতি-পত্নীতে, ভাই-ভগিনীতে এক সঙ্গে আহার করে না, আত্মীয়তাও একবারেই নাই। দেখা দূরের কথা, শুনিতেও পাইবে না যে, পাড়াগাঁয়ে কোন মা আপন ছেলেকে ভালবাসে, কি পতি-পত্নীতে কিছুমাত্র সদ্ভাব আছে, কিম্বা ভাই কোথাও ভগিনীকে স্নেহ করে। যাহা অসম্ভব, তাহ হইবে কেন?

আবার, আহারে বিচার করা অস্বাভাবিক; প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের কথা ছাড়িয়া দাও, চতুষ্পদ গো-গর্দ্দভাদির কথাও ছাড়িয়া দাও, মানুষের সঙ্গে যাহার বিশেষ সাদৃশ্য, সেই বানর-জাতির ব্যবহার দেখ না কেন?

গাছে বসিয়া আছে, গাছেই খাইতেছে; প্রাচীরে, প্রাচীরেই। এক সঙ্গেও খায়, পরস্পরের উচ্ছিষ্টও খায়, যাহার পায়, তাহারই খায়। এইরূপ না করাই ত অস্বাভাবিক। এই যে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা কেন হয়? কেবল, দেশের লোক এক সঙ্গে বসিয়া এক পাতে খায় না বলিয়া। সত্য-নিষ্ঠা, পরোপকার, ইন্দ্রিয়-সংযম, এ সকল সদ্গুণের বিকাশ কোথায় হয়? কেবল যেখানে পাতাপাতি, আর মাখামাখি। কথায় বলে, "এক সানকীর ইয়ার",—শাস্ত্রেও বলে, "অন্নগত প্রাণ"।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, বামুনঠাকুরের বিধান মানিতে হইলে, সময় কত নষ্ট হয়! আমাদের বহুমূল্য সময়, বাজে-কাজে কি নষ্ট করিতে পারি?

"ঝী, একবার তামাক দাও ত?"

ঝী কখন চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই। দুই তিন বার ডাকা হইল, ঝীর সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া গেল না। একটু পরে, ক্ষুদিরামের কাণে-কাণে কি বলিয়া ভুসী বাবুও চলিয়া গেলেন।

খাটের উপর ক্ষুদিরাম একা। সুতরাং হাতের উপর হাত, তাহার উপর মাথা রাখিয়া, মাথার ষোল-আনা এবং পিঠের আধখানা বালিশে স্থাপন করিয়া, পা দুখানি সটান লম্বা করিয়া, চিৎ হইয়া, ক্ষুদিরাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদি কখনও চিন্তাশীল হইতে ইচ্ছা হয়, ঐ রকম করিয়া শুইও। সাবধান! চোখ যেন কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে থাকে। নহিলে, চিন্তা ছুটিবে না, স্বপ্ন আসিবে।

ক্ষুদিরাম কি চিন্তা করিতেছিলেন?

অন্যের সঙ্গে এক-পাতে খাওয়ার দোষ-গুণ চিন্তা করিতেছিলেন, ইহা আর বুঝিতে পার নাই? নহিলে, আমার কি মাথা-ব্যথা পড়িয়াছিল যে, উপরে অত কথা বলিব? এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ছত্র হইতে আহার-ঘটিত যত বিচার আছে, তাহার এক বর্ণও আমার নহে। এমন পরের চিন্তা, নিজের বলিয়া চালাইবার রীতি চিরদিনই সভ্য-সমাজে প্রচলিত আছে। হয় ত, কবুল করিলাম বলিয়া কর্ম্মাঙ্গনীর কাছে দোষী হইব, কিন্তু—আচ্ছা, কাজ নাই কিন্তুতে। দোষী হইলে, পুস্তকে যে শাস্তি লেখে, আমি তাহা লইতে সম্মত আছি।

কিন্তু—এটা সাবেক "কিন্তু" নয়, আর এক "কিন্তু"—চিন্তা এক নহে, চিন্তা অনেক। প্রথমে এক থাকিলেও ক্রমে বহুতর হইয়া পড়ে! গঙ্গা যখন গোমুখী হইতে বাহির হন, তখন গঙ্গাও এক। তাহার পর, কত নদ-নদী আসিয়া মিলিয়া যায়, কত বিল-খালের জল পরিত্রাণ পায়। সাগরসঙ্গম যত সমীপ হয়, গঙ্গাও তত শতমুখী হইতে থাকেন। চিন্তাও সেইরূপ।

ক্ষুদিরামের হৃদয়ের কোন্ ক্ষুদ্র প্রস্রবণ হইতে প্রথমে ঐ খাবার-ভাবনাই বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর কত দিক্ দিয়া কত কথাই উদয় হইল। সে সব কথা

পরিচয় দিব না. পরিচয় দেওয়া উচিত নয়! যাহা রসনাকে দিতে বিশ্বাস হয় না, এমন কত চিন্তা, কত আশা, কত আশঙ্কা, কত কামনা হৃদয়ের মধ্যে লুকান থাকে, হৃদয় খুলিয়া কি দেখাইতে আছে? নিরন্তর অবারিত রাখা যায়, এমন হৃদয় কয়-জনের আছে? অতি অদ্ভুত, অতি নিভৃত-স্থান এই হৃদয়। যে গিরি-গুহায় তপস্বী তপস্যা করেন, সেই গিরি-গুহাতেই ব্যাঘ্রের আবাস;—যে হৃদয়ে দয়া, শৌচ, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি বিরাজ করে, সেই হৃদয়েই হিংসা, দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদিরও আস্ফালন। আমার হৃদয় দেখাইতে যখন সঙ্কোচ হয়, তখন ক্ষুদিরামের হৃদয়ই বা খুলিয়া দেখাইলে চলিবে কেন? সকলেই যাহার সর্ব্বাবয়ব জানে. সেই শরীরকেই যখন আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়, তখন হৃদয় দেখাইলে কি রক্ষা থাকে? বি, এ, পাস্ থাকিলেও ক্ষুদিরাম অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আপাততঃ আমার আয়ত্ত বলিয়া অত্যাচার করিব কেন?

"ঝী গেল কোথা?"—এ কথা সে-কথা পাঁচ কথার পর, ক্ষুদিরাম এ ভাবনাও ভাবিয়া ফেলিলেন। "তাই ত, ঝী গেল কোথা?"

ঝী, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে যায়—ঝীর কত কাজ। এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে ঝীর চলে না। ক্ষুদিরাম ইহা বিলক্ষণরূপেই জানেন, সেই জন্য ঝী কোথাও গেলে তিনি ভাবেন না, সে কথা মনেই করেন না। আজি কেন তবে এত চিন্তা? বিষয় না থাকিলে বাসনা থাকে না, কামনা না থাকিলে কর্ম্ম থাকে না, রূপ না থাকিলে ধ্যান থাকে না—এ সব যেমন সত্য, চিন্তার কারণ না থাকিলে ক্ষুদিরাম আজি চিন্তিত হইতেন না, ইহাও সেইরূপ সত্য। চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি কারণ অনুসন্ধান করিতে পার উত্তম; আমার কষ্টের লাঘব হইবে। নিতান্ত না পার, আমি ত, আছিই—যথাকালে অবশ্যই প্রকাশ করিব। কিন্তু এখন ভাঙ্গিব না।

ক্ষুদিরাম চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পদধ্বনি শুনা গেল। বল দেখি সিঁড়িতে কে উঠিতেছে?

কখনও বান দেখিয়াছ? মল্লিকদের বাঁধাঘাটে দাঁড়াইয়া যে বান দেখা যায়, সে বান নহে; যে বানে গাছ-পালা, ঘর-দুয়ার, গোরু-বাছুর ভাসিয়া যায়, সে বান কখন দেখিয়াছ? মানুষ যদি সেই বানে পড়ে, তাহার কেমন বিপদ্ হয়, তাহা জান? সে তখন তৃণকেও তরণী মনে করে, তৃণ দেখিয়াও আশ্বাস পায়, বাঁচিবার আশায় তৃণকেও ধরিতে যায়—তাহা জান?

চিন্তাও বান। সুখ-সন্তোষ, আশা-ভরসা সকলই তাহাতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ক্ষুদিরাম এখন সেই বানে ভাসিতেছিলেন। সুতরাং পদধ্বনি শুনিবামাত্র, ব্যস্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া, বাঁ-হাতে মাথা রাখিয়া—আমি এখন যে ভাবে হাতে-মাথা দিয়া লিখিতেছি, ঠিক্ এই ভাবে—ক্ষুদিরাম সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"ঐ যে, খাঁ আসচে। খাঁ বটে, নিশ্চয়—না! এ যে মক্কু!"

ক্ষুদিরামের মন একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। মুচ্‌কি-হাসির মুখস্‌ পরিয়া, ম্রিয়মাণ মনকে ঢাকা দিয়া ক্ষুদিরাম বলিলেন—

"ক্যা মক্কু?—খবর্‌ ক্যা!"

"একটা চিট্‌ঠি আসে"—বলিয়া, তিন-আঙ্গুল চওড়া, পাঁচ-আঙ্গুল লম্বা, গিট্‌খিরি-দার, গোলাপীরঙের এক লেফাফা ক্ষুদিরামের হাতে দিয়া, দুকদম পিছাইয়া, মাঝারি-গোছের একটী সেলাম করিয়া মক্কু, যষ্টির ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মক্কুর মাথার থান কাপড়ের রক্তবর্ণ টুপিটি দেখিতে যেন দু-চালা ঘরের চাল, ঘাড়ে লম্বা-লম্বা চুল, গালপাট্টা আসিয়া গোঁফে ঠেকিয়াছে: গোঁফ যোড়াটী যেন খর্জ্জুর-কণ্টকে ঘটিত। মক্কুর গায়ে বন্ধ-আঁটা কোরা মার্কিণের মের্জ্জাই; নীলবর্ণের মার্কা তাহাতে বিরাজ-মান। মের্জ্জাই এক জাতীয় "অঙ্গরক্ষা"; কিন্তু রক্ষা করুক আর না করুক, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতে পারে নাই। সজলস্থল নাভিসরোবর, মায় চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি, এবং স্কন্ধ অবধি কটিতট পর্য্যন্ত দেহের দক্ষিণাংশের গবাক্ষাকার এক ফালি, সেই মের্জ্জাই সত্বেও দেদীপ্যমান। নাভির নিম্নে মালকোঁচা করা পাঁপড়ি খয়েরের রঙের কাপড়। হাঁটুর নীচে বেখাপ, অর্থাৎ খাপ নাই, অর্থাৎ উলঙ্গ। মক্কু কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ এবং খর্ব্ব। তাহার অন্য পরিচয়, এখন নয়,—সময়ান্তরে। সাবধানে লেফাফা খুলিয়া, ভিতর হইতে সেই রঙের, তেমনি কাগজের ক্ষুদ্র একখানি পত্র বাহির করিয়া, অতি যত্নের সহিত ক্ষুদিরাম পাঠ করিলেন। পত্র, হাতের লেখা নয়, ছাপান, তবে ছাপার নীচে কয়েক পংক্তি কামিনীর কোমল-করলাঞ্ছিত বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে।

পত্র পাঠান্তে ক্ষুদিরাম বলিলেন,—"আচ্ছা, মক্কু, তোম এখন যাও।"

মক্কুর অন্যান্য গুণের মধ্যে এই এক বিশেষ গুণ যে, পারত-পক্ষে, মাতৃভাষায় কথা কহে না। তুমি তাহাকে ইংরেজীতেই বল, আর হিন্দীতেই বল, আর বাঙ্গালা-তেই বল,—মক্কু তাহার স্বোপার্জ্জিত ভাষাতেই কথা কহিবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, 'যেমন বুনো ওল্, তেমনি বাঘা তেঁতুল" যেমন মক্কু, তেমন ক্ষুদিরাম।

মক্কু বলিল—"জোয়াব মেঙ্গিয়াছে। আপ্‌নে হাথে জোয়াব লে যাতে বোল্‌ছে।"

ক্ষুদিরাম বলিলেন—"তোম্‌ বলো, এখন সাবকাশ নেহি হায়, মুখে মুখে বল দিয়া বাবু আসেঙ্গে।"

নিরুপায় মক্কু হতাশ হইয়া, আর একটী সেলাম করিয়া, চলিয়া গেল।

আর একবার পত্রখানি পড়িয়া, পুনরায় লেফাফার মধ্যে পুরিয়া, ক্ষুদিরাম সেই লেফাফা টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিলেন। আবার চিৎ হইয়া শুইলেন, আবার উঠিয়া, লেফাফা বাহির করিয়া—পত্র নহে, শুধু লেফাফা—এ-পিঠ ও-পিঠ ফিরাইয়া দেখিলেন; তাহার পর লেফাফার আঘ্রাণ লইয়া আবার দেরাজে রাখিয়া

দিলেন। লেফাফা খানির চমৎকার সুগন্ধ, তীব্র নহে। কিন্তু নাকের কাছে ধরিলে তর করিয়া দেয়।

আবার ক্ষুদিরাম চিৎ হইলেন,—অমনি, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত—"ঝী গেল কোথা?"

পুনশ্চ পদধ্বনি। কিন্তু এবার ভ্রম হইল না, সোপানৎক পুরুষের পদধ্বনি স্পষ্ট বুঝা গেল। পদাধিকারী বারান্দায় পদার্পণ করিবামাত্র, ক্ষুদিরাম বলিলেন—"কে ও, নিবারণ? তুমি কখন এলে?"

নিবারণচন্দ্র দত্ত, জাতি কায়স্থ, পেশা এল্-এ ফেলগিরি, সাকিম মুলাযোড় হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধান শ্রীপুর,—সেই বাড়ীর কেওড়া-কাঠের তিন তক্তপোশের মধ্যে এক তক্তপোশের মালিক।

নিবারণ বলিলেন—"ক্রাষ্ট্রেণ মিস কোরে ব্যালা হোয়ে গেচলো, তাই ও ব্যালা আর বাসায় আসিনি, বরাবোর কালেজেই গেছলুম।—আপ্‌নি শুয়ে যে?"

ক্ষুদি।—"না, শুয়ে না, এম্‌নি আচি আর কি? এসো।"

নিবা—"মাতায় এট্টু জল দিয়ে আসি, এসে বোস্‌চি।"

ক্ষুদি।—"কেন আজ্ আবার মাথা গরম্ হোয়েচে না কি?"

নিবা।—"ও ত হোচ্চিই। সে দিন সরকারের কাছে গেস্‌লুম, তা একখান বই আমাকে দিলে, দিয়ে বোলে দিলে, সিম্‌টম্ মিলিয়ে কিসের সঙ্গে মেলে, আমায় এসে বোলো, তার পর ওষুদ দেবো। তা মশাই, বোল্‌বো কি? যেখান্‌টা খুলি, সেই-খানেই আমার সঙ্গে ঠিক্ মিলে যায়। বইখানি আর একজনকার হাত দে পাঠিয়ে দিলুম, আর গেলুম না।"

ক্ষুদি।—"বলো কি হে?"

নিবা।—"মাতাটি গ্যালো, আর কি বোল্‌বো? —ঝী কোথায়?"

ক্ষুদি।—"জানি নে ত। বেরিয়ে গিয়েচে, বোধ হয়। অনেকক্ষণ থেকে আমিও দেখি নি।"

নিবারণ মাথায় জল দিতে গেল। দিব্য ফুট্‌ফুটে ছেলেটি, মাথায় থাসা ইস্ত্রি-করা টেড়ি, কচিকচি দাড়ি কেবল লতাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—এমন ছেলের মাথার ব্যারাম হইলে কাহার না কষ্টবোধ হয়? বিশেষ তাহার বেয়াল্লিশ পুরুষের মধ্যে কখনও কাহারও এ রোগ ছিল না,—এমন ছেলেকে রোগে ধরিলে, যদি কোনও কারণবশতঃ দুঃখ নাই হয়, তাহা হইলেও, হওয়া উচিত।

ক্ষুদিরাম ইহার জন্য বিশেষ দুঃখিত।

মাথায় জল দেওয়া হইলে, স্বয়ং তামাক সাজিয়া, তামাক টানিতে টানিতে নিবারণ আসিয়া ক্ষুদিরামের ঘরে, ক্ষুদিরামের খাটে, ক্ষুদিরামের পাশে, বসিল।

বলা বাহুল্য যে, অনেকক্ষণ পরে, ক্ষুদিরামও তামাক খাইতে পাইলেন। নিবারণের কাছে হুঁকোটি লইয়া তামাক খাইতে খাইতে—ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এবার দেখা হোয়েছিল ?"

নিবা।—"দ্যাকা আবার হবে না ? সে যে আমাদেরই দোর্-গোড়াতে। মাজে, একটা বাড়ী, তার পরেই। আমাদেরই জ্ঞেয়াৎ কি না ?"

ক্ষুদি।—"কথাবার্ত্তা কিছু হোলো ?"

নিবা।—কথাবার্ত্তা আগেও যা, এবারেও তাই। দিতেটিতে বেশী পার্ব্বে না, কোষ্টেমোষ্টে হাজার টাকা। আর ত কেউ নেই, এক মা আর সেই মেয়েটি, একখানা বাগান আছে, তাও শেষে আপনিই পাবেন।"

ক্ষুদি।—"তার জন্যে কিছু এসে যায় না। মেয়েটি দেখতে ভাল হোলেই হোলো।"

নিবা।—"মেয়ে দেক্তে চমৎকার—পরীবিশেষ। তা দেক্তিই ত পারেন।—হ্যাঁ, একটা কথা মনে পোড়লো:—সেতায় জিগ্‌গেস কোচ্ছিলো, আপনি কয়ের পোর্য্যো ?"

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা হয়, ক্ষুদিরাম তাহাই শিখিয়াছেন। "পর্য্যায়" শব্দের অর্থ, শ্রেণী, ক্রম ;—কিন্তু নিবারণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সে অর্থে কুলায় না—নিমেষ-মধ্যে ক্ষুদিরামের ওষ্ঠাধর রসহীন, রক্তহীন হইল, চক্ষু সর্ষপকুসুম দেখিবার আয়োজন করিতে লাগিল, অভ্যাস থাকিলে বোধ হয় ক্ষুদিরাম দুর্গানাম জপিতেন।

সংসারের কেমন বন্দোবস্ত, যেখানে মুস্কিল, সেইখানে আসান। নিবারণই তাঁহার বিপন্নিবারণ হইল।

আপনা-আপনি নিবারণ বলিল—"আমি আন্দাজি বোলে দিলুম, চব্বিশের পোর্য্যো—"

ক্ষুদিরাম, অর্থবোধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সুবোধ-বালকের ন্যায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, ঠিক বোলেচ, চব্বিশই বটে।"

নিবা।—"শনিবারে যাচ্ছেন ত ?"

ক্ষুদিরাম।—"এ শনিবারে বোধ হোচ্চে যেতে পারিনে। তা' দেখি ত। একটু বিশেষ দরকার আছে, তাই ভাবচি।"

ক্ষুদিরামের বিবাহের কথা, বড়ই আনন্দের কথা। "মিষ্টান্ন-মিতরে জনাঃ"—লুচি-মোণ্ডার যোগাড় হইলেই আমার আনন্দ। কিন্তু একটু যে খট্‌কা লাগিতেছে। ক্ষুদিরাম হইতেছেন, জেলে কৈবর্ত্ত, মেয়েটী, শুনিতেছি নিবারণের জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া—কায়স্থ। অভাগীর-বেটা কোন কাঙ্গালের জাতি-মারিবার ফিকির আছে না কি ? দেখাই যাউক।

কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এমন সময় ঝীও ফিরিয়া আসিল, প্রদীপ জ্বালিল।

ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় গিয়েছিলে, ঝী ?"

ঝী, মুখ-ঝাপটা দেওয়ার মত বলিল "কোথায় আবার যাবো ?"

ক্ষুদিরামের বুক যেন বসিয়া গেল।

১১। শ্রীপুরে কেন যাওয়া হইল না।

কমলিনি! কখন গাজিপুরে গিয়াছিলে ? গাজিপুরে গোলাপ-ফুলের মাঠ আছে।

তোমার গাম্‌লার গোলাপ আমি দেখিয়াছি: তাহার পরিমলে পৃথিবী মুগ্ধ হয়, রূপে জগৎ আলো করে, সুষমায় স্বর্গ পরাজিত হয়, তাহা আমি স্বীকার করি। তোমার গোলাপ মখমল্ হইতেও মোলায়েম, শরতের পূর্ণশশী হইতেও স্নিগ্ধকর, শিশুর হাসি হইতেও মনোহর,তাহাও মানি। সে গোলাপ গাম্‌লা-ভরিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার কাছে অলি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে; প্রাণ যুক্তায় যে বুকে রাখে, ইহাও জানি। তোমার গোলাপে, আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটে, মরুতে মলয়-মারুত ছুটে, কালানলের জ্বালা টুটে, ইহাও সম্ভব। সে ফুলে কোকিল কুহরে, শরীর শিহরে, প্রাণ হরে হরে; সমস্তই সত্য, কিন্তু সে ত একটি মাত্র। বাগানেও গোলাপ দেখি, তাহাও ত বেড়ায় ঘেরা। গোলাপের মাঠ দেখিয়াছ ? গাজিপুরে গোলাপ-ফুলের মাঠ আছে।

যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই গোলাপ ফুল; স্বর্গ আর মর্ত্ত্য যেখানে মিশিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত কেবলই গোলাপ-ফুল। সেখানে ঝরিয়া পড়ে, গোলাপ-ফুল; গাছে ফুটে গোলাপ-ফুল; বাতাসে দুলে, গোলাপ-ফুল। স্তরে স্তরে, তবকে-তবকে, গুচ্ছ-গুচ্ছ কেবলই গোলাপ-ফুল। দেখিয়া মনে হয়, এই বুঝি হইবে শচীর ফুলশয্যা। শুধু গোলাপফুলে, দিগন্ত ব্যাপিয়া দিবারাত্রি আলো করিয়া আছে। বর্ণনায় সে আসে না; গাজিপুরে গিয়া দেখিতে হয়, ফুল দেখিলে চক্ষু সফল হয়।

এ কি এ! কোথায় গাজিপুর, আর কোথায় কলিকাতা ? এখানে, এ কি এ! যায় যে চক্ষু ঝলসিয়া! লেখনী যে খসিয়া পড়ে। রও আগে কটির বসন কসিয়া পড়ি। এ ত ফুল নহে, ইহারা যে সুন্দরী;—জীবন্ত, চলন্ত, ফুটন্ত সুন্দরী! গাজিপুরের মাঠে ফুল ফুটে—সে ত গাছের ফুল। সুন্দরীর সঙ্গে তাহার তুলনা। ছি ছি! গাছের ফুলের আবার গৌরব! ইহার কাছে, তাহার সৌরভ!—গোল্লায় যাউক, গাজিপুর।

থাম কমলিনি! আমার শ্বাস আসুক। তাহার পর, সোজা করিয়া কথা কহিব।

গলির ভিতর এই ছোট বাড়ীতে ব্যাপারখানা কি ? এখন গলি চেনা থাকুক, বাড়ী চেনা থাকুক; চাহিয়া দেখ, চাঁদের মেলা। রূপ, আর যৌবন, আর বিলাস, আর বিভ্রম। এবার কলমের কর্ম্ম নয়।

কমলিনি, আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি চরিয়া যাইব। এমন কুকর্ম্ম আর করিব না।

সুন্দরীর সমাবেশ দেখিয়া অঙ্ক ভুলিয়াছি;—কয়টি, তাহা কেমন করিয়া বলিব? চপলাদের চাহনিতেই চক্ষু স্থির,—কেমন করিয়া রূপ বর্ণিব?

ঐ যে, ইহার ভিতর চেনা লোকও আছে। ঐ যে শ্রীমান্ ভুসী বাবু, ঐ যে শ্রীমতী নিস্তার। আর ঐ যে—আরে রাম! রাম!—আমাদের ক্ষুদিরাম যে।

এই বা প্রেম-নিকেতন?

প্রত্যেক রমণীর উভয় পার্শ্বে পুরুষ, প্রত্যেক পুরুষের উভয় পার্শ্বে রমণী। মধ্যস্থলে টেবিল। বেস্ ত সাজাইয়াছে। টেবিলের উপর প্রত্যেকের সম্মুখে ফুলদানের উপর ফুলের তোড়া।

চুপ! কথা কহিও না। স্বর্গীয়-স্বরলহরী শ্রবণ কর। মিলিত কামিনী-কণ্ঠে তানের তরঙ্গ উঠিল, মনোযোগ কর।

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(ওহে দীননাথ সুর)

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন, হয় সুধাময়;
জীবে হয় কত, প্রেম সমাগত,
দূরে যায় যত, দুঃখ আর ভয়।
(দেখি), দিবাকরে সুধাকরে সুধাক্ষরে,
সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে;
সরিৎ বহে সুধা মেঘে সুধা ঝরে,
চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
(আমি) তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুত আনন্দ পাই না হৃদয়ে
সময় সম্বরি যে যাতনা সয়ে,
জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
(করি), এই ভিক্ষা নাথ, যেন সর্ব্বক্ষণ,
তোমাতেই যেন মজে থাকে মন;
ধন-মান-সুখে নাহি প্রয়োজন,
তোমা ধনে লয়ে জুড়াব হৃদয়॥

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র ভ্রাতা শ্রীমান ভুসীভোজন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—

"ভগিনীগণ, ভ্রাতাগণ,—আমি যে প্রস্তাব করিবার জন্য দণ্ডাইয়াছি, তাহা আপনাদের অনুমোদনীয় করিবার জন্য অধিক বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। ("শুন," "শুন," এবং করতালি) আমি জানি যে, অধিক কথার আবশ্যক হইবে না। (দ্বিগুণ করতালি) কারণ সে প্রস্তাব সকলের মনোমত হইবে। আমি এ সময়ে আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না ("না" "না" এবং করতালি) শুধু এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমার প্রস্তাব অ-বিসম্বাদে গৃহীত হইবে এমন ভরসা করিবার হেতু আছে। ("আছে" এবং করতালি) আমি প্রস্তাব করি যে,—অদ্যকার সভায় আমাদের প্রিয়-ভগিনী এবং শ্রদ্ধাভাজনী শ্রীমতী নিস্তারকে সভা-পত্নী মনোনীত করা হউক।" (ঘোর-রবে করতালি।)

শ্রীমতী নিস্তার চেয়ার হইতে উঠিবামাত্র আবার করতালি বাজিয়া উঠিল। করতালি ক্ষান্ত হইলে, শ্রীমতী নিস্তার চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর একখানা সোনার চশমা একবার নাকে দিলেন। ভাগ্যক্রমে, অথবা ফরমায়েস্ মতে, চস্মায় কাচ ছিল না, নহিলে বোধ হয় দৃষ্টির ব্যাঘাত হইত। সেই চসমার কাঠাম নাকে দিয়া শ্রীমতী নিস্তার শঙ্খচিরুণী-বিনিন্দিত চাঁ-চাঁ রবে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন,—

"হৃদয়রঞ্জনগণ! এবং হৃদয়রঞ্জিনীগণী! আমি এ সভার পত্নী হইয়া, ভয় পাই-তেছি। আমার চেয়ে যোগ্যতরী বীরাঙ্গনা এ সভায় বিরাজমানা। (পুরুষ কণ্ঠে "না" "না") কিন্তু যখন আমাকে সম্মান করাই সভ্য-সভ্যাদের অভি-প্রায়, তখন আমার পশ্চাৎপদী হওয়া আবশ্যক করে না। (করতালি) যেমন সাধ্য আমি, ততদূর পর্য্যন্তই নির্ব্বাহ করিতে থাকিব। ("খুব পার্ব্বেন্" "খুব পার্ব্বেন্" শব্দ)।

আজিকার সভার উদ্দেশ্য আপনারা অবগত এবং অবগতী আছেন। আমি অধিক বলিয়া, ভাল ভাল বক্তাদের রসময়ী-বাক্য-সুধাপানে হৃদয়রঞ্জিনী এবং হৃদয়-রঞ্জন মহিলা এবং মহলগণকে বিরক্ত করিতে হইলে ক্লেশ বিবেচনা করি। (করতালি) আমাদের নবাগমনী হৃদয়রঞ্জিনী শ্রীমতী নিরয়িণী ঘোষালের (ঘন ঘন করতালি)—শ্রীমতী নিরয়িণী ঘোষালের উৎসবে যোগদান করিয়া যুগপৎ হর্ষবিষাদের জন্য এই সভা আহুতি হইয়াছে। শ্রীমতী নিরয়িণীর ইতিহাস জানিতেছেন আপনারা সকলেই, আমি সে বিষয়ে কোন গৌরব চাই না ("এক শ বার" "এক শ বার")—আপনারা বলুন—দয়া কোরে অধীনীরে বলুন—কিন্তু আমি চাই না। প্রেমময়ের প্রেমদৃষ্টি আমার এই নিকেতনের কুটীরে শুভদৃষ্টি থাকিলেই আমি চির-চরিতার্থিনী, শ্রীমতী

নিরয়িণী কেমন পতিসোহাগিনী, কেমন পতিপরায়ণী তার পর যে প্রকারে কালের করালকবলে কবলিনী হইয়া বিরহিণী জনম-দুখিনী হইলেন, এবং আবার যেমন করিয়া কুল-কিনারা ঘোর দরিয়া পার করিয়া (উচ্চ হাস্য এবং করতালি) তরী বাহ-বাহ ধীরে-ধীরে অকূলে পাইলেন, তাহা দ্বিরুক্তি করা আমার মুখে অস্বাভাবিকী। অতএব আমি প্রথম-বক্তা হৃদয়রঞ্জন ভ্রাতা শ্রীমান্ নরকেশচন্দ্রকে প্রেম আহুতি করি।"

ঘন-ঘন করতালি হইতে হইতে শ্রীমতী নিস্তার বসিয়া পড়িলেন, এবং বুকের কাছে হাত-পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীমান্ নরকেশ বক্তৃতা যুড়িয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দশসহস্র শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করাই শ্রীমান্ নরকেশের অভ্যাস; তিনি এমনি গলা চিরিয়া আরম্ভ করিলেন যে, মধ্যে মধ্যে টিপ্-টিপ্ শব্দে স্বীয় বক্ষে করাঘাত "হা ভারতবর্ষ! হা মাতঃ" "বিধবা, বিধবা!" এইরূপ গুটিকতক অসম্বদ্ধ কথা ভিন্ন, আর কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। তবে রঞ্জন এবং রঙ্গিনীরা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন; নহিলে করতালি দিয়া বক্তাকে আরও উৎসাহিত করিতেন না। শ্রীমান্ নরকেশ বক্তৃতা বন্ধ করিয়া প্রথম এক দফা কাঁদিলেন, তাহার পর এক দফা থামিলেন, তাহার পর বিবাহ বাটীর কর্ত্তার মত কেবল শাউ-শাউ করিতে আরম্ভ করিলেন, স্ফুটধ্বনি একবারে ছাড়িয়া দিলেন। যাহারা ইসারা বুঝে, তাহারা কিছুকিছু বুঝিল, আমি কেবল অবাক্ হইয়া রহিলাম।

আরও দুই-একজন "নহল" "মাহিলা" বক্তৃতা করিলে পর, সকলে মিলিয়া ক্ষুদিরামকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতার জন্য ক্ষুদিরাম প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই অনেক ওজর-আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিতান্তই যখন ওজর নামঞ্জুর হইয়া গেল, তখন অগত্যা আরম্ভ করিলেন,—

"আপনাদের এ কাজে আমি এই নূতন ব্রতী। এমন সাধারণী-সভায় কথা কহা আদবেই আমার অভ্যাস নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দোষ-গুণ মার্জ্জনা করিবেন, (হাস্য) আপনাদের সভায় স্থান পেয়ে আমি বড়ই সৌভাগ্য বিবেচনা করিতেছি, বিশেষতঃ সভাপত্নীর সৌজন্য দে'খে। (হাস্য এবং করতালি) এক কথা বলিতে আমি সাহস করিতে চাই,—আপনাদের এই সভা বোধ হয় চিরস্থায়ী সভা; তা যদি হয়, তবে বড় বড় সভার যেমন "চেয়ারম্যানের" সঙ্গে একজন একজন "বাইস" থাকেন; আপনাদেরও সেইরূপ সভাপতি এবং সভাপত্নীর উপর নির্ভর না করিয়া, একটি একটি "উপ" রাখিলেও ভাল হয়; কেননা, দরকারের সময়ে কাজ পাওয়া যেতে পারে। (হাস্য এবং করতালি) শ্রীমতী নিরয়িণীর সঙ্গে আমার আলাপ নাই ("লজ্জা" "লজ্জা") —লজ্জার কথা তাহা স্বীকার করি—কিন্তু তবু আমি তাঁর সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আজিকার সভা তাঁহার হর্ষ-বিষাদের সভাই ঠিক বটে; তাঁহার বৈধব্যের

জন্ত বিষাদ, এবং উদ্ধার জন্ত আহ্লাদ। ("শুন" "শুন" ও করতালি) তাঁর পতি-ভক্তির যে প্রকার সুখ্যাতি শোনা গেল,—তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই— তেমন পতিভক্তি সচরাচর দেখা যায় না। আমি ভরসা করি যে, ভক্তিটুকু থাকিতে থাকিতেই আপনারা যত্ন করিবেন যেন তাঁহাকে পতিহারা হইয়া কষ্ট পাইতে না হয়। (ঘন ঘন করতালি) পতির অভাবে যদি এমন পতিভক্তি পৃথিবী হইতে লোপ পায়, তাহা হইলে আপনাদেরও লজ্জার সীমা থাকিবে না পৃথিবীরও দুঃখের সীমা থাকিবে না। (করতালি) আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি ("কিছু না" "কিছু না") নিজগুণে সকলে ক্ষমা করিবেন।"

ক্ষুদিরামের বক্তৃতার এই ফুল-শয্যা! সকলেই তাঁহার বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কেবল সেই নরকেশ কিছু বলিলেন না। "মাথা ধরিয়াছে" বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন।

হৃদয়-রঞ্জিনীরা সকলেই ক্ষুদিরামকে প্রায় পাইয়া বসিলেন। তিনি যথাসাধ্য নিজের পসার বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সভাপত্নী শ্রীমতী নিস্তার, ক্ষুদিরামের বিশেষ সম্মান করিয়া, হাত ধরিয়া শ্রীমতী নিরঙ্গিণীর কাছে লইয়া গেলেন, এবং দুইজনকে একটা কোচের উপর বসাইয়া আপনি পাশ কাটিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমতী নিরঙ্গিণী সবে এই শিকলী কাটিয়াছেন; কাজে কাজেই একটু জড়-সড়-ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে, সভাভঙ্গ পূর্ব্বক যে যাহার আড্ডায় প্রস্থান করিলেন।

ক্ষুদিরামও বড় প্রফুল্ল মনে বাসায় আসিলেন।

১১। সংবাদপত্রের নূতন সংবাদ।

বামুনঠাকুর খবরের কাগজ পড়েন না। না হয়, নাই পড়িবেন, অন্ততঃ লজ্জিত হওয়া ত উচিত। তাহাও না।

নিবারণ খবরের কাগজ পড়ে। নিবারণ ভাল ছেলে কি না, খবরের কাগজ না পড়িবে কেন? শুধু পড়া বলিয়া পড়া নয়, নিবারণের কাগজ পড়া, সে এক রকম মৌতাতি-পড়া। আফিংখোর লোক যথাকালে যদি মাত্রা-সহি আফিং না পায়, তাহা হইলে তাহার হাই উঠে, গাত্র-ব্যথা হয়, সর্ব্বাঙ্গ-শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। মৌতাতের এই লক্ষণ। খবরের কাগজে নিবারণের সেই মৌতাত। ঠিক সময়ে কাগজখানি না পৌঁছিলে নিবারণ কালেজের পড়ায় মন দিতে পারে না, বই খুলিলে অক্ষর চিনিতে

পারে না, মিনিটে মিনিটে তামাক খাইতে বাধ্য হয়, দশ মিনিট অন্তর সিঁড়িতে নামা-উঠা করে, ক্ষণে ঝীকে ডাকে, ক্ষণে বামুনঠাকুরকে বকে ;—ফল কথা, নিবারণ একটা বিচিকিৎস্য ব্যাপার করিয়া তুলে।

একদিন এই কথা লইয়া বামুনঠাকুরের সঙ্গে নিবারণের ঘোর তর্ক। তুমুল আন্দোলন। সে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড বলিলেই হয়।

"বামুনঠাকুরের বিবেচনায় পড়া তত আবশ্যক নয়, বরং কর্ম্ম করাই আবশ্যক। পড়িলে জ্ঞান হয় না, অভিমান জন্মে ; কর্ম্ম করিলে অভিমান খর্ব্ব হয়, কালে জ্ঞান লাভের পন্থা হয়। গুরু-উপদেশ ভিন্ন পড়ায় সংশয়ের সম্ভাবনা, অতএব পড়া অপেক্ষা গুরুর সেবা-শুশ্রূষাই শ্রেষ্ঠ। তবে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া অবসর কাটাইলে অবশ্য লাভ আছে। খবরের কাগজ পড়িয়া কি হইবে ?

সুতরাং বামুনঠাকুরের বুদ্ধিবিবেচনা দেখিয়া নিবারণের রাগও হইল, দুঃখও হইল, এবং সেই রাগে ও দুঃখে মিশ্রিত হইয়া ঘৃণাও বাড়িল। কেননা, ঘৃণা পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

টিম্বকটু হইতে ওটাহিটি পর্য্যন্ত রেলের গাড়ী চলিতেছে কি না, নিংপোর নাগরিকেরা হনলুলুর সর্দ্দারের কি প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে, নরবের সম্রাট নববর্ষারম্ভে রাজমন্ত্রীদিগকে কি কি কথা বলিলেন, কশাকের সঙ্গে বাশিবাজুকের সম্মুখযুদ্ধ হইলে কোন পক্ষের পরাজয় হইবার কথা,—ইত্যাদি যে সকল ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের নিত্য জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহার উপর ইহকাল এবং পরকাল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, খবরের কাগজ পড়া ভিন্ন ইহা জানিবার অন্য উপায় কি আছে ? পরিষ্কার ভাবে নিবারণ এই সমস্ত কথা এবং আরও কত কথা বামুনঠাকুরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বামুনঠাকুর এক বর্ণও বুঝিল না। অগত্যা নিবারণের দুঃখ, নিবারণের রাগ, এবং নিবারণের দুঃখ × রাগ = নিবারণের ঘৃণা। বামুনঠাকুর গতিক বুঝিলেন, পরাভব মানিলেন, পলায়ন করিলেন। তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাত শ উনিশ প্রকার কুসংস্কার বামুনঠাকুরের অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা কাহারই অবিদিত নাই। তাহার মধ্যে একটা কুসংস্কার এই যে, ইংরেজীপড়া লোকের মাথা খারাপ হইয়া যায়, অধিক বিরক্ত করিলে ইংরেজীপড়া লোকে মানুষকে কামড়াইতে আইসে। এমন অবস্থায় পলায়ন করাই সুবোধের কাজ। সেই জন্যই বামুনঠাকুর আর নিবারণের কাছে দাঁড়াইলেন না, পলাইলেন।

যত দিন বামুনঠাকুর আছেন, ততদিন পলিত গলিত, পরপদ-দলিত ভারতভূমির আশা-ভরসা কিছুই নাই ; আশা যাহা আছে, তাহা নিবারণকে লইয়া। নিবারণ জানে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কেননা, ভারতবাসী

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে ইংরেজী শিখিতে পারে নাই, সকল লোকেরই একটি একটি বড চাকুরি নাই, সকলে সভা করিতে পারে না, বক্তৃতা করিতে পারে না, প্রবন্ধ লিখিতে পারে না, আজিও অনেকে ধুতি চাদর ব্যবহার করে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে, হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ দেখে, গুরু-লঘু জ্ঞান করে। নিবারণ ইহাও জানে যে, ইংরেজের অধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের এই দুর্গতি। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা নিবারণ জানে যে, উত্তম চোখা-চোখা গুটিকতক প্রবন্ধ যদি সংবাদ-পত্রে বাহির হয়, তাহা হইলেই ইংরেজ যে সাত হাজার ক্রোশ অন্তর হইতে আসিয়া এদেশে আধিপত্য করিতেছে, সেই দিনই সেই সাতহাজার ক্রোশ অন্তরে ইংরেজকে পলাইতে হয়। এমন প্রবন্ধ বাহির হইবে নিবারণের সে আশা আছে;—আরও আশা আছে যে, "প্রাণদায়িনী" সে আশা পূরণ করিবে।

নিবারণের প্রিয় সংবাদপত্রের নাম—"প্রাণদায়িনী।" বলা বাহুল্য যে "প্রাণদায়িনী"র অনন্ত গুণ, তাহার মধ্যে প্রধান গুণ তিনটি। প্রথম, "প্রাণদায়িনী" নিজের বাপান্ত না করিয়া জলগ্রহণ করেন না; ইহাতে জানা যায়, 'সৎসাহস।' দ্বিতীয় কুলকামিনীর কলঙ্ক কাহিনী "প্রাণদায়িনী" যেমন বিনাইয়া বলেন, তেমনটি আর কেহই পারে না; ইহাতে বুঝায়, সুরুচি। "প্রাণদায়িনী"র তৃতীয় গুণ, সত্যনিষ্ঠা; তাহাতে চুল তফাৎ হইবার যো নাই।

সোমবার সকাল বেলা এ হেন "প্রাণদায়িনী" পাঠ করিতে করিতে নিবারণের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। নিবারণ পড়িতেছে—

"জগদীশ্বর আবার বঙ্গদেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আবার একটি প্রেমের পবিত্র উৎস উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আবার একবার হতাশ-প্রাণে প্রণয়ের হিল্লোল ছুটিয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমতী নিস্তার যে, পরমব্রতে দেহ-মন-প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যে জন্য আমাদের ভক্তিভাজন ভ্রাত ভুসীভোজন ভারতে কঠোর বিচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহার ফুল আবার ফুটিয়াছে; আর একটি পবিত্র ফলে তাহা সুশোভিত হইয়াছে। কুসংস্কারের কুয়াসা-জাল ভেদ করিয়া, ঘোর কালিমামগ্ন কুটিল কুলে পদাঘাত করিয়া সুন্দরী, যুবতী, পতিপরায়ণা সতী, পাপময় সমাজকে কি প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমাদের পবিত্রহৃদয়া পাঠিকাগণ, এবং নির্ম্মল পাঠকগণ শ্রীমতী নিরঙ্গিণীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যাহার বিশেষ বিবরণ আমাদের সুবিশ্বস্ত পত্রপ্রেরকের পত্রে অন্য স্তম্ভে দেখিতে পাইবেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে গত শনিবার রজনীযোগে মহাসমারোহে শ্রীমতী নিরঙ্গিণী পবিত্র দাম্পত্যবন্ধনে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম বিশ্বাস বি-এ মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছেন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত দস্যু, যাহারা সমাজের সর্ব্বনাশ সাধনে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে, শুভকার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে নাই; কিন্তু জগদীশ্বর অনাথাবান্ধবের পক্ষ; ক্ষুদিরাম

বাবুর সাহস, সত্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা এক মুহূর্ত্তের জন্ত বিচলিত হয় নাই। নিষ্ঠুর পিতা-মাতা—"

নিবারণ পাঠ শেষ করিতে পারিল না, কাগজ হাতে করিয়া ক্ষুদিরামের ঘরে বেগে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ক্ষুদিরাম বাবু, এ কি ?"

ক্ষুদিরাম সহসা চমকিত হইয়া বলিলেন—"কি ?"

নিবারণ বলিল—"পড়িয়া দেখুন, কি ?"

পুনশ্চ।

ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র কথা, কিন্তু আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তাহাতে আমার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে—ক্ষমা কর ত বলি,—স্ত্রী-পুত্র-পরিবারও আছে। অতএব আপাততঃ ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। যদি রাত্রি প্রভাত হয়, তাহার পরেও কমলিনীর কুতূহল থাকে, আবার কলম চলিবে। রাত হইয়াছে, পাত পড়িয়াছে, পেট পুড়িতেছে, এখন এক প্রস্থ বসা যাউক। কেমন কমলিনি! এই ত সুব্যবস্থা ?



ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃদ্ধ বয়সে।

পাঁচু-ঠাকুর।

[পাঁচ কাণ্ডে সম্পূর্ণ]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিব

৬, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মুখপাত।

রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের—এখন আবার বলিতে হয়—পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে। বাঙ্গালায় এখন হাসিবার কিম্বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে; সে পক্ষে ক্ষমতার দাবি-দাওয়া কিছু রাখি না।

একটা সুসংবাদ দিয়া মুখপাতের চূড়ান্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, কার্য্যভেদে অবতার-ভেদ; পঞ্চানন্দ যে পাঁচুঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ—অর্থলোভ; অথবা, বৈজ্ঞানিক ভাষা বলিতে হইলে,—লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য প্রমাণ। ইতি।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

পাঁচু-ঠাকুর।

প্রথম কাণ্ড।

তামাসা নয়।

এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল। এই ত ভব-সাগরে রঙ্গিল পানসী ভাসান গেল। এই ত ভবের ঘানিতে আত্ম-যোজন করা গেল! এই ত ভবের আসরে নামা গেল। এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল! এখন দেখা যাউক তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

পঞ্চানন্দ বাহির হইল, লোক-সমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোক-সামান্যই বলিতাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কতদিন অন্তরে ভারত উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র—"অসূর্য্যম্পশ্যরূপ!" চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে একবার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্ম-বিকাশ করেন; তদ্ভিন্ন পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—

"সুবর্ণ-দেউটি যথা তুলসীর মূলে"—

মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা ধরাইবার সময়ে দীপ-ছায়া উপস্থিত হয়, তবে এ আলোক কেমন?

এ আলোক কেমন? গভীরভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক—বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অম্বরবিদারিণী সৌদামিনী-সদৃশ; ভৈরবী শ্যামার সমর-রঙ্গকালীন হাসির মত। ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে। ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। না-ই পাইল, নেশা ত জমিয়া গেল! যাহা হইবে, তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সে-ই বন্ধু—"শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।"—পঞ্চানন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চানন্দ সেই শ্মশানবন্ধু। ষড়্দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনু-সংহিতায় আছে; সেই জন্য ষড়দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য বঙ্গ-দর্শন আর্য্যদর্শন শ্যাম-দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিমদশা—মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি-খাইবার জন্য আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ, বন্ধুগণ উঠ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো!—পঞ্চানন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চানন্দ মুমূর্ষু দেহে জীবনসঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু।

"বঙ্গ-দর্শন" প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালা—স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না। প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন; তাহার পরে—ভগবানকি হাত। পঞ্চানন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চানন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ।

পঞ্চানন্দের দর্শনা—যেবার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন; সে শ্রেণীর লোককে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট, তখন পঞ্চানন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না।

এখন আশীর্ব্বাদ করি, এই শুক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চানন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুর্বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি ও সর্ব্ব সমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

নন্দী উবাচ।

হরিতে হর, হরে হরি,
দুই দেহ এক আত্মা ভিন্ন কভু নয়।
দুই আত্মা এক দেহ ভিন্ন কভু হয়?

অতএব হরি হর দুয়ে এক, একে দুই; পঞ্চানন্দ তদ্বৎ।

তথাপি রূপভেদে উপাসনাভেদ; অবতারভেদে লীলাভেদ; সেইজন্য—নন্দেরও ভূমিকাভেদ আছে। এ ভেদে যিনি ভয় পাইবেন, তিনি চৈত্র মাসের কেহ নন, চৈত্র মাস তাঁহার কেহ নয়; সখের জলপান, সাড়ে আঠার ভাজা, চণক-চূর্ণ, চাল-কলাই ভাজায় তাঁহার অধিকার নাই। তিনি দন্তহীন বৃদ্ধ, চর্ব্বণরসে বঞ্চিত। যখন দুর্ভিক্ষ ভয়ে আর্ত্তনাদ-পুরঃসর আমরা অশ্রুপাত করিব, তখন চক্ষের সেই জলের দু-ফোঁটা, তাঁহারা পাইবেন। ইহার অধিক প্রত্যাশা করিলে—যাও, কুছ নেহি মিলে গা।

শুকদেব গোস্বামী লায়েক হইয়া, তাহার পর ভূমিষ্ঠ হন; আর বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ মৃত্যুর পরে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন; আমরা দুয়ের বা'র। আমাদের যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি, তাহা জন্মগ্রহণের পর উপার্জ্জিত; এবং আমাদের যে শিক্ষা, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমাহিত হইবে।

পঞ্চানন্দ লিখিবেন কি সম্পাদিবেন, সুতরাং অগত্যা এই প্রশ্ন উঠিতেছে। বঙ্গোজ্জ্বলোজ্জ্বলা সমুদায় পত্র-পত্রিকাতেই বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান লেখক লিখিয়া থাকেন; এমতাবস্থায় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চাটুর্য্যে, সেক্‌স্পিয়ার, গেটে, এমার্সন, কার্লাইল এবং রাজা রামমোহন রায় এই কয়েকজনকে লেখকশ্রেণীতে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া আমরা আসরে অবতীর্ণ হইলাম। ইহাতে কেহ দুঃখিত হইবেন না। সত্বরেই যাহাতে লেখকসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; "শকুন্তলাগৃহের" (১) বাহিরে যে শাদা কর্দ্দ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আমাদেরই; সেখানকার অনুগ্রাহকবর্গ তথাকার

---

(১) সেকালে কলিকাতার থিয়েটার পাড়ার বাবুদের সুবিধার জন্য অর্থাৎ চপ-কাটলেট খাইয়া ও মদ্যপান করিয়া সদ্য সদ্য থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হওয়ার সুবিধার জন্য, ঐ অঞ্চলে "শকুন্তলা-ভবন" নামে একটি Restaurant (রেস্তোরাঁ) খোলা হইয়াছিল।

স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনানন্তর সেই কর্দ্দে নাম লিখিয়া যাইবেন; আমরা তাঁহাদের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দিগের দ্বারা রচাইব।

পঞ্চানন্দের এক কলম অর্থাৎ এক লেখনী লিখিলে দুই টাকা দেওয়া যাইবে; যাঁহাদের লেখা পত্রস্থ হইবে, তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে না; যাঁহারা বেতনের জন্ম পীড়াপীড়ি করিবেন, তাঁহাদের লেখা লওয়া যাইবে না। পঞ্চানন্দ কখনও দেউলিয়া পড়িবে না, বুক ঠুকিয়া এ কথা ঘোষণা করা যাইতেছে।

এবারে যে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইল, তাহা পাঠ-সাপেক্ষ; সুতরাং তৎসমস্তের গুণ গান করিয়া পঞ্চানন্দ জঘন্ত আত্ম-তৃপ্তি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ। এতদ্ভিন্ন পঞ্চানন্দ অতিশয় লাজুক, সেই জন্ত প্রথম মজলিসে গলা ছাড়িয়া গান করিতে চাহেন না। এবারে নিদাঘের নব-জলদ-সঞ্চার, করকা-নির্ঘোষ,অশনিসম্পাত, বিদ্যুদ্দাম, এবং কদাচ শিলাবর্ষণে পর্য্যবসান। কিন্তু আগামী বারে প্রাবৃটের মূষলধার, ধরিত্রী কর্দ্দম-চর্চ্চিতবপু, দর্দ্দুরের স্বরসাধন ও গাওনার মনোহার্য্যের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান দেখা যাইবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ওজোময়ী 'সীতার বনবাসে'র ছন্দে "মনসার ভাসান," রামমোহন রায় "কুলবালার বিষম জালা," বঙ্কিম চাটুয্যে "স্ত্রী-পুরুষের জাতিভেদ কত দিন হইয়াছে এবং তাহা উন্মূলনের উপায় কি?" প্রবন্ধ দিতে প্রতিশ্রাব করিয়াছেন। অপর শুভ: কিমধিকমিতি।

পঞ্চানন্দের আত্ম-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণিকা।

অনেকগুলি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে এবং প্রকাশ করিতে হইয়াছে; জীবনীতে প্রবেশ করিবার অগ্রে, সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রথম কারণ,আমার অনিচ্ছা। আমার বিশ্বাস যে, ছাপার অক্ষরে পুস্তকের আকারে, দোকানদারের মাচায়, ফেরিওলার বোচকায়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জল-খাবারের ঘরে, আমার এই আত্মচরিত গৌরব বিকীর্ণ করিবে; আমার বিশ্বাস যে, উই কি ইন্দুর যদি শত্রুতা না করে, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম যদি বাদ না সাধে, তবে আমার এই অতুলকীর্ত্তি যুগে যুগে বর্ত্তমান রহিয়া কালের লোল-করাল রসনাকে লালায়িত করিতে থাকিবে, অথচ কখন তাহার খোরাক হইবে না। গ্রন্থ পঠিত হইলে ক্ষয় পায়, ক্রমে লয় পায়, প্রথমে মলাট যায়, তার পর সেলাই যায়, ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। কোন কোন গ্রন্থকার এই শোকজনক, লজ্জাজনক, ঘৃণাজনক ভাবে নিজ-কীর্ত্তি বিধ্বস্ত এবং কালের করাল কবলে কবলিত হইতে দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন সত্য; কিন্তু অনেকেরই ভাগ্য অন্যরূপ। আমার সাধ থাকিলেও শক্তি নাই। সেই জন্য আমার অনিচ্ছা, এবং এই অনিচ্ছা নিতান্ত বেগবতী বলিয়াই এই আত্মচরিতের প্রকাশ। শতকরা নিরানব্বইখানি পুস্তকের ভূমিকা খুলিয়া দেখ, আমার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা নাই, লিখিলে ছাপাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নাচার,বন্ধুবান্ধব নাছোড়, তাঁহাদের অনুরোধে পুস্তক বাহির করিতে হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কেবল অনিচ্ছাটুকু আছে। সেই জন্য এ জীবনবৃত্তান্ত সহস্র সহস্র দীন-দুঃখীর ভরণপোষণ জন্য সংসারে অগ্রসর হইল। কতক্ষণে আমার মত মহানুভবগণের প্রকাশ প্রবৃত্তি জন্মিবে, এই উদ্দেশে, কাগজওয়ালা ছাপাওয়ালা প্রভৃতি কত কত ওয়ালা, তীর্থের কাকের মত হা-প্রত্যাশ করিয়া বসিয়া আছে,—যখন এই কথা আমার মনে হয়, তখন চক্ষে জল আইসে; ইহারা কেহই দাম পাইবে না, সুতরাং নালিশবন্দ হইবে, এই আশ্বাসে কত কত নিরাশ্রয় উকীল মোক্তার, দালাল, দাগাবাজ, ছোট বড় আদালতে নিয়ত পরিভ্রামামাণ হইতেছে—এ চিত্র যখন আমার অন্তরে উদিত হয়, তখন আমি নিজ মহত্ত্ব অনুভব করিয়া অশ্রুপাত করি; তাহার পর ইহারা মামলা

জিতিয়া দেনার দায়ে আমাকে ধরিতে আসিবে—এই কল্পনায় যখন আমার মস্তিষ্ক আন্দোলিত এবং সঞ্চালিত হইয়া উঠে, তখন আমি ভাবী ভয়ে কাঁদিয়া ফেলি। তথাপি আমার অনিচ্ছা, এবং সেই অনিচ্ছা হেতু এই প্রকাশ।

দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যাভূষণ ভায়া (১)। জনষ্টুয়ার্ট মিল্ নামক একব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া মৃত্যুগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন। তিনিও—অর্থাৎ মিল্—আমার মত আত্মচরিত লেখেন, কিন্তু তাহা ইংরেজীতে। বিদ্যাভূষণ ভায়া নিঃস্বার্থভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সেই আত্ম-চরিত্রের অনুবাদ করিয়াছেন; কেহই সে অনুবাদ পড়ে না, কেহই সে অনুবাদ কেনে না, তবু স্বার্থত্যাগ এমনই বস্তু, মিল এখন বাঙ্গালা অক্ষরে অমর। হনুমান্ অমর বর লাভ করিয়া নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছেন; দাঁতখিঁচোন, আঁচড়ান, কামড়ান,—ভয়ে কথাটি কহিবার যো নাই। আমার এই সৌভাগ্য হইবে না বলিয়া আশঙ্কা আছে; কিন্তু আমার নাম অমর হইতে পারে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? আফ্রিকার মরুভূমে, নায়াগারার জলপ্রপাতে; আল্পসের উত্তুঙ্গ শিখরে, সুয়েজের সঙ্কীর্ণ খালে; চীনে তাতারে; ফ্রান্সে, জর্ম্মণীতে, মাদ্রিদে, সেণ্টপিটার্সবর্গে (২),—এই ত্রিভুবনে আমার জন্য একটীও বিদ্যাভূষণ নাই, ইহা কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিব? তবে, বল দেখি, আমি যদি না লিখিয়া রাখি, তবে সে বিদ্যাভূষণটির দশা কি হইবে? অগত্যা আমাকে আত্মচরিত লিখিতে হইতেছে।

তৃতীয় কারণ, সাফ পরোপকার। প্রকৃতিতে প্রকৃত মাধুরী নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন। সেই দুঃখে কল্পনা দেবীর উদরে, বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তকের ঔরসে, কতকগুলি মাধুরী এবং সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি; পূর্ণচন্দ্রের (৩) উপর সেইগুলির লালন-পালনের ভার। কিন্তু আমি মাধুরীর অবতার, সৌন্দর্য্যের রূপ। এই আত্মচরিত লিখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাথা বাঁচিবে; পূর্ণচন্দ্রের নরক ঘাঁটা ঘুচিবে, সাধও মিটিবে। বিলাতের এক মেম বিজ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশে ব্যবচ্ছেদ জন্য নিজ মৃতদেহ উইল করিয়া যান; পূর্ণচন্দ্রের ক্ষোভ নিবারণ জন্য আমি এই আত্মচরিত দান করিলাম। উইল করা অপেক্ষা দান করায় মাহাত্ম্য অধিক।

তিন কারণের উল্লেখ করিলাম; আরও তেত্রিশ কোটি আছে; কিন্তু আমার বিচারে সেগুলির কথা তুলিবার দরকার নাই।

---

(১) ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

(২) রুষিয়ার রাজধানী, বর্ত্তমান নাম—লেনিনগ্রাড।

(৩) ৺পূর্ণচন্দ্র বসু, যাঁহার "কাব্য-সুন্দরী"তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঘটিত স্ত্রীচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিবরণ।

বৎসরের বার মাস ত্রিশদিনই কিছু আমার জন্মপরিগ্রহ হয় নাই; নির্দ্দিষ্ট মাস, বার তারিখে আমি ভূমিষ্ঠ হই। তৎপূর্ব্বে আমি আমার এই চক্ষুতে সংসার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ ইতিহাসের প্রথমাবস্থা এইরূপ তিমিরাচ্ছন্নই হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই অবধি নিয়তই আমার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে; অধিক কি, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, কাল-গণনায় গত কল্য আমার যত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, অদ্য তাহা অপেক্ষাও বেশী।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, কাল-সহকারে বয়সের বৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্ষয় হয়। কিন্তু আমি এ মতের অনুমোদন করি না; কারণ, তাহা হইলে ক্রমে স্ত্রী বিধবা হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, দেখা যায়, অনেকের স্ত্রী বিধবা হন না। তদ্ভিন্ন বিধবা-বিবাহ যুক্তি এবং শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া মানিলেই স্ত্রীর সধবত্বাৎ বয়ঃক্ষয়ের অপ্রমাণ সিদ্ধান্ত।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধনসঞ্চয়ের মত মহাপাতক আর নাই; উপার্জ্জনশীলের হাতে পাছে টাকা-কড়ি জমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বার মাসে তের পর্ব্ব, পনর তিথিতে সাইত্রিশ ব্রত, সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ, অপর পক্ষের তর্পণ, গয়ায় পিণ্ড প্রদান, বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন, পুরুষোত্তমে আটিকে বন্ধন, এবং অতিথিকে ইচ্ছাভোজন ও ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষাদানের ব্যবস্থাতে শাস্ত্রকারগণ নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, গর্ভাধান, সাধ-ভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়া, কর্ণবেধ, উপনয়ন, দীক্ষা প্রভৃতি সাত শত তিরানব্বই হাজার বাবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমারও অন্নপ্রাশনাদি হইয়াছিল, এ কথা লিখিয়া এই জীবনী দীর্ঘাকৃতি করা অস্মদাদির অনুচিত।

যথাক্রমে আমি পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম; শুভক্ষণে আমার হাতে খড়ি পড়িল। গুরু বিদ্যাবীজ ভূমিতে অঙ্কিত করিলেন, আমি মৃত্তিকা খনন এবং হলচালন অভ্যাস করিতে লাগিলাম। গুরুর পর গুরু গেল, ক—এর ত্রিসীমার পর আঁকড়ি পর্য্যন্ত আমার আদায় হইল। এইরূপে দিন দিন শশিকলার ন্যায় আমার বিদ্যার ষোড়শ বা চতুঃষষ্টি কলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে আমি বিদ্যার পারে গেলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র।

একবার মাত্র আমি পরীক্ষা দিয়াছিলাম, আমার বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় তাহাতেই হইয়াছিল; অতএব সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

গ্রামে একটী গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় হইয়াছিল, প্রথম প্রথম অনেক-

গুলি বালক পড়িতে যাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের তাহাতে বড়ই প্রতাপ বৃদ্ধি হইল; প'ড়ো অ-প'ড়ো, সব ছেলেকেই তিনি লালচক্ষু দেখাইতেন। আমি একাধিপত্যের বিরোধী, সুতরাং পণ্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রতাপ টুটিল, বালকেরা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিল।

ইন্‌স্পেক্টার একদিন সংবাদ পাঠাইলেন যে, পর দিবস তিনি পরিদর্শনে আসিবেন। পণ্ডিত ব্যতিব্যস্ত, আসিয়া আমার খোষামোদ খুঁড়িলেন। সেই রাত্রিতে আমার যাত্রার দলের গান হইবে; আমি দূতী সাজিবার জন্য গোঁফ্ কামাইয়া প্রস্তুত; ছেলেরা বালক সাজিবে, গান মুখস্থ করিতেছে। শেষ, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে রফা হইল, তিনি ছেলেদের কিছু বলিবেন না, আমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, আর ইন্‌স্পেক্টার আসিলে আর কেহ যাউক না যাউক, আমি গিয়া স্কুল এবং স্কুলের ইজ্জত বজায় করিয়া দিয়া আসিব।

পরদিন আমার মনোমত চারি পাঁচটী বালক সঙ্গে, আমি গিয়া উপস্থিত; গোঁফ্ ছিল না, আমিও বালক, তবে প্রধান বালক। ইনস্পেক্টার আসিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর,—বালকসংখ্যা এত অল্প দেখিতেছি কেন?

পণ্ডিত,—হুজুর, ম্যালেরিয়া।

ইনস্পেক্টার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান্ চেহারা দেখিয়া আমাকেই প্রথম ধরিলেন।

ইঃ। তোমার বয়স কত?

আমি। আজ আঁকের দিন নয়, ছিলট্ আনি নাই।

ইঃ। শ্লেট কেন?

আমি। বয়সের হিসাব করিতে।

ইন্‌স্পেক্টর,—পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সোৎসাহ দৃষ্টিপাত করিলেন; পুনরপি পরীক্ষা আরম্ভ—

ইঃ। তোমরা ভূগোল পড়?

আমি। (মৃদুস্বরে) ভুও গোল করি।

ইঃ। পৃথিবীর আকার কেমন?

আমি। দাঁড়ির (।) মত।

ইঃ। না, ঠিক দাড়িম্বের মত নয়; তাহা অপেক্ষাও গোল।

আমি। সবই গোল।

ইঃ। তবে দাড়িম্বের মত বলিলে কেন?

আমি। কৈ তা ত বলি নি।

ইঃ। তবে বল, পৃথিবী কিসের মত?

আমি। আপনার মাথার মত।

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া গেলেন। সকলে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। দিন কতক পরে সংবাদ আসিল, বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ, পণ্ডিত মহাশয়ের অন্ন বন্ধ। *

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস।

মনুষ্যবর্গ।

পুরাকালে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ হইতে এক এক জন প্রতিনিধি আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন; সুতরাং ভারতবর্ষ একরূপ আদিম পার্লিয়ামেণ্ট। কোন ঋষি কোন দেশ হইতে আসেন ও তাহার কি কি প্রমাণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১। বাল্মীকি—বাহ্লীকের প্রতিনিধি। ইনি মোগল বংশের আদিপুরুষ; রামচন্দ্র ইঁহারই বংশ-সম্ভূত। উদয়পুরের বর্ত্তমান রাণা এই মোগলবংশ-উদ্ভূত: প্রমাণ—টডের রাজস্থান।

২। কশ্যপ—কাস্পীয় জাতির প্রতিনিধি। কাস্পীয়ান হ্রদ তাঁহারই নামে পরিচিত। এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে।

৩। গর্গ—জর্জিয়ানা (Georgiana) দেশ হইতে আসেন। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত করেন। প্রমাণ—মাণ্ডুক্য উপনিষদের গার্গী-উপাখ্যান, এবং হিরডটসের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ-বার্ত্তা। জর্জশব্দ গর্গ হয় বিকল্পে।

৪। ভরদ্বাজ—হিস্পানিওলার বারদোয়াজা (Vardwazza) হইতে আগমন করেন। ভরদ্বাজবংশে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান অতি মান্য। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুর কোন আধুনিক ব্যক্তি নহেন; অর্থলোভী শঠ ঘটকগণ প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্বের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া কতকগুলি কাল্পনিক কথা রচনা করিয়াছে মাত্র; কিন্তু এখন বিজ্ঞানের বিস্তার বৃদ্ধি সহকারে পুরাকালের বিঘোর কুজ্‌ঝটিকা বিদূরিত হইতেছে। বিষ্ণুঠাকুর বলিয়া

---

* প্রকৃত পক্ষে এ "আত্ম-চরিত" আমাদের নহে; আমরা একবচন নহি। ইহার বিবরণও আমাদের জীবনের সহিত সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। তবে এই প্রবন্ধ ডাক্তার বানরজীর প্রেরিত বলি। অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা আমরা পত্রস্থ করিয়াছি। বঙ্গদেশে আজকাল সকলেই লেখক, তথাপি একখানি পত্রও রীতিমত চলে না; কারণ, প্রবন্ধ পাওয়া দুষ্কর। সেই জন্য লেখক চটাইবার যো নাই। —পঞ্চানন্দ।

কোন ব্যক্তি ছিলেন না। ভরদ্বাজ ঋষি হিস্পানিওলা রাজ্যের বারদোয়াজা প্রদেশের বিষ্টুকুটারী (Vistukutari or Biscutukari) নগর হইতে আসেন, সুতরাং তাঁহাকে ভরদ্বাজ এবং বিষ্ণুঠাকুর দুই নামই দেওয়া হইয়াছে। প্রমাণ এখনও সন্তোষকর পাওয়া যায় নাই; আমরা অনেকগুলি পুরান আটলাস আনাইয়া আজি কয় বৎসর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেছি, কোথাও বারদোযাজা বা বিষ্ণুকুটারীর চিহ্ন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু ভরদ্বাজগোত্রজ মুখুটিবংশ যে স্পেনসম্ভূত, তাহা প্রমাণ না থাকিলেও নিশ্চয়; কেন না, ফুলের মুখুটি অর্থাৎ Chefdel-floro—এরূপ উপাধি স্পেন ভিন্ন কোথায় থাকা সম্ভব? আর, অনেক মুখুটি বিস্কুট বিক্রয় করে।

৫। গালব—প্রাচীন গাল (Gaul) রাজ্য হইতে আসেন। গালজাতীয়েরাই বর্ত্তমান ফরাসি জাতি; ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসা-বিদ্যায় নিপুণ। গ্যালেন (Galen) গালব মুনির ক্ষেত্রজ সন্তান, বৈদ্যবংশের আদিপুরুষ। প্রমাণ,—অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা।

[মন্তব্য—ধন্বন্তরিও ঐ গাল দেশজ। কিন্তু ধন্বন্তরি একজন লোক নহেন। মুসে ডুম (M. Dumas) এবং মুসে দান্তেরি (M. Danteri)—এই দুই নাম কোন কারণে যুক্ত হইয়া ধন্বন্তরি নাম সৃষ্ট হইয়াছে।]

৬। ঋষ্যশৃঙ্গ—সালোনিকা দেশের প্রতিনিধি। এটি বুঝিতে হইলেই ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকটি নিয়ম জানা কর্ত্তব্য। সালোনি শব্দে স্বার্থে 'ক' করিলে সালোনিক: সালনি—ক্রমে, সারাণি—পরে হারণি এবং হারিণ হয়। হারিণ—হরিণের অপত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ। ল স্থানে র এবং স স্থানে হ হওয়া ভাষা-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ; অতএব ইহার প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন বাণিজ্য।

বৃক্ষ-বর্গ।

এখনকার ভারত, আর তখনকার ভারত! মনে করিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলে, এমন একটি বীরও জুওলজিকাল গার্ডেনে নাই। এখন যে ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাইতেছে না; সে কেবল সেই প্রাচীন দুঃখের স্মৃতি জন্য। নিয়ত অশ্রুপাতে সেই উন্নতিপথ এখন কর্দ্দমময় হইয়াছে; এ কাদা চহলায় বাটীর বাহির হওয়া দায়, সুতরাং ভারত কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? যখন বড় বড় পোতাধ্যক্ষ পত পত শব্দে নীল পতাকা, শ্বেত পতাকা, কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভিন্ন

ভিন্ন দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, তখনকার ভারতের পোতাই কত। কিন্তু ভবভূতি এই বাণিজ্যের হ্রাস দেখিয়া যখন দুঃখ করিলেন;—"তেহি নো দিবসা গতাঃ", তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের গৌরব লুপ্তপ্রায়! তখনকার প্রসিদ্ধ সওদাগর আম্রবণিক হনুমন্তের নাম মাত্র অবশিষ্ট।

ফলতঃ আর আমাদের দুঃখের নিশা থাকিবে না। "স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।"

এখন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতবর্গ আমাদের শোকশেল উৎপাটনে ব্রতী হইয়াছেন; বরাহের ন্যায় ইঁহারা বেদোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, লেখনীদন্তে পূর্ব্বগৌরব অনেকটা চাগাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রস্তাববাহুল্য না করিয়া তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল সংগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পণ্ডিতবর্গ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে;—

১। ভারতের বাণিজ্য কাল্ডিয়া (Chaldea) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রমাণ, আজিও আমরা চাল্‌দা ফল (সংস্কৃত চালিদহ) খাইতে পাই।

২। যবদ্বীপে যবের ছাতু।

৩। বাটাবীয়াতে—বাতাবী লেবু (সংস্কৃত বাতাপীর।)

৪। মার্টামানে—মর্ত্তমান রম্ভা।

৫। ফ্রান্সে—ধুচুনি (ফরাসী Dejenner শব্দ হইতে)।

৬। স্কটলণ্ডে—কুমড়া (Cameronদের বাগান হইতে Job Charmock) আনয়ন করেন)। হাইলাণ্ডারেরা খুব কুমড়া খাইতে ভাল বাসে। প্লিনীর (Pliny) এই মত। ষ্ট্রাবো (Strabo) বলেন, কুষ্মাণ্ড—কামৎশ্চট্‌কা (Kamatschatka) হইতে আনীত।

৭। গর্ণসীতে (Guernsey)—গাঁজা।

৮। সোগদানা (Sogdana) প্রাচীন পারস্য—সজিনা গাছ।

৯। লুচুদ্বীপে—লিচু-ফল।

১০। জামেকা (Jamaica)—জাম। ইত্যাদি।

শ্রীহনুমান্ বীর।

বঙ্গীয় ভারত-হিতৈষীর প্রতিজ্ঞা-পত্র।

১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি বঙ্গদেশবাসী।

২ দফা। প্রাণ, দেহ এবং সুখ্যাতি অপেক্ষা অত্যল্প কম মাত্রায় ভারতবর্ষকে এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম পরিমাণে বঙ্গদেশকে আমি ভালবাসি।

৩ দফা। আমি ভারতবর্ষের উপকারার্থে মন এবং মুখ উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

৪ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বাঙ্গালা লিখিব না ও বাঙ্গালা পড়িব না।

৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরেজীতে নাই এমন কথাই নাই; যদি কিছু থাকে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না; মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করি।

৬ দফা। ইংরেজী প্রণালীতে সভা করা, সভার কার্য্যবিবরণ রীতিমত ইংরেজীতে লিখিয়া রাখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা এবং ইংরেজীতে আবেদনপত্র লেখা—এই কয়েক বস্তুর অভাব প্রযুক্তই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হীনাবস্থা, অন্য কারণ বশতঃ নহে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের ভারতবাসী নাই।

৮ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক নাই, চাষী প্রজা নাই, পল্লীগ্রাম নাই, গোঁড়া হিন্দু নাই এবং বুদ্ধিমান লোক নাই।

৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে হেতু অগ্নিসংযোগ করিলে খড় জ্বলে, সেই হেতু অগ্নিসংযোগ করিলে জলও জ্বলিবে।

১০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, কথা কহিবার সময়ে নাড়িবার জন্য এবং আহার করিবার সময়ে সহায়তা করিবার জন্যই হস্তের সৃষ্টি, ইহা ভিন্ন হস্তে অন্য প্রয়োজন নাই।

১১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনার ভার আপনি বহন করিবার চেষ্টা করা মহাপাপ, এবং সে চেষ্টার নাম স্বাধীনতা নহে।

১২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বোম্বাইবাসী অপেক্ষা ভাল ইংরেজী লিখিতে পারাই চরম বীরত্ব, এবং তাহাতেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

১৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, গায়ে মশা বসিলে রাজার উচিত যে, মশা তাড়াইয়া দেন, না দিলে রাজা অধার্ম্মিক। নিজে মশা তাড়ান মহাপাপ। রাজা যদি আমার প্রার্থনা মতে মশা তাড়াইবার লোক নিযুক্ত করেন, করিয়া তাহার ব্যয় আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন, তবে রাজার অন্যায়; এবং দিবারাত্রি সেই জন্য আমার চীৎকার করা উচিত।

১৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, কাগজ, কলম, কালী আর ছাপার খরচ অপব্যয় নহে। (১)

১৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, রাজনীতি ভারতবাসীর একমাত্র আলোচনীয় পদার্থ; যে ব্যক্তি অন্য কথায় লিপ্ত থাকে, অন্য কথা তোলে, সে আততায়ী।

১৬ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, রাজনীতির অর্থ—রাজাকে গালাগালি দেওয়া।

১৭ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, সভ্যতা, ভব্যতা, কর্ম্মশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, এ সমস্তই পোষাকের গুণে; জর্ম্মণীর লোককে সাঁওতালের বেশ দিলে, তাহারা ঠিক সাঁওতাল, এবং বানরকে ইংরেজের সাজ পরাইলে বানর ঠিক ইংরেজ হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

১৮ দফা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আদার দর কত, সে অনুসন্ধান কখনই করিব না; জাহাজের সমস্ত খবর রীতিমত রাখিব।

১৯ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বহু পরিশ্রমে অল্প উপার্জ্জন করা অপেক্ষা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভাল।

২০ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, শিখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার সমস্তই আছে।

২১ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে রাত্রিকালে সূর্য্যালোক থাকে না। অতএব প্রদীপ জ্বালা অন্যায়।

২২ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি আমার মতের পোষকতা করে না, সে মূর্খ; যে প্রতিবাদ করে, সে কৃতঘ্ন; যে বিরুদ্ধাচরণ করে, সে আততায়ী।

২৩ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ নাই, মতভেদ নাই, ভাষাভেদ নাই এবং স্বার্থভেদ নাই।

২৪ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, শরীরের মধ্যে মস্তকই প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অবশিষ্টাংশ অকর্ম্মণ্য ভারমাত্র।

২৫ দফা। আমি বিশ্বাস করি যে, বনমানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, এবং আমার ধর্ম্ম-পত্নীর বিবাহ হইয়াছে।

[আমরা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ভারত-হিতৈষী সম্প্রদায়ের সূচনাপত্র এবং নিয়মাবলীর একখণ্ড পাইয়া আমরা অনুগৃহীত হইয়াছি। যাঁহারা সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপরি-উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশ্য সভায় স্বাক্ষর করিতে হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সম্প্র-

* নহিলে পঞ্চানন্দ বাহির হইত না:—না?

শীতাপাওয়ালা।

দায়ের উন্নতি কামনা করি। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আমরা মত প্রকাশ করিব।—শ্রীপঞ্চানন্দ।]

পঞ্চানন্দের বক্তৃতা।

১।—বক্তৃতার হেতুবাদ।

শ্রীযুক্ত মিষ্টর্ লালমোহন বাবু বিলাতে গিয়া ভারি এক তরঙ্গ তুলিয়া আসিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ভারতবর্ষের বিলক্ষণ একটা উপকার না হইয়া যায় না। আপাততঃ বিলাতী বক্তৃতাতে ভারতবর্ষের নাম খব বেশি বেশি হইতেছে, ইহাই এক উপকার।

ভারতবর্ষের কথা লইয়া একটা আন্দোলন হইলে, সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন,"—এই কথাকে ধুয়া ধরিয়া হণ্টার্ সাহেব খুব বকাবকি করিয়াছেন; ইহার উত্তোর দিবার জন্য আর এক সাহেব "ভারতবর্ষের ঘাড়ে ইংলণ্ড কি চাপাইয়াছেন"—এই প্রসঙ্গ করিয়া অনেক লেখালেখি করিয়াছেন। ইহাই ত যথেষ্ট সৌভাগ্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু যখন কপাল ফলে, তখন জলে প্রদীপ জ্বলে—সৌভাগ্যের শেষ ঐখানেই না হইয়া পঞ্চানন্দের ঘাড়েও বক্তৃতার ভূত চাপিয়াছে। সেই জন্যই সকল বক্তৃতার সার যে বক্তৃতা, তাহার সার নিম্নে সুবিন্যস্ত হইতেছে।—

ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন? কি করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য, কেননা, বলা নিষ্প্রয়োজন। দেখিয়া হউক, ঠেকিয়া হউক, অন্যের নিকট শিখিয়াই বা হউক, কি করিয়াছেন, তাহা সকলেই টের পাইতেছেন, কিংবা পাইয়াছেন। তবে এ প্রশ্ন কেন? উনবিংশ শতাব্দীর আঁচলা ভাগে, বর্ত্তমান কালের এই পুচ্ছাংশে তবে এ প্রশ্ন কেন?—বক্তৃতা করিতেই হইবে, সেই জন্য। সূর্য্যের অধোদেশে সকলই পুরাতন, কিছুই নূতন নাই। ইহা পুরাতন প্রবাদ, যেহেতু কিছুই নূতন নাই। তথাপি সেই পুরাতনকে ভাঙ-চুর করিয়া আবার গড়িয়া পিটিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া,নূতনের মূর্ত্তি দিবার জন্য সমগ্র সংসার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। সকলেই যাহা দেখিতেছে, সকলেই যাহা শুনিতেছে, সকলেই যাহা জানিতেছে, তাহাই দেখাইবার জন্য, তাহাই শুনাইবার জন্য, তাহাই জানাইবার জন্য বক্তৃতা করিতে হয়। অতএব, ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিতে হয়; আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর স্বরূপ একটা বক্তৃতাও করিতে হয়। বক্তৃতাই সমাজের জীবনী-শক্তি।

বক্তৃতা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা প্রতিপন্ন করা গেল। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে কয়জন লোক কাজ করিতে প্রস্তুত হয়? আমি দেখাইব যে, বক্তৃতা যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তেমনি লাভজনকও বটে।

মনের কথা যে খুলিয়া বলে, সে যে পাগল, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। পক্ষান্তরে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি, ইহাও পণ্ডিতের কথা। অতএব বুঝিয়া কথা কহিতে পারিলে অর্থাৎ যেখানে উৎপীড়ন নাই, সেখানে সত্য কথাটা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলেই, দুই দিক্ রক্ষা করা হয়,—সাপ মরে, অথচ লাঠিখানি ভাঙ্গে না—নাম হয়, অথচ মিথ্যাবাদী বলিয়া বদনাম হয় না। কে বলিবে বক্তৃতা লাভজনক নয়? যে বাঙ্গালী, ইংরেজীভাষায় বক্তৃতা করে, অথচ "দেশের হিতের জন্য আমার জীবন যায়," কথায় বা ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশ করে, সে-ই প্রকৃত সারগ্রাহী ব্যক্তি;—দুর্লভ মানব জন্মে, তাহার ন্যায় মানব ততোধিক সুদুর্লভ। যাহাকে বলিতেছি, সে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না; যাহার হইয়া বলিতেছি, সে আমার কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিল না—বক্তৃতার ইহা অপেক্ষা বেশী বুজরুকী আর কি হইতে পারে বলো? এ প্রকার বক্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মজ্ঞ লোক কোথায় পাইবে বলো?

অতএব হে মহিলাকুল এবং ভদ্রগণ! আমি বক্তৃতা করিতেছি। ইংরেজী ভাষা আর গোমাংস, দুই আমার উদরে আছেন; কিন্তু হিন্দুর ছেলে, হিন্দু সমাজে চলা-ফেরা করি; দুই চাপিয়া রাখিতে হইবে। সেই জন্য ইংরেজিতে না হইয়া বাঙ্গালায় আমার বক্তৃতা। দোষ গ্রহণ করিবেন না, মার্জ্জনী ধরিবেন না, মার্জ্জনা করিবেন।

২।—ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন?

ইহা অতি অন্যায় প্রশ্ন। হণ্টার সাহেব পছন্দ করিয়া প্রসঙ্গের এরূপ নামকরণ করায় তাঁহার রাজভক্তির অভাব অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি যদি সাহেব না হইতেন, উপরন্তু যদি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের নিমক না খাইয়া থাকিতেন, এবং আরও নিমকের প্রত্যাশা না রাখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেও অপরাধ হইত না, তাঁহার প্লীহা ফাটাইয়া দিলেও বিধিমতে কেহ দণ্ডার্হ হইত না। কারণ, এরূপ প্রশ্নের ভঙ্গীতে ইংলণ্ড যেন ভারতের কিছু করিতে বাকী রাখিয়াছেন, এমন সংশয় স্বভাবতই হইতে পারে। বস্তুতঃ ইংলণ্ড কি না করিয়াছেন, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নুনের গুণ দেখান হণ্টার সাহেবের উচিত ছিল। ভরসা যে, তাঁহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল, ভাষার বাঁধুনিটা কম বলিয়াই একটা বেফাঁস কথা তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন।

ভারতের জন্য ইংলণ্ড না করিয়াছেন কি? কৃতঘ্ন ভারতবাসী ভিন্ন এমন প্রাণী কে আছে যে, ইংলণ্ডের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়াও ইংলণ্ডের ভারত-কীর্ত্তির প্রমাণ চাহিতে সাহস পায়? ধরিয়া যাও, গণনায় তোমার অঙ্গুলী ফুরাইয়া যাইবে; তথাপি ইংলণ্ডের কীর্ত্তি সংখ্যার কিছুই হইবে না। তথাপি ইংলণ্ডের আত্মত্যাগ, ইংলণ্ডের উপচিকীর্ষা; ইংলণ্ডের ভালবাসা, ইংলণ্ডের ধর্ম্মজ্ঞানের ভারতে যে পরিচয় আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিব। নতুবা পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর চৈতন্যসঞ্চার, জ্ঞানোদয় কিছুতেই হইতেছে না।

ইংলণ্ডের জন্য ইংলণ্ডে বসিয়া ইংলণ্ড কি করিয়াছেন, কিছু করিয়াছেন কি না, ভগবান্ জানেন; যে সমুদ্র ডিঙ্গাইতে পারে, সেই সে কথা বলিতে পারে; কিন্তু আমি পৈতাধারী ব্রাহ্মণতনয়, বাস্তভিটার চৌহদ্দীর ভিতরে থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিব; আর নিজে যাহা দেখি নাই, তাহার বিষয় বলিতে হইলে, ইংলণ্ডের নিজ মুখে যে কথা শুনি নাই, তাহা বলিব না; পাছে সত্যের অপলাপ হয়, সেই জন্য বলিব না। যাহারা মনে করে, সুখ্যাতির কথা আরোপ করিয়া বলিলে দোষ নাই, তাহারা নাট্টকার, তাহারা ভাণ্ড, তাহারা উচ্ছন্নে যাউক।

তবে দেখ, ভারতের জন্য ইংলণ্ড কি করিয়াছেন, কি সহিয়াছেন? সুসভ্য, শাস্ত্র-বিশারদ, ধর্ম্মষণ্ড, ইংলণ্ড ভারতের উপকার করিবেন বলিয়া, সেই উপকার করিবার উপায়বিধান উদ্দেশে আত্মাবমাননা স্বীকার করিয়া বেণের পুঁটুলী লইয়া, বৈদ্যের থলীবড়ী লইয়া ভারতের সহিত প্রথম পরিচয় করেন। উপকার করিবেন বলিয়া কত—কত—কতবড় বিস্তীর্ণ সাগরপারে আসিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। বলো ত, কৃতঘ্ন পামর, এ কলিকালে কয়জন ইহা করিয়া থাকে? হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিল, সত্য; হনুমান বিশল্যকরণী প্রয়োগ করিয়াছিল, সত্য; হনুমান্ মৃত্যুশর আনয়নার্থ, দৈবজ্ঞ সাজিয়াছিল, সত্য;—কিন্তু যদি বুদ্ধি থাকে, তুলনা করিয়া দেখো, ইংলণ্ডরূপ হনুমানের সমীপে তোমার হনুমান্ কলিকাও পাইতে পারিবে না। তথাপি, তোমার হনুমানের স্বার্থ ছিল, দৈববল ছিল, তদ্‌ভিন্ন সে ত্রেতাযুগের লোক, তখন অধার্ম্মিকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না—অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি—যাহার সাধ্য থাকে আমার দস্তানা তুলুক—আমার হনুমানের তুলনায় তোমাদের হনুমান্ মাছী হইতে ক্ষুদ্র, মশা হইতে দুর্ব্বল, তেলেপোকা হইতে নির্ব্বোধ, কেন্নু হইতে ঘৃণ্য। যদি লজ্জা থাকে, ও তুলনা আর তুলিও না।

আবার দেখো, ক্লাইব অসমসাহসী, রণপণ্ডিত, অমিততেজা, খ্রীষ্টধর্ম্মে-নাকানি-চুবানি-ইংলণ্ডের সন্তান। শুদ্ধ তোমাদের উপকার, ভারতের হিত, বঙ্গের উন্নতির জন্য ইহকালকে ভ্রূকুটী করিয়া পরকালের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আত্মাকে শয়তা-

নের জিম্মায় রাখিয়া, জাল, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা—কি না করিলেন, মানুষ হইয়া মানুষের জন্য কয়জন এতদূর আত্মবিসর্জ্জন দেখাইতে পারে?

ইংলণ্ড জানেন যে, জালসাজী বড় পাপের কর্ম্ম, ইংলণ্ড জানেন যে, পাপীর দণ্ড বিধান না করিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ইংলণ্ড জানেন যে, ভারতের উপকার করিতে হইলে ভারতের ভ্রান্ত সন্তানকে সৎপথ দেখাইতে হইবে। জানেন বলিয়া ভারতবর্ষকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্লানি স্বীকার করিতে হইলেও, নন্দকুমারকে ইংলণ্ড ফাঁসি দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। দুর্বৃত্ত নন্দকুমারের দুর্গতিতে পাপীর হৃদয় কম্পিত হইল, ধর্ম্মান্ধ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কৃপায় শিখিয়া লইল। এত ত্যাগ স্বীকার, এত ধর্ম্মোপদেশ দিতে আগ্রহ যাহার আছে, কোন্ লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকো যে, এ দেশে ইংলণ্ড ভারতের জন্য কি করিয়াছেন?

তুমি বলিতে পারো,—এ সকল গৌরবের কথা বটে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু বড় প্রাচীন কথা; এ কথার বলে সম্প্রতি সুখ্যাতির দাবী করা চলে না, দাবিতে তামাদী দোষ ঘটিয়াছে। মঙ্গল! আর পুরাতন কথা বলিব না, হালের ব্যবস্থা, হালের ব্যবস্থা, দেখাইয়াই তোমার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত করিতে পারি কি না, তাহা দেখো! ভক্তি তোমার অন্তরে আছে, তাহা জানি। আমি বক্তৃতা করিলে, সত্যের আবৃত্তি করিলে, তোমার প্রেমাশ্রু পড়িবেই পড়িবে।—

"বাহিরায় নদী যবে পর্ব্বত উদ্দেশে,
কার সাধ্য রোধে তার গতি?"—

ভারতবর্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে ইংরাজী ইতিহাস পড়ে নাই। ইংলণ্ড তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়। এমন স্বতঃসিদ্ধ কথার সবিস্তার উল্লেখ অনাবশ্যক হইলেও আমাকে উল্লেখ করিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, ইংলণ্ড কি করিয়াছেন।

এই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-কাঠাল-পাকানে গরমে তোমরা কাহাকেও আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত না দেখিলে অসভ্য বলিয়া থাকো, সে কাহার প্রসাদাৎ? এই যে কোচ, কেদারা, কাচের বাসন, আর্শী ফেরেমের অভাব হইলে তোমার ঘরের শোভা হয় না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকো, এ শিক্ষা কাহার নিকট পাইয়াছ? এই যে তোমার ভাষা তোমার দেশের চাষায় বুঝিতে পারে না, তুমি যে গুণে দেশের সাড়েপোনের আনা লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারো না, তাহাদের সংসর্গ ঘৃণাজনক মনে করো, এ গুণ কোথায় পাইলে? এই যে, পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়াও তুমি বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছ, মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া দিয়া পশু শালায় চাঁদা দিতে অভ্যাস করিয়াছ, এই যে কোলাকুলি তুলিয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া সম্ভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে শিখিয়াছ,—এ বিদ্যা কে তোমাকে

দান করিয়াছে? একটু ভাবিয়া দেখো, বুঝিতে পারিবে, ইংলণ্ড তোমাদের জন্য কি করিয়াছেন?

ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড ধনশালী করিয়াছেন! আসাণ্টিতে যুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; পারস্যের রাজা চীন দেশে বেড়াইতে যান, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; বিলাতের লোক বিলাতে বসিয়া চাকরী করে, ভারতবর্ষ তাহাদের মাহিনার টাকা দেয়; ইংলণ্ড ভারতের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না,—সে কৃতজ্ঞতায় খৃষ্টধর্ম্মের পাদরীদিগকে ভারতবর্ষ টাকা দেয়; ভারতরক্ষার জন্য ইংলণ্ডে সৈন্য থাকে, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; লাঙ্কাসিয়ারে দুর্ভিক্ষ হয়, ভারতবর্ষ টাকা দেয়; অধিক কি, এই যে প্রায় বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তাহার প্রতীকারের জন্যও ভারতবর্ষ অগ্রিম টাকা দিয়া রাখে; ভারতবর্ষের মত কোন্ দেশ ধনশালী? টাকা অনেকেই দিতে পারে, অথচ তাহারা কষ্ট পাইয়া দেয়; তাহা হইলে তাহাদিগকে ধনবন্ত বলা যায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সে কথাও বলিবার যো নাই। দোতালার গাঁথনি হইতেছে, নীচের তলা কাটিতে আরম্ভ করিল, এই টাকা যে, ভারতের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইন্দ্রালয় সদৃশ নূতন অট্টালিকা হইল, ঘর বড় সোঁতা; আচ্ছা ভাঙ্গিয়া ফেলো; ভারত টাকায় কাতর নহে; ঘর বড় গরম; উত্তম কথা, নূতন ঘর করো, টাকার কমি নাই। কলিকাতায় অনেক বড় লোকের বাস, অনেক গোলমাল, রাজকার্য্য এখানে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা কষ্টকর, বেস, সবল-বাহনে সিমলা যাও, পথখরচ, খাইখরচ, পোসখরচ কিছুরই অভাব নাই, টাকা দিতে ভারতের মুখ ম্লান হয় না; এমন ধনবান্ করিয়া দেওয়া সহজ কাজ নয়; তোমরা কি বলো, ইংলণ্ড এ কীর্ত্তি করেন নাই?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অরাজক ছিল; ভারত রাজা জানিত না, রাজ্য জানিত না; ভারতবাসী জন্মিত, খাইত, ঘুমাইত, আর বংশ রাখিয়া মরিত। এখন সে দুর্দ্দশা নাই; ভারতবাসী রাজনীতি জানে, সমাজনীতি বোঝে, ধর্ম্মনীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিন্তা তাহাকে করিতে হয় না, ইংলণ্ড স্বয়ং ভারতের হইয়া সেটা করিয়া লন; সমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান্ এক প্রকার চালাইয়া লন, আর ধর্ম্মের ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে দুইটা উচ্চ-বাচ্য করো উত্তম, না করো, নাই। এ সুখের কর্ত্তা—ইংলণ্ড।

অশান্ত অসভ্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শান্তি ছিল না, কেবল উপদ্রব ছিল; সেই জন্য বাণিজ্য ছিল না, সেই জন্য বাদসা স্বয়ং তাজমহল গাঁথিতেন, আর বেগম রেজার কাজ করিতেন। এখন ছড়ি হাতে বেড়াইতে যাও, শ্রীঘর না দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পাইবে না। বাণিজ্যের এমনই প্রখর স্রোত যে, তাঁতিকুল একেবারে ভাসিয়া গেল! শিল্পের এমনই উন্নতি যে, সুদৃশ্য হর্ম্ম্যে পাছে কেহ শঙ্কা ক্রমে প্রবেশ না করে,

এই আশঙ্কায় হর্ম্যগণ স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, বাহির হইতে অভ্যন্তর দেখাইয়া থাকে। ইংলণ্ডে এরূপ উন্নতি হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ড [illegible] করিয়াছেন।

অনন্ত কথা বলিতে গেলে অনন্ত কালও ফুরাইয়া যাইবে; সুতরাং আর কত বলিব? তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবাসী রাজভক্তিহীন। স্বয়ং রাজপুরুষ ইংরেজ মহাপুরুষ একথা যখন-তখন বলিয়া থাকেন, সুতরাং কথাটা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব। তোমরা ইংলণ্ডের আধিপত্যের চিরস্থায়িত্ব কামনা করিয়া থাকো, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া তোমাদের এই বিশ্বাসের পর বিশ্বাস কে সহ্য করিতে পারে? ইংলণ্ডকে তোমরা ভালো বাসো, ভক্তি করো: তাহাতে সকল মহাপুরুষের মন কুলায় না। হুগলীর জজ গ্রান্ট সাহেব মুসলমান পেয়াদাকে দিয়া সাক্ষীর শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণকন্যার ঘোমটা জোর করিয়া খোলাইয়া দিয়া অত্যাচার করিয়াছেন; মান্দ্রাজে মালটবী সাহেব একজন মুনসেফকে গুলি করিয়া ক্ষেপা সাজিয়াছেন—এ সব কথা তোমরা কেন বলো? অমুক আইনে অনিষ্ট হইবে,—অমুক টেক্স বসিলে উৎপীড়ন হইবে,—এ উৎপাতে তোমাদের কাজ কি? রাজার ঘরে গেল, তাহার পর লুণের কাভ ফেলে খরচ হইল, কি হিন্দুস্থানীকে বাঁচাইবার টাকা (১) দিয়া আফগানস্থানীর মুণ্ডপাত করা হইল—তাহাতে তোমাদের বলিবার অধিকার কি? ইংলণ্ড যদি চাও, তবে কটা কুকুরে কামড়াইলেও তোমরা কাঁদিতে পাইবে না—ইহা রাজনীতির ভক্তি অধ্যায়ের প্রথম পাঠ, তবে রে শিশু তোমরা এ কথা কবে শিখিবে?

সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষাদানে ইংলণ্ড এত অকাতর যে, রাজভক্তি শিখাইবার ব্যবস্থাও করিতে ত্রুটি করেন নাই, সে ব্যবস্থার নাম দুঃশাসনী ব্যবস্থা ওরফে ন-আইন।

পঞ্চানন্দ শপথ করিতেছেন, তিনি রাজভক্তির মধুপ অর্থাৎ মৌমা; মধু নাই সে কপালের দোষ।

খাও পরো নৈবেদ্য দাও,
গৌর-প্রেমে মত্ত হও,
রাজনীতি, রাজনতি, গৌরপদে কর মতি,
গৌর করিবেন গতি, চরণে শরণ নাও—

পঞ্চানন্দ এই মন্ত্রের উপাসক।

(১) দুর্ভিক্ষ ফণ্ড।

আইন-স্তোত্র।

হে ৯ নয় আইন! তুমি বাঙ্গালা লেখার গুরু মহাশয়,বেত্র হস্তে পাঠশালার সক ছাত্রকে সর্ব্বদা শাসাইতেছ, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের পৃষ্ঠদেশের ছিল্‌কা ছাড়াইতে পারো, তুমি ইঙ্গিত করিলেই আমাদের পাততাড়ি গুটাইতে হয়। অতএব তোমাকে গড় করি।

হে ৫ পাঁচ আইন! তুমি আমাদের ভূস্বামী রাজা, কারণ তোমার এলাকা বাস করি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরাইতে পারো, আমাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে পারো। আমাদের পদস্খলনও হইতে পারে, বিচিত্র নহে পা-টলা দেখিলে তোমার পাহারাওয়ালাদের বড় প্রতাপ বৃদ্ধি হয়,—সেই জন্য তোমাকে এত ভয়। অতএব তোমাকে গড় করি।

হে ৯+৫ ন-পাঁচ চৌদ্দ আইন! আমরা তোমার ধার ধারি না- কেহই নহি সত্য; কিন্তু আমাদের অনেক মুরুব্বীর মুরুব্বীর তুমি মুরুব্বী। তুমি ইষ্ট করিতে পারো, সুতরাং অনিষ্টও করিতে পারো। অতএব তোমাকেও গড় করি।

হে ৯×৫ নয়-পাঁচ পয়তাল্লিশ আইন! তোমার অপার মহিমা; অপরিমেয়শক্তি যে কথা কহে, হাসে, হাঁচে, নিশ্বাস ফেলে, বিচরণ করে, চড়িয়া বেড়ায়, সেই তোমার আয়ত্ত এবং অধীন। তোমার গুণগান করিতে হইলে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে তুমি নিত্য, তুমি সৎ, তোমার কথা কি বলিব? তোমাকে গড় ত করিই; তোমার পায়ে পড়ি; তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তোমরা যৌথরূপে এবং পৃথক্ ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিও। হরি হরি ওঁ।

গ্রাণ্ট-ঘোমটা সংবাদ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ

ঠাকুরেষু—

বিবিধ বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন,—

হুগলীর জজ গ্রাণ্ট সাহেবের কাছে দাওয়ার একটি মোকদ্দমা হইবার সময়ে এক ব্রাহ্মণকন্যা সাক্ষ্য দিতেছিলেন। যে-কোন কারণেই হউক, সাহেব নাকি তাঁহার ঘোমটা (সাহেবের নয়, সেই ব্রাহ্মণকন্যার) খুলিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন, এবং একজন মুসলমান প্যাদা সেই আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করে।

সাধারণীর (১) চরিত্র আপনার অবিদিত নাই; সাধারণী নাকি এই কথা লইয়া পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে, রটনা করিয়া বেড়ায়; তাহাতে সাধারণীর সঙ্গে যাহাদের আলাপ আছে, এমন আর দশজনেও এই কথা লইয়া ঘোঁট করিতে থাকে। এখন নাকি শুনিতেছি যে, কথা আমাদের ছোট লাটের কর্ণকুহরে উঠিয়াছে, আর তিনি ইহাকে অত্যাচারের কথা মনে করিয়া তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

তদন্ত যদি সত্য সত্যই হয়, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। গ্রাণ্ট সাহেবের অনেক শত্রু; আমি বিশেষ জানি, অনেক বাঙ্গালী, গ্রাণ্ট সাহেবের চাকরীটি পাইবার দুরাশায় সময়ে সময়ে তাঁহার অনেক দুর্নাম রটনা করে, এবং অনিষ্ট-চেষ্টা করে। সেবার সেই বাঁকুড়ায় এমনি এক সাক্ষীকে চড়-মারা না কি একটা কথা তুলিয়া অমন অমায়িক স্বভাবের সাহেবটীকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিল। যাহাই হউক, যদি তদন্ত হয়, সাহেবকে একটা কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে। আমি আইন-আদালত লইয়া চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছিলাম; সম্প্রতি মোক্তারদের আইন হইয়া আমার অন্ন মারা যাইবার আশঙ্কা হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে গ্রাণ্ট সাহেবের একটু উপকার করিতে পারিলে, হয় ত আমারও উপকার হইতে পারে। এই জন্য তাঁহার কৈফিয়তের একটা মুসাবিদা আমি পাঠাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া সাহেবের কাছে আপনি পাঠাইয়া দিবেন।

কৈফিয়ৎ।

লিখিতং শ্রীগ্রাণ্ট সাহেব, সাহেব জজ, জেলা হুগলী, কস্য কৈফিয়ৎ-পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর আলীর পরোয়ানা অত্র আদালতে আগত হইলে অধীন সেরেস্তাদার ও সেশিয়ান মোহররকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিবার আদেশ করিবাতে তাহারা যে মর্ম্মে রোয়দাদ দাখিল করিয়াছে, তাহার একখণ্ড নকল পৃথক্ রোবকারী সহকারী সহ পাঠান এবং এ পক্ষ স্বয়ং তৎকালে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, বিশেষ হাল অবগত না থাকা গতিকে তন্মর্ম্ম মতে যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে এ পক্ষের দোষ প্রকাশ পায় না।

আমার হাল এই যে, বিচার কার্য্যে পক্ষপাত করিতে আইন ও সর্কুলর মতে নিষেধ থাকায় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হয়। বাঙ্গালী পুরুষগণ মুখে ঘোমটা দেয় না এবং স্ত্রীলোকগণ ঘোমটা দেয়, ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে;

(১) ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সেকালের "সাধারণী" মাসিক পত্রিকা।

কিন্তু আদালতে তাহা গ্রাহ্যযোগ্য নহে। সেই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ঘোমটার খাতির করা যাইতে পারে না এবং বিচার কার্য্যের সময় সহজে ঘোমটা না খোলায়, তাহাতে আদালতের অবজ্ঞা বলা যাইতে পারে, এ পক্ষের উকীলগণের দ্বারাও ইহা সাব্যস্ত হইবেক অধিকন্তু সাক্ষীদের মুখভঙ্গী দেখিয়া বিচার করিবার কথা আইনে স্পষ্ট প্রকাশ, তাহাতে মুখ দেখা আবশ্যক হইলে, কি প্রকারে ঘোমটা থাকিতে পারে?

আরও জানা যাইতেছে যে, ঘোমটা খুলিবার হুকুম দেওয়া সত্য হইলেও, যে পেয়াদা ঘোমটা খুলিয়া দিল, সে ব্যক্তি পর পুরুষ বটে, কিন্তু তাহা এ পক্ষের দোষ বলা যাইতে পারে না, পেয়াদার নিজের দোষ বলিতে হইবে এবং সে মুসলমান, ইহাও তাহারই দোষ; এমতাবস্থায় যদি কাহারও রুটী মারিতে হয়, তাহা হইলে পেয়াদার রুটী মারাই আইন এবং বিচারসঙ্গত হয়। এ পক্ষেরও সেই অভিপ্রায়, তাহাতে হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।

[পঞ্চানন্দ কেবল বানান দোরস্ত করিয়া দিলেন, অন্য সংশোধনে তিনি অশক্ত। সাহেবের নিকট পাঠাইবার সুযোগ না থাকায়, ইহা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া গেল।]

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (১)। *

শ্রীচরণকমলেষু—

ভূমিলুণ্ঠিত অশেষ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। পূর্ব্ব পত্রে যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে চাহিয়াছি; সুতরাং আপনিও সেজন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া আমার এই পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কৌতূহলের পায়ে আর তুড়ুম ঠুকিয়া রাখা উচিত নয় বিবেচনায় আমিও সত্বর হইতেছি।

যুদ্ধের নাম শুনিলে সকলের মনে একটা ধারণা হয় যে, অনেক লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গোলা-গুলি ছুড়িতে থাকে ও তরওয়াল চালাইতে থাকে এবং সেইরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান আর একদলের আক্রমণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে একদল সংখ্যাতে দুর্ব্বল হইয়া পলায়ন করে, অপর দল তাহাদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া যায়; যাহাকে পায় মারে, কাটে অথবা ধরিয়া আনে। আমি যে যুদ্ধ দেখিলাম, ইহা যদি সে রকমের হইত, তাহা হইলে তাহার বিবরণ লিখিয়া আমি কষ্ট পাইতাম না। এখানকার যুদ্ধ অতি আশ্চর্য্য এবং কৌশলময়। কাবুলবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে জানে না। এক-এক মল্লযুদ্ধ করিতে ভাল বাসে বলিয়া আমার বোধ হইল।

কাবুলে যাহার বাস, সে-ই আমাদের শত্রু; যে পুরুষ কাবুলের ভিতর পদচারণা

---

* সেই সময় আফগানিস্থানে ছোট খাট রকমের একটি যুদ্ধ চলিতেছিল।

করে, সে-ই মল্লযুদ্ধে অগ্রসর হয়—রবার্ট সাহেব এ কথা আমাকে আগে হইতে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রেস কমিশনর মহোদয়ের প্রদত্ত চসমার গুণে আমি নিজেও দেখিলাম যে, তাহা যথার্থ। তাহাতেই যুদ্ধের প্রক্রিয়াটা ভালমতে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

লড়াই এইভাবে হইতেছিল;—মনে করুন, একজন কাবুলী আমাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতেছে, এবং তাহার দুই হাত দুই পাশে দুলিতেছে বা দুলিতেছে। ইংরেজী ভাষায় বাহু এবং অস্ত্রের একই নাম—আর্ম্ম; সুতরাং ইংরেজী মতে সে ব্যক্তি সশস্ত্র শত্রু, যুদ্ধার্থে অগ্রসর, অতএব সাব্য পক্ষে বধ্য। আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ইংরেজ পক্ষে, এই মীমাংসা হইবামাত্র তাহাকে রণে পরাভূত করিবার উপায় স্থির করা আবশ্যক; অমনি পাঁচ সাত জন সৈনিক সেই কাবুলীটার দিকে দৌড়িল, দুই চারিজন দুই একটা ঘুসা ঘাসি খাইল, তাহার পর কাবুলী ধরা পড়িল। রবার্ট সাহেব সেনাপতি, তথাপি অবিচারক নহেন; তাঁহার সম্মুখে পাপিষ্ঠ কাবুলী আনীত হইবামাত্র, তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি কাবানিয়ারি (১) সাহেবকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। আমিও দেখিতে পাইলাম, তাহার বিস্মরবিষ্ট মুখে হত্যার চিহ্ন সমস্ত দেদীপ্যমান; তখন আমার চসমা আর রবার্ট সাহেবের একমত হওয়াতে, তিনি আমাকে বলিলেন—খুন করিলে ফাঁসি হয়, ইহা যথার্থ কি না?

আমি উত্তর দিলাম একশ বার। তিনি বলিলেন—দয়ার সহিত বিচারকে মোলায়েম করিতে হইবে; এক শ বার ফাঁসি দেওয়া বিচারসঙ্গত হইলেও আমি দয়া করিয়া ইহাকে একবারের বেশী ফাঁসি দিব না। তৎক্ষণাৎ কাবুলীর একবার মাত্র ফাঁসি হইয়া গেল।

আমি রবার্ট সাহেবের বীরোচিত এই দয়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতর দুইটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, কাবানিয়ারি সাহেবের দেহ যতই কেন প্রকাণ্ড হউক না, তাঁহার হত্যাকারী প্রমাণে যত লোকের ফাঁসি হইতেছে, তত লোকে তাঁহাকে আঘাত করিতে হইলে, একটা আঘাতের উপর এক-শ দেড়-শ আঘাত করিতে হইয়াছিল; নহিলে তাঁহার শরীরে কুলায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কাবুলীরা এমনই অল্পপ্রাণ এবং দুর্ব্বল যে, তাহাদের মধ্যে একজনও রবার্ট সাহেবের দয়ার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না,—যেমন কেন কাবুলী হউক না, একবার মাত্র ফাঁসি দিলেই তাহার প্রাণান্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায়, যে জাতির এইটুকু সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরেজের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ করা সাজে না। বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান্, এই জন্য এই ইংরেজরাজের এত ভক্ত।

---

(১) Cavagneari.

অধিকন্তু দুঃখ এই যে, ফাঁসির আগে যত কাবুলীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সকলেই আমাকে বলিল যে,—দুইদিন অগ্রপশ্চাৎ মরিতেই হইবে, সুতরাং মরিতে কোন দুঃখ নাই। কিন্তু এ ভাবে মরিতে একটু কষ্ট হয়, অস্ত্র-হস্তে মরিতে পাইলে এ কষ্ট হয় না। আমার বিবেচনাতে এ কথা কতকটা সত্য; কারণ, ফাঁসিতে মরিতে হইলে দম বন্ধ হয়, তাহাতে অধিকতর কষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন কাবুলীকে আমি একদিন পরামর্শ দিলাম যে, এমন করিয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করাই উচিত। তাহাতে সে অসভ্য মূর্খ আমাকে কতকগুলা কটু-কাটব্য বলিয়া শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল,—কাবুল পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাবুলী কখনও হইবে না; যেমন মূর্খ তেমনি শাস্তি; পাষণ্ডের ফাঁসি হইল।

এইরূপে ফাঁসি দেখিতেছিলাম, আমোদ করিতেছিলাম এবং বিশ্রম্ভালাপ করিতে-ছিলাম, এমন সময়ে সহসা একদিন রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন যে, আমাদিগকে ঘেরাও করিতেছে, চলো আমরা এখান হইতে পলাইয়া যাই। "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি আগে আগে দৌড়িলাম; তাহার পর শেরপুরে আসিয়া আবার আমরা জমা-য়েতবস্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। বাহিরের খবর কিছুমাত্র জানি না। রবার্ট সাহে-বের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় দিনযাপন করিতেছি, সেই কথাবার্ত্তার সারমর্ম্ম লিখিয়া এ পত্রের উপসংহার করিতেছি। যদি ফিরিয়া না যাই, কিম্বা আর পত্র লিখিতে না পাই, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক গৃহিণীর হাতের শাঁখা খাড়ু আপনি খুলিয়া দিবেন, এবং আমার শালগ্রামের সেবার ভার লর্ড লিটনের (১) উপর দিবেন, এই আমার অনুরোধ।

আমাদের শেরপুরে ঘেরাও হইবার দিন, দুঃখ প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন,—দেখো, তুমি যেমন উপযুক্ত লোক, অন্য কাগজের সংবাদ-লেখকেরা যদি তেমনি হইত, তবে আমার ভাবনা কি? তাহারা যুদ্ধের কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। অথচ আমাকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমাকে যুদ্ধ ছাড়িয়াও ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহারা এখানে না থাকিলে, এই যে আমরা বন্দী অবস্থায় আছি বলিলেই হয়, ভারতবর্ষে অদ্যই সংবাদ যাইত যে, সমস্ত কাবুলীকে ধ্বংস করিয়া আমরা জয় লাভ করিয়াছি। এই জন্য সংবাদদাতাদের সম্বন্ধে এমন নিয়ম করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিতে পারে। আমি দেখিলাম, কথা যথার্থ।

আর একদিন রবার্ট সাহেব বলিলেন,—দেখো, কাবুলের যুদ্ধ অধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া

(১) তখনকার বড়লাট।

অনেকে অনুযোগ করিতেছে, কিন্তু ইহা বড় অন্যায়। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম; সুতরাং ইহার প্রচার আবশ্যক, এ দিকে ধর্ম্মের প্রতি সহজে কাহারও অনুরাগ হয় না।* এমত স্থানে যুদ্ধ ভিন্ন নিরুপদ্রবে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম কিরূপে এখানে আনা যাইতে পারে? আমি বলিলাম—তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যীশু মনুষ্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন; এখন তাঁহার জন্য মনুষ্যের প্রাণ লওয়াতে কোনও দোষ হইতে পারে না; অধিকন্তু অর্থনীতির নিয়মানুসারে সুদ লওয়া পাপ নহে, সুতরাং প্রাণের শোধ প্রাণ, তাহার উপর সুদ, ইহাতে দোষেরত কিছুই দেখি না। আরও এক কারণে খৃষ্টধর্ম্মের অনুরোধে যুদ্ধ করা আবশ্যক; মুসলমানেরা এক হাতে কোরাণ, অন্য হাতে তরওয়াল লইয়া যায়; যাহার বেলা যেমন, সেই মত না করিলে চলিবে কেন? অন্যথা, অপরের ধর্ম্মে যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। আমার কিছু উন্নতি করিয়া দিবেন বলিয়া এই দিন সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন; কিন্তু ফাঁসি মনে পড়াতে আমার উন্নতি-স্পৃহা একবারেই লোপ পাইয়াছে। সাহেবকে বলিলাম, আপনার অনুগ্রহই যথেষ্ট, উন্নতির প্রয়োজন নাই, তবে কপালে থাকিলে আমিও বন্ধ করিতে পারিব না; আপনাকেও এত আগ্রহ করিতে হইবে না।

সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি? সাহেব বলিলেন—লর্ড লিটন দেশে কাব্য লিখিয়া কাব্যের বিষয় ফুরাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন একখানি বীররসাশ্রিত মহাকাব্য তাঁহার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অনুরোধেই যুদ্ধ। কবির কল্পনা এবং রাজনীতিজ্ঞের কৌশল এমন সমন্বিত দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইল।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একটী স্বাধীন জাতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করা অন্যায় বলিয়া যে, সকলে এত গোলযোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম, যাহারা এমন কথা বলে, তাহারা বোকা। ইংরেজের মত স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি জগতে আর নাই; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা পাইবে, ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, তাহা আত্মসাৎ করিবার যত্ন করিবে, ইহাতে দোষ কি? বরং তাহা না করিলে স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারে।

অদ্যকার মত শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (২)।

শ্রীপাদপদ্মেষু,—

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। অনুমতি পাইলে এইবার স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালীর ছেলে, এত দূরদেশে থাকা সহজেই কষ্টকর তাহাতে এই বিষম দেশে আসিয়া, এই বিষম সময়ে বাস করিতে আমার যাহা হইতেছে, আপনি অন্তর্য্যামী, আপনার কখনই অবিদিত নাই।

শেরপুর হইতে আমরা বাহির হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে চিন্তাবেগ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। কে যে কাহাকে মারিতেছে, কে কেন মরিতেছে,—তাহার কিছুই আর বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল নিত্য নিত্য নূতন ভয়ের কথা কর্ণগোচর হইতেছে। আজি শুনিলাম, মীর বাচ্ছা আমাদের মাথা কাটিতে সজ্জা করিতেছে, কাল শুনিলাম মহম্মদজান কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া লোক সংগ্রহ করিতেছে। ভাবিয়া দেখুন, আফগানস্থানের বাচ্ছা কাচ্ছা সকলেই যদি লাগে, তবে ইংরেজের ভাগ্যে যাহাই হউক, আমার প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া যাওয়া দুর্ঘট হইবে।

অধিকন্তু কাবুলে যে সকল হিন্দু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা পর্য্যন্ত পলায়নপরায়ণ হইয়াছে। ব্যাপারটা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন। তবে আমি শুধু এক ধুতি-গামছার অনুরোধে বসিয়া প্রাণটার উপর হাত দিই কেন, বলুন। আফগানস্থান জয় করার কাজ সমাধা হউক, এখানে ইংরেজের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হউক, তখন না হয় আমাকে একটা বড় চাকরি দিয়া একবার এইখানে পাঠাইয়া দিবেন।

আরও এক ভাবনা আমার হইয়াছে। আমি যে এই সকল পত্র লিখি, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকার দরুণ রবার্ট সাহেব সবগুলি খুলিয়া দেখেন না। এ দিকে বিলাতে ও ভারতবর্ষে অনেক মিথ্যাবাদী লোক আছে; তাহারা রবার্ট সাহেব এখানে অনেক অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া রটনা করিতেছে; সেই জন্য সেদিন রবার্ট সাহেব এক লম্বা চৌড়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, দরকার না হইলে অত্যাচার করা হয় না এবং যতটুকু দরকার তাহার বেশী অত্যাচারও করা হয় না। আমার অক্ষর এবং এবারত দু-ই ভালো বলিয়া, রবার্ট সাহেব আমাকে দিয়াই ঐ পত্রখানি লেখাইয়াছেন, সেই জন্য এত সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি। এই পত্রের মর্ম্মে অনেকে মনে করিতে পারে, অল্প হউক, অধিক হউক, আবশ্যক হউক, অনাবশ্যক হউক, রবার্ট সাহেবের কিছু অত্যাচার আছে। অথচ আমি ইতঃপূর্ব্বে যে সকল পত্র আপনাকে লিখিয়াছি, তাহাতে সাহেবের দয়া, গুণ, ধর্ম্মজ্ঞান এবং সদাশয়তার উচিত সুখ্যাতি করিয়াই লিখিয়াছি। এখন ভাবনা এই যে, যদি ভবিষ্যতে এই সব কথার আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং

সাহেবের কবুল জবাবের বিপরীত আমার পত্র লেখা হইয়াছে বলিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া একটা দণ্ড বিধান করে, তবে সর্ব্বনাশ হইবে। আর সৈনিক-দণ্ডবিধানে তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। উড়িতে আমি অক্ষম, তাহা ডানাতেই কি, আর তোপেই কি? বাঙ্গালীরা উড়িতে জানে না, তাহাও আপনি জানেন; অনেক ভদ্রলোক ছাদ হইতে, বারাণ্ডা হইতে, উড়িবার চেষ্টা করিয়া শেষে প্রাণটা উড়াইয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বোপরি স্থানত্যাগের সঙ্কল্প করিবার কারণ এই হইয়াছে যে, আমীরের বাটী দখল করিবার সময়ে রুষিয়ার যে সকল পত্র পাওয়া যায়, কবিকল্পনাকুশল, দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র, রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহা হইতে এক ভয়ানক অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমীরের সাহায্য লইয়া রুষিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত দখল করিবে, এবং ইংরেজ-সেনাপতি, পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ, প্রজাবৃন্দ, সকলেই তৎকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে; এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যে সকল ঘাঁটি আছে, সে সমস্ত রুষীয় মন্ত্র বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রে ধরাশায়ী হইবে।

এ কথায় যে আশঙ্কার বিষয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আশঙ্কা বশতই বেয়াকুব খাঁকে কৌশল করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া বন্দী করা হয়, এবং দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবেন, এখনও এক একজন আফগান-বাসীকে 'গবর্ণর' ইত্যাদি পদ দিয়া বিশ্বাসভাজন করা হইতেছে। শুনিলাম, ইহাদিগের রপ্তানি করিয়া আফগানস্থানে লোকসংখ্যা কমাইবার কল্পনা আছে; রবার্ট সাহেবকেও আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন, বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে সরিয়া গেলেন, আমি তাঁহার কথা ভালো বুঝিতে পারিলাম না। তবে রুষীয় পত্র বাহির হইবার পরে এ সকল হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে আমি বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করি।

সম্প্রতি ভাবনার চোটে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আমি মনোযোগ করিয়াছি। তাহার কিয়দংশ আপনার নিকট পাঠাই; উৎসাহ পাইলেই সম্পূর্ণ করিব।

আংলো-আফগান অভিধান।

শব্দ	অর্থ
রুষ-শঙ্কা	ভারতবর্ষকে অবিশ্বাস।
বৈজ্ঞানিক সীমা	রক্তের নদী এবং হাড়ের পাহাড়।
দুর্ভিক্ষ	যুদ্ধ।

শব্দ	অর্থ
শক্ত	স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের মাথায় যে প্রাণপণ করে।
সন্ধি	বন্দী।
দেশাধিকার	দাঁড়াইতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন, মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ স্থান পদতলস্থ রাখা।
সেনাপতিত্ব	এরূপ ভাবে সৈন্য সংস্থাপন করা যাহাতে বিপৎকালে এক দল অন্য দলের সাহায্য করিতে না পারে।
অসভ্য জাতি	যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্যতার নিয়ম এবং ধর্ম্মের শাসন মানিবার প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহাদের শিল্প-মহিমার অপূর্ব্ব চিহ্নস্বরূপ অট্টালিকাদি ভগ্ন ও গৃহাদি ভূমিসাৎ করিলে কলঙ্ক নাই।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (৩)।

শ্রীচরণকমলেষু,—

দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব পত্রে অনুমতি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আজ্ঞাপত্র বা তাড়িতবার্ত্তা কিছুই না পাইয়া মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কাবুলীরা যে রকম অধার্ম্মিক এবং দুষ্টপ্রকৃতি, তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহারা ডাক মারিয়াছে এবং তার কাটিয়া দিয়াছে; নহিলে আপনার মত দয়াশীল লোকে কখনও থাড্‌নাড্‌া হাতের ভাত ব্যঞ্জন খাইবার সাধে বাধা দিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ফলে, স্পষ্ট কথা বলাই ভালো, আপনি নিষেধ করিলেও আর আমি কাবুলে থাকিতাম না। কেন থাকিতাম না, তাহা বলিতেছি।

প্রথমতঃ, কাবুলীদের মত মূর্খ লোক পৃথিবীতে আর নাই। মূর্খ লোকে নিজের ভাল বোঝে না, কাবুলীরাও বোঝে না; সেই জন্য ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দেখুন, বলি রাজা মূর্খেরই ভয়ে স্বর্গের বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ অতি সুসভ্য সুপণ্ডিত এবং সদাচারী জাতি, বাঙ্গালায় আসিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া, ইঁহারা যে যে উপকার করিয়াছেন—ইংরেজের উপকারের কথা বলিতেছি না, আমাদের উপকার যাহা করিয়াছেন—তাহা প্রাণ থাকিতে কেহ ভুলিবে না। কাবুলীরা উপকারের কথায় আমল দেয় না; কেবল বলে যে, ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেও আমরা লইতে চাহি না, সাধ্যপক্ষে অপকার করিতেও দিব না। দিবে না—তবে মরো। যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, শাস্তিও হইতেছে।

আর, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী—এসব কথার মানেই ত আমি বুঝিতে পারি না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি; ইহার আবার ভিন্ন জাতি কি? কাবুলীরা এমনই মূর্খ যে চারুপাঠ পর্য্যন্ত ইহাদের পড়া নাই; চারুপাঠে মানব জাতির কথা অনেক বা'র লেখা আছে। তদ্ভিন্ন পৃথিবী সমস্তই এক; এক মাটী, এক জল, এক সকলই। তবে আবার ভিন্ন দেশ কি? হায়! ইহাদের ইহকাল ত গেলই, পরকালে পরিণামে ইহাদের কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমার হৃদয় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাবুলবাসিগণ! এখনও তোমরা অনুতাপ কর, এখনও পাপচিন্তা হইতে বিরত হও, এখনও ক্ষমা-প্রার্থনা কর, অবশ্যই মঙ্গল হইবে। যে হেতু অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তই স্বর্গের দ্বার। বাস্তবিক, আর আমি কাবুলে আসিতে ইচ্ছা করি না; তবে যদি যীশুর ছোট ভাই, সিদ্ধার্থের হাড়িকেলা-জ্ঞাতি, চৈতন্যের খুড়া—সেনজা মহাশয়, কাবুলে পদার্পণ করিয়া, কাবুলীদিগকে স্বার্থপরতা, বিষয়ীর ভাব, এবং ভ্রান্ত স্বদেশ আদির বোধ ভুলাইতে পারেন, আমারও সঙ্কল্প তাহা হইলে টলিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কাবুলের সমস্ত ব্যাপার এখন একঘেয়ে গোছ হইয়া পড়িয়াছে, রকমওয়ারি না থাকিলে মজা নাই, বিবরণ লিখিয়াও সুখ নাই। ঐ রুষিয়া এল,—ঐ আমীর তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিল,—ঐ যুদ্ধের আয়োজন করিল—ঐ আজ মারামারি—ঐ ওখানে কাটাকাটি—ইহা ছাড়া নূতন কথা কিছুই নাই। তা একটা কথা ভাঙ্গচুর করিয়া বাড়ী বসিয়াই লেখা যায়: তবে আর বাসা-খরচ করিয়া, রাম রাবণ উভয়ের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া, প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজনটা কি? তাহার উপর আগাগোড়া কথার ঠিক রাখিয়া পত্র লেখা খুব সহজ ব্যাপার মনে করবেন না; কারণ, নানা মুনির নানা মত। কাবুলীদের উপর অত্যাচারের কথা লইয়া যে প্রকার বাদ-বিসম্বাদ হইতেছে, তাহাতে 'না হাঁ' যাহাই বলিব, তাহাতেই সর্ব্বনাশ। দোহাই ধর্ম্মের, আমি ইহার কিছুই জানি না, সাতাশী জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে বলিলেও আমার স্বস্তি, সাত-শ ফাঁসি হইয়াছে, তাহাতেও স্বস্তি, মোটে হয় নাই, তাও স্বস্তি। ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনও পত্রেই আঁকযোকের কথা লিখিয়া ফেলি নাই। তবে বুক ঠুকিয়া এই ফাঁসির সম্বন্ধে এক কথা আমি বলিতে পারি; যাঁহাদের ফাঁসি হইয়াছে, ইংরেজ যদি এ যাত্রা কাবুলে শুভাগমন না করিতেন, তাহা হইলেও সে লোক কটার ফাঁসি হইত। নিতান্ত পক্ষে ফাঁসি না হইলেও তাহারা গলায় দড়ি দিয়াও মরিত। যাহার যাহা কপালে লেখা আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে; মানুষ কেবল নিমিত্তের ভাগী। সমস্ত নিয়ত, আর কিছুই নয়, নিয়ত। তবে আর অত্যাচারের কথা ওঠে কিসে, তাই ত বুঝিতে পারি না। যুদ্ধ হইতেছে, সে নিয়তের; লখা, টাকা খরচ হইতেছে নিয়তের লেখা

লোক মরিতেছে নিয়তের লেখা; ইহা যে না মানে, সে নেহাত অব্রাহ্মণ—সে খিরিষ্টান।

তৃতীয়তঃ, শর্করকন্দ—(রাঙ্গা আলুকেও শর্করকন্দ বলে, এ তাহা নয় জায়গার নাম)—রেলওয়ে প্রস্তুত; সুতরাং এখন আর কাবুলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকাটা যুক্তিসিদ্ধও নয়। প্রয়োজন নাই, কেন না, আপনার যখন ইচ্ছা হইবে তখনই এই রেলওয়ের কল্যাণে লোকগাড়ীতে হউক, মালগাড়ীতে হউক, ডাকগাড়ীতে হউক, আমাকে বস্তাবন্ধী করিয়া আবার চালান দিতে পারিবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ গাড়ীতে খবর পাঠাইতে পারিব। কাবুলে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ লিটন বাহাদুর পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন যে, রুষিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তিনি রুষিয়ার নাম করেন নাই বটে; কিন্তু বলিয়াছেন,—"That despotic and aggressive military Power which has for years been steadily advancing to her (i e' that of the Indian Empire) gates"—"বহু বৎসর ব্যাপিয়া রোক করিয়া যে অত্যাচারপরায়ণ এবং আক্রমণরত সৈনিকশক্তি ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।" আমি ক্ষীণজীবী বাঙ্গালী, বলুন দেখি, আমার কি পশ্চাৎসর হওয়া উচিত নহে? আর লিটন বাহাদুরের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাবুলে না আসিয়াও হয়ত কাণ্ডকারখানা অনেক দেখা যাইবে। হা ভগবান! আবার কি "চর্চ্চ চর্চ্চ উডেন্ চর্চ্চ" (১) শিখিয়া টাকা রোজকার করিতে হইবে?

চতুর্থতঃ, আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সংবাদ পাইয়াছি যে, কেহ কেহ আমার পত্রে যে সকল কথা লেখা থাকে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, এমন কি কেহ কেহ আমার কাবুলে আসা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না! এ দুঃখে আর কি কাবুলে থাকিতে ইচ্ছা করে? তবে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা এ কথা বলে, তাহারা কি কাবুলে আসিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? তবে বাপু কেন? সংবাদ-পত্রের নীতি, রাজত্বের নীতি এ সকল বোঝো না, অথচ গোল কর কেন?

বিদেশে অনেকেই যায়, আবার দেশেও ফিরিয়া আইসে; কিন্তু শুদ্ধ সেই কথা বলিবার জন্য লম্বাচৌড়া একখানা পত্র লেখা ভালো দেখায় না। অন্ততঃ কেবল সেই কথা লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়াটা কখনই ভালো নয়। সেই জন্য পথে যাহা দেখিয়াছি কি

(১) ইংরেজের প্রথম আমলে সামান্য দুই চারি কথা ইংরেজি শিখিয়াই বাঙ্গালী সাহেবদের সহিত কথা বার্ত্তা চালাইত এবং দুই পয়সা উপার্জ্জন করিত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে; যথা,—রথের দিন বাবুকে সঙ্গে করিয়া সাহেব রথ দেখিতে বাহির হইয়াছেন; রথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি? বাবুটির বিদ্যায় কুলায় না দেখিয়া অল্প কথায় তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, ইহা "চর্চ্চ চর্চ্চ উডেন চর্চ্চ স্যার"। চর্চ্চ—সাহেবদের গীর্জ্জা।

শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে এক জায়গার বৃত্তান্ত এবার লেখা যাইতেছে। জায়গাটার নাম বৈদ্যনাথ ওরফে দেওঘর।

বেলা ৯টার সময়ে বৈদ্যনাথের ষ্টেশনে ভ্রমণ ভঙ্গ (১) করিলাম, অর্থাৎ রেলের গাড়ী থেকে নামিলাম। মাটীতে পা দিতে না-দিতে একজন আসিয়া আমাকে বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু আপনি কি বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে যাবেন?" আমি বলিলাম হাঁ; তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি আসিয়া আবার ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেও বলিলাম হাঁ; আরও লোক আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল; সেই এক উত্তর পাইল। সকলেই আমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র। তখন আমার মনে হইল যে, আমি যে পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ সংবাদদাতা তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, নহিলে এত আদর-যত্ন কেন? আবার মনে করিলাম, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তবে আমি যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তাহা নাকি আমার চেহারা দেখিলেই জানা যায় (আমি অনেকবার আর্শীতে আমার মুখ দেখিয়া এটা টের পাইয়াছি), তাই ইহারা বুঝিতে পারিয়া এ প্রকার করিতেছে। তখন একটু চিত্তপ্রসাদ আপনা-আপনি হইল, মনে হইল যে, ধরায় হলে আমার জন্মগ্রহণ সার্থক, দুর্লভ মানব জন্মে আমার মত ব্যক্তি আরও দুর্লভ। আহ্লাদের সঙ্গে অহঙ্কার, সেই সঙ্গে একটু অভিমান মিশিয়া আমার হৃদয়জলধি ওতপ্রোত হইতেছে; চক্ষুদ্বয়ের কোণ দিয়া জ্যোতিঃশলা নির্গত হইতেছে, গ্রীবা একটু উন্নত, একটু বঙ্কিম, হইয়াছে—এমন সময়ে এই ভাবে একবারে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি—ও মা! গাড়ী হইতে যে নামিতেছে, তাহারই এত সম্মান, এইরূপ অভ্যর্থনা—কাহারই আদর কম নয়! কি আহ্লাদ! কি দর্পহরণ। দুঃখ ত হইলই, লজ্জা হইল, একটু রাগও হইল। আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি একা লইয়া দেওঘর যাত্রা করিলাম। পাল্কী পাওয়া যায়, রাগে লইলাম না। গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, লজ্জায় লইতে পারিলাম না। মনের দুঃখে একায় চড়িয়া, শরীরের সব কয়খানি হাড় কেন এক ঠাঁই হইবে না, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম।

মানুষের দুর্গতি আরম্ভ হইলে পদে পদে অপমান ঘটে। আমার অহঙ্কার, তাহার পরে লজ্জা হইয়াছে, এটা বোধ হয় সকলেই টের পাইয়াছিল; নতুবা একটা লোক আমার পাছে পাছে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে দৌড়িবে কেন। তামাসা করিতেছি না, সত্য সত্যই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে একজন দৌড়িতেছিল। এই দুঃখের অবস্থায় একার গাড়োয়ান আমার কোলে বসিয়া রাধাশ্যামের প্রণয়সঙ্গীত ধরিয়া দিল। লোকটা রসিক বটে, কিন্তু তাহার রসিকতায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

(১) যাহাকে বাবুরা ব্রেক-জার্ণি বলেন।

অথচ তাহার সঙ্গ ছাড়িবারও উপায় ছিল না। তখন এমনই ঘৃণা হইল যে, সেখানে যদি দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে এক্কা হইতে নামিয়া পৃথিবীকে দ্বিধা বিদীর্ণ হইতে বলিতাম, এবং বিদীর্ণ হইলে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতাম। যাহা হউক, নিরুপায় হইয়া সেই বিট্‌লে চাবীকে কিঞ্চিৎ ঘুস্ দিয়া ক্ষান্ত করিলাম এবং ফিরাইয়া দিলাম। অহঙ্কার যে অন্যায়, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু এত লঘু পাপে এরূপ গুরুদণ্ডও অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে, আমার চতুর্দ্দিকেই পাহাড়গুলা ঘাড় উঁচু করিয়া আমার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি করিতেছে। পরে বুঝিয়াছি যে,সেটা পাহাড়ের স্বভাব, আমার জন্য বিশেষ করিয়া কিছু করে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, দুঃখের দশায় মানুষের স্বভাবতই এইরূপ মনে হয় যে, সকলই বুঝি তাহাকে টিটকারী করিবার জন্য চলা-ফেরা করিতেছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মও তাহার নাই।

দেওঘরে পৌছিলে তবে আমার দুঃখের অবসান হইল; আবার সুখ হইল। রবার্ট সাহেবই হউন, প্রেশকমিশনারই হউন, আর লাট সাহেবই হউন, বোধ হয় কেহ আমার জন্য তারে খবর পাঠাইয়া থাকিবেন; কারণ দেওঘরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী—ডেপুটী মাজিষ্টর, ডাক্তার, ইস্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি—এবং যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ভ্রমণ বা আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, সকলেই খুব ধুমধামের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন; এবং আমার সুখ-সচ্ছন্দতা সংসাধন বিষয়ে তৎপর হইলেন। বাস্তবিক মান্যব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করা সকলেরই কর্ত্তব্য, বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে। আমি এই সকল ব্যক্তির ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়াছি। যদিও ইঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি ইঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হইতেছে না।

দেওঘর অতি ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু দেখিলাম, এই দুধের বাটীতেই এক তুফান (১) হইতেছে। তাহার বিবরণটা লিখি।

দেওঘরে কিঞ্চিৎ শিবমূর্ত্তি আছে, কিঞ্চিৎ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিবমূর্ত্তি বড়জোর আট আঙ্গুলের বেশী উঁচু নহে! কিন্তু এই আট অঙ্গুল শিবের পসার হাই-কোর্টের বড় বড় কৌসুলী হইতে বেশী। শিবের মক্কেলদের কর্ম্মার্থী এবং যাত্রী বলে। এখন গত শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে বিস্তর যাত্রী আসিয়াছিল; চিরদিনই আসিয়া থাকে, এবারও আসিয়াছিল। তবে অন্যান্য বৎসর থাকিবার স্থানের ভাবনা থাকে না, এবারে থাকিবার স্থান পায় নাই। সরকার বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন যে কাহার

(১) Storm in a tea-pot. এখন হইলে তিনি বোধ হয় দুধের বাটীতে না লিখিয়া, চা'য়ের বাটীতেই লিখিতেন।

বাড়ীতে কত যাত্রী থাকিতে পাইবে, সরকার হইতে তাহার নিয়ম করিয়া দেওয়া হইবে। আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই নিয়ম করিতে হইবে বলিয়া বাড়ীওয়ালাদের কাছে কিছু কিছু দক্ষিণা পাইবেন বা লইবেন।

এইরূপ নিয়ম করা অ ত সঙ্গতই বলিতে হইবে; কারণ আইনবিরুদ্ধ জনতা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাত্রীদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সুতরাং তাহাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই শান্তি ভঙ্গ, এমন কি রাজবিপ্লব পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কয়জন লোক একত্রে থাকিতে পারিবে, ইহার নিয়ম করিয়া দিলে এ আশঙ্কার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। মনে করুন, যেন একটা স্থানে ৬ জন লোক থাকিবার অনুমতি আছে, একদল যাত্রীর মাধ্যে একজন পিতামহী, একজন মাতামহী, দুই মাসী, এক পিস্তুতো ভগিনী, আর এক বৌ, আর সেই বৌয়ের কোলে আড়াই বৎসরের এক মেয়ে। এখন এই মেয়েটী নিয়মিত সংখ্যার উপর হওয়াতে তাহাকে স্থানান্তরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই, এ দলের দ্বারা কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ তাহারা শিশুর চিন্তায় অন্যমনস্ক থাকিলেই রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিবার অবকাশ পাইবে না।

দুঃখের বিষয় এই যে বৈদ্যনাথের রাজদ্রোহী লোকগুলা এ নিয়মের বশীভূত হইতে স্বীকার করে নাই; এবং অনুমতি লইয়া বাসা দেওয়া দূরে থাকুক, অনুমতিও লয় নাই, বাসাও দেয় নাই। এখানে শ্রীপঞ্চমীর সময়ে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শীতও কিছু ভয়ানক গোছের হইয়াছিল। দুষ্টপ্রকৃতি লোক সকল এই সুযোগ পাইয়া সরকার বাহাদুরের আইনের জন্য এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে এই বলিয়া তারে খবর, দরখাস্ত ইত্যাদি নানারকমে এক হুলস্থুল আরম্ভ করিয়া দিল। ইহারা রটনা করিয়া দিল যে, বিস্তর লোক শীত-বৃষ্টিতে মারা গিয়াছে, সরকার বাহাদুর আইন করাতে এবং আশ্রয় না দেওয়াতে এইটা হইল। সরকারের পক্ষ হইতে ডেপুটী বাবু বলেন যে, যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং কেহই মরে নাই। এখন এই মরা না মরার তদন্ত হইতেছে; এ দিকে আইনকে কতকটা অপরাধী বিবেচনা করিয়া সরকার বাহাদুর আইনকে আপাততঃ সম্পণ্ড করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

তদন্তের ফল যাহাই হউক, আমার বিবেচনায় যাত্রী মরা না মরা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কথাই প্রকৃত। একজন লোকও ষোল আনা মরে নাই, ইহা হইতে পারে, কিন্তু মনে করুন, পাঁচশ লোক যদি আদমরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আড়াইশ লোক মরিয়াছে বলিলে দোষ কি? তবে আইনের দোষ কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ শীত-বৃষ্টি দৈবাধীন কার্য্য, আইনের দ্বারা কিছু শীত-বৃষ্টির সৃষ্টি হয় নাই, আইনের উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ হইলে বরং শীত-বৃষ্টি নিবারণ হওয়াই উচিত ছিল।

যাহাই হউক, আমার মতে বাধা দেওয়া আইন জারী থাকাই উচিত, এবং অনুমতির দক্ষিণায় যে টাকা উঠিবে, তাহাতে কলিকাতায় একজন পাদ্রি বাড়াইয়া দিলেও হইবে। কিম্বা ফিরিঙ্গীদের জন্য একটা বে-খরচা পড়িবার স্কুল করিয়া দিলেও চলিবে।

আপনি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেই আমি সুখী হইব; ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (৪)।

শ্রীচরণকমলেষু—

সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ প্রভুর শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ ভৃত্যের ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিশেষ। পরে শ্রীচরণসমীপ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে শ্রীযুক্ত বেসকমিশনার মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিলাম।

দরজায় অনেক ধাক্কা-ধাক্কির পর তাঁহার ঝী আসিয়া খুলিয়া দিল; আমি তখন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কম্পিতাঙ্গে শ্রীযুক্তের হুজুরে হাজির হইলাম। ঝী আমাকে দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে গেল। আপনি না কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথাই লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এত বিস্তার।

হাইড্রোফোবিয়ার রোগী জল দেখিলে যেমন আঁৎকিয়া উঠে, শ্রীযুক্ত আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ সেইরূপ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমি না বসা পর্য্যন্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে রহিলেন। তাহার পর আমাকে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হেতু আগমন?

তখন তদীয় উপহার জন্য যে বর্দ্ধমানছড়াটী লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা দিয়া বলিলাম, হে জনবুলের গৌরব, আমি কাবুলে যাইব। আমার অভিসন্ধি বুঝিবার জন্য শ্রীযুক্ত বলিলেন, এই যে কাবুলে এত কারখানা করা যাইতেছে, ইহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম,—চূড়ান্ত।

শ্রীযুক্ত। পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহাতে তোমার মত কি?—সেও চূড়ান্ত!

শ্রীযুক্ত। লর্ড লিটন সম্বন্ধে তোমার মত কি?—চূড়ান্ত!

ভাঙ্গিয়া বলিতে আদেশ করিলে আমি নিবেদন করিলাম,—কাবুলের কারখানা বিষয়ে লোকে বলে যে, গবরমেণ্ট অন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষনিবারণের টাকা দিয়া যুদ্ধ করাটা ভাল হয় নাই। আমার মতে তাহা

নহে। ভারতবাসী নেমক-হারাম; কেবল টাকার কথাই বোঝে, আরে বাপু, আগে অর্থাৎ ইংরেজের আমলের আগে, চোর-ডাকাইতে সর্ব্বস্ব লইত, তখন ত খবরের কাগজে হাঙ্গামা কর নাই। টাকা কার? টাকা ত গবরমেণ্টের। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষনিবারণের টাকা দুর্ভিক্ষনিবারণের কার্য্যেই ব্যয় হইতেছে। মধ্যে হইতে মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া লওয়ার মত, একটা চৌহদ্দীর যদি পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণও বন্ধ নাই, কারণ এই দুরন্ত শীতে যে সকল বেহারা ও কুলী, ও দেশীয় সৈন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে—যুদ্ধে কেহ মরে নাই, মরিবে না, মরিলেও সে মরা, মরাই নয়—তাহাদের অভাব হেতু (কারণ যে মরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পেট এবং মুখ নিশ্চিত মরে; এবং সে আনিয়া টানিয়া যে বাচ্ছাটাচ্ছাদের আহার যোগাইত তাহারাও মরে) চাউল এবং গোধুম অবশ্য সস্তা হইবে। তাহা হইলে বিলাতে রপ্তানি করিবার সুযোগ হইল। এ দিকে দুর্ভিক্ষও হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে নিয়মগুলির ত কথাই নাই। যুদ্ধের সময়ে সত্য কথা প্রকাশ হইলে অনেক দোষ, তাহা আমি অবগত আছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলে ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদ ডাকে ইউরোপে যায়; সেখানে রুসিয়ার চক্ষে পড়িলে রুষিয়া ভাষায় তাহার তর্জ্জমা হইতে পারে; সেই তর্জ্জমা আসিয়ার মধ্যস্থলবর্ত্তী রুসিয়ার কর্ম্মচারীরা কাবুলের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া অনায়াসে কাবুলীদিগকে জানাইতে পারে। তাহা হইলেই বিভ্রাট। বিশেষতঃ সত্য কথা কোনও সময়েই ভাল বস্তু নহে। আমি ত প্রাণান্তেও বলি না।

তৃতীয়তঃ, এই সমুদয় কার্য্য বা অন্য কোন কার্য্য সম্বন্ধেই লর্ড লিটনের দোষ নাই এবং হইতে পারে না; কারণ লর্ড লিটন এ সকলের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কেনই বা তিনি এসকল জানিয়া মাথা ঘামাইতে যাইবেন। ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা রকম আচার ব্যবহার। এ সকলের কিছুই লিটন বাহাদুরের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি এখানে আসিয়া যাহা করিবেন, বিলাতে বসিয়াও তাহা করিতে পারিতেন, এ সহজ কথা যে বোঝে না, তাহার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট। লিটন বাহাদুর কবি, বড় লোকের ছেলে, সৌখীন, তাই অভাগাদের দেখা দিয়া ভারতভূমি পবিত্র করিবার জন্য কষ্টকে কষ্ট, দূরদেশকে দূরদেশ না মনে করিয়া, কালাপানি পার হইয়া, লালপানি গণ্ডুষবৎ করিয়া ত্রিপাস্তর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা কি আমি জানি না?

আমি আরও বলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত বলিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার মত সারগ্রাহী লোক ভারতবর্ষে অল্প আছে, নহিলে, এত দুর্দ্দশা কেন?

তাহার পর আমি বলিলাম যে, তবে অনুমতি দেন ত বিদায় হই, বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাহ্নিক করিতে হইবে।

সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত আমাকে একখানি ছাড় চিঠি, একখানি গলায় ঝুলাইবার তক্তি, এক যোড়া বুলু রঙের চসমা দিয়া বলিলেন, ইহা কদাচ ভুলিও না, কদাচ ফেলিও না। আমি বলিলাম, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, ধ্যানে, ভোজনে, পানে, ইত্যাদিতে এই আমার সম্বল, এই আমার সম্বল, এই আমার সম্বল।

তথা হইতে গতকল্য কাবুলে পৌঁছিয়াছি। এখানে অতিশয় শীত, নীলবর্ণের বরফ পড়িতেছে, এবং লোকগুলা নীল বাঁদরের মত দেখাইতেছে। রবার্ট সাহেব আমাকে খুব ভালবাসেন। অদ্য সকালে কাহনটাক ফাঁসিকাঠ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এইগুলি তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছি; গলা পাই, উত্তম; না পাই, তাহাতে কিছু ফাঁসির অপমান হইবে না।

এই বলিয়া আমার হাতে ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখি, সাহেবদের খোরাক ফুরাইয়াছে। অন্য খোরাক না আসা পর্য্যন্ত ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে সাহেবদের কষ্ট হইতেছে। বাজে অর্থাৎ দেশী লোকদের নিমিত্ত ছোলায় কুলায় না বলিয়া অন্য প্রকার (১) ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাদের এক প্রকার বর্দ্দাস্ত আছে বলিয়া কেহই দ্বিরুক্তি করিতেছে না।

এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল। লড়াই যে প্রকার হইতেছে; কল্য তাহা সবিশেষ লিখিব।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

উকীল-মোক্তারের আইন।

এবার ভুক্কার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে। যাহারা আইনের দোহাই দিয়া, আইন বেচিয়া—খান, পরেন, এবার তাঁহাদের সম্বন্ধে এক আইন জারি হওয়াতে তাঁহারা বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

প্রধান ভাবনা মোক্তারদের ভাগের কথা লইয়া। উকীল মনে করিতেছেন, ভাগ না দিলে, কাজ যুটিবে না; মোক্তার ভাবিতেছেন, ভাগ না পাইলে উকীলদিগকে এত টাকা দেওয়া কেন? যেখানে টাকা বেশী আছে, সেখানে না-হয় বিলাতী সাহেবকেই দেওয়া যাইবে।

মোক্তারেরা যদি এ পরামর্শ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য সরকার হইতে একটা উপাধি ও খেলাত পাওয়া উচিত। এখন

---

(১) আজোলা।

দুর্গোৎসবেও ব্রাহ্মণ ফেলিয়া সাহেবনিমন্ত্রণের প্রথা হইয়াছে, তবে ওকালতীতে না হইবে কেন? উপরে নীচে চাপ না পড়িলে, ভারতবাসীর জ্ঞানযোগ হইবে না। উকীলদের জ্ঞানযোগের এই অবসর, —উপরে সাহেব, নীচে মোক্তার! বাছা সকল, টিপে ধর্‌বে, ছাড়বে না।

কিন্তু উকীলদেরও তাদৃশ ভয়ের কারণ নাই। পঞ্চানন্দের এক বন্ধু বলিয়াছেন, উকীল তিন জাতীয়।

প্রথম, ময়ূর,—ইহারা পুচ্ছবলে অর্থাৎ প্যাকাম দেখাইয়া খান; ইতর লোকে ইহাকে বলে—পসার, ক্ষমতা, সময়, অথবা কপাল। ইহাঁদের ভাবনার কারণ নাই, যতদিন প্যাকাম আছে, ততদিন চিড়িয়াখানায় ইহাঁদের মান যাইবার নহে।

দ্বিতীয়, কাক—ইহাঁরা ছেলে-পুলের টোকা হইতে মুড়িটা, লাড়ুটা অথবা আস্তাকুড়ে এটোটা কাঁটাটা খুঁটিয়া খায়: ইহাঁদের কেহই যত্ন করিতে নাই, কাহারও প্রত্যাশাও নাই, তথাপি এক রকমে পেটটা ভরে, জীবনটা কাটে। ইহাদেরও ভাবনা নাই।

তৃতীয়, কোকিল,—ইহারা পরের বাসায় প্রতিপালন হয়, পরের আধার খাইয়া প্রাণ বাঁচায়, সময় পাইলে কুহু কুহু করে, আর বসন্ত এবং বিরহীর কাছে নামে একটু খাতির পায়, কাজে পায়না, বরং গালি খায়। ভাবনা ইহাদেরই জন্য।

নেটিব্ সিবিল সার্ব্বিস।

অর্থাৎ

কাল আদমিদের গোরাঙ্গপ্রাপ্তির ঘোষণাপত্র।

তদীয় উৎকৃষ্টতা ঐ রাজপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রিসভার মধ্যস্থ বড়লাট সাহেব (১) সন্তুষ্ট হইতেছেন ঘোষণা করিতে, তাঁহার ভালবাসার ধন ভারতবর্ষের প্রজাগণের প্রতি যে, তাহাদের দুঃখনিশার অবসান হইল। কোন্ কালে, শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী, অধুনা ভারতেশ্বরী দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় এবং চক্রীদের চক্রান্তে কুহকিত হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ কিছু মাত্র থাকিবেক না, এবং [illegible] ও গোখাদক একাকার হইয়া যাইবেক এবং গুণ থাকিলেই [illegible] পিঠে;—সেই সকল কথা লইয়া কেরেববাজ [illegible] প্রজাগণ মহা এক গণ্ডগোল করিতেছিল, তাহাতে ক্রমাগত কয়েকজন লাট [illegible]

---

(১) His Excellency the Viceroy and Governor General in Council.

প্রাণে প্রাণে লাটগিরি নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান লাট কিছু খোষমেজাজী ও হাঙ্গামাপ্রিয় না হওয়াতে, তদীয় উৎকৃষ্টতার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে। সে বিবেচনায়, উক্ত তদীয় উৎকৃষ্টতা প্রাণতুল্য শ্রীমান্ প্রজাগণকে তোপে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতিশয় অধিক, এবং উড়াইয়া দিলে পঙ্গপালের মত স্থানান্তরে পড়িয়া, ইহারা শস্য নষ্ট করিতে পারে। তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, যে জন্য সর্ব্বদা তদীয় উৎকৃষ্টতা চঞ্চল আছেন, এবং যাহার উত্তম বন্দোবস্ত করণে তিনি ক্ষমবান্ আছেন। অতএব চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বড়লাট সাহেব সৃষ্টি করিতেছেন, এবং এতদ্দ্বারা সৃষ্ট হইল, এক নূতন জাতীয় জীব, যাহা না হিন্দু না মুসলমান, নাস্তি শ্বেত, নাস্তি কৃষ্ণ, কিছুই নহে অথচ সকলই বটে, নির্গুণ অথচ গুণাত্মন। আর লাট সাহেব এতদ্দ্বারা ডাকিতেছেন, তাহাদিগকে "নেটিব সিবিল সার্বিস্" অর্থাৎ কালা আদমিদের গৌরাঙ্গ-প্রাপ্তি।

ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে যে, পিতৃপুরুষের পাপগণ সন্তানকুলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভুক্ত হইবেক। সেই অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় উৎকৃষ্টতা এই বিধান করিতেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির বাপ দাদা কোনও প্রকারে সম্ভ্রম ও সম্পদ হাসিল করিয়া থাকে, এবং যদিস্যাৎ সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ইতর সাধারণের সহিত বিদ্যাশিক্ষারূপ ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাঁপাইয়া গিয়া থাকে, অথবা চক্র কাটিয়া বহির্গত হইয়া থাকে, অথবা মোটেই বড়মানুষীরূপ আস্তাবলের বাহিরে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উক্ত কালোগৌরাঙ্গপ্রাপ্তির আশা রহিবে। ইহার প্রতি কারণ হইতেছে যে, হাটে বাজারে যে জহরৎ বিক্রী হয়, তাহা দাম দিলেই পাওয়া যাইতেছে, এবং শস্তাও বটে, তবে যে রত্ন খনির তিমিরাবৃত গর্ভে গোপনে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে, শাস্ত্রানুসারে—"মৃগ্যতে হি তৎ"। আর বিশেষতঃ সকলেই অবগত আছে যে, কোম্পানী বাহাদুরের আমলে ছাতা ধরিয়া কত জন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বড়মানুষ হইয়া গিয়াছে। ইদানীং সে প্রথা বন্ধ হইয়া কেবল বর্ণমালার অক্ষর সকল নানা রকমে সাজাইয়া, কাহাকেও দুই, কাহাকেও তিন অক্ষর দেওয়া যাইতেছিল, কিন্তু এত ব্যয়ভূষণ করিয়া অক্ষর কিনিতে অনেকে প্রকাশতঃ না হউক, মনে মনে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, তদীয় উৎকৃষ্টতা ইহা টের পাইয়াছেন। তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সন্তানদের প্রতি একটা কিছু করা উক্ত উৎকৃষ্টতা যুক্তিসিদ্ধ এবং যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

ইহাও নিয়ম করা হইয়েছে যে, যে সকল ব্যক্তি কালা হইয়া গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত হইবেক, তাহারা "নেটিব" রহিল, অতএব দরবারে কিম্বা এজলাসে কিম্বা প্রকাশ্য স্থানে জুতা পায়ে দিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেক না। যাহাদের নিতান্ত সাধ হইবেক, তাহারা জুতা পায়ে দিয়া শয্যায় শয়ন করিতে পারিবেক, তাহাতে আপত্তি করা

যাইবেক না; ইহা সওয়ায় ইহারা বিলাতী কোট গায়ে দিবেক না। অপিচ তাঁহারা "সিবিল" হইল, অতএব পেনটুলান্ পরিধান করিবেক, এবং হ্যাট্ তদভাবে বড় বুচনিতে থানফাড়া জড়াইয়া মাথায় দিবেক; ইহাতে অন্যথা না হয়। এতদ্ভিন্ন ইহারা চাপকান্ বা চীনা কোট কিম্বা অন্য প্রকার নেটিবগলিত গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে পাইবেক না। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তি "সার্বিস্" ভুক্ত হইল বিধায় ইহারা সর্ব্বদা ঘড়ির চেইন কিম্বা অন্য কোন প্রকারের চেইন দিন রাত্রি গলায় পরিবেক।

ইহাও নিয়ম হইতেছে যে, সামাজিক ব্যবহারে ইহারা কদাচ সাহেবদের সহিত না মিশ্রিত হয় বা হইবার উপক্রম বা চেষ্টা না করে। ফলতঃ যদি ইহারা কালা আদমি-দের সহিত সামাজিকতা করে, তাহা হইলে "সিবিল সার্বিস" হইতে আবছর্ খারিজ করা হইবেক।

এই ব্যক্তিগণ আসনে বসিয়া থালা পাতিয়া ভাত ডাল চচ্চড়ি কদাচ না খায়। কিন্তু ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, টেবিলে বসিয়া কাঁটা চামচের সংস্রবে ইহারা না খাইবে, তাহা হইলে অস্ত্রবিষয়ক আইনে দণ্ডার্হ হইবেক। মাঝামাঝি এই বিধান হইতেছে যে, টেবিলের নীচে, খালি মেঝের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ইহারা গুঁড়া-গাড়ি খাইতে, ও ছিটা ফোঁটা খাইতে ও হাড়-গোড়খানা লেহন করিতে সত্ত্ববান্ ও অধিকারী হইল।

যাহাদিগকে এই দলভুক্ত করা যাইবেক, তাহারা দুই বৎসর কাল নিয়ত হাডুডুডু বা কপাটী খেলিয়া বেড়াইবে এবং সে জন্য সরকারি তহবীল হইতে ভাতা পাইবেক।

এই দলভুক্তদিগকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলিতে হইলে "নেটিব সাহেব" অথবা "সিবিল বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে। যাহারা ইংরেজী জানে না, নেহাত পক্ষে, তাহারা [illegible] টাকার মুচলেখা লিখিয়া দিলে বলিতে পাইবেক— "[illegible]।"

আদেশক্রমে
শ্রীস্বর্গীয় সরকারি,
মোতরজ্জম্।

সিমলা পাহাড় [illegible],
বাংগুরে চানোয়ারা

বেহারে বাঙ্গালী কেন?

কোথাকার রাজা-রাজড়া কলিকাতা আসিয়া সাহেব-সুবোদের ভোজ দিয়া গিয়াছেন। সুখের কথা বটে।

পাঁজিতে লেখে যে, কলিকালে অন্নগত প্রাণ। বেদে লেখে যে, চারি যুগেই আহারগত প্রণয়। সেই জন্যেই বলা গেল, এমন ভোজের খবর সুখের কথা বটে।

এই সব ভোজের আগে ইংলিশম্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—বেহারে বাঙ্গালী কেন? এই ভোজের পর ইংলিশম্যান আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—বেহারে বাঙ্গালী কেন? প্রশ্নের উত্তরে এক জন বাঙ্গালী বলিয়াছেন,—ভোজের ভেল্কী বড় প্রসিদ্ধ। উত্তরের সারবত্তা বোঝা যায় নাই।

যথার্থ কথা বলিতে হইলে দুঃখের বিষয় বৈ কি?—বেহারে বাঙ্গালী কেন? হাকিম বাঙ্গালী, আমলা বাঙ্গালী, ডাকঘরে বাঙ্গালী, রেলে বাঙ্গালী,—যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবল বাঙ্গালী দেখি—এ অত্যাচারের কথা বৈ কি? উত্তরে আর এক বাঙ্গালী বলেন—দোষ বিধাতার, বাঙ্গালী জন্মায় বেশী! এ উত্তরও মনোমত হইল না।

বেহারে বাঙ্গালী কেন? এ কথার জবাব না দিয়া, অপর একজন পাল্টা এক সওয়াল করেন,—বাঙ্গালায় বেহারী কেন? দারবান্ বেহারী, পাখাটানে বেহারী, চাকর বেহারা বেহারী ইত্যাদি। এ উত্তরও প্রচুর হইল না।

আর এক উত্তর পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ এক দেশ, এক রাজার রাজ্যভুক্ত। চাকরী দিবার অধিকার সেই রাজার, সুতরাং বেহারে বাঙ্গালী কেন, তাহা রাজাই বলিতে পারেন, রাজাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। উহা খাঁটি জল্পনা; এমন বাজে কথা গ্রাহ্য নয়।

অতএব মানিতে হইবে যে, বেহারে বাঙ্গালী কেন, ইহা এক বিষম সমস্যা। পরমানন্দ এ সমস্যা পূরণ করিয়াছেন। অবধান করো—

যে জন্য, হে ইংলিশম্যান, তুমি বঙ্গে, সেই জন্য, হে ইংলিশম্যান, বাঙ্গালী বেহারে। ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

পেটের দায় বড় দায়। ঘরে বসিয়া অন্ন জুটিলে বাহিরে কেহই যাইতে চাহে না। ইহার উপর নিশ্চিন্তে আহারের ব্যাপার সারিতে হইলে, নিজের পেটে কুলায় না, আর কথটা পেট আপনা-আপনি আসিয়া যোটে কিংবা যোটাইয়া লইতে হয়। ভাবখানা এই যে, সামাজিকতা—পেটের দায়ে, বিলাস—পেটের দায়ে, বিদ্যা—পেটের দায়ে, শাস্ত্র—পেটের দায়ে, এমন যে পরকালের ব্যাপার ধর্ম্ম—তাহাও পেটের দায়ে। ইংলিশম্যানের পেটের দায় না থাকিলে এমন সার কথা বলিতে, এমন গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিতেও তিনি বাঙ্গালার মাটিতে পা দিতেন না, বাঙ্গালীও এত আক্কেল

যাইত না, এমন করিয়া বেহারে যাইত না। কথাটা খুব সামান্ত, ইংলিশম্যানের খাতায় বাধ হয় ইহা টোকা আছে। পঞ্চানন্দের অনুরোধ,—তিনি একবার খাতার পাতা দুয়টা উল্টাইয়া দেখিবেন।

আরও কথা আছে। এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষ যুড়িয়া—মূর্খ, পাগল আর শিশু বাদ দলে—এমন প্রাণী কে আছে যে, ইংরেজের রাজ্য স্থায়ী হউক, এ কামনা না করে? তাহা যদি হইল, এ রাজ্য চালাইবার উপকরণ সংগ্রহ করাও আবশ্যক। ইংলিশম্যান এই নিমিত্ত স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আসিয়াছেন। বাঙ্গালীও নাকি বড় রাজভক্ত জাতি, সেই হেতু বাঙ্গালীও বঙ্গের মায়া কাটাইয়া রাজসেবা দ্বারা রাজাকে তুষ্ট করিবার মানসে বেহারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বেহারে বাঙ্গালী—দুঃখের বিষয় হইলেও শ্লাঘার কথা,—সে শ্লাঘা রাজার।

আর একটু বলিলেই মীমাংসাটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ইংলিশম্যান যেমন পণ্ডিত, ভারতবাসীরা তেমন নহে। পণ্ডিতের দ্বারা যেমন কাজ হয়, মূর্খে তেমন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতের দর কিছু বেশী। এই সকল আলোচনা করিয়া, তাহার উপর যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া কাজ চালাইবার মত গোটাকতক হাতগড়া পণ্ডিত ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষে তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালার প্রকৃতি বড় নরম, হাতগড়ার সুবিধাও এইখানে। সেই জন্ত বাজে কাজে বরাত হইলেই বাঙ্গালী পাওয়া যায়, ইংলিশম্যান পাওয়া যায় না। কেরাণী চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত; ছোট চাই—বাঙ্গালায় প্রস্তুত; ইংলিশম্যানের হুকুম, বাঙ্গালীর হাত পা। বেহারী দিয়া বেহারের কাজ নির্ব্বাহ হয় না, তত উঞ্ছবৃত্তিতে ইংলিশম্যানের খরচা পোষায় না—কাজে কাজেই বেহারে বাঙ্গালী।

দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু যদি রাগ করিবা দেশত্যাগী হও, বেহারী ঠেঙ্গাইয়া বাঙ্গালীকে দেশত্যাগী অর্থাৎ বেহার ছাড়া করিবে। ইংলিশম্যানের কল্যাণেই বেহারে বাঙ্গালী।

পঞ্চানন্দের উপদেশ-লহরী।

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর সাহেব বিলাতের মহাসভার সভ্য হইবার আকাঙ্ক্ষায় জাহাজে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে তিনি অনেক কাল কাটাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সকল দলকেই তিনি সন্তুষ্ট করিতে বরাবর প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং চিরকালই এরূপ চেষ্টার ফল যাহা হইয়া থাকে, তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে;—তিনি কোনও পক্ষেরই মন রাখিতে পারেন নাই, কেহই তাঁহার উপর

রাজি নাই। অধিকন্তু বিলাতের রাজনীতি অনুসারে "গোঁড়া" এবং "পাতি" নামক যে দুই জাতি বা দল আছে, তাহার মধ্যে তিনি গোঁড়াদের দলভুক্ত। সেই জন্য ভারতবাসীর কামনা যে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ না হয়; কারণ, সম্প্রতি ভারত-প্রতিনিধি কলিকাতায় সভা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, "গোঁড়াকে বিশ্বাস করিও না; গোঁড়ার হাতে সদ্গতির আশা নাই।" বিলাতের বিধাতা-পুরুষেরা বলিতেছেন, বোম্বাইয়ের গবরণরের কামনা নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। অতএব ভারতবর্ষে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ঘোষজ মহাশয়ও বিলাত রওয়ানা হইয়াছেন; তিনি স্বয়ং সভ্য হইতে পারিবেন না, কারণ বিলাতের মহাসভার শাস্ত্র অনুসারে ভারতবর্ষ অসভ্য। তবে প্রতিনিধির উপর এই ভার দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি "পাতি" সম্প্রদায়ের পোষকতা করিয়া যেন প্রকারান্তরে ভারতের উপকার করেন। ভারতবর্ষের প্রত্যাশা আছে যে, তাঁহার কথায় কাজ হইবে; সেইজন্য সকলেই তাঁহার জয় প্রার্থনা, এবং সিদ্ধি কামনা করিতেছে। পঞ্চানন্দের আশঙ্কা এই যে, কাঠবিড়ালীর সাগরবন্ধন ত্রেতাযুগে সম্ভব এবং সত্য হইলেও কলিকালে বুঝি তাহা খাটে না। এ আশঙ্কা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবনার কথা বটে।

কিন্তু শুধু আশঙ্কার কথা বলিয়া ভয় দেখান ভালো নয়; একটা প্রতীকারের পন্থাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। পঞ্চানন্দের উপদেশ মত কাজ করিলে ভারতের প্রতিনিধি মান বাঁচাইয়া মান লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন।

সভ্য ভব্য হইবার চেষ্টা করা বৃথা; আর পরকে সভ্য করিয়া তাহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টাও তদ্রূপ। অতএব সে সব উৎপাত ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে ভারত-বর্ষের সঙ্গে বিলাতের একটা নূতন সম্বন্ধ পত্তন হয়, তাহারই উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। নূতন সম্বন্ধ নানা রকমের হইতে পারে।

প্রথমতঃ।—প্রতিনিধি চেষ্টা করুন, যাহাতে ভারতবর্ষের পত্তনি কি তদ্রূপ অন্য একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া সকল গোলযোগ জন্মের মত চুকিয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী স্বহস্তে রাখিয়া ইংলণ্ড যে স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায় করেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ছাঁকা ভারতের উপকার করাই ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক স্বরূপ ইংলণ্ড অল্পস্বল্প অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন মাত্র। ইহা যদি অবিসম্বাদিত সত্য হইল, তাহা হইলে একটা পাকা লেখা-পড়া করিয়া বৎসর বৎসর ইংলণ্ডকে মালিকানার টাকা কয়টা পাঠাইয়া দিবার নিয়ম করিতে পারিলে, প্রতিনিধি সকল জ্বালা চুকাইয়া আসিতে পারেন। ইংলণ্ডের ইহাতে আপত্তি না করিবারই সম্ভাবনা; এ দিকে

প্রতিনিধিকে এই বন্দোবস্তের পুরস্কার স্বরূপ ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব পদ এবং যাবজ্জীবন "খুব বাহাদুর" উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করা যাইতে পারে।

এক আফগান-যুদ্ধের ব্যাপারটা ইহার ভিতর আসিতেছে না বলিয়া, গোঁড়ারা পঞ্চাননের প্রস্তাবে বাধা দিতে পারেন। ফলতঃ, আফগান-যুদ্ধের সাধটা যদি এতই প্রবল হয়, তাহা হইলে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের দখলে থাকিবার একটা সর্ত্ত লেখাপড়ার ভিতর রাখিয়া দিয়া, সে বাধার অপসার করিলেই হইতে পারিবে; এবং শেষ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেও, ভারতবর্ষের এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণের ও স্থলাভিষিক্তগণের তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবেক না; আপত্তি করিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে, এই মর্ম্মে একটা অঙ্গীকার রাখিয়া দিলেই চলিবে। নিতান্তই [illegible] বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে

দ্বিতীয়তঃ।—ভারতবর্ষকে উন্নত করা, সুনীতিপরায়ণ করা, সভ্য করা, জ্ঞানী করা [illegible] করাই ইংলণ্ডের অভিপ্রায় এবং সঙ্কল্প। এমত অবস্থায় খাস-দখল ছাড়িয়া দিলে ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতার প্রতি ব্যাঘাত পড়িতে পারে। এ কথাই যদি প্রতিনিধির নিকটে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডের খাস-দখল ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। সভ্য হইতে বা উন্নত হইতে ভারতবর্ষের কোনও আপত্তি নাই; বরং সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। যাহা কিছু আপত্তি, দক্ষিণা দিতে। ইহাই যদি হইল, আদায়-তহশীলের ভার, ব্যয়-বিধানের ভার এবং জমা-খরচ রাখিবার ভার প্রতিনিধি স্বহস্তে রাখিতে পারিবেন, এবং অন্য যাবতীয় ভার ইংলণ্ডকে প্রদান করিতে পারিবেন। বোধ হয়, এরূপ করিলে, উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া, ইংলণ্ড এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে। এদিকে নিজের ক্ষতি না করিয়া অপরের উপচিকীর্ষা বৃত্তি পরিচালনের ক্ষেত্র দেওয়া হইবে জানিয়া, ভারতপ্রতিনিধিও ইহা স্বীকার করিতে পারিবেন। ফলে, ঘরের কড়ি দিয়া বনের মহিষ তাড়াইতে ইংলণ্ডে যদি কেহ [illegible]ের ন্যায় আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে—

তৃতীয়তঃ।—আয়-ব্যয় প্রভৃতি রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় ক্ষমতা ইংলণ্ডকে প্রদান করিয়া ভারতপ্রতিনিধি সমস্ত আইন-ব্যবস্থার অধিকারটা স্বহস্তে রাখিবেন; এবং ইংলণ্ড আইন-বিরুদ্ধ কোনও কর্ম্ম করিলে বা করিবার উদ্যোগ বা উপক্রম করিলে ভারতপ্রতিনিধির নিকট প্রত্যেক উদ্যোগ বা উপক্রমের নিমিত্ত খেশারৎ ও খরচার দায়ী হইবেন, এইরূপ নিয়ম করিতে হইবে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের হস্তগত থাকিলে কোনও পক্ষই কাহারও অনিষ্টজনক কার্দানি দেখাইতে পারিবেন না, অথচ উভয়েরই কাজ হইতে থাকিবে। তবে কোনও কোনও বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সরল

ভাবের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই কাজের বেলায় একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কাও কেহ কেহ করিতে পারেন। এমত ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে, মধ্য-এসিয়াতে রুষিয়ার যে সকল কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকেই মধ্যস্থ মানিবার নিয়ম করিয়া রাখিলেই এ আপত্তির খণ্ডন হইয়া যাইবে। রুষিয়া মধ্যস্থতা করিলে, তাহাকে কিঞ্চিৎ বেতন সময়ে সময়ে দেওয়া হইবে অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তির নিয়ম করিয়া রাখিলেও সুবিধা হইতে পারিবে। রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যে শত্রুভাবের আশঙ্কা আছে, এরূপ নিয়ম করিলে সে আশঙ্কা দূরীভূত হইবার কথা এবং চিরসখ্যতা বন্ধনেরও উপায় হইতে পারিবে। ফলে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহার সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব নাই, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া মধ্যস্থ করা যাইতে পারে না। এ প্রকার আপত্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে—

চতুর্থতঃ।—এই নিয়ম করা পরামর্শসিদ্ধ যে সম্প্রতি ভারতবর্ষের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখিয়া ইংলণ্ড বিবাদ করিয়াই হউক বা আপোষ বন্দোবস্ত করিয়াই হউক, রুষিয়ার সঙ্গে একটা এধার-ওধার করিয়া ফেলুন; এবং যত দিন তাহা না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ নিতান্ত অরাজক থাকুক, এমন কি বিদেশবাসী বা বিধর্ম্মাবলম্বী এক প্রাণীও ভারতবর্ষের ভূমিতে পদার্পণ না করিতে পারে, এমন নিয়ম থাকুক। পশ্চাৎ বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেলে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত মত আচরণ হইবে, অথবা ভারতবর্ষ উচ্ছন্নে গেলেও ইংলণ্ড কস্মিনকালে এক কপর্দ্দকের কাজও ভারতের জন্য করিবেন না। এই দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে। তবে এ যুক্তি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে—

পঞ্চমতঃ।—এখন যে ভাবে চলিতেছে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এই ভাব চিরদিন চলুক, তাহার পর—যা থাকে কপালে। প্রতিনিধি মহাশয় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক অন্নচেষ্টা করিতে থাকুন, এবং ভারতবর্ষের একটা সাধের গলগ্রহ ঘুচিয়া যাউক। তবে ভারতবর্ষের নাম করিয়া বক্তৃতা করান যদি নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে একটা দৈনিক বেতন বন্দোবস্ত করিয়া এক জন বিলাতী কৌসুলীকে ওকালত-নামা দিয়া রাখিলেই বোধ হয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

যে সকল প্রস্তাব করা গেল, তাহাতে প্রতিনিধি স্বাধীনভাবে স্বীয় বিবেচনা-শক্তি পরিচালনপূর্ব্বক সকলগুলা অথবা যেটা ইচ্ছা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিবেন; এবং ইহার মধ্যে একটা-না-একটা প্রস্তাব যে বিলাতে গ্রাহ্য হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যদি এই কয়েকটী প্রস্তাবে প্রতিনিধি মহাশয়ের মন না ওঠে, তাহা হইলে তিনি অকুতোভয়ে ইংলণ্ডস্থ "গোঁড়া" এবং "পাতি" উভয় দলকেই বলিতে পারিবেন।

মহাসভায় (১) ভগ্নদশায়, গুরুতর আহার ধৌতকরণ (২) কালে এবং বিষয়াভাব হইলে সংবাদপত্রের কলেবরে তাঁহারা ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিলে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইবে না, বরং সাধুবাদ দিতে শশব্যস্ত থাকিবে; এবং ঐ দুই দলের মধ্যে যাহার যখন প্রাধান্য এবং প্রবলতা থাকিবে, তাহাকে গালাগালি দিবার জন্য অপর দল ভারতবর্ষের নাম করিয়া ভারতের বন্ধুত্ব করিবেন, তাহাতেও তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রে লেখে—"শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" অর্থাৎ ভারতবর্ষের অগ্নিসংস্কারকার্য্যে অর্থাৎ ভারতকে পোড়াইতে যিনি যত সহায়তা করেন, তিনিই তত উৎকৃষ্ট বন্ধু।

প্রাচীনধির মঙ্গল হউক, মাঞ্চেষ্টরের বাণিজ্য অপ্রতিহত হউক, আর ভারতবাসী গোল্লায় যাউক, পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠে এই আশীর্বাদ করিতেছেন। ইহাতে কেহ অরসিক বলে, সেও ভালো।

পঞ্চানন্দের পত্র।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ জারজ ফ্রেডরিক স্যামুয়েল রবিনসন্ মার্কিস্, রিপন, রেস্তর আরলগ্রে, রিপনের আরল, নক্টনের বৈকুণ্ঠ গোদরিক, গ্রন্থামের বারণ গ্রন্থাম, বারনেট (৩)

দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু!

বৎস,

ভারতবর্ষ দুরন্ত দেশ, তুমি শান্ত সুধীর। এখানে যে কেমন করিয়া কি করিবে ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে।

ভারতবাসী লঙ্কার প্রতিবেশী, কত মায়া জানে, কত কুহক জানে। ভয় দেখাইয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া, অহরহ তোমাকে ভুলাইয়া, ইহারা স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিবে। তুমি নূতন লোক, পাছে ভয় পাও, পাছে চক্ষুলজ্জা করো, সেইজন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ

---

(১) পার্লামেন্টের।

(২) মদ দিয়া।

(৩) বাঙ্গালী হইলেই যে বাঙ্গালা বুঝিতে পারিবে, এমন কোনও শাস্ত্রে নাই, বরং বুঝিবে না এমন ব্যবস্থা পাওয়া যায়। অতএব এই প্রকার অবোধ বাঙ্গালীর উপকারার্থ এই কয়েক পংক্তির সরল ইংরাজি অনুবাদ দেওয়া হইতেছে।—George Frederick Samuel Robinson Marquess of Ripon, Earl de Grey of Wrest, Earl of Ripon, Viscount Goderic of Nocton, Baron Grantham of Grantham and Baronet.

রাজনীতি শিখাইতে ইচ্ছা কর। উপদেশ অবহেলা করিও না; করিলে মারা যাইবে।

ভারতবর্ষে এক হিন্দুর মধ্যেই ছত্রিশ জাতি মনুষ্য আছে। ফিরিঙ্গী আছে, আরও কত আছে। সকলেরই মন যোগাইতে পারিবে না, কারণ তাহা অসম্ভব। অতএব কাহারও মন যোগাইও না। সকলকে বরং অসন্তুষ্ট করিও। তাহাতে অন্ততঃ এই লাভ হইবে যে, পক্ষপাতরূপ মহাপাপকে তোমাকে পতিত হইতে হইবে না।

বৎস, এখানে যোজনান্তরে ভাব, ইহা জানিয়াও যখন অধ্যাপক মোক্ষমূলরকে না পাঠাইয়া উদারনীতি মহাপুরুষগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানকার কোনও ভাষার সঙ্গে সংস্রব রাখিলেই তোমার মহাপাপ। এমন অবস্থায় তোমার উচিত, যাহাতে এই ভাষাবাহুল্যের লোপ হয়, তৎপক্ষে যত্নপর হও। কথার শাসন করিতে নিতান্ত যদি না পারো, ছাপার শাসন অবশ্য করিবে।

হাতে পয়সা হইলে পুত্র পিতাকে মানে না, উচ্ছৃঙ্খল হয়, উচ্ছন্নে যায়। অপত্য-নির্বিশেষে প্রজা পালন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কসিয়া টেক্স বসাইবে। ছেলে কাঁদুক, কিন্তু আখেরে তাহারই মঙ্গল।

রাজনীতিঘটিত বিষয়ে ভারতবাসী এখনও শিশু। শিশুগণ অতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করিবে। ব্যবস্থাপক সভা যাহাতে নিত্য নিত্য নূতন আইন প্রসব করিতে পারেন, তাহার উপায় করিবে। ছেলের শাসন চাই, কারণ শিক্ষার মূল শাসন।

ভারতবাসী জানে, ছত্রদণ্ডই রাজচিহ্ন। যে দিকে দেখিবে, অসন্তোষের রৌদ্র চিন চিন্ করিয়া উঠিতেছে, কিম্বা নয়নজলের বৃষ্টি পড়িতেছে, সেই দিকে বিলাতী বিক্রমের ছত্র ধরিবে। আর, দণ্ড তুচোখো, সম্মুখে যাহাকে পাইবে, তাহাকেই বসাইবে। ভারতবাসী জানে, বসাইলে শাসন হয়, সম্মানও হয়।

রাজার দয়া চাই। তুই বেলা কিছু দয়ার ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। অতএব মধ্যে মধ্যে যাহাতে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। দয়া দেখান হইবে, রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্যতৎপরতার পরীক্ষা হইবে, দরিদ্রের সংখ্যা কমিলে দারিদ্র্যের হ্রাস হইবে—এক গুলিতে হাজার কাক মরিবে।

চারিদিকে নজর রাখিবে, যেন দৃষ্টিভ্রম না হয়, শ্বেত কৃষ্ণ একাকার হইয়া না যায়।

কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, অতি অন্যায় কথা। সেখানকার দুর্ভিক্ষে এক প্রকার বন্দোবস্ত, এখানকার দুর্ভিক্ষে অন্য প্রকার; ইহাতে লোকের মনে দুঃখ হয়। কাশ্মীরকে এলাকাভুক্ত করিয়া লইবে, সকল জ্বালা চুকিয়া যাইবে। যেখানে উদ্দেশ্য মহৎ,

সেখানে উপায়ের জন্য মনে কোরকাপ করিবে না; অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে না কুলায় না-ই বাগানটা হাতছাড়া না হয়।

তোমার পূর্ব্বপুরুষ লিটন বাহাদুর তোমাকে ধারে ডুবাইয়া গেলেন। তুমি পাতাল না দেখিয়া ছাড়িও না; তিনি মুক্তি পাইয়াছেন, তুমি মুক্তা পাইবে।

বৎস, বদান্যতা দেখাইতে ত্রুটি করিও না। দুই হাতে নক্ষত্র বৃষ্টি করিবে, লোকে যদি সরিষার ফুল দেখে, দরবারে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিবে। ভারতবর্ষ জাতিভেদের দেশ, এখানে উপাধির বড় সম্মান, কারণ, ইহাতে বিধাতার ভুল সংশোধিত হইবে। যাহারা বিধাতা মানে না, তাহারা ধাত্রীর ভুল মানে। ফল সমান। (১)

বৎস, তুমি গুণবান্, ধনবান্ শ্রীমান্; আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আমি নিতান্ত ভরসা করি যে, তুমি মনে রাখিবে, ভারতবর্ষ তোমার বিলাসভূমি। তুমি পেটের দায়ে এখানে আইস নাই, তোমার গুণের পুরস্কার জন্য এ পদ তুমি পাইয়াছ; তোমারই দোষে যেন তোমার শ্রীর লীলায় বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত না হয়, সখের রাজ্যের তামাসা ছাড়িবে না। ভারতের রাজত্ব প্রকাণ্ড তামাসা, ইহা যেন অনুক্ষণ তোমার মনে জাগরুক থাকে।

আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আমার উপদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হও; তোমার সোণার দোয়াত-কলম হউক; ধনে-পুত্রে লক্ষেশ্বর হইয়া সুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অপরকে সথ মিটাইতে পাঠাইয়া দেও, আপনি সুখী হও। ইতি—

পুনশ্চ।—মাঝে মাঝে যদি এরূপ উপদেশের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পত্র-পাঠ পত্র লিখিবে, পাঁচ টাকা দক্ষিণা পাঠাইবে, তোমাকে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব।

---

(১) "ধাইমাগী কি ভুল করেছে,
নাড়ী কাটতে লেজ কেটেছে।"
তাই নাকি?
—ছাপাখানার নন্দী।

পুলিশ-আদালত।

শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত।

গত কল্য উপাস্থ শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারাসন অবলম্বন করিবামাত্র শ্রীযুক্ত কৌশলী সুতার সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলেন, যে—

"বিচারক হোয়াইট সাহেবের বিরুদ্ধে শমন প্রেরণের আজ্ঞা হয়! উক্ত বিচারক হোয়াইটের উপর আমি দুই অভিযোগ করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি; প্রথমতঃ নেয়ারণ নামক এক জাহাজী গোরার ফাঁসির হুকুম দিয়া উক্ত বিচারক হোয়াইট্ পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণী সভার নিয়মবহির্ভূত অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ দ্বাদশটী দয়াশীল সাহেবের তিনি অপবাদ করিয়াছেন।

হুজুরের অবিদিত নাই যে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতবর ডারবিন সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা বানর-কুল-সম্ভূত। আমি ভরসা করি যে, এ বিষয়ে কেহ সংশয় করিবেন না।

এখন প্রশ্ন এই যে, যাহারা দ্বিপদ এবং কথা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই মানুষ কি না? আমি বলি, তাহা কখনই নহে। বানরগণ ক্রমশঃ সভ্য হইয়া মনুষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। আমি মনুষ্য, হুজুর মনুষ্য, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ নাই; কারণ আমরা গাছে উঠি না, গাছের ডাল কাটিয়া আসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করি। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কি বলা যাইবে—হাঁ, তাহার সম্বন্ধে—যে গাছের অভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ জাহাজের মাস্তুলে অবলীলাক্রমে, নির্ভয়ে, সদা সর্ব্বদা উঠিয়া থাকে—তাহাকে কি মনে করিতে হইবে, যে অতি সামান্য মানুষ, নিতান্ত ছোট লোক কালো পাহারাওয়ালার কথা-বার্ত্তা, এমন কি ইঙ্গিত ইসারা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না? সে দ্বিপদ হইতে পারে, সে সোজা হাঁটিয়া—(যখন সজ্ঞানে থাকে)—যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে, সে মানুষ হইবে ইহা কদাচই নহে। সে বানর, অবশ্যই বানর, দশ হাজারবার বানর।

মনে রাখিতে হইবে—যে হেতু ইহা আমার তর্কসোপানের এক প্রধান ধাপ—মনে রাখিতে হইবে যে, বানর শব্দের অর্থ ই কখনও নর, কখনও বা নর নহে। আমি বলি,—আর এ বিষয়ে আমি হুজুরের সবিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে ভিক্ষা করি,—আমি বলি যে, নেয়ারণ যখন সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিত, মদ্যপান করিত, তখন সে নর; নেয়ারণ যখন আমোদান্বিত একজন সঙ্গীকে ফাঁকরে

ফেলিয়া চলিয়া গেল, তখন সে বানর। আবার নেয়ারণ যখন জাহাজে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল, যখন এক জনের নিকট ছুরী চাহিয়া লইল, তখন সে নর; কিন্তু আবার যখন একটা কালো কদাকার মনুষ্য পাহারাওয়ালা দেখিয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত করিল, তাহার গলদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিল, তখন সে কখনই নর নহে, অবশ্যই বানর।

বানর, বিকল্পে নর। যখন ইচ্ছা তখন নর। স্বদেশীয় বা স্বজাতীয়ের সহিত নেয়ারণের কেমন সদ্ভাব! কত উত্তম কত প্রশংসনীয় ব্যবহার! কি উদার চরিত্র! তখন নেয়ারণ ইচ্ছা করিয়াছিল, অতএব নর। কিন্তু যখন তাহার নরত্ব দেখিতে ইচ্ছা নাই, তখনও কি তাহাকে নর হইতেই হইবে? মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এরূপ অভিমতির ফলাফলটা চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহার পর বলুন, তখনও কি সে নর? কখনই না। তখন সে অবশ্যই বানর। যাহার যাহাতে ইচ্ছা নাই, তাহাকে তাহা বলপূর্ব্বক করাইলেও সে কার্য্যের জন্য সে দায়ী হইতে পারে না। সে হিসাবেও সে বানর। নতুবা কি ভয়ঙ্কর অনর্থ, কি ঘোরতর অত্যাচারই হইয়া উঠিবে?

এ কথা ভাবিতেও আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, আমার লোমগণ প্রাণ্তোপরি দণ্ডায়মান হইতেছে। অতএব আমি বিনয় সহকারে, অথচ দৃঢ়তার সহিত বলি যে, নেয়ারণ বানর; মনুষ্য কদাচই নহে। আমি ভরসা করি, এ পক্ষে হুজুরকে আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি।

তবে এখন দেখিতে হইবে যে, বানর পশু কি না? আমার বোধ হয়, এতৎসম্বন্ধে তর্ক করা বাহুল্য মাত্র! বানর যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমি নাচার, নেহাত মারা যাই। বানর অবশ্যই পশু। সুতরাং নেয়ারণ যে পশু, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হউক স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি ইহার প্রমাণ আছে। দ্বাদশটী ভদ্রলোক অকাতরে অকপটে ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া ঐ বিচারক হোয়াইটের মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে, নেয়ারণ বুঝিয়া সুঝিয়া, মতলব ছাঁদিয়া, দোষ ভাবিয়া পাহারাওয়ালাকে মারে নাই। তবে আর চাই কি? যে জীব এ প্রকারে কাজ করে, সে কি পশু নহে? এই আমি দণ্ডায়মান হইলাম; কে বলিবে বলুক যে, পশু নয়, অন্য কোনও জীব? হুজুর! বারংবার কি বলিব, নেয়ারণ যদি পশু না হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই পশু।

এ হেন নেয়ারণের ফাঁসির হুকুম! গলদেশে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক লম্বিত করিবার আদেশ! যতক্ষণ প্রাণান্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঝোলাইয়া রাখিবার হুকুম। ইহা যদি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা না হয়, তাহা হইলে নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, আমি জানি না। নিষ্ঠুরতা? এ যে নিষ্ঠুরতার বাপান্ত! হৃদয়, বিদীর্ণ হও। শিরা, ছিন্ন হও। ধমনী, ফাটিয়া যাও! অনর্গল রক্ত পড়ুক, আমার মনের জ্বালা যাউক! নেয়ারণের ফাঁসি!! পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা! ডার্বিন আমাদের কুলাচার্য্য, ডার্বিনকে আমরা মান্য করি,

কালো ভারতবাসীর পৃথক্ কুলাচার্য্য আছে, ডাবিনের কথা ভারতবাসী গ্রাহ্য করে না; তবে কি এই ভারতবাসীর চক্ষের উপর আমাদের কুলাচার্য্যের কথা আমরাই মিথ্যা বলিয়া রটনা করিব? আপনি কি ইহাতে সায় দিবেন? কথনই না! যদি স্বজাতির প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাসনা থাকে, যদি দয়া, সরলতা, সত্যনিষ্ঠার মানবর্দ্ধনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঐ উচ্চাসন হইতে হুজুর ঘোষণা করুন যে, বিচারক হোয়াইট্ কুলাঙ্গার, বিচারক হোয়াইট নিজ নামে কলঙ্ক দিয়াছে, সে হোয়াইট্ নহে, ব্লাকস্য ব্লাক্! শমন ভিন্ন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অতঃপর সংক্ষেপে আমার দ্বিতীয় অভিযোগের উল্লেখ করা আবশ্যক। একটী আধটি নয়, দ্বাদশটি ভদ্রলোক; দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ, সাধু! এই দ্বাদশটী সমবেত স্বরে বলিলেন যে, নেয়ারণ নিষ্ঠুরতার পাত্র নহে, দয়ার পাত্র; বিচারক হোয়াইট সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিলেন যে, নেয়ারণ পশু হউক আর না হউক, এই দ্বাদশটী ভদ্রলোক স্বজাতিপক্ষপাতী হইয়া দয়ার জন্য উপরোধ করিয়াছেন।

এখন, হুজুর বিচার করুন, হোয়াইট্ ইঁহাদের অপবাদ করিলেন কি না? যদি তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, নেয়ারণ মনুষ্য অতএব দয়ার পাত্র নহে, তাহা হইলে দ্বাদশটী ভদ্রলোককে মিথ্যাবাদী বলা হয়! মিথ্যাবাদী বলা ভয়ানক অপবাদ! আর যদি বলেন, নেয়ারণ পশু হইলেও দয়ার পাত্র নহে, দ্বাদশের স্বজাতিপক্ষপাতের জন্য দয়ার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইলে এ দ্বাদশটীকে পশু বলা হইয়াছে। সে দিকেও অপবাদ।

এই আমার দুই শিঙ (১); যেটা ইচ্ছা হোয়াইট্ অবলম্বন করিতে পারেন; কিন্তু অপবাদের দায় এড়াইতে পারিতেছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, হোয়াইট্ স্পষ্ট বলুন, এই দ্বাদশটী মিথ্যাবাদী, না, পশু? উত্তরের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। (২)

উপসংহারে আমার প্রার্থনার পুনরুক্তি করিয়া, হোয়াইটের উপর শমন প্রেরণের আদেশ ভিক্ষা করিয়া আমার কাষ্ঠাসন আশ্রয় করিতেছি। আশা আছে, ভরসা আছে, সাহস আছে যে, আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া ও স্বীয় ক্রোড়কুক্কুরের সহিত বিস্তর পরামর্শ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, বিবেচনাপূর্ব্বক আগামী এজলাসে উচিত আদেশ করিবেন।

---

(১) Horns of a dilemma.

(২) I pause for a reply.

আদালতে এ প্রকার জনতা হইয়াছিল যে, তিল-ধারণের স্থান তে. ছিলই না; ঠেলাঠেলিতে তিনটা কালা-আদমির প্লীহা ফাটিয়া স্থানটা নিতান্ত অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল। মিউনিসিপেল-সীমানার ভিতর এরূপ ময়লা করার নিমিত্ত প্লীহাফাটাদের আত্মীয়গণের উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইবার হুকুম হইবার পর, আদালত অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

বৈঠকী আলাপ।

(পঞ্চানন্দের বৈঠকখানায় বাবুদের প্রবেশ।)

পঞ্চানন্দ। আসুন, আসুন! বড় সৌভাগ্য, ভালো করে' বসুন না?

বাবু। থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরা বেশ বসেছি।

পঞ্চা। কি মনে করে, আসা হয়েছে?

বাবু। কিছু ভিক্ষা করতে আসিনি, এমনি দেখা সাক্ষাৎ করতে আসা।

পঞ্চা। ভালো ভালো। আপনার নাম?

১ম বা। কার্ড তো পাঠিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চা। সে কেমন? বুঝতে পারিলাম না যে?

১ম বা। বুঝতে পারলেন না? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—

পঞ্চা। ভয় কি বাবু, এখানে কোনও বেটা আসতে পারবে না, আপনি নির্ভয়ে নাম বলুন।

১ম বা। ভালো জায়গাতে পড়লুম এসে, দেখছি। আমার নাম সুদর্শন ঘোষাল, এম-এ।

পঞ্চা। শ্রীযোন বললেন যে? যাক্, আপনার পিতার নাম?

১ম বা। মাফ্ করবেন, ভদ্রলোক মনে করে' দেখা করতে এসেছি, কুলজী আওড়াতে আসিনি।

[বিজাতীয় ভাষায় বাবুদের কিঞ্চিৎ কথোপকথন।]

১ম বা। গ্লাড্‌ষ্টোন এবার খুব আড়ে হাতে লেগেছে, বোধ হয় মিনিষ্ট্রী বদল না হ'য়ে যায় না। আপনি কি বিবেচনা করেন?

পঞ্চা। সে আবার কি?

১ম বা। চমৎকার! সে আবার কি বললেন? সেই ত সর্ব্বস্ব।—আমাদের রাজাকে জানেন?

পঞ্চা। কেন, ইংরেজ।

১ম বা। তবু ভাগো! আচ্ছা, কেমন করে' ইংলণ্ডে রাজ্য চলে' তা' জানেন?

পঞ্চা। দরকার?

১ম বা। আশ্চর্য্য! এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এই সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর সমাজে থেকে, এ কথা জানেন না, আর জেনে কি দরকার তাও জানেন না! শুনুন তবে; মিনিষ্ট্রী যদি বদল হয়, আমাদের অনেক দুঃখের লাঘব হবে।

পঞ্চা। সে কি? ইংরেজদের রাজ্য থাকবে না?

১ম বা। আমোদ মন্দ নয়।—তা' থাক্‌বে বৈ কি? কেবল মন্ত্রী আর কর্ম্মচারী —এই সব নূতন হবে।

পঞ্চা। নূতন যা'রা হবে, তারা বুঝি ইংরেজ নয়?

১ম বা। হোপ্‌লেস্।

[পুনশ্চ বাবুদের অবোধ্য কথোপকথন।]

পঞ্চা। আপনারা দেখ্‌ছি অনেক খবর রাখেন, বিস্তর জানেন শোনেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বাঙ্গালায় কত লোকের বাস?

১ম বা। ৬৮ মিলিয়ন, কি এই রকম কত হবে।

পঞ্চা। সে কত? (বাবুর ওষ্ঠাধর কম্পিত)। আচ্ছা, এদের মধ্যে ইংরেজী লেখা-পড়া জানে কত লোক? বাঙ্গালা লেখা পড়াই বা কত লোকে জানে? (বাবু নীরব)। আমাদের একটু বড় গোছের চাষ করবার ইচ্ছা আছে, খুব বেশী পরিমাণে পতিত জমি কোন্ জেলায় পাওয়া যেতে পারে, বল্‌তে পারেন? (বাবু নীরব)। ধানী জমীর আবাদ বাড়ছে, না কমছে, না সমান আছে? (বাবু নীরব)। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনবার কত ধান জন্মেছে, ব'লতে পারেন?

১ম বা। এ সব সামান্য কথা, বোধ হয় রিপোর্ট দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন।

পঞ্চা। বাঙ্গালায় পাওয়া যায়?

১ম বা। ঠিক তা' বল্‌তে পারি নে; বোধ হয় বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। পড়বে কে?

পঞ্চা। বাঙ্গালায় হ'লে সকলেই পড়তে পারে, আপনারা পারেন, আমরা পারি—

১ম বা। (ঈষৎ হাসিয়া) বাঙ্গালা কি ভদ্র লোকে পড়ে?

পঞ্চা। অপরাধ?

১ম বা। সময় নষ্ট; বাঙ্গালায় আছে কি, যে পড়্‌বে?

পঞ্চা। তবে লেখেন না কেন?

১ম বা। (ঘড়ি খুলিয়া) আজকে একটু বরাত আছে। আবার দেখা হ'বে।

পঞ্চা। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে' সুখী হ'লাম। অনুগ্রহ করে মধ্যে মধ্যে বেড়াতে আসবেন। [নিষ্ক্রান্ত।

বিচারসংক্রান্ত কথা।

ভারতবর্ষে বিচারের দোকান আছে; এই সকল দোকানের প্রচলিত নাম আদালত। যে যেমন খরিদদার অর্থাৎ যে যেমন দর দেয়, সে তেমনি আদালত পায়। সেই জন্য আদালতের শ্রেণীবিভাগ আছে।

যাহার যৎসামান্য পুঁজি, অল্প গেলেই যাহার সর্ব্বনাশ হয়, সে-ই অতি অল্প বিচার পায়। যাহা পায়, তাহারও এত দাম পড়ে যে, আসল গণ্ডা কিছুতেই পোষায় না।

বিচারের মহাজন রাজা। যাহাদের জিম্মায় বিচারের দোকান আছে, তাহাদের সম্বন্ধে রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, যেখানে বিচারের কাটতি বেশী, সেইখানেই দোকানদারের যোগ্যতা অল্প, মজুরী অল্প; ঝোঁক অধিক। তাহাদের সুখের মধ্যে মাল বিক্রয় দেখাইতে পারিলেই, আর কোন বিঘ্ন নাই। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্যদক্ষ, তাহারা একধার হইতে বিচার মাপিয়া যায়, তাহাতে যাহার ভাগ্যে যত পড়ুক! বিচার মাপিয়া দেওয়ার নাম ফয়সল্ করা।

বিচারে পক্ষপাতের নিষেধ আছে। সেই জন্য যাহার যেমন পয়সা খরচ এবং যোগাড়, তাহার তেমনি সুবিধা। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে ওজন সূক্ষ্ম হইতে পারে, সেই সকল উপায় বাদ দিবার ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থার নাম প্রমাণবিষয়ক আইন।

যাঁহারা খুব বড় বিচারপতি, তাঁহারা ছোট বিচারের কেহ নহেন, ছোট অবিচারেরও কেহ নহেন।

ক্ষুদ্র বিচারক নানা রকম আছে; কিন্তু অধিকাংশই অপদার্থ; ইহারা ভাবিয়াই আকুল। কার্য্যকুশল বিচারক দুই চারিজন আছে; ইহাদের একটীর নমুনা অঙ্কিত হইতেছে—

"আমাদের বিচক্ষণ মুন্সেফ বাবু,"

বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করিবার পর এবং মুন্সেফি পদ পাইবার আগে, আমাদের বিচক্ষণ বাবু ওকালতীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছয় মাসে নগদ সাত সিকা তাঁহার উপার্জ্জন হইয়াছিল অথচ সেই ছয় মাসের মধ্যেই অন্য উকীলে মাসে মাসে হাজার টাকা পাইতেছে, বিচক্ষণ বাবু স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন। সেই অবধি উকীল জাতির উপর বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ ঘৃণা, উকীল দেখিলেই ইঁহার কম্পজ্বরের জ্বালা

অনুভব করিতে হয়। এখন যে ইনি পাকা হাকিম, যোল আনা হুজুর, তবু উকীল আসিলে বিচারাসন টলমল ক'রতে থাকে।

বিচক্ষণ বাবু ফয়সলে মূর্ত্তিমান্। যে মকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত, তাহার দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দেন; ফিরাইয়া ফিরাইয়া যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিতি, অভাব বা ত্রুটি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বিচার প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। সে অবস্থা ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচারের সরু ধারে দাঁড়ি কাটিয়া, বিচক্ষণ বাবু কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

বিচক্ষণ বাবুর বিশ্বাস যে, বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির অগ্রজ; দৃঢ়সঙ্কল্প তাঁহার ভূষণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকে ইহা না বুঝিয়া, তাঁহার এই গুণকে শুয়ারের গোঁ বলিয়া ব্যাখ্যা করে।

বিচক্ষণ বাবুর বিলক্ষণ উন্নতি, কারণ, এ হাটে এমন ব্যাপারীই দরকার।

রাজস্বসভার বিশেষ অধিবেশন।

উপস্থিত ;—গ্রহাধিপতি মার্ত্তণ্ড—সভাপতি।

অষ্টগ্রহ গলগ্রহ—সভ্যগণ।

অতিরিক্ত মান্যবর পঞ্চানন্দ—ধূমকেতু।

তদনন্তর মান্যবর পঞ্চানন্দ, "কর-দ গ্রহের সদুপায়" বিষয়ক ব্যবস্থার পাণ্ডুলেখ্য উপস্থাপিত করিবার অনুমতি পাইবার জন্য গা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণশাসিত দেশ; এখন যে এক কাটেল হইয়াছে, এক সা কোম্পানী একসায় (১) একসা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি একথা বলা যায় না যে, মূল হিন্দুয়ানির কোনও রকম ব্যাঘাত হইয়াছে। মূল কথা এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ইস্পাতের মত,—ঢালো, পেটো, যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, আসল জিনিস বজায় থাকিবেই থাকিবে। অনেকের মুখে মান্যবর সভ্যগণ শুনিয়া থাকিবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সংঘর্ষণ হইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তুমুল কাণ্ড হইয়াছে, তিনি ইহাও স্বীকার করিতে বিমুখ নহেন যে, এক বিকট সংঘর্ষণ হইয়াছে। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে সংঘর্ষণের ফল কি? হিন্দুর ধর্ম্ম তিনি ইস্পাতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এখানেও সে উপমা খাটিতেছে—ঘর্ষণে ইস্পাতের চাকচিক্য

---

(১) Excshaw—উৎকৃষ্ট মদের নাম।

বাড়িয়াছে, ধার বাড়িয়াছে, অতএব যিনিই যত করুন, হিন্দুর মনে হিন্দুর ধর্ম্মের যে এক অপূর্ব্ব দ্রাঢ়িমা আছে, তাহা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে।

যদি তাহা হইল, তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের একটা ফলের প্রতি, মান্যবর সভ্যগণের বিশেষ মনোযোগ আমন্ত্রণ করিতে যাচ্ঞা করেন। সে ফল এই যে, কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই কুঁড়েমির টানটা স্বভাবতই বেশী বেশী হইয়া উঠে। কুঁড়েমি হইলেই বিনাশ্রমে বাবুগিরি করিবার প্রবৃত্তিটাও আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই প্রবৃত্তির বলে ব্রাহ্মণদিগের এত ব্রহ্মোত্তর জমী। মান্যবর সভ্যগণ অবগত থাকিতে পারেন যে, ব্রহ্মোত্তর জমীর জন্য কাহাকেও সিকি পয়সা কর দিতে হয় না, এবং এই কুদৃষ্টান্তের ফলে, যাহাদের ব্রহ্মোত্তর নাই, তাহারাও কোন-না-কোনও প্রকারে, নিষ্কর ভূমির মালিক হইবার চেষ্টা করে, বা উপায় বিধান করে।

তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) যে কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা এই;—নিষ্করের দিকে ভারতবাসীর অতিশয় টান। জর-বিকারের রোগীর জলটানের মত ইহা অস্বাভাবিক এবং তুষ্ট হইলেও ইহার দমন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক এ প্রকার অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন? কেন, তিনি, পিপাসা শান্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রতিকারও হয়, এরূপ শীতল সেব্য, শীতলগুণ-বিশিষ্ট ঔষধই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অতএব ভারতবাসী যখন কর দিতে কাতর, অথচ পক্ষান্তরে কর না পাইলে রাজত্ব করা না-করা তুল্য, তখন করসংগ্রহ বিষয়ে উপরিউক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকের পন্থা অবলম্বন করাই যে শ্রেয়ঃকল্প, ইহা কোন মান্যবর সভ্য অস্বীকার করিবেন? ভারত-বর্ষে সাক্ষাৎ করের প্রবর্ত্তনা না করিয়া থাকিতে, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাই করা যে যুক্তিসঙ্গত, তদ্বিষয়ে কে না একমত হইবেন?

এই তত্ত্বকথার প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করা গতিকেই, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত কর বসান বা চালান হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই এবং সকলগুলিতেই অসন্তোষ, এবং ফুঁপিয়ে ক্রন্দন করা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) একজন নম্র স্বভাবের পরামর্শদাতা, সামান্য উপগ্রহ হই-লেও অদ্য কর-সংগ্রহের এক সদুপায় উপস্থিত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভরসা আছে যে, তিনি এত কাল মনে মনে তোলা-পাড়া করিয়া যে প্রসঙ্গের অবতা-রণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মান্যবর সভ্যগণ তাহার প্রতি অবহেলা করিবেন না, সম্যক্ বিচার না করিয়া তাহা তাকে তুলিয়া রাখিবেন না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, "রাজনৈতিক আন্দোলন-কর" নামে এক কর-সংগ্রহ বিষয়ে তিনি যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এক নির্ব্বাচিত সমিতিতে বিবেচিত এবং কৃতমন্তব্য হইবার জন্য অর্পিত হউক।

যাঁহারা রাজনৈতিক বিষয়-আশয়ের জন্য সভা করেন, বক্তৃতা করেন, সময় নাই অসময় নাই, বৃহৎ বৃহৎ আবেদন বরেন এবং স্থানাস্থানের বিচার না করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাঁহাদেরই জন্য এই করের সৃষ্টি। ইহার সুবিধা এই যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়ের এ কর দিতে হইবে না—সভা সকল এই কর দিবে। যে সামান্য ব্যক্তি নিজ যৎসামান্য অথচ যথাসর্ব্বস্ব দুষ্টের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হয়, সে কর দিয়া থাকে;—দেশের উপকারের জন্য দশটা বড় বড় লোক হাজার হাজার মধ্যবিত্ত লোকের সহিত একত্র হইয়া কিছু ভিক্ষা করিলে, বা অপ্রাপ্য আদায় করিতে ইচ্ছা করিলে কর দিতে কুণ্ঠিত হইবে, একথা অগ্রাহ্য! বরং এই সকল সভা-আবেদনকারীর নিকট কর না লওয়াতেই পক্ষপাত জাজ্বল্যমান; তাহার উপর মান্যবর সভ্যগণ যদি ভাবিয়া দেখেন যে, যাহার নিকট ইহারা প্রার্থী, সে শঠ নয় বঞ্চক নয়—রাজেশ্বর রাজা,—তাহা হইলে এই পক্ষপাতের আয়তন কিরূপ বিভীষণ হইয়া উঠে।

সামান্য বিচারপ্রার্থীর নিকট যে কর লওয়া যায়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অমূলক অভিযোগ দ্বারা সমাজ উপপ্লুত না হয়। প্রসঙ্গাধীন প্রস্তাবে, যাহার উপলক্ষে সমাজ ওতপ্রোত হইয়া যাইতেছে—সেই উদ্দেশ্য কি দশগুণ বলের সহিত কার্য্য করিতেছে না?

সর্ব্বোপরি এই প্রকার কর সংস্থাপিত হইলে, বৃথা বাগাড়ম্বর দ্বারা কল্পিত অভাব প্রদর্শন করিয়া যে অসন্তোষের সূত্রপাত এবং পরিপোষণ হইতেছে, তাহাও নিবারিত হইবে। যদি বাঙ্গালা মুদ্রণের শাসন করা প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে—এবং মান্যবর সভ্যগণ অবগত আছেন যে, তাহা হইয়াছে—তাহা হইলে ইহার যে কেবল শাসন আবশ্যক, তাহা নহে, প্রত্যুত অনুমতিমূল্যও আদায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) ইচ্ছা করেন যে, এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে, মুদ্রণশাসনের ব্যবস্থার এক অংশ স্বরূপ পঠিত হউক।

কাহাকে কি অবস্থায় কি নিয়মে কত পরিমাণে কর দিতে হইবে, পাণ্ডুলেখ্যে তাহার সাবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে তিনি (মান্যবর পঞ্চানন্দ) আশা করেন যে, এই কর সংস্থাপিত হইলে, অন্য লাইসেন, এমন কি, আবকারি-লাইসেন পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া চলিবে, অথচ তাহাতে রাজকোষের সঙ্কোচ হইবে না।

শ্রীমান্ ভক্তবৃন্দ কল্যাণবরেষু।

বৎসগণ, তোমরা নরলোক, অল্পেই ব্যাকুল হইয়া ওঠো। দেবচরিত্র বুঝিতে পার না, দেবতার লীলা তোমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত নয়, সেই জন্ত 'সবুরে মেওয়া ফলে'—এই স্বর্গীয় বাক্যের সম্মান ইহলোকে তোমরা রক্ষা করিতে পারো না। তবে আমার দুর্ম্মতি ; নাহিলে এখানে সাধে সাধে আবির্ভূত হইলাম কেন ?—সেই দুর্ম্মতির ফলভোগ স্বরূপ তোমাদের কাছে আমিও কৈফিয়ত দিতেছি।

আমি কিছুদিন অবধি তোমাদিগকে দেখা দিতে যে এত শৈথিল্য করিতেছি, তাহার অনেক কারণ আছে। যখন আমি প্রথম অবতীর্ণ হই, তখন আমার স্বর্গীয় বুদ্ধিতে এই ধারণা ছিল যে, নরলোকেও বুঝি প্রকৃতি দেবলোকেরই মত। কিন্তু অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম যে, দেবচিত্তেও ভ্রমের স্থান হইয়া থাকে। অতএব নর-লোক ভালো মত চিনিবার জন্ত এতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাই এত বিলম্ব। দুঃখিত হইও না, বিলম্বে তোমাদের ক্ষতি নাই, লাভই আছে। এতদিন কি দেখিলাম, এত বিলম্বে তোমাদের কি লাভ, সবিশেষ জানাইতেছি, অবধান করো।

সাধারণতঃ একটা কথা জানা গিয়াছে যে, এ পাপ পৃথিবীতে অনেক পাষণ্ডের দোষে অনেক ভক্ত মারা পড়ে। তুমি আমার পরম ভক্ত, সেবক ; যথা সময়ে ভক্তি-পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে আমার পূজা দিয়া, হা দেব, হা দেব, করিয়া আমাকে ডাকাডাকি করিতেছ। এ দিকে তখন আমি এক পাষণ্ডের ছলনায়, স্তোক-স্তবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই পাষণ্ডের আড্ডায় হরিভানন্দের আশ্বাসে বসিয়া আছি। তাহার দোষে তুমি ফাঁকি পড়িলে ; শিরে করাঘাত করিয়া আমাকে ভোলানাথ ভাবিয়া, মনে মনে গালি দিতে লাগিল। বৎস, দোষ আমার নহে, দোষ তোমাদের কপালের, আর দোষ এই দুষ্টসংসর্গের। সকলে যদি ন্তায্য সময়ে ন্তায্য গণ্ডা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না, আমাকেও কথা সহিতে হয় না। আমি ত করিবই, তোমরাও পাষণ্ড-দলনের চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর হও।

আর একটা সাধারণ কথা টের পাইয়াছি। নরলোক যে বানর লোকের সাক্ষাৎ বংশধর, এটা অনেকেরই এখন বিশ্বাস হওয়াতে, ব্যবহারটা তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের মধ্যে যিনি কথক, তিনি উচ্চ কাষ্ঠাসনে তোমাদের অবোধগম্য কিচির-মিচিরে তোমাদিগকে উপদেশাদি দিয়া থাকেন, তোমরাও দাঁত দেখিয়াই পরম তুষ্ট। লাভে হইতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের ভাষার অনেকটাও তোমাদের বুদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত হইয়া পড়িয়াছে ; প্রমাণ, তোমাদের সাধারণী, তোমাদের সঞ্জীবনী (১)। আর সাধারণীর কথা, আজি কাল তোমাদের বেদ। বৎসগণ,

(১) 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'।

ভ্রান্তি পরিহার করো, ধৈর্য্য শিক্ষা করো, ব্যস্ত হইও না। তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা সাত শ বৎসর পাষাণে বুক বাঁধিয়া ধৈর্য্য দেখাইয়া আসিতেছেন, তোমরা আর মাসেক দুমাস পারিবে না? ধিক্ তোমাদিগকে!

সাধারণ কথা আর একটা বলিয়াই বিশেষ কথার অবতারণা করা যাইতেছে। যাহারা ভাবুক, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালা কথার ইজ্জত নাই, বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান নাই, বঙ্গে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই, এই সকল তত্ত্বের প্রমাণ দেওয়াই পঞ্চানন্দের উদ্দেশ্য। তাহা সফল হইয়াছে। পঞ্চানন্দ সকলে আদর করিয়া পড়িতে চাহে না, পঞ্চ পড়ে, চারইয়ারি পড়ে, বাঁদরামি করে,—কিন্তু বাঙ্গালা কথার তিলকণা কেহ নাই, পঞ্চানন্দের আদর নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান নাই। ইংলিসম্যানের দাম অগ্রিম সকলেই দেয়, কিন্তু বঙ্গদর্শন, বান্ধবের (১) কথা কাহারও মনে থাকে না। কাজে কাজেই আষাঢ়ীয় দর্শন ভাদ্র মাসেও তাহা পড়িতে পারেন না। আর প্রতিজ্ঞায় যে দৃঢ়তা নাই, তাহা বলিতে হইবে কেন? যে দিন স্বয়ং পঞ্চানন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে নিয়মিতরূপে তিনি দেখা দিবেন, সেই দিনই লোকের দিব্য জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল। বৎসগণ, অদ্য হাম্বা রবে রোদন করিলে কি হইবে?

যাহা হউক, বিশেষ কথা এখন বলা যাউক; আমি এতদিন কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, একে একে সে সব বলা যাউক। তোমরা ফল ধরিয়া উপবিষ্ট হও।

বিশেষ কথা।

১। রাজদর্শন।

যখন সংসার দেখিতে আমার বাসনা হইল, তখন উপর হইতে তলা পর্য্যন্ত দেখাই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। নরলোকে রাজা এবং রাজপদই সর্ব্বোচ্চ জানিয়া আগে রাজদর্শনটাই উচিত বিবেচনা করিলাম।

কিন্তু গোড়াতেই গোল বাধিল;—ভারতে রাজা কে? যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাই, সে-ই এত মহারাজ, রাজা, রাজড়ার খপর দেয় যে, ভাবনায় দেব-প্লীহাও চমকিয়া ওঠে। ভূমিশূন্য মহারাজ, হিন্দু বিধবা অপেক্ষা হীনতর; কারণ, জীবনের কিয়ৎকালের নিমিত্ত বেতনভোগী রাজা। এ সব এত অধিক যে, আমি অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; মনে হইল, তবে বুঝি ভূ-ভারতে সত্য রাজা নাই, সমস্তই অরাজক।

(১) ঢাকার স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত তখনকার মাসিকপত্র।

শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে, আমার ধারণাটা নিতান্ত অমূলক নয়; এ মুলুকে আসল রাজা নাই, রাজপ্রতিনিধি মাত্র আছে। তথাস্তু। আমি সেই প্রতিনিধি হইতেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

প্রতিনিধি দেখিতে কলিকাতায় গেলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ততোধিক প্রকাণ্ড ফটক, যেন হাঁ করিয়া জগৎ সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত; আর সেই ফটকে ব্রহ্মাস্ত্র-সজ্জিত যমদূত-স্বরূপ প্রহরী! দেখিয়া একটু ভয় হইল, ভাবনাও হইল। এ প্রহরী কেন? তবে কি রাজায়-প্রজায় মৈত্রভাব নাই?

সাহস করিয়া প্রহরী পুরুষের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, সেই প্রান্তর-প্রতিম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম। প্রহরী বোধ হয় কোন আত্মীয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল; আমাকে তদবস্থ দেখিয়া শ্বশুর-কুল-সম্ভূত কুটুম্ব বিশ্বাসে সম্বোধন করিল। আমি অবাক্! প্রহরী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাঁর দক্ষিণ হস্ত আমার গলদেশে সংস্পৃষ্ট করিয়া ভক্তিভাবে 'যাও' বলিয়া আমাকে বহির্দেশের পথ দেখাইয়া দিল। আমি ভাবগতিক না বুঝিতে পারিয়া, তাহার অনুগ্রহে পরিতুষ্ট হইয়া প্রবেশ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, প্রতিনিধি সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রহরীর চিত্তটা খুব ভক্তিশীল বটে। কিন্তু নীচ প্রবৃত্তি অবলম্বন করাতে তাহার হস্ত কিঞ্চিৎ কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার জন্য আমার দুঃখ হইল।

যাহা হউক, একবার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে দেখা গেল যে, আলয়ের বাস-যোগ্যতা যত হউক, না হউক, বহিরাকৃতি কিঞ্চিৎ ভীতিজনক! সরল, বক্র, স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বাঁশ প্রতিনিধিকে নিয়ত যেন—“মনে কর, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর” স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিয়ত বিরাজ করিতেছে। প্রতিনিধির বড় সুখের চাকরি বলিয়া আমার বোধ হইল না।

বুঝিয়া-সুঝিয়া স্থির করিলাম যে, এমন অসুখী প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা না করাই ভাল। জিজ্ঞাসাবাদে টের পাইয়াছি যে, প্রতিনিধির ভাবনা চিন্তা ত আছেই, তাহার উপর তিনি দশচক্রে নিপতিত পুতুল, নিজে হাত-পা নাড়িয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নিরেট অজ্ঞতানিবন্ধন মুখফোঁড় হইয়া কিছু করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিও হয় না। যাহার পরমায়ু পাঁচ বৎসর মাত্র, সে বেচারা করিবে কি? দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ের তরঙ্গ উঠিতে-না-উঠিতে, তাঁহার হিন্দু-রমণীর-বাল্য-বৈধব্য উপস্থিত হয়।

অতএব এখন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আলাপ করাই হইল না।

ADDRESS TO THE JURY.

অর্থাৎ

জুরি সম্বোধন।

জুরিমহাশয়গণ,

একটা লোক গুরুতর অপরাধ করিয়াছে কি না, এই কথার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আপনারা এখানে আসিয়াছেন! আপনাদের বিদ্যার জোরে কিম্বা বুদ্ধির ফেরে যে, এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহা নয়; জজ সাহেব আইন বুঝাইয়া দিবেন, সাক্ষীরা ঘটনার কথা বলিবে, উকীলেরা সাক্ষীদের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিবেন, কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা প্রাণপণ করিয়া দেখাইয়া দিবেন। তারপর আপনারা বলিবেন, হাঁ, এ লোকটা দোষী বটে, কিম্বা বলিবেন, না, এ দোষী নয়।

কাজটা সহজ, কিন্তু যত সহজ মনে করিয়া, জুরিপতি মহাশয়! এই আদালতের কড়ি-বরগাগুলি বার বার গণনা করিতে আপনার গোটা মনটা সংলগ্ন করিয়াছেন, তত সহজ নহে। অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়টা শুনুন, একবার আমা পানে চাহিয়া দেখুন।

আইনকর্ত্তারা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন যে, আপনাদিগকে ডাকিয়া, আপনাদের অভিপ্রায় জানিয়া তবে জজ সাহেব এক ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দ্দোষ ঠিক করিবেন। আইনে লেখা আছে বলিয়াই জজ সাহেব আপনাদিগকে ডাকিয়াছেন। আর, আপনারা না কি দেশের অবস্থা জানেন, লোকের ব্যাভার জানেন, কেন লোকে মিথ্যা বলে, কি হইলেই বা সত্য বলে, এ সকল জানেন; সেই জন্যই আইনকর্ত্তারা বলিয়াছেন, অপরাধের বিচার করিতে আপনাদের থাকা চাই।

তা, জুরিমহাশয়! টানা পাখার বাতাস ঠাণ্ডা লাগে কি না, মিষ্ট লাগে কি না, এ বাতাস গায়ে লাগাইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ঘুম আসে কি না, ইহা দেখিবার জন্য ত আপনাকে এখানে আনা হয় নাই; তবে কোন্ বিবেচনায়, ও জুরিমহাশয়!— জুরিমহাশয়! বলুন দেখি, তবে কোন্ বিবেচনায় চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া আপনি নাসিকাধ্বনি করিতেছেন?

সাক্ষীরা বলিয়াছে যে, আসামী-ফরিয়াদীর গাঁয়ে দলাদলি আছে। এদেশে, দলাদলি থাকিলে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে জব্দ করিবার জন্য হুঁকা বারণ, নাপিত বন্ধ, কুৎসা রটনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, মারামারি—কত কি যে করে, তা আপনারা জানেন। এই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের কথা শুনিয়া, সেই দলাদলির ব্যাপারটা মনে করিয়া, আপনাদিগকে স্থির করিতে হইবে যে, আসামী সত্য সত্যই দোষ করিয়াছে,

না কি সেই দলাদলির দরুণ, মিছামিছি ইহার নাম করিয়া দিয়া সাক্ষীরা আপন দলের বাহাদুরী বজায় রাখিতে আসিয়াছে ?

না, জুরিমহাশয়! আপনি যদি দাদার বোলে মোর বোল, জুরীপতির যে অভি-প্রায় হইবে, আমি তাহাতেই সায় দিব, কিম্বা জজ সাহেব যে দিকে চলাইয়া দিবেন, আমি সেই দিকে চলিব, এইরূপ মনে করিয়া ঘরকন্নার কথা ভাবেন, আমার কথায় মন না দেন, তাহা হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রত্যেককে নিজের মত স্থির করিতে হইবে। সঙের মতন বসিয়া থাকিবার জন্য আপনি এখানে আইসেন নাই, আদালতে তামাসা দেখিবার জন্যও আইসেন নাই। কোথায় কে হাঁচিল, ঐ লোকটা কেন হাঁসিয়া উঠিল, বাহিরে ঠক ঠক করিয়া কিসের শব্দ হইতেছে—এ সব কথা মনে করিলে চলিবে না। এ মোকদ্দমাটা হইয়া যাউক, তাহার পর দশ দিন উপরি উপরি আদালতে আসিয়া আপনি মজা দেখিয়া যাইবেন, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না। কিন্তু আজি অমন হাঁ করিয়া থাকিলে আমি মারা যাই। একটা লোকের ধন, প্রাণ, মানের কথায় অমন করিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলে অধর্ম্ম হয়। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ত জানেন ?

প্রথমতঃ, যখন আসামীকে মেজেষ্টরের কাছে ধরিয়া আনা হয়, তখন সে কবুল করিয়াছিল, এখন বলিতেছে যে, পুলিশের মারের চোটে সে কবুল করিয়াছিল, কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, সে এ পাপে ছিল না। একবার কবুল করিয়াছিল বলিয়াই যদি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সে কাজে আপনাদিগকে এখানে না আনিলেও ক্ষতি হইত না; তবু যে আপনাদিগকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, একবার করিলেই সব গোল চুকিয়া যায় না।

একটা ঘটনা হইলে তাহার কিনারা করিতে না পারিলে পুলিশের বদনাম হয়, তাহা আপনারা জানেন। কাজে কাজেই এক প্রকার দায়গ্রস্ত হইয়া কখনও কখনও পুলিশ যে হাড়িকাঠে যেটা-সেটা একটাকে টানিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, ইহা অসম্ভব নয়। আর সে রকমে টানিয়া ফেলিতে হইলেই, হয় ছুটো ফাঁকি ফুঁকি দিয়া ভুলা-ইতে হইবে, নয় যেখানে মন্ত্র তন্ত্র ছিটা ফোটায় কাজ না হইল, সেখানে গুঁতো গাঁতাটা বসাইতে হইবে। এখন আপনাদিগকে বলিতে হইবে যে, এ লোকটার একরার কি গুঁতোর দরুণ, না কি, লোকটা বড় ধার্ম্মিক, পাপ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারে নাই, সব বলিয়া ফেলিয়াছে, সেই দরুণ ?

বেলা যাইতেছে, তাহা আমি জানি। এই তিন দিন আপনার দোকান বন্ধ, আর আপনার তাঁত কামাই, তাহাও আমি জানি। কিন্তু যখন আসিয়াছেন, হলফ করিয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, তখন বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? হলফের অর্থ আপনি জানেন না; লেখাপড়ার মধ্যে আপনি ঢেরা সই করিয়া দুইখানি তমঃসুক

লিখিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমি জানিলেই বা কি হইবে? এখন যে আপনারা বিচারক। যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগকে বিচার করিতেই হইবে। আমি ব্রাহ্মণ, লেখা-পড়া জানি, বড় লোক,—যথার্থ। আমি আপনাকে 'আপনি', 'আপনি' বলিলে আপনার মন ধড় ফড় করে, প্রাণে কষ্ট হয়, তাহাও জানি। কিন্তু আপনি এখানে দোনা ময়রা নহেন, আপনিও গুণে মুদী নহেন। এখন আপনাদের আসনকে আমিও সম্মান করিতে পারি, তাহাতে দোষ হয় না। আপনারা বোকা, মুর্খ, কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইলেও, এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। অতএব যথাসাধ্য আমার কথা কয়টা শুনিয়া, মন দিয়া বুঝিয়া, আপনারা সকলে বলুন, এ ব্যক্তি দোষী, কি নির্দ্দোষ? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেই আপনারা ধম্মে খালাশ, তাহাতে যদি অবিচার হয়, সে পাপের ফল ভুগিবেন—যিনি আপনাদের ডাকেন, তিনি।

না। আপনাদের কাছে বকাবকি করা, কেবল ঝকমারি। আপনাদের কর্ম্ম-ভোগ, তাই এখানে আসিতে হয়; আর আমারও পোড়া কপাল তাই কথা কহিতে হয়। আমি ক্ষান্ত হইলাম, আপনারাও বাড়ী যান।

শিবপুরের ব্যাপার।

"দোষ কারু নয় গো মা;
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

১। ওকালতিতে আর সুখ নাই, ডুবেলা ডুমুটো অন্ন যোটা ভার হইয়াছে। চাকরির উমেদার এত বেশী যে, একটা কর্ম্মের শুধু প্রত্যাশাতেই তিন পুরুষ কাটাইয়া দেওয়া যায়। ঘরে ঘরে ব্যারাম হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসক পায়ে পায়ে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি ভদ্রসন্তান শিবপুরের কালেজ কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ শিখিতে গিয়াছে। চাকরি যোটে, উত্তম, না যোটে, গতর খাটিয়ে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, ভদ্রসন্তানদের এই আশ্বাস! কিন্তু কপাল এমনি যে, কাজ শিখিতে গিয়া বেচারাদের দুর্গতির আর বাকী রহিল না। জেলের কয়েদীও খাইতে শুইতে স্থান পায়, কুলী মজুরও উহারই মধ্যে একটু স্বাধীনতাবে আপনার শরীরের ভাব, মনের গতি বুঝিয়া চলিতে পায়। কিন্তু এই ভালমানুষে ছেলেদের কষ্টের আর পরিসীমা ছিল না। বাস করিতে হইবে, তা এমনি ঘর যে "ভঃ শুধু" সঙ্গে না লইলে প্রবেশ করিবার যো নাই; রাঁধিয়া বাড়িয়া পোড়া পেটে চারিটি দিতে হইবে, তা উনন পাতিবার স্থান নাই; কোদাল ধরিয়া অন্তাজ খামাই

একটু খেলা-ধূলার জায়গা করিবে, তা সেই দিকেই, তার উপর দিয়াই বোম্বাই গাড়ি যাইবার হুকুম হইবে; স্নান-পানের জল লইবে, তা ফিরিঙ্গি ছেলেরা ঘাটে নামিতে দিবে না।

বড় কষ্টের সময়ও লোকে অন্যমনস্ক হইয়া একটু আমোদের কাজ করে; পুত্র-শোকবিহ্বলা রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে একটা তৃণ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে; সে এক প্রকার আমোদ বৈ কি? শ্রীশচন্দ্র ভদ্রসন্তান—এ দুঃখের সময়ে আনমনে একটু আমোদ করিতে গেল; কারখানার একখানা রেলের কল নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। একে অন্যমনস্ক, তা। কপাল মন্দ, শ্রীশচন্দ্রের হাতে সেই রেলটা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফল কি হইল, সকলেই জানে, কারখানার কেউ কেটা ফোরেকর্ম সাহেব ভদ্র-লোকের ছেলের ঘাড়ে ধরিয়া ধাকাধাকি, বেঞ্চের উপর যষ্টিতাড়না, এক মহাব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন। মানুষে কত সয় বলো? সমস্ত ভদ্রসন্তান যুটিয়া একপরামর্শ হইয়া শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা সাহেব বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করিল, কাঁদিয়া জানাইল যে, এ অপমান, এত অত্যাচার ভদ্রলোকের প্রাণে কিছুতেই সহ্য হয় না। ফোরেকর্ম সাহেবকে না তাড়াইলে ভদ্রসন্তান আর মান লইয়া, আস্ত হাড় রাখিয়া শিখিতে পারে না।

বাস্তবিক, এত দুঃখ সংসারে কাহারও হয় নাই; ভদ্রসন্তানের উপর এত অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই। দরখাস্ত করা অতি চমৎকার কাজ হইয়াছিল।

*　　　*　　　*

২। ছেলে-পিলে পড়িতে আইসে, শিখিতে আইসে। তাহারা যদি বাবু হয়, উদ্ধত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা হইলে তাহাদেরই পরকাল নষ্ট। শিক্ষার স্থানে পদে পদে বংশগৌরব, মান মর্য্যাদার কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে গেলে, শিক্ষা ত হয়ই না, শিক্ষকের পক্ষে আপন মান বাঁচাইয়া চলা ভার হয়।

শিবপুরে যাহারা শিখিতে গিয়াছিল, তাহারা গরবেই অধীর—আমরা ভদ্রসন্তান। আপনি ভদ্র কি না সেদিকে দৃষ্টি নাই, শুদ্ধ ভদ্রসন্তান। তা ভদ্রসন্তান হইলেই কি রান্নাঘরে আস্তাকুড় করিতে হয়? সাহেব ফিরিঙ্গির ছেলেরা কি খায়, কেমন শোয়, দিবা রাত্রি তাই ভাবিতে হয়? আর, লেখা গেল, পড়া গেল, কেবল তাদের হিংসাই করিতে হয়? তাহার উপর ভদ্রসন্তান হইলেই কি আপন কাজ ফেলিয়া, যেখানে সেখানে গিয়া, কল ভাঙ্গিয়া, জিনিস-পত্র নষ্ট করিয়া অশিষ্টতা, অবাধ্যতা দেখাইতে হয়? শিক্ষার মূল গুরুভক্তি, তা গেল চুলোয়। কেবল বাবুয়ানা হইল না, শিক্ষক যেন রুক্ষ কথা বলিল, কিম্বা গায়ে হাত তুলিল, কেবল এই জপ তপ ধ্যান জ্ঞান। এমন ছেলেদের কি বিদ্যা হয়? অত বড়মানুষ অত ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া গুমর করিতে গেলে এখানে চলে না। এমন অশান্ত দুর্দ্দান্ত ছেলেদের ঘাড়ে ধরিয়া বাহির

করিয়া দেওয়াই উচিত। ক্রোফ্ট সাহেব রীতিমত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ়মতির প্রশংসা করা উচিত।

*   *   *

৩। এই কাণ্ডে যদি কাহারও কষ্ট হইয়া থাকে, কি অপমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে, একা শ্রীশচন্দ্রেরই হইয়াছিল। কিন্তু সব ছেলে ঘোট পাট করিয়া—এ শিক্ষক থাকিলে শিখিব না, এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কারখানায় থাকিব না—এ সব কোন্ দেশী কথা? বিদ্যালয় ত গুরুমারা বিদ্যার জন্য হয় নাই। কিসে মান, কিসে অপমান, কি ভালো, কি মন্দ, এই সমস্ত শিখাইবার জন্যই হইয়াছে। ছেলেরা যদি এত লায়েকই হইয়া থাকে, কর্ত্তার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কি কলম চালাইবার অধিকারই যদি তাহাদের জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিদ্যালয়ে কেন? অবশ্য মুনিরও ভ্রম হয়, গুরুরও দোষ হয়। কিন্তু যার ক্ষতি, সে-ই কেন বিনয় করিয়া দুঃখ প্রকাশ করুক না? সব কজনে জমায়েতবস্ত হইয়া বর্গীর দলের মত হাঙ্গামা করা কেন? এ যে বড় কুশিক্ষা, ভয়ানক কুদৃষ্টান্ত! এখন থেকে ষড়যন্ত্র করা অভ্যাস করিলে কালে এ সকল ছেলে যে কি ভয়ানকই হইয়া উঠিবে, তাহা বলিবার কথা নয়, অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মহামনা ক্রফট সাহেব যেমন সদ্বিবেচক, তেমনি দয়ালু; যেমন দৃঢ় শাসক, তেমনি সুনীতির পোষক। ছেলেদের একবারে দূর করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইলেও তাহাদিগকে নিজ দোষ দেখিবার সময় দিলেন। আপন আপন ভ্রম বুঝিয়া যৎসামান্য অর্থ দণ্ড দিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এই তাঁহার সদয় ইচ্ছা। ইহাতেও দুর্ম্মতিদের চৈতন্য হইল না। না হইল, ত বয়ে। শিখিলে নিজের উপকার, না শিখিলে নিজেরই অপকার। শিক্ষার ফলে বড়মানুষ হইয়া কেহ ত অধ্যক্ষ-প্রবরকে সম্পত্তির অংশ দিবে না। সুতরাং ক্রফট সাহেবে বিবেচনার গুণবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার দয়াগুণের কথা সহস্র মুখে বর্ণিতব্য।

*   *   *

৪। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের গবরমেণ্টের মত রাজ্যপ্রণালী, এত প্রজানুরা এরূপ সমদর্শিতা বড় একটা সুলভ পদার্থ নহে। রাজ্য-বিপ্লব নয়, শাসন সম্বন্ধীয় কোন প্রকাণ্ড সমস্যা নয়,—এই বিশাল রাজ্যমধ্যে কোথায় এক গুরুমহাশয়ের সঙ্গে ছাত্রে বিরোধ হইয়াছে, বিভাগের কর্ত্তা তাহার একটা যেমন হউক নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে তথাপি এই সামান্য উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের ছোট লাট ইডেন (১) সাহে মধ্যস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের একটা সামান্য মশাও স্ব

---

(১) Sir Ashley Eden.

ভ্রষ্ট হয় নাই, অথচ রাজ্যেশ্বর স্বীয় সর্ব্বতোদর্শন দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কোনও কথা নাই যে, সকল বিষয়েই লাট সাহেবকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে; এমন কাহারও সাধ্য নাই যে, লাট বাহাদুর অমুক প্রসঙ্গে নিজ মত প্রকাশ করিলেন না বলিয়া কেহ তাঁহার কেশস্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি এই সামান্য বিষয়ের জন্য লাট সাহেবের মাথাব্যথা। তাই যে যা হউক একটা করিয়া দেওয়া, তাহা নয়। প্রকাণ্ড গেজেটে, প্রকাণ্ড ভাবে উভয় পক্ষের দোষ-গুণের সমালোচনা করিয়া লাট সাহেব যেন সাধারণ প্রজাবর্গসমীপে নিজের কৈফিয়ৎ দিতে, সাফাই করিতে বসিয়াছেন। কি সাহস! কি সদাশয়তা! কি লোকানুরাগ! কি সার্ব্বজনীনতা! যিনি ইঙ্গিত করিলে মাথার পর মাথা গড়াগড়ি যায়, যিনি নিশ্বাস ফেলিলে ফাঁসীর আসামী খালাস পায়—তাঁহার এই সৌজন্য। এমন সুখের কথা, এত আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? রাম-রাজ্যের যদি কোনও অর্থ থাকে, তাহা হইলে এই সেই রাম-রাজ্য; রাজপদে বসিয়া কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে ইডেন সাহেবের গৌরব অপরিসীম এবং অপরিমেয়।

*　　　*　　　*

৫। পঞ্চানন্দ দেখাইলেন যে, সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবিহিতরূপে প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এত হুলস্থূল হইয়া গেল, অথচ কাহারই তিল মাত্র দোষ নাই। তবু যে এত গোলযোগ, এত মনোভঙ্গ, এত দীর্ঘ নিশ্বাস, এত অশ্রুনিপাতন এই এক ব্যাপার লইয়া হইল, সেইজন্য মনের আনন্দে সচ্চিদানন্দ পঞ্চানন্দ বলিয়াছেন,—

"দোষ কারু নয় গো মা,
কেবল স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

*　　　*　　　*

দুষ্টের-দমন বিধি।

[ফৌজদারি কার্য্যবিধির প্রস্তাবিত সংশোধনে পর্য্যাপ্ত প্রতীকার হইবে না বিবেচনায় পঞ্চানন্দের পাণ্ডুলিপি]

আইন হইবার কথা

যেহেতু নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও ইংরেজ বাহাদুর দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ ভারতবাসীর দমন ও শাসন করিয়া উঠিতে অক্ষম হওয়ায়, অপরাধের বিচারপ্রণালী সংশোধন না করিলে, রাজত্ব অচল এবং প্রজাত্ব প্রবল হইতেছে, এ মতে নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

অনুষ্ঠান, রদ, ব্যাপ্তি এবং পরিভাষার কথা।

১ দফা। সংক্ষেপ নামের কথা।

এই আইন দফা-রফার আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তির কথা।

এ আইন যেখানে চলিবে না, সেখানে নিতান্ত অরাজক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আরম্ভের কথা।

এবং এ আইন জারি হইবার পূর্ব্বেই চলিতে থাকিবে।

২ দফা। রদের কথা।

যে সকল আইন এবং বিধান হাকিমানের মনোমত নহে বা হইবে না, তাহা এতদ্দ্বারা রদ করা গেল।

৩ দফা। দায়ের মোকদ্দমার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা দায়ের আছে, তাহার নিষ্পত্তি এই আইন মতে হইবে।

৪ দফা। পরিভাষার কথা।

এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ এবং ভাষার নিম্নলিখিত মত অর্থ হইবে, অন্যথা হইবে না।

তদারকের কথা।

লোককে ধরিয়া চালান দিবার জন্য পুলীশ যে কোনও কার্য্য করিবে, তাহার নাম তদারক। তদারক শব্দে হাতকড়ি দেওয়াও বুঝাইবে।

বিচারের কথা।

লোককে সাজা দিবার জন্য আদালতে যে সকল অনুবন্ধ হইবে, তাহার নাম বিচার। বিচার শব্দে খালাস বুঝাইবে না।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

জজ, মেজেষ্টর প্রভৃতি যে কেহ সাজা দিবে, আদালত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

হাইকোর্টের কথা।

যে আদালতে আসামীর উকীল, কৌঁসুলি—চড়টা, চাপড়টা অভাবে মুখখাবড়া খাইবে, হাইকোর্ট শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে।

ফৌজদারি আদালতের কথা।

৫ দফা। আদালতের রকমারির কথা।

হাইকোর্ট ছাড়া, আরও দুই প্রকার আদালত থাকিবে, যথা ;—

(ক) মেজেষ্টরি।

(খ) সেশন।

৬ দফা। যে আদালতে বিচার হইবে, তাহার কথা।

মেজেষ্টর ইচ্ছা করিলে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। মেজেষ্টরের অপ্রবৃত্তি বা আলস্য হইলে, কোনও কোনও মোকদ্দমার বিচার সেশনে হইতে পারিবে।

গৌরাঙ্গের মোকদ্দমার কথা।

৭ দফা। গৌরাঙ্গের কথা।

গৌরাঙ্গ শব্দে নেটিভ নহে, এরূপ কোট-পেণ্টুলান-পরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে। এরূপ ব্যক্তির উপরের সাত পুরুষ এবং নীচের সাত পুরুষের মধ্যে কেহ কস্মিন্ কালে সমুদ্র না দেখিয়া থাকিলেও তাহারা সকলেই গৌরাঙ্গ হইবে।

৮ দফা। গৌরাঙ্গের মোকদ্দমা করিবার অধিকারের কথা।

স্বয়ং গৌরাঙ্গ না হইলে কেহ গৌরাঙ্গের মোকদ্দমা করিতে পারিবে না।

৯ দফা। গৌরাঙ্গ তলব করিবার কথা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ করিলে গৌরাঙ্গের নামে ভদ্রোচিত নিমন্ত্রণপত্র বাহির হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মরা কিম্বা অক্ষম হওয়া কি অন্য কোনও ওজর করিয়া কোনও ব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপে গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে না, এবং তদ্রূপ অভিযোগ গ্রাহ্য বা তন্মূলে নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইবে না।

১০ দফা। গৌরাঙ্গের বিচারের কথা।

গৌরাঙ্গের অনভিপ্রায়ে কেহ তাহাকে সাজা দিতে পারিবে না।

পুলীশের কথা।

১১ দফা। পুলীশকে সাহায্য করিবার কথা।

মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্ম, অর্থ, লোকবল এবং বাহুবল দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলীশের সাহায্য করিতে বাধ্য; যথা,—

(ক) শান্তিভঙ্গ করণ বিষয়ে।

(খ) একরার এবং চোরামাল বাহির করা বিষয়ে।

(গ) সাধারণতঃ তদারক বিষয়ে।

১২ দফা। বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিবার কথা।

পুলীশ যেখানে খুশি, যাকে খুশি, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।

১৩ দফা। গৃহপ্রবেশের কথা।

আসামী থাকা জানিতে পারিলে, কিম্বা থাকা সন্দেহ হইলে, কিম্বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা থাকিলেও থাকিতে পারে এরূপ অনুমান হইলে, কিম্বা যদিই

ভুল ভ্রান্তি ক্রমে থাকিয়া যায়, এরূপ বোধ হইলে, ঘর ভাঙ্গিতে, দুয়ার ভাঙ্গিতে, জানালা ভাঙ্গিতে, আসবাব ভাঙ্গিতে, মান ভাঙ্গিতে, সম্ভ্রম ভাঙ্গিতে, বৈঠকখানায়, সেৎখানায়, ঠাকুরঘরে কিম্বা অন্দরে অবারিত দ্বারে প্রবেশ করিতে পুলীশ ইচ্ছামত পারিবে।

১৪ দফা। অন্দরের বিশেষ কথা।

অন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাড়ীর এবং পাড়ার বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষবর্গকে হাতকড়ি দিয়া, কিম্বা অন্য প্রকারে বন্ধন করিয়া পাহারায় পুলীশ রাখিতে পারিবে, এবং আবশ্যক বোধ করিলে জোরপূর্ব্বক কুলকামিনীকে বাহির করিতে পারিবে।

১৫ দফা। তদারকের কথা।

তদারক করিবার সময়ে পুলীশ শ্যামচাঁদের সাহায্যে আসামীকে একরার করাইতে এবং চোরা মালের কিনারা করিতে পারিবে।

১৬ দফা। পুলীশের তদারকি কাগজের কথা।

তদারকের প্রণালী সম্বন্ধে পুলীশ কোনও কথা লিখিয়া রাখিতে পারিবে না, এবং লিখিয়া রাখিলেও তাহা পুলীশের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

বিচারের পূর্ব্বানুষ্ঠানের কথা।

১৭ দফা। উকীল মোক্তারের কথা।

আদালতের অনুমতি ব্যতীত আসামী উকীল-মোক্তার দিতে বা দিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিবে না। তদ্রূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাহা অপরাধস্বীকারের তুল্য গণ্য হইবে।

১৮ দফা। উকীল-মোক্তারের অধিকারের কথা।

কোনও উকীল-মোক্তার আসামীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর জেরা কিম্বা সওয়াল জবাব করিতে পারিবে না। হাকিমানের অনুমতি লইয়া সাক্ষিগোপালের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে।

মেজেষ্টরের বিচারের কথা।

১৯ দফা। ধরাধরি বিচারের কথা।

মেজেষ্টরের ইচ্ছা হইলে ধীরে সুস্থে, লিখিত পঠিতপূর্ব্বক ধরাধরি বিচার হইতে পারিবে।

২০ দফা। সরাসরি বিচারের কথা।

ঘোড়দৌড় করিতে করিতে কিম্বা পথে ঘাটে বেড়াইতে বেড়াইতে তাড়াতাড়ি করিয়া বিনা লেখা পড়ায় মেজেষ্টর স্বেচ্ছাক্রমে আসামীর সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

সেশনে বিচারের কথা।

২১ দফা। জুরি ও আসেসরের কথা।

সেশনে প্রত্যেক মোকদ্দমায় জুরি অথবা আসেসরের সাহায্যে আসামীর বিচার হইবে।

জুরি হইলে, অন্যূন তিনজন এবং আসেসর অন্যূন একজন নির্ব্বাচিত হইবে।

উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী, বাহিরের মুটে মজুর, ঘোড়ার গাড়ীর কোচমান কিম্বা গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে জুরি অথবা আসেসর মনোনীত হইতে পারিবে। তাহাতেও পরিমিত সংখ্যা পূর্ণ না হইলে, বলদ ধরিয়া বসান চলিবে।

২২ দফা। আসেসর ও জুরির সাহায্যে বিচারের কথা।

জুরি অথবা আসেসরের সহিত একমত হইয়া সেশনের হাকিম আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন। জুরি অথবা আসেসর বা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, আসামীকে নির্দ্দোষ প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেশনের হাকিম একাএক আসামীকে সাজা দিতে পারিবেন।

আপীলের কথা।

২৩ দফা। আসামীর আপীলের কথা।

সরাসরি ভিন্ন ধরাধরি এবং সেশনের বিচারের অসম্মতিতে আসামী আপীল করিতে পারিবে।

২৪ দফা। আসামীর আপীলের ফলের কথা।

আসামী আপীল করিলে জরিমানার স্থলে মেয়াদ এবং মেয়াদের স্থলে ফাঁসি এবং সকল স্থলেই সাজা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

২৫ দফা। সরকারের আপীলের কথা।

আসামীর প্রতি অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস পাইলে সরকার হইতে আসামীর পর পূর্ব্বে যে সময়ে হউক আপীল হইতে পারিবে।

২৬ দফা। সরকারের আপীলের ফলের কথা।

সরকারের আপীলে আসামীর সাজা হইতে পারিবে এবং লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইতে পারিবে, এবং আসামীর আপীলের যে ফল, তাহাও ফলিতে পারিবে।

হাইকোর্টের কথা।

২৭ দফা। পুনরালোচনার কথা।

অবিচার অর্থাৎ আসামী খালাস হইলে হাইকোর্ট খোদ এক্তেয়ারে অথবা পরের কথায় সমস্ত মোকদ্দমার নথি তলব দিয়া দেখিতে পারিবেন, এবং খালাস দিলে অরাজক হইতে পারে বলিয়া সুবিচার করিতে পারিবেন।

সরকারের কথা।

২৮ দফা। আইন স্থগিত করিবার কথা।

এই আইনের বিধান মতে কার্য্য হইলেও দুষ্টের যথোচিত শাসন হইতেছে না, এমত বোধ করিলে সরকার বাহাদুর কিছুকাল বা চিরকালের জন্য আইন স্থগিত করিতে পারিবেন।

২৯ দফা। আইন স্থগিত হইলে উচিত কথা।

তদ্রূপ আইন স্থগিত করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেশবাসিগণকে জাঙ্গিয়া পরাইয়া সরকার বাহাদুর তৈল নিষ্পেষণে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সরকারের ব্যয়সংক্ষেপ।

মহকুমার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজির সরকারি লেফাফা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন, গালাবাতি ফুরাইয়াছে। এক পয়সার গালাবাতি বাজার থেকে কিনে আনিবার জন্য ডিপুটী বাবুর অনুমতি চাহিলেন।

ডিপুটী বাবু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সংবৎসরের জন্য যাহা কিছু দরকার, গত ১লা এপ্রেল হিসাব করিয়া আনান হইয়াছিল। অদ্য ৩০শে মার্চ্চ গালাবাতির অভাব হইল, ইহা অন্যায় কথা। ডিপুটী বাবু নাজিরের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। লেফাফা বন্ধ হইল না, পড়িয়া রহিল।

নাজিরের কৈফিয়তে প্রকাশ যে, আফিসের কাগজ কলম ছুরী কাঁচি গালা বাতি ফিতে কালি প্রভৃতি সরঞ্জামের বরাদ্দ কেরাণীখানা হইতে হইয়া থাকে। কমি বেশীর কথা কেরাণীখানার আমলারাই বলিতে পারেন। নাজির যাহা পায়, তাহার হিসাব প্রস্তুত আছে। সে হিসাব সমঝাইয়া দিতে নাজিরও প্রস্তুত আছে। কৈফিয়তের উপর হুকুম হইল, হেড কেরাণী তিন দিবসের মধ্যে গালাবাতির জবাবদিহি করেন। লেফাফা রওয়ানা করা বন্ধ রহিল।

হেড কেরাণীর রিপোর্ট পাঠে ডিপুটী বাবু অবগত হইলেন যে, গত বারের বরাদ্দ করিবার সময়ে যিনি কেরাণী ছিলেন, তিনি পেন্সন লইয়া বিদায় পাইয়াছেন। হাল কেরাণী বিশেষ হাল অবগত নহেন। অগত্যা ডিপুটী বাবু এক দিনের খরচের আন্দাজ গালাবাতির জন্য জেলার মেজেষ্টরের কাছে রুবকারি পাঠাইলেন। মূল লেফাফা বন্ধ করা সম্প্রতি বন্ধ রহিল।

জেলার মেজেষ্টরের সেরেস্তাদার খুব হুঁশিয়ার, পাকা আমলা। রুবকারি পৌঁছিবা

মাত্র, মজেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন, গালাবাতির ইণ্ডেণ্ট ফারম্ অনুসারে হয় নাই। সাহেব ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন এবং হুকুম দিলেন যে, উচিত সংশোধন জন্য ডিপুটী বাবুর সদনে রুবকারি ওয়াপোশ পাঠান যায়।

কি জন্য বেমালুমী রুবকারী দ্বারা গালাবাতির ইণ্টেণ্ড পাঠান হইয়াছিল এবং কেনই বা ফারম্ মোতাবেক পাঠান হয় নাই, ডিপুটী বাবু তাহার তদন্তে লিপ্ত হইলেন। জানা গেল যে, ফারমের অভাব হওয়াতে রুবকারী পাঠান হইয়াছিল। সুতরাং ফারমের জন্য ইণ্ডেণ্ট গেল।

ক্রমে ফারম্ আসিয়া পৌঁছিলে, ফারম্ পূরণ করিয়া পুনর্ব্বার মেজেষ্টরের সদনে প্রেরণ করা হইল। মেজেষ্টর, তাহা কমিশ্যনরীতে পাঠাইয়া দিলেন। কমিশ্যনর সাহেব মঞ্জুর করিয়া কাগজ-কলমের সরবরাহকারী আফিসে চালান দিলেন। বজেটের অতিরিক্ত খরচ মঞ্জুর করাইবার জন্য একৌণ্টেণ্ট-জেনেরেলের অভিপ্রায় লইয়া সরবরাহকার সাহেব যথাক্রমে, যথানিয়মে, যথাসময়ে পুলীন্দা করিয়া বাঙ্গী ডাকে আধখানা গালাবাতি কমিশ্যনরের জরিয়তে, মেজেষ্টরের মারফতে মহকুমার ডিপুটী বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

ডিপুটী বাবু দস্তর মত রসিদ পাঠাইয়া দিয়া আপন সেরেস্তায় গালাবাতি জমা করাইয়া লোফাফা বন্ধ করিবার জন্য হুকুম জারি করিলেন। ৭ মাস উনিশ দিন পরে লেফাফা যথাস্থানে যথাপথে চলিয়া গেল। লেফাফার ভিতরে বাজার-দরের রিপোর্ট ছিল। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা গেজেটে প্রচলিত বাজারদর ছাপা হইল।

দপ্তরি একদিন নাজির বাবুর তামাক সাজিয়া দেয় নাই। লেফাফা বন্ধ করিবার সময়ে গালাবাতি গলিয়া তিন ফোঁটা মাটিতে পড়িয়াছিল; নাজির সেই দোষ ধরিয়া দপ্তরির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া দিলেন। রিপোর্ট ক্রমে ক্রমে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হওয়াতে এক সারকুলার বাহির হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, দপ্তরিরা গাফিলী করিয়া সরকারের যেরূপ লোকসান করে, তাহাতে দপ্তরির পদ উঠাইয়া দেওয়া উচিত, না কি, দপ্তরিদিগের কার্য্য পরীক্ষার জন্য ষ্টেশনরি আফিসে একটা নূতন সেরেস্তা খুলিয়া সরবরাহকার সাহেবের মাসিক দুই শত টাকা বেতন বাড়াইয়া দিয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করা উচিত, প্রত্যেক জেলার এবং প্রত্যেক মহকুমার হাকিমান, এ সম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান ভারতবর্ষীয় সভার কমিটি বসিয়া কসেট সাহেবের দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপের জন্য বিলাতের মহাসভায় একটা হাঙ্গামা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

এখনও লেখালেখি ফুরায় নাই। সুতরাং কোনও কথার মীমাংসাও হয় নাই। সেই এক পয়সার গালাবাতির গোল মিটিলে প্রেস-কমিশ্যনর আফিস হইতে পঞ্চানন্দ

অবশ্যই সংবাদ পাইবেন, এই আশ্বাসে সম্প্রতি পাঠকবর্গকে নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেওয়া গেল।

লেজ! লেজ!! লেজ!!!

অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন, বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতী কারীকরের তৈয়ারী এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে, সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।

লেজগুলি বিশেষ উপকারজনক। তুমি যখন মাতাল হইয়া আড়ষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকো, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে বচন নাই, হাত-পায়ে স্পন্দন নাই, তখন এই লেজ আপনা-আপনি তোমার বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, মুখের কাছে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া মাছি তাড়াইতে থাকিবে। টাকাওয়ালা বাবু হও তো লেজ লও।

তুমি এক প্রকাণ্ড বক্তা, মস্ত বুদ্ধিমান্ উকীল, সওয়াল জবাব করিতেছ, হাত পা কতই নাড়িতেছ,—এমন সময়ে মোক্তার আপন কার্দ্দানি দেখাইবার জন্য তোমার কাণের কাছে ভিন ভিন করিয়া তোমার স্রোত ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, তোমাকে বিরক্ত করিতেছে। থামাও তাহাকে লেজের এক বাড়ি মারিয়া। লও লেজ, ভালো উকীলের বিশেষ দরকারী। অনেক কাজে লাগিবে।

তুমি হাকিম, এজলাসে বসিয়া উত্তর-পূর্ব্ব জ্ঞান হারাইয়া কি মাথামুণ্ড করিতেছ, তাহার ঠিকানা নাই। যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি গোড়ায় ছিল, তাহা মেজাজের গরমে গলিয়া গিয়াছে। শেষে আপীল আদালত উপরওয়ালার ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। আমি তোমার বন্ধু মানুষ, কাছে বসিয়া আছি, অথচ সময় মতে উপদেশ দিয়া তোমার উপকার করিতে পারিতেছি না। প্রকাশ্যভাবে তখন কিছু বলিয়া দিলে তোমার আত্মগরিমায় আঘাত লাগে, বাজে লোকের কাছে তুমি অপদস্থ হও। একটি লেজ থাকিলে কোন ভয় থাকিবে না, সময় শিরে লেজ টিপিয়া দিয়া তোমার বন্ধু পথভ্রম হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। যদি সুবোধ হও, বুদ্ধির পরিচয় দিতে চাও, দশের কাছে আপন গুণপণার যথার্থ পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে লেজ লও! লেজ থাকিলে আর ভুল হইবে না।

তুমি ময়লাফেলা কমিশনর, অমুক কমিটির মেম্বর, রায়ে রায় দিয়া সাহেবের মন

যোগানো, আর পাড়াপড়সিকে ভোগান তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। সাহেবের হাতে যদি তোমার লেজটি দিয়া রাখিতে পারো, তাহা হইলে তুমি নির্ভয়, নিঃসংশয়, নিশ্চিন্ত। সাহেব যেই লেজ ধরিয়া টান দিবেন, অমনি তুমি সাহেবের দিকে ঝুঁকিবে। যদি এ সম্মানের পদ রাখিতে চাও, একটি লেজ লও। লেজ নহিলে তোমার কিছুতেই চলিবে না।

তুমি বড়লোক, চিহ্নিত ব্যক্তি। কত সভা-সমিতিতে, কত দরবারে, তোমার নিমন্ত্রণ হয়। লেজ থাকিলে অনেক যায়গায় অপ্রতিভ হইবে না, পাগড়ি সঙ্গে না থাকিলে তোমার ক্ষতি হইবে না, আর বাজে লোকের গোলে কখনও মিশিয়া যাইবে না। লেজ না থাকায় অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময়ে তোমার গোল হয়, লোকে তোমাকে চিনিতে পারে না, তোমার উচিত সম্মান করিতে পারে না, সেই জন্যই গোল হয়। লেজ লও, তাহা হইলেই যত গোল মিটিয়া যাইবে।

তুমি বাগিপ্রধান সভাপতি মহাশয়, তোমার একটী লেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বায়ুর বর পুত্র। তুমি তথায় কথায় ঝড় বাহিয়া দাও, বায়ুবেগে আপনি কতই উচ্চে আরোহণ করো। তোমার সঙ্গে উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভারত এতদিন অধঃপতিত থাকিত না। কিন্তু নিঃসহায়, নিরবলম্ব ভারত কি ধরিয়া উঠিবে? তুমি লেজে বাঁধিয়া না তুলিলে এই অসাড় জড়ভরত ভারতের কোনই উপায় নাই। লেজ লও, তোমার মহিমার ধ্বজা উড়াও, ভারতের উদ্ধারবার্ত্তা বায়ুবেগে বিঘোষিত করো। মহাভাগ, লেজ লও।

আর তুমি যক্ষরাজ, কুবেরের কুঠিয়াল, লক্ষ্মীর বিশ্বাসপাত্র, তোমাকে একটী লেজ লইতেই হইবে। তোমার অভাব নাই, তাহা জানি। তথাপি তোমার যত লেজ বাড়িবে, ততই সম্মান বাড়িবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। দেখো তোমার কত দিকে কত টান, কিন্তু সাহেব সুবার টানেই তোমার লেজমালা দিবানিশি যোড়া থাকে। আমাদের মত গরিব লোকের জন্য একটা পৃথক্ লেজ যদি রাখিয়া দাও, তাহা হইলে অনায়াসেই তোমার বার পাইতে পারি। তাই বলিতেছি, গুণধাম একটী লেজ লও। তোমার ক্ষতি নাই, আমাদের যোলো আনা লাভ, ভারতবর্ষের চারি পোয়া উপকার, একটী লেজ লও।

নগদ মূল্যে লইলে এক একটী রস্তা দস্তরি দেওয়া যাইবে।

পেসাদার এণ্ড কোম্পানি।

[বাণিজ্যের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য আমরা বিনা মূল্যে এই বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করিলাম। ভরসা করি গ্রাহকবর্গ লেজের গৌরব অনুভব করিয়া আমাদের বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।]

পঞ্চানন্দ।

পুনশ্চ নিবেদন।—পঞ্চানন্দের ছাপাওয়ালা বোধ হয়, অত্যন্ত অলস এবং অমনো-যোগী, আর বোধ হয়, সে পঞ্চানন্দের চক্ষের উপর কাজ করে না। এই বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যে প্রচারিত হইতেছে, সেই কৃতজ্ঞতায় ছাপাওয়ালাকে একটি লেজ বিনা মূল্যে দিতেছি; ইহাতে উভয় পক্ষের সুবিধা হইবে। পঞ্চানন্দের একটা অবলম্বন হইবে, আর ছাপাওয়ালারও লেজের মমতায় একটুকু ভয় থাকিবে।

পেসাদার এণ্ড কোং!

লাট-মন্দিরের খবর।

(হাড়গিলের পাঠানো।)

জানেন ত, আমি কুড়ের বেহদ্দ, আমায় আবার খবরাখবরের ভার দেওয়া কেন? আমি এই গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি, অথচ দুটী পা কখনও এক সঙ্গে বার করিনে। দিন রাত জেগে থাকি, তবু দুটী চোক মেলে কখনও পুরো নজরে চাইনে। লোকে মনে করে—কত জন বলেও—হাড়গিলের মত হুঁসিয়ার অথচ বিজ্ঞ লোক সংসারে আর নাই। আসল কথা আমিই জানি,—আমার মত আলসে ত্রিভুবনে আর নাই।

যাই হোক, আপনি যে আমার মত নাছোড়বন্দা, তাতে দুটো খবর না দিলেও, দেখ্‌চি আর চলে না। ফলে আমি বাইরের কিছু বল্‌তে পারবো না, এই লাটমন্দিরের ভেতর যা দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই, তাই নিয়ে দু'কথা যা যোগায় বল্‌চি;—

১। ব্যক্তি; লাটের দল ও মলাটের দল।

প্রথম ত দেখি খোদ লাট, নাম রিপণ। লোকটা কিছুতেই নাই, খায় দায় মাইনে ন্যায়, এই পর্য্যন্ত। রিপণ চাচা পষ্ট কবুল জবাব দিতে খুব মজবুৎ, মনের ভেতর বড় একখানা কোরকাপ নেই। দলের লোক যেমন যেমন বোলে কোয়ে ন্যায়, তেমনি কাজ কর্ম্ম করে। একবার একটা টিকে দেবার আইন হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল যে যে টিকে না দেবে, তার ম্যাদ হবে। রিপণ চাচা আইন দেখে চম্‌কে গেল, বোল্লে তোমরা দশ জনে যা ভাল বোঝো তাই করো, তায় আমি আপত্তি করি নে; কিন্তু আইনের ব্যবস্থা শুনে আমার পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে—এতে ম্যাদ কেন? সেই হাত-পা-সেঁদোনই সার, আইনটা কিন্তু জারি হোয়ে গেল।

যেমনি সেদিন আবার ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন হবার বেলা যতীন্দ্র ঠাকু বললে যে, খালাসের পর আপীল ক'রে লোককে নাস্তানাবুদ করাটা ভালো নয়, কো

রাজ্যেই এমন বেমক্কা কথা চলে না, তবে এখন চল্‌বে কেন ? চাচা—ঐ রিপণ চাচা, সাদা সিদে লোক, বোলে ফেল্‌লে —আমি ওসব কিছু বুঝি সুঝি নে, দলের লোক যা করে করুক। আগেকার লাট যা কোরে গ্যাছে, তার উল্টো করতে গেলে এক্ষুণি এরা আমায় খেয়ে ফেল্‌বে ; হচ্ছে, হোক। চাচার এ আক্কেলটুকু হলো না যে, আগেকার লাটের আমলে আপীলে সাজা বাড়াবার নিয়ম ছিল, অথচ আজকের এই মজলিসেই সেটা উল্টে দেওয়া হচ্চে। চাচা কিন্তু পষ্ট বোলে দিলে যে, কথাগুলো শক্ত, আমি অতো ভেবে উঠ্‌তে পারি নি।

চাচার দোষই বা দি কি বোলে ? ভাল মানুষের ছেলে, এসেছে ত একে মগের মুল্লুকে ! না জানে এ দেশের লোককে, না জানে এদের ভাষা, না জানে এদের চাল চলন, না জানে কিছু। এ হরি ঘোষের গোয়ালে—অর্থাৎ কি না এই ভারতবর্ষে—হঠাৎ যে একটা কিছু ঠাউরে ওঠা, যার তার কাজ নয়। তাই বোল্‌চি যে রিপণ চাচা থায় দায় মাইনে নায়, কোনও গোলের ভিতর থাক্‌তে চায় না। তবু ভালো, "ভালো কর্‌তে পার্‌বো না, মন্দ করব, কি দিবি তা দে"—ডেকে হেঁকে যে সেইটে করে না, এই ঢের।

লাটের দলে অনেকগুলো উপসর্গ আছে ! তার একটা লড়াইয়ের লাট। নেহাত ষণ্ডামার্ক লোক না হোলে কেউ কাঁচা প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াইয়ের চাকরি স্বীকার করে না। তা এ লোকটা কাজে যেমন ষণ্ডামার্ক, বুদ্ধিতে ততোধিক। আসামে কুলি পাঠাবার আইন নিয়ে যখন টক্কাটক্কি হচ্ছিল, হাঁদারাম উঠে বল্লেন কি না, আসামের চা-বাগানের কুলির মত সুখী জীব ভূভারতে আর নাই। আমি মনে মনে ভাবলুম যে, হাঁদারামের তাই যদি মনে হয়েচে ত, এ কর্ম্মভোগ কোরে মরে কেন, আপনি গিয়ে কুলি হলেই ত হয়। হাঁদারাম যদি কুলি হয়, তা হলে দেশের লোকের হাড় জুড়ায়, যার বাগানে হাঁদারাম খাটে, তার কাজ বেশী হয়, আর হাঁদারামের পেটটিকও যায়। ষণ্ডামার্কের কিন্তু সে বুদ্ধিটুকু হোলো না।

আর একটা মহিষাসুর আছে, সেটার নাম বিট্‌লে ষ্টোক্।* দরকার মত আইনের রদ বদল করাই তার কাজ, কিন্তু বিট্‌লে এমনি কুচক্রী, লাগুক না লাগুক, সময় অসময় না বুঝে আইন কোর্চ্চেই, কোর্চ্চেই। বিট্‌লে মনে করে যে, লাটমন্দিরটে কুমোরের চাক, আর তার মগজটা কাদার তাল। সেই চাকে চাপিয়ে কেবলই পাক দিচ্ছে, আর আইন বার কোর্‌চে। আইন যা করে, তাতে বিদ্যে প্রকাশও সেই গোচের ; না বেরুতে বেরুতেই তালি দিয়ে রিফু কোর্‌তে হয়। তার পর আবার সেই রিফুর রিফু, তস্য রিফু, ক্রমাগত চোলেচে। বিট্‌লে যে মাইনের টাকাগুলো মাটী

* Whitely stoke.

কোর‍্চে, তা করুক; ঐ যে এত কাগজ, কলম, কালি নষ্ট করে, তাতেই বড় কষ্ট হয়। আমার কেবলই মনে হয় যে, পঞ্চানন্দ ঠাকুর এত কাগজ কলম পেলে না-জানি কি একটা কারখানাই কোরে ফেল্‌ত। শুনতে পাচ্ছি বিট্‌লে এই বার যাবে। না টেঁক্‌লেই ভালো। যে দিন যাবে, আমি সেদিন পালক ঝেড়ে একবার হাওয়া খাবো।

এই রকম গ্রহ উপগ্রহ লাটমন্দিরে অনেক আছে, সব কটার কথা বল্‌তে গেলে বিস্তর সময় নষ্ট হবে।

যতীন্দ্র ঠাকুর টাকুর আর আর যারা আছে,তাদের আমি গ্রহ উপগ্রহ বোলে ধরি না। তারা লাটমন্দিরে মলাট মাত্র—সোণার জলে হলকরা বেশ বাঁধানো ওপরে টাইটেলটুকু আছে, কিন্তু ভেতরে সব ফাঁক; তাই তাদের মলাট বল্‌চি। শুদ্ধ শোভার্থে তাদের নিয়ে গিয়ে লাটমন্দিরে সাজিয়ে রেখে ছায়। দরকার হোলে কর্ত্তারা নেড়েচেড়েও ত্যাখেন। কিন্তু ভেতরে কখনও কিছু খুঁজে পান না। সেই জন্য বোলচি যে, এদের ভেতরে সব ফাঁক। নইলে বিশ কোটি লোকের বেদ বোলে, অমন যত্ন কোরে তুলে নিয়ে 'গবে কাজের বেলায় অমন তুচ্ছ তা চ্ছীল্য কোর্‌বে কেন? এক দিনও দেখলুম না যে, এদের কথা বিকুলো! অথচ গতি বিধি সাধ সম্মান—কিছুরই কসুর নাই। আমার মনে হয় যে এরা বড় বেহায়া লোক। নইলে পয়সা নেই, কড়ি নেই, শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই,—এসব দেখে শুনেও রোজ রোজ পরের আমোদ বাড়াবার জন্য সঙ্‌ সাজতে যাবে কেন? আমি হোলে ত কিছুতেই যেতম না। যেখানে আমার কথা চলে না, সে দিকে আমার পাও চলে না, এই আমার মত।

শিবপ্রসাদ নামে একটা মেড়ুয়া রাজাও এই মলাটের দলে আছে। এ একটা মানুষের মত মানুষ; সে দিন বোলে ফেল্লে যে, সিবিল সাহেবের দল খুব বেশি বেশি না থাকলে দেশ চোলবে না, দেশের অমঙ্গল হবে। কথা খুব পাকা। আপন মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল, সিবিল সাহেব না হোলে ছাতুখোরের সেলাম নেবে কে? কথা ঠিক, সিবিল সাহেব যখন নেই, তখন শিবপ্রসাদও নেই। সুতরাং,—

২। পদার্থ; ঘটনা ও রটনা।

বিদ্যাসাগর ছেলেদের শেখান যে, ইতস্তত যাহা দেখিতে পাও, তাহাই পদার্থ। সে কথা যদি ঠিক হোতো, তা হোলে বিপন চাচা অবধি ছাতুমারা মেড়ুয়া পর্য্যন্ত সবই-পদার্থ হোতো। কিন্তু আমি নাকি এ সব—"জলবিম্ব তদ্রূপ প্রায়" বিবেচনা করি, কখন আছে কখন নেই; তাই—এ সকলকে পদার্থও মনে করি না। আমার মতে এ সমস্তই অপদার্থ।

আসল পদার্থ হোচ্চে লাটমন্দিরে যা ঘটে, আর যা রটে; তারই কথা এখন কিছু বোলবো।

এক ঘটনা, ন-আইন উঠে গ্যাছে। কেন যে উঠে গেল, কিছুই বুঝতে পাল্লুম না; লাটমন্দিরের এক পাশে ভাল মানুষের মত বোসে থাকৃত, মুখে কথাটি ছিল না, কোন উৎপাত ছিল না, অথচ দশ জনে পেছনে লেগে, বেচারিকে বোকা বানিয়ে উঠিয়ে দিলে। কাজটা ভাল হয় নি। আপনি কি বলেন? আমোদের মধ্যে এইটুকু হোয়েচে যে ন-আইনের কথা নিয়ে লোকে যতীন্দ্র ঠাকুরকে যজমেনে ঠাকুর নাম দিয়েচে—কেননা, গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম ইস্তক তাঁর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াতেই ইনি উপস্থিত থেকে মন্ত্র বোলে যজিয়েছিলেন—কেউ কেউ বলে মজিয়েছিলেন।

আর এক ঘটনা, আসামের চা-বাগানে কুলি পাঠাবার আইন। এই আইন নিয়ে তুমুল কাণ্ড হোয়েছিল—দলাদলি পর্য্যন্ত হোয়েছিল, একটা কুলির দল, আর একটা চা-করের দল। দেশী লোক সমস্ত কুলির দলে, আর বিদেশী সব চাকরের দলে। চা-করেরা জিতেচে, কুলিরা হেরেচে। এখন কুলির দল বোল্‌চে এতো আইন নয়, এ মানুষধরা কল। আমি কুলিও না, চা-করও না, কাজেই আমি এর কিছু-তেই নেই।

আরও একটা ঘটনা, ফৌজদারি কার্য্যবিধি। এ সেই বিটসে গুণনিধিরই বিধি। কাজে কাজেই নামে বিধি হোলেও এতে অনেক অবিধি আছে, তা বলাই বাহুল্য। এই আইন জারি হবার সময়ে লাটমন্দিরে অনেকগুলো পদার্থের সিদ্ধান্ত হোয়েচে;—

(ক) লাট সাহেব আইন কানুনের কথা ভাব্‌বেন বলেন, কিন্তু ভেবে উঠতে পারেন না।

(খ) আগে আপীল কর্‌লে সাজা বাড়্‌তো, এখন আর বাড়্‌বে না। দলহ লোকের অভিপ্রায় হোলে হালের লাট সাহেব সাবেক লাট সাহেবের ব্যবস্থা রহিত করেন।

৩। উপকার,—কিন্তু কার?

এই যে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজ্য কেবল লাভ লোকসানের উপরেই নির্ভর করে, তা অন্য রাজে লোকে জানে না বটে, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই। গোড়ায় ব্যবসা কর্‌বারই জন্যে এখানে ইংরেজদের আসা। এখনও সেই ব্যবসার ভরসাতেই তাঁদের এত কষ্ট স্বীকার কোরে রাজ্যপরিচালন। তবে দোকানদারির দায়ে জমীদারি ঘুটলে পর যেমন সেরেস্তা আলাদা রাখতে হয়, ইংরেজেরাও সম্প্রতি সেই ভাবে কাজ চালাচ্ছেন। কতকগুলি ইংরেজ খাঁটি দোকান নিয়ে থাকে, আর কতকগুলি নায়েব, গোমস্তা—জজ মেজেষ্টর সেজে জমীদারি সেরেস্তার কাজ আঞ্জাম করেন। কিন্তু আসলে যে বেণে, সেই বেণে; জমীদারী সেরেস্তাতেও সেই খরিদ-বিক্রী, লাভ-লোক-

স্নান গণনা ভিন্ন অন্য কথা নাই। রাজকার্য্যে—অর্থাৎ ঐ জমীদারী সেরেস্তায় বছর বছর হিসাব নিকাশ করা হয়, আর পর বৎসরের আয়-ব্যয়েরও একটা ফর্দ্দ তৈয়ের হয়। এই হিসাব নিকাশ করা ফর্দ্দ তৈয়ের করাকে বজেট বলে; বজেট লাটমন্দিরেই হয়,—আমি সেই বজেটের কথাই বল্‌তে বোসেছি।

বছর বছর হয়, এবারও বজেট হোয়েছে। বছর বছর সেই আফিঙ বিক্রী, সেই ষ্ট্যাম্প বিক্রী, ইংরেজ আমলাদের মেহনৎ বিক্রী, বিচার বিক্রী, ধর্ম্ম বিক্রী—ইত্যাদি নানারকম জিনিস বিক্রী হোয়ে থাকে, এবারও হয়েছে। তবে বজেটে কেবল খোতে-নের ধরণে মোটামুটি টাকার অঙ্কগুলো ধরা হয় মাত্র, বিশেষ খোলসা কিছু থাকে না। যেমন, বিচার খরিদ করাতে রামা চাষার সর্ব্বস্ব গ্যাছে, রাজারাম রায়ের ঘরে এত টাকা দেনা প্রবেশ করেছে—এ রকম কোনও ব্যাওরা বজেটে পাওয়া যায় না। তা অন্য বছরও থাকে না, এবারও ছিল না। ফলে এ সব পুরাণো কথার হিসাবে বজেটের কথা না বল্লেও চল্‌ত। কিন্তু এবার নাকি একটু বিশেষ খবর আছে, তাই লিখ্‌তে হচ্ছে। আর সেই বিশেষ কথাগুলো লোকে বুঝ্‌তে পারবে বোলে এতটা ভূমিকাও কর্‌তে হলো।

বার হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, আমারও আসল কথা চেয়ে ভূমিকা বড়। তা করি কি? যা না বোল্লে নয়, তা না বোলেই বা থাকি কি কোরে?

নুনের কাটতি বাড়াবার জন্য নুনের দর কমিয়ে দেওয়া হোয়েছে। এতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দুই হবে। নুনের মহাজনেরা বড় জোচ্চোর, ব্যবসা করে, কিন্তু সরকার বাহাদুরকে ফাঁকি দেবার চেষ্টাটা বিলক্ষণ আছে—পুরো লাইসেন্সি দিতে কিছুতেই চায় না। এবার তেমনি জব্দ! সাবেক দরে গাদা গাদা নুন কিনে রেখেছিল, আর লাভ কোরে বড় মানুষ হবে ভেবেছিল। মুখে ছাই পড়েছে—নুনের দর কম হওয়াতে একেবারে গোল্লায় গ্যাছেন। কেমন দুষ্টের দমন হলো কি না?

শিষ্টের পালনও তেমনি। যে দশ টাকা রোজগার করে, কি যার বাপের দশ টাকা আছে, সময়ে অসময়ে চাঁদাটা আসটা দেয়—সেই ত শিষ্ট। তা স্বচ্ছন্দে এখন পোনে সাত পয়সার নুন সাড়ে পাঁচ পয়সায় পাবে। এরা এখন চার পা তুলে রাজাকে আশীর্ব্বাদ কোরবে, আর অনায়াসে নুনের পয়সা বাঁচিয়ে তাতে তেল কিনে হর্ত্তা কর্ত্তা-দের মন যোগাতে পারবে। তবেই দেখ, শিষ্টের পালনটাও হলো। লাভের অঙ্কেও দু পয়সা এলো।

আর, দিনে বাউরি, বিন্দে দুলে, হলা ক্যাওরা—এরা কি মানুষ, তাই এদের জন্যে মাথা ঘরাতে হবে? ব্যাটারা একদমে আধ পয়সার বেশী নুন কিনবে না, তা রাজার দোষ কি বলো? এরা নেহাৎ পাজি, এমন পাজি লোকের কথায় থাক্তেই নেই।

আর এক কাণ্ড হয়েছে, কাপড়ের মাশুল উঠে গ্যাছে। এখন দেশার কাপড়ের

আমদানি হবে, দেদার টাকার রপ্তানি হবে। তা হোলেই বাণিজ্য, আর বাণিজ্য হোলেই লক্ষ্মী! বোকা তাঁতির বিনাশ, বুদ্ধিমন্ত সদাগরের জন্য পাটের চাষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বোঝা গেল যে, ভারতের এবার উপকার। তবে লোকে বোঝে না, এই যা। তারা বলে কি—শুনলেও হাসি পায়—তারা বলে যে, বিলাতি কাপড়ে আমাদের তাঁতকুল গেল, আর বিলাতী মদে বোষ্টমদল গেল; এখন আমরা দুইয়ের বার। শোন একবার কথাটা!

শোন যে বাজেট, মূর্খ লোকে একেই বলে——বজ্জাত।

শোকশেল।

হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল। এত ভরসা এত আশা সমস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। আর আমরা কি লইয়া জীবনধারণ করিব? কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইব? দুঃখময় সংসারে একমাত্র প্রদীপ, দুস্তর সাগরে একমাত্র ভেলা, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র গৃহলক্ষ্মী—কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল? মুদ্রাশাসনী-ব্যবস্থা, ওরফে আদরের ধন, 'ন-আইন্' কোথায় গেল? হায়! আমাদের আর কিছুই নাই! (১। দীর্ঘ নিশ্বাস।)

আমরা দেশী লোক, দেশী ভাষায় দেশী কথা লিখিয়া আর কি করিব? আমরা লিখি, বাবুরা পড়েন না; আমরা পরামর্শ দি, বাবুরা কাণে তোলেন না; আমরা উত্তেজন করি, বাবুরা জল ঢালিয়া দেন; আমরা কত মিষ্ট কথা বলি, বাবুরা তুষ্ট হন না; আমরা গালাগালি দি, বাবুরা ভ্রূক্ষেপ করেন না; আমরা কাগজ পাঠাইয়া দি, বাবুরা দাম দেন না। আমাদের আদর নাই, মর্য্যাদা নাই, সম্ভ্রম নাই, ভয় নাই, মান নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, কিছুই নাই, কে আমাদের আদর করিবে? বাবুত করিতেন না, করিবেনও না। যাহা কিছু করিত, আমাদের সাধের 'ন-আইন'! দশদিক্ অন্ধকার করিয়া অতল সাগরের মধ্যস্থলে ডুবাইয়া দিয়া, গহন বনের মাঝে ফেলিয়া ন-আইন কোথায় গেল? হায়! কি পরিতাপ! এ বাদ কে সাধিল! পদ্মপলাশলোচন ন-আইন! তুমি কোথায় গেলে? শিশু আমরা, এ বিপদে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? (২। বক্ষে করাঘাত।)

রণরঙ্গিণী দিগম্বরী মহাকালীর পদানত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ভূতপতি, আশুতোষ ভোলানাথ একবার সদয়নেত্রে কটাক্ষপাত করিয়া আমাদিগকে লোক মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন; লাট লিটন আমাদের জন্য ন-আইন করিয়া আমাদিগকে পদস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন ত্রিভুবনে আমাদের বিজয়-দুন্দুভি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভয়কম্পিত হইয়াছিল, বাবুরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে চিনিয়াছিলেন। আমাদের সে গৌরব কে বিলুপ্ত করিল? আমাদের সে দিনের কে অস্ত করিয়া দিল? এ প্রাণ আর কেমন করিয়া রাখিব? ও হো! কি হইল? (৩। অশ্রুবর্ষণ।)

ন-আইনের বলে আমরা সাহেবের বজ্রহৃদয় কাঁপাইয়া দিয়াছিলাম। ন-আইনের কৃপায় আমরা জগৎজয়ী ইংরেজের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলাম। বিনা অস্ত্রে, বিনা শস্ত্রে, নির্ব্বান্ধব যে আমরা —আমরাও রাজ্যে বিদ্রোহ করাইতে, রাজবিপ্লব ঘটাইতে, লোকের চালে চালে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে, আমাদের চিরশত্রু বাবুগণেরও মাথা মুড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এত গুণের ন-আইন আমাদের কে হরিয়া নিল? (৪। দন্ত ঘর্ষণ।)

যে দিন হইতে আমাদের ন-আইনের ডঙ্কা বাজিয়াছিল, সেই দিন হইতেই আমরা কত উন্নতই হইয়াছিলাম! আমাদের উপর কত চক্ষুই পড়িয়াছিল। মাতৃভাষা যাহাদের পক্ষে কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তির জলস্বরূপ আতঙ্ক উৎপাদক, এমন কত কত বাবুও আমাদের নাম করিয়া, চীৎকারে গগন ফাটাইয়া বাগ্মীর যশোলাভ করিয়াছিল। যাহারা বাঙ্গলার ব জানে না, এমন কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাহেব, বর্ষে বর্ষে বত বিজ্ঞাপনাই আমাদের নামে লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছিল। মহামহামন্ত্রি-সম্প্রদায় গভীর রজনীতে গুপ্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের জন্য কত মন্ত্রণাই করিতেছিল। কিন্তু হায় অদ্য! অদ্য আমরা কোথায়? কাল আমরা বীর ছিলাম, সিংহের সমকক্ষ ছিলাম, আজ সেই আমরা কাপুরুষ, শৃগালেরও অধম! এখন কি আবার ভেকের পদাঘাত সহ্য করিতে হইবে! এখন কি আবার বাবুদের উত্তোলিত নাসার তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে? এখন কি আবার সেই অরণ্যে রোদন আরম্ভ করিতে হইবে? হায়! অদৃষ্টে কি এই ছিল? ন-আইন! তুমি কি ছলিবার জন্য, আমাদিগকে এমনি তুলিয়া আবার ফেলিবার জন্যই আসিয়াছিলে? আদরের উৎস ন-আইন! কে তোমার চাঁদমুখে পাথর চাপাইয়া দিল? হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! অহো, কি অধঃপাত! (৫। বক্ষে বটীর আঘাত, পতন ও মূর্চ্ছা)

———

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা।

ইতিমধ্যে বাখরগঞ্জের জজ কম্পবেল সাহেবের বাসার সরহদ্দে জনৈক ব্রাহ্মণ কনষ্টেবল পাইখানাকৃত্য সমাধা করাতে, জজ কম্পবেল উক্ত ব্রাহ্মণের স্বহস্তে তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লন। বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট তজ্জন্য জজ সাহেবের শাস্তির জন্য তাহাকে অপদস্থ অর্থাৎ জজ হইতে জাণ্ট মেজেষ্টর করিয়া দিয়াছেন।

অপর, জঙ্গীপুরের মহকুমাতে গোরু ছিনাইয়া লইবার মোকদ্দমায় ডিপুটী মেজেষ্টর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর উপযুক্ত সাজা না দেওয়াতে অর্থাৎ আসামীকে কয়েদ না করিয়া জরিমানা করাতে মুর্শিদাবাদের খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব ডিপুটী মেজেষ্টর বাহাদুরের ভ্রম দেখাইয়া এক খণ্ড হাফ সরকারি পত্র তাঁহার বরাবর লেখেন। পুনশ্চ, ক্ষতিগ্রস্ত নীলকর সাহেব পুনর্ব্বার গোরু ছিনাইয়া লওয়ার অপরাধে সাবেক বকেয়া আসামী এক্তার মণ্ডলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার নালিশ করায় ডিপুটী বাবু নিজ রায়ে খোদ মেজেষ্টরের সেই চিঠির উল্লেখ করিয়া এক্তার মণ্ডল আসামীকে বিলক্ষণ মেয়াদ ঠুকিয়া দেন; তাদৃশ কঠিন সাজা দিতে আইন মতে ডিপুটী বাবুর এক্তার না থাকা গতিকে উক্ত এক্তার মণ্ডল জেলার জজ-আদালতে আপীল দায়ের করে। খোদ মেজেষ্টর কায়িক দণ্ড দিবার উপদেশ দিয়া যে পত্র লেখেন, তাহা ডিপুটী রায়-বাহাদুরের রায়ে প্রকাশ থাকাতে জেলার জজ ঐ খোদ মেজেষ্টর সাহেবকে বলেন যে, এ প্রকার পত্র লিখিলে ভবিষ্যতে মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের খারাবি হইতে পারে। খোদ মেজেষ্টর ইহাতে রাগত হইয়া জঙ্গীপুরে শুভাগমন ও ডিপুটী বাবুকে তলব করিয়া স্পষ্টাক্ষরে মুখের উপর বলিয়া দেন যে, তাঁহার পত্রের কথা রায়ের ভিতর প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে ডিপুটীর বোকামি অথবা সাফ বজ্জাতি জানা যাইতেছে। তাহাতে ডিপুটী রায়বাহাদুর অপমান জ্ঞান করিয়া কমিশনর সাহেবের হুজুরে মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করাতে কমিশনর সাহেব তজ্জন্য ডিপুটীর বেতন কমাইয়া দিয়া অপদস্থ করণ জন্য বাঙ্গালার ক্ষুদ্র লাট সাহেবের সদনে সুপারিশ করেন। ক্ষুদ্র লাট ডিপুটী বাহা-দুরকে মহকুমায় থাকিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দিয়াছেন। এবং বজ্জাতি শব্দের অর্থ বজ্জাতি মাত্র তদতিরিক্ত কিছু নহে, এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত মৌশলি সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, অতুল বাবুকে সেই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয়।

বাঙ্গালার লাট সাহেবের এই দুই বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য পঞ্চানন্দসমীপে পেশ হইয়াছে।

প্রথমতঃ কম্পাবেল সাহেবের অধোগতি দর্শনে পঞ্চানন্দ দুঃখিত হইয়াছেন। সাহেব হইতেছেন রাজকুল, সে কুলে কালি দেওয়াতে লাট সাহেবেরই অবিবেচনা

প্রকাশ পাইতেছে। যে ব্যক্তি আত্মকলঙ্ক গোপন করিতে জানে না, সে লোকের হস্তে লাটগিরি রাখা উচিত কি না, পঞ্চানন্দ তাহার বিবেচনা পশ্চাৎ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীদের মনে এ প্রকার ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, কনষ্টেবলের দরখাস্তেই বুঝি জজ সাহেবের চাকরি গেল। অথচ এরূপ ধারণা জন্মিয়া গেলে, এবং প্রকৃত পক্ষে কনষ্টেবলের কথায় জজ সাহেব হেন ব্যক্তিকে অপদস্থ হইতে হইলে, ইহার পর রাজকার্য্যে সাহেব লোক পাওয়াই দুঃসাধ্য হইবে। এদিকে সাহেব লোক যদি বিরক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আর চাকরী স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বঙ্গাধিকার বৃথা, সমুদ্র লঙ্ঘন বৃথা আর মিথ্যা-কথাতে দশানন-রূপী বঙ্গবাসীর পুরী ছারখার করা ও বৃথা।

সুতরাং হয় লাট সাহেব কম্পবেলের জজিয়তি কম্পবেলকে পুনঃপ্রদান করুন; নতুবা, যদি অভ্যন্তরের কোন গূঢ় কথা থাকে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া অজ্ঞানী বঙ্গবাসীর ভ্রম দূর করুন।

মৌশলির অতুল-কীর্ত্তি সম্বন্ধে লাটের বিচার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও পূর্ব্ববৎ মন্দ হয় নাই। লাটবুদ্ধির উন্নতি দেখিয়া পঞ্চানন্দের আশ্বাস হইয়াছে।

অত্যাচার কাহাকে বলে, অতুল বাবু তাহা জানেন না। নচেৎ গোরু ছিনাইয়া লওয়ার মোকদ্দমাতে তাদৃশ অল্প দণ্ড দিতেন না। ইহাতে জানা যায় যে, অতুল বাবুর দলের চাষ নাই।

আইনে সাজার চূড়ান্ত সীমা লিখিয়া দেয়, অপরাধ বুঝিয়া অপরাধীর সেই দণ্ডের তারতম্য করাই হাকিমের কর্ম্ম। অতুল বাবুর প্রতি দয়া করিয়া কোন্ মোকদ্দমায় কি আন্দাজ সাজা দেওয়া উচিত, মৌশলি সাহেব ইহা দেখাইয়া দেওয়াতে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ, হাকিম হইয়া যে বুদ্ধিটুকু খাটাইতে হয়, অতুল বাবুর আর তাহা খাটাইতে হইত না, অথচ পুরা মাহিয়ানাটা বাক্সগত হইতে পারিত। এ সামান্য কথা অতুল বাবু বোঝেন নাই, সুতরাং খোদ মেজেষ্টর মৌশলি সাহেব যে তাঁহাকে স্বয়ং নিজ মুখে বোকা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় নহে। বোকাকে বোকা জানিয়াও, যদি বোকা বলিতে না পাইব, তবে কি বলিব? মৌশলি সাহেব যে, স্পষ্ট-বাদী, সরলভাষী, সত্যপ্রিয়, ইহা লাট সাহেব বুঝিতে পারেন নাই।

লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, বজ্জাত শব্দটা কিছু রূঢ়, সুতরাং মৌশলি সাহেবের এমন শব্দ প্রয়োগ না করাই উচিত ছিল। মৌশলি সাহেব দেখাইয়াছেন যে, এই শব্দের চলিত অর্থ তত মন্দ নহে। বঙ্গভাষায় যাহার এ প্রকার গাঢ় জ্ঞান, অবসর বুঝিয়া যিনি শ্লেষ করিতে জানেন, তাঁহাকে ভাষাজ্ঞানের জন্য পুরস্কার না দিয়া তিরস্কার করা যে, কাঁহাতক অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন একজন সাহেব যে, বঙ্গভাষায় গালি দিয়াছেন, ইহাতে ভাষার গৌরব, সাহিত্যের সম্মান, এবং

অতুল বাবুর সৌভাগ্য মনে করা উচিত। যে অতুল বাবু বাঙ্গালী হইয়াও এ কথা বুঝেন নাই, তাঁহাকে বাঙ্গলাদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দিভাষী পূর্ণিয়া জেলাতে বদলি করিয়া দেওয়া সৎপরামর্শের কাজ হইয়াছে।

প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে লাট সাহেবকে এই পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়াই পঞ্চানন্দ অদ্য পুঁথিতে ডোর বাঁধিলেন।

বিদেশের সংবাদ।

(১)

বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলি ওরফে আর্ল্‌ বিকন্সফীল্ড নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ইহুদি, ব্যবসায়ে পুস্তকলেখক ছিলেন। আর মধ্যে বারেক দুইবার তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ইংলণ্ডে মন্ত্রী হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সকলেরই মন্ত্রী হইবার অধিকার আছে। এই লোকটার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া অনেকে বিস্তর কাগজ কালি নষ্ট করিয়াছে, আর যাহার মনে যে কথার উদয় হইয়াছে, তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে, বেঞ্জামিনের জন্য বঙ্গবাসীর মাথা-ব্যথা, অন্যায় কথা। এ দেশে অনেক গ্রন্থকার আছেন; কিন্তু বঙ্গবাসী সারগ্রাহী, সুবিবেচক এবং প্রতারিত হইবার পাত্র নহে, সেই জন্য সে সকল গ্রন্থ বড় একটা বিকায় না; ইংলণ্ডের লোক বোকা, তাই ডিজ্‌রেলির পুস্তকের এত পসার।

আর, ইহুদি হইয়াও ডিজরেলি মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া যে, গৌরব বর্ত্তিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। ডিজরেলি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছিল; তা এ দেশেও অনেকে জাতি দিয়া মেমের সঙ্গে নাচিতে পাইয়াছেন। সুতরাং ইহাতে প্রশংসার কিছুই নাই।

টের পাইতেন, ডিজরেলি যদি এদেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন! পুঁথির খশড়া বগলে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার রোজ জোটা ভার হইত। সই সুপারিশের জোর থাকিলে বেঞ্জুমিয়া বড়-জোর একটা ডিপুটিগিরি পাইতেন। (মনে থাকে যেন, তাঁহার বি-এল্‌ পাশ ছিল না, মফঃস্বলে তিন বৎসর মোক্তারের খোশামোদও করেন নাই, সুতরাং মুনসুফি পাইবার কোন আশাই ছিল না।)

তাহার উপর সেলামের কেতা দোরস্ত থাকিলে, আর সাহেবদের বাড়ী বাড়ী দুবেলা ঘুরিয়া সত্য মিথ্যা দশটা বলিবার ক্ষমতা থাকিলে, বেঞ্জু চাচা হদ্দ খাঁ-বাহাদুর

হইতে পারিতেন। বাস্তবিক এদেশে কাহারও চালাকি খাটে না, ইংলণ্ড বোকার জায়গা, সেখানে সবই হইতে পারে। তবে কি ডিজরেলিব কথা লইয়া বাড়াবাড়ি কাড়াকাড়ি করা এদেশে ভাল দেখায়?

(২)

আরও একটা লোক ইউরোপে মারা গিয়াছে,—রুষিয়ার জার। এ মৃত্যুর বিচার কঠিন সমস্যা। রুষিয়ার-সন্তানগণের ভয়ানক আক্রোশ, তাহারা জার রাখিবে না। প্রজার মনোরঞ্জন করে, এমন ভূস্বামী তাহারা চায়। এভাবে দেখিতে গেলে প্রজাদের দোস মনে হয় না। বাস্তবিক, চক্ষের উপর এ অত্যাচার সহিবে কেন? আর লোকের যদি অসহ্য হয়, তবে জারই বা কতক্ষণ থাকিতে পারে?

আর এক পক্ষে মনে হয় প্রজারা মিলিয়া মিশিয়া, সহিয়া বহিয়া থাকে না কেন? বঙ্গদেশের প্রজা কেমন ভাল মানুষ। ক্ষুদ্র জমাদারকেও ভূস্বামী নাম দিয়া কত আদর, কত ভক্তি, কত যত্ন, কত সম্মান করে। অথচ সকলেই জানে যে, ইহারা জারেরও অধম। অদ্য সূর্য্যাস্তে আবাহন, কল্যকার সূর্য্যাস্তে বিসর্জ্জন। তবে কি জানো, এখানে ধরণী সর্ব্বংসহা।

ভালো হউক, মন্দ হউক, এ কথাতেও বঙ্গবাসীর, ভারতবাসীর না থাকাই উচিত, এ দেশেরও ভাবনা ভাবিবারও কোনও হেতু নাই; যেহেতু আমাদের মালিক—মহারাণী ভারতেশ্বরী!

রয়টার প্রেরিত তারের খবর।

বিলাত,

আষাঢ় মাস, অপরাহ্ণ।

মেস্তর লালমোহন ঘোষ ভারতবর্ষে যাইবার উদ্দেশে জাহাজের তক্তার উপর পা দিয়াছেন।

তাঁহার সহিত লাট রিপণের বরাবর এই মর্ম্মের এক চিঠি গ্লাডষ্টোন সাহেব পাঠাইয়াছেন,—

"বাবাজীবনের প্রমুখাৎ সকল সমাচার অবগত হইবা। তেঁহ বোম্বাই মোকামে পদার্পণ করিবার অগ্রেই পত্রপাঠ মাত্র, ছাপার আইন, অস্ত্রের আইন, দণ্ডের আইন এবং যাবদীয় টেক্স উঠাইয়া দিবা। ভারবর্ষে আমাদের তরফ যে সকল আমলা ও নগদী পাইক ইত্যাদি থাকিবে, তাহাদের বাসাখরচ ও অন্য অন্য খরচ বরদারির টাকা এথা হইতে পাঠান যাইবেক। নহিলে লিবারেল অর্থাৎ বদান্য নামে কলঙ্ক হইবেক।

"তোমাকে চাকরি দেওয়াতে ভারি বিভ্রাট উপস্থিত। বাবাজীবন যদি সম্মত হয়েন, ইঁহার হস্তে আদায়-তহশীলের কাগজ-পত্র এবং তহবিল সমঝাইয়া দিয়া তুমি ফেরত জাহাজে বাটী রওয়ানা হইবা। নিতান্তই যদি বাবাজীবনের অমত হয়, তাহা হইলে নবাব আবদুল মিয়াকে ভার দিতে পারিবা। উঁহ বড় লায়েক আদমি এবং আমাদের নিতান্ত অনুগত।

"আসিবার কালীন এথাকার মিউজিয়মে রাখিবার জন্য মহারাজা, রাজা, নবাব, রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর প্রভৃতি আমাদের সৃষ্টির এক এক নমুনা, এবং ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান, ও ইণ্ডিয়ান সভার এক এক সভ্য সঙ্গে আনিবা। জীয়ন্ত না পাওয়া যায়, মরা আনিলেও চলিতে পারিবে।

"নাস্তিক ব্রাডলা পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করায়, তাহার বিলক্ষণ নাকাল হইতেছে—এ কথা বুঝাইয়া দিয়া মিররকে সান্ত্বনা দিবা এবং চিন্তা করিতে নিষেধ করিবা ও ব্রাহ্মমতে গোবরের শিবপূজা করিতে উপদেশ দিবা।"

"পঞ্চানন্দ" পাঠ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাণী বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। বাঙ্গালা পরীক্ষা দিয়া হাজার টাকা পুরস্কার-প্রাপ্ত-হওয়া জনৈক ইংরেজ ঐ কর্ম্মের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। নাম টের পাওয়া যায় নাই।

চীনের সহিত রুষিয়ার যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে চীনের সাহায্য জন্য যুদ্ধের অর্দ্ধেক ব্যয় ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে দিবার প্রস্তাব হইতেছে। ফসেট ইহাতে আপত্তি করিবেন।

দেশহিতৈষিতার ইতিহাস।

(প্রাপ্ত পত্র।)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীপদপল্লবাশ্রয়েষু।

দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চেতৎ—

আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, আপনার শ্রীচরণে শরণ লইতেছি, উচিত আদেশ করিয়া এ দাসকে এ মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে আজ্ঞা হয়। আমি একজন পল্লীগ্রামবাসী ক্ষুদ্র জমীদার। আগে আগে খাইয়া পরিয়া দুদশ টাকা আমার উদ্বৃত্ত হইত। সেই জন্য সামান্য লোককে কর্জ্জটা আস্‌টা কখনও কখনও দেওয়া হইত। সরকার বাহাদুরকে যথাসময়ে রাজস্ব দিই; আলি পথে পাল্কীযোগে এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম যাই বলিয়া পথকর দিই; কি জন্য বলিতে পারি না, কিন্তু আরও একটা

কর দিই, লাইসেন দিই, বেয়ারিং চিঠির মাশুল আর নগদ টিকিটের দাম ছাড়া ডাক-ফণ্ড দিই; আর সরকার হইতে যখন যে কাগজপত্র তলব হয়, তাহাও দিই! এই সকল বিষয়ে আমি কখনও ত্রুটি গাফিলি কিম্বা আপত্তি করি নাই।

বিষয়রক্ষা করিতে হইলে কালেভদ্রে মামলাটা মোকদ্দমাটা করিতে হয়। যে মোকদ্দমায় আমার পরাজয় হয়, তাহাতে ঘর হইতে কিছু যাইবারই কথা। কিন্তু যে মোকদ্দমায় জয়লাভ করি, তাহাতেও আসল গণ্ডা কখনই পোষাইল না। উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, আমলা সকলেই যথাশাস্ত্র আপন আপন অংশ লইতে লইতে, আমার ভাগ্যে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

সরকার বাহাদুরের খাজনা যথাসময়ে দাখিল করিতে পাই বলিয়া সে অনুগ্রহের দক্ষিণা দিয়া থাকি। পুলীশের এলাকায় বাস করি বলিয়া নিত্য পূজার উপর সময়ে সময়ে মানসিক দিয়া থাকি।

হাকিম হুকুম সাহেব সুবা গেদ্দিয়ারিতে এ অঞ্চলে আসিলে খাসীটা মুর্গীটা শাকটা ফলটা ভক্তিপূর্ব্বক যোগাইয়া থাকি। হুজুরী কোনও সর্দ্দার লোকের প্রয়োজন হইলে, ধার করিয়া হাতী ঘোড়া পর্য্যন্ত সরবরাহ করি।

আমার সৌভাগ্যফলেই যে এ সকল করিতে পাই, তাহা আমি জানি এবং শত-সহস্র বার স্বীকার করি। স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, খোদ জজ মেজেষ্টর পর্য্যন্ত দায়ে অদায়ে আমাকে স্মরণ করিয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে আমার ন্যায় দীনহীন অকিঞ্চনকে স্মরণ করেন, সেইজন্য হাসপাতালের টেক্স, ইস্কুলের টেক্স, অলিঙ্গ কলিঙ্গের কাঙ্গালীবিদায়ের টেক্স, ভোজ-সমারোহের টেক্স—যখন যাহা তলব হয়, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর গহনাপত্র বাঁধা দিয়াও হুকুম তামিল করিয়া থাকি। অধিক কি বলিব, এই খয়েরখাঁহীতে আমার ঘরে কিঞ্চিৎ দেনা প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি দেবকৃত্য পিতৃকৃত্য কমসম করিয়া দিয়া এক প্রকার চালাইয়া আসিতেছিলাম।

এখন উপস্থিত বিপদ্ এই যে, অদ্য এক ইংরেজী পরোয়ানা হুজুর লোক হইতে আগত হইয়াছে। গ্রামের মাষ্টের মহাশয় তাহা পড়িয়া বলিতেছেন যে, দেশহিতৈষিতার তহবিলে টাকা জমা দিবার হুকুম আমার প্রতি হইয়াছে। মাষ্টের মহাশয় বলিতেছেন যে, এইবার আমি হুজুর হইতে বাহাদুরি পাইলেও পাইতে পারি।

এখন উপায় কি? দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা আমার কোনও কর্ম্মচারী কিম্বা গ্রামবাসী লোক, কিম্বা পঞ্চক্রোশের মধ্যে কোনও লোক, আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে, লড়াই করিতে মানুষ কাটা পড়িয়াছে, সেইজন্য টাকা দিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মারামারি করিতে গেলেই খুন জখম হইয়া থাকে। সেজন্য আমাকে কেন টাকা দিতে হইবে? সুতরাং এ কথাটা নিতান্ত অলীক বলিয়াই বোধ হইতেছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, দেশহিতৈষিতার যদি

একটা তহবিল থাকে, তবে আমাকে সে তহবিলে জমা দিতে হইবে কেন? যাহার তহবিল, সে বুঝিয়া সুঝিয়া তাহার জমাখরচ নিকাশ নিষ্পত্তি করিবে; আমি তাহাতে জমা দিতে যাইব কেন? আর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, আমার মোটে টাকা নাই, তাহার জমা দিব কি? ধার করিয়া জমা দেওয়াতে ক্ষতি বৈ লাভ নাই। সুতরাং সরকার বাহাদুরের এমত অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। সেইজন্য মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা যে, ইহার আসল ব্যাপারটা আমাকে জানাইবেন, আমি শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া থাকিব।

মাষ্টের মহাশয় যে বাহাদুরির কথা বলেন, তাহারই বা ভাবখানা কি? ঘরে না থাকিলেও দিতে পারাতে বাহাদুরি হইতে পারে, কিন্তু সে বাহাদুরি লইয়া কাজ কি? সরকার বাহাদুর এমন বাহাদুরি দিবেন কেন? তবে যদি হুকুম এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আপনি তাহাও জানাইলে আমার পরম উপকার হয়। তাহা হইলে নাকি, গাই না থাকিলেও বলদ দুইয়া দুধ দেওয়া এবং বাহাদুরি লওয়া আবশ্যক।

আমি ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছি না। যদি টাকা জমা দিতেই হয়, তবে ফেরত পাওয় যাইবে কিনা, এবং কত দিনে কি নিয়মে ফেরত পাওয়া যাইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা। ফেরত পাওয়া যদি না যায়, তাহা হইলে কিস্তিবন্দী করিয়া টাকা দেওয়া চলে কি না, অথবা বেবাক টাকার তমঃসুক লিখিয়া দিলে সদা নিস্তার পাওয়া যাইবেক কি না, তাহাও জানিতে চাহি।

আপনি নাকি সদর জায়গায় থাকেন, আর সকল মুলুকের আসল খবর রাখেন, এইরূপ শুনা আছে, সেই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক

শ্রীএককড়ি রায় দাসস্য।

পুঃ নিবেদন,

এই সকল কথার উত্তর পাইলে, আপনি যদি আমার জেলার মোক্তারিপদ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সালিয়ানা আড়াই টাকা বেতনে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি, ইতি।

[পাঁচ টাকা হউক ভালো, না হউক ভালো, পঞ্চানন্দ এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতে অসমর্থ। যে স্থলে, "দিলে প্রাণ যায়, না দিলে মান যায়" সে স্থলে বোধ হয় কেহই কিছু বলিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষতঃ, রাজা প্রজার কথা, পঞ্চানন্দ ইহাতে একেবারে নীরব। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার কারণ বোঝা যাইবে।

প্রজার "আশা" বলিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়; আবার রাজা রাজড়ার সেই "আশা"

বলিলেই "সোটা" মনে পড়িয়া রক্ত শুখাইয়া যায়। যাঁহারা রাজা প্রজার অভিধান উত্তমরূপ জানেন, তাঁহারাই রায়জীর সমস্যা পূরণ করিবেন।

পঞ্চানন্দ।]

অবিদ্যা ও বিদ্যা।

(জীর্ণোদ্ধার)

দোতলার উপর সবে একটি ঘর, আর সেইটিই ঘরের মতন। নীচেকার ঘর বড় স্যাঁৎ সেঁতে, হাওয়া নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সেকেলে হাড়ে সব সয় বলিয়া বাঞ্ছারামের বুড়ী মা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেপুলেগুলি লইয়া দরমার উপর মাদুর পাতিয়া সেই ঘরে শোন, বসেন। উপরে থাকেন বৌমা—বাঞ্ছারামের সাত রাজার ধন, পাড়ার চক্ষুঃশূল, শাশুড়ীর বিড়ম্বনা, উত্তোলিনী সভার গৌরব।

বাঞ্ছারাম শালকের পাটের কলে—চাকরি করেন। কি চাকরি কেহই জানে না; —তবে কলের সাহেব বাঞ্ছারামকে "বাবু" বলিয়া ডাকে, আর দুই হাত দুই পায়ে মানুষ যা করিতে পারে, বাঞ্ছারাম সেই কর্ম্ম করে। বাঞ্ছারামের মাইনে কুড়ি টাকা! তবু সেই দোতলার ঘরে একখানি কেদারা, একটা ছোট মেজ, একখানি মাঝারি ঝাড়ার আর্শী, দোয়াত, কলম কাগজ। সেই কেদারার উপর দিন রাত্রি বিরাজ করেন—বৌ মা!

আজি সকালে-সকালে বাঞ্ছারামের কলে যাইবার বরাত, সাহেব কড়াকড় করিয়া বলিয়া দিয়াছে। ভোরে উঠিয়া গামছা-হাতে বাঞ্ছারাম বাজার করিয়া আনিয়াছে, বুড়ীও তাড়াতাড়ি ভাত ব্যঞ্জন রাঁধিয়া প্রস্তুত। ছেলেগুলা টাঁটা করিতেছে। বৌমা নামিয়া আসিয়া আহার করিয়া গেলেই ছেলেরা খাইতে পায়, বাঞ্ছারামের কলে যাওয়া হয়।

বৌমার বিলম্ব দেখিয়া বুড়ী সাহসে ভর করিয়া, তাহাকে খবর দিতে গেল। বৌমার চক্ষু পৃথিবীতে নাই, শূন্যে—বৌমার সম্মুখে মেজের উপর কাগজ। বৌমার ডানি হাতে কলম। বৌমার বাঁহাত ঝাঁপটার এক গোছা আলগা চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বুড়ী ডাকিল—"বৌ মা!" বৌ-মা সংসারে নাই, সাড়া দিলেন না!

বুড়ী আবার ডাকিল—"বৌ-মা!"

বৌমার চটক ভাঙ্গিল। বৌমা মৃদু-মন্দ স্বরে শান্তভাবে, বুড়ীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আহা! মূর্খতা কি ভয়ঙ্কর দোষের আকর। শ্বশ্রূঠাকুরাণি

পুস্তকে আছে আপনি পূজনীয়া! কিন্তু আপনি আমার যে উচ্চভাবে ব্যাঘাত দিলেন, যে কবিদুর্লভ কল্পনার ধ্বংস করিলেন, তাহাতে আপনি আমার সহিষ্ণুতার সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন এমত নহে, প্রত্যুত সে সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।”

বুড়ী ভয়ে কাঁপিতেছিল; থতমত খাইয়া বলিল—“তা নয় মা, বাঞ্ছা, সকালে-সকালে যাবে, সেই জন্য—”

বৌমা আর সহিতে পারিলেন না;—“তবে দেখিতেছি অদৃষ্ট মানিতেই হইল। হায়! বঙ্গভূমে যদি রমণী-কুলরবি হইয়াও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিচালন করিতে না পাইব, তবে অদৃষ্টের আধিপত্য স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর কৈ? শ্বশ্রূঠাকুরাণি! আপনি আপনার মূর্খ পুত্রকে মৎসমীপে একবার প্রেরণ করুন; তাহার অকিঞ্চিৎকর সামান্য অর্থোপার্জ্জনে এবং আমার আশ্রয়ীভূতা কবিত দেবীর আরাধনায় কি প্রভেদ, একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।”

বুড়ী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কোন দিনই বৌমার কথা বুঝিতে পারিত না। নীচে গিয়া বাঞ্ছারামকে পাঠাইয়া দিল।

বাঞ্ছারাম আসিল, কিন্তু মুখে কথা নাই। এক দিকে সাহেব—অন্নদাতা, এদিকে পরিবার—ভয়ত্রাতা; দুই পিতৃ-তুল্য, কথাটি না কহিয়া ইহাই ভাবিতেছিল।

বৌমা বক্তৃতা জুড়িলেন। বাঞ্ছারামের নিশ্বাস ফেলিবার সময় হইল। বক্তৃতা শেষ হইলে বাঞ্ছারাম বলিল—“সময়ে না আহার করিলে শরীর থাকিবে কেন? শেষে কি সব দিক্ নষ্ট করিবে?”

স্বাস্থ্যরক্ষা খুলিয়া বৌমা দেখিলেন, বাঞ্ছারামের কথা যথার্থ। বাঞ্ছারামের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—“বড় বাধিত হইলাম!”

বৌমার আহার হইল, বাঞ্ছারামেরও চাকরি বজায় রহিল।

১। সুরুচির কথা।

নিস্তারিণী বিধবা। কিন্তু লোকে বলাবলি করে যে, তাহার চরিত্রটা বিধবার মতন নয়। নিস্তারিণীর একজন আত্মীয় লোক গ্রামান্তর হইতে তাহার তত্ত্ব করিতে আসিয়া কএক দিন ধরিয়া তাহার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিস্তারিণীর ইহাতে একটু অসুখ হইতেছিল। আত্মীয়কে যাইতেও বলিতে পারে না, অথচ তিনি থাকাতে নিস্তারিণীর বিষম উৎপাত মনে হইতেছিল। এক দিন সেই আত্মীয় ব্যক্তি নিস্তারিণীর নিকট একটু চুণ চাহিয়া পাঠাইলেন। নিস্তারিণীও মনের দুঃখ প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল;—“চুণ! আমার কাছে চুণ? কেন আমি কি পান খাই? তাই আমার কাছে চুণ থাকিবে? আমি বিধবা মানুষ, চুণ

রাখি, পান খাই, তবে আর না করি কি? আত্মীয় লোকের এই কথা! আপন হইয়া এই কলঙ্ক রটনা! অপরে তবে না বলিবে কেন? চরিত্রেই যদি গোঁটা হইল, তবে বাকী রহিল কি? হায়! হায়! কুনাম রটনা হইতে কুকাজ ঘটনা যে ভালো!" ইত্যাদি।

নিস্তারিণীর আত্মীয় বুঝিলেন; বুঝিয়া সেই দিনই প্রস্থান করিলেন। গ্রামের দুই চারি জন লোক, যাহারা নিস্তারিণীকে বিশেষ আদর যত্ন করিত, নিস্তারিণীর চরিত্রের গুণবাদ করিত, একস্বরে বলিতে লাগিল—"আত্মীয় হইলে কি হয়! ভদ্র লোক হইলে কি হয়! কথাটা ভদ্র লোকের মতন হয় নাই। যাহাই হউক, আত্মীয়ের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না, তবে তাঁহার রুচি এবং শিক্ষার বিলক্ষণ দোষ আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিধবা স্ত্রী লোকের নিকট চুণ চাওয়াটা নিতান্ত বিকৃত রুচির কার্য্য।"

পঞ্চানন্দের "শনিবারের পালা" নামক মহাপদ্য পড়িয়া কেহ কেহ সুরুচি সুনীতির কথা তুলিয়াছেন। ইঁহারা নিস্তারিণীর দলের লোক না হইলেও, ইঁহাদের আপত্তিটা যেন নিস্তারিণীর অঙ্গের বলিয়াই মনে হয়। তমালের পাতা কালো, যমুনার জল কালো, মাথার চুল কালো, কোকিল কালো, ভ্রমর কালো, মেঘ কালো—সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কালো দেখিলেই,—কালাচাঁদ কৃষ্ণকে মনে করিয়া কাজ কি? যদি বা মনে পড়িল, সে দোষ মনের বা কালোর? ফলে যাহারই দোষ হউক, পঞ্চানন্দের দোষ কখনই নহে।

যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, পঞ্চানন্দ দুঃখিত হইবার পাত্র নহেন; বরং বক্তারা যে বাঙ্গালা সাহিত্যে অবহেলা না করিয়া, উহারই মধ্যে বাছাই বাছাই গ্র[ন্থ] পাঠ করেন এবং চুনা চুনা প্রসঙ্গ কণ্ঠস্থ অভ্যাস করিয়া রাখেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ করিতে পঞ্চানন্দ মুক্তকণ্ঠ! কে বলে বাঙ্গালা ভাষার মা বাপ নাই? কে বলে বাঙ্গালা সাহিত্যের আশা ভরসা নাই? লেখার মত লেখা হইলে, আর বাগা[ই]য়া যোগাইয়া লিখিতে পারিলে, সকলই আছে।

ফলতঃ, সুরুচির বিষয়ে যেমনই হউক "শনিবারের পালা"য় কাহারও অরুচি দেখা যায় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? পঞ্চানন্দ এত দিনে পূজক চিনিতে পারিলেন; ভক্তের পরিচয় পাইলেন।

২। সুনীতির কথা

কতকগুলি কথা আছে, যাহা পরিহাসের অতীত, কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা উপহাসের আয়ত্ত হইবার নহে, আর কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা লইয়া রসিকতা চলে না, রসিকতা করিতে চেষ্টা করা অন্যায় এবং চেষ্টা করিলে রসিকতা ফলে না। এ তত্ত্ব সকলেই জানেন, পঞ্চানন্দও মানেন। শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা বা ব্যবহারের দ্বারা যে ব্যক্তি এ তত্ত্বের বিপর্য্যয় করে, সে সুনীতির বিরোধী, সুতরাং বনবাসের যোগ্য। আইস ভাই, বিশদ করিয়া উদাহরণ দিয়া এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করা যাউক।

মনে করো, একটা লোক অন্য কোনও দিকে সুবিধা না পাইয়া ধর্ম্মানুসরণ দ্বারা বড়লোক হইবার চেষ্টা করিতেছে। উচ্চাভিলাষ গর্হিত বস্তু নহে। সেই উচ্চাভিলাষ সাধনের পন্থা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে ধরা বাঁধা প্রশংসার কাজ। ধর্ম্ম ঘরেও হয়, বাহিরেও হয়; অরণ্যেও হয়, লোকালয়েও হয়; চুপি চুপি করাও চলে, সোর হাঙ্গামা করিয়াও চলে। এমত অবস্থায় যদি কোনও ব্যক্তি নিশান তুলিয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া, সঙ সাজিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে; অথচ যৎসামান্য কালের নিমিত্ত লোকের কাজ নষ্ট করা ভিন্ন অন্য অপকার না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে কখনই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। আবার, ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই ধর্ম্মের বিচার করিতে হয়। বিচার করিতে হইলেই, প্রচারের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতে হয়; কেবল মুখে যদি নিন্দাবাদ করিয়া কাজে সেইরূপ নিন্দিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ বা অনুকরণ করা যায়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? এইরূপ পাঁচটা আয়োজন করিয়া পাঁচ রকমে ইষ্টসিদ্ধি করিবার যত্ন করা অসঙ্গত নহে এবং এরূপ সঙ্গত ব্যবহারকে যে পরিহাস করে, সে সুনীতির বিরোধী। এরূপ ব্যাপার যে কোথাও হইতেছে, তাহা নহে। তবে দৃষ্টান্ত নাকি কল্পিত বস্তু লইয়াও দেওয়া যাইতে পারে, সেই হেতু উপরিলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত হইল।

আবার দেখো, সকলেই কিছু ধনবান্ নহে, সকলেই সুখী নহে। সেইজন্য, "ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা"র একটা প্রবাদ চলিত আছে। মনে করা যাউক, কল্পনার বলে সবই মনে করা চলে—ভারতবর্ষ রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত ম্রিয়মাণ, দরিদ্র, অসঙ্গতিপন্ন এবং কাতর। কিন্তু তাই বলিয়া একটা খুব স্বাধীন, খুব সবল, খুব ধনশালী দেশের অনুকরণে ভারতবাসী যদি রাজনৈতিকসভা করে, রাজনীতির বড় বড় কথা লইয়া আন্দোলন করে, অনুমোদন করে, করিয়া একটু সুখে থাকে, সংসারের জ্বালা একটু ভুলিতে পারে, অন্ন চিন্তা হইতে কিয়ৎকাল অব্যাহতি পায়, এবং মরিবার সময়ে হাত-পা ছাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে দোষ কি? এরূপ

ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করা, ইহা লইয়া উপহাস করা, অতি অন্যায়, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ। যে তাহা করিতে পারে, সে সুনীতির বিরোধী, তৎপক্ষে কি সংশয় আছে?

বেগার দিই, তবু বসিয়া থাকি না; কর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি এই মন্ত্রের উপাসক। এই দলের লোক অন্য কাজ না পাইলে "খুড়ার গঙ্গাযাত্রা" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মনে করো, একটা ছিন্ন-ভিন্ন জাতীয় তুমি একজন অপদার্থ লোক। সাধ্য নাই, সহায় নাই, সাহস নাই, সেই জন্য অপদার্থ। এখন, জাতির উন্নতি করিতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক, অনেক খড় কাঠের দরকার। বিদ্যা বুদ্ধি সকল লোকের থাকে না, শিল্প বিজ্ঞান লইয়া মাথালো মাথালো দশজন লোকের চলিতে পারে। সুতরাং জাতিবন্ধন করিতে হইলে, ইতরদের সঙ্গে একটা সাধারণ বন্ধনের আবশ্যকতা। ধর্ম্মে এবং ভাষায় এই বন্ধন হইতে পারে। কিন্তু আমার তত সময় নাই, তত ক্ষমতাও নাই যে, গোড়া পত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া আমি সমুদায় পালাটা শেষ করিয়া উঠি। তাই বলিয়া কি একটা সখের দলও আমার করিতে নাই? সখ করিয়া যদি আমি জাতীয়তার পালা গাইতে আরম্ভ করি, ভুলোর দলের মেথরাণীর গান, মহেশ চক্রবর্ত্তীর ভূতের সঙ্, বৌ মাষ্টারের ভিস্তীর নাচ, এই সকল যোট পাট করিয়া যদি দুদিন দশদিন আমোদ আহ্লাদ করি, তাহাতে দোষ কি? বস্তুতঃ তাহাতে দোষ নাই, ক্ষতি নাই, কিছুই নাই। সুতরাং এমন আচরণ করিলে যে রসিকতা করিয়া ঠাট্টা তামাসা করে, সে নিতান্তই সুনীতির বিরোধী।

আবার দেখো, কেরাণী বাবু হুজুর বাবু প্রভৃতি জন কতক লোক এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পেটের দায়ে অজস্র খাটুনি খাটিয়া একটু বিকৃতমনা হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই তাহাদের মাথাও গরম হইল। একদিন চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার, আর চলে না, আমাদের মনে হইতেছে যে, মাথা বুঝি নাই, পাগড়ী আছে দেখিতে পাই, কিন্তু মাথা খুঁজিয়া পাই না! যদি অনুমতি করেন, ত মাথাটা খুলিয়া রাখি, নেহাত না হয় কালো টুপি দিয়া ঢাকিয়া রাখি; তবু হাত বুলাইলেও মাথা আছে এমন বুঝিতে পারিব। নচেৎ গরীব-মারা হয়।" আফিসের সাহেব গরম দেশে আরও গরম; তাহার সর্ব্বাঙ্গ গরম, মাথা আরও। সাহেব গোল শুনিয়া নিজে চীৎকার করিলেন—"কেও রে তোর ভি মাথা? মাথা যা আছে সে আমার দখলে, তোর যদি থাকে, ঢাকিয়া রাখ্; আর শুধু ঢাকিলেই বা হইবে কেন? পরামর্শ করিতে হইলে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি না হয়, সেই জন্য একটা বিঁড়াও মাথায় পরিয়া থাক্। নতুবা যদি দেখি শির লাঙ্গা, তবে দেখবি শির লেঙ্গা।" ইত্যাদি দৃশ্য দেখিলেও যে রসিকতা করিতে চেষ্টা করে, সেও সুনীতির বিরোধী, নিতান্ত দুর্নীত লোক। এ সকল কথা সকলের শিখিয়া রাখা আবশ্যক। *

---

* ইহার পর "৩ প্রশ্ন কথা বলিয়া" একটি প্রবন্ধ ছিল; তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য।

ভদ্র লোকের ছেলে মানুষ করিবার প্রকরণ।

এক দফা শিশুপালন।

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে ঘোষেদের শ্রীমতী ছোট বৌ ছোট বাবুকে একটী পুত্ররত্ন দিবেন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবুও অনেক দিন ধরিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, সুতরাং রত্নলাভের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং গৃহিণীকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ যম-যমজোপম এক ধাত্রীপুরুষকে স্বীয় রত্নলাভাভিসন্ধি সাধনে সহায়তা করিবার উদ্দেশে আনয়ন জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাপুরুষ এক বস্তা হাতা, বেড়ী, কোদাল, কুড়ল, করাত, খন্তা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হই-লেন। ঘোষমহিলা এই সন্দেশ শ্রবণমাত্র ভীতচিত্তা হইয়া আর আব্দার লওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া প্রতিশ্রুত পুত্ররত্ন আপনা হইতে প্রদানপূর্ব্বক নীরবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব জন্য কোলাহল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ এবং প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ধাত্রীপুরুষ অভীষ্ট কার্য্যে অকৃতমনোরথ এবং ব্যাহত হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাবাবলম্বন পুরঃসর চিন্তা করতঃ পরিশেষে পুত্রবরকে বারেক নয়নগোচর করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে ছোট বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে স্বকীয় সঙ্গে লইয়া গেলেন। ছোট বৌ প্রাণপতিকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন এবং তাদৃশ অনুচরানু-সৃত দেখিয়া মৃদু মন্দ ভাবে বসন সংযমনপূর্ব্বক অতিমাত্র কষ্টে তদীয় দেহলতা যৎ-কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলেন। সূতিকাগারস্থিতা কিঙ্করীর ক্রোড়ে ইঁহারা উভয়ে সেই কুমারলাঞ্ছন নবকুমারকে দৃষ্টিগোচর করত ধাত্রীপুরুষ সহসা বিস্ময়-রোষ-ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ছোট বাবু তাঁহার তদ্রূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কথঞ্চন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"অহো, কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই শিশু অনাবৃত গাত্রে মৃত্যুসঞ্চারী এই ভীষণ শীতল বায়ু সঞ্চার ভোগ করিয়া সন্তা-বিনী পীড়ার আবির্ভাবাশঙ্কা বদ্ধমূলা করিতেছে। অধিকতর লজ্জার বিষয় এই যে, কিঙ্করী স্ত্রীজাতি-সম্ভূতা হইয়াও এই বালককে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীয় অঙ্কদেশে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে ভীতা বা ব্রীড়ান্বিতা হইতেছে না। তদুপরি বালকেরও কি ধৃষ্টতা—একেবারে আবরণবিহীন, এমন কি কৌপীনটীর পরিধান না হইয়াও এই রমণীজনমণ্ডলে অম্লান বদনে সহাস্যাস্যে বিরাজ করিতেছে। এতৎকারণ প্রযুক্তই অস্মদ্দেশের এবম্প্রকার দুর্গতি, এবম্ভূত অবনতি এবং এতাবৎ রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুপরিপ্লুত দশা সংঘটিতা হইয়াছে। ইহার প্রতিকার না করিলে সুখ-সৌভাগ্যের

আশা সুদূরপরাহত, তাহা শেমুষীসম্পন্ন কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করণে সক্ষম হইবেন ?"

ছোট বাবু প্রণিধানপূর্ব্বক ধাত্রী পুরুষের উপদেশলহরী শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করত তাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—"যথার্থ কথা।" কিন্তু অজ্ঞ জনের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সবিস্তার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রীপুরুষ লঙ্কার যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ঘোষণপূর্ব্বক বিধি-ব্যবস্থা সন্ন্যস্তা করিয়া কিয়ৎকালান্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন। নবজাতশিশু তদবধি ফেলানেলমণ্ডিত হইয়া ভবযন্ত্রণা সংকীর্ণ করণবিষয়ে যত্নপর হইল।

কালক্রমে বালক কি অভিধায় আখ্যাত হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ প্রস্তাব করিল প্রিয়নাথ, কেহ নলিনীভূষণ, কেহ কামিনীমোহন, কেহ বা দামিনীকণ্ঠ ইত্যাদি বহুবা অভিধা প্রস্তাবিত হইলে, পরিশেষে সকল পক্ষ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিয়া নর নারী উভয় জাতির মনস্তুষ্টিজনক ননীগোপাল নামকরণ স্বীকৃত করিল। তদবধি নবকিশলয়বিনিন্দিত নবীন শিশু ননীগোপাল হইল,—আতপতাপে তাহার দেহ বিগলিত হইতে লাগিল, শীতসঞ্চারে তদীয় শরীর জমাট আড়কাট হইতে লাগিল, এবং রমণী-জনসুলভ কোমলহৃদয় তদীয় জনক ছোট বাবু, তথা স্নেহময়ী জননী ছোট বৌ শিশুকে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূত হইতে নিরাকৃত করিয়া পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন! ক্ষিতিস্পর্শনিবারণ জন্য দাস-দাসী নিয়োজিত হইল; বহুবিচার-পুরঃসর সময়ে সময়ে মীমাংসা করিয়া ননীগোপাল উষ্ণজলে স্নাত হইতে লাগিল, রুদ্ধদ্বারবাতায়ন গৃহে তেজঃ নিবারিত হইতে লাগিল, কার্পাসকৌশিকোর্নজালে প্রভঞ্জনের প্রকোপ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, এবঞ্চ দিব্যাশ্বযুগলোঢ়যানে আকাশের ভুঃশ্বাস হইতে ননীগোপাল রক্ষিত হইতে লাগিল। নবনীত-পুত্তলীনিন্দিত ননীগোপাল এইরূপে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।—ইতি "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি।"

অথ বিদ্যাশিক্ষা।

(এডুকেশন-গেজেট হইতে সংগৃহীত।)

ননীগোপালের যখন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" জানিয়া তাহার পিতা মাতা তাহাকে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিলেন। সেখানে কড়ানিয়া, বট্‌কিয়া, নামতা, কড়িকসা, মণকসা, সুদকসা কাঠাকালি, বিঘাকালি, দেয়ালকালি, নৌকাকালি প্রভৃতি শিখিলে, অথবা নামলেখা, পত্রলেখা, খৎলেখা, পাট্টালেখা প্রভৃতি শিখিলে, একদিকে সময় নষ্ট অপরদিকে বৃথা কষ্ট জানিয়া ননীগোপালকে তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ, দন্ত্য স, বর্গীয় ব, অন্তস্থ ব, হ্রস্ব স্বর, দীর্ঘ স্বর, প্লুত স্বর প্রভৃতির

উচ্চারণগত প্রভেদ সম্বন্ধে সাবধানে নিরস্ত করিয়া কণ্ঠস্থ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল, এবং যাবদীয় উচ্চারণ স্থান, ব্রহ্মাণ্ডের শব্দের লিঙ্গজ্ঞান প্রভৃতি বাঙ্গলার অত্যাবশ্যক তত্ত্ব সকল মুখস্থ করিবার আদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। অধিকন্তু পৌণ্ডো, শিলিঙ্গ, পেনসো দিয়া টাকা কড়ির হিসাব, আর ড্রাম, ঔন্স, পৌণ্ড দিয়া ওজনের জ্ঞান শ্লেটে অঙ্ক পাতিয়া ননীগোপাল লিখিতে লাগিল।

এদিকে কলিকালে লোক অল্পায়ু হয়, এ কথাটা সকলে জানে বলিয়া, চিরজীবী ননীগোপালের পরকালের পথ মুক্ত রাখিবার জন্য বাড়ীতে একজন উপশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কৃপায় পি-এল-ও-ইউ-জি-এচ—প্লাউ, টি-এচ-ও-ইউ-জি-এচ—দো, সি-ও-ইউ-জি-এচ—কফ, আর-ও-ইউ-জি-এচ—র‍্যফ, টি-এচ্-আর-ও-ইউ-জি-এচ—থ্রু, টি-এচ-ও-আর-ও-ইউ-জি-এচ—থারা—ইত্যাদি উচ্চারণ রহস্যে ননীগোপাল নিত্য নিত্য নূতন আনন্দের আস্বাদন গ্রহণ করিতে লাগিল।

ননীগোপাল প্রত্যূষে শয্যা হইতে ওঠে, অমনি স্নেহময়ী জননী একবার তাহাকে মিঠাই মোহনভোগ দিয়া জলযোগ করাইয়া দেন। জলযোগ সম্পন্ন হইবামাত্র হিতৈষী পিতা তাহাকে পাঠগৃহে বসাইয়া দেন। নয়টা না বাজিতেই পাঠ স্থগিত রাখিয়া ননীগোপাল স্নান করে; স্নানান্তেই আহার। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে গিয়া ননীগোপাল আবার পড়া দেয়, আবার পড়া লয়। প্রদোষে বাড়ী আসিয়া ননীগোপাল উপশিক্ষকের হস্তে আবার কোমল প্রাণ সমর্পণ করিয়া দেয়। যখন চিক্কিনে রৌদ্র, সেই একটার সময় একবার ননীগোপাল বাহিরে যাইতে যাইতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া বিদ্যামন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করে, এবং স্বাধীন ক্রীড়ায় সুখানুভব করে।

এইরূপে দশ বৎসর বয়স না হইতেই ননীগোপাল বাঙ্গালা সাহিত্যে পারদর্শী, বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃতবিদ্য, প্রাচীন ও নব্য সমগ্র ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন, ভূগোলে নখদর্পণ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে তৎপর, অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ, স্থিতিবিজ্ঞানের যন্ত্র জ্ঞান, গণিতবিজ্ঞানে বেগবান্ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেও উন্নতি করিতে লাগিল। ননীগোপালের সুখ্যাতি লোকের মুখে আর ধরে না। সেই আহ্লাদে ছোট বাবুর আর মাটীতে পা পড়ে না, আর ছোট বৌ সেই অহঙ্কারে সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে পারেন না।

আর দশ বৎসরের মধ্যে ননীগোপাল ইংরেজীতেও পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান লাভ করিল। শেষবার পরীক্ষা দিয়া ননীগোপাল যে পুরস্কার পাইল, অনেকে চাকরি করিয়া তত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না। বিংশতি বৎসর বয়সেই ননীগোপাল এইরূপে কৃতবিদ্য এবং সিদ্ধার্থ হইয়া সুখের পূর্ণভোগ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না; সেই জন্য ননীগোপালের সুখেও দুই

চারিটী কণ্টক ফুটিয়া তাহাকে একটু কাতর করিয়াছিল। সে গুলির উল্লেখ আবশ্যক।

(১) পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ননীগোপালের বিবাহ হয়। এখন তিনি বিদ্যাসমুদ্রের পারে ভাসিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স তিন বৎসর, পুত্র খেলা করিতে শিখিতেছে এবং অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি তাঁহার প্রণয়িণীর উদর-পরিধি বৃদ্ধি করিতেছেন।

(২) প্রত্যেক বার পরীক্ষা দিবার অনতিপূর্ব্বে ননীগোপালের জ্বর, উদরাময়, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হইত, কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের কুইনীনের প্রয়োগে গবাস্থিচূর্ণ পথ্যে এবং পিতা-মাতার যত্নের বাহুল্যে তিনি পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারি-তেন। তাহাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু ননীগোপালের শরীর এখন নিয়ত নিস্তেজ এবং অসাড় মনে হয়, অগ্নিমান্দ্য সর্ব্বদাই থাকে, উদরাময় প্রায়ই দেখা দেয়, শিরঃপীড়া যখন তখন ঘটে এবং চক্ষুতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি কম হয়।

(৩) বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইবার দুই তিন বৎসর আগে হইতে ননীগোপালের পিতা এক ঘরাও মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। কিছু দিন পরে ছোট বৌ, ননীর মা, প্রাণত্যাগ করিলেন এবং ছোট বাবুও শেষে প্রেয়সীর অনুগমন করিলেন। ফলে, এ সব না ঘটিলেও আর আর যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতই।

"তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি"তে ক্ষান্ত হইল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ননীগোপাল প্রায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

অথ "মিত্রবদাচরেৎ"।

(এটা পঞ্চানন্দের)

ননীগোপাল মানুষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে বড় ভাবনা হইল। এখন করি কি? যাই কোথায়? খাই কি? এই সকল ভাবনায় ননীগোপালের মন তোল-পাড় করিতে লাগিল। গৌরমোহন আড্ডের স্কুলে ছেলেদের প্রাইজ হইতেছিল; ছোট লাট অনুগ্রহ করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া, স্বয়ং সেইখানে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে প্রাইজের বইগুলি বিতরণ করিতেছিলেন। ননীগোপাল ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল। বালকদের উৎসাহ-আগ্রহ-আশা-মাখা মুখ দেখিয়া ননীগোপালের চক্ষের জল অতি-কষ্টেই চক্ষে রহিল; সুবিধা, সময় বা স্থান পাইলে সে জল একবার অনর্গল পড়িত, তাহার আর ভুল নাই। তাহার পরে সাড়ে ছয় কোটী লোকের রাজা, লক্ষ টাকার চাকুরে, চিরিয়াখানার প্রতিবাসী ছোট লাট সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া অন্যান্য দশ কথার পর গাঢ়স্বরে বলিলেন—"লেখা পড়া ত সকলেই শিখিতেছে; এখন এদেশের বড় মানুষের ছেলেদের, ভদ্রলোকের ছেলেদের দশা যে কি হইবে, তাহাই আসল ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

কথা শুনিয়া ননীগোপাল একটু কাঁদিল, না কাঁদিয়া আর থাকিতে পারিল না; সেই সঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপাল একটু হাসিল, হাসি আপনা-আপনি আসিল বলিয়া হাসিল। ননীগোপাল চমৎকার। অন্ন-চিন্তার দায়ে সকলই করিতে সম্মত, কিন্তু তাহার শরীর তাদৃশ পটু নহে। ওকালতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে কাহারও বিদ্যা খাটে না, বিদ্যাতে কুলায়ও না, চাকুরির চেষ্টা করিয়াছিল, যোটে নাই, যাহা যুটিয়াছিল, তাহা না যোটারই মধ্যে, কারণ তাহাতে মান সম্ভ্রম দূরে থাকুক, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর। সুতরাং ননীগোপাল লাট সাহেবের কথায় মনের বেগ সামলাইতে পারিল না; এত লেখা পড়া শিখিয়া কিছু হইল না, অতএব দশায় হইবে কি—ইহা সত্য সত্যই ভাবনার কথা বুঝিয়াই ননীগোপাল কাঁদিল। তখনি আবার লাট সাহেবের অট্টালিকা, লাট সাহেবের গাড়ী ঘোড়া, লাট সাহেবের নাচ গান, লাট সাহেবের খানা পিনা, এত হাঙ্গামের ভিতর পরের দশার জন্ত ভাবনা কেমন করিয়া থাকিতে পারে, বাস্তবিক থাকিবে না, যথার্থ ভাবনা থাকিলে পন্থাও হয়—এই সব মনে করিয়াই ননীগোপাল হাসিল। সভা ভঙ্গ হইলে ননীগোপাল আবার সেই অন্নের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সংবৎসরেও অন্নসংস্থান হইল না। কিন্তু অন্নের সংস্থান করা যে খু… সহজ ব্যাপার, ধনী হওয়াটা যে সকলেরই ইচ্ছায়ত্ত, ননীগোপাল ইহা বুঝিতে পারিল। কারণ, সংবৎসরই বক্তার বক্তৃতায় এই কথা, সংবাদপত্রের লেখায় এই কথা অনর্গল বাহির হইতেছিল,—India is rich, you are rich. develope the resources of your country, find out the mine of wealth that is in her. Set about your task in right earnest, and you shall want nothing. ইংরেজীতে এই সব, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বাণিজ্য করো, কৃষি করো, মাথা করো, মুণ্ড করো—বাঙ্গালায় এই সব কথা, নিত্যই ননীগোপাল শুনিতেছিল বা পড়িতেছিল। যাহার অন্ন আছে সে বলে, যাহা… "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" সেও বলে, যাহার উচ্চপদ, তাহার মুখে এই কথা, … চাকরির জন্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, তাহার মুখেও তাই। দুঃখের বিষয় এ যে, এ সকল কথা বুঝিয়াও, ইহার মর্ম্ম জানিয়াও ননীগোপাল এ সমস্ত প্রলাপ ম… করিতে লাগিল।

বৎসর ঘুরিয়া গেল, আবার গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে প্রাইজ বিতরণ… এবার প্রধান বিচারপতি বক্তা, ননীগোপাল উপস্থিত। প্রধান বিচারপতি ব… লেন,—"সকলকেই যে ডাক্তার, উকীল, সঙ্গীতবিশারদ বা চাকুরে হইতে হই… এমন কোনও কথা নাই। ভগবান্ এক এক জনকে এক এক গুণ দিয়াছেন, …খিয়া লাগিলে একটা না একটা কাজ যে যুটিবেই, সে কাজে ফল যে ফলিবেই,

আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই দেখো কত ব্যবসা আছে, তোমরা অবলম্বন করিলেই হয়—এঞ্জিনিয়ার হইতে পারো, জবীপের কাজ করিতে পারো, উকীল হইতে পারো, চিকিৎসক হইতে পারো” ইত্যাদি।

বিচারপতি সমস্ত বলিলেন, কেবল পন্থাটা বলিয়া দিলেন না। ননীগোপাল বাড়ী আসিল, কর্ম্ম কাজের আশা ছাড়িয়া দিল, স্ত্রী পরিবারকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিল, মদ ধরিল, ইয়ারকিতে মশগুল হইল। “মিত্রবদাচরেৎ” কাহাকে বলে, ননীগোপাল তাহা বুঝিল, ননীগোপাল মানুষ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, মানুষ বেশী দিন টেঁকে না; অল্প দিনের মধ্যেই ননীগোপালের স্ত্রী বিধবা হইল, ননীগোপালের ছেলেরা পিতৃহীন হইল। “আমার কথাটী ফুরাইল” ইত্যাদি।

মূলে কুঠারাঘাত।

পূর্ব্ব সূচনা।

বঙ্গদর্শন ত পড়া আছে? তবে আইস ভাই, একবার দার্শনিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্মী বঙ্গপন্থীই বঙ্গের ভরসা, ভারতের ভরসা, জগতের ভরসা। বঙ্গপন্থী বুঝিয়াছেন, বুঝাইতেছেন, বৈষম্য সকল অনর্থের মূল। এই জন্য বঙ্গপন্থী অবতার স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করি যে, মধ্যে মধ্যে একজন বা দশজন অমানুষ শক্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে বৈষম্যবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বঙ্গপন্থীর মতে তাঁহারা সকলেই অবতার, সমকার্য্যে সমধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গপন্থী বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ কিছুই মানেন না; গ্রন্থবৈষম্য তাঁহাদের পন্থায় নাই। সেই জন্য বর্ণপরিচয় (১) হইতে বেদান্তদর্শন পর্য্যন্ত সকল পুঁথিই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। তৃতীয়তঃ অর্চ্চনা বন্দনা, পূজা প্রেয়ার, তাঁহারা সকলই বৃথা বলেন। আমি ভক্ত, তুমি ভগবান্ এ কথা ঘোর বৈষম্যমূলক এ মোহভাবের প্রশ্রয়দাতা বঙ্গপন্থী নহেন, সুতরাং তিনি অর্চ্চনা বন্দনায় নাই। চতুর্থতঃ বঙ্গপন্থী জানেন, পাপ পুণ্য--মিথ্যা; বঙ্গপন্থীর নবদর্শনকার, ইহা শ্লাঘার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, এবং বঙ্গপন্থীর কার্য্যকলাপে প্রত্যহই এই সাম্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গপন্থী বিবেচনা করেন, “মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনা হইতে ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা গেলেও সেইরূপ কি একটা হইবে।”

---

(১) বঙ্গদর্শনে একবার “বর্ণপরিচয়ে”রও সমালোচনা হইয়াছিল।

এই নাগদার জমায়েতের পূর্ব্বে দেশে মহাদেশে, গ্রামে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, ভবনে, অঙ্গনে, প্রকোষ্ঠে খট্টায় যে নরনারীরূপ আকৃতির প্রকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা ঘুচিয়া যাইবে, গিয়া কি একটা হইবে।

যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন বঙ্গপন্থীর মতে, জগতের ভরসা নাই, নর-সাগরসৃষ্টির সুযোগ নাই।

স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যই সকল অনর্থের মূল—সার্ব্বজনিক, সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক। হিন্দু-মুসলমানের ভেদ, পৃথিবীর একদেশব্যাপী; ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ এখন কেবল কলার-ব্যাপী, ধনী নির্ধনের ভেদ জেলে নাই, মূর্খ পণ্ডিতের ভেদ সাহেবের কাছে নাই, নবেল রোমান্সে ভেদ বঙ্কিম বাবুর কাছে নাই, নাটক প্রহসনের ভেদ মিত্রজার (১) কাছে ছিল না; আধুনিক পুস্তক-পুঞ্জমধ্যে ওজনগত ভেদ থাকিলেও, পাঠকের কাছে নাই, যোগেশ (২) বাবুর কাছেও নাই। কিন্তু নর-নারীর ভেদ কোথায় নাই বল? বিলাতের সাম্য-সভা পার্লিয়ামেন্ট হইতে দরিদ্রের পাকশালা পর্য্যন্ত এই বিজাতীয় জাতিভেদ কোথায় নাই? বঙ্গপন্থী এত চেষ্টা করিলেন, তবু ত ধর্ম্মসভ হইতে স্ত্রী-পুরুষের স্থানগত বৈষম্যও উঠিল না। ইংরেজ-রাজ সাম্য-অবতার,—বড়কে ছোট করিয়া, ছোটকে বড় করিয়া অনবরত সাম্য সাধন করিতেছেন; তথাপি তাঁহার বিখ্যাত সাম্যশালা শ্রীঘরে স্ত্রী-পুরুষের স্থান-বৈষম্য এখনও ত ঘুচিল না অহো কি দুর্ভাগ্য!

তাহার পর, আকৃতির বৈষম্য, প্রকৃতির বৈষম্য, বিকৃতির বৈষম্য, নিষ্কৃতির বৈষম্য পরিচ্ছদের প্রবৃত্তির নিবৃত্তির—বৈষম্য, আহারের ব্যবহারের প্রহারের অপহারের উপ-হারের বৈষম্য,—এ সকল কবে যে ঘুচিবে, বঙ্গপন্থী তাহা তাঁহার নব দূরদর্শনেও স্থি করিতে পারেন না।

এই জাতিভেদ সকল জাতিভেদের শিরোমণি, অথচ মূল। তল.দশে আঘাত ন করিলে আর চলে না। দুঃখভরা ধরার সকল দুঃখের মূলই ঐ। এই বৈষম্য তাড়নে লঙ্কাকাণ্ড, ইলিয়ম নাশ, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, ৺মিত্রের (৩) মুখভেট, কুচবিহা কিষ্কিন্ধ্যা, (৪) মৃজাপুরে গৃজাযন্দ্ব (৫)। এই জাতিভেদ হইতেই কায়স্থের কষ্ট

---

(১) ৺দীনবন্ধু মিত্র।

(২) ৺যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার ক্যানিং লাইব্রেরী নামক পুস্তকাল স্বত্বাধিকারী।

(৩) কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র।

(৪) ৺কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহকালে গোলযোগের প্রতি ইঙ্গিত।

(৫) কলিকাতার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, ব্রাহ্ম গীর্জ্জা লইয়া বিবাদ।

দায়, গ্রাণ্টের ঘোমটা দায় (১), পঞ্চানন্দের গৃহিণী-দায়, সাধারণীর অনাদায় (২)। (এ তাগাদায় কিন্তু লাভ নাই।)

এই বৈষম্য হইতেই ঢেঁকিতে টাপ ঢাপ ঢুপ, ব্যাকরণে ঈপ্‌ আপ্‌ উপ্‌; ঘট ঘটীর দুর্ঘটনা, রমণ-রমণীর বিচ্ছেদ-যাতনা; লেনিতে (৩) father mother, brother sister প্রভৃতি নিতান্ত ঘনিষ্ঠের পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠে সংস্থান। নাটকে—ললিত ললামের, এবং লীলা-লহরীর ভিন্ন পথে, এক দল বাহুকম্পে, এক দল পদঝম্পে, প্রস্থান।

এই জন্যই শকুন্তলা ভবন (৪) দুষ্মন্তগণের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়া যাইতেছে, ন্যাশনাল থিয়েটার বসিয়া যাইতেছে, ফৌজদারী আদালত চলিয়া যাইতেছে, দেওয়ানি আদালত বেনামির বিচারে ব্যস্ত, কালেক্টর নাম খারিজে ব্যস্ত।

এই জন্যই দম্পতী, উপদম্পতী ক্ষণদম্পতী মধ্যে,ঈর্ষার উৎপত্তি। তৎকালিক জুলুবীর ওথেলো, এই ঈর্ষা হইতেই অকাল-মৃত। বন্ধুতার বন্ধুর-ভাব; সভ্যদলে ভ্রাতৃ-ভগিনী ভাব।

এই বৈষম্য হইতেই আলঙ্কারিকের আবিষ্কার। নায়ক নায়িকা ধীর, ললিত, উদাত্ত, শঠ, ধৃষ্টত্রয়—কলহান্তরিতা, বিরহান্তরিতা, প্রবাসান্তরিতা, প্রকোষ্ঠান্তরিতা প্রভৃতির প্রভেদ।

এই সাংখ্য দর্শনের মূল, অসংখ্য-দর্শনের ভুল, অসংখ্য যোগের সৃষ্টি, অসংখ্য শোকের বৃষ্টি।

এই জন্য, indecency, obscenity, pruriency, scandalum magnatum, venalum, অশ্লীল, কুৎসিত, কোকচ, পৌরুষ, জঘন্য, নগণ্য, ধন্য, বদাস্ত প্রভৃতি কথার সৃষ্টি,ব্যথার দৃষ্টি, সমালোচকের নিকট ভ্রূকুটিদৃষ্টি। দর্পণে (৫) ভণ্ডামী; তর্পণে গোত্রনাম্নী। এই শ্লীলতার দায়েই বঙ্গপন্থী কবির বিদ্যাসুন্দর উদরস্থ রাখেন, সহজে উদ্গার করেন না; শনিবারের পালা (৬) পড়েন, হাসেন, তথাপি সভ্য ভাবেন! সকলই না স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য জন্য ?

এই বৈষম্যের অনিষ্টকারিতা এখন উপপন্ন হইল; যাহাতে উপায় সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কর্ত্তব্য, এমত স্থলে

---

(১) "গ্রাণ্ট-ঘোমটা সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

(২) অক্ষয় চন্দ্রের "সাধারণী"র মূল্য বাকী থাকিলে, তাহার জন্য তাগাদা করা হইত না।

(৩) সেকালে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র লেনির ব্যাকরণ (ইংরেজী) পঠিত হইত।

(৪) মদ-মাংসের টাকার অনাদায়ে। বাবুদের এমনই বদান্যতা।

(৫) দর্পণ-Idian Mirier,

(৬) "শনিবারের পালা" কবিতা এই "পাঁচুঠাকুরেই" পরে আছে।

সংস্কার সূচনা।

এই বিষম বৈষম্য একটী মহান্ অনিষ্টকর ব্যভিচার ; বঙ্গপন্থী ইহার সংস্কার করিবার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। এই সংস্কারের সংস্কারক নাই। এবারকার কে চৈতন্যদেব ? জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর নাই। কোনও পরামর্শ নাই, যত্ন নাই, উদ্‌যোগ নাই, অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে! ধর্ম্মযাজন নাই, ধর্ম্মপ্রচারক নাই, কোনও গ্রন্থ নাই, (ব্যতীত এই পঞ্চানন্দ) অথচ চারি দিকে ইহার কার্য্য হইতেছে।

কার্য্য নানাবিধ। প্রথম, ঈশ্বর পরিবর্ত্তনে। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী উঠাইয়া দিয়া, শিব দুর্গা তুলিয়া দিয়া, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ ভুলিয়া গিয়া স্ত্রীপুংভাবের বৈষম্য-চ্ছেদ করণার্থ প্রথমেই বঙ্গপন্থী ক্লীব ব্রহ্মের অবতারণা করেন। স্নেহ মায়া থাকিলে স্ত্রীত্ব আইসে, কার্য্যকারিতা থাকিলে পুংত্ব আইসে,কাজেই ঈশ্বর নির্গুণ নিষ্কাম,নিরাকার জড় ভরত।

কিন্তু এখন আর তাহাতেও কুলায় না। বৈষম্যের এমনই অত্যাচার যে, এহেন ঈশ্বরকেও লোকে পিতা, কেহ পিতার পিতা, কেহ খুড়ার দাদা, বলিতে ছাড়িল না। সেন সাম্যী ইহার এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি এমন ঈশ্বরকে জননী, স্বর্গাদপি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অচিরাৎ পিতরৌ, পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ বলিবেন ; তাহা হইলেই ঈশ্বরত্বে জাতিগত বৈষম্যের বিনাশ ; সাম্য যোগের জয়জয়কার।

দ্বিতীয়তঃ নাম করণে সেই সাম্য যোগ। কামিনী সেন, নিতম্বিনী মুন্‌সি, যামিনী গুপ্ত, ভামিনী দাস, বলিলে এখন আর কোনওরূপ আকৃতিগত বৈষম্য সূচিত হয় না। রজনী গুপ্ত, নর কি নারী, কেহ দূর হইতে নির্ণয় করিতে পারে না।

তাহার পর পরিচ্ছদাদিতে সাম্য সাধন! স্ত্রীলোকের মুখাবরণ উত্তোলিত হইতেছে ; পুরুষে দাড়ি রাখিয়া মুখাবরণের সংস্থান করিতেছেন, তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও সাম্য সাধন হয়। ফুল বাবু বুকের দুদিকে দুটী বড় ফুল গুঁজিয়া স্ত্রী-অনুকরণে ব্যস্ত, ফুল কুমারী বস্ত্রতাড়নে, অনাহারে, রুচি সংস্কার প্রদর্শন জন্য সন্তানের গর্দ্দভদুগ্ধ ব্যবস্থা করিয়া, বিন্ধ্যাচলকে ভূলীন করিয়া রাখিতেছেন, 'উঠ উঠ বিন্ধ্যরাজ, বৈষম্যবাদী কবির আবাহনে আর কিছুই হয় না।'

অতএব আকৃতি-প্রকৃতিগত বিকৃতি বৈষম্য সকল অনর্থের মূল। সেই বিকৃতির তলে আঘাত করিতে বঙ্গপন্থী নিয়তই বিব্রত। আশা করা যাইতে পারে, এই নদ নদী প্রথম প্রয়াগে মিলিত হইয়া ক্রমে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাসাইয়া নর-মহাসাগরে লীন হইবে। যে কয়দিন না হয়, যেমন পুরুষানুক্রমে চলিতেছে তেমনই থাকুক, পঞ্চানন্দের তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই ; বোধ হয় পাঠক-পাঠিকার আপত্তিও না থাকিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে।

অপামর সাধারণ একমত হইয়া যে কাজ করিতে মনস্থ করেন, তাহার বিরুদ্ধভাব করিবার চেষ্টা করা যে ধৃষ্টতামাত্র, তাহা আমি অবগত আছি। আর, সকলে যাহা ভালো বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা একজন লোকে মন্দ বলিলেই যে মন্দ হইবে, ইহাও আমি বিবেচনা করি না। এমন কথা প্রকাশ করিলে উহাকে বুদ্ধির বিড়ম্বনা মনে করিবার অধিকার সকলেরই আছে। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিবার জন্যও এইরূপ একটা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিপ্রায় দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টা করাও যে অসমসাহসিকতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "দশ চক্রে ভগবান্ ভূত" এ প্রবাদও আমি অবগত আছি। কিন্তু রোগই বলুন, কিম্বা মানব প্রকৃতির শূকরত্বই বলুন, এরূপ দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের মত সত্ত্বেও আমি বাঙ্গালা ভাষার উচ্ছেদ সাধনে সম্মত হইতে পারিতেছি না। ইহা আমার দুর্বুদ্ধি হইতে পারে, দুর্ভাগ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য মনে যাহা হইতেছে, তাহা কেমন করিয়া চাপিয়া যাইব? অধিক কি, যদি ন-আইনে পঁয়তাল্লিশ আইন যোগ করিয়া স্বয়ং লাট সাহেব আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া না দিলে যে কিছুতেই চলিতেছে না, এরূপ ধারণা করিতে আমি অক্ষম।

কিন্তু যেখানে সকলেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা না উঠাইয়া দিলে বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ, সেখানে অবশ্যই আমার বক্তব্য বিনয়ের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত এবং গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য। গুরুতর প্রশ্নে পণ্ডিতগণের প্রতিকূল কথা বলিতে হইলে সম্মানের সহিত বলা আবশ্যক, তাহা আমি জানি। অতএব আমি যে সকল আপত্তি নিবেদন করিতেছি, তাহার সারবত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গবাসী বিদ্বান-মণ্ডলী আমার ব্যবহারের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবেন না। এই আমার ভিক্ষা।

ফলতঃ আমাকে এত মূর্খ বা বোকা মনে করিবেন না যে, সত্য সত্যই কেতাবী বাঙ্গালা ভাষার অনুকূলে আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছি। যাহাতে এত ষত্ব-ণত্ব দুর্দান্তের উৎপাত আছে, তাহা লইয়া ভদ্র লোককে বিব্রত করিতে কোন্ পামরের ইচ্ছা হইতে পারে? তবে তেলী তাম্লী, গয়লা, মালী, চাষা ভূষো, হাড়ি ডোম্ প্রভৃতি গরীব দুঃখী লোক যে ভাষাকে অবলম্বন করিয়া কোনওরূপে পাপ বাঙ্গালী জন্ম কাটাইয়া যাইতেছে, তাহা উঠাইয়া দিতেই আমার আপত্তি, ইহা আমি শতবার স্বীকার করি।

যাহারা বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিবার পক্ষ, তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই যে, বাঙ্গালা ভাষা বজায় রাখিলে অন্ততঃ দুইটা ভাষা শেখা আবশ্যক হইয়া উঠে। তাহা

হইলেই প্রথমতঃ অকারণে অনেক বহুমূল্য সময় নষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ভাষার বিরোধ হেতু মনেরও বিচ্ছেদ জন্মে।

এ তর্ক যে নিতান্ত অসার, ইহা বলিতে আমার সাহস হয় না। কিন্তু এ তর্কের কোথায়ও যে খুঁত নাই, তাহাও ত বলিতে পারি না। একাধিক ভাষার কথা যে বলা হয়, তাহা ইংরেজীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, ইহা আমি ধরিয়া লইলাম। ইংরেজী রাজভাষা, অতএব অর্চ্চনার বস্তু, তাহা আমি মানি। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়,—ইংরেজ বাঙ্গালী উভয়েই একথা বলেন যে, এমন দিন আসিতে পারে যে, ইংরেজরাজ আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। যদি তাহা ঘটে, অথচ বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব তখন লোপ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে গরীব বেচারারা দাঁড়ায় কোথায়? মনুষ্যের যে উৎপত্তিতত্ত্ব ডার্বিন সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সত্যতার প্রতি সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া হঠাৎ একদিন বাঙ্গালীকে সেই তত্ত্বের প্রমাণ দিতে বসিতে হইলে এবং জানি না কত যুগ পিছু হাটিয়া যাইতে হইলে, বোধ করি নিতান্ত সুখের কথা হইবে না। এই কথাতেই সময় নষ্টের আপত্তি কথঞ্চিৎ খণ্ডিত হইতেছে। ফলে তাহা না হইলেও, আগাগোড়া লোককে বাঙ্গালা ভুলাইবার জন্য যে অনেক সময় লাগিবে না, ইহাও নিশ্চিত বলা যায় না। বলিতে আশঙ্কা হয়, কিন্তু বিনীতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে, কালে ভদ্রে পত্র লেখা আবশ্যক হইলে 'Dear Papa, Dear Mamma' না লিখিয়া 'প্রিয় বাপ,' 'প্রিয় মা' সম্বোধন করিয়া কতক সময় বাঁচাইতে পারা যায়, এবং সে সময়টুকু বাঙ্গালা ভাষাকে দেওয়া যাইতে পারে। এটা যে একটা গুরুতর তর্ক, তাহা বলিতেছি না; তবে অন্য দশ কথার সঙ্গে ইহার বিবেচনা করিলে করা যাইতে পারে, এই মাত্র আমার বলিবার উদ্দেশ্য।

ভাষা-বিরোধের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে একেবারেই অসঙ্গত, তাহা বলি না। কিন্তু বড়লোকে-ছোটলোকে, ইতরে-ভদ্রে, সুশিক্ষিত বাবুতে এবং অসভ্য চাষাতে যখন একটা প্রভেদ থাকা অত্যাবশ্যক, বিরোধ না থাকিলে প্রকৃত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না, তখন ভাষা-বিরোধের আপত্তি বা মনো-মালিন্যের শঙ্কা কেমন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদনীয় হইতে পারে? যত্ন করিয়া যাহা রাখিতে হয়, চিরদিন যাহা রাখিতে হইবে, তাহার রক্ষণ-প্রণালী লইয়া এত বাছবিচার করিলেই বা চলিবে কেন? এখন ত বাঙ্গালা ভাষা জীবিত আছে—বিকারের রোগীর মত তাহার অবস্থা বটে, তথাপি জীবিত—এখন যে কারণে বঙ্গবাসীর হিতের কথা হইলে, কোনও একটা দয়কারী কথা হইলেই ইংরেজীতে বাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক,বিতণ্ডা, বিচার, বক্তৃতা করা যায়, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিলেও ত সে কারণের বিনাশ হইতেছে না। সাধারণ বাঙ্গালী যাহাতে না বুঝিতে পারে, তাহাই ত উদ্দেশ্য? তা বাঙ্গালা উঠাইয়া

দিলেই যে সকলেই ইংরেজীতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, মারুন্ আর কাটুন্ এমন বিশ্বাস ত আমার হয় না। লোকে এখনও বোঝে না, তখনও বুঝিবে না ; এমত স্থলে সামান্য ব্যক্তিদের যৎসামান্য ভাব-বিনিময়ের পথে কাঁটা দেওয়াটা কি খুব সুবিবেচনার কাজ হইবে ?

বাঙ্গালা ভাষার বিরোধিগণ আরও বলেন যে, বাঙ্গালা যখন মাতৃভাষা, তখন শিক্ষা করিতে এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন ? অথচ লিখিতে বুঝিতে গেলেই কষ্ট স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

যে জাতি, গুলি ডাণ্ডা খেলিয়া, গুলি গাঁজা ফুঁকিয়া, পিতার, পিতামহের, মাতামহের এমন আরও দশ জনের বিষয় হস্তগত করে, তাহার এরূপ তর্ক করিবার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু জাতিভুক্ত সকল ব্যক্তিই এমন সৌভাগ্যশালী নয়; অনেককে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, দুই প্রান্ত একঠাঁই করিতে হয়। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন লোকের জন্য বাঙ্গালাটা রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি ? যাঁহারা ধনবান্, জ্ঞানবান্, বিদ্যা-বান, স্বদেশবৎসল, বাক্যস্বচ্ছল, তাঁহারা এখনও বাঙ্গালা শেখেন না, তখনও শিখিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের কোনও কষ্ট নাই। তবে জোর করিয়া ভাষাটা উঠাইয়া দিয়া কাজ কি ? ভাষা উঠাইয়া দিতে ইঁহারা যে পরিশ্রম করিতে উদ্যত, সেই পরিশ্রম অন্য কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাঁহাদের সুখ হইতে পারিবে, অভাগারাও কিছু দিনের জন্য রক্ষা পাইবে। ক্রমে বড় দরের লোকের মনোভাব চুঁইয়া চুঁইয়া ক্ষুদ্র দলের ভাবান্তর করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ব্যস্ত হইয়া কাজ কি ? কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালায় শিখিবার কোনও কথা নাই ; পড়িবার কোনও পুস্তক নাই, তবে এমন ভাষা থাকিতে দিব কেন ?

একথা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলে কোনও ভাষাই টেকিতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, ভাষা মাত্রেই উঠিয়া যাউক, এরূপ অভিপ্রায় কাহারও নহে। কারণ সকল ভাষারই শৈশব যৌবন আছে বলিয়াই সাধারণের প্রতীতি। বাঙ্গালার না হয় সেই শৈশব মনে করা যাউক ; যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালাকে গলহস্ত না দিয়া পুস্তকাদি লিখিলে সে ক্ষোভ নিরাকৃত হইতে পারে। তবে যদি বলেন যে লিখিয়াই যদি পড়িতে হইল, তাহা হইলে আমার না লেখাই ভালো—যদি এ কথা বলেন, আমি নাচার, নিরুত্তর।

পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ।

বিশুদ্ধ ভাবগ্রহ না হইলে রসের উদ্বোধ হয় না। ব্যাকরণে জ্ঞান না থাকিলে ভাবগ্রহ অসম্ভব। সেই জন্যই পঞ্চানন্দের রস হৃদয়স্থ করিতে অনেকে অসমর্থ। ইহাদের উপকারার্থ সচ্চিদানন্দকে (১) নমস্কার করিয়া পঞ্চানন্দী যে এই ব্যাকরণ, তাহা প্রণীত হইতেছে।

সংজ্ঞা-প্রকরণ।

দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান, মত্ততা ও উন্মত্ততা এই ছয় পদার্থে সংজ্ঞার লোপ হয়। পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে এই ছয় বর্জ্জিত। যাহারা বর্জ্জনে অক্ষম, এই ব্যাকরণের কোনও প্রকরণেই তাহাদের অধিকার নাই।

বিভাগনির্ণয়।

ব্যাকরণের পাঁচ অঙ্গ ;—বর্ণ-অঙ্গ, ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ, ভাব-অঙ্গ, ছন্দ-অঙ্গ, রস-অঙ্গ। এই পাঁচ অঙ্গে পঞ্চানন্দ সম্পূর্ণ।

১। বর্ণ-অঙ্গ ; যে অঙ্গে হ্রস্ব দীর্ঘ, উত্তর পূর্ব্ব, সকার-নকার প্রভৃতির বিড়ম্বনা, তাহারই নাম বর্ণ-অঙ্গ। বিড়ম্বনার কর্ত্তা নন্দী (২) এবং তাঁহার অনুচরবর্গ।

২। ব্যুৎপত্তি-অঙ্গ ; পঞ্চানন্দে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহার প্রকৃতি এবং বিকৃতি যে অঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহাকে ব্যুৎপত্তি অঙ্গ কহা যায়। ব্যুৎপত্তি সহজে হয় না, কারণ ইহা ঈশ্বরদত্ত ; সেই জন্য গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা অসম্ভব।

৩। ভাব-অঙ্গ ; যাহাতে শব্দবিন্যাসের চাতুরী বোঝা যায়, তাহাকে ভাব বলে। ভাব দুই প্রকার ; যাহারা বুঝিতে পারে, পঞ্চানন্দের সহিত তাহাদের সদ্ভাব ; যাহারা অবোধ, তাহাদের সমস্তই অভাব।

৪। ছন্দ-অঙ্গ ; যেখানে মাত্রার তারতম্য দেখা যায়, সেই স্থানকে ছন্দের বিষয়ীভূত বলা যায়। ফকীর চাঁদের মাত্রা, নেহালিনীর মাত্রা, ভুবনমোহিনীর মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন রকম। মাত্রার দোষে বা গুণে ঢলিয়া পড়িলে অথবা ঢলাইলে ছন্দোভঙ্গ হয় যাহারা ছন্দোভঙ্গ করে, তাহারা স্বতঃ বা পরতঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে লাইসেন লয়।

৫। রস-অঙ্গ। কটুকথা, বিচ্ছেদ, মান, ক্ষমা, মিলন—এই পাঁচ পদার্থ যে অঙ্গে

---

(১) "মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ"ও সচ্চিদানন্দকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা পরোপকারের জন্য,—

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥"

(২) নন্দী—প্রিণ্টার।

থাকে, তাহাকে রস-অঙ্গ কহে। পঞ্চানন্দের সর্ব্বাঙ্গেই রস; সেই জন্য এ সমুদয়ে পঞ্চানন্দের অধিকার সর্ব্ববাদি-সম্মত। কপালে ঘটেও সব।

বর্ণনির্ণয়।

যাহাদিগকে লইয়া শব্দ, তাহাদের প্রত্যেককে বর্ণ বলা যায়।

আদিতে চারি বর্ণ ছিল। অনুলোম প্রতিলোম ক্রমে ছত্রিশ বর্ণ দাঁড়াইল; ইহার উপরেও কতকগুলি বর্ণচোরা হইল। সুতরাং এখন বর্ণসংখ্যা উনপঞ্চাশের কম নহে।

বর্ণবিভাগ।

বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল।

যে বর্ণ নিরাশ্রয় হইলেও কার্য্যকর, অন্যের অবলম্বন না পাইলেও এক রকমে চলিয়া যায়, তাহার নাম স্বর। পঞ্চানন্দ স্বয়ং স্বর বর্ণ।

স্বর (১) দ্বিবিধ, তীক্ষ্ণ ও ভোতা। যাহা খট্ করিয়া মনে লাগে এবং ব্রহ্মজ্ঞানীরও মর্ম্মভেদ করিয়া চিত্তবিকার উৎপাদন করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ স্বর কহে।

সেই আক্রোশে অবশিষ্ট অংশকে ভোতা বলা হয়।

স্বরবর্ণ যাহাদিগকে চালায় অর্থাৎ পঞ্চানন্দ পাঠে যাহারা বিচলিত হয়, তাহাদিগকে হল্‌বর্ণ কহে। হল্ বর্ণ পরমুখপ্রত্যাশী হইলেও, চাষার অস্ত্র হইলেও তাহার উপকারিতা আছে; তাহার গুণে ভাবার অর্থাৎ পঞ্চানন্দের উৎকর্ষণ হয়।

বর্ণের উৎপত্তিস্থান।

১। মনের মধ্যে উদিত হইয়া কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও নাসিকার সাহায্যে অথবা কাগজ কালি কলমের সাহায্যে স্বরবর্ণ উৎপন্ন হয়। এই স্থানভেদ বা প্রকরণভেদ, অবস্থাভেদেও হইয়া থাকে; যথা নিদ্রা ও বিব্রত অবস্থায় স্বর নাকী হয়।

২। গালাগালিতে লোভ এবং অর্থে তিতিক্ষা সংযুক্ত হইলেই হল্ বর্ণ উৎপন্ন হয়। এরূপ না হইলে চাষার হাতে পড়িবে কেন?

সন্ধিপ্রকরণ।

একাধিক বর্ণ একত্র করিয়া ঘনিষ্ঠতা করিলেই সন্ধি হয়। সন্ধি হইলে মনের খট্‌কা যায়। যথা,—শ্রীক্ষেত্রে, হোটেলে।

সন্ধি দুই প্রকার,—স্বরসন্ধি ও হল্‌সন্ধি।

১। যেখানে মনের কোরকাপ মিটিয়া পঞ্চানন্দ এবং তাহার স্বরে সম্পূর্ণ একীভাব হইয়া যায়, সেইখানেই স্বরসন্ধি হয়। যথা, নযপঞ্জী।

২। হল্‌বর্ণ স্বরবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হইয়া মিলিত হইলে স্বরবর্ণে যদি পাঁচ

(১) স্বর (শর)

টাকা সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে হলসন্ধি হয়। এবং হলবর্ণের পর হলবর্ণ আসিয়া পঞ্চানন্দের তহবিলে মিলিত হইলেও হলসন্ধি হয়। উদাহরণ বাহুল্য মাত্র।

(টীকা :—গ্রাহকগণ কোনও কারণে চটিয়া গেলেই সন্ধির বিচ্ছেদ হয়। তাহাতে ভাষার অনিষ্ট, উভয় পক্ষের বলক্ষয়।)

নত্ব ও ষত্ব বিধান।

ইহার ধার পঞ্চানন্দ ধারেন না, ইচ্ছা থাকিলেও পরের জ্বালায় পারেন না। বাস্তবিক ষত্ব নত্ব এক প্রকারের গর্দ্দভের সেতু; যত্ব-নত্বের ভয়েই অধিকাংশ গর্দ্দভ বাঙ্গালা ভাষায় পারগ হইতে পারে না। পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে ভদ্রতা হইলে সত্ব, না হইলে নত্ব।

শব্দনির্ণয়।

পঞ্চানন্দ পাঠে যে স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনি পাঠকগণ করিয়া থাকেন, তাহার নাম শব্দ।

বিভক্তিনির্ণয়।

শব্দের পর বিভক্তি হয় অর্থাৎ হয় বিশিষ্টরূপ ভক্তির উদ্রেক হয় নতুবা ভক্তি বিগত হইয়া হাড়ে চটিয়া যাইতে হয়।

পদপ্রকরণ।

বিভক্তি যোগের পরেই পদের প্রয়োগ; যাহাকে যেমন পদ দেওয়া উচিত, তাহাকে সেইরূপ পদ দেওয়া যায়।

পঞ্চানন্দ তিন প্রকার পদ দিয়া থাকেন; সম্পদ, বিপদ, এবং একপ্রকার উপপদ, যাহার নাম অব্যয়।

পঞ্চানন্দের আবরণে যাহার নাম প্রকটিত হয়, তাহাদেরই সম্পদ্ যথা, মহারাণী স্বর্ণময়ী।

পঞ্চানন্দ যাহার ঘাড়ে চাপেন, তাহারই বিপদ, যথা, পঞ্চানন্দের সৌখীন সম্পাদক; পঞ্চানন্দের দায়গ্রস্ত পাঠক।

যাহারা গালাগালি খান, গালাগালি দেন, অথচ একটী পয়সা ব্যয় না করিয়াও ভজনার বারবারে পঞ্চানন্দ পাঠ করেন, তাঁহারা অব্যয়। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে অব্যয়ে বিভক্তি যোগ হয় না। উদাহরণ রাণী মুদি গলিতে (১) পাওয়া যায়।

বচন।

পদ প্রয়োগ করিতে হইলেই বচন আবশ্যক, বচন দুই প্রকার সুবচন ও কুবচন।

(১) কলিকাতার রাণীমুদিনীর গলিতে মদের খোলাভাঁটি ছিল; সেখানে অব্যয়ে মদ খাওয়া চলিত।

এক কথায় যাহার সঙ্গে কাজ হয়, একবার চাহিবা মাত্র যে দেনা পরিশোধ করে, তাহার প্রতি সুবচন।

অধিকাংশ লোকই বেয়াড়া, বহুবচনেও তাহাদের কিছু হয় না। অগত্যা কু-বচন।

পুরুষ।

পুরুষ ত্রিবিধ। আমি নিজে উত্তম পুরুষ, তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে তুমি মধ্যম পুরুষ। আমি তুমি ছাড়া (চক্ষুলজ্জার ভয় না থাকিলে) সকলেই কাপুরুষ। (নিকটবর্ত্তী হইলে একটু লজ্জা হয়, সুতরাং সেরূপ স্থলে সেই) তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম পুরুষ।

কারক।

যাহা দ্বারা পদপ্রয়োগ কালে সম্পর্ক বুঝা যায়, তাহাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্বন্ধ, অপাদান, অধিকরণ।

যিনি আহার যোগান, সুতরাং যাঁহার মন যোগাইতে হয়, তিনি কর্ত্তা। অবস্থা বিশেষে সকলেই কর্ত্তা হয়।

দায়গ্রস্ত হইয়া যাহা করিতে হয় তাহাই কর্ম্ম, সুতরাং পঞ্চানন্দী ব্যাকরণে সৎকর্ম্ম কুকর্ম্মের প্রভেদ থাকা অসম্ভব।

যাহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে হয়, সেই করণ। যথা, পঞ্চানন্দের উপলেখক সম্প্রদায়। যাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রাহকগণের সহিত পঞ্চানন্দের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তিনি সম্বন্ধকারক, যথা, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪৪ নং রসারোড ভবানীপুর।

যাহা হইতে পঞ্চানন্দ ভয় পান, যথা—বঙ্গীয় সমালোচক; যাহার কথায় পঞ্চানন্দ চালিত হন, যথা—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাহারা অপাদান কারক।

যেখানে যে দিন কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সেদিনকার অধিকরণ। টেক্স প্রভৃতির যে রকম উৎপীড়ন তাহাতে বোধ হয় যে, কিছুদিন পরে অধিকরণ একবারেই উঠিয়া যাইবে।

ধাতু।

যে সকল লোকের সহিত পঞ্চানন্দের আলাপ আপ্যায়িত, দহরম মহরম করিতে হয় তাহাদের স্বভাবকে ধাতু বলে।

প্রত্যয়।

অষ্ট ধাতুর লোকের সঙ্গে যখন পঞ্চানন্দের চলিতে হইতেছে, তখন বিশ্বাস না করিলে উপায় নাই। এই বিশ্বাসের নাম প্রত্যয়।

ধাতু বুঝিয়াই প্রত্যয় করা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রত্যয়ের পর অনেক ধাতুর রূপান্তর হয়।

সমাস।

এক স্থানে দুই চারিটা কথা হইলেই সমাস হয়। সমাস ছয় প্রকার।

১। সমশ্রেণীর কথা একত্র হইলে অর্থাৎ কথার উপর কথা বা যত বড় মুখ তত বড় কথা হইলেই দ্বন্দ্ব বলা যায়।

২। দ্বন্দ্বকারী উভয় পক্ষই যখন অশ্রাব্য প্রয়োগে হাট করিয়া তোলেন, তখন দ্বিগু বলা যায়।

৩। দোষগুণবর্জ্জিত কেহই নহে, অতএব সকলেই কর্ম্মধারয়।

৪। যখন পদে পদে একাকার হয়, বিভক্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, অনুমানের দ্বারা পাত্রাপাত্র স্থির করিয়া লইতে হয়, তখন তৎপুরুষ।

৫। যাহাদের নাম লইয়া সমাস, কাজের সময়ে যদি তাহাদের কোনও স্বার্থই সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে বহুব্রীহি সমাস বলা যায়। যথা, ভারত-সভা বলিলে ভারতের অনর্থ, সুতরাং সভা ব্যর্থ, কেবল গলাবাজী ও কলমবাজী বোঝায়।

৬। যাহারা বাপ পিতামহের টাকা তুহাতে অপব্যয় করিয়া শেষে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় কুলাইতে পারে না, অগত্যা অব্যয়ের ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাবের দৃষ্টান্ত শুঁড়ীর খাতায় ও ইনসালভেন্ট আদালতে পাওয়া যায়।

বর প্রার্থনা।

১। দয়াময়, তুমি আমার উপর সদয় হইয়া বর দিতে সম্মত হইয়াছ; এখন আমি মনোনীত করিয়া লইলেই হয়। কিন্তু দয়াময়, আমি বাঙ্গালীর ছেলে, নানা কাপে বিব্রত, বহুতর দায়গ্রস্ত; কি বর লইব, ভাবিয়া অস্থির হইতেছি।

২। দয়াময়, এ বিপদ্‌সাগরে তুমিই তরণী, এ তরণীতে তুমিই কর্ণধার, তুমিই আমার ভার গ্রহণ করো, যাহাতে আমার ভালো হয়, তাহাই করো। সকল কামনা জানাইতেছি; যেটা পূর্ণ করা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহাই করো।

৩। আমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, বিপুল ধনের অধিপতি করিয়া দাও। আমি খানা দিব, আপনি খাইব না, খানার সময়ে খানসামাবেশে দণ্ডায়মান থাকিব, বল্ নাচ যাহা আবশ্যক হইবে করিয়া দিব, আপনি দ্বাররক্ষকের ভাবে বাহিরে থাকিব, গাড়ী ঘোড়া রাখিব, তোমার সেবায় তাহা অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকিবে, তোমার নিয়োগ অনুসারে দান করিব, চাঁদা দিব, ভুগোলে জ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকিলেও তুমি কোনও দেশের নাম করিলেই আমি তাহার উপকারার্থে মুক্তহস্ত হইব। কানাচে হাহাকার উঠিলে শুনিব না, এ কর্ণদ্বয় তোমারই জন্য; সম্মুখে কেহ পড়িলে দেখিব না, এ চক্ষু-

দ্বয় তোমারই জন্য; অন্নের গ্রাস মুখে তুলিবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিব না. করদ্বয় তোমারই জন্য। দয়াময়, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, নবদ্বার লইয়া যাহা করিতে হয় করো, আমি কথাটী কহিব না। তবে, দয়া করিয়া, আমাকে উপাধিদানে কাতর হইও না, দেবপত্রে (১) ধন্যবাদ গানে বিমুখ হইও না; আমাকে মহারাজ (২) বলিও, আমি লোকের মাথা কামাইয়া দিয়া সকল সাধ মিটাইয়া লইব।

৪। দয়াময়, আমি তোমার বেতনভোগী ভৃত্য, অহরহ পদসেবায় নিযুক্ত আছি, এ দেহ তোমার অন্নে রক্ষা করিতেছি। আমি ভূমিশূন্য, আমাকে রাজা করিয়া দাও। আমি নীচ, আমাকে বাহাদুর করিয়া দাও। আমি তোমাকে অভিনন্দন দিব, তোমার যশোধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়া পথে পথে তোমার মহিমা সংকীর্ত্তন করিব, ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যাহা কুলাইবে, তোমার জন্য সকলই করিব। তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার কর্ম্ম, তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার মুক্তি, বাক্যে ইহা বলিব, মনে ইহা মানিব, শরীরের দ্বারা ইহার প্রমাণ দিব! সাত শ টাকার নবাবী তোমার মুখের কথায় হইতে পারে, তোমার তাহাতে লোকসান নাই, আমার সমূহ লাভ; দয়াময়, আমাকে তাহা দাও।

৫। দয়াময়, আমি পেটের জ্বালায় অস্থির, কাচ্চা বাচ্ছা আছে, পরিবার আছে, তুমি আমাকে বড় চাকরি দাও। কলঙ্কের ডালি মাথায় বান্ধিয়া, ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া, দুই হাতে তোমাকে নমস্কার করিব। আমি তোমার একান্ত অধীন, তোমার মন যোগাইতে আমি সকলই করিব। যাহারা আমার অধীনস্থ হইবে, তাহাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে পাইলেই আমার সকল অভাব পরিপূরিত হইবে! তুমি আমাকে চাকরি দাও।

৬। তোতা পাখী যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-গ্রস্ত হইয়াছি, ওকালতীর যোগ্য হইয়াছি। দয়াময়, আমাকে মোক্তারের ভগিনীপতি, জমিদারের ভাগিনেয়, আমলার শালীপতি ভাই কিংবা হাকিমের জামাতা যাহা হউক একটা করিয়া দাও, আমি লোক ভুলাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইব। দয়াময়, এখন যে গুনধা অপেক্ষা সুখতলার মূল্য বেশি, তাহাতে আমার দোষ কি!

৭। আমাকে দেশহিতৈষী করিয়া দাও; আমি যাহা ইচ্ছা বকিতে থাকিব, মাতৃ-ভাষায় শ্রীমুখ কলুষিত করিব না, তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, আমাকে পাগলাগারদে পাঠাইয়া দিও না। আমি অক্ষম, নানা রকমে নাচার, তুমি দয়া করো, আমি বড় হইব।

৮। দয়াময়, আমি জাতি মানি না, কারণ তাহা হইলে তোমার প্রসাদ খাইবার

---

(১) সরকারী গেজেটে।

(২) বেহার অঞ্চলে কোথাও কোথাও নাপিতকে "মহারাজ" বলে।

ব্যাঘাত হইতে পারে। আমার অভিমান নাই, তোমার পদধূলি গ্রহণ করাই আমার পরমানন্দ। আমার অহঙ্কার নাই, মস্তকে তোমার বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করাই আমার জীবনের মহাব্রত। আমার সাহস নাই, তোমার শাসন বাহুল্য মাত্র। আমার লজ্জা নাই; কেবল রচনে আমি অদ্বিতীয়। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বয়সের বিচার।

ধর্ম্মোপদেষ্টা যখন তখন বলিতেছেন,—"মুহুর্মুহু বয়স কমিয়া যাইতেছে, অতএব অনিত্য সংসারের চিন্তায় সতত নিরত না থাকিয়া হরিচরণে শরণ লও।" জড়বুদ্ধি ডাক্তার বলিতেছেন, "প্রতিক্ষণে বয়স বাড়িতেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বাড়িবে। তাহার পর সব ফুরাইবে। অতএব নিয়মপূর্ব্বক এখন খাও দাও, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেহ বজায় রাখিতে পারা যায়।"

এখন সমস্যা শক্ত, প্রকৃতপক্ষে বয়স বাড়ে কি কমে?

পঞ্চানন্দ এতদ্দ্বারা জানাইছেন যে, যিনি যাহা বলুন, বাস্তবিক বয়স বাড়েও না, কমেও না। যাহার যখন যত বয়স তখন ঠিক ততই বটে; কমও নয়, বেশীও নয়।

তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এরূপ বয়সের হ্রাসবৃদ্ধির সমস্যা উঠিল কোথা হইতে? উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

বয়সের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু বয়স স্থিতিস্থাপক পদার্থ, টানিলেই বাড়ে আবার ছাড়িয়া দিলেই কমিয়া যায়। এ হিসাবে বয়স তিন প্রকার; যথা,—

(১) যাহা বাড়েও না কমেও না তাহা আসল বা ঠিক বয়স। ইংরেজী নাম Realage.

(২) যাহা বাড়ে, তাহা পেশাদারী বয়স; পেশাদার হইতে হইলে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা দেখান আবশ্যক, সেই জন্য বয়স টানিয়া বয়স বাড়াইতে হয়, ইংরেজীতে ইহাকে বলে Professionalage.

(৩) যাহা কমে, তাহাকে বলে চাকরের বয়স। না কমাইলে অনেককে পেনসন লইতে হয়, সেই জন্য বয়স কমিয়া যায়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Official age.

(৪) আর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলে যে বয়স কমে, তাহাকে বলা যায় গরজের বয়স অথবা Selfish age; অতএব ধর্ত্তব্যই নহে।

দশ অবতার।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা ইতিহাস, দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কথা রূপক অলঙ্কারে সাজাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, সাদা সিধা কথায় প্রায় কিছুই বলেন নাই। মানবসমাজের উন্নতির ক্রম দেখাইবার জন্য দশ অবতারের যে কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্থলে তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই টুকু বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, দশ অবতার বলিলে সেই একই পদার্থ চিরকাল বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। শাস্ত্রকর্ত্তারা যুগে যুগে যেমন অবতার কল্পনা করিয়াছেন, পঞ্চানন্দ এই এক যুগেই সেই সমুদয় অবতার দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্তু এক বঙ্গদেশেই সমস্ত বিরাজমান। সুতরাং বঙ্গের এমন সৌভাগ্যের পরিচয় দেওয়াই পঞ্চানন্দের কর্ত্তব্য।

১।—সত্য যুগের অবতার।

এখন সত্য ত্রেতা দ্বাপর নহে মনে করিয়া যাহারা বঙ্গদেশে সত্যযুগের অবতার থাকা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক যেখানে ন্যায় রক্ষা, অন্যায়ের শাসন হইতেছে; যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপের লেশ মাত্র নাই; যেখানে ষোলো আনা পুণ্য—সেই রাজদ্বারেই সত্যযুগ।

সত্যযুগে চারি অবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ। রাজদ্বারেও এই চারি অবতার আছেন।

প্রথম, মৎস্য;—ইনি বঙ্গদেশের পুলিশ; গভীর জলে বাস, ক্রীড়াচ্ছলে যখন পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া নরসমাজে ভাসিয়া ওঠেন তখন দৃষ্টিগোচর; কোথায়ও চার পড়িলে ঝাঁকে ঝাঁকে উপস্থিত হইয়া ঘাট তোলপাড় করেন। আমিষের দোষে নিয়তই অপবিত্র, অথচ নহিলেও চলে না। কদাচ কখনও জালে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। দুই এক জন নিষ্কর্ম্মা লোক কখনও কখনও ছিপ বঁড়শিতে ধরিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে প্রায় ফল দর্শে না, লাভের মধ্যে চিন্‌চিনে রোদে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যায়, ও কখনও কখনও কাদা মাখা সার হয়। মৎস্যের আদর তৈলে, পুলিশেরও তাই।

দ্বিতীয়, কূর্ম্ম;—আদালতের আমলা। পিঠ বিলক্ষণ মজবুৎ। কৈফিয়তের কামাই নাই, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে অদ্বিতীয়। গালাগালি না দেয় এমন লোক দেখা যায় না, অথচ ভ্রূক্ষেপ নাই। হাত পা মুখ আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ ঘুশঘাস পার্ব্বনির বেলায় হাত পা ছেড়ে নখর পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকেন, আর, কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিতে পারিলে, মেঘগর্জ্জন না হইলে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। দেবতার ডাক মানুষের আয়ত্ত নয়, সেই জন্য প্রায়ই রক্ত মাংসের অংশ দিয়া ঘরে যাইতে হয়।

তৃতীয়, বরাহ;—খোদ মেজিষ্টার। যে দিকে গতি, সেই দিকেই মহাভীতির সঞ্চার, দংষ্ট্রাভয়ে লোক শশব্যস্ত। ভয়ানক গোঁ, কাহার সাধ্য ফিরায়? কোপ হইলে

ফুলের বাগান চষিয়া তাহাতে সরিষা বুনিবার যোগাড় করিয়া দেন! দূর হইতে নমস্কার করিয়া ইহার পথ ছাড়িয়া দেওয়াই সুবোধের কর্ম্ম।

চতুর্থ, নৃসিংহ;—জেলার জজ; দেওয়ানী বিচারের কর্ত্তা, কাজেই নর,—শান্ত, বিবেচনাপরায়ণ, হিতাহিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত। দাওরায় বসিলেই সিংহ, পশু হইলেও পশুর রাজা, তর্জ্জন গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমি থর থর কম্পবান্; অথচ ক্ষুদ্র শ্বাপদগণের রাজা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া ভয়যুক্ত ভক্তির পাত্র।

২।—ত্রেতাযুগের অবতার।

রাজদ্বারের পরেই বিষয়িসংসারের কথা বলিতে হয়। যাহার উপলক্ষে রাজদ্বারে গতিবিধি করিতে হয়, এবং শরণ লইতে হয়, সুতরাং যাহাতে পাদপরিমিত অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই বিষয়িসংসারেই ত্রেতাযুগ।

ত্রেতাযুগে তিন অবতার,—বামন, পরশুরাম, রাম। বিষয়িসংসারেও এই তিন অবতার।

প্রথম, বামন;—বঙ্গদেশে ইনি উকীল নামে পরিচিত। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যকে হাকিম বলা যায়। যিনি উকীল তিনি হাকিম নহেন, অথচ হাকিমের আবশ্যকীয় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইহার আছে, সেই জন্য ইনি বামন। ছলনা করাই উকীলের ব্যবসায়, সে জন্যও ইনি বামন। আর, ভিক্ষার ছলে 'দেহি দেহি' বলিয়া মক্কেলের কাছে উকীল যে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন, তাহাতে কত বলি-রাজাই যে পাতালস্থ হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইনি বামনাবতার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

দ্বিতীয়, পরশুরাম,—বঙ্গদেশের জমিদার, অতুলপ্রতাপ, সর্ব্বদা কুঠার হস্তে মার মার, কাট কাট, শব্দ করিতেছেন; জননী জন্মভূমির প্রতি দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই, কুঠার প্রহারে তদীয় মস্তকচ্ছেদন করিতেছেন, অথচ ধরাপতির একান্ত অনুগত এবং অকৃত্রিম ভক্ত; (উপাধির জন্য) ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃতর্পণ করিতে অসঙ্কুচিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তৃতীয়, রাম;—ব্রহ্মোত্তরভোগী। কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে দুই একটি প্রজা স্থাপন করিয়া ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদের নিকট কলাটা মূলাটা লইয়া তাহাদের মানমর্য্যাদা রক্ষা এবং যত্ন সম্মান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত জাতিশত্রু জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমারূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়া থাকে দেবতা-ব্রাহ্মণের—সরকার বাহাদুর ও বড়লোকের—প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনে অকাতর আর পেট ভরিয়া খাইতে পায় বলিয়া ভুজবলবিশিষ্ট।

৩।—দ্বাপরযুগের অবতার।

যাহাতে স্বার্থের সহিত দেশের মঙ্গল সমভাবে জড়িত, যাহাতে অজ্ঞতা ও সহায়হীনতা চৈতন্য এবং ক্ষমতার সহিত সমপরিমাণে বিভাজিত, এ কলিকালে সেই অর্থিসমাজেই দ্বাপরযুগ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দ্বাপরে দুই অবতার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধ; অর্থিসমাজেও দুই।

প্রথম, শ্রীকৃষ্ণ;—বাঙ্গালাসংবাদপত্র। চতুর, মন্ত্রণাবিশারদ অথচ স্বয়ং রাজত্ব করেন না, স্বয়ং যুদ্ধ করেন না; যাহার পক্ষাশ্রয় করেন, ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জাজ্বল্যমান; সকল ঘটেই বিরাজ করেন, সকলের কথাতেই থাকেন। ইহাঁর জয় হউক, ইহাঁর গৃহীত মন্ত্রের জয় হউক।

দ্বিতীয় বুদ্ধ;—বাঙ্গালার প্রজা। সমগ্র ভূমির উত্তরাধিকারী অতএব রাজপুত্র সদৃশ তথাপি সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক; নির্ব্বাণ মুক্তির প্রচারক, অন্নাভাবে মরিয়া গেলেই শান্তি, এই মন্ত্রের শিক্ষক। এখন ইহারা জাগিতেছে, অল্পে অল্পে চৈতন্য লাভ করিতেছে, সুতরাং বুদ্ধ।

৪। কলিযুগের অবতার।

কলিতে পুণ্য যৎসামান্য, কারণ, ধর্ম্ম লোপ পাইবে, ধার্ম্মিক কাগজের লোপ হইবে, সমস্তই একাকার হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ থাকিবে না, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, অথচ এক রকমে চলিয়া যাইবে। সে একাকার করিবার কর্ত্তা, অবতারের মধ্যে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবতার—কল্কী অর্থাৎ স্বয়ং পঞ্চানন্দ!

বিজ্ঞাপন।

১ নং।

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!!

পঞ্চানন্দের এসেন্ট-বোকামি-মিকশ্চার।

অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আরক।

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষানুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়। না সারিলে, কবুল জবাবের পত্র পাইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরত দেওয়া যায়।

সঙ্গতি বুঝিয়া বারে। অথবা চব্বিশ মাত্রা সেবন করিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য। নিয়ম না থাকাই এবং না রাখাই ইহার নিয়ম।

যাঁহারা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ চাহেন, ভারত-মাতাকে গাউন্ বনেট পরাইয়া নাচাইতে চাহেন, বাঙ্গালার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন, গলার জোরে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাধি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অনুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন; সভ্যতার খাতিরে মদ্যপান করিয়া থাকেন; নামকা-ওয়াস্তে ময়লা-কেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

আর, যাঁহারা কাগজের গ্রাহক হইয়া দাম দেন না, না বুঝিতে পারিলেও সমালোচন করিতে কাতর হন না, লিণ্ডলী মরের (১) সপিণ্ডীকরণ করিতেছেন, সেই জন্ম মাতৃভাষার ধার ধারেন না, তাঁহাদের অন্য উপায় নাই, এই মহৌষধ লইতেই হইবে।

সদর মফস্বলে প্রভেদ নাই,
ডাকমাশুলের চাপ নাই,
ছোট বড় বোতল নাই,
সমস্তই একাকার, সমস্তই সমান।
মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। (২)

বিজ্ঞাপন

২০।

সাধুতা! সরলতা!! সত্য কথা!!!

আজি কালি বিজ্ঞাপনের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়; বিজ্ঞাপন দিতে হইলেই অর্থ ব্যয় হয়। অতএব বিজ্ঞাপন দিলেই কিছু যে লভ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফাঁকি দিতে ইচ্ছা নাই, সেই জন্য সাধুর ন্যায় সরল ভাবে, এই সত্য কথার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, আমার বড়মানুষ হইবার অতিশয় ইচ্ছা। যাহার যেমন সঙ্গতি নগদ, নোট, মনিঅর্ডার, ডাকের টিকিট, যাহাতে সুবিধা হয়, আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেই আমি অব্যর্থ বড়মানুষ হইতে পারিব। বড়মানুষ না হইতে পারি, সমুদয় ফিরিয়া দিব। টাকা পাইবার অগ্রে, এবং টাকা পাইবার পরে আমার কেমন চেহারা হয়, ডাকমাশুল পাঠাইয়া দিলে, তাহার ছবি দেওয়া যাইবে।

(১) লিণ্ডলী মরে—ইনিও একজন ইংরেজী ব্যাকরণপ্রণেতা।

(২) বলা বাহুল্য, এই আড়াই টাকা পঞ্চানন্দের অগ্রিম মূল্য।

রসিদের টিকিট লওয়া যাইবে না। ডাকের টিকিট অথবা নোট পাঠাইলে টাকায় এক আনা বাটা দিতে হইবে।

পঞ্চানন্দতলা। } অর্থাকাঙ্ক্ষী এণ্ড কোং।

পরকালের উপদেশ।

(পাদ্রি পঞ্চানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত।

ভ্রান্ত নর! আর কত কাল এ মোহ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, ইহকালের ইন্দ্রজালে আকৃষ্ট হইয়া রহিবে? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করো, একবার ভাবিয়া দেখো, এ প্রকাণ্ড প্রশস্ত সংসারে তোমার কেহই নাই, তোমার কিছুই নাই। "আমার, আমার" বলিয়া যাহা লইয়া তুমি অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, বাস্তবিক তাহা তোমার নহে।

ঐ যে দিব্য বস্ত্রে তোমার কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তোমার নহে,—মাঞ্চেষ্টারের। উহাতে তোমার শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। এখনই যদি মাঞ্চেষ্টারের কোপ হয় কিম্বা বিরক্তি জন্মে, এখনই যদি মাঞ্চেষ্টার তোমাকে বলে—আর দিব না,—তাহা হইলে তোমার গতি কি হইবে? এমন ক্ষণিক প্রেমে আর মুগ্ধ হইয়া থাকিও না। অবিনশ্বর আচ্ছাদনের উপায় করো।

তুমি কাচের দোয়াতে বিলাতি কালি রাখিয়া লৌহের লেখনীতে বিদেশজাত কাগজে লিখিয়া করকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিতেছ; তুমি বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চির-স্থায়িনী কীর্ত্তি সম্পাদনের প্রলোভনে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছ, জাহাজে পেষ্টবোর্ড আমদানি করাইয়া তদ্দ্বারা তোমার গ্রন্থের আবরণ দৃঢ় করিবার ভান করিতেছ, কলের সূচে কলের সূতা পরাইয়া পত্রের পর পত্র যোজনা করিতেছ—সত্য; কিন্তু ভ্রমান্ধ নর! এ সমুদায়ই ফক্কিকার! ইহার মধ্যে তোমার কিছুই নহে। মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখো,—সকলই অন্ধকার দেখিবে! ও কি করিতেছ? দেশালাই জ্বালিলে কি হইবে? ও আলোকে এ অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে। তাহার পর, তুমি যে দেশালাই জ্বালিতেছ, তাহাও যে তোমার নহে। অজ্ঞান! এ কথা এখনও বুঝিতে পারিলে না।

পাপের কুহক অতি ভয়ঙ্কর কুহক। এ ছলনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যত্নশীল হও। যে জুতা প্রকৃত পক্ষে তোমার মস্তকের উপর রহিয়াছে, ইহকালের আশু সুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই জুতাকে তোমার চরণাভরণ বা চরণ-রক্ষণের পদার্থ মনে করিতেছ। এ জুতা তোমার নহে। কারণ তাহা তোমার সঙ্গের সঙ্গী নহে।

প্রাঙ্গণে, গৃহমধ্যে, ঝাড় লণ্ঠন জ্বালিয়া, বিচিত্র চিত্র-শোভিত গৃহভিত্তিতে দৃষ্টিপাত করিয়া, ফেটনযানে বিচরণ করিয়া, তাড়িত তারে মুহুর্মুহুঃ তোমার আত্মীয় স্বজনের কুশল বার্ত্তা আনাইয়া, তুমি স্বীয় ধন-গৌরবে মত্ত হইতেছ, তোমার ঐশ্বর্য্য মনে করিয়া সুখানুভব করিতেছ, পরকালের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিতেছ। কিন্তু বৃথা এই ঐশ্বর্য্য; মিথ্যা এ গৌরব। মূর্খ! যে লৌহ-সিন্দুকে তোমার কোম্পানীর কাগজ, তোমার নোট, তোমার টাকা রহিয়াছে—তাহাও তোমার নহে। মায়া-পাশ ছিন্ন করো, একবার পরকালের দিকে দৃষ্টিপাত করো।

তোমার আয়-ব্যয়ের গণনা করিয়া অহঙ্কৃত হইতেছ। নির্ব্বোধ! তোমার আবার আয় কোথায়? এ কেরাণিগিরিতে তোমার যেমন অধিকার নাই, এ জমিদারিও সেইরূপ তোমার নহে। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন যদি এইমাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমি নিঃসহায়, নিরুপায়, নিরবলম্ব, নিঃসম্বল। অতএব, ক্ষণে ক্ষণে মনে রাখিবে—যিনি দিতে পারেন, যিনি দিয়াছেন, যিনি দিতেছেন—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছামাত্রেই কাড়িয়া লইতে পারেন, অথবা অশেষ প্রকারে তুমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারো।

নাস্তিক! তোমার এ বিষম ভ্রম পরিহার করো, আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করো, যমদণ্ড হইতে অব্যাহতি-লাভের বিধান করো! অদ্যকার ক্ষণিক সুখে আপ্লুত থাকিয়া, তুমি টপ্পানবিশী করিয়া, গায়ে ফুঁ দিয়া, মধুর স্বরে গলাবাজি, বা ভাবের ভণ্ডামি করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার ভ্রমে তুমিই ভুলিতেছ; তাঁহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি তোমার গর্জ্জনে ভীত নহেন, তোমার উপহাসে কাতর নহেন, তোমার ভ্রান্ত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না।

অবোধ! হেলায় সব হারাইতেছ। পরকাল তোমারই হস্তে রহিয়াছে; যাহাতে রক্ষা পাইবে, তজ্জন্য চেষ্টিত হও।

বিজাতীয় বর্ণমালায় স্বজাতীয় ভাষা লিখিবার বক্তৃতা।

(Roman-অক্ষর সভার আগামী অধিবেশনে জনৈক মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক কর্ত্তৃক যাহা পঠিত হইবে।)

ভদ্রাভদ্রগণ অর্থাৎ লেডীZ এবং জেণ্টলমEন,—

বেদবিধির উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, লোকাচার এবং দেশাচারের শীর্ষদেশে উপানৎ প্রহার করিতে পারা যায়, আত্মাকে নরকস্থ করিতে পারা যায়, কিন্তু সাহেবের অনুরোধে অবহেলা করিতে পারা যায় না, সাহেব-ঘেঁসা বাঙ্গালীকে অসন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না, তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে

আপনারা সকলেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ; সৌভাগ্যবলে আমার পিতৃভোগ্য অপক্ক-কদলী-সিদ্ধ-সহায়-অন্নরাশিকে পরিবর্জ্জন করিয়া এখন যে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া কণ্টক-কর্ত্তরীর সাহায্যে পাদুকাসমেত, ভ্যাবত্যংশ স্বচ্ছন্দে উদরগত করিবার যোগ্য হইয়া আর্য্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে সমাধিক সম্মান লাভ করিতেছি, তাহা আমি জানি এবং সে সৌভাগ্যের বিধাতা কে, তাহাও আমি জানি। এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাদের অবিদিত নাই।

তবে জিজ্ঞাসা করি, সাহস সহকারে অকুতোভয়ে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, স্বজাতীয় ভাষায় বিজাতীয় বর্ণমালার প্রয়োগ হইলে যদি গৌরজনরঞ্জন হয়, তবে তদ্রূপ প্রয়োগবিধানে আমরা কেন নিরস্ত থাকিব? আমরা কি জন্য যত্নপর হইব না? আমাদের উদ্যম সফল হইবে না, আমরা উপহাসাস্পদ বা নিন্দাভাজন হইব, সে আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। সৎসঙ্গই কাশীবাস—ব্যাসকাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাপাতকে পতিত হইব কেন?

ভদ্রগণ, যেখানে উদ্দেশ্য সাধু, সেখানে তৎপোষক যুক্তির অভাব হয় না। স্বজাতীয় অক্ষর বর্জ্জনের সঙ্কল্প যে অতি মহান, তৎপক্ষে সংশয়ের স্থল নাই। প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক্ বর্ণমালা থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিগণের আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া প্রযুক্তই যে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহাদির প্রশ্রয় হইয়াছে, তাহা কে না বলিবেন? তুমি যবন, তোমাকে কন্যাদান করিব না, তোমার সহিত ভোজাদিতা করিব না—এ কথা বলিলে যে দোষ,—তোমার ভাষা স্বতন্ত্র, অতএব তোমার ভাষাকে আমার অক্ষর দিব না, অথবা আমার ভাষায় তোমার অক্ষর লইব না—ইহা বলিলে যে তদপেক্ষা গুরুতর দোষ হইতেছে, তাহা কি চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে?

"জাতিবাৎসল্য" শব্দ অভিধান হইতে, ভাষা হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উচিত। তুমি যদি জাতিবৎসল হও, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যের শত্রু, পরম শত্রু। কারণ, তোমার হৃদয়ে পার্থক্যরূপ মোহাগ্নি প্রজ্জলিত রহিয়াছে, আর পার্থক্যই সমস্ত অনিষ্টের মূল। ভ্রান্তি পরিহার করো, প্রশস্ততা অভ্যাস করো, বদান্যতা শিক্ষা করো,—তবে তুমি নিজের উপকার করিতে পারিবে, সংসারের মঙ্গল করিতে পারিবে। যদি সাধুতা থাকে, তাহা হইলে জাতীয় পার্থক্যের বিনাশ করো, ভাষার পার্থক্যের লোপ করো, এবং যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়াও নিজ মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করো। অক্ষরই লিখিত ভাষায় প্রাণ, সাহিত্যের অস্থি মাংস—সেই মূলে কুঠারাঘাত করো।

বিদেশী এই আর্য্য জাতির ভাষা শিখিতে পারে না, সুতরাং যথোচিত সৌহার্দ্দ

বিদেশীর সহিত জন্মিতে পারে না। কিন্তু শিখিতে যে পারে না, তাহার কারণ কি? শুদ্ধ, বর্ণমালারূপ অন্তরায়ের দোষে। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স, কোল্‌ব্রুক, মোক্ষমূলর, কাউয়েল্ প্রভৃতি ব্যক্তির নাম যাহারা করে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। পৃথিবীতে মনুষ্য-সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বলিয়া কি হরিতালের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবে না? অথবা ব্যবহার প্রচলিত করিতে হইবে না? যাহাতে এক ব্যক্তিরও অসুবিধা বা ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহার অপনয়ন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য; বিকলবুদ্ধি ব্যক্তির নিমিত্তেও যত্ন করা একান্ত উচিত। বর্ণমালা লোপ করিয়া দাও, দেখিতে পাইবে পৃথিবীতে একটিও স্বতন্ত্র ভাষা থাকিবে না। তখন বিকৃতির বিলোপ হইয়া আবার প্রকৃতির জয় হইবে।

সাধারণতঃ বর্ণমালার দোষ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। একবার দেবনাগর বর্ণমালার পৃথক্ বিচার করা যাউক।

ভদ্রগণ! দেবনাগর অক্ষরের সবিশেষ দোষকীর্ত্তন করিতে হইলে শীতকালের রজনীরও প্রভাত হয়। সে পণ্ডশ্রমে আমি লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। দুই চারিটা মুখ্য দোষের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আদৌ, দেবনাগরের নামেই দোষ। যে সভ্য সমাজে নরনাগরের লাঞ্ছনা, সে সমাজে ভাষায় নাগর থাকিবে, ইহা অতি অসঙ্গত। তাহার উপর, দেবনাগর কোনও জীবন্ত ভাষাতেই প্রযুজ্য নহে। তবে, বলুন দেখি, দেবনাগর কোন্ লজ্জায় রাখা যাইবে?

আপনারা অবগত আছেন যে, অন্ধকে অন্ধ বলিলে, মূর্খকে মূর্খ বলিলে সে দুঃখিত হয়, রাগ করে। সংস্কৃতজ্ঞ অনেক লোক বায়ুগ্রস্ত, তাহাও আপনারা জানেন। যে বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা নিয়তই বায়ুসংখ্যা মনে করাইয়া দেয়, তাহার সংরক্ষণ করিতে গিয়া কোন্ মতিমান্ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আত্মক্ষতি সাধন করিতে পারেন? আমার অনুরোধ,—আসুন, আমরা উনপঞ্চাশৎ সভ্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া দুরন্ত বর্ণমালার বিনাশ করিয়া সফলমনোরথ এবং নির্ব্বিঘ্ন হই।

দেবনাগর বর্ণমালাই ভঙ্গভাবাপন্ন হইয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং তাহার দোষোদ্‌ঘোষণ, বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র। এই উভয় বর্ণমালাই দুর্ব্বল; নিজ ভাষার কার্য্য ব্যতীত অন্য ভাষার লিপিকার্য্যে সক্ষম হইবার শক্তি ইহাদের নাই। দুর্ব্বলের মরণই মঙ্গল, অতএব এ বর্ণমালার যত শীঘ্র বিলোপ হয়, ততই উত্তম।

এখন দেখা যাউক, উপযোগিতা পক্ষে ইংরেজী বর্ণমালা কত অংশে শ্রেষ্ঠতর। বৈয়াকরণেরা বারম্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইংরেজজাতীয় মনুষ্যের ন্যায়, ইংরেজী বর্ণমালাও স্বাধীন। কি মনুষ্যের, কি বর্ণের, কোনও কার্য্যই ইহাদের অকরণীয় নহে, অথচ কোনও কার্য্য ইহাদের নির্দ্দিষ্টও নহে। আমাদের যেমন

ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হইবে, জুতা বেচিতে পাইবে না, সেইরূপ 'ক' 'ক'ই থাকিবে, 'ছ'র কাজ করিতে পাইবে না। কিন্তু ইংরেজের শক্তি দেখুন, প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতে যেমন উপযুক্ত, হল চালনাতেও সেইরূপ, বরং ততোধিক উপযুক্ত। ইংরেজী স্বরবর্ণের মধ্যে যাহাকেই লউন, কেহই নিয়মিত কার্য্যের দাস নহে। এখন যিনি "এ" অন্য সময়ে তিনি "আ," কখনও বা "অ" তখনই আবার "অ্যা"—বাস্তবিক ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। "S" ঘরে নাই, "C" তাহার কাজ করিয়া দিবে; "K" অনুপস্থিত, সেখানেও "C" কাজ করিতেছে। কি মাহাত্ম্য! কি উদারতা! কি অমিত পরাক্রম! এমন মানুষ নহিলে কি মানুষ! এমন অক্ষর নহিলে কি অক্ষর!

আবার দেখুন। ঐ এ, বী, সী, ডি, বর্ণমালা কেবল যে ইংরেজের বা ইংরেজী ভাষার ক্রীতদাস, তাহা নহে। নানা ভাষায়, নানা দেশে ইহাদের প্রসার; আর যেখানে যেমন ইচ্ছা, শক্তি প্রদর্শন করিতেছে। অধিকন্তু অক্ষরগুলির গাম্ভীর্য্য এবং মর্য্যাদা বোধও প্রচুর;—শব্দের মধ্যে, মূলে, বা অন্তে অক্ষর বিরাজ করিতেছে, অথচ নীরব, নিস্পন্দ। এ শক্তি, এ আত্ম-সংযমনের ক্ষমতা অন্য কোনও বর্ণমালারই নাই। ঐ একই অক্ষর দিয়া ফরাসি লিখিতেছে, ইংরেজের তাহা অনুচ্চার্য্য; ইংরেজ লিখিতেছে, ব্রাণ্ডের তাহা অনুচ্চার্য্য। বস্তুতঃ, যতই প্রবেশ করিয়া দেখা যায়, ইংরেজী বর্ণমালার গুণে ততই মোহিত এবং বিস্মিত হইতে হয়।

সকল পদার্থই পঞ্চভূতাত্মক। স্বরবর্ণই লিপিকার্য্যের আত্মাস্বরূপ। ইংরেজীতে পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ স্বরবর্ণ! অহো! কি আনন্দের বিষয়!

পঞ্চভূতে সংসার চালাইতেছে, আমরাও চালাইব। পঞ্চ স্বরবর্ণেই ভাষা চালাইব, তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

পর্য্যায় অনুসারে ধরিলে, প্রথমতঃ ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন ভাষা জানিতে হইলে, অগ্রে ব্যাকরণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। স্বজাতীয় সাহিত্যের জন্য বিজাতীয় বর্ণমালার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাতে আর দোষ রহিল কোথায়?

আর, যদি শাস্ত্র মানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পঞ্চ স্বরাত্মক বর্ণমালাকেই যে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। পঞ্চভূতেই সকল পদার্থ নির্ম্মিত, অথচ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের পার্থক্য নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা বা ক্লেশ নাই; যে পাঁচ ভূতে উমেশ, সেই পাঁচ ভূতেই রামদাস,—তথাচ রামদাস শুইয়া আছে, তাহাতে উমেশের বসিয়া থাকার ব্যাঘাত নাই এবং উমেশকে চিনিয়া লইতেও কষ্ট নাই। যতগুলি পৃথক্ পৃথক্ স্বরধ্বনির প্রয়োজন, এই পঞ্চ স্বরেই আঁকড়ি, বিন্দু, ফুট্‌কি ইত্যাদি দিয়া লইলে ততগুলি পৃথক্ স্বরই পাওয়া যাইবে, অথচ মূলে যে পঞ্চস্বর, সেই

পঞ্চস্বরই রহিয়া যাইবে। এ প্রকার বিচিত্র কৌশল আর কোথায় আছে? তবে কেন দেশীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব? বর্ণের দেশীয় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে, রাখিয়া দাও, কিন্তু দেশীয় মূর্ত্তি কখনই রাখা যাইতে পারে না। কোট্‌ পেণ্টুলুনধারী তেঁতুলে বাগ্‌দীর সম্ভ্রম রেলওয়ে ষ্টেশনে যে দেখিয়াছে, ইংরেজী বর্ণমালায় সজ্জিত দাশুরায়ের পাঁচালীর গৌরব সে-ই বুঝিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা অবগত আছেন যে, "কলিশেষে একবর্ণ হইবে যবন।" তবে কি আর বর্ণভেদ রাখা শোভা পায়? আইস ভদ্রগণ, শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়া কল্কী অবতারের সহায়তা করি। কৃতকার্য্য হইলে আমরাও ক্ষুদ্র অবতার হইতে কেন না পারিব?

উপসংহারে আর একমাত্র কথা বলিব,—মুখে সকল বাঙ্গালীই পঞ্চশরের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করেন, ব্যবহারেও তাহার অনুগমন করেন; কিন্তু লিখিবার বেলায় এত স্বরবাহুল্য কেন? পূর্ব্বাপর অসংলগ্নতা জন্য বঙ্গবাসীর কি লজ্জিত হওয়া উচিত নহে? গর্দ্দভের একমাত্র স্বর—অথচ সেই এক স্বরেই গর্দ্দভ ইহ জগতে অদ্বিতীয়। আইস, বন্ধুগণ, যত্ন করি, এখন পঞ্চস্বর অবলম্বন করি, ক্রমে আমরাও একস্বরে অদ্বিতীয় হইতে পারিব।

যাহা হউক, বলিয়া কহিয়া দিলেও, শিক্ষাবলে অভ্যাস করিয়াও যাহারা "Ami chalilam" দেখিলে "আমি চলিলাম" পাঠ করিতে পারিবে না, তাহারা শিবের অসাধ্য; তাহাদের জন্য আমাদের প্রতিপত্তি, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের দূরদর্শিতা নিবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি কখনও প্রকৃত উন্নতি হয়, যদি কখনও বরক-শাম্পেনে শালগ্রামের "শীতল সেবা" হয়, তবে জানিবেন, সে আমাদের কর্ত্তৃকই হইবে।

খেপা খগেশের টিপ্পনী (১)।

১।—আমি ক্ষেপা, না, তোমরা ক্ষেপা? তোমাদের যদি ফুরসুৎ থাকে, তবেই আমাকে দেখিয়া এক আধ-বার তোমরা হাসিয়া থাকো। অথচ মাথা মুণ্ড কি যে করিতেছ, কেন যে তোমরা সদা শশব্যস্ত, তার ঠিকানা নাই। আমি সারা দিন-রাত হাসি, তোমাদিগকে দেখিলেও হাসি, না দেখিলেও আপন মনে, মনে মনে হাসি। ক্ষেপা তোমরা, না ক্ষেপা আমি?

২।—উকীল দেখিলেই "হরি হরি বলো—হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে আমার ইচ্ছা হয়। উকীল হইলেই মানুষের আশা ভরসার, শিক্ষা-পরীক্ষায়, কার্য্য-বীর্য্যের অবসান হয়। একটি একটি উকীল হয়, আর বঙ্গদেশ এবং বঙ্গভাষা গঙ্গা

ধরাধরি করিয়া এক-এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া থাকে। মরণ নানা প্রকার, তাহার মধ্যে উকীল হওয়া এক প্রকার। পয়সা খরচ করিলে উকীলে কথা কয়, না করিলে কয় না। পয়সা খরচ করিলে কলেও শব্দ বাহির হয়, আর্গিনেও সঙ্গীত হয়।

৩।—বিবাহ আর শ্রাদ্ধ একই রকম জিনিষ। লুচি, মোণ্ডা, ধুম, ধাম, আসা যাওয়া দুইয়েই আছে। আর, শ্রাদ্ধের সময়ে টের পায় না—যার শ্রাদ্ধ, সেই; বিবাহের সময়ে টের পায় না—বর। যে শ্মশানে মড়া যায়, সেখানে প্রেতের অভাব নাই, যে বাসরঘরে বর যায়, সেখানেও প্রেতিনী অর্থাৎ পেত্নীর অভাব নাই। আমি এখন চিন্তা করিতেছি, বিবাহ করি কি মরি। এখন ঝোঁক বিবাহের দিকেই। তাতে বেঁচে মরা হবে।

৪।—লোকে পড়ে না, কেন না পড়িবার উপযুক্ত বই নাই। লোকে লেখে না, কেন না পড়িবার প্রবৃত্তি কাহারও দেখা যায় না। পৃথিবীতে যত বন্দোবস্ত আছে, তার মধ্যে এইটি আমার মনের মতন।

৫। চাকরির বড় ভক্ত বলিয়া বাঙ্গালীকে অনেকে অভিসম্পাত করে, ঠাট্টা করে, গালাগালি দেয়; অথচ এটা বোঝে না যে, স্বাধীন কাজে অক্ষম বলিয়াই বাঙ্গালী চাকরির জন্য এত লালায়িত। স্বাধীন কাজে যে অক্ষম, তাহার কারণ এই যে, সকলেই চাকরির চেষ্টায় ব্যস্ত, সুতরাং কাজ শেখে কে, শেখেই বা কখন?

৬—দেবতার কাজ অনুগ্রহ, কি, নিগ্রহ, তাহা বলিবার যো নাই। বৃষ্টির জলে কাহারও ফুটো ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাহারও দেয়ালের জন্য কাদা করিবার মজুর-খরচ বাঁচিয়া যায়। হিন্দুরা বলে, রাজাও দেবতা।

৭—ব্যারাম হইলে লোকে যে চিকিৎসা করায়, তাহার কারণ এই যে, মৃত্যু আশ-ঙ্কার স্থলে ঋণ পরিশোধ এবং দান ধ্যান করিয়া পরকালের পথটা পরিষ্কার রাখাই সুবোধের কর্ম্ম।

৮—সে দিন যোগাচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন যে, সঙ্গে বিষয় আইসে নাই; সঙ্গে বিষয় যাইবেও না, অতএব বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করাই উচিত। যোগাচার্য্য এক ক্ষেপা, নহিলে এমন কথা বলিতেন না। বিষয় যদি সঙ্গে যাইত, অর্থাৎ আমি মরিলে যদি বিষয়ও মরিত, তবে বিষয়ের জন্য ইচ্ছা করিতাম না। কিন্তু বিষয় যে রাখিয়া যাইব! যাহা যাইবে তাহাই মাটী, যাহা রাখিতে পারিব, তাহাই ত আমার।

৯—সকলেই বলে সময় যাইতেছে, অতএব নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকা অবৈধ। পাগল আর কি? সময় কি একা যায়? সকলকে সঙ্গে করিয়াই সময় যায়। তুমি যখন নিদ্রিত, তখনও তুমি সময়ের সঙ্গে যাইতেছ। বিশ্বাস না হয়, বরাবর ঘুমাইয়া থাকিয়া দেখ, তুমিও সময়-মত মরিবে! যে বলে—সময় কাহারও হাত-ধরা নয়, সে মিথ্যা বলে; সময়ের সঙ্গে এত হাত-ধরাধরি যে, ছাড়াইবার যো নাই!

১০—মানুষ স্বভাবতঃ বস্ত্রচ্ছদ-বিহীন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই মনুষ্যের আদি বাস; ক্রমে সভ্যভব্য হইয়া শীতপ্রধান দেশে গমন করিয়াছে। অতএব যাহারা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহারা জানোয়ারবিশেষ।

১১—বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নাই, তবে জাহাজে চড়িয়া বিদেশ গেলে জাতি যায় কেন? জাতি নাকি খুব পুরাতন প্রাচীন সামগ্রী, তাই বোধ হয় সমুদ্রের জলে লোণা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

১২—সকলেই যদি চিন্তাশীল হয়, আর সকলেই নিজ নিজ চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, সাহিত্য বিজ্ঞান লোপ পায়, পড়া শুনা কেহ করে না, অবশেষে সমস্ত লোকই মূর্খ হয়। নবদ্বীপে মূর্খ, গয়াতে ভূত—থাকাটা দরকার!

১৩—আমি প্রবৃত্তির দাস, নাকি, প্রবৃত্তি আমার দাস, তাহা আজিও স্থির করিতে পারিলাম না। ছানাবড়া দেখিলে, খাইতে ইচ্ছা করে, এস্থলে প্রবৃত্তি আমাকে চালিত করিতেছে; আবার সর্ব্ব-প্রথম ছানাবড়া যখন খাইতে হইয়াছিল, তখন প্রবৃত্তিও করিয়া লইতে হইয়াছিল, সেখানে প্রবৃত্তিই আমার দাস। কথাটা খুব শক্ত, কিন্তু তত দরকারি নয়। অথচ এমনি ভাবনা ভাবিয়া পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে।

খেপা খগেশের টিপ্‌নী (২)।

১—সব যাইবে, নাম থাকিবে। উত্তম কথা; কিন্তু পৃথিবীই যদি যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কি নাম থাকিবে?

২—বিচ্ছেদই স্বাভাবিক; আত্মীয়তা, সদ্ভাব, প্রণয় বা মিলন কেবল ভণ্ডামি অথবা কাজ হাসিল করিবার ফিকির মাত্র। পৃথিবীতে আসিবা মাত্রেই পরমাত্মীয় জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, মরিবার সময়ে পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ; আর এই দুইটিই স্বভাবসিদ্ধ কাজ! তবে, নাট্যশালার অভিনয় করিবার জন্য যত যাহাই দেখাও, আসলে সব ফাঁকি।

৩—বিদ্যা শিক্ষা এবং চৌর্য্যক্রিয়াতে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। পরের ধনে স্বার্থসাধন উভয় কর্ম্মেরই অভিপ্রেত। তথাপি যে, লোকে চোরের উপর এত রাগ করে, সেই জন্যই বিদ্বান্ অপেক্ষা অর্থশালীর সম্মান এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

৪—উপার্জ্জনের প্রধান উপায়, অনিচ্ছা প্রদর্শন। খাইতে বসিয়া আর লইব না বলিলেই, পরিবেষ্টা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। আহারে মানুষের প্রয়োজন নাই

বলিয়া আমেরিকায় এক ব্যক্তি দিনকতক উপবাস করিয়াছিল; তাই দেখিয়া লোকে তাহাকে এত অর্থ দিয়াছে যে, এখন তিন পুরুষেও আর তাহার অন্নচিন্তা হইবে না।

৫—কৃষিজীবীদের ভূমির উপর বড়ই মায়া। যে কৃষিজীবী সে চাষা; চাষা বলিলে গালাগালি হয়, অসভ্য বুঝায়। পাছে কেহ অসভ্য বলে, এই ভয়ে অনেক লোক জন্মভূমির প্রতি মমতা প্রদর্শন করে না।

৬—যিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, সকলে তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করে। তবে যে এত রিফু করিয়া, ছেঁড়া যুড়িয়াও দর্জীর গৌরব নাই, তাহার হেতু এই যে, দর্জী ধনবন্ত নহে. পেটের দায়েই অস্থির। বাস্তবিক যত প্রকার পাপ এবং যত প্রকার অপরাধ আছে, সমুদায়ের চেয়ে পেটের দায় গুরুতর।

৭—অবিশ্বাস যদি সংসারে এত অধিক প্রবল না হইত, তাহা হইলে লেখাপড়ারও এমন আদর হইত না।

৮—দোকানদার লোক অতিশয় মূর্খ। সে দিন একটু কাপড়ের দরকার হওয়াতে, আমি এক দোকানে গিয়া কাপড় চাহিলাম; দোকানদার আমার নিকট টাকা চাহিল। টাকা আমার নহে, কাহারই নহে, টাকা রাজার, সুতরাং আমি হাতে করিয়া দিলেও আমার টাকা দেওয়া হইবে না, এই কথা দোকানদারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি টাকা দিতে অসম্মত হইলাম, কিন্তু তথাপি তাহার ভ্রম গেল না। এমন মূর্খের সহিত ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমিও আর কাপড় লইলাম না, রাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, রিপুদমনেই মনুষ্যত্ব; রাগ একটা রিপু। আবার দোকানদারের কাছে যাইব কি না, ভাবিতেছি।

৯—অগ্নিকে সর্ব্বভুক্ বলে, সেটা ভুল। জলে তেলে একত্রে দিলে অগ্নি তেল-টুকু চুষিয়া লয়, জল পড়িয়া থাকে। অগ্নি সর্ব্বভুক্ নয়, সারগ্রাহী বটে।

১০—আপনার সুখ্যাতি আপনি না করিলেই অখ্যাতি হয়। তুমি একটি টাকা আমাকে দিলে, তাহার বদলে আমি তোমাকে সতরো আনা পয়সা দিলাম। যদি চারি পয়সা অতিরিক্ত দানের কথা নিজ মুখে আমি বলিয়া দিই, তবে আমি সদাশয় লোক; যদি সে কথাটা না বলিয়া দিই, তাহা হইলে সকলেই বলিবে আমি বিষয়-বুদ্ধিহীন বোকা।

১১—মনের মত না হইলে সত্য কথাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। দুষ্টেরই শাসন করা বিধি, নির্ব্বোধের শাস্তি হইতে পারে না। কিন্তু চোর যদি বলে যে, আমি বোকা নহিলে চুরি করিব কেন, আর যদি চুরি করি, তবে ধরা পড়িব কেন? তাহা হইলে, কথাটা যদিও সত্য কিন্তু বিচারকের মনোমত হয় না, সেই জন্য তিনি সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া, চোরকে দুষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। ফলে এই হয় যে, যে আসল বোকা, সেই দুষ্ট, আর যে আসল দুষ্ট, সে বোকা প্রতিপন্ন হয়।

১২—যাহার যাহা নাই, সে তাহাই ভিক্ষা করে। কিন্তু কাণাতে চক্ষু ভিক্ষা করে না। সুতরাং জানা গেল যে, যাহা কিনিতে মেলে না, তাহা ভিক্ষা করিলে পাওয়া যায় না; সেই জন্য কেহ তাহা ভিক্ষা করে না। অতএব ভিক্ষা করাই ভুল, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া আনাই কর্ত্তব্য।

১৩—বিদ্যাকে অমূল্য ধন বলে কেন? ঘরের পয়সা খরচ আর শরীর মাটি না করিলে বিদ্যালাভ হয় না। যদি বলো, মূল্য দিলেও অনেকে পায় না, তা এমন অনেক জিনিষই ত পাওয়া যায় না? বাজারে আলুর আমদানি নাই, তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, আলু অমূল্য ধন?

সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য।

(চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ হইতে উদ্ধৃত)

পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানবজাতিকে যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, অদ্য সুশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক তাহার একমাত্র অধিকারী। তুমি অশিক্ষিত বর্ব্বর, তোমার এ সমস্ত গুণ না থাকা প্রযুক্ত তুমি নিয়ত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া যৎকথঞ্চিৎরূপে জীবন যাপন করিতেছ মাত্র। তোমার ঐশ্বর্য্য নাই, তোমার আধিপত্য নাই, তোমার গাড়ী ঘোড়া নাই, তোমার ঝাড় লাণ্ঠান নাই, তোমার এ সমস্ত কিছুই নাই, আমার আছে। তোমার সেই জন্য দুর্ভাগ্য, আমার সৌভাগ্য।

দেখ, আমি স্কুল কলেজে নাম লেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া এখন হাকিম হইয়াছি, আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু উকীল হইয়াছেন। আমি মাসান্তে মোটা মাহিয়ানা পাইতেছি, আমার বন্ধু অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের সুখের সীমা কি? আমাদের এখন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কষ্ট নাই; পৃথিবী ভাসিয়া গেলেও আমাদের ভাবনা নাই। তুমি মনে করিতেছ যে, হাকিমকে ভূতের খাটুনি খাটিতে হয়, সকল সাহেবের মন যোগাইয়া চলিতে হয়; তুমি মনে করিতেছ যে উকীল পয়সার গোলাম, নাঙ্গুলে তৈল মর্দ্দন না করিলে ইহার দিনপাত হয় না, অতএব ইহাদের জীবন বড়ই দুঃখময়। কিন্তু তুমি বোকা, তাই এরূপ মনে করিতেছ। যদি সত্য সত্যই ইহা দুঃখের কারণ হইত, তাহা হইলে চাকরির জন্য দেশ শুদ্ধ লোক লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত না। ওকালতির আশায় মাথা কুটিয়া মরিত না। বাস্তবিক তুমি যাহাকে, নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু কষ্ট মনে করিয়া থাকো, তাহা সৌভাগ্য, ভোগের উপাদেয় চাটুনি মাত্র, তাহাতে সৌভাগ্যের সুস্বাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সুশিক্ষিত হইবার নিমিত্তেও

বিশেষ কোনও ক্লেশ পাইতে হয় না। আমরা পরীক্ষা দিয়া উপাধি হাসিল করিয়াছি সত্য, কিন্তু যে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার পিণ্ডান্ত করিতেছি; যে গণিত ইতিহাস বিজ্ঞানে পরীক্ষককে তুষ্ট করিতে হইয়াছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুড়াগঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া এখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি, অথচ পক্ষান্তরে মাতৃভাষার পদসেবা আমাদিগকে করিতে হয় নাই, মাতৃভাষাও সাহস করিয়া কখনও আমাদের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারে নাই। সুশিক্ষিতের প্রধান সুখ—স্বাধীনতা, আমরা অহরহ সে সুখ ভোগ করিতেছি।

আমরা যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করি, তখন খানসামা তেল মাখাইয়া দেয়, খানসামা স্নান করাইয়া দেয়, খানসামা কোঁচান কাপড় পরাইয়া দেয়; আমরা জড়ভরতের মত কেবল সুখেরই অনুভব করিতে থাকি; হস্তপদাদির পরিচালন মাত্র করিয়াও সহজে সুখের জীবন বিড়ম্বিত করি না। অপরাহ্নে আমরা যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করি, সে বায়ুসেবনের জন্য; সন্ধ্যার পর পাঁচজনে একত্র হই; সে মদমত্ত হইয়া খোসগল্প বা খেমটানাচের জন্য। আহার বিহারের জন্য আমাদের ভাবিতে হয় না, আমরাও ভাবি না। পড়া শুনা আমাদের আর করিতে হয় না, আমরাও করি না। দেশের দুঃখ আমাদিগকে দেখিতে হয় না, আমরাও দেখি না। দেশের কথায় আমাদিগকে থাকিতে হয় না, আমরাও থাকি না। এখন আমরা কেবল খাই দাই, নিদ্রা যাই, প্রবৃত্তি হইলে প্রকৃতির জল্পনায় কাল কাটাই। বাস্তবিক আমাদের কোনও বালাই নাই।

কিন্তু অশিক্ষিতের দুরবস্থা দেখ। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিয়তই পরের অধীন। যে অশিক্ষিত ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, সে পেটের দায়ে অস্থির। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দুর্ভাগা মনুষ্য মাটি কাটিয়া, বা অন্য প্রকারে খাটিয়া খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া থাকে। অহো! কি বিভীষিকা! এ সকল লোকের মরিয়া যাওয়াই উচিত। ইহারা নাকি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন, সে জন্যই বোধ হয় এ জীবনভার বহন করিয়া থাকে।

আর একপ্রকার অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে, যাহারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তর দেশ দেখিয়া থাকিলেও, কিছুমাত্র শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাদিগকে অর্দ্ধ শিক্ষিত বলা যায়। ইহারা ইংরেজী পড়িয়াছে, সে নাম মাত্র,—কারণ ইংরেজীতে ভুল করিয়া পত্রাদি লেখে না, অথচ শুদ্ধরূপে লিখিতেও পারে না। এরূপ শিক্ষা কেবল শর্করবাহী বলীবর্দ্দের ভার-বহনরূপ বিড়ম্বনা মাত্র। অধিকন্তু ইহারা দেশীয় ভাষার চর্চ্চা করিয়া প্রকৃত শিক্ষালাভের ফল হইতে বঞ্চিত থাকে, এবং তদ্ধেতু স্বার্থের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। ইহাদের শুভ পরিণামের আশা সুদূরপরাহত।

সাধারণতঃ উভয় দলের অশিক্ষিত ব্যক্তিরই এই এক ভয়ানক দোষ আছে যে, ইহারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, পরের অপেক্ষা না করিয়া কোনও কাজ করিতে পারে না। ইহাদের মনোমধ্যে একটা চিন্তার উদ্রেক হইলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত করে, নহিলে কোনও প্রকার মীমাংসা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভাব নানা প্রকার। আমরা সময় বুঝিয়া সাহেব সুবার সেবা করি বটে, কিন্তু আত্মার যাহাতে তৃপ্তি নাই, এমন কার্য্যের জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করি না। আমরা শরীরের সেবা করি, মনের সন্তোষ বিধান করি, বাক্যের সার্থকতা করি, অর্থাৎ যাহাতে বাক্যে অর্থাগম হয়, তাহার চেষ্টা করি! আমরা সুশিক্ষিত সুতরাং বুঝিতে পারি যে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

—আমরা চুলে পমেড, গায়ে জামা, পায়ে বুট, হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া সম্মানের সংযোগ করিয়া লই। কিন্তু অশিক্ষিতগণ পরের জন্যই সদা ব্যস্ত। তাহাদের পরকাল অনিশ্চিত, ইহকাল থাঁটি মাটী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্বজ্জন সমাগম (১)।

সুখই স্বর্গ, আর যেখানে সুখ, সেই স্বর্গ। যেখানে বিদ্বৎ-মণ্ডলী, যেখানে এক-প্রাণ বহুজনের সমাগম, সেখানে যাহার সুখ না হয়, সে পামর, সে হতভাগ্য:—তাহার অদৃষ্টে কুত্রাপি সুখ নাই, তাহার স্বর্গ লাভ কখনই ঘটিবে না, তা বাঁচিয়া থাকিতেই কি, আর মরিয়া গেলেই কি?

যিনি কমলার কৃপাসত্ত্বেও ভারতীর (২) চিহ্নিত সেবক, যিনি দুর্লভ মানবজন্মে দ্বিজেন্দ্র বলিয়া বরেণ্য; তাঁহার আতিথ্যে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর, যেখানে বাল্মীকির কাব্য-প্রভা (৩), যেখানে মূর্ত্তিমতী প্রতিভা, (৪) যেখানে সঙ্গীতের নিসর্গ-শোভা—সে যদি স্বর্গ না হয়, তবে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ করিতে হয়।

পঞ্চানন্দ স্বর্গবাসী হইলেও এখন নরলোকে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং মানব-স্বর্গেও তিনি ইন্দ্রত্ব করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন-সমাগমে তিনি মর্ত্ত্যের পরম সুখ

---

(১) বিদ্বজ্জন সমাগম—এই নামে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর-পরিবারে একটি সাহিত্যিক সম্মিলন খুব সমারোহের সহিত হইয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩) ঐ দিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনীত হইয়াছিল। নেতা ও অভিনেত্রী সকলেই ঠাকুর পরিবারেরই লোক।

(৪) প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

লাভ করিয়াছেন। ধরাধামে কি কি উপাদানে স্বর্গ সংগঠিত হয়, তাহার পরিচয় পঞ্চানন্দ পাইয়াছেন; অজ্ঞান-তিমিরান্ধের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্বরূপ এই লৌহলেখনী দ্বারা তদ্‌বৃত্তান্ত বিবরিত হওয়া আবশ্যক।

যেখানে সমাগম, সেইখানেই সভা; যেখানে সভা, সেইখানে সভাপতি। কালের জ্যেষ্ঠ পুত্র, (১) বঙ্গের গণপতি এই জনসমাজে সমাগত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য! মণিমুক্তা বিভূষণে স্বয়ং সঙ্গীত স্বীয় রাজশ্রী (২) প্রদর্শনে, সমাগত বিদ্বজ্জনের মনোমোহন করিয়াছিলেন, ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। বিদ্বানের বল বিজ্ঞান; সুতরাং রসায়ন (৩) রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেবভাষা, নাগরবেশে আশু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া লম্বশাটপটাবরণে সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শীতল (৪) ভাবে মেধা স্বীয় পুরুষকার দেখাইতেছিলেন। পাছে এত শোভাসমষ্টি সন্দর্শন করিয়া মানব নয়ন ঝলসিয়া যায়, সেইজন্য নেত্ররোগ-ধন্বন্তরিও (৫) নিজ বিপুল কলেবর সঞ্চালনে ত্রুটি করেন নাই।

এতদ্ভিন্ন বিভাকরাদি (৬) নানা গ্রহ, জাতীয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ উপগ্রহ, কুলাচার্য্য ভারিনের পরমপূজ্য স্বরুতভঙ্গ কুলতিলক সম্প্রদায় তথায় উপদ্রব করিতে উপেক্ষা করেন নাই। আর যেখানে এত উপসর্গ, সেখানে সাধারণীয় অক্ষয়চ্ছায়া (৭) মূল স্বর্গের অপ্সরাস্থানীয় হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন, ইহাতে কাহার না আনন্দ হইবার কথা? এমত অবস্থায় সুকণ্ঠ সঙ্গীত এবং আকণ্ঠ সন্দেশে পঞ্চানন্দ যে নিরানন্দের বিনাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, আইস ভাই, প্রবন্ধশেষে জয়ধ্বনি করিয়া ছাপাখানায় কাপি পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

---

(১) তাৎকালিক খুব বৃদ্ধ Reverend K. M. Bannerji.

(২) সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

(৩) তাৎকালিক রসায়নাচার্য্য রায় কানাইলাল দে বাহাদুর।

(৪) লাহোরের "Tribiune" পত্রের শীতল বাবু।

(৫) সেকালের সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক লালমাধব মুখোপাধ্যায়। ইনি বিপুল-কলেবরই ছিলেন।

(৬) 'নববিভাকর' পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি।

(৭) 'সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

গোরাচাঁদ।

(ঐতিহাসিক নবাখ্যান)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যার মীমাংসা।

নব বিধানের রহস্য-ভেদ শুনিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত; রাজকুমার আলবার্টের মধ্যম পৌত্রের প্রপিতামহী জন্মভূমি হইতে অনুস্বার্য্যনামা বন্যজন্তু আনাইয়া জীবতত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞানের পরিধি বাড়াইতেছেন দেখিয়া, বিরাট-লাট-রাজপ্রতিনিধি পুণ্যভূমি আর্য্য ভূমিতে একটি কাবুলী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুচারুরূপে তাহার সেবা পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এবম্বিধ বহুবিধ ঐতিহাসিক ব্যাপার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নৈসর্গিক নিয়মাবলীর অনিবার্য্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে; এমন সময় খ্রীষ্ট অষ্টাদশ শত একাশীতিতম অব্দের প্রথম এপ্রিল দিবসে বেলা ছয়টার পর গোরাচাঁদের বাটীতে ভরপুর মজলিশ জমিয়া গেল।

কোমলপ্রাণ পাঠক! বীরপ্রসবিনী পাঠিকে! প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণটা একটু কঠিন হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। যখন বিদ্যার বেগ সম্বরণ করা যায় না, তখনই লেখকেরা গ্রন্থ আরম্ভ করে, সুতরাং ভাষার জোয়ারের মুখে জঞ্জাল দেখা যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমি পাঠক মহাশয়ের স্বজাতি-বাৎসল্যের—পাঠিকা ঠাকুরাণীর গুরুজন ভক্তির দিব্য করিয়া বলিতেছি, ইহার পর যাহা লিখিব, অতি প্রাঞ্জল নির্ম্মল ভাষাতেই লিখিব। দন্তহীন ব্যক্তির স্বাদবোধ অল্প: সে জন্য গোড়াতে একমুঠা একমুঠা চালভাজা ছোলাভাজা দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিলাম। আমি দরিদ্র, আতা, রাতাবি কোথায় পাইব? যদি অল্পেতেই অপ্রীতি না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আসিতে আজ্ঞা হউক, আমার এ ভুনির দোকানে যাহা কিছু আছে, সকলই দেখাইব।

বাগবাজারের ঘোষপাড়ার একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যদেব অন্যকার মত রাত্রিবাসের জায়গা খুঁজিতেছিলেন; একটা প্রকাণ্ড নারিকেল গাছের পশ্চিম দিকের পাতাগুলা তাই দেখিয়া হাসিতেছিল। পূর্ব্বদিকের পাতাগুলার স্বভাব কিছু নম্র, আস্তে আস্তে অল্প অল্প মাথা নাড়িয়া ম্লান মুখে তাহাদিগকে হাসিতে বারণ করিতেছিল। ইত্যাদি। এ সমস্ত কবিকল্পনা; লেখকের বর্ণন শক্তির পরিচয় মাত্র। প্রকৃত কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

যেখানে সেই নারিকেল গাছ, তাহার উত্তরদিকে ইটের প্রাচীর, তাহার উত্তরেই

গলি; তাহার পরেই দরজা দিয়া উত্তরমুখে প্রবেশ করিলেই গোরাচাঁদের বাড়ী। বাড়ীর বর্ণন করিয়া আর কষ্ট দিব না, ফলে বাড়ীখানা তুমহল। নির্ভয়চিত্তে, আমার সঙ্গে অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্বদ্বারী একতালা ঘরের দরদালানে পাড়ার মহিলাগণের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। উপরে এই মজলিশের কথা বলিতে গিয়াই বর্ণনকণ্ডুয়নে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামী, বামী, শামী, অলকা, তিলকা, মেনকা, বিমলমণি, কমলমণি, সূর্য্যমণি, হেবোর মা, পুঁটির মা, খোকার মা, প্রভৃতি ছোট বড় মাঝারী বয়সের বিস্তর মহিলা সেই মজলিশে উপস্থিত। কেহ গা আতুড় করিয়া, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ আধ ঘোমটা টানিয়া,—নানাভাবে নানা মহিলা বসিয়া আছেন। আর, কেহ বা তুয়ারের শিকলি ধরিয়া, কেহ বা এক পায়ে ভর করিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া, কেহ বা আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির রিং আঙ্গুলে ঘুরাইয়া অন্যমনস্ক হইয়া,—কতজন কত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ বাসরের গান ভাবিতেছেন, কেহ নূতন অপেরার নূতন টপ্পাটা বার বার মনে মনে আওড়াইতেছেন, কেহ অপরের নূতন ধরণের বেশ-বিন্যাসটা সপ্রণালী মৌনসমালোচনা করিতেছেন; কেহ বা গোরাচাঁদের বনিতাকে সাহস দিতেছেন, কেহ বা কল্পিত বহুদর্শিতার সুপারিশে তাঁহার আশঙ্কা বাড়াইতেছেন। ফল কথা, নানারকমে নানাজনে কথা কহিতেছেন। হাসির উপদ্রবে, নিষেধের তাড়নায়, পরামর্শের গম্ভীরতায়, রোদনের শান্ত অভিনয়ে, নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, এমনতর একটা গোলযোগ সেখানে হইতেছে। মজলিশের উপস্থিত বিষয়—গোরাচাঁদের বনিতা আসন্নপ্রসবা।

যশোহর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে অপ্রসিদ্ধ-নাম এক পল্লীগ্রামে গোরাচাঁদের বনিতার বাপের বাড়ী; নাম বসুমতী। নামটা উনবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত নয় মনে করিয়া, গোরাচাঁদ স্বীয় উত্তমার্দ্ধকে বিকল্পে বসন, বসনী বা বসী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, প্রাণান্তেও বসুমতী বলিতেন না। আমি কিন্তু এ নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিব না, যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেই নাম করিয়া গোরাচাঁদ-গৃহিণীর পরিচয় দিব।

বসুমতীর বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, বর্ণ গৌর, এমন কি চুলগুলি পর্য্যন্ত খুব কাল নয়; গড়ন দীর্ঘাকার, একহারা, তবে সম্প্রতি তেহারা বলিয়াই মনে হয়; কপাল ছোট; চক্ষু তুটি ডাগর, কিন্তু কোলে বসা; নাক সুদীর্ঘ, টিকলো, সরু; গাল তুখানি মরা মরা, উপর ঠোঁট খুব পাতলা, নীচের খানি পুরু, থুতনী খুব অল্প। বসুমতীর সুর চড়া, কিন্তু মিহি, অল্পেই নাকিতে উঠে। এ হেন বসুমতী আসন্নপ্রসবা সেই মজলিশে বসিয়া আছেন, কদাচ তুই একটী কথা কহিতেছেন। কিন্তু এত গোলে তাঁহার কথা ধরা যাইতেছে না। যাঁহারা দেখিতে, দেখা করিতে বা দেখা দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা

নিজে নিজে কথা কহিয়াই পরিতুষ্ট ; সুতরাং বসুমতীর কথা বুঝিলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইতেছে না।

গোরাচাঁদ বাড়ীতে ছিলেন না। "স্ত্রী উত্তোলনী" সভার অদ্য বিশেষ অধিবেশন। সুতরাং সভাপতি গোরাচাঁদ বেলা একটার সময় সেইখানেই গিয়াছিলেন। স্ত্রীর অবস্থা মনে ছিল না, বাড়ীতে এ মজলিশ বসিবে, তাহারও সংবাদ পান নাই, কাজে কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। পাড়ার মেয়েরা গোরাচাঁদকে বড় ভয় করিত, আজি বাহিরে গোরাচাঁদের বিলম্ব হইবে টের পাইয়া মেয়েরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া জুটিয়াছিল। এমত অবস্থায়, সন্ধ্যার পর গোরাচাঁদ যখন বাড়ী আসিলেন, তখন মজলিশের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

গোরাচাঁদের পরিচয় দিবার এই সুযোগ হইয়াছে, অতএব পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া যাউক।

বর্ণচোরা আমের দোষ বা গুণ এই যে, ভিতরে পাকিয়া পচিবার উপক্রম হইলেও, খোসা যে সবুজ সেই সবুজই রহিয়া যায়। বয়সের হিসাবে গোরাচাঁদও বর্ণচোরা আম; পঁচিশের উপর পঞ্চান্ন পর্য্যন্ত সকল বয়সই গোরাচাঁদের হইতে পারিত। কেবল এক বুড়ী মা বাড়ীতে থাকাতেই গোরাচাঁদের বয়স চল্লিশের নীচে রাখিতে পাড়া-প্রতিবাসী বাধ্য হইয়াছিল। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,—(ইহার ভাবার্থ যাহাই হউক)—বিলক্ষণ খর্ব্বাকৃতি, প্রশস্ত চতুষ্কোণ ললাট, স্থূলনাস, প্রবল হনুমস্ত, বর্ত্তুলাক্ষ, গুম্ফবিভীষিত, নিষ্পিষ্ট-ওষ্ঠাধর, বিরল অথচ দীর্ঘ শ্মশ্রু-শোভিত চিবুক, মস্তকে ধূসর কাশ্মীরীর ক্যাপ, গলায় দুহাত লম্বা কম্ফর্টর, আধ-চীনে-আধ-বিলাতী কালো আলপাকার কোট এবং সাদা জিন্ কাপড়ের পেণ্টুলন পরা, হাতে পিচের মোটা ছড়ি, পায়ে গরাণহাটার ডবলস্প্রিং জুতা—পুষ্ট না হইলেও হৃষ্ট গোরাচাঁদ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়াকাশের চাঁদ (বসন) কাতর মুখে, কাতরভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ দেখিতেছেন। ভীত, চিন্তিত, বা বিস্মিত না হইয়া গৃহিণীকে কিছু না বলিয়া এবং কোনও জিজ্ঞাসাও না করিয়া গোরাচাঁদ নিকটবর্ত্তী হইয় বসুমতীর হাত ধরিলেন এবং শুদ্ধ হস্তবলের অনুরোধে তাঁহাকে শয়নগৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বসুমতী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোরাচাঁদের মা রান্না-ঘরে ছিলেন, জুতার শব্দে পুত্রের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইয়া পুত্র-পুত্রবধূকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন।

জননীকে দেখিয়া গোরাচাঁদ বিরক্ত হইলেন। বসুমতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, স্বীয় বাম কটিতটে বামহস্তের মণিবন্ধ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া, সোজা অথচ একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোরাচাঁদ বলিলেন,—"যাও, তোমার রান্না ঘরে যাও—কর্ত্তব্য পালন আগে; বিশ্রাম কি আমোদ, তার পর। রুটী হয়েছে?—হয় নাই

াল হয়েছে?—হয় নাই; চচ্চড়ি হয়েছে?—হয় নাই; মাছ ভাজা হয়েছে?—হয় াই। আমি জানি, নিশ্চয় জানি, এ সব কিছুই হয় নাই। তবু তুমি কাজ ফেলে, ামার কাছে আমোদ করতে এলে। ছি! ছি!" মাকে সম্বোধন করিয়া এই পর্য্যন্ত। াপনা-আপনি খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"মা মনে করে যে, মা হ'লেই বুঝি াত খুন মাফ! এই এলুম একটা কাজ ক'রে, কোথায় দুটো মিষ্টি মুখের কথা শুনে ন তুষ্ট করব, পরিশ্রমের অবসাদ বিনাশ করব, না বুড়ী এসে সুমুখে দাঁড়ালেন! াদের কি বিবেচনার লেশ মাত্র নাই?"

মা থতমত, ভীত, সঙ্কুচিত। বলিলেন—"না বাবা, এই বৌমার অসুখ ক'রেছে, াই বলতে এলুম, বলি যদি কারুকে ডাকতে টাকতে হয়' তা হ'লে—"

"তা হ'লে তোমার সাত গুষ্টির পিণ্ডি, আর আমার বাবার মাথা। 'তা হ'লে আবার কি?—যাও, যাও, বিরক্ত করো না।"

"আহা পরের জন্যে বাছার আমার আহার-নিদ্রে নেই! খেটে খুটে এয়েছে"—বিড় বিড় করিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে গোরাচাঁদের মা, কর্ত্তব্য পালনের স্থান রন্ধনশালায় পলায়ন করিলেন।

তখন গোরাচাঁদ আবার পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিয়া, প্রেয়সীর হাতে ধরিয়া একটু উৎকণ্ঠা, একটু আগ্রহের স্বরে বলিলেন—"অসুখ হয়েছে? কি অসুখ, বসন? তোমার অসুখ করেছে? তোমার?"

বসন উত্তর দিতে বিলম্ব করিল। গোরাচাঁদ বসনের হাতে ধরিয়া বসনকে টানিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন, খাটের উপর বসনকে সবলে উপবেশন করাইলেন।

বসুমতীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, নয়ন-নদের পঙ্কিল জলে কপোল-ভূমি ভাসিয়া গেল। "তোমার বসীর কি হয়েছে, তা কি তুমি জান না?" স্বল্পভাষিণী বসুমতী প্রত্যেক শব্দের পর এক এক দীর্ঘশ্বাস, অথবা কণ্ঠরোধসূচক অব্যক্ত ধ্বনি সহকারে কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইল। গোরাচাঁদ মাথার টুপি খুলিতেছিলেন, খোলা হইল না, টুপির সঙ্গে হাতের যোড় লাগিয়া গেল।

"আমি ত জানি না যে, তোমার কোন অসুখ করেছে। তোমার অসুখ জানলে কি আমি এমনি স্থির হ'য়ে থাকবার লোক? তোমার জন্য আমি নদীর জল, গাছের পাতা, আকাশের নক্ষত্র তন্ন তন্ন ক'রে তোলপাড় করতে পারি, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্দোলিত করতে পারি—আর, আমার সেই বসনের, আমার হৃদয়ের বসীর, আমার সেই তোমার অসুখ জেনেও আমি হিমাচলের মত শীতল, অচলভাবে বসে' থাকব, এও তোমার বিশ্বাস হয়?"

বসুমতী দেখিলেন বেগতিক! এখন এই যে প্রণয়-সরোবরের লহরীলীলা দেখিয়া তিনি সুখানুভব করিবেন, এমন অবস্থা তাঁহার নয়। কাজে কাজেই আর বাক্য-

ভূধরের দিকে না গিয়া সাদা কথায় বলিয়া উঠিলেন—"আজ বুঝি আমার ছেলে হবে। একটু একটু ব্যথা উঠেছে।"

গোরাচাঁদ। "এই বুঝি অসুখ?"

বসুমতী। "দত্তদের বাড়ীর মেয়েদের কথা শুনে অবধি আমার আরও ভয় হচ্ছে ওমা! তা হ'লে আমি কি ক'র্‌ব?"

বসুমতী আবার কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তদের বাড়ীর মেয়েরা ভয় দেখাইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কি না, বসুমতীর ব্যথা উঠিয়াছে, ডাক্তারকে প্রথমেই ডাকিয়া আনা উচিত কিনা; যে জন্য, যে স্ত্রী পুরুষের সাম্য-সংস্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ব্রত সার্থক করিবার এই সুযোগে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না—এই মানসিক বিতণ্ডায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোরাচাঁদ একটু মৌনী হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, শেষ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ চিন্তা, এই সার করিয়া প্রফুল্লভাবে, হাসি হাসি মুখে বলিলেন,—

"বেশ হয়েছে! তোমার এই যে অসুখের কথা বল্‌ছ, এ চমৎকার হয়েছে। তোমার কষ্ট পাবার দরকার নাই, আমি স্বয়ং সন্তান প্রসব ক'র্‌ব, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোও গে। আমি রইলুম, ছেলে প্রসবের ভারও আমার রৈল।"

বসুমতী অবাক্!

"সে কি? তুমি প্রসব কর্‌বে কি?" তা যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা কি বলো?"—অনেক কষ্টের উপরেও একটু হাসিয়া, বসুমতী এই কথা কয়টী বলিল।

"তা যদি হ'ত?—কেন? যদি কেন? তা হ'তেই হবে। তুমি যেটা অসম্ভব মনে কর্‌ছ, সেটা আমার মতে একটুকুও অসম্ভব নয়।—হাঁ আমি স্বীকার করি যে, এ পর্য্যন্ত পুরুষে কুত্রাপি প্রসব করে নাই। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ, শুদ্ধ পুরুষের অত্যাচার, স্ত্রীজাতির বিড়ম্বনা, আর তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কু-অভ্যাস! আগে রেলের গাড়ী ছিল না, তাই ব'লে কি রেলের গাড়ী হ'ল না? আগে কেবল পুরুষেই বই পড়ত, স্ত্রীলোকে রাঁধাবাড়া ক'রত—এখন কি তা উল্টে যায় নি? কু-অভ্যাস, সমস্তই কু-অভ্যাস, আর কু-সংস্কার, আর অত্যাচার। আমাকে যদি মা বাপ ছাড়তে হয়, বাগ্‌বাজার ছাড়তে হয়—সেও স্বীকার, তবু এবার তোমাকে আমি প্রসব হ'তে দিচ্ছি না। আমি করাসডাঙ্গায় গিয়ে বাড়ী করব, সেখানে নিজে প্রসব কর্‌ব—তবু তোমাকে আর কষ্ট সহ্য করিতে, একমাত্র স্ত্রীজাতিকে বিড়ম্বিত হ'তে দিব না।"

বক্তৃতা করিতে করিতে, গোরাচাঁদ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের ভাব দর্শনে গোরাচাঁদের মা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাতের এক গোছা কটী উনানে পড়িয়া পুড়িতে লাগিল, পাড়ার লোক একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল। মহা এক হুলস্থূল ব্যাপার। কিন্তু গোরাচাঁদের বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই।

বাস্তবিক সদ্‌বক্তার, সুকবির, প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই গুণই এই; ইহাঁরা তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। নহিলে প্রতিভা কি? অসাধারণতা কোথায়?

অনেকক্ষণ পরে গোরাচাঁদের চটকা ভাঙ্গিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন যে, আপনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর কথাটা না কি নিজ গৌরবের কথা,—তাই মনে মনে একটু ইতস্তত করিয়া গোরাচাঁদ বুঝিতে পারিলেন যে, শুদ্ধ বক্তৃতার ইন্দ্রজালে জড়িত এবং বিমোহিত হইয়াই এত লোক সমবেত হইয়াছে। গোরাচাঁদ সিদ্ধবক্তা;—জনতাই তাঁহার ঘর বাড়ী, জনতাই তাঁহার অস্থি-মাংস। মৎস্যের যেমন জল, নক্ষত্রের যেমন আকাশ, অগ্নির যেমন ইন্ধন, জনতাও গোরাচাঁদের তদ্রূপ, সুতরাং গোরাচাঁদ বিস্মিত হইলেন না, সস্মিত-বদনে হতবুদ্ধি জননীকে বলিলেন—"মা, এক গেলাস জল নে এস দেখি" —বলিয়া সেই স্ত্রীবহুল লোকসমুদ্রে নয়ন সঞ্চালনপূর্ব্বক দেখিলেন, সংবাদপত্রের লেখক তাহাতে ভাসিতেছে কিনা। দেখিলেন, কিন্তু বৃথা! যেহেতু, সংবাদপত্রের সম্পর্কীয় নরনারী কেহ তথায় ছিল না। সংসারের দোষই এই, শিয়রে সময়মত ইতিবেত্তা থাকে না বলিয়া আমাদের কত কত সোণার স্বপ্ন স্বপ্নেই বিলীন হইয়া যায়।

জননী জল আনিবার অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বৌমা বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন এবং কাতরভাবে—"মাগো মরূচি গো, আর বাঁচলাম না গো" ইত্যাদি শব্দ করিতেছেন। সুতরাং জলের কথা ভুলিয়া বৌমার শুশ্রূষা করিতে বসিয়া গেলেন। অভ্যাস দোষেই হউক, কুল-ধর্ম্মের গুণেই হউক, বসুমতী যে তখন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতেছিল, তাহার আর কথাটি নাই। এবং গোরাচাঁদের মা যে সে কষ্ট বুঝিতেছিলেন, তাহারও সংশয় নাই। সুতরাং প্রিয় পুত্রের পিপাসার কথা ভুলিয়া যাওয়াতে তিনি যে একটা খুব গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

জল আসিল না দেখিয়া গোরাচাঁদ অতিশয় ত্যক্ত হইলেন। বক্তৃতা ব্যাপারের দুইটা প্রধান অঙ্গ—সংবাদপত্রের লিপিকর এবং জলের গেলাস—অনুপস্থিত দেখিয়া উপস্থিত মহিলামণ্ডলীর উপর গোরাচাঁদ কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তুই মাগীরেই তো যত দোষের গুরু! আপনি ভালো হবি না, পরকেও হ'তে দিবি না।—তোরা আপনার নাক কাটিস্, কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস্। সৎকার্য্যে যোগদান,—আপনাদের উপকারের কথাতে উৎসাহ—দূরে থাক্, বাপ পিতামহের ব্যাভারের উল্লেখ ক'রে, আবার আমাদেরই টিটকারি করাটুকু আছে। এখানে তামাসা দেখ্‌তে এয়েছেন,—আমার—চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ দেখ্‌তে এয়েছেন। বেরো আমার বাড়ী থেকে! বেরো, বল্‌চি বেরো। এক্ষণি বেরো। নইলে এক এক কিলে তোদের নাক ভেঙে থেঁতো ক'রে দেবো, জানিস্ নে?"

স্ত্রীলোকেরা গোরাচাঁদকে ভয় করিত, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। কেন তাহারা ভয় করিত, তাহাও এখন জানা গেল। তিরস্কারের তাড়নায় রমণীগণ দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল।

সেই রাগের ভরেই গোরাচাঁদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননীর উপস্থিতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"বসন! এই তোমাকে শেষবার জিজ্ঞাসা ক'রছি, তুমি আমাকে প্রসব ক'রতে দিবে কি না?"

"বসন" নিরুত্তর। পূর্ব্ববৎ এ পাশ, ও পাশ, হা হুতাশ করিতে লাগিলেন।

"বাবা গোরাচাঁদ"—বলিয়া জননী মুখ ব্যাদান করিতে না করিতে, একবার তীব্র দৃষ্টির পর এক লম্ফ প্রদানে গোরাচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং সেই রাত্রি নয়টার সময়ে স্ত্রীর দুরভিসন্ধির প্রতিবিধান কল্পে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সভাগৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মনে মনে সংকল্প করিয়া চলিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য বিধান জন্য আবশ্যক মত বল প্রয়োগ করাও বিহিত, সভায় এইরূপ অবধারণ করিয়া সভার কার্য্য-বিবরণে ইহা লিপিবদ্ধ করাইয়া লইবেন। নচেৎ এ সমস্যা পূরণের উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পাঠক-পাঠিকার মরণ বাঁচন গ্রন্থকর্ত্তারই হাতে।]

তখন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন যে কলিকাতা সহর, তাহাও এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে; এত যে জনস্রোত, তাহাও যেন শুকাইয়া, শীর্ণ হইয়া, সঙ্কুচিত হইয়া, বালুকারাশি মধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছে। (পাঠক মহাশয় সমীপেষু,—জন-স্রোতের অনুরোধ আমি অবশ্য মানি; কিন্তু এস্থলে বালুকারাশি যে কোন্ পদার্থের উপমান, তাহা আমি অবগত নহি)। কেবল কদাচ কোথাও একখান ভাড়াটে গাড়ী ভয় দেখাইবার জন্য বিকট শব্দসহকারে মৃতপ্রায় অশ্বযুগলের অনুধাবন করিতেছে; অশ্বদ্বয়ও প্রাণের দায়ে একমনে এক ভাবে চলিয়াছে। অনেকে ভূত মানে না, কিন্তু ভূতকে বড় ভয় করে; রাত্রিকালে সন্দিগ্ধ স্থল দিয়া যাইতে হইলে ভয়ে দৌড়িতে পারে না, থামিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও সাহস করে না। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার অবস্থাও সেইরূপ। কোনও কোনও স্থানে বেড়ার গায়ে, দেওয়ালের গায়ে, রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া আড়ারিয়া লাঠান হাতে এক এক জন পাহারাওয়ালা দুইটী পরমতত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; এক—সার্জ্জন সাহেব এ পথে না আইসে; অপর—একটা চোর কিম্বা মাতাল গায়ে পড়িয়া ধরা দেয়।

যাহারা পাখা টানে আর যাঁহারা পাহারা দেয়, তাহারা ইহকাল পরকাল একসঙ্গে রক্ষা করে—ধ্যান ছাড়ে না, অথচ কাজ ভোলে না। ইহা ছাড়া, পথের ধারে কিম্বা দোতলার উপরে কোথায়ও বাঁয়া তবলা, মানুষের গলা প্রভৃতি হইতে ওয়াক্ ওয়াক্ মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় শব্দে নেশায় তন্ময় কলিকাতার বিরক্তি সম্পাদন করিতেছে। ঘুমাইয়াও কলিকাতা ঘুমাইতে পাইতেছে না।

ফলে আমি প্রকৃতি বর্ণন করিতে বসি নাই, পটও আঁকিব না। গোরাচাঁদ না কি সভাস্থল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই ঐতিহাসিক নবাখ্যানের সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই এত বাক্য ব্যয় করিতেছি। আপনারা সেটা ভুলিবেন না।

তত রাত্রিতে সভায় গিয়া গোরাচাঁদ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বার রুদ্ধ, সুতরাং প্রবেশ করিবার উপায় নাই। যে সে লোক হইলে হতশ্বাস হইয়া এইখানেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু গোরাচাঁদের অধ্যবসায় অপ্রতিহত; সঙ্কল্প অটল, সাহস দুর্জ্জয়। অসাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু গোরাচাঁদের অভীষ্ট বিচলিত হইতে পারে না। অনেক উত্তম উত্তম উপমা দিয়া এ বাক্য সমুজ্জ্বল করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। যে অসম্ভবকে বাস্তব করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপমা প্রয়োগ করা ধৃষ্টতা ত বটেই, পূর্ণ বাতুলতা।

স্ত্রী-উত্তোলনীর সম্পাদকের বাড়ী গোরাচাঁদ স্বয়ং গেলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সভ্যদের বাড়ী বাড়ী গিয়া আবশ্যক সংখ্যা পূরণ করিয়া সকলে মিলিয়া সভাতলে উপনীত হইলেন।

অসাধারণ সভার এই অসাধারণ অধিবেশন খুব জমিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে প্রস্তাব বক্তৃতা, বাদ, অনুবাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক বিতণ্ডা—কত বলিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র মানব, কেমন করিয়া সে বাক্যসাগর মসীরেখায় অঙ্কিত করিব? সাহারার মরুভূমি যদি কাগজ হইত, মিশরের শিখা-মন্দির (১) যদি লেখনী হইত, ভূমধ্যসাগর যদি দোয়াত হইত, তাহা হইলেও এই সভার, এই রজনীর কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিতাম কি না, বলা যায় না। আমার বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত উপকরণ লইয়া ত কোনমতেই নয়। আপনারা এইস্থলে একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, উপরে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ভারত ছাড়া। পাণ্ডিত্য থাকিলে, আর পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এরূপ নহিলে হয় না; ফল কথা, আমি সে কার্য্যবিবরণ এখানে তুলিতে সাহসী হইলাম না; সদ্য সদ্য তাহা না পড়িলে যাঁহার সংসার অচল হইবে, তিনি সভাসম্পাদকের খাতায় পড়িয়া আসিতে পারেন; আর, অপেক্ষা করা যদি চলে, তবে আগামী কল্য মন্তব্য সমেত সংবাদপত্রে পাঠ করিতে পারিবেন!

---

(১) অগ্নিশিখাকার স্তূপ Egyptian Pyramid.

স্ত্রী-পুরুষের সম্যক্ সাম্য বিধান জন্য গোরাচাঁদ যথাবিধি প্রস্তাব করিলেন। যথাবিধি গোরাচাঁদের সে প্রস্তাব গৃহীত, অনুমোদিত, অবলম্বিত এবং সভার পুস্তকে লিখিত আকারে পরিণত হইল। একটু বলা আবশ্যক। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, জয়ের পূর্ব্বে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী, নহিলে জয় কিসে? অতএব গোরাচাঁদের প্রস্তাবে বাধা উপস্থিত করিয়া, তাহার বিরোধ চেষ্টা করিয়া কেহ যে নিজ দুর্ব্বলতা, অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা না বলিলেও চলে। অন্ততঃ এখন এখানে না বলিলে চলে।

সেই জয়ে উল্লসিত হইয়া, সভাভঙ্গের পর দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত করিয়া গোরাচাঁদ কর্ণবালিস (১) রথ্যা অবলম্বনে বাটী যাইতেছিলেন। তাহাতে সুকিয়ার গলির মোড়ের সম্মুখে গ্রন্থকারের সহিত দেখা। সেই কথাটা জানাইবার জন্য আমার এ প্রয়াস। অনেক কথা বলিতে ভুলিয়াছি; তন্মধ্যে এক কথা এই যে, মির্জ্জাপুর রথ্যার কোনও এক স্থানে স্ত্রী-উত্তোলনীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেই ধড়াচূড়া-বান্ধা গোরাচাঁদ সেই স্থান হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। আর এক কথা এই যে, গাড়ী ভাড়ার পয়সা সঙ্গে ছিল না বলিয়া গোরাচাঁদ একাকী পদব্রজে যাইতেছিলেন। এই অর্থাভাবে এই ইতিহাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, গোরাচাঁদ গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে পারিলে আমরা সঙ্গে যাইতে পারিতাম না। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার এবং গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।

যাহাদের মানসক্ষেত্রের পরিসর অল্প, এরূপ ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু গোরাচাঁদ বিরাট পুরুষ, উন্মত্ত হইলেন না; তাই বলিয়া অন্তরের তরঙ্গ-বিক্ষোভে তিনি যে একটুকুও বিচলিত হন নাই, এমন বলিতে পারি না। প্রাকৃতিক বলের সংঘর্ষ একেবারে পরিহার্য্য নহে, ভূকম্পে ভূধরও টলিয়া যায়। সুতরাং গোরাচাঁদ চলিতে চলিতে এক একবার দণ্ডায়মান হইবেন, থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গভঙ্গীসমেত সবলে দক্ষিণ হস্তের সঞ্চালন, বাম করতলে দক্ষিণ করমুষ্টি সশব্দে প্রহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এক পার্শ্ববর্ত্তী পাদপন্থা হইতে অপর দিকের পাদপন্থায়, আবার এধার হইতে ওধার—বার বার গোরাচাঁদ এ প্রকার করিয়া চলিতেছিলেন, তাহাও আমি অস্বীকার করি না, অস্থিরমতিতে পদবিক্ষেপ অস্থির হইয়াছিল, তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহার কারণ ছিল।

সভাতে গোরাচাঁদ কৃতকার্য্য, সিদ্ধকাম হইয়াছেন, সভার নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিবে না, সহজেই পুরুষত্ব লাভে সম্মত হইবে, সমগ্র নারীকুল বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, ইহা

---

(১) Cornwallis Street,

চাপিয়া রাখিবার আনন্দ নহে। এখন, এই গৌরবের কথা, এই আনন্দের কথা, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইবে বটে, কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই "বঙ্গ মশালে" এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ লেখাইতে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, গোরাচাঁদ ইতস্তত করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে সর্পগতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইতেছিল। গোরাচাঁদ একবার ভাবেন "বঙ্গ মশালে"র বাড়ী যাই, অমনি রাস্তার ডান ধারে উপস্থিত; আবার মনে করেন, "বঙ্গমশাল" হয় ত এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে, অমনি দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপাইয়া চিন্তা; তখনি স্থির করেন—আত্মগৌরব পরমুখে ব্যক্ত হইলেই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে বেগে রাস্তার বাঁ ধারে আসিয়া পড়েন; ক্ষণে আবার যুগপৎ সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়, তখন এক পা তুলিতে এক পা পড়িয়া যায়, দু পা আগে হাঁটিতে এক পা পাছে সরিয়া যায়, যেখান-কার সেইখানে পা থাকিতে দেহপ্রতিমা দুই বার বামে, দুই বার দক্ষিণে হেলিয়া যায়। ফলতঃ গোরাচাঁদের সেই আপাতদৃশ্যমান অস্থিরতার কারণ ছিল, ইহা আমি দেখাইলাম। সে কারণ "বঙ্গ মশাল"। "বঙ্গ মশাল" যে বঙ্গদেশীয় বঙ্গভাষা-বিরচিত, বঙ্গোন্নতির কেন্দ্রীভূত জগদ্বিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এ কথা যে না জানে,—মহারাজা, রাজা এবং রায় বাহাদুরের তালিকা হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়াই উচিত। আবশ্যক হইলে "বঙ্গ মশাল" সম্বন্ধে অন্য কথা পশ্চাৎ।

উপরে বলা হইয়াছে—বৃথা কথা আমি বলি না—রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছিল। একজন পাহারাওয়ালা একটা আলোকস্তম্ভে নির্ভর করিয়া মুদিত-নয়নে ভাবনা করিতেছিল যে, ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী চুরি করিয়া কিষণজী বড় উত্ত্যক্ত করিতেছেন, যশোদামাইর খাতিরে কেহ কিছু বলিত না, আর তেমন হুঁসিয়ার পাহারাওয়ালাও সে আমলে ছিল না। এখন এই "কোম্পা-নির" মুলুকে আমার সামনে পড়িলে কিষণজী যেই ননীর ভাঁড় হইতে হাতটী তুলিতেন, অমনি খপ্ করিয়া—ভগবৎধ্যানমগ্ন পাহারাওয়ালা সত্য সত্যই দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে দৈবের বিচিত্র সমাবেশ, গোরাচাঁদের দেহখানি সেই হাত-খানির প্রান্তদেশে উপস্থিত! সুতরাং সংস্পর্শ; ফল, উভয়েরই ধ্যানভঙ্গ। একভাব হইতে ভাবান্তর প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে বড় বড় দার্শনিকগণ সমর্থ হন নাই; সুতরাং 'কিষণজী' ভাবিতে ভাবিতে পাহারাওয়ালা কেন যে "শ্বশুরা" বলিয়া উঠিল, আমি কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু বলিল—"শ্বশুরা"। গোরাচাঁদও "বঙ্গ মশাল" ভাবিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ক্যা হায়"। চিত্তবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতেই নাটকের উৎপত্তি; শব্দের উপর শব্দ পড়িলেই গোলযোগের উৎপত্তি; এ না কি নৈসর্গিক নিয়ম, তাই এ স্থলেও ইহার কার্য্য হইল। পাহারাওয়ালা পূর্ব্বে কেবল "শ্বশুরা" বলিয়াছিল, এখন বলিল—"শ্বশুরা, বাউরা, মাতোয়ারা"। অগত্যা গোরাচাঁদের

মুখে "ষও" অর্থাৎ সরিয়া যাও ধ্বনিত হইল। পাহারাওয়ালা পুনরপি বলিল "চলো থানা পর" এবং সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল করিল। গোরাচাঁদও ইংরেজী ভাষায় উত্তর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর সঞ্চালন করিলেন। ফল হইল উভয়ের বেগে গমন, অগ্রে গোরাচাঁদ, পশ্চাৎ পাহারাওয়ালা; ক্রমে রীতিমত নরদৌড়, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ—"পাক্‌ড়ো চোর—মাতোয়ারা" ইত্যাদি।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! নিরপরাধ পরহিতপরায়ণ গোরাচাঁদ জানেন না যে কেন দৌড়িতেছেন, তথাপি দৌড়! সাহস নাই এমন নয়,—এত রাত্রিতে সভা সংগ্রহ, সভা হইতে একাকী প্রত্যাগমন ভীরু লোকে পারে না। শরীরে বল নাই এমত নয়,—অন্নের উচ্ছিষ্ট প্লীহাগর্ভ বঙ্গবাসী সহজে এত বেগবান্ হইতে পারে না, তবু দৌড়। ভ্রম বশত দৌড়। পাহারাওয়ালা দৌড়িতেছে, সেও ভ্রম বশত দৌড়। সংসারে কয়জন ফিরিয়া দেখে? সংসারের গতিকই এই।

ইহাঁরা দৌড়ুন, কিন্তু পাঠক-পাঠিকা এখন নিতান্তই গ্রন্থকারের হাতে। এখন আমি মারিলে মারিতে পারি, রাখিলে রাখিতে পারি; এখন একমাত্র আমার দয়ার উপর নির্ভর। এই জন্তই গ্রন্থকারের এত সম্মান, লোকে গ্রন্থকারদের এত ভয় করে। নিত্য নিত্য দেখিতে পাও না, দক্ষিণা দিয়া হাসি হাসি মুখে গ্রন্থকারের করকবলিত হইয়া কত সুশীল সুবোধ পাঠক শেষে কাঁদিয়াও নিস্তার পান না? অতি কোমল শয্যায় সবলে শোওয়াইয়া দিলেও যাহার অস্থিভঙ্গের সম্ভাবনা, এমন কোমলপ্রাণা, পাঠকের ভালবাসার ধন, নায়িকাকেও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুলিয়া 'এই ফেলি, এই ফেলি' করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন; বহু অশ্রুপাত, বহুতর বিচ্ছেদ, বহুতর দুঃখ ভুগাইয়া আশার সুখপ্রান্ত সংস্পর্শ করাইয়া ধীর শান্ত নায়ককেও গ্রন্থকার ভদ্রাসনের খিড়কির বাঁধা ঘাটের নিম্নে অতল সাগরতলে নিমজ্জমান রাখিয়া ভদ্রলোকের মত সরিয়া দাঁড়ান। গ্রন্থকারের এই রীতি। এক্তেয়ার আছে বলিয়াই এই কার্দানি। আমিও ত গ্রন্থকার।

গোরাচাঁদ অনন্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পাহারাওয়ালা-তাড়িত হইয়া দৌড়িতে পারেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে পাহারাওয়ালার করাল কবলে কবলিত হইতে পারেন; অথবা বিপদ্-প্রশান্তমহাসাগরে সন্তরণলীলা দেখাইয়া পাঠকের অলক্ষিতে, পাঠিকার অতর্কিতে বেলা-ভূমিতে পদার্পণ করিয়া হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে পারেন; পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজি হইলে ত? সেই জন্তই বলিয়াছি, পাঠক-পাঠিকার মরণ-বাঁচন গ্রন্থকর্ত্তারই হাতে।

এখন আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্ত আমি একবার বিশ্রাম লভিব; আপনারা ভাবিতে থাকুন।

দিশাহারা।

"তুমি কার কে তোমার, কারে বলো রে আপন ?"—

নববিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। "সাধারণী" একবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল,—

"আমি তার, সে আমার, তারে বলিরে আপন।"

সর্ব্বনামে "সাধারণী" সন্তোষ হয় ; পঞ্চানন্দের হইবে কেন ? তাই এ কথাটা তোলা গেল।

তুমি গড়িয়াছ গির্জ্জা, নাম রাখিয়াছ মন্দির। দাঁড়াও পুল্‌পিটে, বলিয়া থাক সেটা বেদি। যীশুখৃষ্টের নাম গাহিয়া তুমি পাদরি ভুলাইয়াছ। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াছ। খোল করতাল, ডোর কোপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধুলি দিয়াছ। আবার-শঙ্খ-ঘণ্টা-হুলুধ্বনি দিয়া নববিধানের ধ্বজদণ্ডের বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু-কুলবধূর মন মোহিত করিয়াছ! বাবাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার, আর তোমারই বা কে ?

তোমার চক্ষে সোণার চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া। পদ্মকুটীর-অট্টালিকায় (১) বাস করিয়া তুমি সন্ন্যাসী। স্ত্রী-পরিবারে বেষ্টিত থাকিয়া তুমি বৈরাগী। কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া তুমি যোগসাধনে নিমগ্ন। রেলের গাড়ীর গদী-মোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া তুমি দারিদ্র্য-ব্রতাবলম্বী!—বাবাজী, সত্য বলিতেছি, তোমাকে চিনিতে পারিলাম না, সেই জন্য সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"তুমি কার, কে তোমার ?"

সামাজিক নিয়মসমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই জন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল আপনার মেয়েকে রাজরাণী করিয়া দিলে ? সেই জন্যই কি হিন্দুর ছত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল ? আর ঝগড়া করিয়া আরও একটা ভাঙ্গাদল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আটি করিয়া দিলে ? বলো দেখি বাবাজী, তুমি বাস্তবিক কোন্ দলের, আর তোমার আসল মতখানাই বা কি ?

তুমি পৌত্তলিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অথচ তোমার মন্ত্র তন্ত্র আছে,

---

(১) Lily Cottage

তাহাতে বাবা ভগবান্, মা ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ আছে; ভগবানের পদ্ম-আঁখি, রাঙ্গা চরণ আছে! তুমি মুসলমান,তাহাও বলিবার যো নাই, তবু মক্কা মদিনায় মহম্মদের কাছে তোমার তীর্থভ্রমণে যাওয়াটুকু আছে। তুমি খ্রীষ্টান নও, কিন্তু খ্রীষ্টান পুরাণের ব্রত-পর্ব্বের অনুষ্ঠানে তোমার ত্রুটি দেখি না। কত বলিব? আমি হতভম্ব হইয়াছি, তুমিই আমাকে দিশাহারা করিলে।

তোমাকে চিনিতে পারিলাম না বলিয়া আমার ভয় হইয়াছে। ভয় হইয়াছে বলিয়া একটা অনুরোধ করিতে চাই। সুলভ-সমাচারে দেখিয়াছি, তুমি নববিধানে "সীতা" উদ্ধার করিয়াছ। এখন অনুরোধ এই,—প্রাচীন বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, নববিধানে যেন লঙ্কা-কাণ্ডটা আর করিও না। কথাটা রাখিবে?

আমি কে, আর, আমি কার?

[বেকার লোকের লেখা।]

এই প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু মৌন সম্মতি লক্ষণ; আমি উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। বিল্ববৃক্ষবিহারী মহাপুরুষ ব্রহ্মদৈত্যেরা দৈত্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখেই প্রকট হইয়া থাকেন, কিন্তু অদ্য স্বয়ং মহাপুরুষই কথা কহিতেছেন্।

আমি কার? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই,—আমি সকলকার। আমার মনে বিকার নাই, তাই কেহ কেহ আমাকে নির্ব্বিকার বলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবিহারীর মত আমি সখী সখা, পিতা মাতা সকলকার। আমি সখা মজুমদারের (১) দ্বারী, ভ্রাতা, কোকিল বিহারীর (২) হস্তের ছড়ি, কন্যা রাজনারীর পরম হিতকারী (৩) এবং 'কমল-কুটীর'বাসিনী গৃহিণীর জীবনবারি। আমি কাঙ্গাল এবং ধনীর, মূর্খ এবং জ্ঞানীর। আমার চক্ষে শ্বেত কালো সমান, শিক্ষাশির ব্রাহ্মণ এবং শ্মশ্রু-অধর মুসলমান আমার উভয় তুল্য। কি উচ্চ কুচরাজ, কি ঝামাপুকুরের ব্রহ্মমন্দিরের মস্তক, কি কমলীর কুটী-রের প্রাচীর, আর কি ঘানিটোলার গাছঘর, অমার চক্ষে ইতরবিশেষশূন্য। বিশুদ্ধ শ্বেত স্ফটিক রচিত নয়নাবরণ মধ্য দিয়া আমি সকলি শ্বেত নির্ম্মল দেখিয়া থাকি।

আমি কে? আমি কে? আমি সব। আমি চন্দ্র, আমি পাপবৈদ্য। আমি ধর্ম্মধ্বজী—ধর্ম্মযুদ্ধে সেনানায়ক, আমি মহাসেন! আমি নিদানে; আমি মোক্ষ-মুক্তি-প্রদানে; কেবল কন্যা সম্প্রদানে শালগ্রাম দেখিয়া এক্ষণে নববিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

---

(১) ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

(২) কৃষ্ণবিহারী। (৩) কাজেই।

আমি সুন্দর গৌরাঙ্গ। বঙ্গে কত রঙ্গ করিলাম তাহার সীমা নাই। আমি যোগীর চক্ষে সন্ন্যাসী—সহধর্ম্মিণীর অগ্রে রাসরসিক এবং জামাতার অগ্রে রাজসচিব। আমায় সকলে এক চক্ষে দেখে না। ভাবুক ভেদে আমার অনেক রূপ। কেহ আমাকে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মত চতুর মনে করেন। যার চিত্ত শ্রীবাসের তুল্য প্রশস্ত, তিনি আমাকে অধমতারণ জ্ঞান করেন। কথাই আছে "মতি কি মন", জগতীতলে যত মাথা তত মত—কাজেই আমার সম্বন্ধে নানাবিধ কথা উঠিয়া থাকে। কিন্তু আমি আগে যেই, আমি পরেও সেই, আমি কিছু আর এই নয়। আমি মন্দিরে, ময়দানে, মসজীদে এবং লোকের মনে। আমি খোল করতালে, খঞ্জনী এবং হারমোনিয়মে। আমি আর কত বলিব, আমিই কলিকাতায়, আমিই শিমলায়, আমিই মুঙ্গেরে, আমিই গাজিপুরে, আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বগামী এবং ছেলে বুড়ো সকলের অন্তর্যামী।

কলিকাতার সিঁদুরে পটী (১) আমার আদ্যলীলার স্থল। শ্বেতাঙ্গধাম সুদূর সিন্ধুপার তামসতীরে (২) আমার মধ্যলীলা হয়। আর শেষ লীলা এইক্ষণ শিবাদহ (৩) সন্নিকট—ললিত গৃহে।

আমার প্রথম লীলার পারিষদ দ্বারকানাথ-সুত দেবেন্দ্র দেব। দ্বিতীয় লীলার পারিষদ অনেক—দেশী এবং বিদেশী। তন্মধ্যে সাহেব জনসারই অতি প্রধান ছিলেন। আর এই শেষ লীলায় ত্রৈলোক্য (৪) শুদ্ধ অনেক বয়স্য এবং শিষ্য।

পূর্ব্বে আমি বক্তা হইয়া বায়ুর দ্বারা জীবের ধর্ম্মায়ুর মঙ্গল সাধিতাম। এক্ষণে বায়ু ছাড়িয়া অন্যতর ভূত, জলের (৫) আশ্রয় লইয়া তদ্দ্বারাই শান্তির কার্য্য সাধন করিতেছি। মস্তকই কুলকুণ্ডলিনীর বাসস্থল, তাই লোকের মস্তকে জলসেচন আরম্ভ করিয়াছি; আর যেমন চিকিৎসকেরা এলোপেথি ছাড়িয়া হুমোপেথী এবং হাইড্রোপেথী ধরিয়াছে, আমিও তেমনি আত্মার রোগ সম্বন্ধে জলসেক জলপড়া অবলম্বন করিয়াছি। জাহাজে ইংরেজ এসে গঙ্গাজলকে অপবিত্র করায়, আমি আমার পবিত্র কুটীরের পুষ্করিণীর জলের আশ্রয় লইয়াছি। দেখা যাক, এই ধর্ম্ম-হাইড্রোপেথিতে কত দূর কার্য্য হয়।

---

(১) এখানে কেশব বাবু প্রথম বক্তৃতা করেন।

(২) যৌবনে মধ্যবর্ত্তী কালে তিনি বিলাত যান এবং বক্তৃতা করেন। তামস—টেমস্ নদী।

(৩) শিয়ালদহ।

(৪) ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, যিনি কেশববাবু কর্ত্তৃক চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

(৫) যীশুখৃষ্টের জলাভিষেক অভিনয়ে দশহরার দিন 'কমল-কুটীর'স্থ পুষ্করিণীতে যে জলোৎসব সংঘটিত হইয়াছিল।

মান।

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম, এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে! এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশ স্থলে বলে! কোথায় অমূল্য, অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়ার মান! ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা ধুতি, ছড়ি ছাতি, তেমনি মান;—দাম দিলেই পথে ঘাটে, হাটে মাঠে যত চাই, ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া, তাহাও নয়; টাকা কড়ির ত কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান আপনার ঠাঁই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার যো নাই;—হয়, ইহা স্বার্থপর শঠের কথা, নয়, বুদ্ধিহীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিম্বা কিছু পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দু দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল মান হইবে; তবে আর মুখ দেখান বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইলে ত কেহ বলে না যে, না ভাই তুমি সুখতলা হারাইয়াছ, তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখতলার অভাবে তবু পায়ে লাগে। আর মানের অভাবে?—কৈ আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্ব্বোধের কথা বলিতেছিলাম। ইহারা বলে, মান গেলেই সব গেল। খাঁটি জানিবে, বুদ্ধি শুদ্ধি থাকিতেও যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়। হয় সে মানের দালাল, খরিদদার যুটিলেই তার লাভ, নয় ত সে কোন দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্রগিরি ধরিয়াছে, তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্য্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার—চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি ব্যবসা। আর, নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলের দিন-মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেঁচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়। নির্ব্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি, আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্ব্বোধের কথা ছাড়িয়া

দাও। তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এই এত কাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী, দেখিও আভাস পাইবা মাত্র কাকের পালের কলরবের(১) মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে—মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাছে সাবধান! কি রাজদ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্ব্বত্রই আছে, সেই পঞ্চমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে—চাই, মা—ন, বড় মান, খুব মান, সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না,—তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার ফিকির। তমঃ-স্থক লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত—" সম্বোধন করে, তুমি তখন মনে করিতেছ সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই। কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার—টাকা। বল দেখি, কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্নচিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাত ছাড়া করিও না; বুঝিলে ত? তোপ (২) মারিলেও—না। আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ। সেইরূপ আঁখর (৩) দিয়া বলিলেও ভুলিও না। কীর্ত্তন গাইবার সময় আঁখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা ত জান? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়ে চিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা, আর ভৃত্য শ্যামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেইখানেই তোমার মান। তুমি আপনাকে আপনি বাবু বলিলে বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা; তাহাতে তোমার অন্ত বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাদুরি চাই না, সত্যিকার প্রজার পুরী চাই না। চাই কি, ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাক্কা খেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও ত মান। আর যদি সে সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি? তোমার নেশা ছুটিলে, চোখ ফুটিলে, দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে, সেই; মোদ্দা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙ্গা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে দুটি পয়সায় তোমার সঙ্গদোষ, চরিত্রদোষ, সকল দোষ

(১) কাকগুলা কি গরু? যে কাকের পাল বলা হইল? আমাদের মোটা রসিকের ভাষায় বাঁধুনী যেমন, ন্যায়শাস্ত্রের বাঁধুনীটা তেমন নয়। —পঞ্চানন্দ।

(২) দানের পরিবর্ত্তে সরকার হইতে নির্দ্ধারিত তোপের সম্মান পাইলেও।

(৩) আঁখর=আক্ষরিক সম্মান, যথা—সি-আই-ই ইত্যাদি।

ধুইয়া দিয়া, তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে; তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্ম্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবকে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ত ধোপার হাতে; আর ধোপা ত দু পয়সার চাকর! মানের জন্য আবার ভাবনা?

বাঙ্গলা দেশে কেহ ইতিহাস লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না; সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে, কায কি বাপু সে কথায়? এখন এই উপস্থিত মুহূর্ত্তে আমার যদি গাড়ি যুড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ ছড়ি, চশমা দাড়ি, সমস্তই থাকে, তাহা হইলে কাল আমার কি ছিল, আমিই বা কে ছিলাম—সে খোঁজ খবরে দরকার কি? বাস্তবিক দরকার কিছুই নাই; আর দরকার যাহাতে নাই, বাঙ্গালীও তাহাতে নাই। বাঙ্গালী ত অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"—যে জাতির ইষ্ট মন্ত্র, সে কি কখনও অজ্ঞান হয়?

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমারও নয়, মান আমারও নয়; মান যায়ও না। ফল কথা, মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার তখনই তার মান। মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারই নাই তখন মানের জন্য প্রাণ দেওয়া, ধন দেওয়া দূরে থাকুক, এমন যে ফক্কিকার জিনিষ ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালে ভদ্রে ফাঁকি দিয়া, কি দুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায়, ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ বস্।

ঠাকুরদাদার কাহিনী।

এক থাকেন রাজা, তিনি খান খাজা, বাস করেন আমড়ার বাগানে। কোটা-বালাখানা, বাগ-বাগিচা, দীঘী-পুষ্করিণী, হাতী-ঘোড়া, গাড়ী-পাল্কী, লোক-লস্কর—এ সব যে কত তা বলিয়া ওঠা যায় না। রাজার ভাণ্ডার, কুবেরের ভাণ্ডার। ফল কথা, ভূভারতে এমন রাজা আর ছিল না।

রাজা বয়সে যেমন নবীন, জ্ঞানে তেমনি প্রবীণ। রাজা হইলেই তার যেমন সুয়া দুয়া দুই রাণী থাকিতেই হয়, এ রাজার তা ছিল না;—এক রাজপাটে এক পাটরাণী। এখন রাজরাণী হওয়া নাকি খুব জোর কপালের কথা, তোমার আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, এই ভেবে রাজা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পারিষদবর্গ একদিন বিকাল বেলায় দেখে যে, ফুলবাগানের পদ্মপুকুরের পাথর-বাঁধা ঘাটে ধরাসনে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, বিমর্ষভাবে রাজা মৌনী হইয়া রহিয়াছেন।

পারিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ পারিষদ, চুপি চুপি পা টিপে টিপে পেছন দিক্ দিয়া রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া চুপ করিয়া দুই হাতে রাজার চক্ষু চাপিয়া ধরিল। রাজা তখন একমনে ভাবিতেছিলেন, আঁৎকে উঠিলেন, পারিষদ তবু চক্ষু ছাড়িল না। কাজে কাজেই রাজাকে পারিষদের হাতে হাত বুলাইয়া দেখিতে হইল, লোকটা কে? হাত বুলান শেষ করিয়া, একটু রাজহাসি হাসিয়া রাজা বলিলেন—ঠাওরাইতে পারিলাম না।

তখন সেই হাতের মালিক ফিক্ করিয়া একটু হাসি ছাড়িয়া দিয়া, রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—ব'লি, মহারাজ, একা ব'সে এত ভাবনা হচ্ছিল কিসের?

চোখ ধরাতে রাজার ভাবনা গিয়াছিল, এই কথায় আবার সেই ভাবনা ফিরিয়া আসিল, রাজা বলিলেন—প্রিয় সখে! ভাবি কি সাধে? ভাবনা আসিয়া পড়ে, তজ্জন্যই ভাবিতে হয়। পরের দুঃখ ভাবিতেছি।

পারিষদ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে রাজার বাক্যসকল শ্রবণকুহরে প্রবেশ করাইতেছিল। ফুরাইলে পর, উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, অপিচ বলিল—"মহারাজ, সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা আপনি, আপনার আবার ভাবনা? ধনাগারে ফাঁক নাই, হীরা মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ; শরীরে ফাঁক নাই, রূপযৌবন পরিচ্ছদাদিতে শোভা উছলিয়া পড়িতেছে; গীত বাদ্য, মাংস মদ্য, সদস্য বয়স্য, কিছুরই অভাব নাই। আমি ভাবিতেছি, ভাবনা কোন্ পথ দিয়া কোথায় প্রবেশ করে? না মহারাজ, আজ অন্য কোন নিগূঢ় কথা আছে, আমাকে বলিবেন না, সেই জন্য এই সকল ওজর করিতেছেন।"

পারিষদের এই শ্লেষসূচক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ মাত্র, রাজা অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া খিন্ন চিত্তে উত্তর করিলেন—প্রিয় বয়স্য, তোমার নিকট আমার গোপনীয় কি আছে? তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া অবিচার করিতেছ। সত্য সত্যই আমি পরের দুঃখ ভাবিয়া কাতর হইয়াছি।

উভয়ে মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা একে একে দুঃখ জানাইতে লাগিলেন, পারিষদ যথাক্রমে তাহার প্রতিবিধান ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল।

বিস্তীর্ণ রমণীকুলমধ্যে একজন মাত্র রাজরাণী হইতে পারে, অন্যের সেই সৌভাগ্য সম্ভবে না। ইহাই রাজার এক নম্বর পরদুঃখ।

মীমাংসা অতি সহজ। পারিষদ বলিল,—মহারাজ, এ দুঃখের নিবারণ ত আপনারই হস্তে রহিয়াছে। বাক্য এবং ব্যবহারে আপনি ঘোষণা করুন যে, যাহার রাজরাণী হইবার সাধ আছে, আপনি তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, আপনার পাটরাণীর প্রতি একাগ্রতা পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে সৌভাগ্য-কামিনী রমণী মাত্রকেই রাণী নির্ব্বিশেষে অশন ভূষণ সম্প্রদান করিয়া পরদুঃখনিরসন এবং আত্মভাবনা বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সংশয় দেখি না।

"সাধু! বয়স্য, সাধু," বলিয়া মহারাজ প্রিয় বয়স্যের করমর্দ্দন এবং শিরশ্চুম্বন করিলেন। এত সহজে এক চিন্তার পার পাইয়া, আর এক চিন্তার উন্মেষণ করিলেন। বলিলেন,—"বয়স্য! আমার প্রজাবর্গ অতি দরিদ্র, কোনও প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু তাহাদের চরিত্র বড় দূষিত। গণিকা এবং মদিরাতে তাহাদের ধনক্ষয় হয় এবং তাহারা সপরিবারে কষ্ট পায়; ইহার উপায় কি?"

এই দ্বিতীয় দফার দুঃখও অকিঞ্চিৎকর। পারিষদ প্রস্তাব করিল,—মহারাজ, এ জন্য চিন্তা কি? ব্রহ্মাণ্ডের বারবিলাসিনীগণকে আপনি আশ্রয় প্রদান করুন, প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদিগকে রাজপুরীমধ্যে আনয়নপূর্ব্বক নিশাশেষে বিদায় করিয়া দিউন, তাহাদের জীবিকা জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিউন, এবং তাহাদের মনোভঙ্গ নিবারণ জন্য রাজপ্রাসাদে সুরাচ্ছত্র সংস্থাপন করিয়া দিউন। মহারাজ, এ প্রকার নিয়ম হইলে শৌণ্ডিকের ব্যবসায় বিলুপ্ত হইবে না, অথচ নেশাকর ও নিশাচর প্রজাবর্গের ধনবৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইবে, আপনি ধর্ম্মযাজক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন এবং আপনার যশোরাশি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া ধরণীমণ্ডলে বিঘোষিত হইতে থাকিবে, বমের শব্দের ন্যায় দূর দূরান্তরে আপনার নামের শব্দ শোনা যাইবে

তখন রাজার মনে তিন নম্বরের চিন্তা উদ্রিক্ত হইল। যে পণ্ডিত, যে বিদ্বান্ তাহার সম্মান সকল রাজ্যে সকল রাজাই করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। এমন অবস্থায় মূর্খ বর্ব্বরগণকে ঘৃণা করা, তাহাদের সংবাস বর্জ্জন করা, অতি নিষ্ঠুরের ধর্ম্ম। বয়স্য, কি বলো?

পারিষদ তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্নের সারোদ্ধার করিয়া দিল। যোড়হস্তে বলিল—মহারাজ, আমিও ঐ কথা অনেক দিন ধরিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া আসিতেছি। আমাদিগকে স্থান দিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসার পথ আপনি অনেকটা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তবু এতদিন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে আমার সাহস হয় নাই। আজ যাই আপনি উত্থাপন করিলেন, এখন আর কোরকাপ না রাখিয়াই সব বলিয়া ফেলিব। পণ্ডিত আর ভদ্র বেটারাই এতকাল আদর যত্নের একচেটে করিয়াছিল; সেই বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে ঐ কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মহারাজ, আপনি যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন—বিদ্যা আর সভ্যতা সুকৃতির ফলেই হয়। সুতরাং মূর্খদিগকে দেবতায় মারিয়াছে বলা উচিত, তাহার উপর মানুষে মারিলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়। মহারাজ আপনি নিয়ম করুন যে, যার পেটে কালির দাগ আছে, তাহাকে রাজভবনের ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলেই বিধাতার যন্ত্রণাটা আর থাকিবে না; হেসে খেলে সকল লোকেই আপনার জয়জয়কার করিবে। বাস্তবিক মহারাজ লোকের চরিত্র শোধনের যে উপায় করা হইয়াছে, তাহার পর ভদ্রলোককে এদিকে ঘেঁসিতে

দিলে, আবার যাকে তাই হবে, লাভের মধ্যে স্থানটা ভালো। যে যথার্থ ভদ্রলোক, সে সহজেই এ মুখো হবে না। আর যে নামে ভদ্র, তার সম্বন্ধে অর্দ্ধচন্দ্রাবিধান হইলেই সমস্ত নির্ভয় নিঃসংশয়।

রাজা বলিলেন,—বয়স্য, সুন্দর কথাই বলিয়াছ। কিন্তু লোকের স্বভাব আমি বিশেষ অবগত নহি, তাই একটা আশঙ্কা হইতেছে, আমার নামে ব'ম্ ফুটিবে ত?

পারিষদ নিবেদন করিল—মহারাজ বলেন কি? ব'ম্ ত ব'ম্, আপনার নামে তোপের শব্দ হইবে, লোকের কাণ ঝালা পালা হইবে, দুষ্ট পড়শীর বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরিবে, চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। মহারাজ! আপনি রাজা, শাস্ত্রে বলে—"মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ কি না রাজা ত মানুষ নয়, দেবতা; সংসারে কেবল লীলাখেলা করিতেই আসা। তা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতেছি, আপনার লীলার কেহ অন্ত পাইবে না।

তার পর, এই নিয়মে রাজা ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। অতএব আমার কথাটী ফুরাল, নোটে গাছটী ইত্যাদি।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

কামিনী সুন্দরী বসু বিকাল বেলায় আফিস হইতে বাসায় আসিলেন। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। তামাক সাজা ছিল, মেনকা খানসামানী আলবোলার নলটা কামিনী বসুর হাতে তুলিয়া দিল; তিনি মৃদুমন্দ ভাবে টানিতে লাগিলেন। একে একে মেনকা সেই অবসরে জুতা যোড়াটী, মোজা যোড়াটী খুলিয়া লইল, চটী জুতা পরাইয়া দিল, গাউনের বক্ষ ছন্দ খুলিয়া দিল, দিয়া শাড়ীখানি হাতে করিয়া সসম্ভ্রমে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাকের আশ মিটিলে, কামিনী সুন্দরী বসু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাড়ীখানি মেনকা বাড়াইয়া দিল, তিনি গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিলেন। অন্দরের এক ছোঁড়া চাকর সেই সময়ে সম্মুখের উঠান দিয়া পুকুরের ঘাটে একটা গেলাস ধুইতে যাইতেছিল, কামিনী সুন্দরীকে দেখিয়া কোঁচার আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই মুখ হাত ধুইয়া কামিনী সুন্দরী বসু অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কামিনী সুন্দরীর যৎসামান্য বাহির-ফটকা রোগ ছিল। তা থাকুক, কিন্তু পরিবারের প্রতি তাহার অযত্ন ছিল না। আফিসের ফেরত রোজকারের টাকার অধিকাংশই বাটীর ভিতর গিয়া দিতেন, আর সেই সময়ে দুটা খোসগল্প করিয়া দিবসের অবসাদ নষ্ট এবং অর্দ্ধাঙ্গের মন তুষ্ট করিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ তাহাতেই [illegible]।

কামিনী সুন্দরীর পরিবার একহারা, গৌরবর্ণ, দিব্য ফুটফুটে ছোকরাটী। তাঁহার সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফ রেখাঙ্কের অবস্থা ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লতাইয়া পড়ে নাই। হরিতালের কল্যাণে গালপাট্টা প্রকট হইতে পারে নাই। মাথায় আলবার্ট কাটা টেড়ি, কোঁচার কাপড়ে অৰ্দ্ধাবৃত। পরিবারের নাম ভৈরব দাস, কিন্তু কামিনী সুন্দরী আদর করিয়া তাহাকে ভয়ী বলিয়া ডাকেন। ভয়ী,—কামিনী সুন্দরী বসুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার সচরাচর যেমন প্রবল হয়, মুখর হয়, প্রগল্‌ভ হয়, ভৈরব সেরূপ নহেন। কামিনী সুন্দরী বসুর প্রথম পক্ষের এক কন্যা আছেন, কিন্তু ভৈরবের ব্যবহারে সেটী যে সপত্নীর কন্যা তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—ভৈরব এমনি শান্ত, এমনি সংস্বভাব, এমনি স্নেহময়। এ হেন ভৈরবকে কামিনী সুন্দরী বসু ভালবাসিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অদ্য দশ অঙ্গুলে দশটা হীরার আংটী, হাতে চুড়ি, বালা, গলায় চিক, কোমরে সোণার চন্দ্রহার, আরও (নাম জানি না) কত কি অলঙ্কার সুকোমল শরীরের নানা অঙ্গে পরিয়া, জলখাবারের থালা সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ভৈরব বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনী সুন্দরী হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসনে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন,—"কি ভয়ি! আজ যে বড় বাহার দেখাচ্চ! শরীরটে বাঁধা দিয়েচ, প্রাণটা কেড়ে নিয়েচ, এখন কি নেবে?"

ভৈরব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, মৃদু হাস্যে ভুবন ভুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"প্রাণনাথিনি! আমার বাহার ত তোমারই নিমিত্তে। আমায় যতদিন তুমি ভালবাসিবে, যতদিন তোমার অনুগ্রহ থাকিবে, ততদিনই আমার বাহার। এখন সাহস আছে, ভালবাস, তাই এ বাহারও আছে; বারণ কর, আর বাহারও করিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের চক্ষু যেন ছলছল করিয়া আসিল।

কামিনী সুন্দরী তখনও আহারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাড়াতাড়ি ভৈরবের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"ছি ছি ভয়ি। আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিতে ও কথা বল্লাম? রোজ রোজ, এমন সাজগোজ দেখি না, সেই জন্যেই রহস্য করে একটা কথা বল্লাম! তুমি আমার উপর রাগ করলে?"

পত্নীর সোহাগে কোন্ সাধু পতির মন না গলিয়া যায়? ভৈরব পরিহাসের স্বর অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"তোমার মন বুঝিবার জন্য অমন করিলাম, তাহাও বুঝিলে না। আজ ওবাড়ীর দাদা একবার দেখা করতে চেয়েছেন, তাই মনে ক'রেছি যে, তুমি যদি বল, তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"

কামিনী সুন্দরী বসুর ইচ্ছা নয় যে, এমন সময়ে ভৈরব কোথাও যান। তিনি ভৈরবকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈর্ষ্যা ছিল না, এমন কথা আমরা

বলিতে প্রস্তুত নহি। ভৈরবের কথার উত্তর না দিয়া কামিনী সুন্দরী বসু বলিলেন— "তোমাদের বৌয়ের স্বভাবটা বড় খারাপ হোয়ে যাচ্ছে। সে দিন মন্দাকিনীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে কি ঢলাঢলিটে না কর্‌লে? আবার শুনচি যে মেচোবাজারে জীবনকৃষ্ণের বাড়ীও যাতায়াত আরম্ভ করেচে; কেউ কেউ বলে, তাকে বাঁধা রেখেচে। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন।" অদ্য সন্ধ্যার পর জীবনকৃষ্ণের বাড়ীতে কামিনী সুন্দরী বসু এবং তাঁহার ইয়ারিনীদের মজলিশ হইবার কথা আছে, ভৈরবকে তাহা আর বলিলেন না। হয় ত পাছে ভৈরব আপন দাদার মুখে কিছু ইঙ্গিত পায়, সে ভয়েও তিনি কথা চাপিয়া গেলেন।

তাহাতে কিন্তু ভৈরব দাস বুঝিলেন না। দাদার সঙ্গে দেখা করিব র জন্ত একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামিনী সুন্দরী বসুর মনে ঈর্ষ্যা ছিল; কেন, বলা যায় না। কিন্তু আজ সেই ঈর্ষ্যা সন্দেহে পরিণত হইল। ভাল করিয়া জল খাওয়াও হইল না, একটা বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ওজর করিয়া কামিনী সুন্দরী বসু তাড়াতাড়ি বাহির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময়, ভৈরবের জলধারা ভৈরবের কপোলদেশ অভিষিক্ত করিতেছে, দেখিয়া আসিলেন; তাহাতে চিত্ত আরও উদ্‌ভ্রান্ত হইল।

পাঠ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কামিনী সুন্দরী বসু অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তার অবসান না হইয়া বাহুল্যই হইতে লাগিল। তখন সেই খানসামানী মেনকাকে ডাকিলেন। মেনকা মনের গতি জানিত, সুরাপূর্ণ ডিকাণ্টার, গেলাস, জল, বরফ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কথাটী না কহিয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুষ্ট লোকে বলে, মদ আনিবার সময়ে মেনকা এক গণ্ডূষ আপন গলায় না দিয়া আনিত না এবং গন্ধের আশঙ্কাতেই কথা কহিত না। কিন্তু সে দুষ্ট লোকের কথা। যে কালে পুরুষেরা স্বাধীন ছিল, তখন বাবুদের খানসামারও ঐ অপবাদ শুনা যাইত।

দুই গেলাস মদ ক্রমে ক্রমে কামিনীসুন্দরী বসুর উদরে পড়িল। তাহার পর নিজ গুণে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া দুই গেলাসই তাঁহার মাথায় গিয়া উঠিল।

তখন কামিনিসুন্দরী বসু কয়েক বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, তাহার পর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় "জীবন কৃষ্ণ নাচে ভাল" এই কথা কয়টী অস্ফুট স্বরে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

চল পাঠিকে! কামিনীসুন্দরী বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই—(উচ্ছন্নে?)।

চিঠির মুসবিদা

[সেকেলে উকীলদের একটা খ্যাতি ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে যে, তাঁহারা মুসবিদা করিতে অদ্বিতীয়। হাল ধরণের উকীলগণ হাত পা নাড়িতে ভাল, নজীর দেখাইতে ভাল, কিন্তু বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত ; মুসবিদার ত তাঁহারা যম।

পঞ্চানন্দ সেকেলে। অগত্যা যাবতীয় সংবাদপত্র ও প্রবন্ধপত্রের সম্পাদকবর্গের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া, অনেক দিন ধরিয়া একখানি পত্রের মুসবিদা করিতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য কিছুকাল তদীয় দরজা রুদ্ধ ছিল, তোমরা তাঁহার শ্রীচরণরাজি সন্দর্শন করিতে পাও নাই।

পত্রখানি এখন প্রস্তুত। প্রত্যেক পত্রসম্পাদক সমীপে প্রেরণ করিতে হইলে বহু ব্যয়, বিলম্ব এবং বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। তাই, নিম্নে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে. আবশ্যক অংশ সম্পূর্ণ করিলেই কাজে লাগিবে।]

মহামহিম মহিমার্ণব——

শ্রীলশ্রীযুক্ত (নাম এবং পুচ্ছ থাকিলে পুচ্ছের পরিচয় বসাইতে হইবে) মহোদয়—
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন

বরাবরেষু।

সযোড়হস্ত সকাতর সবিনয় নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।

পরং মহাশয়ের মহারাজোন্নতি (অথবা রাজোন্নতি, রায়োন্নতি, বাহাদুরোন্নতি, অভাবে বাবুন্নতি, যেখানে যেমন বসাইতে হয়) নিয়ত শ্রীশ্রীগবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে এ দেশের এবং এ দাসের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল জানিবেন।

মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাহাতে বীণাপাণি বাগ্‌দেবী নিতান্ত উপকৃত এবং চিরচরিতার্থ হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু ভবদীয় লেখা-পড়া শিক্ষা শুদ্ধ বদান্যতা মাত্র।

কাজেকাজেই মহোদয়ের নামের জ্যোতিঃ ভূমণ্ডলের উত্তর মহাকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ মহাকেন্দ্র পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, দেশের তমোরাশি অপসৃত হইয়াছে। এখন সূর্য্যদেব থাকিলেও চলে, না থাকিলেও চলে।

আপনার গুণানুবাদ করি, এত শক্তি আমার নাই। কারণ, আপনার সম্বন্ধে অত্যুক্তি অসম্ভব। বানরকে নাই দিলে মাথার উপর চড়ে। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছে।

বিলাসভোগই আপনার উপযুক্ত কার্য্য। তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন দেখিয়া ভবদীয় শ্রীকমলসংযুক্ত পত্র (প্রাপ্তে বা অপ্রাপ্তে) মূঢ়বুদ্ধি অসমসাহসী স্বার্থান্ধ আমি সাহস

বাধিয়া (বঙ্গদর্শন বা বান্ধব, সাধারণী বা সঞ্জীবনী (১) এইখানে বসাইবে) লইয়া মহাশয়ের দ্বারস্থ হইয়াছি। আপনার অসীম কৃপা, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, সেই জন্ত আপনি আমাকে সার্দ্ধচন্দ্রে বিতাড়িত করেন নাই। অপিচ কখনও কখনও অতি সুদুর্লভ অবসর পাইলে মোড়ক খুলিয়া, মলাট তুলিয়া অভ্যন্তরে শুভ দৃষ্টি পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এ আনন্দ প্রকাশ করি কাহার কাছে? এ গৌরব বোঝে কে?

ফলে আপনি এবম্প্রকারে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া শতমুখেও ব্যক্ত করা যায় না। এই সঙ্গে যদি আর একটু উপকার করেন— লুব্ধের আশার নাকি সীমা নাই, তাই বলিতেছি—আরও একটু উপকার যদি করেন, তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহে ঋণ-সাগরে আমি একেবারে তলাইয়া যাইতে পারি।

পাপিষ্ঠ কাগজ-বিক্রেতা অত্যন্ত অর্থলোভী। মহাশয়ের মন যোগাইবার অভিসন্ধিতে, সেই কাগজে ভবদীয় গুণ গরিমার বর্ণন করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের নিকট লইয়া থাকি। কিন্তু এমন মহাব্রতের গৌরব তাহারা বোঝে না, তাহারা সর্ব্বদা পেটের দায়েই অস্থির, হা অন্ন হা অন্ন করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তোলে। তাহাতে একমনে মহোদয়ের গুণচিন্তনের ব্যাঘাত হয়! বিধর্ম্মী পাষণ্ড দপ্তরি কাটিয়া ছাঁটিয়া, বাঁধিয়া খুঁড়িয়া ভবদীয় অনুগ্রহ লাভে জন্ম সার্থক না করিয়া, বেতন চায়। মহাশয়েরই পদসেবার জন্য শোষক রাজা ডাকহরকরাগিরি ব্রতাবলম্বন করিয়াছে অথচ টিকেট বিক্রয়চ্ছলে শোষকতা ছাড়িবে না। আর, ক্ষমা করিলে বলিয়া ফেলি, উদর নামে আমার যে এক শত্রু আছে, সেও মহাশয়ের কাজে বাধা দিয়া থাকে। বক্তৃতা করিয়া হউক, সভা করিয়া হউক, বিলাতে ভগ্নদূত পাঠাইয়া হউক কিম্বা "পারিলে মন্দে" (২) দরখাস্ত করিয়াই হউক, যে কোন প্রকারে এই দুষ্ট সম্প্রদায়ের শাসন যদি করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মহানুভবের নিকট "বিনি মূলে চিরবিক্রীত হইয়া থাকি।

বাস্তবিক শপথ করিয়া বলিতেছি, এই অন্যায় অন্তরায়গুলি না থাকিলে আমার [অমুক] পত্র প্রকাশ করিতে তিলমাত্র নিয়ম ব্যত্যয় হয় না; এবং আপনার অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ এবং স্বদেশবাৎসল্য অপ্রতিহতভাবে লীলা করিতে পাইয়া জগৎ সংসারকে তোলপাড় করিয়া তুলিতে পারে।

বক্তৃতা, সভা ইত্যাদি বিষয়ে যদি আপনার নিতান্তই অমত হয়, তাহা হইলে ভদ্রলোকের মত দামটা ফেলিয়া দিলেও চলিতে পারে। তাহাতে আমার ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তা প্রকাশ পাইবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনার দোষ কি? না হয় মনে করিবেন, এ কাগজখানাও সাহেব-চালিত ইংরেজী কাগজ, অথবা এ

(১) "বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী"।

(২) পার্লিয়ামেণ্ট।

টাকা কয়টা সাহেব-চালিত সৎকর্ম্মের চাঁদা, কিম্বা শুঁড়ীর খাতার দেনা কিম্বা ইত্যাদি। আপনার "ইত্যাদি" অনন্ত, আমি কি তত জানি, না প্রকাশ করিতেই পারি ?

মহাশয়ের কুশলেই এখানকার কুশল। অধিক লিপি বাহুল্য। নিবেদন ইতি।

দাসখৎ

[নাম বসাও]

অধ্যক্ষ [বা কার্য্যনির্ব্বাহক]

বিদেশভ্রান্ত যুবকের পত্র। *

প্রিয় মহাশয়,

যাহারা বিদেশে গিয়া থাকে, বঙ্গীয় সমাজে তাহাদের নানা কলঙ্ক রটনা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমাদের অর্থাৎ বিদেশ-দর্শনকারী যুবকগণের অপেক্ষা স্বদেশের মঙ্গল কামনা কে অধিক করিয়া থাকে ? তবে যে আপনাদের সহিত আমাদের আচার ব্যবহার মেলে না, সে মহাশয়দের দুর্ভাগ্য। এ বিষয়ে অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা ক্রমে ক্রমে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব। ভরসা করি, আপনার ইহাতে উপকার হইবে।

আমার স্মরণ হইতেছে যে, এক বৎসরের কিছু বেশী হইবে আমি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাই নাই, ফলতঃ এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার এ প্রকার অদ্ভুত যে, তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময় সংবরণ করিতে পারি নাই। তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

গত ১লা এপ্রেল যখন আমি জাহাজ হইতে প্রিন্সেপ ঘাটে নামিলাম, সেই দিন প্রথমেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার চক্ষুর উপর পড়িল। আমার সাজ সরঞ্জাম জাহাজ হইতে নামাইবার জন্য বাহকের প্রয়োজন হইয়াছিল। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্য সত্যই কতকগুলা কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য মনুষ্য—পরে জানিয়াছি ইহাদিগকে কুলী বলে—খাঁটি উলঙ্গ হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কেবল তাহাদের কটিদেশে বোধ হয় তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট অতি মলিন কাপড় জড়ান রহিয়াছে, তাহার গন্ধ এখনও পর্য্যন্ত আমার নাকে ঘুরিতেছে। তাহাদের পায়ে জুতা নাই; গায়ে কাপড় নাই, মাথায় টুপি নাই। যাহা হউক, কোনও প্রকারে আমার দুর্ণাকে জয়

---

* আশঙ্কিত ভ্রান্তি নিরসনার্থ জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এস্থলে ভ্রান্ত অর্থে কৃতভ্রমণ বোদ্ধব্য ইতি।——পঞ্চানন্দ।

করিয়া তাহাদের সাহায্যে এক ঠিকা গাড়ীতে আমার দ্রব্য সামগ্রী সমেত আমি অধিষ্ঠিত হইলাম। বিদেশে থাকিতে যে ভদ্রলোকের সহিত আমার পত্র লেখালেখি হইত, তাঁহার বাসস্থানের গলির নাম এবং নম্বর বলিয়া দিলাম, কিন্তু চালক কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু চালক কিঞ্চিৎ বকসিসের প্রতিশোধ স্বরূপ—(এদেশে ইহাও এক লক্ষ্য করিবার কথা, অধিকাংশ লোকেই, সম্মানযোগ্য বর্জ্জন অবশ্যই আছে, বক্‌সিসে বড় অনুরক্ত) আমার বন্ধুর বাটীর সম্মুখে আমাকে নামাইয়া দিয়া বাধিত করিল। আমার স্মারক পুস্তকে তাহার নাম লিখিয়া রাখিয়াছি।

বন্ধুকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম। কিন্তু এত কাল পরে দেখা হইয়া যে সুখ হইবে মনে করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে বিষম দুঃখ হইল। বন্ধুও সেই কুলী-দের ন্যায় উলঙ্গ। তবে ইঁহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত যেমন বেশী ঢাকা, তেমনি এ দিকে আবার কাপড় এত সূক্ষ্ম যে দুঃখের কথা কি বলিব, যতক্ষণ বন্ধুর নিকটে ছিলাম, একবারও তাঁহার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি করিতে পারি নাই। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আমি বন্ধুর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছি এবং আমার সঙ্কোচের ভাব কোনও প্রকারে অপনীত করিতেছি, এমন সময় বন্ধুর দুইটী পুত্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। একটীর বয়ঃক্রম চারি ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে, আর একটীর আড়াই বৎসর। কিন্তু ভগবান্ জানেন, তাহাদের কাহারও গাত্রে যদি এক আঁস সূতো থাকে অথচ যে পরিমাণ বহুমূল্য ধাতুদ্রব্য তাহাদের শরীরে ছিল, তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে, ইংলণ্ডের কোন এক বৃহৎ কৌণ্টীর সমস্ত দরিদ্র লোককে বস্ত্রাবৃত করিতে পারা যায়। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। "স্বদেশীয়" "স্বজাতি" প্রভৃতি কথা উত্তম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্লীলতার উপর, সভ্যতার উপর, আক্রমণ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত।

মার্সম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে অংশে বাঙ্গালা লেখে এবং বলে, তাহার নাম বঙ্গ অথবা বঙ্গদেশ।

এখন আর এ সংজ্ঞায় চলিবার যো নাই; যে বলিতে পারে, সে ইংরেজী বলে, বটু কাটিবা বলে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাণান্তেও বলে না। আর যে বলিতে পারে না, সে ত মুখচোরা; তাহার ইহকাল নাই পরকাল নাই, চাকরি যোটে না, ব্যবসা চলে না, সুতরাং তাহার পক্ষে বাঙ্গালা অবাঙ্গালা একই কথা। আর বাঙ্গালা কেহ কেহ লেখে বটে, কিন্তু বড় একটা বিকায় না। অতএব মার্সম্যান সাহে-বের আমল আর নাই, ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইল।

ফলে ইহাতে তাদৃশ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ, বাঙ্গালা না থাকিলে ও বাঙ্গালী উৎসন্নে গেলেও বঙ্গদেশ থাকিবে, এমত অবস্থায় তাহার ইতিবৃত্ত লেখা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে এক্ষণে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাহারা দুই জাতিতে বিভক্ত, কতক পুরুষ জাতি, কতক স্ত্রীজাতি।

এই পুরুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম রাজপুরুষ, দ্বিতীয় রোজকেরে পুরুষ, তৃতীয় কাপুরুষ।

যাহারা দণ্ডমুণ্ডকারী, অসিতচর্ম্মধারী, ঈডোনোদ্যান-বিহারী, ফেটনবান-সঞ্চারী, বামার্দ্ধসহকারী তাহারা বিশিষ্ট রাজপুরুষ। আর, যাহারা অসিতচর্ম্মধারী হইলেও স্মিতবদন-বিকাশকারী, প্রাপ্ত পদকল্যাণে নরান্তকরূপে কাষ্ঠাসন-বিহারী, অধম-জন-মনোভীতি-সঞ্চারী, মনোমোহন-গৌর-পদ-লেহন-সুখজন্য সদা অহঙ্কারী—তাহারা অবিশিষ্ট রাজপুরুষ।

যিনি প্রশস্ত রমণীকুল মধ্যে কেবল গৃহিণীতে অনুরক্ত, গৃহিণীর ভক্ত, জনক-জননী ভ্রাতা-ভগিনীতে বিরক্ত, শ্যালক-শ্যালিকা-বলে শাক্ত, যিনি বিস্তীর্ণ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিজাতীয় বক্তৃতাপ্রসক্ত, দেশ সমেত লোক যজ্জন্য উত্ত্যক্ত, শাক চচ্চড়ির পরিবর্ত্তে যিনি গো-মেষ-মহিষ-মটন-মুরগীতে আসক্ত, তিনি রোজকেরে পুরুষ।

এই উভয় সম্প্রদায়কে আমরা বারবার নমস্কার করি।

বাকী যাহারা বাজে নিষ্কর্ম্মা লোক চাষ বাস করে, দোকান পসার করে, টেক্স দেয়, গালি খায়, তাহারা যেমন কাপুরুষ, আমরাও তদ্রূপ। অতএব ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও। এই গলগ্রহ বহিতে হয় বলিয়াই রোজকেরেরা বাঙ্গালাকে স্বর্গে তুলিতে পারেন না। তন্ন চেৎ এতদিন বঙ্গদেশের স্বর্গপ্রাপ্তি, গয়াকৃত্য পর্য্যন্ত হইয়া যাইত।

বঙ্গদেশে এখনও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত হয় নাই। ক্ষুদ্রারা হাট বাজার করে সত্য, মহতীরা তীর্থভ্রমণ করেন সত্য; কিন্তু মেজবউ বাড়ীতে চেয়ারে উপবেশন করিয়া কাব্য-রসাস্বাদন করিতে পারেন না, কোণের বউ গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন না, বিলাসিনী বারে বসিয়া থাকিতে পান না, মিত্র-স্বজনের পাণি-পীড়ন করিতে পান না, চটুল চরণে নাচিতে পান না—তবে আর কোন্ মুখে বলিব, স্বাধীনতা আছে?

বঙ্গদেশে কি কি হয়? পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য হয়, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়, কালেজে ডাক্তার হয়, বাহিরে হাভুড়ে হয়, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হয়, বালকের বিবাহ হয়, বালিকার বৈধব্য হয়, কবি হয়, কাব্য হয়, আর মাথা মুণ্ড যথেষ্ট হয়।

অন্যান্য বিবরণ দ্বিতীয় চালানের সহিত পাঠান যাইবে।

ধরমসিংহের নান খাতাই।

না—ন্ খাতা—ই!

ইহকাল আছে, পরকাল—আছে, বেদ—আছে, বাইবেল—আছে, কোরাণ—আছে, আবেস্তা—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

খোল—আছে, করতাল—আছে, নাচ্চা—আছে, নাজী—আছে, ভেক—আছে, ভিক্—আছে, ঝোলা—আছে, ঝুলী—আছে, রং—আছে, তামাসা—আছে

না—ন্ খাতা—ই।

চসমা—আছে, ঝাড়—আছে, লণ্ঠন—আছে, কোট—আছে, কুটীর—আছে, বালাখানা—আছে, মন্দির—আছে, দর্পণ—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

এক—আছে, অনেক—আছে, হরি—আছে, চৈতন্য—আছে, ঈশা—আছে, মুসা—আছে, নাচ—আছে, গান—আছে, আদ্দাশ—আছে, স্বপ্ন—আছে।

না—ন্ খাতা—ই!

পৌত্তলিকতা—নাই।

প্রত্ন-তত্ত্ব

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ, মান্যবরেষু

প্রিয় মহাশয়,

আমি দেখিতেছি যে, বঙ্গদেশের এবং বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি কর্ম্মে আপনি অতিশয় যত্নপর হইয়াছেন। ইহাতে আপনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু কি কি বিষয়ে বিশেষ-রূপ মনোযোগ বিধান করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন করণে আপনার ভ্রম হইতেছে দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।

রাজনীতি বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। সে কার্য্যের জন্য অনেকগুলি সভা হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা প্রচুরের অতিরিক্ত কার্য্য হইয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাজনীতির আন্দোলন এখন বিলাসের বস্তু বলিলেও বলা যায়।

ধর্ম্মের জন্যেও আর চিন্তার কারণ নাই। যে হারে ধর্ম্মের সংখ্যা এখন বাড়িতেছে, বোধ হয় এরূপ চলিলে, প্রত্যেক ভারতবাসী একটী একটী পৃথক্ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারিবে; একজনকে অপরের ধর্ম্মের ভাগ চাহিতে হইবে না।

সমাজের কথায় ভদ্রলোকের থাকাই, আমার মতে অকর্ত্তব্য। সমাজে এত বিভিন্ন প্রকার লোক আছে, তাহাদের মধ্যে এত বিভিন্ন প্রথা সকল প্রচলিত আছে, এবং সেই উপলক্ষে এত জঘন্য কার্য্য আচরিত হয় যে, তাহাতে লিপ্ত হইতে গেলে ভদ্রের ভদ্রত্ব রাখা অসম্ভব। তবে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও উন্নতি বিধান করিতে হইলে অবশ্যই কচিৎ কখনও কিছু বলিতে পারেন।

ভাষায় একমাত্র অভাব ভিন্ন কোনও অংশে খর্ব্বতা পরিলক্ষিত হয় না। সে অভাবের কথা পশ্চাৎ সবিস্তার লিখিতেছি। এই দেখুন, ইতিহাস যথেষ্ট। বোধ হয়, এক মার্সম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু কম দশ বারোখানা অনুবাদ, চুম্বক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি আছে। একটু হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরেজী ভাষায় যত ইতিহাস আছে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার দশ বারো গুণ বেশী ইতিহাস হইল।

কাব্যের ত কথাই নাই। কাব্য এখন ছাঁচে ঢালিয়া লইলেই হয়, কিম্বা কলে প্রস্তুত করিয়া লইলেও হয়। আদিরসে—প্রেম, প্রণয়িণী, বিরহিণী, নবীন পল্লব, শিশির, নিশি; করুণরসে—ভারত, জননী, নিদ্রা, (১) সন্তান; বীভৎস রসে—ছাই, ভস্ম; রৌদ্র রসে—দাপট, সাপট, মহাভৈরবী, মেঘগর্জ্জন, শ্মশান; বীররসে—জাগো, উঠো,—ইত্যাদি কয়েকটা কথা মনের আগুনে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া দিলেই কাব্য। সুতরাং এ অংশে কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই।

উপন্যাসেরও কল আছে। ইংরেজীর মাথা মুণ্ড কলের ভিতর গুঁজিয়া দিলেই খাসা খাসা উপন্যাস বাহির হইয়া আইসে।

নাটক আরও প্রচুর। যেখানে দেখিবেন, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক উদ্দেশে সমবেত হইয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে এবং যে যাহার পারে বুকে ছুরি মারিয়া মরিতেছে, সেইখানে জানিবেন নাটক। দোকানে যেমন মুড়ী মুড়কী, বাঙ্গালায় তেমনি নাটক।

বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। যে সে পাড়াগাঁয়ের বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিবেন ৮।১০ বৎসরের কচি ছেলেদের এ সমস্ত কণ্ঠস্থ।

সুতরাং ভাষা বিষয়েও তাদৃশ কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। এক অভাব আছে

(১) "কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্তানগণ।"

যে বলিয়াছি, সে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে। প্রাচীন কথা যে সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার উদ্ধার করাই আবশ্যক; তৎপক্ষে যত্ন করাই মনুষ্যত্ব, তাহাতে নিরবচ্ছেদে লিপ্ত থাকাই মাহাত্ম্য। আমি এক জন প্রত্নতত্ত্ব-খোর।

এ সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ আমার লেখা আছে; মধ্যে মধ্যে পাঠাইয়া আপনার উপকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। এবার একটী পাঠাই, পত্রস্থ করিয়া বাধিত হইবেন।

শ্রীর, রা।

পাঁচী ধোপানী।

অশোকের স্তম্ভের পূর্ব্বে কি পরে পাঁচী ধোপানীর আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত-ভেদ আছে (১)। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক হোয়েন্থ সাঙের পূর্ব্বে কামৎশ্চটকা-বাসী জিনকৃষ্কিহ্ন (২) যে সময়ে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন, তৎকালে পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন না, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, জিন-কৃষ্কিহ্নর গ্রন্থে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই, দায়োদোরস সেকুলস (৩) এ কথা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)। ইহাতে অনুমান হয় যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে কিম্বা পরে (৫) পাঁচী ধোপানী জীবিত ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবরের এই মত (৬)।

প্রকৃতপক্ষে পাঁচী ধোপানী নামে কোনও ব্যক্তি ছিলেন কি না, অনেকে সে সংশয় করিয়া থাকেন। বন্ হম্‌বোল্‌ডট্ (৭) বলেন যে, উক্ত নাম পৌরাণিকদিগের

---

(১) *Vide* Keith Johnston's Atlas; also, Ramayana Vol. V, pp. 49-72, by J. Talboys Wheelr.

(২) *Vide* Gulliver's Travels, a voyage to the Houyhnhums, hap, VI, p 199.

(৩) Diod. Sec. fase. IX leaf 320, মহাভাষ্যম্ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীতম্, দশম অধ্যায়-ত্রয়োবিংশ শ্লোক।

(৪) "Chiomikron charasso datur Jinkriska phaino manon non" &c, leaf 2 *passim.*

(৫) বারাণসীস্থ পুস্তক, দ্রাবিড়ের মুর্তুয়ে স্বামীর হস্তলিখিত পুস্তক, Schlegel কর্ত্তৃক মুদ্রিত Greek Recension; Ryehouse Plot by Titus Oates—এই সকল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত পাঠান্তরের মীমাংসা করিতে পারি নাই; কোনও গ্রন্থে 'পূর্ব্বক' কোথায় 'পূর্ব্ব', কোথায় 'পুর' কোথাও বা 'পর' লিখিত আছে।

(৬ Barber's Ain-i-Akberi; Asi, recherche Vol, 9—1 passim.

(৭) "Hlafden ver Gottzgiijen moller grahferlunzig trmnstopkter. An Liand-

কল্পিত; মাংস-পুরাণে (১) যদিও পাঁচী ধোপানীর নাম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে পাঁচী ধোপানী স্ত্রীলোক বলিয়া বর্ণিত আছে, অথচ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে পাঁচী ধোপানীর নামে এ পর্য্যন্ত স্থানের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।(২) ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোকের নাম এতাদৃশ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এতভিন্ন ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ কেহ কখনও অবিবাহিতা থাকিতে পারেন নাই; পাঁচী ধোপানী বিধবা স্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিলেও তাহার নাম পাঁচী ধোপান্ত্য হইত। অদ্যাপি "দেব্যা" "দাস্যা" শব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফেডরিকো পেলিতি (৩) এতদুত্তরে বলেন যে, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে স্ত্রী-লোকের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল; এরূপ বিশ্বাস করিবার ভূরি ভূরি কারণ আছে (৪) নতুবা "স্বৈরিণী" "স্বাধীনভর্ত্তৃকা" প্রভৃতি শব্দের সার্থকতা হয় না। পাঁচী ধোপানী প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিনী রমণী, সেইজন্যই তাহার উপাধি পরিবর্ত্তিত হয় নাই; বিশেষতঃ তিনি হিন্দুবিধবা হইলেও 'ধোপানী' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে তদ্বিরুদ্ধ অনুমান করা সঙ্গত হইতে পারে না। যে হেতু অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভট্ট নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে "মিত্র" উপাধি ব্রাহ্মণদিগের হইতে পারে।

যাহাই হউক পাঁচী ধোপানী ছিলেন; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই (৫) তবে তিনি স্ত্রী কি পুরুষ (৬) তাহা এত দীর্ঘকাল পরে নির্ণয় করা অসম্ভব। অনেক জীবিত পুরুষকে

---

der vrost matod utan sulfra och die j phos phos,"—Tandstickor Hohenzolern, p. 99.

(১) "পাঁচী পঞ্চাননী দশাঙ্কী বিংশতেশ্চতুরাংশৈকাংশী" মাংসপুরাণ, ১০ম পটল ১৩ সূক্ত অপিচ,—"পঙ্কিকা পঙ্কিকা চৈতা-নথো বামার্দ্ধভঙ্গিকা। নারদা ক্রোশমালীনে নর্থাদো পিস্তবাসিন ইতি। ঋগ্বেদ, পঞ্চাশতম ব্রাহ্মণ।

(২) যথা কলিকাতা নগরে "পাঁচী ধোপানীর গলি।"

(৩) Sezoine Italien In diciy Frederico Peliti "Ecosa. standi vel pruchere chi mon fan forado e mulatto par suza in &c." pp. 337

(৪) (a) "Cum cogiture nos interprationis Selucœ adhue sunt smilibaris tam tandro mutando non alientibur parlos: si dicuut inter rationes suum." Don Giovanni Ecloga movum. (b) Ass. Res. Bom. 99 MS- (c) M. Bardelot: "Une marionette per fenetre j'ailignolles &." Œavres. o.

(৫) শিশুবোধক, শ্রীঅরুণোদয় বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ৩৩৭ সংখ্যক ভবন, বটতলা। এই ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ইতি মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

(৬) "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—মনু, ১০৷১৩ অপিচ "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ;"—বিবাদতাণ্ডব, ৫ অধ্যায় ১৭ শ্লোক।

লোক বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এ প্রকার স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে মুণ্ডিত-গুম্ফ জ্যেষ্ঠ পিতৃবৎ বোধ হয় (১)। ফলতঃ পাঁচী ধোপানী-ভারবহনক্ষম যোগ্যতর পণ্ডিতগণ এ তর্কের মীমাংসা করিবেন।

পাঁচী ধোপানীর অন্যান্য বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীর, রা।

পরিচয় এবং প্রার্থনা।

এমন দিন ছিল যে, পঞ্চানন্দ দেবতাদের সঙ্গে আসন পাইয়া শুদ্ধ ঠাকু লোকের ঘাড়ে চাপিয়া স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিত। তখন হিন্দুয়ানির প্রকোপ ছিল, বুজরুকির আমল ছিল; সুতরাং পঞ্চানন্দের তখন সুখ ছিল। এখন হিন্দুর বড় দুর্দ্দশা, হিন্দুয়ানির ততোধিক। অগত্যা পঞ্চানন্দ, ঘাড়ে চাপা দূরে থাকুক, মুরুব্বীহীন চাকরি-ভিখারীর মত, এখন লোকের দ্বারস্থ। অতএব, হে দয়াময়, তোমরা পাঁচ জন পঞ্চানন্দ পানে, একবার মুখ তুলিয়া চাও।

কি বলিলে? "পাত্রাপাত্র, বিচার না করিয়া ভিক্ষা দেওয়াতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই"?—এই তোমার কথা? মুখে বলিতেছ বটে, কিন্তু তোমার মন এ কথায় সায় দিবে না। কথাটায় যে ভজুমার গন্ধ বাহির হইতেছে; আর একবার বিবেচনা করিয়া বলো, দাতাকর্ণের বংশধর, অতিথি বিমুখ করিও না।

মন নরম হইল না? পরিশ্রম করিয়া আহার সঞ্চয় করিতে বলিতেছ? না হয় সম্মত হইলাম। এ বয়সে কি পরিশ্রম করিব, বলো? ব্যবসা করিতে পুঁজি চাই, চাকরি করিতে মুরুব্বি চাই। পঞ্চানন্দের দুয়েরই অভাব। অধিকন্তু যেখানে এক পূজা, সেখানে তেত্রিশ কোটী দেবতা; একটী কর্ম্মখালি পাঁচ শ উমেদার, এক ব্যবসা, বাহান্ন দরে ব্যবসাদার। মুটে মজুরের অভাব নাই—দেশ শুদ্ধ লোকই তাই। পঞ্চানন্দকে যদি তাহা করিতে বলো, সে ত একই কথা হইল;—তোমাদের অন্নে হস্তারক হওয়ার চেয়ে তোমরা হাতে তুলিয়া যৎকিঞ্চিৎ দাও, সেটা কি ভাল নয়? আর দশটা পোষ্য ত তোমার আছে; জানিবে, পঞ্চানন্দ তাহার ভিতর একটা।

বাজে খরচ করো না? গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণকেও সে কথা এক বাবু বলিয়াছিলেন। গল্পটা বলি। বাবুর একটী বৈ চক্ষু ছিল না, কিন্তু সেরেস্তাদারী চাকরি করিতেন বলিয়া টাকা যথেষ্ট। বাবু এক দিন কাছারি হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় মুখ হাত ধুইতেছেন,

---

(১) সখের যাত্রা; Amature Theat ical Company, dassim

এমন সময়ে গুপ্তিপাড়ার সেই ব্রাহ্মণ, ভিক্ষার্থে উপস্থিত। বাবু কিছু দিতে চান না, ব্রাহ্মণও ছাড়ে না। "আমি বাজে খরচ করি না"—শেষে এই কথা বলিয়া বাবু তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং বিদায় করিয়া দিলেন। পর দিন সকালে ব্রাহ্মণ আবার গিয়া উপস্থিত; বাবু তখন লেখা পড়া করিতেছেন।

বাবু বলিলেন—"ঠাকুর, তুমি ত বড় বেহায়া"।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"আজ্ঞে, তা' না হইলে আপনার কাছে আস'বো কেন? ভদ্রের কাছেই ভদ্র যায়"।

বাবু কিছু রুষ্ট হইয়া পুনরপি বলিলেন—"কাল ত তোমাকে ব'লেছি, আমি কিছু দিব না, তবে মিছা জ্বালাতন করো কেন?"

ব্রাহ্মণ। "আজ্ঞে দিবেন না, তা জানি; আজ সে জন্য আসিও নি। তবে, আর একটা কথাও নাকি কাল বলেছিলেন; তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, আপনার যদি বাজে খরচ নেই, তবে দুপাটী চস্‌মা ব্যবহার করছেন কেন?

বাবু অন্য উত্তর না দিয়া, একটী টাকা ব্রাহ্মণকে দিলেন।

পঞ্চানন্দও তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন যে, বাপের শ্রাদ্ধ করো না, অথচ স্বর্গীয় ডিসিল্‌ক সাহেবের পাথরের ছাবর জন্য চাঁদা দাও কেন? আর এই যে দিলজান বাইজী সেদিন তোমার বাগান-বাড়ীতে নেচে গেয়ে এতগুলো টাকা লইয়া গেলো—তুমি সঙ্গীতাদি বিদ্যার অনুরাগী এবং পরিপোষক তাহা জানি—তবে সে যে এত বেশী পাইল, তাহা কি দিলজান গায় ভালো, সেই জন্য, নাচে ভালো, সেই জন্য, না কি, দিলজান হচ্চে দিলজান, সেই জন্য? আরও জিজ্ঞাসা করি, সেদিন ম্যাড্‌অক্স সাহেবের বাড়ী তুমি দেখা করিতে গিয়াছিলে, উত্তম; তাহার পরদিন পেয়াদা খুড়া, আরদালি বাবাজীদের এত ভিড় তোমার বাড়ী হইয়াছিল কেন? তাহারা ফিরিয়া যাইবার সময়ে তোমাকে খুব সেলাম আর মান সম্মান করিয়া গেল কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি সকল গুলাই ন্যায্য, আর বুড়া পঞ্চানন্দ কেবল সেই কি এত বাজে খরচের দলে পড়িল?

পঞ্চানন্দ চায় কি? বাবু জয় হউক। পঞ্চানন্দ হাতি চায় না, ঘোড়া চায় না, চায় —তোমরা পাঁচজনে সুখে থাকো, আনন্দ করো; চায়, পাঁচ জনকে দেখিতে শুনিতে, পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে; চায়—পাঁচরকম বলিতে কহিতে সুতরাং পাঁচটা কথা সহিতে; চায় দশে পাঁচে দেখা করিতে, পাঁচটী করিয়া টাকা লইতে, চায়—পাঁচ বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া, পাঁচটী লোক যাহাতে প্রতিপালন হয়, তাহার উপায় করিতে। তোমরা পাঁচ ইয়ার, পঞ্চানন্দ জানেন তোমরাই তাঁহার 'পাঁচো হাতিয়ার' পঞ্চানন্দের আশা ভরসা, বল বুদ্ধি, সকলই তোমরা। তোমাদের জয় হউক।

পঞ্চানন্দ খায় কি—যৎসামান্ত!—পাঁচ জনের মাথা, পাঁচটা গালাগালি! তবে অমনি অমনি খায় না, বদান্যতা আছে; পাঁচ জনকে না দিয়া খায় না।

পঞ্চানন্দের প্রতি পঞ্চানন্দের উপদেশ।

যাও উত্তম পুরুষ, সাবধানে যাও। ঐ যে দূরে, বহু দূরে আলোক দেখিতেছ, উহাকে লক্ষ্য করিয়া যাও। পরিচিত অন্ধকার, তাহার উপর দিয়া তোমার পথ বুঝিয়া, বুঝাইয়া চলিবে, কিন্তু লক্ষ্য ভুলিও না, ঐ আলোক সত্য। তোমার শঙ্কা নাই।

অন্ধকারে পাদবিক্ষেপ করিতে হইবে, অতএব সন্তর্পণে চলিবে, অতি কোমল ভাবে পদ সঞ্চালন করিবে, দেখিও তোমার অস্থির পদদলনে ক্ষুদ্র কীট যেন বিনষ্ট না হয়। সামান্ত বাধাকে বিঘ্ন মনে করিয়া যথায় তথায় খড়্গ উত্তোলন করিও না। যাহা অধম, যাহা তুচ্ছ, যাহাকে ঘৃণা করিলেই পর্য্যাপ্ত আত্মাবমাননা করা হয়, তাহার প্রতি কোপ প্রদর্শন করিও না। অসমানে যুদ্ধসজ্জা করিও না, দুর্ব্বলকে দয়া করিও, অজ্ঞানকে শিক্ষা দিও।

নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও। তোমার পথে বহুতর বিভীষিকা আছে; দণ্ডবিধি, মুদ্রাবিধি, প্রভৃতি কত মূর্ত্তি ধরিয়া তাহারা তোমাকে ভীত করিতে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু ভয় নাই। মহাব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত, দেবদত্ত মহাস্ত্র তোমার হস্তে দিয়াছি; বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। যে পাপী, সেই ভয় করে। তুমি পাপীর শাস্তি বিধান করিবে।

মনে যদি ভ্রম হয়, মার্জ্জনা করিও। জানিয়া শুনিয়া পাপে লিপ্ত হও, পঞ্চত্বেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

পঞ্চানন্দ মনোযোগপূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করিয়া বলিল—"হুঁ, তা কি আর বলতে?"

সতীপ্রসাদের কোণের বৌ

[যিনি ১৫ই বৈশাখের সোমপ্রকাশের সঙ্গে বেরিয়েছেন

[পাড়া-পড়শীর লেখা]

না মা, হদ্দ করেছে। তা' না হবেই বা কেন? সোয়ামীর ঐ নাই দেওয়া, ছোঁড়াদের ঐ মাথায় তোলা—যা হবার তাই হচ্ছে।

সোয়ামীকে দিয়ে সোমপ্রকাশের ছাপার কাগজে কাঁদুনি গেয়েছেন। শুনতে পাই, যে মিনসে সোমপ্রকাশে লেখে, সে নাকি বুড়ো। তাই কি ছেলে বুড়ো সমান হ'তে হয়। লজ্জা করলে না, বুড়ো মিনসে দেখলে না, শুনলে না, তলিয়ে বুঝলে না যে,

কথাটা কি? আর ঐ ছোঁড়ার ধোয়ায় ধোয়া ধর্‌লে? সত্যি বোন্, দেখে শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

কোণের বউ! খাবার সময় খেতে পান না, শোবার সময় শুতে পান না, হেসে কথা কইতে পান না, তেষ্টায় জলবত্তি চাইতে পান না! এমনি দুঃখিনীই বটে, বাছার এমনি কষ্টই বটে! এদিকে ঢাক বাজিয়ে দেশে দেশে শাশুড়ী-ননদের কুচ্ছোটুকু গাওয়া আছে! ডাক্তারের হাত দে দুঃখের কাহিনী লিখিয়ে পাঠিয়েছেন। ছুঁড়িদের কি দড়ি কলসীও যোড়ে না?

সোয়ামী রোজকেরে, এক শ টাকা মাইনের চাকুরে; তাই বুঝি বুড়ো শাশুড়ীর এত লাঞ্ছনা? পনেরো বছরের ছোঁড়ার বে দিয়ে ন বছরের বাঁদুরী ধরে এনে মানুষ করেছে, তার শাস্তিটে হ'লো ভাল। আজ যেন তোর্ সোয়ামী টাকার মুখ দেখ্‌ছে। এতকাল আপনার বুকের উপর দিয়ে মই চালিয়ে বিষ্টিকে বিষ্টি রোদকে রোদ মনে না করে' বুড়ো মাগী যে জলের পোকা মানুষ কল্লে, তাও কি বৌকে কষ্ট দেবার জন্যে? এখনও যে দুবেলা উনুনে ফুঁ পেড়ে মাগীর চোখ যাচ্ছে, ভাতের হাঁড়ি নাবিয়ে নাবিয়ে হাতের ছাল যাচ্ছে, তাও কি বউকে যন্তরণা দেবারই জন্যে? না—মা, আর বল্‌ব না, রুটি বেড়ে বউ, আপনি ঘরে নিয়ে যান, আপনি ঢাকা দিয়ে রাখেন, সোয়ামী ঘরে এলে আপনি ঢাকা খুলে দেন, সুমুখে বসে বসে' যতক্ষণ খাওয়া না হয়—ইটি খাও, উটি খাও, বলেন, কত গল্প করেন;—বউয়ের কষ্টের কি সীমে আছে।

ননদ! ছার কপাল যে অমন বউয়ের ননদ হয়ে' ঘরে থাকতে হয়, অমন ভাইয়ের বোন হয়ে বেঁচে থাকতে হয়! কি করে সাধ্যি নেই সেই—কাচ্ছা বাচ্ছা দুটো আছে, কুলীনের ঘরে ভাত পায় না—বাঁদীর মত খাটে, নাটাইয়ের মত ঘুরে, দু'বেলা দু মুঠো ছাই পাঁশ খেয়ে ভাই-বউয়ের মন যোগাবে, মনে করে। তা' অমন অভাগীর কপালে ওটুকু সুখই বা হ'বে কেন? ও বউয়ের মন কে যোগাবে বলো?

কোণের বউ ত কোণেরই বউ। সকাল সন্ধ্যে কোণেই আছেন। আফিস থেকে ঘরে এলেই, সোয়ামীর আঁচল ধরে' বসে—আফিসে, যতক্ষণ,—বউ থাক্‌তে পার্‌বে কেন, লেখাপড়া শিখেছে [illegible] চিঠী লিখ্‌ছেন। শাশুড়ী-ননদকে কখন্ মুখ ফুটে কথা কয় বলো? কথা কইবার ফুরসুৎ কৈ, লজ্জাশীলের বড় কষ্ট! মরে' যাই, অমন কর্ম্মশীলের—লজ্জাশীলের—বালাই লইয়া মরি!

কোণের বউ গেরস্তর কুটোটি কেটে দুখান কল্লে যে উপকার হয়, তা' কর্‌বেন না। তাই যদি কেউ বল্লে ত আগুন লাগল, কেঁদে কেঁদে সোয়ামীকে দেখাবার জন্যে চোক করকা কত্তে লাগলেন, মোমের পুতুল গলতে লাগলেন। ভেড়াকান্ত ঘরে এলে মা বোনকে ঝাঁটা লাথি খাওয়াবেন তার উজ্জুগ কত্তে লাগলেন। কোণের বউয়ের মুখ ফোটে না; না'

কুকুরে হাঁড়ি খেয়েছে, তাই কোণের বউকে বকেছে। মরে' যাই, তা কি বলতে আছে? শাশুড়ী রাঁধতে রাঁধতে জল আনতে গেছলো, ননদ কুটনো বাটনা কর্‌ছিল,—এমন ফাঁকে কুকুর আসবে তা বউয়ের দোষ কি? কোণের বউ যে তখন কোণে ছিলেন, নাটক পড়্‌ছিলেন,—তিনি কি তাই ছেড়ে কুকুর তাড়াতে আসবেন না কি? এও কি কথা গা! এমন সোণার চাঁদ বৌ ঘরে এনে শাশুড়ীকে মর্‌তে হয়, ননদকে বেরিয়ে যেতে হয়।

বউয়ের বড় দুঃখ—সে কারুর কাছে দুঃখের কান্না কাঁদতেও পায় না; কাঁদলেই বা শোনে কে? বটে ত! ভাগ্যি না বলতেই লিখিয়ে সোয়ামীর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, ছাপাওয়ালার বুকে শেল পড়েছিল,—সেই তবু কথাটা বেরুল, নইলে ত এই গুমরে কান্নাই চাপা থাকৃত।

ও মা যাব কোথা! বউ যে গায়ের কাপড় খুলতে পায় না, একি সামান্যি কথা। "শান্তিপুরে কালাপেড়ে কল্মে চুড়িদার।" এ সব কাপড় কি বউ গায়ে রাখতে পারে? গেরস্ত ঘরের মেয়ে কত গা ঢেকে ঢেকে বেড়াবে' বলো? তায় আবার বাবু লিখেছেন—যৌবন কাল! সত্যি বোন, যৌবনেই যদি গায়ের কাপড় না ফেলতে পেলে, তবে আর এর পর গিন্নী বান্নী হয়ে' ফেল্‌লেই কি, আর না ফেল্‌লেই কি?

যা হোক, আর বড় ভাবনা নাই, যখন মাথার কাপড় ফেলে খবরের কাগজ অবধি গ্যাছেন, তখন গায়ের কাপড় ফেল্‌তে আর বড় দেরি হবে না। হ্যা গা, অমন ডাগর ডাগর চোখ্, তা' কি এক ফোঁটাও লজ্জা থাকৃতে নেই?

শেষ কথাই সার কথা,—স্বাধীন হয়ে, দেখে শুনে বে কর্‌তে হবে। ভালো, স্বাধীন যেন হ'ল, শাশুড়ী ননদ যেন নাই রইল,—তখন পিণ্ডি রেঁধে দেবে কে? বউয়ের ছেলে ধর্‌বে কে?

শোন বাছা, রাগই করো আর রোষই করো, আমাদের দিন দুখে-সুখে কেটে যাবে, যখন তিন কাল গ্যাছে এক কালে ঠেকেছে, তখন যাবেই যা'বে—কিন্তু তোমাদের রীতি চরিত্তির বড় ভালো বোধ হচ্ছে না। তোমাদের কপালে দুঃখু আছে।

ন্যাকারামের পত্র।

পূজনীয় শ্রীশ্রীপঞ্চানন্দ ঠাকুর

শ্রীচরণসরসীরুহরাজেষু।—

অবনত-মস্তকে, যোড়হস্তে, নিবেদনমিদম--

আমার অন্তঃকরণে বিষম এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার নিরসন করে, মানুষের এমন সাধ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। সেই জন্য আপনার কাছে হত্যা দিতে আসিয়াছি।

বহুকাল হইতে শুনিতে পাই যে, অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বারেষ্টর হইবার জন্য কিম্বা সিবিল হইবার জন্য বিলাত গিয়া থাকেন। আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, বিশেষ জানি না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও ফিরিয়া আসার সংবাদ আমি পাই নাই। তাহার পর অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। কলিকাতার লোক বড় রহস্য-প্রিয়, ভাল মানুষ, পাড়াগেঁয়ে পাইলেই তাহাদের আমোদ-স্পৃহা বড়ই চাগিয়া উঠে। আমি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে কতকগুলি কলিকাতা-বাসী—আমি প্রথমতঃ তাহাদিগকে এককের হাটে ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলাম—আমাকে বলিয়া দিল যে, বড় আদালতে যাও, বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী অনেক দেখিতে পাইবে। লুব্ধ আশ্বাস সহজেই প্রতারিত হয়; আমিও প্রতারিত হইলাম।

বড় আদালতে আসিয়া যাহাকে দেখি তাহাকেই ধরিয়া বসি,—মহাশয় কি বিলাত গিয়াছিলেন? সকলেই বলে—না। পরিচয় লইয়া বুঝিলাম,—কেহ উকীল, কেহ মোক্তার, কেহ কেরাণী, কেহ আমলা ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালী বারেষ্টর কিম্বা সিবিল একটীও দেখিলাম না।

হতাশ্বাস হইয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছি, এমন সময়ে একজন জুয়াচোর—সবই জুয়াচোর—আমার বিমর্ষভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এমন আরও পাঁচ সাত জন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি মামলা করিতে আসি নাই শুনিয়া, তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এ লোকটা চেহারায় যেন কতই ভদ্রলোক—বেটা পাজি পাষণ্ড! এ লোকটা, একটী কালো কালো, ছোট খাটো, সাহেব আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল—ঐ দেখো, বাঙ্গালী বারেষ্টর! সহসা বিশ্বাস হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, হইতেও পারে, আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, হয় ত এ সরগরম আদালতে আসিয়া দিশাহারা হইয়া মানুষ চিনিতে পারিতেছি না।

তথাপি সেই লোকটাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম; সে চটিয়া বলিল, তুমি কোথাকার পাগল! তোমায় কি আমি মিথ্যা বলিলাম? একটু অপ্রতিভ

হইলাম, কারণ, বুদ্ধির উপর খোঁটা দিলে সকলকারই গায়ে লাগে, তাহাতে সে ত একবারে পাগল বলিয়া ফেলিল। লোকটা ত এই বলিয়া স্থানান্তরে গেল, আমি [illegible], আর [illegible] পদস্থ হওয়া উচিত নহে মনে করিয়া, সাহসে ভর করিয়া একবারে গিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত।

বলিলাম, বাবু আপনি কি—? আর বলিতে হইল না। বাপু রে বাপু! সে রক্ত চক্ষু, সে স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, সে কম্পিত ওষ্ঠাধর, সে কুঞ্চিত কপাল,—যদি ইহার এক বর্ণ কখনও ভুলি, তবে গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত। তাহার পরে, সেই নিষ্পীড়িত-দন্তপঙ্ক্তি-বিনিঃসৃত—'চিপ্র্যাসীএ'—আর ত বুঝিতেই পারি নাই, প্রথম চোটের কথা, তখনও পূরা অচৈতন্য হই নাই, তাই একটু একটু মনে আছে—আর সেই মদগন্ধ ব্যালোল হৃদয়-কম্প স্থল-বিদারী স্বর—সাহেবদের গলা কি বজ্রে গড়া?—তাহার পর যাহাতে চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম, সেই পলাণ্ডুবাসমোদিত নেড়ের সেই করলাঞ্ছিত, অস্মদ্‌-গ্রীবায় শোভাকারী সেই অর্দ্ধচন্দ্র; ইহার বিন্দু বিসর্গ যে ভুলিতে পারে, তাহার অন্ন-প্রাশনের প্রথম গ্রাস বিষমক্ষিত হউক।

চৈতন্য পুনর্লাভ করিয়া আমার বিকলীকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামকে পুনশ্চ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি এমন সময়ে সেই ধূর্ত্ত আবার আসিয়া উপস্থিত। আমি তখন রাগে আপাদমস্তক থরথরায়মান, নহিলে কথা না কহিয়া তাহাকে চপেটাঘাতই করিতাম। কিন্তু দুর্বল তখন অবশ, সুতরাং কি করি, তাহাকে বলিলাম, ভালো বাপু ভালো, এখনও এক পোয়া ধর্ম্ম আছে, চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়, তোমার এই কাজটা কি উচিত হইয়াছে? ভালো, সাহেব যদি বাঙ্গালী হন, তবে উঁহার নামটা কি?

সে [illegible] অম্লান বদনে বলিল—ছি ছি ডস!

ওরে রে পাষণ্ড, এই তোর বাঙ্গালী!

এই প্রহারের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন সে পলাইয়াছে। একাকী [illegible] বসিলাম, বুঝিলাম যে সেও একটু রহস্য করিয়া থাকিবে।—কিন্তু, হউক, [illegible] কি করিতে হবে। কলিকাতার মাটিকে দণ্ডবৎ!

[illegible], এক রকম স্থির করিয়াছি যে, কেহ ফিরে না। তথাপি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর জন্য প্রাণটা কি কাঁদে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কেহই কি ফিরিতে পায় না? এ [illegible] কাহিনী শুনিতাম, কোন্ দেশে পুরুষ গেলে ভেড়া করিয়া দিত, এ কি তাই? দোহাই ঠাকুর, সেবকের আন্দাশ অবহেলা করিবেন না।

ভৃত্যানুভৃত্য
শ্রীভাকারাম দাসস্য।

[পত্রপ্রেরক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চৈতন্য চরণ দাস মহাশয় যথার্থই বাঙ্গালী এবং যথার্থই ব্যারিষ্টার।]

দেপাড়ার (১) লক্ষ্মী (২) বৈষ্ণবী।

[আজি কালি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু বাড়াবাড়ি, ছড়াছড়ি বলিলেও বলা যায়। পঞ্চানন্দের কাছে পুরাতনের আদর নাই! যাঁহারা হাল বাবু, পেটরোগা, তাঁহারাই নূতনকে ভয় করেন, নবান্ন তাঁহাদের পেটে সয় না।

এই প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন লোক, ইনি বাল্যকালে ঠাকুরদের দিয়া দুই সের নূতন চাউল উদরস্থ করিতেন এবং তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক, স্ফূর্ত্তি বোধ করিতেন।

সেই জন্য আদরের সহিত তাঁহার এই নূতন প্রণালীর নূতন প্রবন্ধ পঞ্চানন্দ গ্রহণ করিলেন। এ প্রকার প্রবন্ধের নাম ঔপন্যাসিক ইতিহাস। যাঁহাদের অরুচিকর হইবে, তাঁহারা ডাক্তার না ডাকিয়া ইহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত না হন—পঞ্চানন্দ।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীর পরিচয়।

লক্ষ্মী বৈষ্ণবী অনেক কালের মানুষ, তবু কিন্তু সকলের চক্ষে এখনও বুড়ী হইল না। লক্ষ্মীর বয়সী একটী প্রাণীও দেপাড়ায় নাই, তবু কিন্তু লক্ষ্মী দেখিতে শুনিতে এখনও এমন যে, কোনও কোনও যোড়শীকে ফেলিয়া লক্ষ্মীর দিকে আপনা-আপনি নজর যায়।

এ লক্ষ্মীর পরিচয় জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? লক্ষ্মী নিজে কাহাকেও আত্ম-পরিচয় বলে না (৩)। দেমাক টুকু আছে বলিয়াই মাগি এখনও হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়। অন্য কেহ হইলে, কি এমন দেমাক না থাকিলে, এ বয়সে শ্মশানে তাহার অস্থি খুঁজিতে হইত। লক্ষ্মীর পরিচয় ইহার উহার মুখে শুনা। কথাটা নাকি বড়ই কৌতূহলের, তাই অনেক যত্নে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

লক্ষ্মী ভগবান্ বিশ্বাসের মেয়ে। বিশ্বাস বহুতর জাতি হইতে পারে। সুতরাং নানা লোকে নানা জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। কেহ বলে ভগবান্ আছে, কেহ বলে নাই। তাহার পর বাড়ী কোথায়, কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না।

ভগবানের অনেকগুলি মেয়ে, সবগুলি প্রায় আমাদের লক্ষ্মীর মত। তবে দু-চারি-জন স্বামীর ঘর করিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাই। কিন্তু ভগবানের পরিচয় দিতে বসি নাই, তাহার অন্য মেয়েদের সঙ্গেও আমাদের কথার সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে সব কথা আর তুলিয়াও কাজ নাই।

---

(১) দেবপল্লী—পৃথিবী। (২) ভারতভূমি।

(৩) ভারতবর্ষে 'ইতিহাস' নাই.

লক্ষ্মী রূপে অদ্বিতীয়া। যাহারা রূপ দেখিয়াছে, রূপের বিচার জানে, তাহারাই বলে, লক্ষ্মীর মত রূপ কস্মিন্ কালে কাহারও ছিল কি না, আছে কি না, সন্দেহ। বিবাহের আগে লক্ষ্মী বাপের বাড়ী হইতে বাহির হন; অনেক সোণা রূপা, মণি মুক্তা লইয়া বাহির হন। বাহির হইয়া, সে বিভব লইয়া, সে অতুল সৌন্দর্য্য লইয়া, লক্ষ্মী আসিয়া দেপাড়ায় বাস করিলেন। অধিক দিন যাইতে না যাইতে লক্ষ্মী ভেক লইলেন, বৈষ্ণবী হইলেন!

লক্ষ্মীর রূপ ছিল, দেমাক ছিল, খাবার ভাবনা ছিল না। কাজে কাজেই লক্ষ্মী প্রথম প্রথম অনুগ্রহের সহিত সদাব্রত বসাইলেন। গোটাকতক বাঁদর—যে প্রকার শুনা যায়, তাহাতে সে গুলাকে মানুষ বলিতে ইচ্ছা করে না—লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভোগী হইল। বাঁদর গুলা খায় দায়, নাচিয়া বেড়ায়। কিন্তু মুক্তামালা বাঁদরে চিনিবে কেন? লক্ষ্মীর মর্ম্ম তাহারা বুঝিল না। পেট ভরিলেই সন্তুষ্ট। সুতরাং তাহারা যেমন বাঁদর তেমনই রহিয়া গেল। লক্ষ্মীরও প্রাণ চটিয়া গেল।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত। আজি কালি চরিত্র বলিলে আমরা যাহা বুঝি, সে অংশে লক্ষ্মীর কখনও কোন নিন্দা গ্লানি শোনা যায় নাই। এখন, মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার জলগ্রহণ হয় না, পরের মন্দ না করিলে যাহার দিন বৃথা যায়, এমন লোকের কথাতেও চরিত্র-দোষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ এক ব্যক্তি লক্ষ সৎকর্ম্ম করিয়া; অপরাধের মধ্যে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইলে স্থান-কালের সন্দেহ করিয়া তাহার চরিত্র মন্দ বলা হয়। এখনকার অভিধানে দেহ লইয়া চরিত্র, অন্তরাত্মার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক নাই। এই চলিত অর্থে বলিয়া রাখিতে চাই যে,লক্ষ্মীর চরিত্র মন্দ বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই। লক্ষ্মী আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে, লক্ষ্মীর ভদ্রাভদ্র বিচার নাই, লক্ষ্মী কুলত্যাগিনী, অনুগ্রহ-পাত্রকে লক্ষ্মী সর্ব্বস্ব দিবে। কিন্তু যাহা হইলে এখন চরিত্রে দোষ দেয়, তাহাতে লক্ষ্মী কখনই নাই। লক্ষ্মী ঐ এক রকমের লোক। যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকেই লক্ষ্মীর দোষ আর দেখিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে লক্ষ্মী দুশ্চরিত্রা। দেপাড়ার পার্শ্বগ্রামে অচ্যুত (১) নামে এক ব্রাহ্মণ-তনয় ছিল। অচ্যুত দেখিতে দিব্য সুশ্রী, কিন্তু তাহাদের অবস্থা তত ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। লোকে বলে, অচ্যুত কেবল হোহো করিয়া গুলিডাণ্ডা খেলিয়া বেড়াইত।

অচ্যুত এক দিন লক্ষ্মীকে দেখিল। লক্ষ্মীকে দেখা, আর লক্ষ্মীর কুহকে পড়া, একই কথা। লক্ষ্মীরও তখন মন খারাপ হইয়াছিল, আকার ইঙ্গিতে লক্ষ্মী অচ্যুতকে প্রসাদ দিবে, এইরূপ জানাইল। দুই ইয়ার সঙ্গে অচ্যুত লক্ষ্মীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত।

(১) আর্য্য।

একবার যিনি লক্ষ্মীর বাড়ী পদার্পণ করিবেন, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। অচ্যুত রহিয়া গেলেন। তাঁহার ইয়ার রাম সিং (১) এবং বেণেদের হলা দত্ত (২), ইহারাও রহিয়া গেল।

অচ্যুতের আমোদ আর ধরে না; ফূর্ত্তি দেখে কে? তাহার বিশ্বাস যে, লক্ষ্মীকে ত হস্তগত করিয়াছি, আর আমায় পায় কে? এ বাড়ীর কর্ত্তাই এখন আমি। এই ভাবে মত্ত হইয়া বাড়ীর বাঁদরগুলার উপর অচ্যুত ধুমধাম আরম্ভ করিল। সেগুলা থাকিলে আমোদের একচেটে হইবে না, বাধো বাধো হইবে, কি ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া, অচ্যুত শেষে তাহাদের মারা ধরা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে পলাইয়া গেল। কতকগুলা নিতান্ত অন্ন-দাস লক্ষ্মীর বাড়ীর মায়াও ছাড়িতে পারে না, প্রহারও সহিতে পারে না, কাঁদিয়া গিয়া লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত। পূর্ব্বভাব মনে করিয়া লক্ষ্মীর একটু দুঃখ হইল, একটু দয়াও হইল, অথচ বাঁদরগুলার উপর একটু বিরক্ত ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—"দেখ আমি কি করিব? ভাল মানুষের ছেলে, ওরা এসেছে, আমি ত আর ওদের কিছু বলিতে পারি না। যদি মিলে মিশে ওদের হাতে পায়ে ধরিয়া থাকিতে পারিস, থাক।"

কাণা কুকুর, মাড়ে তুষ্ট; ইহারা তাহাতেই সম্মত। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপথের বাহির না হইতে হইলেই ইহাদের পর্য্যাপ্ত লাভ বিবেচনা করিয়া, ইহারা অচ্যুতের পায়ে পড়িল, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অচ্যুত ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে, ইহাদিগকে চাকর করিয়া রাখা মন্দ নয়; খাইতে খাইবে লক্ষ্মীর, খাটিবে আমাদের। এই ভাবিয়া ইহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাহাদিগকে থাকিতে বলিল। তাহারাও কৃতকৃতার্থ হইয়া রহিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঁদরগুলার সঙ্গে যখন এই রকম রফা নিষ্পন্ন হইয়া গেল, ঘরাও হাঙ্গাম যখন এই প্রকারে চুকিয়া গেল, তখন অচ্যুত সুখে নেশায় ভোর হইয়া আমোদের রগড়ে দিন রাত্রি সমান করিয়া তুলিল। অচ্যুত আপনি কিছু করে না, আর ইয়ারদেরও কিছু করিতে দেয় না; সেই পোষমানা বাঁদরগুলা শাক, পাতা, ফল, মূল, যাহা আনিয়া দেয়, গোঁফখেজুরের মত তাহাই খায় দায়, আর পড়িয়া থাকে।

লক্ষ্মী দেখিলেন বে-গতিক। ভাল মানুষের ছেলে জানিয়া যাহাদিগকে স্থান দিয়াছেন, তাহারা এমন অকর্ম্মা হইয়া পড়িলে, শেষে তাহারাও যে বাঁদর হইয়া যাইবে,

---

(১) ক্ষত্রিয়। (২) বৈশ্য।

লক্ষ্মী সহজেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। বাস্তবিক, নিষ্কর্ম্মা লোক উৎসন্নে যাইবার পথে সর্ব্বদাই যেন বোঁচকা হাতে করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যাহার হাতে কাজ থাকে, সে নষ্ট হইবার অবসর পায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া একদিন আহারান্তে লক্ষ্মী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ অচ্যুত, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। কিন্তু তোমার স্বভাব চরিত্র যে রকম হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আমার মনে ভয় হইয়েছে, পাছে তোমার সঙ্গে আমার পোট রাখা না চলে। এমনতর করিলে চলিবে কেন? আমি তোমাকে পরামর্শ দিই—রামসিং, হলাদত্ত প্রভৃতি সকলকেই পরামর্শ দিতেছি যে, "তোমরা একটু ভদ্র হও; একটু আদব কায়দা শিখ"। এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, লক্ষ্মী আবার বলিল,—"আমার বাড়ীতে তোমাদের স্থান দিয়াছি, যদি এখানে থাকিয়া তোমাদের চৈতন্য না হয়, দশজনে তোমাদের সুখের কথা না জানিতে পারে, অন্য বাড়ীর লোকে যদি তোমাদের একটু হিংসাই না করে, তাহা হইলে আমার নামে কলঙ্ক হইবে আর এখানে তোমাদের আশ্রয় দেওয়াই বৃথা হইবে। লোককে সুখে রাখিতে আমার মত কে জানে?"

লক্ষ্মীর যে বড় দেমাক ছিল, লক্ষ্মী যে কেন এত হেলিয়া দুলিয়া চলিতে ভালবাসিত, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল। অচ্যুত এবং তাহার সঙ্গীরাও বুঝিল, বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি যাহাতে সুখে থাক, যাহা করিলে তোমার নামের খুব জারি হয়, তাহা করিতে কবে আমরা কুণ্ঠিত হইয়াছি? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে আমারা ত প্রস্তুত আছি। তোমার বাগান ছাড়িয়া দিয়াছি, তোমারই লোকজনে এটা সেটা আনিয়া আমাদের দেয়, আমরা তাই খাই দাই, ঘুমাই। তবে আমাদের আর দোষ কি?"

লক্ষ্মী একটু অপ্রতিভ হইল, হইয়া বলিল,—"ক্ষুণ্ণ হইও না, তোমাদের ভালর তরেই আমার বলা। তা এতদিন যাহা করিয়াছ, তাহা আমার অমতে কর নাই, ভাল করিয়াছ। এখন আবার যাহা বলি, তাহাই কর, তাহা হইলেই আমার রাগ দুঃখ কিছু থাকিবে না। আমার ইচ্ছা, আমার অনুরোধ যে, তোমরা সকলেই বিবাহ কর, সংসারী হও। আর অচ্যুত, তুমি একটু লেখা পড়া শিখিবার জন্য যত্ন কর; রামসিং বাড়ী ঘর দুয়ার দেখুক শুনুক, কর্ত্তৃত্ব করুক, চোর ডাকাত আসিয়া উপদ্রব করিতে না পারে, সে ভারও গ্রহণ করুক। হলাদত্ত দোকান করিয়া বেচা কেনা আরম্ভ করুক। আর বাকী লোকগুলা আমার বাগানে কাজ কর্ম্ম করুক। ইহাতে তোমার মানের খর্ব্বতাও হইবে না। তবে আমি বলিয়া দিতেছি, কোনও বিষয়ে তোমাকে কেহ অমান্য করিতে পারিবে না। তবে বিষয় আশয়ে খুব নেশা থাকিলে লেখা পড়ার নাকি ব্যাঘাত হয়, সেই জন্যই বাড়ী ঘরের ভারটা তোমার উপর না দিয়া রামসিংকেই দেওয়া গেল।"

সকলেই সন্তুষ্ট হইল, সকলেই লক্ষ্মীর কথায় সম্মত হইল। কিন্তু বিবাহ করিতে, দোকান চালাইতে, বাড়ীর ভার লইতে ব্যয় বিধান আবশ্যক। অর্থ আসিবে কোথা হইতে, অচ্যুত এই কথা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—"পাগল, তোমাদিগকে এখন খাইতে পরিতে দেয় কে? আমি পরামর্শ দিতেছি, পুঁজিও আমি দিব। সে জন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না। যে আমার আশ্রিত, তাহার আবার অভাব কিসে, ভাবনাই বা কি"

ক্রমে ক্রমে সকলে বিবাহ করিল। অচ্যুত খুব মন দিয়া লেখা-পড়া করিতে লাগিল। রাম সিং বিষয় বিভবের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। হলাদত্ত ব্যবসায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল। অন্য সকলে বাগানের অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিল। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ্মীর নাম ছুটিল। গরবে লক্ষ্মী মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল।

যথাসময়ে সকলেরই সন্তান সন্ততি জন্মিল। লক্ষ্মী ব্যবস্থা করিয়া দিল, ছেলেরা আপন আপন বাপের ব্যবসা শিখিবে, তাহারই উন্নতি করিতে যত্নবান্ থাকিবে। বংশ-ধরেরাও তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

তখন লক্ষ্মীর বাড়ীর অপূর্ব্ব শ্রী হইল, নূতন নূতন পরম রমণীয় গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে লাগিল, অচ্যুতের বংশধরগণ বিদ্যার চৌষট্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করিল; সংক্ষেপে বলিতে হইলে সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর বাড়ী দেপাড়ার সর্ব্বত্র আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে অচ্যুত, রাম সিং, হলাদত্ত প্রভৃতি সন্তানদের উপর সকল বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া, আপনারা আরাম-কুঞ্জে গিয়া ভগবৎচিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিল।

মোটা রসিকের প্রবন্ধ।

আপনাকে ভাল বাসা, আপনাকে বড় মনে করা, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ঘোষের কি নিজের গরুর দুধকে দুধ বলিলে তাহা যে দুধ না হইয়া জলই হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। যাহা সত্য, তাহা তুমি বলিলেও সত্য, না বলিলেও সত্য। তবে কেহ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিলে অবশ্যই তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। এ মুখবন্ধটুকুর তাৎপর্য্য ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোটা না হইলে মানুষ রসিক হইতে পারে না! যাহারা রোগা, সরু, খিট্‌খিটে বা পাতলা, তাহারা দুষ্ট হইতে পারে, পাজি হইতে পারে, মূর্খ হইতে পারে, বড় জোর অহঙ্কারীও হইতে পারে, কিন্তু রসিক কিছুতেই না। মোটা লোক দেখিলে, ইহারা ভোঁদা বলে, হাঁদা বলে, গোবরগণেশ বলে—বলুক। তাহাতে মোটা মানুষের রসিকত্বই প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের নিজের রসিকতার প্রমাণ হয় না

আগুন আপনি গরম, যে আগুনের কাছে যায়, সেও গরম হয়। মোটাদের বেলাও তাই। মোটা আপনি রসিক, আর মোটার সংস্পর্শে যে আইসে, সেও তখন রসিক হইয়া ওঠে। রসের আধার মোটা; যে নীরস, সেই শুষ্ক।

আমি নিজে কিঞ্চিৎ মোটা, আমার পেটের বেড় পৌনে চারি হাতের বেশী নয়। তথাপি আমি রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। একবারও দেখিলাম না যে, আমার দরজী আমার কাপড়ের মাপ নিতে আসিয়া না হাসিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু আমি রসিক বলিয়াই যে মোটা মানুষ মাত্রেই রসিক, কিংবা আমি মোটা বলিয়াই যে রসিক লোক হইলেই মোটা হইতে হইবে, তাহা বলিতেছি না। হইতেও পারে আমার বেলায় এটা একটা দৈব সমাবেশ মাত্র এবং সেই সমাবেশ জন্য আমার এই স্বজাতিপক্ষপাত জন্মিয়া আমাকে অন্ধ করিয়াছে। কিন্তু যখন ইহার যুক্তি ও কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, তখন মোটার রসিকত্ব যে প্রাকৃতিক সাধারণ তত্ত্ব এবং স্থলবিশেষের সমাবেশ নহে—ইহা কেমন করিয়া না বলিব?

স্মরণ করিয়া দেখো, মোটা লোকে একটা কথা বলে, সহজে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না। তাহার পর মনে করো, বিদ্রূপের শাসন হইতে গুরুতর শাসন নাই, রসিকতার আশঙ্কা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক আশঙ্কা নাই। এই দুই কথা একত্র করিয়া বলো দেখি, কি দাঁড়াইল? মোটা লোকের সম্মান বেশী, আদর বেশী, মর্যাদা বেশী, ধন বেশী—কি নয়? ভালো বস্তু, দামী জিনিস হইলেই তাহা একটু দুর্লভ হয়; মোটা মানুষও দুর্লভ, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মোটা মানুষের আমদানি রপ্তানি করিতেও সময় বেশী চাই, বন্দোবস্ত পাকা গোছের হওয়া চাই। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, মোটা মানুষ দামী, রসিকতা দামী, অতএব মোটা মানুষ রসিক?

জল হইতে রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক, চপলতা হইতে রসিকতারও তাই, এবং বাঁদরামি হইতে মনুষ্যত্ব তদ্বিধ। বাঁদর বেশী মোটা, না মানুষ বেশী মোটা? আধেয়ের গৌরব থাকিলে আধারেরও গৌরব জানিতে হইবে, রসিক মানুষকে মোটা হইতেই হইবে। সামান্য তৃণে যতদিন রস থাকে, ততদিন তাহা কাব্যের বস্তু, সৌন্দর্য্যের আধার ইত্যাদি; তৃণ যখন শুষ্ক নীরস, লঘু, তখন উপহাসের বস্তু। মোটাই রসিক!

শুধু ধারে সকল বস্তু কাটা যায় না, শুধু ভারে সবই কাটা যায়, নিতান্ত পক্ষে থেঁতো করা যায়। যাহার রস আছে তাহার ভার আছে, রস আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে যত রস, তত আর কোথাও নাই; বৈষ্ণবদের গোঁসাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই। শুধু রস আছে বলিয়াই ত? রসিকের আর এক নাম রসগ্রাহী; আয়তন না থাকিলে কি গ্রহণ করা করা যায়? বাস্তবিক মোটা না হইলে মোটা রসিক হইতে পারে না।

চটুল চরণে চুটকি পরিয়া ঘেমটাওয়ালী নাচে; তাহাতে যদি রসিকতা ভরপূর হইত, তাহা হইলে মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আসরের সম্মুখে সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটাবাই সে প্রশস্ত আসরের ভারকেন্দ্র, সেই রস-জগতের সূর্য্য, সেই রস-কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার আবরণ বাদ দিয়া বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্ব্বক পঞ্চানন্দের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম; ইঁহার মধ্যে যে একটুকুও সরস স্থান নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, ইঁহাতে মোটা বুদ্ধির অভাব আছে। পাতলা বুদ্ধিতে কুলাইবে না, ইহাও আমার বিশ্বাস। কার্য্যটা বড় সামান্য নয়, গুরুতর কার্য্যে গুরুতর বুদ্ধিরও প্রয়োজন। আমার এই উপদেশটা গ্রহণ করিলে সুখের বিষয় হয়। (১)

মোটা রসিকের প্রবন্ধ।

[দ্বিতীয় বার।]

করিলাম এক, হইল আর; বলিলাম এক, পঞ্চানন্দ বুঝিলেন আর। দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ আমারও নয়, দোষ পোড়া দেশের, আর পোড়া কপালের। যখন বলা গেল যে, মোটা না হইলে রসিক হইতে পারে না,—পঞ্চানন্দের মোটা বুদ্ধির অভাব আছে—তখন কি আমি লিখিয়া রসিকতা করিব মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছি? হে ভগবন্! ইঙ্গিতে কথা কহিলে লোকে বোঝে না, ইহার বাড়া কি দুঃখ আছে?

সে বার বলি নাই, এবার ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল—বাঙ্গালায় রসিকতা চলিবে না। কারণ অনেকগুলি; সমুদয় বলিতে গেলে একখানি শব্দকল্পদ্রুম তৈয়ার হয়। আমার তত অবসর নাই, অবসর থাকিলে প্রবৃত্তি নাই, মোটামোটা দুই চারিটি বলিয়া দিতেছি।

এক কথা এই, অহোরাত্র মনে রাখিতে হইবে যে, আপন ঘরে কোন বাঙ্গালী কম রসিক নয়। গৃহিণীর কাছে পসার রাখিতে হইলেই ত এক প্রস্থ রসিকতা চাই, তাহাতে বাঙ্গালীর বাহিরিণী আছে। দু দশজনের না থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ সূত্রের ব্যাঘাত হইতেছে না; প্রমাণ, যেখানে শুনিবে গিন্নী, সেই সঙ্গে সঙ্গেই শুনিতে পাইবে বান্নী। তবে বল দেখি, তোমার রসিকতা লইবে কে? লইবে কখন? লইবে কেন? তায় আবার যে দর! পাঁচ টাকার পঞ্চানন্দ, কি মজার কথা!

১। গ্রহণ করিয়া দরকার কি? মোটা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই পঞ্চানন্দ আপ্যায়িত হইয়াছেন। নিত্য নিত্য এইরূপ পাইলে পঞ্চানন্দ সুচতুর লেখককে দেবতাদের মধ্যে আসন দিতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার 'মোটা বুদ্ধি' দুর্লভ পদার্থ।

এই পাঁচ টাকায় আনন্দের বাজার বসান যায়, আনন্দের সাগর ভাসান যায়, আনন্দের জীয়ন্ত প্রতিমা গ'ড়ে, পূজা ক'রে শেষে, চাই প্রতিমাই ভাসাও, আপনি ভাসো— দুইয়ের এক চলে, কিম্বা দুই-ই চলে। কেন তবে ছাপার অাঁখরের উপর মাথা খাবিয়ে লোকে মরিতে যাইবে?

বলিতে পারেন, সকল লোকের মতি গতি এক রকম নয়; আমিও স্বীকার করি, "বায়ূনাং বিচিত্রা গতিঃ" কিন্তু রসিকতা অপেক্ষা—যদি রসিকতাই মানিয়া লওয়া যায় —ধার্ম্মিকতাই ভালো, স্তাবকতা ভালো, যোজকতা ভালো, ভোজকতা ভালো, ইহাতে সংশয় নাই। এক পাঁচে যাহা হয় না, পাঁচ জড়ো করিলে তাহা হয়, অথচ পঞ্চানন্দই কোন এক পাঁচে হয়। আমার হয় বটে, কিন্তু বুঝিয়া দেখুন পঞ্চানন্দের হয় না।

ঘরের রসের কথা বলিয়াছি, সেটা মজ্জাগত; বাহিরে যে রকম টান, ভগবান্ জানেন তাহাতে টাকবা শুকাইয়া যায়। পঞ্চানন্দের মাহিয়ানা বাড়ে না, টেক্স কমে না, উপাধি জোটে না, সুখ্যাতি রটে না, আয়েস মেটে না, ফল কথা মনের মতন কিছুই ঘটে না, ইহাতে কি রসিকতায় মন ওঠে? কিছুতেই না।

পঞ্চপেটে ঢেকুর তোলা আর ছাঁচি পানে মুখশুদ্ধি করা অভ্যাস ইংরেজের থাকিতে পারে, ফরাসির থাকিতে পারে, মার্কিনের থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর কখনই নহে। বাঙ্গালী সারগ্রাহী, কাজ বোঝে, ফক্কুড়ী বোঝে না; সেইজন্ত বাঙ্গালী বিদ্রূপ করে, বিদ্রূপ সহিতে পারে না। তবে বলুন দেখি, পঞ্চানন্দে তাহার কি আনন্দ হইবে? যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিয়াছে যে, বাঙ্গালী লিখিয়া সুখী, পড়ে না, খাটাইয়া সুখী, খাটে না, এইটুকু শিখিয়া রাখা উচিত, সেই জন্ত একটা কথা আছে— "শতং বদ, মা লিখ"। আমি আরও একটু বলি,—"শতং লিখ, মা ছাপো"। অরসিকের কাছে রসিকতা কেবল বিড়ম্বনা। সক্ হয়, "শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কাগজে" সক্ মিটাইতে পারেন। স্বার্থপরতার দাস হইয়া অর্থের টান ধরিয়া অনর্থক হাড় জালাতন করিবেন না।

নূতন ভূগোল।

পৃথিবীর আকৃতি।

১। পৃথিবীর আগাগোড়া চাপা, নহিলে সমস্তই গোল। চাপা বলিয়াই সকলে মনের কথা বলিতে পারে না। এবং সকল সময়ে সত্য কথাও বলিতে পারে না।

২। যাঁহারা খেলেন, তাহারা বলেন পৃথিবী ভাঁটার মত; যাঁহারা পেটুক, তাঁহারা বলেন কমলা নেবুর মত। কথা একই, তবে যাহার যেমন রুচি।

৩। জাহাজ আসিতে দেখিয়াই গোল বোঝা গিয়াছে, গ্রহণ দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে।

পৃথিবীর গতি।

১। পৃথিবীর দুই গতি; নিত্য যাহা হয় তাহাকে দুর্গতি এবং বৎসরে যাহা একবার হয় তাহাকে সদ্গতি বলা যায়।

২। পৃথিবীর গতি নিয়মিত চক্রে হইয়া থাকে, সে চক্র দেখা যায় না, অনুমান করা যায়, সেই জন্য তাহাকে অদৃষ্টচক্র বলে।

৩। পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ অকূল পাথারে ভাসিতেছে, দাঁড়াইবার স্থল নাই।

৪। পৃথিবী এক গ্রহ, আরও অনেক গ্রহ আছে, সকলেই টানাটানি করে, তাই পৃথিবী এক রকমে চলিয়া যায়।

পৃথিবীর ভাগবর্ণন।

১। পৃথিবীর কতক জল, কতক স্থল। ভাষা কথায় ইহাকে অর্দ্ধ-গঙ্গাজলী বলে, কিন্তু সেটা ভুল; কারণ জলই বেশী।

২। অধিক ভূমি এক স্থানে দেখিলেই দ্বেষ হয়। অনেকে দ্বেষ স্বীকার করিয়াও লেখেন—দেশ। ফলতঃ দ্বেষে দোষ নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কেননা দেশত্যাগী হইতে যে সে অনুরোধ করে; কিন্তু দ্বেষত্যাগী বলিয়া কোনও কথা চলিত নাই।

৩। যেখানে গৌরাঙ্গের জন্ম, সেই স্থানকে দ্বীপ বলে। দেশী গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বিশেষরূপে জানাইতে হইলে নবদ্বীপ বলা যায়।

৪। বড়লোক যেখানে হাত ঝাড়ে সেই স্থানে পর্ব্বত হয়।

৫। অন্ধকারে সিঁধ কাটিয়া সিঁধের ভিতর হাত বাড়াইয়া দিলে সেই হাতকে অন্তরীপ বলা যায়। গৃহস্থ যদি সেই হাত চাপিয়া ধরে, তখন তাহাকে যোজক বলে।

৬। যাহা সকলে ডিঙ্গাইতে পারে না, অথচ ডিঙ্গাইতে পারিলে অমরত্ব লাভ করা যায়, তাহাকে সমুদ্র বলে।

৭। উচ্চকুলে জন্মিয়া যে নিজের তরলতা দোষে আপনি ভাসিতে ভাসিতে শেষে দুই কূল ভাসাইয়া সাগর-সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে নদ বলে।

৮। জলের অন্যান্য বিবরণ দেওয়া গেল না। বঙ্গদেশে দণ্ডী কলসী অত্যন্ত সস্তা। শুদ্ধ সেই কারণে। তদ্ভিন্ন অনেকে জল দেখিলে ভয় পান।

পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ।

১। মানচিত্র করিবার সুবিধার জন্য পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দুপাটী মণ্ডা (১) ছাড়াইয়া দুই ভাগে রাখিলে যেমন হয়, সেই ভাবে পৃথিবীও দ্বিধা অঙ্কিত হয়।

২। বারকোসে মণ্ডা সাজান থাকিলে যে পিঠে ধুলা গুঁড়া বেশী পড়ে, তাহাকে কহে পুরাতন পৃথিবী। আর এক পাটী এক সঙ্গে সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে নজরে পড়ে না, শেষে ভদ্র লোকের সুখ-সেব্য হয়, তাহাকে নূতন পৃথিবী বলে।

৩। পুরাতন পৃথিবীতে ভিড় বেশী, নানা প্রকার নরলোকের সমাগম। যেখানে প্রথমে আসিয়া জমায়েৎ হইয়া তথা হইতে, নরকুল পৃথিবী ছাইয়া ফেলে, এবং শেষে যেখানে আসিয়া নরগণ (বিকল্প) দৌরাত্ম্য করে, তাহাকে কহে আসিয়া। কাফেরীর যেখানে জন্ম, তাহাকে কহে আফেরিকা। কেহ কেহ বলেন যে আফেরিকার প্রকৃত নাম কাফেরুকা; ইয়রপে (Europe) যে প্রকার সিংহ ভল্লুক প্রভৃতি চতুষ্পদ এবং গৃধ্র প্রভৃতি মহাপক্ষীর প্রভুত্ব, তাহাতে ফেরু হইতে আফেরুকার নাম করণ অসম্ভব নহে। যিনি ইয়রপ, তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইয়রপের অর্থই (You-are-up) তুমি এখন উপরে।

৪। পৃথিবীর যে আধখানা যুড়িয়া দেবগণ বাস করেন এবং যেখানে বাস করিলে অমরতা লব্ধ হয়, তাহার নাম অমরিকা! দেবগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদের নাম অনুসারেও কেহ কেহ এই মহাদেশের নাম করণ করিয়া থাকেন, ঐ অনুসারে আমেরিকারে কেহ কেহ মারক্ষীণ (২) বলিয়া থাকেন।

প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত।

---

(১) এ তত্ত্ব ঠাকুরই জানেন।—শ্মশানের নন্দী।

(২) মারের চোটে ক্ষীণ।—ছাপাখানার নন্দী

পাঁচু-ঠাকুর।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

[illegible] এক কাণ্ড সাঙ্গ করিয়া- [illegible] ভাবিয়া দেখিলে [illegible]

[illegible] মুরব্বি নহিলে চলিবার যো নাই। [illegible], সব সময়ে সব কাজ উদ্ধার করিতে [illegible] পারিবে না। [illegible] অপরিহার্য্য। তাহা যদি পাওয়া যায়, [illegible] কাজ হইবে, [illegible]। কিন্তু সকলেই জানে যে, বাঙ্গালার [illegible], বাঙ্গালার সাহস নাই, সামর্থ্য নাই। তবে যে দুই প্রহরের [illegible] দোষ হইলেই বা চারা কি? [illegible]

[illegible] প্রতিপালন করে, আর [illegible] চেষ্টা করে, "গ্রাহক এবং অনু- [illegible] প্রার্থনা" করিবার [illegible] তাহারা ঘরে ঘরে [illegible] লইয়াছে। পঞ্চানন্দ এখন স্বেচ্ছাবশে এই নিয়মের দাস। অতএব মামুলী কাজটা তিনি করিবেন, সেই কৈফিয়ৎ বলো, যাই [illegible], একটা তিনি দিবেন।

বঙ্গ সংসারে পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল যে [illegible] জন্য পঞ্চানন্দ থাকিবে, তাহা নয়। সে ত হরবোলার কাজ, ভাঁড়ের কাজ। [illegible] করিয়া [illegible] যে পঞ্চানন্দের কাজ, তাহাও নয়। কুতুকাতু দিলেই ত অনেকে হাসিয়া গলিয়া যায়। পঞ্চানন্দের প্রয়োজন গুরুতর,—ভ্রমের বিকৃত মূর্ত্তির

চিত্র প্রদর্শন, অসারতার মর্ম্মোদ্ঘাটন, ভাষার পুষ্টিসাধন, প্রকৃত দেশহিতৈষিতার উৎসাহবর্দ্ধন—তদভাবে পাঁচটা লোক প্রতিপালন এবং নিজের কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন—ইহাই পঞ্চানন্দের প্রয়োজন। তুমি বিদ্যার ভাণ্ডারী, জ্ঞানের কুবের, তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু এক আর একে দুই হয়, ইহা যে বুঝিতে পারে, সেও এখন বুঝিতে পারিবে যে, পঞ্চানন্দের প্রয়োজন আছে, নহিলে আবির্ভাব কেন?

যাঁহারা পঞ্চানন্দের পরম বন্ধু, তাঁহারা একটা অনুযোগ করিয়া থাকেন, সেটার উল্লেখ অগ্রে করা আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চানন্দের অনেক কথা বোঝা যায় না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে বলিব দোষ পঞ্চানন্দের নয়, দোষ তোমাদের বুদ্ধির, আর দোষ তোমাদের ভাষার। বাস্তবিক কিন্তু অনুযোগটাই অমূলক। বাঙ্গালা ভাষা বুঝিলে নাকি ভারি নিন্দার কথা, সেই জন্য বুঝিয়াও অনেকে বলেন যে, বোঝা গেল না। তাহার এক প্রমাণ এই যে, ক্ষুদে কাঁকড়া, ছেলে ছোকরা, পালে পালে দলে দলে যখন টৌনহলে রাজনীতির বিষম সমস্যার বিজাতীয় বিতণ্ডা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, তখন ত কেহ বলে না, যে আমি বুঝি না, তবু আসিয়াছি। বাগ্মীও বলেন না যে, কেহ বোঝে না, তবু আমি বকিতেছি! ভাই, আসল কথা কি জানো, পঞ্চানন্দ নাকি বাঙ্গালা, তাই অনেকে বুঝিতে পারে না। আর তা ছাড়া, যে ব্যথা বোঝে না, সে কি কথা বুঝিতে পারে?

এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা পঞ্চানন্দে রস দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে প্রথমত এই বলা যাইতে পারে যে, এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে পুকুরের জল শুকাইয়া যায়, হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়, জিহ্বায় ধূলি উড়ে, এমন অবস্থায় পঞ্চানন্দ কেমন করিয়া রসে টলমল করিবে? তাহার পর যে রস আছে, তাহা মজ্জাগত। যাহারা রসের ব্যবসা করে, তাহারা মহারুক্ষ খেজুর গাছের গলা কাটিয়া রস বাহির করে। রস চেনা চাই, রসগ্রাহী হইতে জানা চাই।

একটা ত্রুটির কথায় পঞ্চানন্দ কবুল জবাব দিতে প্রস্তুত। ইচ্ছা না থাকিলেও, কামনা না করিয়াও কালে ভদ্রে ভদ্রলোকের মনে পঞ্চানন্দ আঘাত করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেটা অনিবার্য্য। এই ত বড় লাটের ছেলে এ দেশে শিকার করিতে আসিয়া দুইটা মানুষকে গুলি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি রাগ করা উচিত? এ সব যে দুর্ঘটনা, ইহার জন্য দুঃখ করিতে হয়, করো, কিন্তু রাগ করিও না। বাস্তবিক অনেক সময়ে, অনেক স্থলে মানুষ কি পশু ঠাওরান যায় না; আর শেষে যদি ঠাওর হয়, তখন নিরুপায়, আর সারিবার আয় থাকে না।

অতএব, আইস ভাই, সকলে মিলিয়া—

১। মুদ্রণবিধি উঠাইবার জন্য প্রার্থনা করি।

২। নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজি ভাষার চর্চ্চা করি।

৩। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া ব[illegible] খুড়িয়া দিই

৪। চাকরি লক্ষ্য করিয়া স্রোতে পা ঢালিয়া দিই।

৫। আড়াই টাকা দিয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহক হই।

নববর্ষ।

নূতন বৎসর পড়িয়াছে, কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। এইরূপ বর্ষে বর্ষে বৎসর যাইতেছে, ক্রমে ক্রমে শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে। ন-আইনের ধমক, আঠারো আইনের চমক, অভাগার জন্ম, ভাগ্যবানের মরণ, চন্দ্রের উদয়, সূর্য্যের অস্ত, সংবাদপত্রের আবির্ভাব, মাসিকপত্রের তিরোভাব, ভাল মানুষের রপ্তানি, সাহেব-বাবুর আমদানি—এ সমস্ত যথানিয়মে হইয়া হইয়া পুরাতনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; তথাপি প্রতি বৎসরের "নূতন পঞ্জিকা"র শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে—গুপ্ত পঞ্জিকাই যে কত বাহির হইয়াছে, তাহাও ঠিক করা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় পঞ্চানন্দের নবপঞ্জী বাহির না করা আর শোভা পায় না। অতএব পঞ্চানন্দের নূতন পঞ্জিকা।

কর্ত্তা প্রতি প্রিয়ভাষে কহেন গৃহিণী।
বৎসরের ফলাফল কহ গুণমণি॥
কোনগ্রহ হইল রাজা, কেবা মন্ত্রিবর।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি প্রাণেশ্বর॥
কর্ত্তা কন গৃহিণীকে, যদি থাকে মন।
নবপঞ্জী-ফলাফল করহ শ্রবণ॥

বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়াং সোমবারে সাতাশী সালের উৎপত্তিঃ। তত্র অবতারঃ মিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষঃ। (সভাগুলি বজায় থাকিলে) পুণ্যং পুণং; (পিনাল কোড বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে) পাপং নাস্তি। ইংলণ্ডনাম তীর্থং, জঠরাগ্নিকো ব্রাহ্মণঃ; ওষ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ। (হ্যাটের মাথা পর্য্যন্ত মাপিলে) পাদোনচতুর্হস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ, প্রাণান্ত পর্য্যন্তং পরমায়ুঃ। ব্যবহার্য্যং কাচ পাত্রম্।

সাতাশী সালস্য লক্ষণং।

বক্তৃতায়াং রতো নিত্যং গৌরাণাং তুষ্টিসাধনম্।
উপাধি-ব্যাকুলা লোকা রাজানঃ টেক্স-কারিণঃ॥

তারকব্রহ্ম নাম।

গৌর ধর্ম্মো গৌর কর্ম্মো গৌর মে পরমন্তপঃ।
গৌর ভিন্নং ন জানামি গৌরেব মুক্তিদায়কঃ॥

অথ সাতাশী সালস্য স্থিতাব্দা।

মহাবিষুব সংক্রান্তি পর্য্যন্তং। গঙ্গার স্থিতাব্দা মড়ার সংখ্যা শেষ হওয়া পর্য্যন্তং। জগন্নাথ দেবের স্থিতাব্দা যতদিন হোটেল থাকে সেই পর্য্যন্তং। পঞ্চানন্দের স্থিতাব্দা গ্রাহক বংশ ধ্বংস পর্য্যন্তং।

অথ রাজাদি-কথনম্।

অস্মিন্ বর্ষে রাজা শুক্রঃ—"রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং" সুতরাং চক্ষুলজ্জা নাই। 'রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ' সুতরাং তিনি কবি, (১) প্রকৃতির (২) প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। দেবলোকে দলবিপ্লব অতএব রাজ-পরিবর্ত্তনাশঙ্কা; (৩) ফলতঃ যিনিই হউন, গ্রহ,(৪) সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেহ হইবেন; অত্র সন্দেহো নাস্তি।

মন্ত্রী জাম্বুবান্—যে গ্রহই মন্ত্রীর আসন প্রকাশ্যতঃ অধিকার করিয়া থাকুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে ঋক্ষপতিই (৫) সকল প্রকার মন্ত্রণার মূলে থাকিবেন, এবং যে কিছু কার্য্য হইবে, তাঁহাকে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়াই হইবে।—সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে।

মন্ত্রী শনি—যাহার প্রতি যখন দৃষ্টি তখনই তাহার লোপ; রাজভাণ্ডারে এবং প্রজার গৃহে স্বর্ণের প্রতি ইহার সর্ব্বদাই দৃষ্টি।

শস্যাধিপতি—জমিদার; প্রজার উৎপন্ন করিয়া খাদক।

জলাধিপতি—মহানগরে, পলতার কল, বাহিরে নালাপথ।

দ্বীপাধিপতি—লিবেরাল।

বায়ু-অধিপতি—সদ্বক্তা সম্প্রদায়।

বৈদ্য-অধিপতি—হাতুড়ে এবং ...

দণ্ডধারী—পুলীশ।

রৌদ্র—চিন্‌চিনে।

অস্মিন্ বর্ষে জল ৮০ আঢক তদ্বিভাগ—(৬) বঙ্গীয় রাস্তায় ৩০, গোওয়ালিনীর ... ৫ বামন ঠাকুরের ভাইনে ১৫, ব্রাক্ষীন গেলাসে (২) ২০।

---

(১) বাট লিটন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের শুক্রাচার্য্যের নামও কবি

(২) প্রকৃতি—প্রজা, না স্ত্রীলোক?—শ্রীছাপাওয়ালার সন্দেহ।

(৩) বোধ হয় বিলাতের মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তন বুঝাইতেছে।—শ্রীভাষ্যকার।

(৪) মূলে বানানের ভুল,—আমাদের পাড়ি তলোকে "গেরো"।—৺মল্লিনাথ জ্যোতিষ।

(৫) The Russian Bear (Bugler) রুশিয়া ভল্লুকঃ ইংলিশিয়া সিংহ: এসব কথার বার্থ কি?—শ্রীছাপাওয়ালা।

(৬) আশয় ত জলেরই হয়: যেমন জলাশয় আরও আশয় আছে নাকি?

(৭) গণনার স্পষ্ট ভুল; গয়লানীর দুধের কৈ? দুধের কল্যাণে ছেলেদের কাশী প্রাপ্তি হচ্ছে, সেটা বুঝি খড়ি ধরবার বেলা মনে থাকে না?—জ্যোতির্ব্বিদের গিন্নী

মেষাদি দ্বাদশ রাশির নাম।

১ মেষ—বাঙ্গালী; যে পথে একটা যায়, পালের পাল সেইদিকে ঝোঁকে। মেষগুলা লড়ায়ে, তাহাদের কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিয়া লোকে তামাসা দেখে।

২ বৃষ—মুসলমান; গাড়ী টানা অবধি হিন্দুর পূজা পর্য্যন্ত সমান অধিকার; যিনি ধর্ম্মের ষাঁড়, তিনি ঘোর নবাব।

৩ মিথুন—কেশব ও প্রতাপ।

৪ কর্কট—ভারতবর্ষের প্রজা; “কাঙ্গালের কর্কট রাশি”।

৫ সিংহ—ইংলণ্ড, সদাই তর্জ্জন গর্জ্জন, মেষ বৃষ ধরিয়া ভক্ষণ।

৬ কন্যা—বাঙ্গালা ভাষা; “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ” শাস্ত্রে এইরূপ, কিন্তু লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট।

৭ তুলা—উপাধিগ্রস্ত লোক; এত লাঘব স্বীকার কেহই করিতে পারে না।

৮ বৃশ্চিক—এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান, পাইওনিয়ার, ইংলিশম্যান, ডেলি নিউস্ প্রভৃতি; ইহাদের শতপদ, দংশন করিলে জ্বালায় অস্থির।

৯ ধনু—মফস্বলের হাকিম; গুণ থাক আর নাই থাক, কখনও সোজা দেখা গেল না।

১০ মকর—এ দেশে কখনও দেখা যায় নাই, কেহ কেহ বলেন এই রাশির প্রকৃত নাম রামছাগল (১)। তাহা হইলে অযোধ্যার তালুকদার হইলে হইতে পারে। যাহারা বানর নাচায়, তাহাদেরই সঙ্গে রামছাগল থাকে।

১১ কুম্ভ—বাঙ্গালা কাব্য; শূন্য বা পূর্ণ, যে কক্ষে আদর রমণীকক্ষে।

১২ মীন—মামার (২) ভাগিনে, জলচর জাতি

অথান্যান্য কথনমতিরিক্ত মূল্যায় প্রাপ্যামিতি।

---

(১) Capricornus. The He Goat.—P. D.

(২) শিষ্যের প্রশ্ন,—মামা কে? —মা; তা জানি। কিন্তু কাণা মা? গুরুর উত্তর,—এক হইলেই হইল।

সাতাশী সাল।

সাতাশী সাল চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর আর এক বৎসর ফুরাইয়াছে। ইহাতে সুখ-দুঃখের কিছুই তো দেখি না। নিত্যই এক এক বৎসর যাইতেছে; সাতাশী আটাশী কেবল গণনার কথা। যদি সুখের দুঃখের কথা তুলিতে হয়, কি বলিতে হয়, তাহা হইলে দিন গেল বলিয়া সুখ-দুঃখ প্রকাশ করাই উচিত। কিন্তু দিনের দাম বোঝে, এমন লোক অল্প, তাই দীর্ঘকাল পরে নিঃসাড়ে দিনের পর দিন—বহু দিন—কাটাইয়া নিদ্রিতের পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ন্যায় বর্ষান্তে এক দিন, এক বার, বৎসর গেল বলিয়া লোকে অধরোষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহার পর যে ঘুম, সেই ঘুম। সাতাশী সাল বহিয়া গেল; দশ জনে বলে, আমিও একবার বলি।

হরি বলো, দিন গেল! তিনটী তুড়ি দিয়া বিকট হাই তুলিয়া সাতাশী সালের অন্তিম দিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাউক। যেমন করিয়াই হউক, যে সময়েই হউক, হরিনাম লইলে ফল আছে; যে অসাড়, নিস্পন্দ, ক্রিয়াহীন, প্রাণবর্জ্জিত, তাহার জন্য হরি নাম বিশেষ মাহাত্ম্য ধারণ করে। "যার কেউ নেই তার হরি আছে।" যখন নির্জীব মানবের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে হয়, তখন তাহাকে "হরি হরি বলো, হরিবোল" বলিয়া হরিনাম শুনাইবার ব্যবস্থা আছে, রীতি আছে। সাতাশী সালের বঙ্গবাসিসমীপে, একবার "হরি বলো, দিন গেল" বলিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

যাহা বলিলাম তাহা সত্য। কিন্তু তবু উহারই মধ্যে একটা কথা আছে; যে মাছটা সূতা কাটিয়া অথবা জাল ছিঁড়িয়া পলায়, সেটা খুব বড় মাছ; আর যে মানুষটা মায়াসূত্র কাটাইয়া অথবা ভবজাল ছিন্ন করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করে, সেই খুব বড় লোক।

চুনো মাছের জালের ভিতর থেকে একটা দেড় ছটাক ওজনের পোনা মাছ পলাইয়া পলাইল; অমনি "খুব মাছটা পালিয়েছে, মস্ত মাছটা হাতছাড়া হয়েছে, মাছটা খুব প্রকাণ্ড" ইত্যাকার বিস্ময় ক্ষোভ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তিবিকারজ্ঞাপন ধ্বনি হইয়া থাকে। সেইরূপ মনসারাম রায়, আমরণ গৃহিণীর গহনাচিন্তায় নিমুক্ত থাকিয়া, আর পেটের ভিতর মদের ভাটি খুলিয়া বমনোদ্গারে পাড়া তোলপাড় করিয়া অবশেষে এক দিন শান্তিনিকেতনে যাত্রা করিলেও—"এমন মানুষ, এমন দাতা ভোক্তা, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তি আর হইবে না" বলিয়া হাহাকার শব্দও শোনা যায়। এমন অবস্থায় সাতাশী সাল যে একটা খুব সালের মত সাল চলিয়া গিয়াছে, একথা বলিলে সামাজিক প্রথার সম্মান ভিন্ন অবমাননা করা হইবে না। এ হিসাবে সাতাশী সালের একটা ইতিহাস লিখিয়া সংসারে উপকার করিলে দোষ হইতে পারে না; বরং না করিলে প্রত্যবায় আছে।

ইতিহাস লিখিতে হইলে বিস্তর কথা লিখিতে হয়। আমি প্রধান প্রধান কথাগুলা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। পারলৌকিক বিবরণ।*

যাহার বিনাশ নাই, বিবর্ত্তন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই, গতি নাই, স্থিতি নাই, সেই পুণ্য-আত্মার পুণ্যধাম-যাত্রার উল্লেখ করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত; সেই জন্য বঙ্গের পারলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা প্রথমেই করা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে সাতাশী সাল বঙ্গের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া পরিগণিত হইবে। পাপাত্মার দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনেকগুলি পুণ্যাত্মা ভব-ভবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

(ক) যাহাদের গৌরাঙ্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাদের খুব জোর কপাল। বুটের সুপারিশে প্লীহাপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া আত্মারাম প্রাণপক্ষী উড়িয়া যাইবে, কিম্বা গুলি-খোরের বদনাম না লইয়াও গুলি ভক্ষণপূর্ব্বক পঞ্চভূতের অধীনতা হইতে পাপ দেহের পাপপ্রাণ পরিত্রাণ পাইবে, এর চেয়ে ভালো কথা আর কি আছে বলো? তা সাতাশী সাল এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় নাই। কতকগুলি আত্মা কাঁসীযাত্রা করিয়াছে; ইহাদের উন্নতিও কাল্পনিক কথা নহে, কারণ ইহারাও গৌরাঙ্গের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়াছে। ভক্তিমার্গে এই পর্য্যন্ত।

(খ) আরও অনেকগুলি আত্মা, গৃহিণীর গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া, ভ্রাতাবে বিষয়-বিভবের হিসাব বুঝাইয়া দিতে অপারগ হইয়া, ছেলের স্কুলের মাহিয়ানা যোগাইতে না পারিয়া, মেয়ের বরের দাম দিতে অসমর্থ হইয়া,—ওদিকে কতকগুলি আত্মা গহনা বেচিয়া স্বামীর মদের যোগান যোগাইতে না পারিয়া, পরপুরুষের কোমর ধরিয়া নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শনে অক্ষম হইয়া, চেয়ারে বসিয়া "অপূর্ব্ব প্রেম" নবন্যাস পড়িবার সময় দুষ্টমতি শাশুড়ী কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়া—ইত্যাকার নানা কারণে নানা প্রকারে নানা আত্মা, কড়ি কাঠে দড়িবন্ধন (১) পূর্ব্বক উদ্বন্ধনে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া আরাম কুঞ্জে চলিয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন যাহারা জ্বরের সঙ্গে বিশিষ্ট আত্মীয়তা প্রযুক্ত, অথবা ওলাউঠার অলঙ্ঘনীয় নির্ব্বন্ধ জন্য বা এবম্বিধ অন্যবিধ কারণে ডাক্তার বাবুর অনুরোধে, হাতুড়ে উপরোধে, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দলও নিতান্ত পাতলা নহে।

আর যাহারা রাজার সম্মান রক্ষার জন্য শুদ্ধ পেটের দায়ে বাস্তভিটার মা ছাড়িয়া লোকান্তরে বসবাস করিতে গিযাছে, তাহাদের সংখ্যা যতই কেন হউক না,-

(১) এখনকার দিনে হইলে পঞ্চানন্দ অবশ্যই কেরোসিন তৈলের উল্লেখ করিতেন।

তাহারা গণনার মধ্যে আসিতে পারে না। আর গণ্য মান্য লোক ভিন্ন অন্যের হিসাব রাখিয়া পঞ্চানন্দই বা আত্মলাঘব করিবেন কেন?

তদনন্তর ছাঁকা পরলোকের কথা এইখানে শেষ করিয়া ইহলোক-মিশ্রিত পরলোকের কথা বলা যাইতেছে। অর্থাৎ ইহলোকে থাকিয়াও পরলোকের ব্যবস্থা যাহারা করিয়া থাকেন, সেই ধার্ম্মিক দলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে।

সাতাশী সালে ধর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। খৃষ্টান রাজা আফগানস্থানে এক গণ্ডে চপেটাঘাত খাইয়া দক্ষিণ-আফ্রেকাতে দ্বিতীয় গণ্ড পাতিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ সার্থক করেন।

মহম্মদের শিষ্যগণ এক হস্তে কোরাণ, অন্য হস্তে তরবাল চালাইবার সুবিধা না দেখিয়া, হোটেলে খানশামারূপ ধারণপূর্ব্বক হারাম অর্থাৎ শূকরমাংস ছেদন করিয়া ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ফলার এবং সাহেব সুবাকে খানা দিয়া "সর্ব্বজীবে সমান দয়া", পড়িয়া মাত্র থাকিয়া কথাটী না কহিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া, হিন্দুসন্তান কুলধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মী সকল ধর্ম্মের উপাদেয় [illegible] পাকাইয়া অকাতরে বিতরণপূর্ব্বক সগৌরবে নববিধানের ধ্বজা তুলিয়া ধর্ম্মের মহিমা [illegible] ত্রুটি করেন নাই।

আর ইহার পর উপধর্ম্ম, বাজে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি কত প্রকারে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—তাহার তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই এবং সংক্ষেপে বর্ণনাতীত।

মুখ্য কল্পে ধর্ম্মের এই ভাব; গৌণ কল্পে চতুর্দ্দিকে সুফল। আর্য্যসন্তান এত হাঙ্গামেও জাতি বাঁচাইয়া চলিয়াছে; ধর্ম্মজ্ঞানী জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া ভ্রাতৃভাবে সমগ্র পৃথিবীকে একাকার করিয়াছে; শুঁড়িভক্ত সর্ব্বত্র হোলি স্পিরিট * অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রসাদ করিয়া দিয়াছে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য তিরোহিত হইয়াছে; লোকে বিরোধ করা ভুলিয়া গিয়াছে; দলাদলি উঠিয়া গিয়াছে; নাপিত ধোবা বন্ধ করা বন্ধ হইয়াছে; সুতরাং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু সংসার হইতে অপসারিত হইয়াছে। অতএব সাতাশী সাল প্রকৃত ধর্ম্মের সাল।

২। রাজনৈতিক বিবরণ।

সাতাশী সালের ইতিহাসে অপরাপর প্রসঙ্গ না-কি পারলৌকিক কথার মত বড় অঙ্কের নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

* বুঝিতে পারিলাম না। বোতলা ভাঁটীতে কি হোলি স্পিরিট (Holy spirit) বিক্রী হয়?

—ছাপাখানার ভূত।

রাজনীতির ভিতর দুইটী মূল তত্ত্ব ; তাহারই ডাল পালা লইয়া ভাঙ্গচুর করিয়া যত যাহা বলা যাউক। মূলতত্ত্ব দুইটা এই যে, এক আছেন রাজা, তিনি হন ইংরেজ ; আর এক আছে প্রজা, সে হয় নেটিব। ইহাদের সম্পর্কও দুইটী কথা লইয়া—আদান আর প্রদান, তা' প্রজা টেক্স দিতে ত্রুটি করে নাই, রাজাও লইতে ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং রাজনীতির মূলসূত্র সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

যদি বলো প্রজাপালন আর রাজভক্তি লইয়াই রাজনীতি, তাহাতেও পঞ্চানন্দের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সাতাশী সালে ইংরেজ অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন। সঙ্গতি অনুসারে ছেলেকে যেমন লেখাপড়া শেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা করা হইয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খলের শাসন, বেতরিবতের সোহবৎ, দুষ্টের প্রহার—এ সমস্তই হইয়াছিল। আর মিতাক্ষরা শাস্ত্র নাকি নিতান্ত সেকেলে, সেই জন্যই বাপ থাকিতে বেটার ধনাধিকার হইতেই পারে না, তা' ইংরেজও মিতাক্ষরার মতে চলেন নাই।

রাজভক্তি পক্ষে, প্রজারাও অকাতরে রাজসেবা করিয়াছে। কেনই বা না করিবে ? সেটা তো চলা চাই। গুলি ডাণ্ডা,বঁটি দা, এ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া সুশীল সুবোধ বালকের মত প্রজারা ২৪ ঘণ্টা মেহনৎ করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়াছে, আর গুরুদক্ষিণার ভাবনা ভাবিয়াছে।

রাজনৈতিক ডাল পালা উপলক্ষে এই কথা বলা উচিত যে, জমীদারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রজাদের আর প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া জমীদারের দুঃখমোচন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষে একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ভিন্ন সাতাশী সালে তিনশ পঁয়ষট্টিখানি আইন জারি হইয়াছে, এক হাজার দিস্তা কাগজের দরখাস্ত হইয়াছে, পাঁচ হাজার ঘন্টা বক্তৃতা হইয়াছে, আর দশ হাজার বর্গমাইল দেশী সংবাদপত্র চলিয়াছে। সুতরাং রাজা এবং প্রজা উভয়েই সদ্ভাব এবং সৌহৃদ্য বিষয়ে লক্ষ যোজন অগ্রসর হইয়াছেন।

৩। বাণিজ্যিক বিবরণ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই কথার গৌরব বুঝিয়া বিস্তর ভারতবাসী তৈলের বিনিময়ে উপাধি, মানের বিনিময়ে পদ, খোশামোদের বিনিময়ে অর্দ্ধচন্দ্র, জাতীয়তার বিনিময়ে করমর্দ্দন, ধুতি চাদরের বিনিময়ে কপিত্ব, স্বতন্ত্রতার বিনিময়ে অনুকরণ—ইত্যাদি নানা রকমে নানা কারবার করিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের মূলধনের বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

ইংরেজও বাণিজ্যপ্রধান জাতি. ভারতবর্ষে অনেক কারবার করিয়াছেন। রক্ত ও শোণিত লইয়া অথচ মাটির দরে আফিঙ, গাঁজা মদ চণ্ডু বেচিয়াছেন ; ইহাঁদের বিচার না-কি খুব খাঁটি এবং সরেস, তাই অত্যল্প মাত্রাতে দিয়াও অনেকের সর্ব্বস্ব লইতে

পারিয়াছেন। ষ্ট্যাম্প বিক্রম, টিকিট বিক্রয়, প্রভৃতি দ্বারাও ইংরেজের বিস্তর লাভ হইয়াছে। আর কাবুল অঞ্চলে যথেষ্ট অপযশ লইয়া ভারতের ধন প্রাণ বিক্রয় দ্বারা ইংরেজ অল্প লাভ করেন নাই।

সংবাদ এইরূপ যে, সাতাশী সালে সাহিত্যের বাজার কিছু নরম ছিল, আমদানি রপ্তানিও কম হইয়াছিল। তা, হউক, কিন্তু তাহাতে পচা সড়া মালের কাটতি যে কম হইয়াছে, এমন বোধ হয় না।

৪। সামাজিক বিবরণ।

খবরের কাগজওয়ালা, সুশিক্ষার টিকাওয়ালা প্রভৃতি প্রধান লোকেরা বলেন, এবং ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, সমাজের কথায় আমাদের কাজ কি? পঞ্চানন্দও তাই বলেন। বাস্তবিক বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সধবাবিবাহ, ভদ্রলোকের সম্মান, ইতর লোকের অজ্ঞান, যুবাদের দীক্ষা, ছেলেদের শিক্ষা, বারোয়ারি, দলাদলি, পঞ্চাইতি কি মদমাতালের ঢলাঢলির কথায় থাকিয়া দরকার কি? ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই উন্নতির মূল। কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখিবে না, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না—তবে তো মঙ্গল! তাই যদি হইল, তবে কে কি খাইল, কে কোথায় যাইল, রাম কি বলিল, হরি কি করিল, কাহার কেমন সংস্কার, কিসে কার উপকার—এ সকল কথা ভাবিয়া তাসের সময়, টপ্পার সময়, ইয়ারকির সময় কেন বৃথা নষ্ট করিতে যাইব? সমাজ আছে আপনার আছে, তাহাতে আমারই বা কি আর তোমারই বা কি? সমাজে মাহিয়ানা বাড়ে না, রাজাবাহাদুরী ঘটে না, কাজ কর্ম্ম জোটে না, দেনা পাওনা মেটে না, কিছুই হয় না—তবে সমাজের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? এই মহান্ ভাবের পুষ্টি সাতাশী সালে হইয়াছে।

৫। সাহিত্যিক বিবরণ।

একা পঞ্চানন্দের কথা বলিলেই সমগ্র সাহিত্যের কথা বলা হইল। সাতাশী সালে স্বতেজে, স্বজোরে, লোকযোগে, ডাকযোগে, আপনার সুযোগ বুঝিয়া, পরের অনুযোগ সহিয়া, পঞ্চানন্দ চলিয়া আসিয়াছেন। ছ কোটী সাড়ে সাতাশী লক্ষ বঙ্গবাসী সকলেই মনোযোগপূর্ব্বক ভাবগ্রহ করিয়া পঞ্চানন্দ পাঠ করিয়াছেন। কেহ রাধাবল্লভ জীউর বনমালা বন্ধক দিয়া, কেহ দুর্গোৎসবের ব্যয় কমাইয়া দিয়া, কেহ শুঁড়ির খাতায় বাকী রাখিয়া, কেহ পোঁ ট্রিয়টিক-ফণ্ডে দাতব্য না করিয়া—এইরূপে যিনি যেমন পারিয়াছেন, আড়াই টাকা বাঁচাইয়া পঞ্চানন্দের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কাহারও কাহারও মূল্য বাকী রাখা অভ্যস্ত ছিল। সাতাশী সালে তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সকলেই অগ্রিম মূল্য দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জাতীয়

গৌরবের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কাজে কাজেই অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পঞ্চানন্দ এক চিত্তে এক ভাবে আত্মকর্ম্মে নিয়োজিত পারিয়াছেন।

যাঁহারা যথার্থ সুশিক্ষিত, কেবল তাঁহারাই সাতাশী সালে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেমন পাঠক অপেক্ষা লেখকের সংখ্যা অধিকতর ছিল, সাতাশী সালে আর সেরূপ হয় নাই। সাহিত্য-সংসারে আর এক সুলক্ষণ এই দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক লেখকই স্ব-স্বপ্রধান না হইয়া সকলে মিলিয়া লিপিসাহায্য দ্বারা স্বীয় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান এবং পঞ্চানন্দের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং সাতাশী সালে কি রাজদ্বারে, কি সুহৃদ্‌সমাজে—সর্ব্বত্রই বিলক্ষণ প্রভাব দেখাইয়া পঞ্চানন্দ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

অতএব সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণকে ধন্যবাদপূর্ব্বক পঞ্চানন্দ পুনশ্চ কুশাসন গ্রহণ করিতেছেন।

আর সম্প্রতি যে পরচ্ছিদ্রদর্শী পঞ্চানন্দ সঙ্গদোষে সাধারণীর কাছে ধরা পড়িয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহাতে লোকের ক্ষতি নাই, পঞ্চানন্দেরও বৃদ্ধি নাই।

এখন অষ্টাশী সাল এইরূপ চালাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকে না।

বিলাতের সংবাদ-দাতার পত্র—১।

সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। আপনার প্রসাদাৎ এ দাসের প্রাণ-গাতক মঙ্গল। পরে নিবেদন, আমার অন্তঃকরণে বড় দুঃখ হইয়াছে,যেহেতু এ সংসারে যোগ্য ব্যক্তির মরণ, অযোগ্যের সুখ-সমৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে অকাল কুষ্মাণ্ডের পিতা পিতামহ জমিদারী রাখিয়া গিয়াছে, সে তাকিয়া ঠেসান দিয়া স্বচ্ছন্দে মদের ইয়ার, গুলির গোলামে পরিবেষ্টিত হইয়া দুনিয়াকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে, আর আমি নাকি আজন্ম খাটিয়া বিদ্বান্ হইয়াছি, সেই জন্য আপন ভিটায় দুদিন কাটাইতে পাই না। আপনি আমাকে ধরিয়া কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন; সেখানে যেই সুখ্যাতির সহিত কার্য্য আঞ্জাম দিলাম, অমনি আমার মস্তকে বজ্রপাত হইল; আপনি আমাকে বিলাতে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তবু এতদিন নানা টাল বাহানায় ফাঁকি দিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম যে, আমা ভিন্ন আপনার গতি নাই, আপনার ভক্তগণ, চটিয়া যাইতেছে, তখন অগত্যা আসিতে হইল। বলুন দেখি, ইহাতে দুঃখ হয় কি না হয়?

জাহাজে আরোহণ করিয়া আমার আরও কষ্ট হইয়াছিল। প্রথমতঃ সামুদ্রিক বাঁচি দর্শনেই ত অন্তরাত্মার চৈতন্যলাভ হয়; তাহার পর অনেক বিচ্ছেদের অর্থাৎ

ডাইবোর্শের মোকদ্দমার সূত্রপাত জাহাজেই হইয়া থাকে, একথা যখন শুনিলাম, তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। জাহাজে অনেক মেম থাকেন, দর্পণ আমার অতিশয় চাটুকার, এবং বঙ্গবাসীরা পুরুষ হওয়া দূরে থাকুক মানুষের মধ্যে গণ্য নয়—তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন, সুতরাং আমার ভয়ের যে বিশেষ কারণ ছিল, ইহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নিরাপদে আমি তীরস্থ হইয়াছি। আমার স্বীকার করা উচিত যে, আসিবার সময়ে আমি চাঁদনি হইতে যে একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা একখানা রবিবারের মিররে জড়ান ছিল। জুতা জোড়াটি যখন তখন খুলিয়া দেখিতাম, সুতরাং মিররও একটু আধটু পড়া হইত; যাহারা মনে করিবে যে, ইহাতে ধর্ম্ম সঞ্চার হইতে পারে না, এবং এই মনে করিয়া বিদ্রূপ করিবে, তাহারা পাষণ্ড, নাস্তিক। প্রমাণ-স্বরূপ একটা গল্প বলি, ক্ষমা করিবেন।

হলা ডোম ছেলেবেলা পর্য্যন্ত অতি দুষ্টপ্রকৃতি ছিল। জলার ধারে মানুষ ঠেঙ্গাইবার মতলবে হলা বরাবর বসিয়া থাকিত। একদিন মানুষ দেখিতে না পাইয়া হলা ঢিল ছুড়িয়া একটা বককে মারিল, বকের গায়ে ঢিল না লাগিয়া জলে পড়িল, সেই জল ছিটকাইয়া একটা তুলসী গাছে লাগিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত হলা কখনও কোনও সৎকর্ম্ম করে নাই। ক্রমে হলার মৃত্যু হইল; যমের কাছারীতে চিত্রগুপ্ত পাপ-পুণ্যের খাতা খুলিয়া দেখিলেন, পুণ্যের মধ্যে একদিন তুলসী গাছে জল দিয়াছিল (সেটা উপরে বলা হইয়াছে), তদ্ভিন্ন সমুদয়ই পাপ। সেই তুলসী গাছে জল দেওয়ার দরুণ যম হুকুম দিলেন, হলা একবার বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পাইবে আর অবশিষ্ট কাল তাহাকে নরক-বাস করিতে হইবে। হুকুম শুনিয়া হলা যমরাজকে বলিল—"মহারাজ চিরকাল নরকে থাকিয়া শেষে কবে, বিষ্ণু-মন্দির দেখিব, তাহার ত স্থিরতা নাই; তাই নিবেদন করিতেছি যে, যদি বিষ্ণু-মন্দিরটাই প্রথমে সারিয়া লইতে দেন ত আমার পক্ষে ভাল হয়। শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া নরকে থাকি।" প্রার্থনা সঙ্গত দেখিয়া যম বলিলেন—"তথাস্তু!" অমনি বিষ্ণুদূত আসিয়া হলাকে স্কন্ধে আরোপণ করত লইয়া চলিল।

কিয়দ্দূর গমনানন্তর বিষ্ণুদূত বলিল—"ঐ দেখ, হলা, ঐ বিষ্ণুমন্দির দেখা যাইতেছে।" হলা বলিল—"প্রভু বিষ্ণুদূত! চক্ষে। যদি সে জ্যোতিই আমার থাকিবে, তাহা হইলে এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন?"

আরও কতদূর গিয়া বিষ্ণুদূত আবার সেইরূপ দেখিতে বলিল। হলা উত্তর দিল যে—"তোমাদের যদি বেগার দেওয়া হয়, তবে আমাকে ফিরাইয়া যমের বাড়ী লইয়া চলো; আমি আগেই বলিয়াছি, আমি অন্ধ, তবে আর আমাকে দূর হইতে দেখিতে বলিয়া ফল কি?"

[illegible] লজ্জিত হইয়া বিষ্ণু-মন্দিরের যত নিকটবর্ত্তী হইয়া হলাকে দেখিতে বলে, [illegible] অন্ধের ভাণ করিয়া দেখিতে অস্বীকার করে। ক্রমে ঠিক বিষ্ণুমন্দিরের [illegible] উপস্থিত হইয়াছে, অমনি বিষ্ণুদূতের স্কন্ধ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া হলা বিষ্ণু-[illegible] দেখিল। হলার তৎক্ষণাৎ মোক্ষ এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইল; যে যমদূতেরা [illegible] আনিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল, এবং যমরাজও [illegible] সহিত খাতায় হলার [illegible] খরচ লিখিবার জন্য চিত্রগুপ্তের প্রতি আদেশ করিলেন।

[illegible] হলা যেমন [illegible] তুলসীগাছে জল সেচন করিয়া উদ্ধার পাইয়াছিল; আর [illegible] উক্তাবিধ মিরর্-পাঠে [illegible] হইবে না, ইহা অসম্ভব।

[illegible] বিলাতে পৌঁছিয়া আমার দুঃখের কতক নিবৃত্তি হইয়াছে। তাহার প্রধান [illegible] এত দিন ভারতবর্ষে [illegible] সাহেব বলিয়া ভয়ে তটস্থ হইতাম, [illegible] নেটিব বলিয়া, আমাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিত, এখানে আসিয়া অষ্ট-[illegible] সহরম করিতেছি এবং তাহাদের [illegible] আপনাদের লিখিয়া পাঠাইব, তাহাতে নেটিব বলিয়া [illegible] "[illegible] পথ ছাড়, গাড়ী পর্ নাও" চিরকাল শুনিয়া আসিতে-ছি [illegible] হইল। আমার নেটিবগণ আপনাদের ভক্তি-[illegible] প্রতিশোধ। [illegible] পরিপূরণ জন্য আমার আহ্লাদ [illegible] আরও আনন্দের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

[illegible] নেটিব [illegible] সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে, [illegible] ব্রাহ্মসমাজের [illegible] জানিয়া সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা [illegible]।

[illegible] দেখিতেছি যে, নেটিবগণ বিদ্রূপের ভয়ে অতিশয় ভীত, ইহাদের [illegible] সহজেই [illegible] হয়। আমাদের দেশের লোকের চামড়া গণ্ডারের [illegible] অভেদ্য, যত কেন তীব্র বিদ্রূপ করুন না, তাহাদের গায়ে কিছুতেই [illegible] না। মনে করুন, আইনের নিষেধ জানিয়াও একজন আমাদের দেশী উকীল [illegible] মোক্তারদের ডাকিয়া পার্ব্বণী ব'লয়া সংবৎসরের দশোত্তরা (১) বা মোক্তারনামাটা মিটাইয়া দিয়া থাকেন। আপনি "শনিবারের পালা" (২) লিখিলেন, উকীল বাবু [illegible] পড়িলেনই না, কিম্বা যদি পড়িলেন, তবে ভ্রূক্ষেপই করিলেন না,

(১) [illegible] দশ।

(২) পরে পদ্যাংশে আছে।

উলটিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া দিলেন। তাহার পর যদি তাঁহাকে বেহায়া, নীচ-প্রকৃতি, পাজি, নচ্ছার, দুরাচার বলিয়া অপদস্থ করিবার কামনা করেন, সেও বৃথা হইবে, নাম ধরিয়া না বলিলে বাবু চটিবার লোক নহেন।

কিন্তু এখানে নেটিবদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপ। অমন ভরো একটা কথার ইঙ্গিত যদি এখানে হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, সকল উকীলে খুটিয়া সেই পালনষ্টকারী কৃষ্ণ মেষকে শিকার করিয়া বাহির করিবে, তবে ছাড়িবে; সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিবে, যতক্ষণ প্রতীকার না হয়, ততক্ষণ জলগ্রহণ—এ দেশে বাতীগ্রহণ—করিবেন না। এই দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে। হয় ত নেটিবদের আমি ভালো বাসিয়া ফেলিব। যাহা হয় পরপত্রে টের পাইবেন।

বিলাতের সংবাদ-দাতার পত্র—২।

আমার প্রিয় পঞ্চানন্দ,

আমি এখন সভ্যতার খনিতে প্রবেশ করিয়াছি, সুতরাং আর সে সেকেলে—"দণ্ডবৎ প্রণাম" ইত্যাদি বর্ব্বর সম্বোধনে আমার পত্র কলঙ্কিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের লোকের একটা ভয়ানক কুসংস্কার আছে; তাহারা মনে করে যে, পিতা বা তত্তুল্য লোক হইলেই ভক্তির পাত্র হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সরস প্রিয় সম্বোধন করিলে পাপ হয়! কি মূর্খতা! ফলে, এখানে কোনও প্রকার কুসংস্কারের স্থান পাই-বার অধিকার নাই; একজন নেটিব কবি লিখিয়াছেন—

"বিলাতের মাটী ঠেকে যদি পায়ে,
দাসের শিকল খসিয়া যায়,
বিলাতের হাওয়া লাগে যদি গায়ে,
পরবশভাব বিনাশ পায়।"

(আমার অনুবাদের দোষ ক্ষমা করিবেন, আমি যে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা "পরবশ" হইয়া রহিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট।)—কাজে কাজেই এখানে আসিবার সময় ভারতের কুসংস্কার, ভারতের কুব্যবহার, ভারতের কুপরিচ্ছদ—সমস্তই বৃটিশ চ্যানেল অর্থাৎ ডোবরের দক্ষিণবর্ত্তী খালে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিক, আম স্মরণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের অনেক লোক শুদ্ধ বিলাতের গন্ধ বলে এ সব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে; এখন মেষ্টর বাবু অবধি নিরেট ন্যায়বাগীশ পর্য্য অনেকে সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে আমি যে "কালাপানী" পার হইয়া, লালপা উদরে ধরিয়াও বে-আদব চটী এবং বেল্লিক টিকীর জন্যে সেই বকেয়া বাপ-পিতামহে

বোকামি বহিয়া মরিব, ইহা কখনই সম্ভবে না। আপনি যদিও আমার শিক্ষাগুরু, তথাপি বিনয়ের সহিত আপনাকে শিখাইতে ইচ্ছা করি যে, আপনি যত সত্বর আপনার সেই হাস্যজনক হাব ভাব এবং ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করেন, ততই মঙ্গল। যে গোরু আমাদের সেবায় লাগে, আপনারা সেই গোরুর সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন,—এ লজ্জাকর কথা যেন আমাকে আর না শুনিতে হয়। যাই হউক, এইবার আলাত পালাত ছাড়িয়া আসল কথায় প্রবেশ করা যাইতেছে।

আমার শেষ পত্রে আভাস দিয়াছিলাম যে, এখানে থাকিয়া হয়ত নেটিবদিগকে আমি ভালো বাসিয়া ফেলিব। এখন সত্য সত্যই তাহা ঘটিয়াছে এবং উপরের কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠ করিয়া আপনি তাহা বুঝিতেও পারিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক এখানকার কয়েকজন নেটিবের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি এ দেশের গুণে মোহিত হইয়া উঠিয়াছি।

নেটিবদের প্রধান গুণ এই যে, বখামি কাহাকে বলে, ইহারা জানে না। আমাদের দেশের লোকে সংসারকে ভবের হাট বলে, অথচ হট্টগোল ভিন্ন হাটের কোনও পরিচয় তাহাদের কাছে পাওয়া যায় না। নেটিবদের ভাব অন্যরূপ, ইহারা মুখে বলে না, কিন্তু কাজে দেখায় যে, সংসার ভবের হাটই বটে। খরিদ, বিক্রী, লেনা-দেনা ভিন্ন এখানে আর কোনও কথা নাই।

ভারতবর্ষের সঙ্গে এ দেশের কি সম্বন্ধ? অনেকগুলি নেটিব ভদ্রলোককে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহারা সকলেই আমার প্রশ্নে অবাক্ হইয়া ঈষৎ হাসিয়া, মধুর ভাবে আমাকে উত্তর দিয়াছে—"গুরুর দিব্য!—(ইংরেজীতে "বাই জোব", কি না 'বাই জুপিটর' কি না বৃহস্পতির দিব্য,—সুতরাং আমাদের দেশীয় ভাষায় গুরুর দিব্য।)—তুমি পঞ্চানন্দের আত্মীয় (ইংরেজী শব্দ—ওন্) হইয়াও এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন, একজন দুগ্ধপোষ্য শিশুও তোমাকে বলিয়া দিতে পারে যে, ভারতবর্ষের সহিত এদেশের 'খাদ্য খাদক' সম্বন্ধ। যদি সে সম্বন্ধই না হইবে, তাহা হইলে প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক উন্নতির জন্য আমরা এত ব্যস্ত থাকিব কেন?"

উত্তরের শেষভাগটা শুনিয়া আমি অধিকতর কুজ্‌ঝটীগ্রস্ত হইলাম দেখিয়া নেটিবেরা হাসিতে হাসিতে আমাকে বুঝাইয়া দিল—"আমরা মেষ ভক্ষণ করি, তাহা ত জানো। বেশ, কিন্তু তাই বলিয়া কি দুর্ব্বল, মাংসহীন, বসাহীন মেষ আহার করি? না। মেষকে ভক্ষণ করিবার অগ্রে অন্ততঃ ছয় মাস ছোলা খাওয়াই, মেষকে হৃষ্ট পুষ্ট করি—তাহার পর উচিত ব্যবস্থা করি। ভারতবর্ষের উন্নতি না করিলে আমাদেরই ক্ষতি, আমাদেরই অসুখ, ইহা কি তোমরা বাস্তবিক বুঝিতে পারো না?"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। নেটিবদের সরল ভালবাসা ও

হইয়াছেই ; অধিকন্তু তাঁহাদের উপর আমার অচলা ভক্তি হইয়াছে। যথার্থ বলিতেছি, এমন ক্ষতি-লাভজ্ঞ, সুবিজ্ঞ পরিণামদর্শী মনুষ্য সংসারে আর কোথাও আছে বলিয়া আমার আর প্রত্যয় হয় না।

ভারত-রাজ্য চালাইবার জন্য নেটিবেরা যে বন্দোবস্ত করিয়াছে, দেশে থাকিয়া সেটা ভালো বুঝিতে পারিতাম না ; আর দেশের অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারে না। কাজেই এত অসন্তোষ, আন্দোলন এবং গণ্ডগোল সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আসিয়া উত্তমরূপে ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছি, এবং বুঝিয়া প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া আমি এখন কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই অনুরোধ করিতেছি যে, কোনও কথায় ত্রুটি দেখিতে পান, কিছু মনে করিবেন না। ঠাকুর-মা বলিতেন, এক দেশে এক মালিনী ছিল, সে রাজপুত্রগণকে গাড়ল করিয়া রাখিয়া দিত। এখন আমার মনে হইতেছে যে, এই সেই মালিনীর দেশ ; নহিলে যে একবার এখানে আসে, সেই গাড়ল হইয়া যায় কেন ?

যাউক। বন্দোবস্তের কথা বলিতেছিলাম। হিন্দুর ভারত নাকি খুব পুরাতন, খুব ভক্তির সামগ্রী, তাই জানিয়া ভারতবাসীকে তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে ভারত-লক্ষ্য কার্য্যতন্ত্রে নেটিবগণ ভারতের প্রাচীন আচরণ বিচরণে জোর জবরদস্তি করিয়া কোন গোলযোগ করিয়া দেন নাই। ভারতবাসী জানে যে সসাগরা পৃথ্বীর রাজা না হইলে রাজাই নয়, তাই ইঙ্গদেবী সাগরের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া ভারতের ভূ-সম্পত্তির উপর অধিকার চালনা করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চতুর্বর্ণের সংযোগ ভিন্ন সংসার চলে না, ভারতবাসীর এই চিরন্তন বিশ্বাস ; এ দেশের সহিত সম্বন্ধ হইলেও সে বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

এই দেখুন যাঁহারা সিবিলিয়ান নামে পরিচিত, তাঁহারাই হইতেছেন ব্রাহ্মণ,— বেদ-বিধির কর্ত্তা, সকলের পূজ্য, যজ্ঞের দক্ষিণান্ত পর্য্যন্ত বিরাজমান ; আর সিবিল সার্ব্বিশে প্রবেশ ইহাঁদের উপনয়ন, কবেনান্ট ইহাঁদের উপবীত, অতএব ইহাঁরা দ্বিজ-পদবাচ্য। ইহাঁরা স্বয়ং অবধ্য হইয়া যাহাকে যে দণ্ড নিক্ষেপ করা আবশ্যক করিতে সম্পূর্ণ অধিকার-বিশিষ্ট, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের একমাত্র প্রযোজক এবং ক্ষণস্থায়ী অসার সংসারে দেবতা ব্রাহ্মণের উপাসনা এবং তাঁহাদের উদ্দেশে স্বার্থের উৎসর্গ করিলেই অর্থের সার্থকতা—এই পরম জ্ঞানের নিত্য উপদেষ্টা। ব্রাহ্মণের উপবীত সংস্কার অল্প বয়সেই কর্ত্তব্য ; এই জন্য সিবিলিয়ানও অল্পবয়সে হইতে হয় ; পাছে ইহাঁরা ভারতবর্ষে এদেশের ব্যবস্থার আরোপ করিয়া অনিষ্ট করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় ইহাদিগকে এ দেশে কিছু শিখিতে দেওয়া হয় না ; সুতরাং অপক্ষপাতে, অবিচলিত-চিত্তে, শুদ্ধান্তঃকরণে ইহাঁরা তথায় কাজ করিতে পারেন।

এইরূপ মিলিটারি অর্থাৎ সৈনিকরূপে ক্ষত্রিয়, মার্চ্চাণ্ট অর্থাৎ বণিকরূপে বৈশ্য হইয়া ভারতের লালন পালন, ধর্ম্মরক্ষা, শাস্ত্র-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার নেটিবেরা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শূদ্র অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকে যে মনে করে, নানা ভেকে ভিক্ষা করাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য, সেটা নিতান্ত ভুল। সহজে বুঝিলেই ত হয় যে, একমাত্র দস্যুবৃত্তিতে যাহা সাধ্য, তাহার জন্য এতগুলি ভিন্ন বৃত্তি কে কোথায় অবলম্বন করিয়া থাকে?

ভবের হাট যে বলিয়াছি, সে কথার মাহাত্ম্যও ইহাঁরা যথাবিধি রক্ষা করিয়া থাকেন। সকলেই ত বেচা-কেনার ব্যাপার লইয়া আছে; তাহার মধ্যে আবার সূতার ব্যাপারীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে। যে সংসারে সকলেই কর্ম্মসূত্রে বাঁধা, সেখানে সূতার মান বাড়াইবার চেষ্টা করাই সুবোধের কাজ! তাই এখানে মান-চেষ্টারের মান-রক্ষার এত চেষ্টা। ভারতবাসী না কি ব্যাপার বোঝে না, কেবল গোল করিতেই মজবুত, তাই ভক্তি-কাণ্ডের সূত্রপাত লইয়াই এত বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বাস্তবিক মানচেষ্টারের তাঁতিকুলের মান না রাখিলে, এখানে কাহারই কুল রক্ষার আশা থাকে না।

এখানকার রাজকার্য্য মহাসভার দ্বারা সম্পন্ন হয়; ভারতে যেমন মহালাট, অনুলাট প্রভৃতি বিরাট পুরুষেরা সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করেন, এখানে সেরূপ কেহ নাই। এমন কি স্বয়ং সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীকেও এখন সাক্ষী গোপাল হইয়া থাকিতে হয়। গৃহস্থের ইচ্ছামত ভোগরাগে যেমন কুলবিগ্রহকে তুষ্ট থাকিতেই হইবে, এখানকার সভার কার্য্যে রাজাকে বা রাণীকেও সেইরূপ অনুমোদন করিতেই হইবে। এ দেশটা বাস্তবিক অদ্ভুত দেশ, এখানে নামে রাজা আছে অথচ কাজে রাজা নাই। তাই বলিয়া দেশটা যে অরাজক, তাহাও নহে। সেই জন্যই ত অদ্ভুত বলিতেছি।

সভার দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, বলিয়াছি। এই সভায় দুই দল লোক থাকে; একদল কর্ত্তৃত্ব করে, অন্যদল সেই কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইবার জন্য নিয়ত বিরোধ করিতে থাকে। মজা এই যে, কর্ত্তৃত্ব যখন যে দলের হাত ছাড়া হয়, তাহারাই রাজ্যের পরম বন্ধু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মনে করুন, এখন পান্তির দল কর্ত্তা আছে, গোঁড়ার দল এখন বলিয়া বেড়াইতেছে,—"ঐ দেখ, দেশের সর্ব্বনাশ করিল, মানসম্ভ্রম সব গেল, লোকের টাকাগুলা খোলামকুচির মত উড়াইয়া দিল, আমরা থাকিলে কিছুতেই এমন হইত না!" কিন্তু এ দেশের লোকে বেশ বুঝিতে পারে যে, দুই দলেরই মুখভারতী বিলক্ষণ, কাজের রীতিতে সে লক্ষণ বড় একটা থাকে না; সুতরাং রাজ্যটা খেয়ালের উপরেই চলে। নেটিবদের এই একটা আমোদ। সভার দুই দলেই খুব আমুদে লোক আছে; হাতে কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে,

ইহারা ভারতবর্ষের কথা তুলিয়াও কত আমোদ করে। কেহ ভারতবাসীকে ইন্দ্রত্ব দিতে চায়, কেহ ভারতবর্ষকে নন্দন-কানন করিতে ইচ্ছা করে; এইরূপ কত খেয়ালই তোলে। কিন্তু কাজের ভার পড়িলে ইহারা গম্ভীর হয়, তখন আর সে বৃথা আমোদের কথা লইয়া সময় নষ্ট করে না। এটা খুব গুণ বলিতে হইবে; কাজের সময়ে কাজ, আর আমোদের সময় আমোদ করাই ত মনুষ্যত্ব। নহিলে মনে করুন হাসিতে হাসিতে আমরা যত কথা বলি, সে সব ধরিয়া যদি কাজের বেলায় চলিতে হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে?

চোরা চিঠি।

[পঞ্চানন্দ ঠাকুর,—মুন্সীগঞ্জের ডাকমুন্সী আমার পরমাত্মীয়, সুতরাং লোকটা রসিক, ইহা বলাই বাহুল্য। ডাকের চিঠির ভিতর অনেক রকমের আমোদের কথা থাকে। ডাকমুন্সী ভায়া সেই লোভে, লেফাফার যোড়ের জায়গা রসনা-রসসিক্ত করিয়া অভ্যন্তরের গূঢ় তথ্য মধ্যে মধ্যে জানিয়া লন। নির্দ্দোষ রসিকতা বাঙ্গালীর সম্ভবে না, সুতরাং এ বিষয়ে ইঁহাকে অপরাধী করিতে পারিলাম না। সেদিন এইরূপে একখানি পত্র ইনি আমাকে পড়িতে দেন, শেষে অনুরোধের বশে নকল করিতেও দিয়াছেন। অবিকল নকল পাঠাই; বোধ হয়, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভায়ার অনুরোধে লেখকের নাম গোপন করিতে বাধ্য হইলাম; কারণ, রসিকতা অপেক্ষা চাকরির মূল্য বেশী।——শ্রীপরিচিত পুজারী।]

"আমার প্রিয়তমা জাহ্নবি,

কএক দিবস যাবৎ উৎসবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকা জন্য তোমারে পত্র লিখিতে পারিয়াছিলাম না। তোমার প্রেম যদিও পিতার প্রেমের থাকিয়া লঘু জ্ঞান করি না, কিন্তু ধর্ম্মের যদ্দ্বারা উন্নতি সম্বব হয়, সে বিষয়ে তোমাকেও উপদেশ দিতে আমি বাধ্য আছি। সেই জন্য আমি সাহস পাইতেছি যে, উৎসবের বৃত্তান্ত জানানে তোমার নিকট আমার কর্ত্তব্য করণ হইবে, এবং সেই সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ব্যবহারে অমনোযোগ না হওন প্রকাশ পাইবে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় যে প্রকার উৎসাহের সঙ্গে আত্মার পৃষ্ঠদেশে হস্ত দিয়া ধর্ম্মের পথে ঠেল দিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, স্বর্গের দ্বার অধিক ব্যবধান নাই, ক্যাবল নিকট হইয়া আসিতেছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেছে, জলসওম হইতেছে. হোম হইতেছে, শান্তি হইতেছে, অভিষেক হইতেছে,— সারদা পূজার কালে পাঠাকাটন হইবে কি না, একাল যাবৎ নিশ্চয় না। জল

হওন সম্ভব করি। ক্যাবল তাহাই না, মুসলমানের উজু আজান, খৃষ্টানের রক্ত মাংস ভক্ষণ, স্থাও হইতেছে।

এখনে জানা গেল যে, শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্যের কোচা টিপিয়া দরিতে পারিলে স্বর্গে যাওন পক্ষে বাধাঘটন হইতে পারে না। বেদ, বাইবল, কোরাণ, জেন্দাবস্তা, ললিত বিস্তার, চৈতন্যচরিতামৃত, ব্রতমালা, আরব্য উপন্যাস এবং সুলভ সমাচার এই নববিধানে স্বর্গ-নিকেতনের নবদ্বার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়ের করুণার জন্য কেহই এখন আর গুহ্য না, সকলেই সুপ্রকাশ। এমতে পরকালের চিন্তা আর নাই। তোমারে এইক্ষণ আমার অনুরোধ যে, তুমি সেমত গৃহিণী আর থাকিবা না, প্রেমচিন্তা এবং বৈরাগ্য অভ্যাস করণে মন দিবা।

আমার যাত্রার দিবস নিশ্চয় হইয়াছে। সাহেব হইয়া যখনে প্রত্যাগমন করিব, সেকালে তোমার মুখচন্দ্রে উল্কী-কলঙ্ক না দেখিতে হইলে বিলক্ষণ আনন্দ পাইব, ইহা মনে রাখিবা। দুই পয়সার সাবুন কিনিয়া হস্তে এবং মুখের পর মাখিবা, তাহাতে রং গোরা হইবে এবং উল্কীও পুছিয়া যাইবে। বক্ষী আষ্টঅঙ্গ গাউন পরিলে লুকান থাকিবে, তাহাতে সাবুন মাখিয়া পয়সা খর্চ্চ করিবা না।

আইসন কালীন যেমন যেমন কহিয়া আসিয়াছিলাম, সেইমত ইংরেজী শিখনে মন রাখিবা। ধন দাদারে এবং সোণা কাকারে দেখিলে মাথার কাপড় ফেলাইয়া দিবা। আমি সাহেব হইয়া আসিলের পর তোমার বিবি হওন চাই [পড়া গেল না] যাওন কালে নৌকার পর মাল্লার কোমর ধরিয়া নাচ [পড়া গেল না] বুরা কর্ত্তারে নমস্কার না করিয়া এইক্ষণ থাকিয়া হস্ত চালন করিবা। লজ্জা থাকিলে বিবি হওন যায় না, একেবারে বেহায়া হইবা এবং রাস্তার পর ভদ্রলোক দেখিলেই পাণিগ্রহনপূর্ব্বক সমাদর করিবা। আমাদের কুলপ্রথা এককালেই নিন্দার, সে জন্য কুলে কাটা দিয়া বাহির হইতে প্রস্তুত হইব।

রন্ধনে আর কর্ম্ম দেখি না। ফিরিয়া আসিলে পর বাবুরচি পাক উঠাইবে নামাইবে, খানসামা সে বাটিয়া দিবে। তুমি আমি ছুড়ি কাটা ধরিয়া টেবলে ভক্ষণ করিব। এখন ক্যাবল মাত্র নবাব সাহেবদের ঘরে মধ্যে মধ্যে বেড়ানে যাইয়া মুসলমান অভ্যাস করিবা। আমি যেমন পুরা সাহেব আসিব, তুমিও সেইমত পুরা বিবি হইয়া থাকিতে পারিলে সুখের কারণ হইবে।

আমার কারণ চিন্তা করিবা না। বিবি লোক বিধবা হইলে বিবাহ করিয়া থাকে, তুমিও করিতে পারিবা; আমি তাহাতে রাগ করিব না, বরং খুশী হইব।

সকলদিন আমারে পত্র লিখিবা। তাহাতে 'মাই ডিয়ার' করিয়া লিখিবা, বাবু করিয়া লিখিলে আমার জাতি থাকন সঙ্কট হইবে। ঠাকুরাণীরে আমার প্রণয় কহিবা। এই পত্রের উত্তর, মনুমেণ্টের পশ্চিম চাদপালের ঘাট ঠিকানায় লিখিলে আমি

পাঠ করিতে করিতে জাহাজের পর ভাসিব, দেশের হুতাশে চক্ষুর জলে ভাসিব না।”

“পুনশ্চ নিবেদন, সমাজে যাতায়াত রাখনে অনাবেশ করিবা না”।

পঞ্চানন্দের নিলামি আড্ডা।

আমরা বলি দিলাম!
তোমরা বলো নিলাম!
নিলাম! নিলাম!! নিলাম!!!
উঁচু দর যার,
জিনিস হবে তার।
আগামী চৈত্র সংক্রান্তির পর,
শুভ বৈশাখের পূর্ব্বে,
দুপুর বেলায়
তাড়ি-খানার সামনে,
গুলির আড্ডার পাশে
শুঁড়ির দোকানের কাছে
বর্দ্ধমানরাজ পবলিক্লাইব্রেরী ঘরে
(যেখানে সম্প্রতি
পঞ্চানন্দের নিলামি আড্ডা
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)
প্রকাশ্য নিলামে, সর্ব্বোচ্চ দরে,
ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে
তালিকার মাল।

১ নং লাট

বাঙ্গালা ভাষা, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত, মাঝে মাঝে ইংরেজীর বুকুনী দেওয়া, সায় বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল, “বিধাতার ভুল” ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম। অতি সুশ্রাব্য, সুদৃশ্য ও সুখাদ্য। সর্ব্বাংশে মদমত্ত বাবুকুলের উপযোগী।

[সম্পত্তি একজন বাবুর, যিনি সাহেব বাড়ীতে মর্দ্দা সাহেব, মেমসাহেব, খানশামা সাহেব প্রভৃতিকে তেলের যোগান দিতে চলিয়া গিয়াছেন।]

২ নং লাট।

মা ঠাকরুণের ঠেঁটি, বাবার থান কাপড়, নিজের কালা-পেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ও ঢাকাই উড়ুনি ও পিরাণ। প্রকাশ থাকে যে, মেগের শাড়ীখানি থাকিবে, নিলাম হবে না।

[সম্পত্তি জনৈক ভদ্র বাঙ্গালীর, যিনি রেলে যাইতেছেন।]

৩ নং লাট।

এক চাপকান (তালি দেওয়া, কিন্তু নূতনেরই মত), এক চোগা (কিছু কশাকশি), এক মখমলের টুপি (হাঁড়ির ভিতর গুঁজে রাখার দরুণ যৎসামান্য বেখাপ গোছ, কিন্তু অল্পদিনের খরিদা), এক পানটুলন [বোতাম নাই], একজোড়া মোজা [গোড়ালি ছেঁড়া], এক যোড়া জুতা [ঠনঠনের ডবল ইস্পিরিং বার্ণিশ-চটা], এক ছড়ি [পিচের], এক ঘড়ি [অচল], একছড়া চেন [গিলটি করা],

[সম্পত্তি জনৈক বাঙ্গালী বাবুর, যিনি রেলের গাড়ী থেকে নামিয়া গিয়াছেন।]

৪ নং লাট।

একটা মলবাহ কমোড [ঢাকনি ছাড়া], নূতন খবরের কাগজ [গোসলখানার], একজোড়া বিলিতি জুতোর তল [পেরেকমারা], একটা পিতলের গলাবন্দ [পোষা কুকুরের গলায় দিবার], একছড়া শিকলি [ঐ কুকুরের, এখন খণ্ড খণ্ড করিলে ঘড়ীর চেন হইতে পারে।]

[সম্পত্তি এক সাহেবের, যিনি বদলি হইয়াছেন। জমিদারের পুষ্যিপুত্র, উপাধি-গ্রস্ত উকীল, এবং অপরাপর বড়লোকের পছন্দসই জিনিস।]

৫ নং লাট।

ঝাঁটা (মুড়ো), দড়ি (দেড়হাত), কলসী (কিঞ্চিৎ কানাভাঙ্গা)।

[গোদ পঞ্চাননের সম্পত্তি, অন্য লাটের গ্রাহককে অমনি দেওয়া যাইবে।]

পরিমাণের দোষে পরিণাম নষ্ট।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, বিস্তর লোক জমিয়া গিয়াছে, তাহার পাশে হীরালাল বাবুও একটু মদবিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন—

ভাবযুক্ত হইয়া গায়ক গাইতেছে—

"কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় রে।"

শুনিমাত্র হীরালালের প্রাণ চটিয়া গেল, "দুঃশালা, ধেনো। তাইতে এত লোকের জটলা, বটে?" বলিয়া হীরালাল সরিয়া পড়িল।

নদীয়ার অঞ্জনা-নন্দনের * চেষ্টা।

নদীয়া জেলা জ্বরে জ্বরে খাক্ হইয়া গেল। এখন জ্বরের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কমিশুন বসিয়াছে। লোক অজস্র মরিতেছে, কমিশুনরেরা কারণের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কেবল এবেলা ওবেলা অঞ্জনার কাছে যাইতেছেন, আর "হেঁই মা কি হবে, ওমা কি করিব" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

পঞ্চানন্দের বিশ্বাস যে, এ জ্বর বায়ুর কোপে নহে, তবে অমন তর করিলে কি ফল হইবে? তবু দেখা ভাল, অঞ্জনার রাগ পড়িলেও যদি উপকার হয়।

খবর।

"খোশ খবরের ঝুটোও ভাল।"

—বগুড়ায় একটি স্ত্রী লোকের পুত্র মরিয়া যায়, সে কাঁদিবার জন্য পাশের দরখাস্ত করে। শান্তিভঙ্গের ভয়ে শার্প সাহেব তাহা দেন নাই; গরীব বেচারী কাঁদিতে পাইল না বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পঞ্চানন্দ এ সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

—শুনা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের জল-বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজেরা এদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। সংবাদ সত্য হইলে অতিশয় দুঃখের বিষয়, কেননা, তখন আমরা বক্তৃতা করিলে বুঝিবে কে, আর মেমোরিয়েল লিখিলেই বা পড়িবে কে?

—হিন্দুদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হুগলীর কয়েক জন উকীল ও জমিদার গোরাদের গরু খাওয়া বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহাদের স্বজাতিবাৎসল্য প্রশংসার যোগ্য। কারণ, জাতিরক্ষার উপায় করাই স্বজাতিবাৎসল্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

—যাহারা সর্ব্বদা বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া মদ খাইয়া থাকেন তাহারা গোলাভাটির প্রতিবাদ করিতেছেন। পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন যে এরূপ স্বার্থপরতা নিন্দনীয়, এবং বোধ হয় যে, ভারতবাসীদের এই প্রকার মতদ্বৈধ দেখিয়াই সরকার বাহাদুর কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না। বাস্তবিক, খোলা হউক, বন্ধ হউক, যাহাতে যাহার সুবিধা, সে সেই

---

* আফ্রিকার ভূবিবরণ যাহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহাদের উপকারার্থে জানান যাইতেছে যে, অঞ্জনার প্রবাহরোধই নদীয়ার জ্বরের একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে।—পঞ্চানন্দের পণ্ডিত।

অনুসরণ করিবে। ইহাতে আপত্তি করিলে ঘরে ঘরে বিবাদ হয় মাত্র। শাস্ত্রে বলে,—"যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।" কাজ নিয়েই কথা।

—বর্দ্ধমানের কমিশনর বীম্‌স সাহেব হুগলির বাঙ্গালীদের বিরস বিরক্তিকর বাচালতা বরদাস্ত করিতে পারেন না। সেই নিমিত্ত খোলাভাঁটির পোষকতা করিয়া লাট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যেনো কেনো যাহাই হউক, a good glass of grog পাইলে গলা একটু সরস হইবেই হইবে। বীম্‌স সাহেব, আর আমার এক রায়।

—ডিগুপ্তের প্রসিদ্ধ ঔষধের উপকার লাভের প্রত্যাশা করিলে "জীবিত মৎস্যের ঝোল" খাওয়া আবশ্যক। কয়েকজন পুরাতন রোগী "জীবিত মৎস্যের ঝোলে"র ভয়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে না পারিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় মৎস্যকে আগে যথেষ্ট পরিমাণে ডিঃ গুপ্ত খাওয়াইয়া শেষে তাহার ঝোল রাঁধিলে জীবিত থাকিতে পারে। অন্ততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সমালোচনা।

(১)

পঞ্চানন্দ, রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন। বর্দ্ধমান। সন ১২৮৮ সাল।

অনেক দিন পরে পঞ্চানন্দের দেখা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এ প্রকার পত্র বঙ্গদেশে আর নাই, ভারতবর্ষে আর নাই, পৃথিবীর কুত্রাপি আর নাই, সাহস করিয়া ইহা বলিতে পারা যায়। বাস্তবিক পঞ্চানন্দ আমার মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছে। যে দিন পঞ্চানন্দ বিলুপ্ত হইবে, আমরাও সেই দিন অবধি এ মুখ আর দেখাইব না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে এটা পক্ষপাতের কথা। পক্ষপাত হইতে পারে, কিন্তু সে ভালোর ভালবাসার পক্ষপাত, অজ্ঞানকৃত পক্ষপাত, আত্মগৌরব জনিত স্বপক্ষে পক্ষপাত। যাঁহারা এ কথার পোষকতা চাহেন, তাঁহারা হর্বর্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

ভাষার জন্য কেহ যদি গৌরব করিতে পারে, তাহা হইলে পঞ্চানন্দই পারেন। অতি সরল, কোমল, ললিত কথায় পঞ্চানন্দ মনের কথা প্রকাশ করেন, অথচ যেন ইক্ষুদণ্ড, যেন সছোবড় ঝুনো নারিকেল,—কাহার সাধ্য যে দন্তস্ফুট করে। কিন্তু পারিলে, রসে শাঁসে বিলক্ষণ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, সমস্তই বিদ্যমান। কি গদ্যাঘাত কি পদ্যস্রাব, পঞ্চানন্দের কিছুতেই কাহারও কথাটি কহিবার যোটি নাই। পঞ্চানন্দ সত্য সত্যই রস-প্রধান।

পঞ্চানন্দ অসাময়িক পত্র। ইহা অতি সুব্যবস্থার পরিচায়ক। যাহা সাময়িক অর্থাৎ Periodical তাহা কুইনাইনের আয়ত্ত; জ্বর সাময়িক, সেইজন্য জ্বর কুইনাইনের আয়ত্ত। সাময়িক পদার্থ মাত্রই হয় অনিষ্টকর, যেমন জ্বরাদি; নচেৎ নূতনত্বহীন, যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি। সাময়িকের আর এক দোষ আছে, অসময়ে কোন উপকার করে না। যখন লেখকের অভাবে, ছাপকের অভাবে, পাঠকের অভাবে, দামদায়কের অভাবে তোমার সাময়িক পত্র হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে, লোক সমক্ষে বাহির হইতেছে না, তখন সাময়িক পত্র তোমার কি উপকার করিতে পারে? উপকার দূরে আস্তাং, তোমার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, তোমার লীলাসাঙ্গ, তোমায় নাস্তানাবুদ করিয়া সাময়িক সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব সাময়িককে বিশ্বাস করিও না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চানন্দ অসাময়িক, যখন সংসার আর শ্মশানে এক ভাব, যখন 'সমাজ সমালোচনে' আর 'গোচারণের মাঠে' (১) সেই এক অক্ষয় অব্যয় মূর্ত্তি সাধারণীকৃত বলিয়া উপলব্ধ হয়, কত কথা, যখন তোমার নিতান্ত অসময় তখনই পঞ্চানন্দ। অসময়ের বন্ধুই বন্ধু। কে বলিবে, কোন্ পামর ইচ্ছা করিবে যে পঞ্চানন্দ সাময়িক হউক? যে করে, তাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই। তা ছাড়া সাময়িক পত্রই ত সবগুলা; অসাময়িকেরই নিতান্ত অভাব। পঞ্চানন্দ সে অভাব পূরণ করিয়াছেন।

আরও এক কথা বলা আবশ্যক। পঞ্চানন্দ শাস্ত্রার্থদর্শী, সেইজন্য অসাময়িক। শাস্ত্রকারেরা কলির এই কয়েকটি গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কলিতে—(ক) অন্নগত প্রাণ, (খ) জঠরাগ্নি উগ্র, (গ) ব্যাধিমন্দির শরীর, (ঘ) রোগ-শোক—পরিতাপ—বন্ধন—ব্যসন-সঙ্কুল জীবন, (ঙ) সহায়হীনের দুর্গতি, (চ) লোকসকল পাপমতি, (ছ) ন্যায্য গণ্ডা ফেলিয়া দিতে সাধারণের মনে হয় ক্ষতি। এই সাত পদার্থ সময়ের 'কোদণ্ড' অর্থাৎ "ষড়্‌রিপু" (২)। এতগুলি এড়াইয়া কি সময়ের মান রাখা সম্ভব?

অনেক কথা বলা গেল, আরও বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু পাঠকবৃন্দের বুদ্ধিকে খোরাক দিবার জন্য আর একটী মাত্র কথার উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

সমালোচনে পঞ্চানন্দ অদ্বিতীয়। উচিত কথা উচিত মত বলিতে পঞ্চানন্দ কখনই সঙ্কুচিত হন না। ষোলো আনার জায়গায় বরং আঠারো আনা—কম কিছুতেই না। অধিক কি, পঞ্চানন্দ আপনাকেই ছাড়েন না। আপনার নিন্দা না করিয়া যে কেবল

---

(১) 'সমাজ সমালোচন' এবং 'গোচারণের মাঠ' এই দুইখানি পুস্তকই অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত।

(২) "ষড়্‌রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ"। —দাশুরায়।

প্রশংসাই করেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তিনি যে নাছোড়বন্দা, তাহাতেই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(২)

বড় দুঃখ হইয়াছে, আর কিছু ভালো লাগে না, নহিলে সমালোচনায় সমালোচনায় দেশ শুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলিতাম। সমালোচনা করিব কি, দুঃখেই ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছি এবং "দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি।" দুঃখ না করিয়া রাগ করিলেই এ বিড়ম্বনা আর সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাগ করিবার যো নাই। কারণ পঞ্চানন্দ রাগ করিলে, রক্ষা করিবে কে?

ছাপাখানা-রূপ শ্মশানে পঞ্চানন্দের প্রধান অনুচর—নন্দী। নন্দীর দৌরাত্ম্য কিছু বেশী বেশী; মানুষে কখনও এত সহ্য করিতে পারিত না। নন্দীকে শাসন করাও চলে না; কারণ, প্রমথ ভিন্ন পঞ্চানন্দের অনুচর আর কে হইবে? অথচ সকল ভূতই ভুলা।

সমালোচনা করিবার জন্য পুস্তকের অভাব আছে, তাহা নহে। অভাব হইলেও যে সমালোচনা চলিত না, এমত নহে। অনেক পুস্তক অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। লিখিত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ হইতে সেই অলিখিত গ্রন্থগুলি সুখপাঠ্য, সুরুচিসম্পন্ন, রসভাবযুক্ত এবং বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। প্রশংসা করিতে হইলে সেইগুলির প্রশংসা করিলে চলিতে পারে। নিন্দার পাত্রের কথা ত বলাই বাহুল্য। সুতরাং গ্রন্থাভাবে সমালোচনা হইতেছে না, ইহা বলা চলে না।

সূক্ষ্ম বিচার।

গঙ্গারাম মণ্ডল শুদ্ধ কৃষি কার্য্যের দ্বারা দশটাকার সঙ্গতি করিয়াছিল। তাহার বাড়ী রাত্রিতে ডাকাইত পড়িল। গঙ্গারামের পিতামহের আমলের এক মস্ত কাতান ছিল; সাহসে ভর করিয়া গঙ্গারাম দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। ডাকাইতদের সম্মুখে গিয়া পড়িল। দুই জনকে গুরুতর আঘাত করিল। শেষে একাই দলকে দল ভাগড়া করিল।

পরদিন পুলীশের ইন্স্পেক্টার জমাদার কনষ্টেবল প্রভৃতি আসিল। গঙ্গারামের নিকট চতুর্ব্বিধ ভোজন লইল। ষোড়শোপচারে পূজা লইল। জখমি দুই জনের নিকট অপর ডাকাইত কয়েক জনের সন্ধান লইল, ডাকাইত ধরিল। শেষে ডাকাইত, জখমি, গঙ্গারাম মণ্ডল প্রভৃতি, চালান দিল।

মাজেষ্টর সাহেব ডাকাইতদের দাওরা সোপর্দ্দ করিলেন ; গঙ্গারামকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারের হুকুম দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গারামকে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"গঙ্গারাম! কিসেয়ার সোইট টুমি মারিয়াছিল সেই ডেকয়েট এঃ?"

গঙ্গা। "ধর্ম্মাবতার! এই কাতান দে।"

মাজে। "পাইয়াছে টুমি লাইসেন্স ইহা টরওয়ালার নিমিট্ট?"

গঙ্গা। "ধর্ম্মাবতার! আমরা চাষী রেওৎ, আমাদের ত লাইসেনি নেই।"

মাজে। "টুমি হাটিয়ার রাখে, হাটিয়ার বহন করে, কিণ্টু লাইসেন্স লয় না। টোমার ডুই সটো টাকা জোরুমানা, আওর শ্রম সহিট টিন মাহিনা, না ডে, আর টিন মাহিনা।"

গঙ্গারাম সন্তুষ্ট হইল। কৃতজ্ঞতার বেগে তাহার গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

প্রশ্নোত্তর—১।

প্রশ্ন। বলো দেখি বুড়রা বেশী দিন বাঁচে কেন?

উত্তর। যাহারা অল্প বয়সে মরে, তাহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া।

প্রশ্ন। যদি তোমার কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে কি করিবে?

উত্তর। আর একটী ঠিক সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার স্থান পূরণ করিব।

প্রশ্ন। সহজে কাহারও বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার উপায় কি?

উত্তর। তাহার সম্মুখে তাহাকে বোকা বলা। কাণাকে কাণা বল্‌লে রাগ করে, যাহার চক্ষু আছে, সে করে না।

প্রশ্ন। একটী রূপার ঘড়াকে মদের বোতল কিরূপে করা যায়?

উত্তর। ঘড়াটা বাঁধা দিলেই টাকা, শুঁড়িকে টাকা দিলেই বোতল ভরা মদ।

প্রশ্ন। তোমার পরিচিত কোনও পাঁচ জন লোকের মধ্যে কে কে তোমার আগে মরিবে বলিতে পার? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে, তোমার যত ইচ্ছা, সময় পাইতে পার।

উত্তর। হাঁ, তাহা হইলে পারি। যেমন যেমন দেখিব, তেমনি তেমনি বলিয়া দিব।

প্রশ্ন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মায় প্রভেদ কি?

উত্তর। ব্রহ্ম—নিরাকা ; ব্রহ্মা—সাকার।

প্রশ্নোত্তর—২।

প্রশ্ন। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর। ঘড়ী ;—চলিলেই অস্থাবর না চলিলেই স্থাবর।

প্রশ্ন। (গ্রন্থকারকে বন্ধু) কেমন হে, তোমার বই কাট্‌ছে কেমন ?

উত্তর। উই আর ইঁদুরে—বিলক্ষণ।

প্রশ্ন। মানুষের চলা বন্ধ হয় কখন ?

উত্তর। মানুষ যখন মাটী হয়।

প্রশ্নোত্তর—৩।

প্রশ্ন। "সাহিত্যসভা" কাহাকে বলে ?

উত্তর। একটা বয়াটে ছেলে ; পড়াশুনায় মন নাই ; আস্বাটুকু বিলক্ষণ ; চিঠি পত্র ছাপাইয়া দরখাস্ত করে, ভিক্ষা করে, অভিনন্দন দেয়, শেষে ধরা পড়ে।

প্রশ্নোত্তর—৪।

প্রশ্ন। কে সর্ব্বাপেক্ষা লগ্ন মুহূর্ত্ত ঠিক গণনা করিতে পারে ?

উত্তর। পাওনাদার; তাহাকে যখন আসিতে বলিবে, সে ঠিক তখনই আসিয়া উপস্থিত।

প্রশ্ন। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাগ্মী কে ?

উত্তর। যুবতীর চক্ষের জল।

প্রাপ্ত পত্র।

(নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত ছিল ; ইহার অনুবাদের জন্ত পঞ্চানন্দ স্বয়ং দায়ী।)

পঞ্চানন্দ প্রতি (১)।

প্রিয় মহাশয়,—আমি বিজ্ঞাপিত হইয়াছি . যে, তুমি এক খাতা লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া থাকো, এবং সকলকে উক্ত খাতায় নাম দস্তখত করিতে বরিয়া থাকো; এবং এইরূপে জীবগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করো।

তোমার মঙ্গলের জন্ত আশা করা যাইতেছে যে, তুমি এ সভার, যাহার আমি

---

(১) পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন,—এই পত্রখানি নিছক ইংরেজী ঢঙের বাঙ্গালা অনুবাদ।

সম্পাদক হওনের সম্মান উপভোগ করি, অস্তিত্ব বিষয়ে অবগত নও। কারণ অন্যথা তোমার বুদ্ধিমত্তা এবং বিবেচকতার প্রতি সন্দেহ করণের যে কষ্টকর আবশ্যকতা, তাহা আমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহা হউক আমি জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, চারিখণ্ড পদের উপরে বিচরণ না করিলেই যে কেহ এই সভার আশ্রয় পাইবার যোগ্য হয় না, এমত নহে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই; এবং তাঁহারা একমতও নহেন। অতএব বাহ্য মূর্ত্তি দেখিয়া বিচার করা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আর এ বিষয়ে তুমি যত শীঘ্র আপনাকে অপ্রতারিত করো এবং যে ভ্রমের অধীনে তুমি পরিশ্রান্ত হইতেছ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইতে তোমার চিত্তকে অনপমার্গগামী করো, ততই উত্তম।

উপসংহারে তোমাকে আমার অনুরোধ করিতে হইতেছে যে, এই সভার সংঘর্ষণ এড়াইবার জন্য, কাহাকেও উৎপীড়ন করিবার অগ্রে, সে তোমার ভাষা বুঝে কি না, এবং তৎপরিবর্ত্তে, নিশ্চয় করিবে। যাহাতে ত্রুটি করিলে, সভার কর্ম্মচারিগণ তোমার বিরুদ্ধে উপায় অবলম্বন করিতে উপদিষ্ট হইবেক।

তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য

(স্বাক্ষর অপাঠ্য)

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সম্পাদক।

[সময় মত এই উপদেশ পাইয়া পঞ্চানন্দ উক্ত সভাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। অধিকন্তু সভার সমীপে অনুরোধ যে, তাঁহাদের আশ্রয় লাভযোগ্য সকল প্রাণীর এক একটী নমুনা, আলিপুরের প্রাণিবাটিকায় রাখিয়া দিয়া তাঁহারা পঞ্চানন্দের উপকার করেন। কারণ "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"]

সুসমাচার।

"নশিনাল পেপার" নামক দৈনিক পত্রে বিধুভূষণ মিত্র লিখিয়াছেন যে, ১৬ই জানুয়ারী কেশব বাবুর দলের ব্রাহ্মগণ এক উৎসব করেন; তদুপলক্ষে প্রীতি-ভোজন হয়, তার পর, "The demon of drunkenness was then burnt," (অর্থাৎ) মাতলামির কুশপুত্তল করিয়া তাহার অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল।

পঞ্চানন্দ ইহাতে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন—

(১) মাতলামি কি দ্বাদশ বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হইয়াছিল?

(২) মাতলামি নিরাকার। ব্রাহ্ম হইয়া মাতলামির কুশপুত্তল অর্থাৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কি পৌত্তলিকতার চিহ্ন নহে?

(৩) দাহ করিবার আগে মুখাগ্নি করা হইয়াছিল কি না? হইয়া থাকিলে, কে করিয়াছিল?

(৪) ব্রাহ্ম মতেই হউক, আর হিন্দু মতেই হউক, যখন সংকার হইয়াছে, তখন শ্রাদ্ধ চাই। মদের শ্রাদ্ধ কবে হইবে, এবং কোথায় হইবে?

পঞ্চানন্দ পরোপকারী "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্" অবধি কাঙ্গালী বিদায় পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে প্রস্তুত আছেন।

সরকারী বিজ্ঞাপন।

শস্তা! খুব শস্তা!! মাটীর দর!!!

শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড় লাট ও রাজ্ঞী প্রতিনিধি—এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জানাইতেছেন যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূতপূর্ব্ব লাট ডালহৌসির আমল হইতে মহারাজা, রাজা প্রভৃতি যে সকল খেতাব রাজভাণ্ডারে মজুদ হইয়া সময় মত রৌদ্র বাতাস না পাওয়া হেতু ক্রেমঘোর্দ্ধা অর্থাৎ পোকায় কাটা ও বল্মীকদষ্ট অর্থাৎ উইধরা হইয়া জীর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা এবং হাল আমদানি রায়-বাহাদুর, খাঁ-বাহাদুর, এ, পি, ই, এ-ডব্লু-এস প্রভৃতি বহুতর খেতাব আগামী ১লা এপ্রেল মেকিঞ্জি লায়ালের প্রকাশ্য নিলামে দিবা দুই প্রহরের সময় বিক্রয় করা যাইবেক! নিলামের সময় অর্দ্ধেক টাকা দিয়া রাখিতে হইবেক, এবং কাবুল যুদ্ধের অবসান হইলে বাকী টাকা লইয়া গুদাম খোলা যাইবেক। যাহাদের প্রয়োজন হয়, এমন সুযোগ তাহারা না ছাড়ে, বড়লাটের এই অনুরোধ।

আদেশক্রমে
শ্রীসেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ!! দ্বিতীয় সংস্করণ!!!

"অত্যুৎকৃষ্ট" কাব্য।

ছয় মাসের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের 'মলাটের' দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। মূল গ্রন্থ অবিকল আছে। মূল্য ২৫৲। একখণ্ডের কম পুস্তক না লইলে শতকরা এক শ টাকা কমিশ্যন দেওয়া যাইবে; ডাক মাশুল দেওয়া না দেওয়া ক্রেতাদিগের ইচ্ছাধীন।

গ্রন্থকার স্বয়ং এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন; বেয়ারিং পত্র লিখিলে এই সমালোচনা বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। শ্রী—হঃ।

মাতব্বর দলীল।

বড় লাট লীটন যে বড় কবি, অনেকে জানেন না, অথবা মানেন না। কিন্তু এবার তিনি মাতব্বর দলীল দেখাইয়াছেন, আর কাহারও সন্দেহ করিবার অধিকার নাই।

ইংরেজী-কবিকুল-চূড়ামণি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, প্রণয়ী, কবি, এবং পাগল,—এ তিনিই এক। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া লাটসাহেব পূজার পূর্ব্বে হুকুম দেন যে, সরকারী আফিস প্রভৃতি দুর্গাপূজার সময় ১২ বারো দিন বন্ধ রাখিলে ব্যবসায়ের এত ক্ষতি হয় যে, ছোট লাট সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও তিন দিনের বেশী ছুটী মঞ্জুর করা যাইতে পারে না।

এখন আবার সেই কথারই—অর্থাৎ কবির কুটুম্বিতার কথার—পোষকতা করিবার জন্য হঠাৎ হুকুম দিয়াছেন, পূজার ছুটী বারো দিন অবশ্যই হইবে. ইহাতে ব্যবসায় মাটী হয়, হউক। এই হুকুম দেওয়াতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, লাট সাহেব খুব উচু দরের কবি।

আগামী পূজা পর্য্যন্ত এ হুকুম স্থিরতর থাকে কি না, ইহা না দেখিয়া আশীর্ব্বাদের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।

টীকা টিপ্পনী।

হর্ষে-বিষাদ।

গেজেটে দেখা গেল, দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চানন্দের সরকারী বিজ্ঞাপনের কাজ হইয়াছে,—বঙ্গদেশে অনেকগুলি রাজা বাড়িয়াছেন। দেখিয়া পঞ্চানন্দ বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। যাঁহারা রাজা হইয়াছেন, তাঁহারাও আহ্লাদিত হইয়াছেন, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। একজন মহারাজও হইয়াছেন,—ইহাঁর সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই গেল সুখের বিষয়, সুতরাং হর্ষ।

এই দিকে মহারাজ বাড়িল, রাজা বাড়িল, কিন্তু রাজ্য লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। লাভের মধ্যে, "নাম গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ"—এ সকল Jack Lackland Johannes Sansterre এর দেশে হউক, সেই ভালো, এ গোলামের পুরীতে কাজ কি? সুতরাং দুঃখের বিষয়, অতএব বিষাদ।

দ্রব্যগুণ।

পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ সংবাদদাতাকে প্রেশ-কমিশনর সাহেব একখানি চসমা দিয়াছিলেন, তাহার গুণে তিনি যে যে বস্তু দর্শন করিতে পাইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চসমা না থাকিলে তিনি যদি এই সকল দেখিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে মূর্খ, খোসামুদে, ভীরু প্রভৃতি বিশেষণ দিয়া এক ঘ'রে করিত। দ্রব্যগুণ মানিতেই হইবে, এই জন্ম তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে।

গেলাসের কানা ছুঁইয়া, তাহার পর ঠোঁটে সেই আঙ্গুল ঠেকাইয়া গোবর্দ্ধন গুণনিধিকে অশ্লীল, অসভ্য, অবাচ্য, অশ্রাব্য কথা প্রয়োগ করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন। দ্রব্য-গুণ স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য বলিয়া গোবর্দ্ধনের প্রত্যেক শব্দে হাসির গিটকিরি উঠিতে লাগিল, গোবর্দ্ধনের বাক্‌পটুতার প্রশংসা হইতে লাগিল, রসিক বলিয়া গোবর্দ্ধনের একটা নাম পড়িয়া গেল। সহজে যাহাতে ভদ্রসমাজে গোবর্দ্ধনের কলিকা পাওয়া দুর্ঘট হইত, দ্রব্যগুণে সেই হেতুতেই গোবর্দ্ধনের আদর বাড়িল।

কেশব সেন চক্ষে চসমা দিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মের দক্ষিণ হস্তে যীশুখ্রীষ্টকে, বাম হস্তে মুসাকে, যীশুর দক্ষিণে চৈতন্যকে, মুসার বামে শাক্য মুনিকে, এইরূপে প্রতিমা সাজান গোছ সমস্ত দেখিতে পাইলেন। সহজে, শুষ্ক চর্ম্মচক্ষুতে এইরূপ কিছু দেখিলে অন্যে পরে দূরে থাকুক, কেশব সেনই তাঁহাকে দোক্তাহীন ভণ্ড, পাপিষ্ঠ প্রভৃতি আখ্যা দিতে ত্রুটি করিতেন না। দ্রব্যগুণ স্মরণ করিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছে, কেশব সেন পরম ধার্ম্মিক, একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বৈরাগ্যব্রতধারী, সংসারের মায়ার অতীত, নিষ্কাম এবং গুণধাম।

দ্রব্যগুণে সকলই হয় বলিয়া আজি কালি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর লোকের এত টান পড়িয়াছে। ফলে, দ্রব্যগুণ মানো আর নাই মানো, সাদা চোখে মজা নাই, ইহা মানিতেই হইবে। সস্তায় যদি সুখ চাও, পঞ্চানন্দের পরামর্শ নাও, দোক্তা বাদ দিয়া ত্বরিতানন্দের চেষ্টা দেখো।

ভাব-ব্যাখ্যা।

ইংলণ্ডের রাজত্ব উপলক্ষে কোনও কথা বলিতে হইলে বৃটিশসিংহ বলিয়া তাহার উল্লেখ হয়, সিংহই ইংলণ্ডের রাজচিহ্ন। সকলে এ রূপকের সম্পূর্ণ ভাবগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া, বুঝাইয়া দিতে পঞ্চানন্দের বাসনা হইয়াছে। সিংহ পশুরাজ; আর ইংলণ্ড যাহাদের উপর রাজত্ব করেন, তাহারাও পশু। পশুরাজ হইলেও সিংহ নিজেও পশু; ইংলণ্ডের আচরণে ইংলণ্ডের আস্ফালনে, ইংলণ্ডের হুঙ্কারে ইহার প্রমাণ। কোথাও

ঋক্ষ শার্দ্দুল একটী মৃগশিশু লইয়া বিবাদ করিলে, সিংহ গিয়া মধ্যস্থ হয়, এবং আপনার সংস্থান তাহার ভিতর করিয়া লয়। ইংলণ্ডও সাইপ্রস্ অধিকার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবজন্তু দেখিলে সিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইংলণ্ড নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। গল্পে আছে, একদা এক সিংহ কূপমধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ভাবিয়া, তাহাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে, সেই কূপের ভিতর লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডও আফগানস্থান অধিকার করিতে গিয়াছেন। আইন কানুন ইংলণ্ডের নখর কেশর, টেক্স ইংলণ্ডের পুচ্ছ, বন্দুক সঙ্গিন ইংলণ্ডের দংষ্ট্রা। অতএব ইংলণ্ড সিংহ।

নূতন নিয়মে জাতিভেদ।

অনেকে বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে চিরাগত জাতিভেদ প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুরাতন প্রণালীর পরিবর্ত্তে নূতন প্রণালীতে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র; একেবারে একাকার কিছুই হইতেছে না। নূতন প্রণালীর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আজি কালি যাহারা কন্যাদায়গ্রস্ত, তাহারা চণ্ডালের অধম; সকলেই তাহাদের পূজ্য, সকলকেই তাহারা কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে।

যে লেখা পড়া শিখিয়াছে, ইংরেজীরূপ বেদে যাহার অধিকার আছে, সেই এখনকার ব্রাহ্মণ, বরের প্রয়োজন হইলে, তাহার আদর মর্য্যাদা যথেষ্ট।

যাহার বিষয় বিভব আছে, অন্নচিন্তারূপ শত্রুকে যে পরাজয় করিয়াছে, দাসদাসীরূপ প্রজাপুঞ্জ যাহার বশ্যতা স্বীকার করে, সে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়, বরস্বরূপে সেও প্রার্থনীয়।

যে দোকান পসার বাবদ বৃত্তি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে বৈশ্য বর, ইহাকেও কন্যা দেওয়া প্রশস্ত।

নিতান্ত অভাব হইলে পরপদসেবাধিকারী, অর্থাৎ যাহার একটা যেমন তেমন চাকরি যুটিবার সম্ভাবনা আছে, বরের হাটে সে শূদ্রেরও মূল্য আছে।

সকল দেশেই চিরকাল জাতিভেদ আছে, চিরদিনই থাকিবে; সেই পুরাতন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া এখন যে যত নূতন করিয়া লইতে পারে।

দরকারি বিজ্ঞাপন।

চাই—একটী লেজ !

পঞ্চানন্দের একটী প্রিয়পাত্র আছে। রূপ, যৌবন, ধন, মান, আশা, আশয়, যাহা কিছু করিয়া দিতে হয় পঞ্চানন্দ ইহার সকলই করিয়া দিয়াছেন; প্রিয় পাত্রটী একটী পোষা বাঁদর।

বাঁদরামি যত রকম হইতে পারে, প্রিয়পাত্র তাহার সমুদায় প্রদর্শন করিতে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। সংসারে যে লেজ পাইলে অনেকেই বাঁদর জন্ম সার্থক করে, সে উপাধি-লেজও প্রিয়পাত্রের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। পঞ্চানন্দের সুপারিষে বিধাতা পুরুষের কলমে, আঁটকুড়ার কপালে, যাহা লেখান সম্ভব, তাহা সমস্তই লেখান হইয়াছে। এমন কি, প্রিয়পাত্রকে দেখিয়া সকলেই বলে—"আহা! এটী রাজপুত্তুর বিশেষ!" লোকে বলে বটে, কিন্তু পঞ্চানন্দের ষোল আনা সুখ ইহাতে হয় না; কারণ, তাঁহার পোষা বাঁদর যে সে নাচাইয়া বেড়ায়। প্রিয়পাত্র যখন উঁচুর উপর বসিয়া থাকে, তখন নীচে দাঁড়াইয়া কেহ হাততালি দিলেই মনের মত বাঁদরামিটি দেখিতে পায়। দুঃখ এই যে, অন্তরালে থাকায় পঞ্চানন্দ তখন প্রিয় পাত্রকে আয়ত্ত করিতে পারেন না। ইহার একমাত্র কারণ,—প্রিয়পাত্রের একটী লেজের অভাব।

অতএব এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, যদি কেহ এই প্রিয় পাত্রের উপযুক্ত একটী লেজ সংযোগ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে পঞ্চানন্দ তাঁহার নিকট বিনামূল্যে কেনা রহিবেন অর্থাৎ তাঁহাকে একখণ্ড পঞ্চানন্দের অবৈতনিক গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইবেক।

সময়োচিত প্রস্তাব।

আমেরিকাতে ডাক্তার টানর স্বয়ং চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আহার একটা বদ অভ্যাস মাত্র; বস্তুতঃ আহার না করিলে সংসারের কোনও ক্ষতি নাই, বরং উপকার আছে।

ভারতবাসী এ সহজ কথাটা কিন্তু বুঝিতে পারে না; সেই জন্য লাইসেনের টাকা কাবুলের যুদ্ধে খরচ হইতে দেখিয়া মহা গণ্ডগোল করিতে থাকে।

সুখের বিষয় এই যে, সমুদয় ভারতবাসী এ প্রকার ভ্রান্ত নহে। কারণ যাহারা দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র চালায়, তাহাদের অধিকাংশই ডাক্তার টানরের চৌদ্দ পুরুষ;—ইহারা পেটেত খাইতে পায়ই না, অধিকন্তু পিঠে খাইয়া থাকে।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া পঞ্চানন্দ প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাবুল যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া মধ্যে মধ্যে কাবুলীদিগকে লাইসেনের তহবিল হইতে টাকা যোগাইয়া লড়াই করাইয়া লওয়া হউক। এদিকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য একটা অনাহারবিধায়িনী সভা সংস্থাপিত হউক, ডাক্তার টানর তাহার সভাপতি, দেশীয় সংবাদ পত্রের লেখকেরা সভ্য, এবং হিন্দু-বিধবারা সভ্যা নিয়োজিতা হইয়া ভারতে অনাহার শিক্ষা দেওয়া হউক। তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত সভার ব্যয় বিধানও অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ পেটের দায় না থাকায়, একটা মোটা খরচ একেবারেই লাগিবে না। আর ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, কাপড় পরাটা ক্রমে উঠাইয়া দিলেই চলিতে পারিবে।

ভরসা করি, ভারতসভা এ প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া চসার, আডিসন, ডি কুইন্সি বা মেকলের ইংরেজীতে পার্লীয়ামেণ্টের বরাবর এক দরখাস্ত করিবেন, এবং এ বিষয়ের আন্দোলন জন্য বিলাতে একজন প্রতিনিধিও পাঠাইবেন। এখন লিবারেল সম্প্রদায় প্রবল, সুতরাং আশার খর্ব্বতা হইবার কোনই হেতু দেখা যায় না।

হিসাবী লোক।

বারাসতের ভুলু মাষ্টার গাঁজা খায়, কিন্তু খুব হিসাবী লোক। লালু বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ভুলু মাষ্টার একদিন শুনিল যে, কলিকাতায় গাঁজা বড় শস্তা।

দিন দুই পরে ভুলু মাষ্টার আবার লালু বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত। গল্পের প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল "যথার্থ কথা; কলিকাতায় গাঁজা খুব শস্তা; দু আনায় যাহা আনিয়াছি, এখানে দশ পয়সাতেও তত পাওয়া যায় না।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি গিয়াছিলে নাকি?"

ভুলু,—"ভাই, না গিয়ে কি রোজ রোজ ঠকিব? একখানি ফিরতি গাড়ী পেয়েছিলাম; সবে বারো আনা ভাড়া। আসবার সময় কিছু বেশী পড়েছিল—পাঁচ সিকা। কিন্তু, বল্লে বিশ্বাস করবে না, আট পয়সায় এই এত গাজা।"

উপস্থিত বুদ্ধি।

বাবু আফিশে যাইবার জন্য সেজে গুজে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে দুই জন ইয়ার মদের বোতল সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। বাবুকে অনুরোধ, একটু বসিয়া এক গেলাশ খাইয়া আফিশে যান, এখনও তত বেলা হয়নি, তাড়াতাড়ি কেন?

বাবু। "না ভাই, এখন খেয়ে গেলে মুখ দে গন্ধ বেরোবে, সকলে টের পাবে।"

ইয়ার। "হ্যাঁ টের পাবে, না ঘোড়ার ডিম হবে। নেহাত টের পায়, বলবে, যে আজকার নয়, কাল রাত্তিরে খেয়েছিলে, তারই গন্ধ।"

তর্কটা অকাট্য। বাবু নিরুত্তর।

যেটা পছন্দ হয়।

কেশব চক্রবর্ত্তীরা দুই ভাই; জ্যেষ্ঠ কেশব, কনিষ্ঠ গদাধর। গ্রামান্তরে ফলারের নিমন্ত্রণ হইয়াছে; বাড়ীতে ঠাকুর। অনেক বেলা পর্য্যন্ত গভীর চিন্তা করিয়া কেশব বলিল—"গদা কি কর্‌বি? হয়, তুই ঠাকুর পূজা কর, আমি ফলারে যাই; নয়, ত, আমি ফলারে যাই, তুই ঠাকুর পূজা কর্।"

গদাধর সাদা সিধা লোক: উত্তর দিল—"যা বলো দাদা, তাই করি; কিন্তু ফলারটা আমি ছাড়্‌ব না।"

স্মরণ রাখিবে।

নিতান্ত অনুরোধের বশীভূত হইয়া পঞ্চানন্দ প্রকাশ করিতেছেন যে, বাঙ্গালীদের ফাঁসি যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনাপূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত করিবার জন্ম আগামী চৈত্র সংক্রান্তির দিবস, মোতাবেক ১লা এপ্রিল টৌনহলে এক মহতী সভা হইবে। সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। গলার জোরেই বাঙ্গালী বাঁচিয়া আছে। এমন গলায় ফাঁসি দিলে নিতান্ত প্রভুভক্ত একটা সভ্যতম জাতির রুটি মারা যায়। সুতরাং পঞ্চানন্দ ভরসা করেন যে, দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই ঐ দিবস সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সভ্যগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

বিদ্যাসাগরের নূতন উপাধি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজদ্বারে নূতন উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া, একজন পল্লীগ্রামের অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন—"নূতন উপাধিটা কি?"

বিদ্যা।—"সি, আই, ই।"

অধ্যা।—"তাহাতে কি হইল?"

বিদ্যা।—"ছাই।"

অধ্যা।—"সাধু! সাধু! রাজার মুখে সকলই শোভা পায়।"

প্রেশ-কমিশনার হইতে প্রাপ্ত।

যে সকল বাবু ভ্রমক্রমেও বাঙ্গালা লেখেন না, বাঙ্গালা পড়েন না, এবং বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন না, তাঁহাদের সম্মানার্থ এম্ (M) উপাধি সৃষ্টি করিবার কল্পনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন! যাঁহারা উপাধির যোগ্য হইবেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক রম্ভাকল খিল্লং স্বরূপ পাইবেন। মুক্তার মালা তাঁহাদিগকে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না।

পঞ্চানন্দ আশা করেন, যাঁহাদের এই উপাধি লাভের প্রত্যাশা আছে, তাঁহারা এখন দন্তবিকাশ পুরঃসর নৃত্য আরব্ধ করিবেন।

সার্থক শিক্ষা।

বুল্ সাহেবের অদ্য ভারি আহ্লাদ; বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। তাহার উপর বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাজার টাকা পুরস্কারের সমাচার আসিল। হাসিতে হাসিতে সর্দ্দারকে বলিলেন,—"ডেকো স্নর্ডাও, এক গাঢা আনয়ন কোরিবে; লেকেন্ নহে, আমার ন্যায় গ্যাঢা, মেম সায়বের মটন্ গ্যাঢা মাংটা— বাচ্ছা দুগ্ধে ভোজন করিবো।"

যেমন গাছ, তেমনি ফল।

য়াকুব খাঁর সহিত লর্ড লিটনের যে সন্ধি হয়, তাহার পর কাবুলে এত বিড়ম্বনা ও গোলযোগ হইতেছে দেখিয়া, অনেক রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক লর্ড লিটনকে অবিবেচক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন। কিন্তু গণ্ডমূর্খের সন্ধির ফল যে এইরূপ হইবে, পঞ্চানন্দ ইহাতে বিস্ময়জনক কিছুই দেখেন না। লিপিকরের অনবধানতা প্রযুক্ত উক্ত সন্ধি গণ্ডমূর্খের সন্ধি বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম পঞ্চানন্দ অদ্য লিপিবদ্ধ করিলেন। এক ভ্রমের ফলে অন্ত ভ্রম হইয়াছিল।

কথার অন্যথা হয় নাই।

রামনিধি একটী বাক্স কিনিতে চিনাবাজারে গিয়া এক জন দোকানদারকে বলিলেন, যথার্থ বলো, তুমি ধর্ম্মতঃ কি লাভ নেবে?

দোকানদার বিনয় সহকারে বলিল—আপনি দেখছি খাঁটি লোক; তা' প্রবঞ্চনা হ'বে না, দুকথা হবে না; টাকাটার উপর চারি আনা নেবো।

রামনিধি সন্তুষ্ট হইয়া বাক্স মনোনীত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কত দিতে হ'বে?

দোকা। আজ্ঞে সাড়ে চার টাকা।

রাম। তোমার খরিদ হ'ল কত দে?

দোকা। সে কথায় আর কাজ কি? আপনি ত ধর্ম্মভার দেছেন, তবে আর কেন?

রামনিধি দ্বিরুক্তি করিলেন না। বাক্স লইয়া বাড়ী গেলেন। তাঁহার একজন আলাপি লোক বাক্সের দাম শুনিয়া অবাক্ হইল। বলিল, এর দাম যে হদ্দ মুদ্দ ন সিকা, আড়াই টাকা।

রামনিধি বুঝিয়া বলিলেন—দোকানদার কথার অন্যথা করে নাই। টাকার উপর চার আনার মানে টাকায় পাঁচ সিকা লাভ।

ধর্ম্মের অনুরোধে অধার্ম্মিক।

সম্প্রতি "আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা" সংস্থাপিত হইয়াছে; সভার প্রচারকদের অনুরোধ কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করেন।

"আদি ব্রাহ্মসমাজ" আছেন; তাঁহারা বলেন,—বেদ ছাড়া শাস্ত্র নাই, যদি থাকে তাহা অমান্য এবং অগ্রাহ্য; আর পুতুল পূজা করা হইবে না।

কেশব বাবুর মন্দিরে ঘোষণা হইতেছে যে মনুষ্য ভ্রমর জাতি; শাস্ত্র ফুল; ধর্ম্ম মধু; (প্রভুর) গুণ্ গুণ্ গাও, যে ফুলে মধু পাও, অমনি লুটিয়া লও—কে জানে বেদ, কে জানে কোরাণ, কে জানে বাইবেল। তার পর, ভগবানের মর্জ্জি। এটা বাড়ার ভাগ।

কেশব বাবুর ভাঙ্গা দলেরও ঐ সুর, ঐ গান, ঐ কথা। কমের মধ্যে ভগবানের মর্জ্জিটা ইঁহারা মানেন না; তেমন আচার অনুরোধটা কিছু বেশী বেশী।

ক্রেস্তান বলিতেছেন এই যে, এক ভালমানুষের ছেলে তোমাদের পাপের বোঝা বহিয়া মরিল, তোমাদের জন্য রক্ত দিল, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন কি উপায় আছে? তাহার দলে থাকিবে না কেন? ইহা ছাড়া নেড়া-নেড়ী আছে, পীর-গাজি আছে, কত আছে; তাহাদের চেলাদের অনুরোধ, তাহাদের মত করো, চলো, বলো।

এখন যাহার চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারই মরণ, কা'র কথা রাখে? পক্ষপাত করিলে অধর্ম্ম, দলাদলিতে থাকা অন্যায়। সুতরাং ধার্ম্মিকদের জ্বালায় অধার্ম্মিক হওয়া ভিন্ন উপায় কি?

রসিকতা।

পঞ্চানন্দ একজন ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ রসিকতা করিতে বলায়, তিনি উত্তর দিলেন যে, রামকমলের কন্যার সঙ্গে রাধামাধবের বিবাহ হইয়াছে।

রসিকতায় কেহ হাসিল না দেখিয়া ভ্রাতা বলিলেন—আচ্ছা, তবে সে বিধবা হইয়াছে।

তাহাতেও কেহ হাসিল না দেখিয়া ভ্রাতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—সধবা বিধবা কিছুতেই যে রসিকতা পাইল না, সে নেহাত বেরসিক।

ছেলে চিত্রকর।

নসিরাম (স্বীয় বন্ধুর প্রতি)—আমার ছেলে চমৎকার ছবি লিখ্‌তে শিখেছে; যা বলবে, প্রায় অবিকল আঁকতে পারে। (চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত সন্তানের প্রতি)—দেখি, ওটা কি হচ্চে। (একটু চিন্তা করিয়া বন্ধুর প্রতি)—দেখো, ঠিক বানরের চেহারা এঁকেছে কি না?

সন্তান। না, বাবা, ওটা তোমার চেহারা!

কেন, বল দেখি?

ইংরেজ কখনও কখনও আর্য্যসন্তানের প্লীহা বাহির করিয়া দেন, অথচ কেহ তাঁহার গায়ে হাত দিতে পারে না কেন?

"জন বুল্" আর্য্যগণের পূজ্য; তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে হইলে মহাপাতকে পড়িতে হয় এবং কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

উচিত সন্দেহ।

একজন চুটকির 'শিক্ষানবিশ' লিখিয়াছেন যে,—"মার্কিন দেশীয় একখানি কাগজে পৃথিবীর সমস্ত গাধার সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি, সংখ্যাটি ঠিক নহে।"

জলে নামিয়া কাপড় ভিজাইবার দরকার নাই। পঞ্চানন্দ সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। কারণ, তালিকার মধ্যে লেখকের নাম পাওয়া যায় নাই।

নিঃসন্দেহ।

পূর্ব্বে কাহারও সন্তান জন্মিলে সংবাদপত্রে দেখা যাইত—অমুক সাহেব বা অমুক বাবুর সন্তান হইয়াছে। এখন দেখা যায়—অমুকের পত্নীর সন্তান হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনটা বোধ হয় ব্রাহ্ম ভায়াদের অনুরোধে হইয়া থাকিবে। যাহার অনুরোধেই হউক, এখন মনে আর কোরকাপ্ থাকিবার যো নাই।

মাণিকলালের বর-লাভ।

কঠোর তপস্যার বলে মাণিকলাল বিধাতা পুরুষকে সন্তুষ্ট করায়, মিথ্যা কথায় বোঝাই করা তিনখানি জাহাজ তাহার জন্য বড় বাজারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। মাণিকলাল তখন একটা বেওয়ারিশ শ্রাদ্ধের ঘী ময়দা আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত ছিল। এদিকে মিথ্যা কথা, আদরের সামগ্রী, বড় বাজারের ঘাটে কতক্ষণ থাকিবে? বাজার শুদ্ধ লোক সন্ধান পাইয়া তাড়াতাড়ি যে যত পারিল মিথ্যা কথা হস্তগত করিয়া চলিয়া গেল। মাণিকলাল এই সংবাদ পাইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া দেখে, জাহাজে আর মিথ্যা কথার এক ছিল্‌কা পড়িয়া নাই। কপালে করাঘাত করিয়া মাণিকলাল কাঁদিতে লাগিল এবং বিধাতা পুরুষের কাছে আবার হত্যা দিল!

বিধাতা দেখিলেন, নিরুপায়; মাণিকলালকে দর্শন দিলেন; সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মাণিকলাল রোদনে ক্ষান্ত হইল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধাতা পুরুষ বলিলেন,—মাণিক, যাও আর কাঁদিতে হইবে না; এখন হইতে তুমি যাহা বলিবে তাহাই মিথ্যা হইবে। মাণিকলাল বর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

পঞ্চানন্দ এ গল্প মাণিকলালের মুখে শুনিয়াছেন; সুতরাং কথাটা মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই।

দান গ্রহণে অস্বীকার।

অশিষ্ট যাদু ক্রোধে অধীর হইয়া মাধুর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে কদর্য্য দ্রব্য প্রদান-পূর্ব্বক গালি দিল। মাধু হাসিয়া বলিল—"এখন গালি দিও না; তোমাদের কুলিনে বাড়ে, ত বিবেচনা করা যাবে।"

প্রবোধ বাক্য।

সভ্য বাবু পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় হাসিয়া বলিলেন—পিণ্ড পৃথিবীতে দিলে স্বর্গে যাইবে কিরূপে? অসভ্য পুরোহিত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবুর পিতার উদ্দেশে একটা অভ্যস্ত কটূক্তি করিয়া ফেলিলেন। বাবু চাবুক ধরিলেন। বাবুর বুড়া চাকর রামা ত্রস্ত হইয়া বলিল—"বাবু রাগ করিবেন না, আপনি হাতে ক'রে দিলে পিণ্ডিটে যদি না পৌঁছয়, পুরুত ঠাকুরের কথায় ওটাও পৌঁছবে না।"

মিথ্যা কথা।

গত বি-এ পরীক্ষা বড় কঠিন হইয়াছিল বলিয়া কয়েক জন অনুযোগ করিতেছিলেন। আমরা স্বচক্ষে সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, তৃতীয় শ্রেণীতে এক জন 'হাতী' পাশ হইয়াছেন। কঠিন পরীক্ষা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

গিরিশের সন্দেহ।

কৈলাস বড় ভালো ছেলে ছিল; তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সকলে দুঃখ করিতে লাগিল। গিরিশ সেইখানে বসিয়াছিল; একটু চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিল—"এমন হ'বে না। এক মাস পরে পরীক্ষা, এমন সময়ে পড়া কামাই করে' কৈলাস কখনই মরবে না, সে তেমন ছেলেই নয়।"

ভুল হয়েছিল।

রামহরি তামাক টানিতেছে, উমাচরণ হুঁকাটী পাইবার প্রত্যাশায় লোলুপ নয়নে তাকাইয়া আছে। রামহরি সুখটান টানিবামাত্র উমাচরণ হাত বাড়াইল। অমনি আবার রামহরি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া ছোট টান আরম্ভ করিল; ইচ্ছা যে, উমাচরণ অপ্রতিভ হউক। পাঁচ সাত বার এইরূপ করিয়া রামহরি বলিল,—"কি ভাই, বারে বারে বেড়ালের মত থুলো বাড়াচ্ছ কেন?"

উমাচরণ বলিল,—"আমার ভুল হয়েছিল, আমি মনে করিয়াছিলাম,—ইঁদুর; তা নয়, এখন বুঝেছি—ছুঁচো।"

তবে দোষ নাই।

গোবিন্দলাল মদ খাইতেছে, এমন সময় সুরাপান-নিবারিণী সভার এক জন সভ্য আসিয়া উপস্থিত। গোবিন্দলালকে তদবস্থ দেখিয়া সভ্য বলিলেন—সভার প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করেছ, তবু মদ খাচ্ছ?

গোবিন্দ। ঔষধার্থে বিধি আছে।

সভ্য। কেন, তোমার হয়েছে কি?

গোবিন্দ। আর কি হ'বে? না খেলেই যে অসুখ করে।

ছিরুর ফাও।

সে বৎসর বেগুণ বড় সস্তা হইয়াছিল। ছিরু একা মানুষ, এক পয়সার বেগুণ কিনিতে গিয়া সাত আট গণ্ডা বেগুণ পাইয়াছিল, ফাও চাওয়াতে আরও চারিটি পাইল। একা মানুষ, এত বেগুণের দরকার নাই জানিয়া ছিরু চারিটা বেগুণ তুলিয়া লইল, এবং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। যাহার বেগুণ সে বলিল—দাম দিলে না?

ছিরু গম্ভীরভাবে বলিল—তোর এক পয়সার বেগুণে আমার কাজ নেই; তুই ফিরে নে; এই ফাও আমার রইল, এতেই হবে।

বেগুণওয়ালা—অবাক্।

তা'ত বটে।

রাধামাধব দিব্য সুশ্রী সুরসিক পুরুষ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার দুইখানি পায়েই বড় গোদ। রাধামাধব পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটা বাড়ীর বাহিরে রোয়াকে অতি বিকটাকার মোটা এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। রাধামাধব বিদ্রূপের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলেন—দাদার দেহখানি ত দেখ্‌ছি বিলক্ষণ। বাড়ীর ভিতর যাওয়া আসা হয় কেমন করে?

সে উত্তর দিল—ভায়া, যা' বল্‌লে, তা' সত্যি। কিন্তু তুমি যে পত্তন করেছ, গেঁথে তুল্‌তে পার্‌লে, আমি কোথায় লাগি।

বুদ্ধিমান্ ভৃত্য।

বাবুর কাছে অনেকক্ষণ অবধি অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে। চাকরদের বলা আছে, অনেকবার না ডাকিলে তামাকটা না দেয়। বাবুর ডাকা-ডাকিতে একজন

বেহারী চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঙ্গালী চাকর তখন বাজারে গিয়াছে। বাবু হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে বলিলেন,—তামাকু ফের্ দেও।

চাকর বলিল,—ধর্ম্মাবতার, তামাকুওয়ালা যব্ আয়া যো আপ্‌কা হুকুম পর উসি বখৎ সব তামাকু ফের্ দিয়া।

বাবু বুঝিলেন,—চাকর বুদ্ধিমান্, এক ছিলিম তামাকও ঘরে রাখে নাই। আর তামাক না চাহিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক কাজ করিতে লাগিলেন।

গিরিশের পরিণামদর্শিতা।

একবার বড় বন্যা হইয়াছিল। নৌকাযোগে গিরিশ বাটী যাইবে, নৌকায় আসিয়া উঠিল। গিরিশের একজন সঙ্গী বলিল—দাদা, এবার খুব বান, গঙ্গায় ঘুরে দূর যেতে হবে না, ডাঙ্গার উপর দিয়ে সোজাসুজি যাওয়া যাবে।

গিরিশ নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল-দাদা, নাম্‌লে যে?

গিরিশ। ভাই খুব সময়ে মনে করে দিয়েছ; দুটো কল্‌সী নিয়ে আসি, জল তুলে নিতে হবে, নইলে পথে জল পাব কোথায়?

সাবধানের একশেষ।

স্কুলের ছেলেদের কাছে গিরিশ থাকিত; হাট বাজার করিত, রাঁধিয়া বাড়িয়া দিত, আর নিজের পড়াশুনা করিত। একজন গিরিশকে এক দিন বলিল—"এক পয়সার বড়ি আর এক পয়সার তামাক আনতে হবে, দেখিও তামাকে বড়িতে এক ঠাঁই করে এনো না—এই নাও এক পয়সা বড়ির, আর এক পয়সা তামাকের।"

গিরিশ বাজার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। "ফিরে এলে যে"—জিজ্ঞাসা করায় গিরিশ দুই হাত খুলিয়া, দুইটী পয়সা দেখাইয়া বলিল—"তুমি যে মিশিয়ে আনতে বারণ করেছিলে, তাই ফিরে এলাম। কোন্ পয়সাটী বড়ির, আর কোন্‌টী তামাকের, তা' ভুলে গিয়েছি।

অদ্ভুত প্রশংসা।

মদনপুরের বৃন্দাবন দত্ত খুব ব্যয় বিধান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপকদের বিদায়টা তাদৃশ সন্তোষজনক হইল না। দত্তজ ক্রিয়া সাঙ্গ করিয়া এক

জন ভট্টাচার্য্যকে একটু অহঙ্কারের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন মহাশয়, লোক জনের খাওয়ান দাওয়ান কেমন হ'ল ?

ভট্টাচার্য্য উত্তর দিলেন—সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন ? এ একটা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। এমন ক্রিয়া প্রায় দেখা যায় না।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

রামগোবিন্দ এক খুনী মামলায় ধরা পড়িয়া চালান হইয়া গেল। যে কনেষ্টবল তাহার সঙ্গে যায়, সে তাহার উপকার করিবে, এই আশ্বাস দিয়া কিঞ্চিৎ হস্তগত করিয়া লইল।

মাজেষ্টর সাহেব রামগোবিন্দকে দাওরা সোপর্দ্দ করিলেন; কনষ্টেবলকে রামগোবিন্দ বলিল—"ভাই বাঁচলাম না ত ?" কনষ্টেবল বলিল—"ডর ক্যা হো ভাই, উপরমে খোলাসা হো যাওগে।"

দাওরাতে রামগোবিন্দের ফাঁসির হুকুম হইল। কনষ্টেবল ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"আপীলমে হুকুম নেহি বাহাল রহে গা।"

যে দিন রামগোবিন্দের ফাঁসি হয়, সে দিনও সেই কনষ্টেবল উপস্থিত। রামগোবিন্দ বলিল—"হাঁ ভাই, শেষে কি ধনেপ্রাণে মারা গেলাম ?"

কনষ্টেবল তখনও সপ্রাতিভ, অম্লানবদনে বলিল—"ভাই রামগোবিন, কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়। আভি হুকুম তামিল করো, রামজী কা নাম লেকে ফাঁসি মে বয়েঠ যাও, পিছু যো হোগা, হাম সমঝ লেঙ্গে।"

সত্যবাদী ভৃত্য।

বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করাতে চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু রাগ করিয়া বলিলেন, ভদ্রলোক সব এতক্ষণ বসে' রয়েছেন, তামাক দিস্‌নে কেন ?

চাকর। "আজ্ঞে আপনি যে বারণ করেছেন। সত্যি সত্যি তামাক আনব না কি ?"

নীতি কথায় রসিকতা।

নীতিকথা,—কদাচ মিথ্যা কহিও না; কদাচ কাহারও দেনা ধারিও না, কদ পঞ্চানন্দের মূল্য বাকী রাখিও না; কদাচ গালি খাইও না; কদাচ টাকা দিতে আলস্য করিও না; কদাচ ভুলিও না যে মানুষকে মরিতে হইবে;—তুমি কখন মরো

তাহার ঠিক নাই, অতএব দান দেওয়ার পর যাহাতে সে দুর্ঘটনা হয়, কদাচ তৎপক্ষে যত্নের ত্রুটী করিও না।—কদাচ রসিকতা করিও না,—কদাচ পঞ্চানন্দকে অরসিক বলিও না; কদাচ ভুলিও না যে, যাহা তোমার ভাল লাগিতেছে না, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়াই ভাল লাগিতেছে না।

বিশেষ আত্মীয়।

একটী ভদ্র সন্তান, ছোকড়া বয়সে বিদেশে কর্ম্ম করেন। একজন আত্মীয় দেশে ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়া তাঁহার হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া বলিলেন—"ভাই, আমার পরিবারকে টাকা কটী দিও; কিন্তু সাবধান, কেহ যেন টের না পায়। চুপে চুপে তাহার হস্তে দিও।"

আত্মীয়। অত করে সতর্ক কর্‌তে হবে না। আমি কি বুঝি না? দেখ্‌বেন, যাঁকে দিতে দিলেন, তিনিও টের পাবেন না।

এডুকেশন গেজেটের প্রতি প্রশ্ন।

এই যে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে দেওয়া হয়, তাহার সকলগুলাই কি সৎ কর্ম্ম? না কি এই উপলক্ষে কু-কর্ম্মেরও প্রশ্রয় দেওয়া যাইতেছে?

সুখের বিষয়—১।

কোনও একটী গ্রামে মড়ক অর্থাৎ মারীভয় হইয়াছিল। ঐ উপদ্রব শেষ হই-লেই একজন ভদ্রলোক গল্পের প্রসঙ্গে, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে কাহারও কোনও অমঙ্গল হয় নাই বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন। অপর এক জন ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"ভাই এবার মড়কটা আমিও পরে পরে কাটিয়েছি; দুটী মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম দুটীই মরেছে; আর ছেলেটীর বিয়ে দিয়েছিলাম, বৌমাটীও মরেছেন, মড়কটা পরে পরেই গিয়েছে।"

সুখের বিষয়—২।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, 'কুসুম' নামে এক মাসিক পত্র এক ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে থাকিবে "জীবনচরিত্র, নীতিবিষয়ক

গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ, উপদেশপূর্ণ কৌতুক কথা, বিখ্যাত নগরাদির বিবরণ এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়।"

এই ক্ষুদ্র আয়তনের ভিতর একমাসের খোরাক দিতে হইলে, হয়, পরমাণুর মত অক্ষরে ছাপিতে হইবে—নইলে এত বিষয় ধরিবে কেন?—তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ সৃষ্টি হইবে। বঙ্গের মঙ্গল। অথবা হোমিওপেথিক মাত্রায় বিষয় গুলি দেওয়া হইবে, পাঠকবর্গ জল মিশাইয়া বাড়াইয়া লইতে পারিবেন। হোমিওপেথির প্রভাব বাড়িলেও মঙ্গল। উভয়তই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের সুখ।

একজন রাজনীতি-শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বিলাতে মন্ত্রি-পরিবর্ত্তন হইলে ভারতবর্ষের তাহাতে সুখ কি? পঞ্চানন্দ এই বলিয়া দিতে পারেন যে, এক দলের আমলে ভারতবর্ষ জোয়ারে ভাসিয়া যাইতেছিল, অন্য দলের আধিপত্য কালে আবার ভাটায় ভাসিয়া যাইবে। ভাসিয়াই ভারতের সুখ।

সদালাপ—১।

উমাচরণের অনুরোধে তাঁহার একটি কাজের ভার রামহরি লইলেন। উমাচরণ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন—"ভাই আমাকে বাঁচাইলে। কথায় বলে যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠী বাজে,—এ ভূতের বোঝা কি আমি বইতে পারি?"

রামহরি—"অত করে বলতে হবে কেন, আমি ত ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হলাম। তোমার ঘাড়ে যতদিন ছিল, তত দিন সত্য সত্যই ভূতের বোঝা ছিল, তা কিন্তু এখন আর তা হবে না।"

সদালাপ—২।

পাঁচজন ভদ্রলোক একস্থানে বসিয়া পরস্পরের গুণানুবাদ করিতেছিলেন। ধীর-প্রকৃতি নসিরামের প্রশংসা করিবার জন্য হলধর বলিলেন—"নসি বাবুর মত ঠাণ্ডা লোক আর দেখা যায় না!"

সুরেশ বলিলেন—"আমি অনেক দেখেছি।"

হলধর—"তোমার ঐ কাজলিমি, কোথায় দেখেছ বল দেখি?"

সুরেশ—"ওলাওঠার রোগী শেষ অবস্থায় ওঁর চেয়েও ঠাণ্ডা হয়।"

চুড়ান্ত কৈফিয়ত।

কমল কেরাণী বিলম্বে আফিশে আসিয়া, আবার সকালে সকালে পলাইয়া যাইতে-ছিলেন। আফিশের বড় বাবু দেখিতে পাইয়া কমলকে বলিলেন—"সে কি হে? তুমি ওবেলা অত দেরি করে এসেছ, আবার এরি মধ্যে যাচ্চ?"

কমল বলিল—"আজ্ঞে এক দিনে হুবার হলে, সাহেব যে রাগ করবেন।"

"EDEN MUST HAVE LOST HIS HEAD."

লাট লিটন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাওয়াতে ছোট লাট ইডেন সাহেব শোকাতুর হইয়া বলিয়াছেন;—"এমন লাট সাহেব আর হবে না, ভারত যুড়িয়া লাটের জন্য কান্না-হাটি পড়িয়াছে।"

কথা মিথ্যা নয়। লাট লিটন সকলকেই কাঁদাইয়া গিয়াছেন, কাজে কাজেই এমন লাট আর হ'বে না, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু এমন ইডেনও হ'বে না,—ইডেন অর্থে স্বর্গকানন, আশ্‌লি (১) অর্থে পাংশুবৎ। লিটনও এই ইডেনের খুব গোঁড়া।

ডার্ব্বিনের কথা যথার্থ।

একখানি বিলাতী কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে,—পণ্টষ্ট্রীটে একটা ভোজ হয়, তাহাতে আসল ফলের গাছ দিয়া ঘর ও টেবিল সাজান হইয়াছিল। ভোক্তারা স্বচ্ছন্দে গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইয়াছিলেন।

ক্রমে ঘর ও টেবিল উঠিয়া যাইবে; গাছে গাছেই কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে।

পৌরাণিক ঋণ শোধ।

গুপ্তিপাড়ার গোপীনাথ মুখুয্যে কুলীনের সন্তান, ফুলের মুখুটি, ব্রাহ্মণ ইষ্টনিষ্ঠ, বয়স ষষ্টি বৎসর, উদরান্ন সংস্থান জন্য ক্লকেড কোম্পানীর অফিসে বিল সরকারী করেন। স্নান আহ্নিক ক'রে স্বহস্তে পাক করিয়া আহারান্তে আফিস আসিতে মধ্যে মধ্যে বিলম্ব হয়। কাজেই সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে সাহেবদের কাজের আঞ্জাম করেন। একদিন একটু কিছু অধিক বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, দুর্দ্দান্ত ডেমার্টিন সাহেব

---

(১) Ashly.

সজোরে ব্রাহ্মণের বক্ষে সপাদুক পদাঘাত করিলে, গোপীনাথ তখন চৌরঙ্গীর রাস্তার মাঝে পৌরাণিক রোদন করিতে লাগল;—"ভৃগুরে ভৃগু! তোর ধার আমায় শুধতে হ'ল, বাপুরে বাপু!"

পাইকের জড় করা অভ্যাস।

জীতনপুরে জমিদারী কাছারীর দাওয়ায় ভজহরি পাইক শুইয়া আছে, মশার দৌরাত্ম্যে অনেকক্ষণ হইতে তাহার ঘুম হয় নাই, এ পাশ ও পাশ করিতেছিল; গোমস্তা মশারি ফেলিয়া অদূরে গাঢ় নিদ্রাভিভূত। নিকটে ডেপুটি-কাছারির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ হইল। শব্দে গোমস্তা গামোছা দিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ভজহরি একবার তামাক সাজতো বাপু'—'কটা বাজলো রে?' ভজহরি উঠিয়া বলিল—'আজ্ঞে এই তিনটা বাজছে।' আর একজন পাইক জাগ্রত ছিল, সে বলিল—'আজ্ঞে না, এই দুটা বাজিল।' ভজহরি কুপিত হইয়া বলিল,—তুই ত সব জানিস, আর একটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, তুই তখন ঘুমিয়ে ছিলি।'

উপদেবতা কখনও কিছু না নিয়ে ছাড়ে কি?

দক্ষিণা না পাইলে কলির অর্থমেধ যজ্ঞের আচার্য্য স্থূর জনষ্ট্রাচী ভট্টাচার্য্য যজ্ঞস্থল ত্যাগ করিয়া যাবেন কেন? পঞ্চাশ কোটী অর্থমেধের পঞ্চাশ সহস্র দক্ষিণা অসঙ্গতই বা কি? ভাট তষ্টিদারেরা পুরোহিতের প্রাপ্তিতে চীৎকার করিয়া অদক্ষিণায় যজ্ঞ নষ্ট করিলে পুরোহিত আবার আচমন করিয়া বসিবেন—সেইটাই ভাল হবে?

ভবী ভুলিবার নয়।

সরকারী (১) সভায় মুলকি লাট শ্রীপদ অর্পণ করিলে, বাপ্‌পা লাফোঁ (২) তাঁহার 'আপ্যায়িত' করিলেন; সভার আশা ভরসার অনেক কথা বলিয়া সরকারি সভার জন্য ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সরকার হইতে যাচ্‌ঞা করিলেন। বিরাট লাট আপ্যায়িত হইয়া সকল কথার সদুত্তর দিলেন। তবে কেহ কেহ বলেন, কেবল রুধিরের কথায় বোধ হয় বধির হইয়াছিলেন, নহিলে কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না কেন? পঞ্চানন্দ জানেন, লাট লিটনের আংশিক মৌনভাবের নিগূঢ় অর্থ আছে; প্রথম কথা—

(১) ৺মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভা।

(২) Father Lafont

তিনি বিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে অর্থনীতির বিতণ্ডা করিবেন কেন? আর দ্বিতীয় কথা,—বিজ্ঞানসভার যেরূপ বিদ্যুৎ বেগে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সভ্যেরা অচিরাৎ অঙ্গার হীরকে, বাষ্প সুবর্ণে, শিশির মুক্তায় পরিণত করিতে পারিবেন। অভাব হইতে আবিষ্কার, সভার অভাব মোচন করিয়া আবিষ্কারের পথে বাধা দিবেন কেন?

মাতাল বাঁটিয়া লয়।

নিশিকান্ত প্রায় নিশীথ অতীতে, আরক্ত লোচনে টল-বিটল চরণে বাটীতে আসিতেন। সেদিন কিছু অতিরিক্ত সেবন হইয়াছিল, বিলম্বও অতিরিক্ত হইয়াছিল; ভোরের বেলা ভোর হয়ে উপস্থিত। গৃহিণী শশব্যস্ত; কুটির ঢাকা খুলতে যান এমন সময়ে ঘড়ি বাজিতে লাগিল, নিশিকান্ত গণিতে লাগিল,—টুং এক; টাং এক; টং—এএক; টাং এএএক। ঘড়িটে এমন হ'ল কেন? চারিবার একটা বাজিল যে?

পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর জীবন।

হাকিম—তুমি চুরি করিয়াছ?

আসামী—আজ্ঞে হাঁ।

হাকিম—কেন চুরি করিলে?

আসামী—আজ্ঞে আপনাদেরই ভয়ে।

হাকিম—আমাদের ভয়ে চুরি! সেকি?

আসামী—আজ্ঞে, এই আমরা যদি চুরিটা আসটা বন্ধ করি, আপনার চাকরি থাক্‌বে না, তা' হ'লেই আপনারা এই ব্যবসা ধরবেন, আমরাও মারা যা'ব, ব্যবসাটাও মাটী হবে!

হাকিম আর প্রশ্ন না করিয়া রায় লিখিতে লাগিলেন।

প্রতিবাদ।

বৃহৎ সভা, লোকে লোকারণ্য। বক্তা হাত পা নাড়িয়া মদের দোষ গাইতেছেন, মাতালের নিন্দা করিতেছেন এবং সকলকেই মদ ছাড়িতে, মদ না ধরিতে এবং মদকে বিষতুল্য জ্ঞান করিতে উপদেশ দিতেছেন। বক্তা বলিতেছেন—"যাঁহারা দেশের অলঙ্কার, জন্মভূমির গৌরব, তাঁহাদের কত জন মদ খাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।"

সভায় একজন মাতাল ছিল, দাঁড়াইয়া বলিল "বাবা, তুমিও ভদ্র লোকের ছেলে, আমরাও ভদ্র লোকের ছেলে। মিছেমিছি কতকগুলা মিথ্যা কথা ব'লে কেলেঙ্কারি কর্‌ছ কেন? খতিয়ে দেখ দেখি, মদ খেয়েই বা কত লোক মরেছে, আর মদ না খেয়েই বা কত লোক মরেছে। যারা মরে, তারা বারো মাসই মরে।"

রাজভক্তির অতিরিক্ত কারণ।

১। ইংরেজী শিখিয়া ভারতবর্ষের লোক নানা প্রকারে অসন্তুষ্ট হইতেছে, আর যখন তখন ইংরেজের নামে লাগানে কথা লিখিতেছে, আর বলিতেছে। ইহা সকলেই জানেন, এমন কি, ইংলিশম্যান্ ও পাইওনিয়ারও মানেন; তবু কেরাণী বজায় আছে, নূতন লোকে নিত্য নিত্য কেরাণীগিরী পাইতেছে।

২। কাবুলের যুদ্ধ লইয়া কত জনে কত কথা বলিতেছে, আসল ব্যাপারটা এই যে, ভারতবর্ষে চাক্‌রি অপেক্ষা চাকরের সংখ্যা অতিশয় বেশী হইয়া পড়িয়াছে, একটা নূতন দেশ হস্তগত হইলে, এই উমেদার-কুলেরই উপকার, ইংরেজেরও তাহাই সংকল্প।

দুঃখের কথা এই যে, পোড়া লোকে হিতে বিপরীত ভাবে।

যেমন শিক্ষা তেমনি পরীক্ষা।

আই—হ্যাঁ লা শেষে কুল মজালি? এ লজ্জা রাখ'ব কোথা?

নাতিনী—(ঈষৎ কান্নার সুরে) তুই যে এক দিন বলেছিলি, না মজলে কুল মিষ্টি হয় না।

প্রেম সম্ভাষণ।

স্বামী—(কবিতা লেখেন) বিধুমুখি, তোমায় না দেখিলে দশদিক্ আমার অন্ধকার বোধ হয়।

স্ত্রী—কেন, চোখের মাথা খেয়েছ না কি?

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আজি কালি মহাভারত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরিত হইতে দেখিয়া, কেহ কেহ মূল্য দিয়া পঞ্চানন্দ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন; এই সকল [illegible]

সুবিধার নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে, এই বৎসরের পঞ্চানন্দ বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। কেবল ডাকমাশুল এবং "ইত্যাদি" ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নগদ, নোট অথবা মণিঅর্ডার দ্বারা ৫৲টী মাত্র টাকা সমেত সত্বর আবেদন করিতে হইবে। আপাততঃ তিন হাজার সাতশত খণ্ড ছাপান যাইতেছে, তন্মধ্যে ষোলশত সাঁইত্রিশ জন গ্রাহক হইয়াছেন। বিগত ১৫ই মাঘের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। গ্রাহক-সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে, আর আবেদন গ্রাহ্য করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন থাকিবে। অতএব এ সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া সুবোধের কার্য্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ডার্বিনতন্ত্রীর শিক্ষা-সোপান।

এক ব্যক্তি চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য ওস্তাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিক্ষার্থীর মূর্ত্তি দেখিয়া ঐ ওস্তাদ তাহার বুদ্ধি ঠাওরাইয়া লইলেন। বলিলেন,—মানুষের ছবি আঁকা শিখ্‌বে?

শিক্ষার্থী—হঁ্যা।

ওস্তাদ—তবে বাঁদরের চেহারা থেকে আরম্ভ ক'রে দাও অ'র কি?

শিক্ষার্থী—তা' কেমন তর করে' আঁক্‌তে হয়?

ওস্তাদ—তাও জানো না? কাগজ নিয়ে পেন্‌সিল নিয়ে সম্মুখে একখানি বড় আর্শী রাখবে। একবার একবার আর্শীতে দেখবে, আর মন দিয়ে ছবি আঁকতে থাক্‌বে।

দিব্যজ্ঞান।

সিধু বাবু মাতাল হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়াছেন; সঙ্গে তাঁহার ইয়ার নিধু বাবু ছিলেন; অনেক যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিধু বলিলেন—ওঠো ওঠো, মাটীতে পড়ে, কেন? লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি?

সিধু উত্তর করিলেন,—"বাবা, বৃথা অনুরোধ, জন্মভূমির মায়া আমি পরিত্যাগ কর্‌তে পার'ব না। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, যার যা বল্‌তে হয় বলুক, অহঙ্কার ক'রে মাথা তুল্‌লে আর আমি চলব' না।"

সৎপথের কণ্টক।

ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিলেন,—সাধু পথে থাকিয়া শাক-অন্নে জীবন ধারণ করিতে হয়, সেও ভালো; কিন্তু চুরি ডাকাইতি করিয়া ঐশ্বর্য্য হইলেও, তাহা অগ্রাহ্য। তবে তোমরা কেন পাপে লিপ্ত হইবে?

শ্রোতাদের মধ্যে রঘু ডাকাতও ছিল, দণ্ডায়মান হইয়া যোড় হস্তে বলিল,—শুদ্ধ টেক্সের দায়ে। চোর-ডাকাতের খাজনা দিতে হয় না, টেক্সও লাগে না।

সুশীল বালক।

বিধুভূষণ বড় সুবোধ ছেলে; যাহার যেমন উচিত খাতির মর্য্যাদা করিতে বিধু অদ্বিতীয়। বিধু একদিন একজনের দোকানে বসিয়া আছে, আর সেইখানে বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ও আছেন। দোকানদার তামাক সাজিয়া আনিল।

বিধু সসম্ভ্রমে বলিল—চৌধুরী মহাশয়, আপনি এখান থেকে একবার সরে যান।

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

বিধুভূষণ বলিল—আমায় একবার তামাক খেতে হ'বে, তা' আপনার সুমুখে ত সেটা ভাল হয় না।

উপমায় কলঙ্ক।

[illegible]। তোমার মুখ-শশী যখন মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন আমাতে আর আমি থাকি না!

"কেন ভাই! আমার গালে কি এতই মেচেতা?"

প্রণয়ী দম্পতী।

রাগী স্বামী।—"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।"

রসিকা স্ত্রী।—"কেন, তুমি ত বিধবা-বিবাহের বিরোধী নও।

ধনী হইবার সহজ উপায়।

আমেরিকাতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন—"যাহারা সহজে ধনী হইবার উপায় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে আধ আনা মূল্যের এক একখানি টিকিট সহিত পত্র আমাকে লিখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

ধনী হইতে সকলেরই ইচ্ছা; সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতার নিকট নিত্যই রাশি রাশি পত্র আসিতে লাগিল; কিন্তু ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহ উত্তর পায় না। ব্যস্ত হইয়া অনেকে পুনর্ব্বার পত্র লিখিতে লাগিল। তখন সেই ব্যক্তি আবার এই বিজ্ঞাপন দিল—"আমি পূর্ব্ব-বিজ্ঞাপন অনুসারে যে টিকিট পাইয়াছি, তাহা বিক্রয় করিয়া আমার লক্ষাধিক টাকা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সহজে ধনী হইবার উপায় আর কি আছে?"

জ্ঞান টনটনে।

ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা হইতেছে; ভগ্নতচিত্তে শ্রোতারা বসিয়া আছেন; এমন সময়ে একজন মাতাল গিয়া উপস্থিত। যোড় হাত করিয়া কাতর ভাবে দাঁড়াইয়া মাতাল বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। তাহার ভক্তি ভাব দেখিয়া, তাহাকে ভক্ত ব্রাহ্ম মনে করিয়া কয়েকজন শ্রোতা বলিলেন—"বসুন না মশায়, বসুন"—বলিয়া বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

মাতাল তাহার দোদুল্যমান চাদরের খুঁটটি তুলিয়া বলিল—"গঙ্গা, বাবা! এখানে ছত্রিশ জাত আছে, ছোঁয়া পড়্‌বে।" (১)

শ্রোতারা অবাক্।

মিউনিসিপেল বিচার।

অনাহারী মেজেষ্টর (প্রথম আসামীর প্রতি)। তোমার জায়গায় জঙ্গল হয়েছে?

আসামী—আজ্ঞে সে জায়গা আমার নয়।

মেজেষ্টর—আচ্ছা, তোমার বাড়ীর কাছে ত বটে।

আসামী—তা বটে।

মেজেষ্টর—দু টাকা জরিমানা।

(দ্বিতীয় আসামীর প্রতি) তোমার বাড়ীর কাছে জঙ্গল পরিষ্কার করো নাই কেন?

আসামী—আজ্ঞে, আমার বাড়ী নয়।

মেজেষ্টর—ঐ পাড়ায় ত তোমার বাড়ী?

আসামী—আজ্ঞে, তা'ও নয়; আমি কুটুম্বের বাড়ী এসেছি।

মেজেষ্টর—তোমার এক টাকা।

(তৃতীয় আসামীর প্রতি)—তোমার বাড়ীর—

আসামী—সে কথায় আর কাজ কি?—এই চৌদ্দ গণ্ডা পয়সা আছে, নিন্।

---

(১) পাছে গঙ্গা নষ্ট হয়।

খোশ খবরের ঝুটোও ভাল।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আগামী বার হইতে নব-বিভাকর এক কর্ম্মা এবং সোমপ্রকাশ দুই কর্ম্মা করিয়া বেশী দিতে আরম্ভ করিবেন। ইহাতে কেবল বিবাদের কথা থাকিবে, এবং বিবাদ সম্বন্ধীয় একখানি অভিধান খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা উপনগরের প্রধান প্রধান মেছুনীরা ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবেন, এমন আভাস পাওয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা।

গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ঘটিত হিসাবের ভুল হওয়া বলিয়া যে তিন কোটি তেরো লক্ষ টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছে, রাজস্ব-মন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের পুরস্কারের পঞ্চাশ হাজার টাকা এই কর্জ্জের ভিতর ধরা হইয়াছে ত? না হইয়া থাকিলে, পরিমাণটা এই সময়ে বাড়াইয়া দেওয়া ভালো না?

খেদের কথা।

একজন এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিল—হা ভগবান্, বুদ্ধি দিতে, সেই এক হইত; করিয়া কর্ম্মিয়া অন্ন-সংস্থানটা করিতাম। তাহা না দিলে নাই, যদি পাগল করিতে সেও যে ভালো ছিল। এ যে দুইয়েরই বা'র।

চন্দ্রের কথা।

নামের উপর চন্দ্রের যে প্রকার আধিপত্য, এরূপ আর কাহারও নয়। ঈশ্বরচন্দ্র, জগৎচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র, বৃন্দাবনচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র প্রভৃতি ব্যতীত চন্দ্রমোহন শ্রীচন্দ্র ইত্যাদি আছে।

আচ্ছা, কলিকাতাচন্দ্র, ঢাকাচন্দ্র, বগাগড়চন্দ্র, কাঁসারীপাড়াচন্দ্র—নাই কেন? এখনকার অপ্রকাশচন্দ্র অপেক্ষা কি এগুলি ভালো নয়?

সার কথা।

শ্রীনিবাস গাঙ্গুলী কন্যাভারগ্রস্ত, সর্ব্বদাই মনের অসুখ। অনেক স্থান হ'তে অনেক লোক কন্যাটিকে দেখতে আসে, কিন্তু সম্বন্ধ আর স্থির হয় না। অথচ মেয়ে দেখানির হাঙ্গামে ব্রাহ্মণের খালি খরচান্ত। মাসকতক এইরূপে যায়, একদিন এক-

জন ঘটক, একজন বাবু এবং তাঁহার দুই তিন বন্ধু মেয়েটীকে দেখিতে এলেন। দেখা শুনা হ'লো, জলযোগ বিলক্ষণরূপে হ'লো, শেষ তামাক খেতে খেতে কেহ বল্লেন "মেয়েটী মন্দ নয়, তবে আর একটু গৌরাঙ্গী হলে ভালো হ'তো, বাবু বল্লেন "আকটী যেন বসা বসা।"

কন্তাকর্ত্তা আর থাকৃতে পাল্লেন না, বলে উঠলেন,—"আমার এক নিবেদন আছে যদি ঘর করা কত্তে হয়, তবে পাঁচ পাঁচিই ভাল, আর যদি ব্যবসা করার ইচ্ছে থাকে, তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।"

বিষয়-বুদ্ধি।

রসময়—কেমন ভাই, তোমার পরিবার কেমন ?

রামনিধি—আর ভাই, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো' না, দু'তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেল, কিন্তু ব্যারামের কিছুই কম দেখা যাচ্ছে না!

রসময়—বলো কি ? দুই তিন হাজার! তা' রিপুর কাজে এত খরচ করার চেয়ে, নতুন দুটো বে করা যে ছিল ভালো ?

রামনিধি—তোমার মত বিষয় বুদ্ধি-থাকুলে এত কষ্ট পাব কেন, বলো ?

যা নয়, তাই।

বিনোদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখে একজন মাতাল বড় গোরগোল করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য দুই চারিবার তাহাকে চলিয়া যাইতে বলাতেও সে নিবৃত্ত না হইয়া বেশী হাঙ্গাম করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—নে আয় ত বেটাকে বেঁধে, বেটার মাতলাম বার ক'রে দি।

মাতাল—সেকি বাবা, যা নয় তাই বল্‌তে আরম্ভ করলে ? এ ত চাল কলা নয় যে বাঁধবে,—আমি যে মানুষ বাবা!

দেবলোকের শোক।

শিমলা পাহাড়ে উপর্য্যুপরি নয় দিন সূর্য্যদেব দর্শন দেন নাই; ক্রমাগত মেঘ ও বৃষ্টি হইয়াছে।

জ্যোতিষ গ্রন্থে দেখা গেল, লাট মিন্টনের অকালে তিরোভাব জন্য দেবলোকে দারুণ শোক উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সূর্য্যদেবের রোদনের বিরাম নাই।

একটা পরামর্শ।

সকল ধর্ম্ম-সভাতেই দেখা যায় যে, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনা হয় না। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও অধর্ম্মের লোপ হইতেছে না।

দিন কতক অধর্ম্মের আলোচনা করিয়া দেখিলে হয় না? লোকে তাহাতে অন্ততঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদটা বুঝিতে পারিবে।

জ্ঞাতি-গুণ।

(মিরায়ের অনুরোধে আউড পত্র হইতে উদ্ধৃত)

একদা এক কাঠুরিয়া কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল। কাষ্ঠ কুঠারকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ভাই কুড়ুল, আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করি নাই, তুমি কি জন্য আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছ?

তাহাতে ঠাকুর স্বীয় বাঁটের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাষ্ঠকে বলিল "ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমার পেছনে তোমার জ্ঞাতি লাগিয়াছে, নতুবা আমি এমন করিতাম না।"

বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

ভুলু বাবু খুব ধুমধামের সহিত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন; তাঁহার ব্যয় বিধান দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ভুলু ঈষৎ লজ্জিত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনারা অপরাধ নেবেন না; আমি পিতৃহীন, তাই আপনাদের যথোচিত সমাদর করতে পারলেম না। আজ যদি বাবা থাকতেন, তাহা হইলে এর দশ গুণ ক্রিয়া করতে পারিতাম, বাবা সন্তুষ্ট হতেন, আমারও জন্ম সার্থক হত।"

ওঝা চেয়ে ভূত ভালো।

বন্ধু। (রোগীর প্রতি) কেমন হে, আছ কেমন? আর জ্বর ত হয় না?

রোগী। রোগের হাতে রক্ষা পেয়েছি, কিন্তু কবিরাজের হাতে বুঝি পাই না।

বন্ধু। কেন কবিরাজ কি করেছে?

রোগী। কর্‌বে আর কি? অনাহারে ত জীবন ধারণ হয় না, তাই বলছি!

আক্কেল আছে।

সেকেলে সেরেস্তাদারেরা যে ঘুষ খাইত, তাহা অন্যায় বলা যায় না; কারণ তেমন হুসিয়ার লোক চারগুণ বেতন দিয়া আজি কালি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

একদিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে। অনেক বেলায় দেরি করিয়া সেরেস্তাদার আদালতে উপস্থিত। জজ সাহেব বলিলেন, এ বড় বেজায়, তুমি এত দেরি করিয়া কাছারি আসিলে কেন?

সেরে। হুজুর, পথে যে কাদা, দুপা এগিয়ে আসিতে তিন পা পেছিয়ে পড়ি, কাজেই একটু গৌণ হইল।

জজ। যদি দুপা এগুতে তিন পা পেছিয়ে পড়লে, তবে পৌছিলে কেমন ক'রে? তোমার এ মিথ্যা কথা।

সেরে। দোহাই ধর্ম্ম-অবতার। মিথ্যা না, যখন দেখলাম নেহাত আসা যায় না, তখন কাছারির দিকে পেছন ফিরে নগরের দিকে সম্মুখ করিলাম।

অন্যায় দেখিলেই রাগ হয়।

মুখুজ্যেদের বাড়ী কালীপূজা দেখিতে গিয়া সেখ দবীরুদ্দীন হোঁচোট খাইয়া বলিল,—"শালার মুকুজ্যে পির্ত্তি বছরই আঁদারে কালী করবে, ভুলেও যদি একবার জোছনায় করলে!"

পদবৃদ্ধি।

সদরালার আদালতে মোকদ্দমা হারিয়া আসিয়া হাকিমকে নির্ব্বোধ ইত্যাদি বলিয়া অর্থী গালি দিতে লাগিল।

তাহার উকিল বুঝাইয়া দিলেন—সদরালা ত বোকা হবেই! চতুষ্পদ কি না?

আর আর উকীলেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—চতুষ্পদ কেমন?

তিনি বলিলেন—এটা আর বুঝিলে না?—ভগবান্ দত্ত দুই পদ। মুন্সেফীতে প্রথম পদ-বৃদ্ধি, কাজে কাজেই সদরালা হইলে পূর্ণ চতুষ্পদ!

মর্ম্মগ্রাহী শ্রোতা।

পাদ্রী সাহেব চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতার সূত্রপাতেই প্রশ্ন করিলেন—বলো দেখি, এ দুনিয়াটা কার?

একজন শ্রোতা বাধা দিয়া বলিল—এক শ বার উচিত কথা বলিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দুনিয়া—টাকারই বটে!

একটা ভরসার কথা।

মিরর পাঠ করিয়া একটা বিশেষ সুসংবাদ জানিতে পারা যায়। তাহা এই যে, বঙ্গদেশের শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে, বাল্য-বিবাহ এ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বিবাহ যখনই হউক, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ সে বিবাহ বিবাহই নয়, সম্বন্ধ মাত্র। যখন দেখিবে বরকন্যা, তখন জানিবে বিবাহ। দৃষ্টান্ত কুচবিহারে!

বিদ্যা অমূল্য ধন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবদীয় উপাধি হস্তগত করিয়া আসিয়া এক বৎসর ধরিয়া ভরসা-রাম দত্ত ওকালতীর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রজতখণ্ড দূরে থাকুক, একটী তামার পয়সার মুখও দেখিতে পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া, ওকালতী ছাড়িবার সময়, প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়া গেলেন—এত দিনে বুঝিলাম যে, বিদ্যা অমূল্য ধনই বটে!

ন্যায়সঙ্গত উত্তর।

প্রশ্ন। "ঘোড়া এবং গাধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

উত্তর। "গাধা"

প্রশ্ন। "কেন?"

উত্তর। "গাধা পিট্‌লে তবে ঘোড়া হয়।"

নির্দ্দোষ প্রার্থনা।

রামহরি। (ক্রুদ্ধভাবে) "ওরে বেটা তুই উচ্ছন্নে যা"!

বিষ্ণু (ভক্তিভাবে)—"অনুগ্রহ করে যদি আগে আগে পথটা দেখিয়ে যান ত ভালো হয়। নইলে চিন্‌তে পার্‌ব না।"

সরকার বাহাদুরের ভ্রম।

সেন্‌শেষ আদম-সুমারী বা জনসংখ্যা লইবার হুকুম হইয়া গিয়াছে। এবং সর্ব্বত্র একই সময়ে ঘর, দুয়ার, নৌকা পর্য্যন্ত দেখিয়া মানুষের সংখ্যা ঠিক করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, একটু সঙ্কীর্ণ ফাঁক থাকিয়া যাওয়াতে অনেক ভদ্রলোক গণনার বাহিরে পড়িবেন। থানা ও বাগান গণিবার উপায় করা হয় নাই। অথচ অনেক ভদ্রলোক রাত্রিতে নর্দ্দমাবাসী হইয়া থাকেন, অথবা ভুলক্রমে বাগান-বাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়েন, এ কথা সকলেই জানে।

আর একটা কথার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তাহাতেও ভুল হইবার সম্ভাবনা। গণনার সময়ে প্রসবোন্মুখী রমণী এবং আধখানা জলে, আধখানা ডাঙ্গায় ৮ তীরস্থ খাবি-ভক্ষণ-পরায়ণ ব্যক্তি, পূর্ণ একজন বলিয়া অথবা কম-বেশ করিয়া গণিতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া উচিত।

ন্যায়রত্ন-কীর্ত্তি। *

এখন অবধি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতানুসরণ অভ্যাস করা উচিত। সেইজন্য নিম্নে দুইটি সরল পাঠ দেওয়া গেল—

১। "এসো, এসো, ভায়া এসো" লিখিতে হইলে S-o S-o Via S-o' এইরূপ বানান করিতে হইবে।

২। Gave him legacy দেখিলে পাঠ করিবে "গোবে (অর্থাৎ গোবিন্দের) হিম লেগেচে।

হুসিয়ার ছেলে।

শিক্ষক। পাঁচ থেকে দুই নিলে কত থাকে?

ছেলে। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) –জানি না।

শিক্ষক। আচ্ছা মনে করো, তোমাকে পাঁচটা কমলা লেবু দেওয়া গেল—

ছেলে। কখন দেবেন?

শিক্ষক। মনে কর দিলাম, তার ভেতর থেকে দুটি লেবু আমাকে ফিরে দাও, তা' হ'লে তোমার কটা থাকে?

ছেলে। পাঁচটা ত আমায় দেবেন? তা পাঁচটাই আমার থাক্‌বে।

শিক্ষক। না না, তা কেন? দুটো যে আমায় ফিরে দিবে।

ছেলে। (কাঁদিয়া) না, তা আমি একটাও দেবো না।

---

* প্রথমভাগে বিজাতীয় বর্ণমালার স্বজাতীয় ভাষা শিখিবার বক্তৃতা।

●

আসামীর জবাব।

রাধামাধব মাতাল হইয়া রাস্তায় দৌরাত্ম্য করিতেছিল, এমন সময়ে পুলীশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ঝোলায় তুলিয়া লইয়া গেল এবং থানায় সমস্ত রাত্রি কয়েদ করিয়া রাখিয়া দিল।

সকালবেলা চালান দিবার সময়ে নাম জিজ্ঞাসা করাতে, রাধামাধব মনে করিল যে, নাম প্রকাশ হইলে লজ্জার বিষয়, অথচ জরিমানা কিছু হইবেই। সেই জন্য প্রকৃত নাম গোপন করিয়া আপন নাম লেখাইয়া দিল—রামচন্দ্র!

আদালতে উপস্থিত হইলে রাধামাধবের একজন বন্ধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার ফলে, নাম ভাঁড়াইবার অপরাধে আর এক অভি-যোগ তাহার উপর চাপিল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার আসল নাম কি?

"আজ্ঞে, রাধামাধব"।

বিচারক—"তবে পুলীশে নাম ভাঁড়াইয়া প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে কেন?"

"হুজুর, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম—তখন কাজে কাজেই—রামচন্দ্র।"

বিচারক—"রাস্তার উপর মাতলামি করিতেছিলে কেন?"

"হুজুর, মাতলামি করি নাই। তবে রাত্রি অধিক হয়েছিল, গাড়ী পাকী পাওয়া গেল না, হেঁটে বাড়ী যাই এমন সঙ্গতি ছিল না, তাই কোম্পানীর ঝোলা ডাক্‌ছিলাম।"

দেবতার পক্ষপাত।

যে দরিদ্র, তাহার উপর দেবতারও কোপ দেখা যায়। কিন্তু মহাপাপীও যদি দরিদ্র না হয়, তাহা হইলে দেবতা তাঁহার অনিষ্ট করেন না। আমার ঘর নাই, মাথা বাঁচাইবার স্থান নাই, আমিই বৃষ্টিতে ভিজিব। আর, তুমি চুরি করা ছাতাটি মাথায় দিয়া চলিয়া যাইতেছ, তোমার মাথায় জল পড়িবে না।

অকাট্য প্রমাণ।

"যাঁহারা উন্নত ব্রাহ্ম, তাঁহারা হিন্দু নহেন—ইহা কিসে জানা যায়?"

"তাঁহারা আদরের সহিত রবিবারে দর্পণ দেখেন।"

"তাহাতে কি প্রকারে জানা গেল ?"

"হিন্দুদের বিশ্বাস আছে যে, রবিবারে দর্পণ দেখিলে কলঙ্ক হয়। কলঙ্কে হিন্দুর সাধ নাই।"

রাজকার্য্যের রহস্য।

জেলার জজ সাহেবেরা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত গুরুদণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অনেকেই অবগত নহেন। অনেক সাহেব অপরাধ করিলে শাস্তিস্বরূপ জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভুক্ত-ভোগী, সুতরাং দণ্ডের ব্যবস্থা ভাল বুঝিবেন বলিয়াই এ প্রকার ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে।

একজন বাঙ্গালী অতিরিক্ত জজ হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোন বিষয়ে স্বয়ং দণ্ডিত হন নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই তাঁহাকে দাওরার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে না।

আশ্চর্য্য অজ্ঞতা।

মেম সাহেব (খানসামাকে)—গত রবিবারে সাহেব তোমাকে মারিয়াছিলেন কি ? কৈ আমি ত জানিতে পারি নাই ?

খানসামা।—আপনি জানিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়াছিলাম।

কবির ভবিষ্যদ্বাণী।

পাঁচ ইয়ারে একত্র হইলেই একটা মদের বোতল খোলা আবশ্যক, নহিলে আর ভদ্রতা রক্ষা হয় না। নসী বাবুর বৈঠকখানায় এইরূপ মজলিস হইয়াছে, খানসামা এক বোতল 'বী-হাইব' ব্রাণ্ডী দিয়া গেল। নব অনুরাগী একজন নবীন ইয়ার "ব্রাণ্ডীর" নাম শুনিয়া চমকিয়া বলিল—"না ভাই, আমাদের বাঙ্গালীর পেট, ব্রাণ্ডী খাওয়াটা উচিত নয়।"

নসী বাবু বলিলেন—"বী-হাইব" জিনিষটা ভালো হে; এতে কোন অনিষ্ট হয় না।

এক জন বকেয়া ইয়ার নসী বাবুর পোষকতা করিয়া বলিল—"বী-হাইব, কি না মধুচক্র,—বাঙ্গালীর জন্য ব্যবস্থাও আছে। দূরদর্শী কবিবর মাইকেল দত্তজ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—

—'মধুচক্র, গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি !'—
যদি ভদ্রলোক হও, দেশানুরাগী হও, তবে বী-হাইবের নিন্দা করিতে পারো না।

জিজ্ঞাসা।

"বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী"কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। কিছুদিন হইতে গো-জাতির উন্নতির জন্য "সঞ্জীবনী" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, এই সমস্ত প্রবন্ধ গো-জাতির অবোধগম্য এবং গোপাল সম্প্রদায়ও প্রবন্ধ পড়ে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, গোজাতির অগ্রে স্বজাতির উন্নতির জন্য যত্ন করাই উচিত এবং আবশ্যক। তবে, যদি "সঞ্জীবনী"র গোজাতি এবং স্বজাতি একার্থবাচক হয়, তাহা হইলে কথাই নাই।

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অবৈধ অনুযোগ।

বাঙ্গালীর দেশহিতৈষিতা নাই, এই কথা বলিয়া অনেককে অনুযোগ করিতে শোনা যায়। কিন্তু কথাটা সত্য নহে, সুতরাং অনুযোগও অমূলক। খোলা ভাটী হইবার পূর্ব্ব হইতেই "কনট্রির" নামে অনেকের মুখ লালায়িত এবং হৃদয় প্রফুল্ল হইতে দেখা গিয়াছে। তবে যাঁহারা "কনট্রির" কথায় বমি করেন, তাঁহারা অবশ্যই বিলাতী-ভক্ত এবং দেশের পরম শত্রু।

যে যেমন বোঝে।

"প্রকৃত সুন্দর কে ?"
"যাহার বিদ্যা আছে।"
"ইহার প্রমাণ কোথায় ?'
"ভারতে।"

ক্ষমা প্রার্থনার নব বিধান।

মোশলির অতুল কীর্ত্তি ওরফে বজ্জাতি ব্যাপার বোধ হয় এখনও কেহ বিস্মিত হন নাই। সেই যে ছোট লাট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বজ্জাতির জন্য জেলার মেজেষ্টর

ডেপুটী মেজেষ্টরের সদনে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাহার ফলে মহামতি মৌশলি আদেশ করিলেন যে, অতুলানন্দ বর্দ্ধন জন্য ডেপুটী তারিণী বাবু এই মর্ম্মে রুবকারি প্রেরণ করুন যে, বঙ্গজাতির বদার্থ যত কেন বদ হউক না, তৎসম্বন্ধে বিবাদ করা বৃথা, কারণ অপবাদের অভিপ্রায়াভাব, অতএব অপরাধ অসম্ভাবিত।

এই ত গেল ক্ষমা প্রার্থনা। ইহাকে নব বিধান অভিধান দিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আদেশ আছে, অনুতাপ আছে, গৌরাঙ্গ আছে, কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, ঈশার উপদেশানুসারে গণ্ডান্তরে চপেটাঘাত আছে, মহম্মদের শাসনানুগত করবালাঘাত আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য্য ঈডেনাবতারের জয়-পতাকার উড্ডীনতা আছে।

এ হেন প্রয়াগ তীর্থে, এমন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে যে ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডনে কুণ্ঠিত হয়, তাহার পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ, ইহকালের অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ, সকাল সকাল এ ভবজ্বালা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাহার মঙ্গল।

সৎ পরামর্শ।

ফাঁসি দিবার জন্য বৃন্দাবনকে মশানে লইয়া যাইতেছে। আর ফাঁসী দেখিবার জন্য দলে দলে লোক দৌড়িতেছে। একদল লোককে ডাকিয়া বৃন্দাবন বলিল—"ভাই সকল, কেন ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছ? আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত কোনও কাজই ত হইবে না।"

আশার অতিরিক্ত।

পিতা। (পুত্রকে) কেমন, আজ তোমাদের স্কুলে ওঠা ওঠি হ'ল না? তোমাদের ক্লাসের ক'জন উঠল? তুমি উঠেছ তো?

পুত্র। (সহর্ষে) আজকে কারুই উঠতে বাকী নাই, স্কুল শুদ্ধ উঠে গ্যাছে, আর পড়া ক'রতে হ'বে না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত।

শিক্ষক। তাপের গুণ এই যে, তাহাতে পদার্থের সম্প্রসারণ হয়, অর্থাৎ পদার্থের আয়তন বাড়ে। শৈত্যের গুণ ইহার বিপরীত, শীতে পদার্থ সঙ্কুচিত অর্থাৎ ছোট হইয়া যায়।—বুঝিতে পারিলে ত?

ছাত্র। আজ্ঞে, বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দাও দেখি?

ছাত্র। এই যেমন—দিন। গ্রীষ্ম কালে বাড়ে, আর শীতকালে ছোট হয়।

এডুকেশন গেজেটে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে;—

"এক জন সুবিজ্ঞ ইংরাজিতে এণ্ট্রান্স পাস, বাঙ্গালা, পারসীতে উত্তম পারদর্শী ও আইন উত্তমরূপ জানা আবশ্যক, এরূপ এক জন লোকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৮ টাকা। ইহার সবিশেষ জেলা নদীয়ার মহকুমা রাণাঘাটের চাকদহ থানার অধীন কাজিপাড়া গ্রামে মুন্সী রওসন আলি সাহেবের বাটীতে আসিলে জানিতে পারিবেন। কার্য্য দেওয়ানি, সত্ত্ব জমিদারী বন্দোবস্ত, মোকদ্দমা মামলাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে।"

আট টাকা মাহিনাতে আপত্তি নাই। খুটের পয়সা খরচ করিয়া কাজিপাড়া যাইতেও আপত্তি নাই; কিন্তু এ কর্ম্মের যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে কি না, পঞ্চানন্দ তাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন! এডুকেশন গেজেটের উচিত, যেমন কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপিয়াছেন, তেমনি কর্ম্মে ভর্ত্তির একটা বিজ্ঞাপনও তিনি বাহির করেন।

তিনি কে?

নূতন ঝি চুরি করে, চোরের শর তুলে খায়, বামুন ঠাকরুণ এই কথা গিন্নীকে ব'লে দিলে গিন্নী আবার কর্ত্তাকে তাই জানাইলেন। কর্ত্তা বাবু বড় ধাৰ্ম্মিক, হঠাৎ ঝীকে কিছু না ব'লে, এক দিন রান্নাঘরে তাকে হাতে-পাতে ধ'রে ফেল্লেন, ফেলে ব'ল্লেন—"দেখ পাপীয়সি! তুই এই চুরি ক'রে, শুধু যে আমার অনিষ্ট কর্‌ছিস তা' নয়; যাঁর সম্মুখে আমিও কীটানুকীট, এমন এক জন উপরে আছেন, তাঁর কাছেও তোর ঘোর অপরাধ হচ্ছে। তুই জানিস্, তিনি কে?"

ঝী থত-মত খেয়ে বল্লে—"আজ্ঞে জানি,—তিনি বড় মাগিন্নী।

বুঝিবার ভুল।

খোলা ভাটি হওয়াতে অনেকে রাগ বিরাগ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু খোলা ভাটি হওয়াটা সুলক্ষণ। এখন নাকি যকৃতের দৌরাত্ম্যে ভদ্রলোকে মদ খাওয়া

ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই জন্য সরকার বাহাদুর সাধারণ লোকের মনে মদের উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মদ যেমন উত্তেজক, তেমনি অবসাদক; প্রথম প্রথম দিন কতক মদ-মাতালের বাড়াবাড়ি হইবে বটে, কিন্তু আখেরে আর কিছুই থাকিবে না। সরকার বাহাদুর সার বুঝিয়াছেন যে, মদ না খাইলে মদের দোষ জানা যায় না। দুঃখের বিষয় যে, পোড়া লোকে এটা বুঝিতেছে না।

প্রকৃত কারণ।

অনেকে মনে করিয়া থাকে যে, মদের দোকান অধিক হওয়াতেই মাতলামি বাড়িতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়।

সরকার বাহাদুরের অনুমতি না লইয়া কেহ কেহ না কি মদ বিক্রয় করে, তাই আবকারীর একটা নিয়ম আছে যে, মদ ধরিতে পারিলে, যে ধরে তাহাকে বক্‌শিস দেওয়া যায়! এই বক্‌শিসের লোভে অনেকে চুপি চুপি মদ ধরে। বক্‌শিস পাউক আর না পাউক, ধরিলে আর কেহ ছাড়িতে পারে না। ইহাই মাতলামি বাড়িবার প্রকৃত কারণ।

প্রভুভক্ত ভৃত্য।

সাহেব (রাগত হইয়া খানশামাকে)——

"শূয়রকা বাচ্চা———"

খানশামা (যোড়হাত করিয়া বলিল),———

——"হুজুর মা বাপ, সব বল্‌তে পারেন।"

তা তো যথার্থ।

রামমণি পঞ্চাশ বৎসরের বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা, পীড়ায় শয্যাগত; বড়ই কাহিল, নিতান্ত ক্ষীণ, তাহাতে আজি আবার একাদশী। রামমণির আত্মীয়বর্গের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। কি করে, বিব্রত হইয়া গোবর্দ্ধন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

গোবর্দ্ধন ডাক্তার রামমণির বুক ঠুকিয়া প্রথমতঃ পঞ্জর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন, জিহ্বা টানিয়া প্রাণ চমকাইয়া দিলেন, ঘড়িতে নাড়ী দেখিলেন, তার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—দোয়াত কলম, কাগজ।

রামমণির এক জন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিল—বাবু দেখলেন কেমন? তীরস্থ করবার ব্যবস্থা করা যায় কি?

গোবর্দ্ধন ডাক্তার তীরস্থের খবর জানেন না। রোগীর অবস্থা খারাপ, উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—৪ ঔন্স ব্রাণ্ডী আধ ঘণ্টা অন্তর ছ বার। সঙ্গে সঙ্গে পথ্য মুর্গীর সুরুয়া; বীফ্-টি হইলে আরো ভালো।

"সে কি মহাশয়! বামুনের বিধবা যে? তায় আজ আবার একাদশী!"

"আমি তার কি করব বলো?" পুস্তকে বয়োভেদে ঔষধের মাত্রা-ভেদের কথা আছে; কিন্তু ধর্ম্মভেদ, তিথি-ভেদের কথা কিছু তো নাই। তোমাদের মনোমত না হয়, আমার বিজিট দাও, চলিয়া যাইতেছি। আমি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অমনোযোগ করি নাই, এই আমার সুখ।

গদাধর একটু গোঁয়ার গোছ। এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"মেজো কাকা, ঠাকুরমার যা হবার হবে। এখন, আগে এই গোবরা বেটাকেই তীরস্থ করা যাক্। কি বলেন?

কলির শুভঙ্কর।

কদমতলার বংশীধর দত্ত গত জনসংখ্যা উপলক্ষে আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পরিচয় লিখিতেছিলেন। স্ত্রীর বয়স লিখিলেন কুড়ি বৎসর।

একজন প্রতিবেশী সেইখানে বসিয়া ছিলেন, 'দত্ত-দা, উপিনের বয়সই যে কুড়ির কাছাকাছি!' উপিন দত্ত মহাশয়ের পুত্র।

বংশীধর বলিল—"তা হোক ভায়া, কিন্তু স্ত্রীর বয়সে আমার ভুল হবার যো নাই। আঠারো বছরে আমার বিয়ে হয়, তখন তাঁর বয়স ন বচ্ছর, প্রায় আধাআধি। এখন আমার ঠিক চল্লিশ, দেখ্‌ছ না?"

আর একটুকু।

কতকগুলি ব্রাহ্ম "ভ্রাতা" প্রস্তাব করিতেছেন যে, মৃতদেহ পোড়াইলে আত্মার অতিশয় যন্ত্রণা হয়, অতএব না পোড়াইয়া গোর দিবার নিয়ম প্রচলিত হউক।

প্রস্তাব অতি সৎ এবং সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পঞ্চানন্দ ইহাতে সম্মত আছেন। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে "ভ্রাতা" সকলকে পুঁতিতে পারিলে আরও ভালো হয়। কেননা, তাহা হইলে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির পক্ষে আর সংশয় থাকিবে না।

ছেলে ভুলানো উত্তর।

কচু। (যাহার মামা বিলাতে পাশ দিয়া আসিয়াছে)—হাঁ বাবা, মামা অত ক'রে, রাত দিন মুখে সাবান মাখে কেন? আগে ত এ সব ক'রত না।

কচুর বাপ। হাবা ছেলে, এও জানিস নে? তা নইলে "উদ্ধারের কলঙ্ক যাবে কিসে?"

আইনের উপদেশ।

ছাত্র। একজন সামান্য বাঙ্গালীও আপনার গলায় আপনি দড়ী দিয়া মরিতে চেষ্টা করিলেও কেন যে তাহার দণ্ড হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

অধ্যাপক। এ আর বুঝিলে না? আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে যে রাজদ্রোহিতার লক্ষণ দেখা যায়, সেই জন্য।

ছাত্র। কিসে?

অধ্যাপক। সকল লোককেই ফাঁসি দিবার অধিকার রাজার, তাই কেহ যদি আপনার গলায় আপনি ফাঁসি দিতে যায়, তাহা হইলে সে স্পষ্টত রাজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, সুতরাং বিদ্রোহী।

নব বিধান।

(ভাবশুদ্ধি ও অনুপ্রাসচ্ছটা)

১। ব্রহ্ম-মদে মাতিল মুঙ্গের।

২। ব্রহ্ম-গাঁজায় গাঁজিল গাজিপুর।

৩। ব্রহ্ম-চরসে চৌরস চট্টগ্রাম।

৪। ব্রহ্মাফিঙে ফাঁপিল ফতেগড়।

৫। ব্রহ্ম-গুলিতে গলিল গারো দেশ।

৬। ব্রহ্ম-চণ্ডুতে চেতিল চাণক।

৭। ব্রহ্ম-ভাঙ্গে ভোর ভাগলপুর।

৮। ব্রহ্ম-তামাকে তবু হইল তমলুক।

৯। ব্রহ্ম-চাটে চকিত চাটমোহর।

শক্ত সওয়াল।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে অনেক বাঙ্গালী ধুমধামের সহিত পিটে খায়, আর নাম দেয় "পৌষপার্ব্বণ।" বঙ্গবাসী তো প্রায়ই খায় না, বারো মাসই অকাতরে পিটে খায়, তবে পার্ব্বণ বলে না কেন?

কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ; এও কি তাই নাকি? পার্ব্বণ নামে একটা ধুমধামের শ্রাদ্ধ আছে, সেইটা মনে করিয়াই পৌষপার্ব্বণ বলে? অথবা এমন হইতে পারে কি না, যে, পৌষমাসে সকলকার ঘরে চারটি চারটি ধান হয়, বছরের মধ্যে একবার পেট ভরিয়া খাইবার যোগাড় হয়, তাই শ্লেষ করিয়া সেই দিন পিটে খাওয়া বলে?

ক্রম নং ৫০। এক মাসে উত্তর দিতে হইবে।

বিনাশ নয়, নাশ।

ব্রাণ্ডী জমাইয়া এক জন ফরাসী ব্রাণ্ডীর ডেলা তৈয়ার করিতেছে। যাঁহারা মদের বিনাশ হইবে মনে করিতেন, তাঁহারা এখন দেখিবেন যে, মাতালেরা মদের নাশ করিতেছে। অহো!

সারগ্রাহী বাবুর গুণগ্রাহিতা।

কালেক্টারীর ঘর মেরামত হইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ি, বড় বড় কাপ-কলের সাহায্যে তোলা হইতেছে, কত কুলী মজুর খাটিতেছে। একজন সাহেব-কুলীও সে সঙ্গে খাটিতেছে এবং কালো কুলীদের খাটাইতেছে।

বাঙ্গালী বাবু—বেলা হইয়াছে, আফিস যাইবার তাড়া—সেইখান দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছেন। সেই সাহেব-কুলী বাঙ্গালী বাবুকে ধাক্কা দিয়া সে পথ হইতে সরাইয়া দিল, মুখে বলিল—"ড্যাম শালা নিগর, বাঞ্চট মরিয়া যাবি, আর বলিবি কি সাহেব আমার পিলা ফেটিয়ে দিলে।"

কথাটি না কহিয়া রাজভক্ত, প্রভুভক্ত বাঙ্গালী বাবু আপন গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেলেন। কতক দূর গিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সাহেব তখন অনেক দূরে পড়িয়াছে। তখন আর একবার দাঁড়াইয়া, খুব আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বাঙ্গালী বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"সাহেব ত খাশা বাঙ্গালা শিখেছে।"

সন্ধান।

"এখন রাজা কোথায় হে?"

"চিড়িয়া খানায় গ্যাছেন।"

"সেখানে এখন কেন?"

"কি একটা জানোয়ার পালিয়ে গিয়েছে, সেই জন্যে।"

"শিগ্‌গির ফিরবেন ত?"

"সন্ধান না হ'লে ত নয়।"

সরল বিজ্ঞাপন।

১। আমি একখানি কাগজ বাহির করিব, কেননা সম্প্রতি আমি বেকার।

২। অন্য অন্য কাগজে যে কথা থাকে, আমার কাগজে ঠিক তাই থাকিবে। সেই রাজনীতি, সেই সমাজনীতি, সেই সুনীতি, সেই দুর্নীতি, সেই ইতিহাস, সেই পরিহাস, সেই কাব্য, সেই গদ্য ইত্যাদি। বেশী কিছু দিতে পারিলে দিতাম, কিন্তু সামর্থ্য নাই; কম দেওয়া অনেক জায়গায় দরকার, কিন্তু আমার সে সাহস নাই।

৩। বাঙ্গালা লেখা আমার খুব অভ্যাস আছে। অপর কাগজের জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতাম, কিন্তু সম্পাদক বাবুরা আমার লেখা পছন্দ করিতেন না, ফেলিয়া দিতেন। সেই আক্রোশেই, আমি নিজের কাগজ বাহির করিতে চাই।

৪। আমার কাগজে বাঙ্গালার কোনও উপকার হইবে না, তাহা জানি। আমার উপকার হইবে না, তাহাও মানি। কিন্তু তবু একখানি কাগজ আমি বাহির করিব। আর দশ জনে করিয়াছে, আমিও করিব।

৫। বাঙ্গলা কাগজ কেহ পড়ে না। এই আমার বিশ্বাস, আমি নিজে নিশ্চয়ই পড়ি না। বাঙ্গালা কাগজের কোনও একটা বিশেষ মত আছে, এমন ধারণা আমার নাই। আমারও কোনও বিষয়ে কোনও একটা স্থির মত নাই। সেই সাহসেই আমি কাগজ বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছি।

৬। এখন বড় কম দামে কাগজ পাওয়া যাইতেছে, আমিও কম দামে দিব। আমার লাভের প্রত্যাশা নাই সত্য, অন্তেত মাটী হইবে।

৭। যত এম্-এ,-বি-এল্ ইংরেজীতে চিঠি লেখেন, আর দো-আঁশলা কথা কন, সকলেই আমার কাগজে লিখিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। দুই কারণে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা গেল না।—এক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁজীতে তাঁহাদের নাম ছাবা আছে; দ্বিতীয়, আমার কাগজে লেখার বিষয়ে কাহারও সহিত আমার কোনও কথা হয় নাই। শুদ্ধ সাধারণ প্রথার অনুরোধে, এ কথাটা আমি প্রকাশ করিলাম।

৮। দু হাজার গ্রাহক অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিলেই কাগজের নাম এবং আমার নাম এবং অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করিব।

ব্যবস্থার অতিরিক্ত।

বিলাত-ফেরত ছেলেকে জাতিতে উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র পিতা অধ্যাপকের ব্যবস্থা আনাইলেন; ছেলেকে বলিলেন,—"বাকী সব টাকায় হবে; কিন্তু বাপু, তোমায় যে একটু গোবর খেতে হবে।" ছেলে জনষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায়-দর্শনে পরম পণ্ডিত। বিনয়ের সহিত উত্তর দিল,—"আমার উদরেই বিস্তর গো-বর, আবার কেন?" প্রায়শ্চিত্ত আর হইল না।

শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন্দ ঠাকুরেষু।

ঠাকুর আপ্নি বেরুলেন, আমি বাঁচলুম। আপনাকে না দেক্তে পেয়ে আমার যে কি হোচ্ছিল, তা আর কি বোল্‌বো। মাজে মাজে আমার মনে যে খট্‌কা ওটে, তা নাকি আপনি নৈলে কেউ মাস্তে পারে না, তাই ন্যাত দুশ্চিন্তে। যোদো যা হয়েচে শুনুন।

সেদিন আলখোট্টা (১) সাহেব বোলে গ্যালেন যে, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব"—(অর্থাৎ যদি কিছু বুজে থাকি)—"খুব উচিত, আর সেই ভাব যাতে বাড়ে, তাই করা উচিত।"

ভালো এর কি এই মানে যে, সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই ভাব্বে? তা যদি হয়, তা হোলে ত ভারি গোল। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—এই যে ন্যাক্‌টা কতা আচে, তা কি উটে যাবে নাকি? আর এই শালা ভগ্নিপোৎ, বাপ ব্যাটা, মামা পিশে এই রকম যত সম্পক্ক আচে, তাও উটিয়ে দিতে হবে নাকি? হয় হোক ভ্রাতৃভাব, কিন্তু এসব নৈলে তো সংসার চোলবে না, তাই আপ্নাকে জিগ্‌গেশ কোচ্চি।

আপ্ন্যার চিরন্তনের শিশোঃ

শ্রীবোদে।

[আমার দ্বারা সমস্যার পূরণ হইবে না। পূর্ব্বেও এ হুজুক অনেক বার উঠিয়াছিল, চাপ চুপি দিবিয়াও গিয়াছিল। বোদের যদি নিতান্ত আগ্রহ হয়, শ্রীমতী বলবৎসখীকে (২) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শ্রীপঞ্চানন্দ।]

---

(১) থিয়সফিপ্রবর্ত্তক কর্ণেল আলকট।

(২) এদেশে থিয়সফি প্রবর্ত্তন কারিণী ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি।

বৈবাহিক রহস্য।

একটা নিবেদন।

মালথাসের (১) কথা ঠিক হউক আর না হউক, তোমায় ত কিছু বলি নি; তুমি যখন বু ঝেছ, তার হাতের গোড়ায় এমন দাঁও পেয়েছ, তখন ছাড়বে না, তা ত নিশ্চয়। তুমি বিয়ে কত্তে হয় করো, কিন্তু তাই বোলে মালথাসের কথা তুলেই তোমায় পিঠ পেতে নিতে হবে, তা কে বোল্লে?

নূতন সংবাদ।

ভারতবর্ষের লোক বড় মিথ্যাবাদী। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, ইহারা উভয় পক্ষে বিপরীত উক্তি করে, আর আপন আপন পক্ষে পোষক প্রমাণ দেয়। বিলাতি সকল মোকদ্দমাই একতরফা হয়, মিথ্যা কথা কাহাকে বলে, বিলাতের সাহেবেরা জানেন না; তাঁহারা এ দেশে আসিয়া শিক্ষা করেন।

প্রশস্ত অনুবাদ।

একজন বড় লোকের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। আর দশকথার পর বক্তা বলিলেন—"He did good by stealth"—তখন ঘোর রবে করতালি হইল। একজন নিরেট বাঙ্গালী বক্তৃতা শুনিবার ছলে বক্তার হাত পা নাড়া দেখিতেছিল, এবং চসমা চক্ষে, ফুল ষ্টকিং পায়ে একটী বাবুর কুনুইএর গুঁতো ভক্ষণ করিতেছিল। করতালির ধ্বনিতে বাঙ্গালী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বক্তা কি বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিল। বাবু বুঝাইয়া দিলেন—"তিনি চুরি করিয়া ভাল করিয়াছিলেন

গোয়ালা জব্দ।

যাহারা কিনিয়া খায়, তাহারা প্রায় কখনই নির্জ্জলা দুধ পায় না; অথচ গোয়ালারা জল দেওয়াও স্বীকার করে না, দামও বেশী লয়। জল দেওয়া ধরিবার জন্য অনেকে অনেক উপায় সময়ে সময়ে স্থির করেন, এমন কি, এই নিমিত্ত একটা কল পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। দুধওয়ালারা এমনি ধূর্ত্ত যে, কলের উপরেও তাহারা হিক্মত চালায়। আমরা এই জন্য এক অতি সহজ

---

(১) ম্যালথস্ (Malthus), যিনি জগতে জনসংখ্যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিকূলে প্রবন্ধাদি লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

উপায় স্থির করিয়াছি, ইহাতে ব্যয় নাই, অথচ পরীক্ষা নিঃসন্দেহ। যাহার নিকট দুধের যোগান লওয়া হয়, দোহনের অগ্রে তাহার বাটীর পার্শে আড়ি পাতিয়া থাকিয়া, সে যখন জল মিশ্রিত করে, তখন খপ্ করিয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরা!

সাধারণের উপকার হইবে জানিয়া আমরা আমাদের নবাবিষ্কৃত এই প্রক্রিয়া গোপন করত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলাম না।

বেখরচা উপদেশ।

যাহাদের চাকর বাজারের পয়সা চুরি করিয়া উত্যক্ত করে, তাঁহারা অতঃপর চাকর রাখিবেন না। নিজে বাজার করিলেই চুরির সম্ভাবনা খুব অল্প হইবে।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী।

"সাধারণী" মধ্যে মধ্যে ভারতবাসীকে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। পঞ্চানন্দের তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে—জয়েণ্ট কোম্পানীর না হইলে ভারতমাতার গঙ্গালাভ হইবে না।

জ্ঞানের পূর্ণ মাত্রা।

অন্ধকার রাত্রিতে এক ব্যক্তি পচা নর্দ্দমায় পড়িয়া গিয়া, উঠিবার জন্য যত যত্ন করে, সব বিফল হইয়া যায়। এমন সময়ে সার্জ্জন সাহেব সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন হ্যায়?

উত্তর হইল—"আমি ভ্রাতা।"

প্রশ্ন। "ক্যা হোটা হ্যায়?"

উত্তর। "অমৃতবাজার পত্রিকা" পাঠ হচ্চে।

সঙ্গত প্রার্থনা।

নরহত্যা অপরাধে এক ব্যক্তির বিচার সমাপন করিয়া বিচারপতি বলিলেন,—"তোমার অপরাধের নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়াছে; তোমার শেখা উচিত যে, নরহত্যা ভয়ঙ্কর পাপ, সেই জন্য আমি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলাম।"

অপরাধী যোড়হস্তে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, ফাঁসি দেবেন না, ফাঁসি দিলে একেবারে মরে যাব, কিছুই শিখ্‌তে পার্‌ব না।"

শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ।

ননীরাম। (শিক্ষকের প্রতি)—আপনার হাতে ছেলেটী অর্পণ করেছি, কিছু হ'বে ত?

শিক্ষক। হবে না, সে কি কথা? কত কত গাধা পিটে মানুষ করা গেল, আর এমন ছেলের হ'বে না? তুমিও ত আমারই ছাত্র।

বহুদর্শিতার অভাব।

বাবু। (হাসিতে হাসিতে পাচক ব্রাহ্মণের প্রতি) হ্যাঁ হে চক্রবর্ত্তী, তুমি নাকি বাঁদর দেখনি? আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ বাঁদর। এবারে যখন আমাদের বাড়ী যাবে, তখন তোমাকে সেই দলে ছেড়ে দেব, যত ইচ্ছা দেখবে।

চক্র। আজ্ঞে, আপনার অনুগ্রহে দেখিনি এমন নয়, তবে, আপনার মত দেখিনি।

প্রশ্ন।

"বালকবন্ধু" বলেন, পেত্নিনী নাই। কেন, বালকবন্ধুর কি স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে?

উত্তর।

"তুমি কি ভূত মান না?"

"আগে মানতাম না বটে; কিন্তু তোমার কথা যে অবধি শুনেছি সেই অবধি মানি।"

উকীল চিনিবার উপায়।

রেলের গাড়ীতে মলিনমুখ ভদ্রসন্তান দেখিলে জিজ্ঞাসা করিবে, "মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?" তোমার প্রশ্নে যে বিরক্ত হইবে, নিশ্চিত জানিবে, সে উকীল।

বিষম সমস্যা।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় সাড়ে চারিটের গাড়ী কতক্ষণে ছাড়ে?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিলেন—"ঠিক চারিটে ত্রিশ মিনিটের সময়ে।"

"রক্ষা পেলেম! তবে এখনও সময় আছে।"

বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে—
দোষের মক্ষিকা যেন সবটুকু ছেড়ে,
ক্ষতটুকু খুঁজে স্থান আগে গিয়ে ছেড়ে,
"র‍্যাকেল" যথা ছবিগুলি ঘরে দোরে আঁটা
কার গুণে তা, ভাবেন না কো মেয়েদের খোঁটা,
খেলায় বীরত্ব যত চোটের চাপড়ে,
হাকাহাঁকি ডাকাডাকি যেন ডাকাত পড়ে।
আয়েসে দেমাক তার তামাক অম্বুরি,
একসা নম্বর এক, সাম্পেন শেরি,
কার জন্যে হাঁড়ি কালো করবে রেঁধে বলো?
জুতা টুপি অঙ্গে ওঠে তা' নয় কি ভালো?
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুখের সাপট,
চৌদ্দতে মিলে না তবু পদ্যের দাপট,
বাঙালী বাবুর ঘোড়া কোথা গেলে মেলে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর ছেলে—
অধরে মধুর হাসি, বাঁশরী বাজায়,
থাকে থাকে নিধুগান ঝিঁঝিঁটেতে গায়!
ছাঁচি মুখে কচি দাড়ি, গোঁফের বাহার,
দেখুক যে আঁখি ধরে বঙ্গের মাঝার।
রাত জেগে বসা বসা রক্তিম নয়ন,
মোটা মোটা যোড়া ভুরু তাহে সুশোভন।
যায় যায়, ফিরে চায়, কিভাবে কি ভাবে,
বিষণ্ণ প্রসন্ন মুখ অন্নের অভাবে,
কাব্যে তবু নব্য বাবু রসে আই-ঢাই,
হায় রে, মেয়ের লাজ পুরুষের নাই।
চক্ষু যদি থাকে, তবে দেখো চক্ষু মেলে—
"বাঙালীর মেয়ে" আর "বাঙালীর ছেলে"।

ডাক-হরকরা।

(১)

দ্বিপদ বলদ তুমি ডাক-হরকরা!
না দিলা বিধি পাখাপ,
সেই হেতু শিরত্রাণ,
পাগড়ীর রূপ ধরি ভ্রমিতেছ ধরা।
নরবেশে পশু তুমি ডাক-হরকরা।

(২)

অশ্বলোম তনু দেখি ভ্রম পাছে হয়,
তাই এত জামা জোড়া
দিয়া ও শ্রীঅঙ্গ মোড়া;
পুচ্ছাভাব তুচ্ছ, যা'র চাপকান রয়।
জুতায় খুরের কাজ কিবা নাহি হয়?

(৩)

নিয়মিত চক্রে নিত্য ঘুরে ঘুরে মরো;
নাই বটে চক্ষে ঠুলি,
কিন্তু কভু চক্ষু খুলি
না দেখিলে এক দিন কার কাজ করো;
তেল খোল তুল্য জ্ঞানে শুধু ঘুরে মরো।

(৪)

পশু তুমি, তাই এত বিশ্বাসভাজন;
রাজদ্রোহী রাজভক্ত
সমভাবে অনুরক্ত
তোমা প্রতি, অবিশ্বাসী নহে কোন জন।
মানুষে মানুষে এত নাই প্রিয়জন।

(৫)

তব তুল্য ভারসহ কে আছে জগতে!
জগতের বার্ত্তা যত
তব পৃষ্ঠে অবিরত,
তবু কিন্তু তুমি শ্রান্ত নহ কোন মতে।
অকাতরে দণ্ড তার, যা'র যা' জগতে।

(৬)

জানো না কি তায় তুমি বেড়াও বহিয়া
কত বিরহিণী-ব্যথা,
কতই স্নেহের কথা,
কত আশালতা ছিন্ন করো, না জানিয়া,
কি আশীষ, কিবা গালি, সমানে টানিয়া।

(৭)

ঘৃণা নাই, নাই লজ্জা, যাও ধীরে ধীরে;
যে আজে বাঙ্গালা-মরা
মাটী-হ'ল বসুন্ধরা
সেই সে বঙ্গের কাব্য কুলকামিনীরে,
দাও, পশু, নিতি নিতি, নাহি যাও ফিরে।

(৮)

চাকরির দরখাস্ত, বরখাস্ত আদি,
যার তরে এই বঙ্গে
নাচে সবে নানা রঙ্গে
দিয়া যাও, নিয়া এস, তুমি নির্ব্বিবাদী;
আপদ্, সম্পদ্ যত, তুমি তার আদি।

(৯)

কিন্তু নাহি দোষ তব, হে বাহনবর,
পর-সেবা যা'র কর্ম্ম,
এমনি তাহার ধর্ম্ম,
পশুর অধম সেই, হইলেও নর।
সুখে থাকো শুভ হউক দিতেছি এ বর।

(১০)

এক অনুরোধ রাখি, রাখিবে হে মান,
যা'র বাড়ী যবে যাবে
সুধাবে কোমল ভাবে,
শঙ্কানন্দ সেথা পূজা পান কি না পান?
নহিলে, চাপাবে ঘাড়ে, বিতরিতে, জ্ঞান।

বিজ্ঞাপন।

সন্ন্যাসিদত্ত মহৌষধ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যচূর্ণ। [এক পরম কারুণিক পরমহংস হইতে প্রাপ্ত।]

অনেকে এই ঔষধ সেবন করিয়া মস্তিষ্কের কঠিন কঠিন পীড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে বাত, দাঁতের পোকা, শিকতামুষ্টি, পবননন্দন জ্বর, অর্শরোগ প্রভৃতি নিবারণ হয়।

মূল্য বড় বোতল	২৲টাকা
মফস্বলে	আড়াই টাকা

সা-কোম্পানীর দোকানে এবং প্রায় সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যাঁহাদের আত্মীয়বর্গ এই ঔষধ সেবনে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত আছে।

গবর্ণমেণ্টের পেটেণ্ট লওয়া হয়, ভেদ নাই, ছিপির উপর নাম দেখিয়া লইবেন।

চিড়িয়াখানা।

গাও দেখি, সরস্বতি! লক্ষ্মী মা আমার,
আবার মোহন গান, মোহি জগজ্জনে
আপনার গুণপণা প্রকাশো আপনি
সদয়া হইয়া দীনে, চক্ষুদান দিয়া
ঘুচাও আঁধার-ধাঁধা, দেখুক সকলে
—অমল মুকুরে যেন—আঁখি বিস্ফারিয়া,
বিকাশি' দশনপাঁতি, কুঞ্চিত কপোলে,
ভবের চিড়িয়াখানা। সঙ্গীত-সাগরে
রঙ্গের তরঙ্গে তুলি, অঙ্গ ডুবাইয়া
স্যাটিক্ লবণ-রসে, ভাসাও বাঙ্গালা।
সুজনে করিয়া সুখী, কালামুখে কালি
ঢালো দেখি ভাল বাসো যদি গো ভকতে,
ভগবতি! কহ দেখি, করি অনুরোধ
ধরিয়া চরণ-যুগ, বিচরে কেমনে
হৃষ্টমনে, ভূতভাব বিস্মরণ করি,
অদ্ভুত অপূর্ব্ব জন্তু কত মোহ-রোধে।

অভ্যর্থ-সেবায় তুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট তনু
যতেক ইতর জন্তু, কোন্ মন্ত্রবলে
আস্ফালে সিংহাদি সনে সাহঙ্কার মনে ?
বাঘানি' চিড়িয়াখানা, বালক-দলনি,
মুরুখ-পালিনি, দেবি, শিখাও সকলে
মুড়ি-মিছরি একদর হইল কেমনে।

স্যর্ রিচার্ড টেম্পল্।

(পার্লামেণ্টের মেম্বর হইতে না পারিয়া)

(একাকী)

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে !
লঙ্ঘিয়া সাগর শুধু, লাভ মাত্র পোড়া মুখ,
দেখাব কেমনে ?
শুখাইল সব আশা, বাড়িল কেবল তৃষা,
মশা না মরিল, শুধু গালে চড়—একি দায় !
বাকী কি রাখিলি মন, প্রয়োজন অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
সরলতা সত্য কথা, মুহূর্তের তরে স্থান
পায় নাই চিত্তে।
সাধিলি রে কত ছলে, তোষিতে উভয় দলে,
সকলি বিফল হ'ল পরাণ ধরি কেমনে ?
রাজ্যপদ ছিল হায়, রাজটীকা ছিল ভালে,
লক্ষের টোপর।
কু-আশায় সব ছেড়ে, শেষে কি এ বিষ-ফোড়া
গোদের উপর !
হায় রে শ্মশান-ক্ষেত্র, এই কি দেশের মিত্র ?
ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট শেষে কি ছিল কপালে !

ঘোমটা-রহস্য।

দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
তাই বিধি রাখে সুধা চাঁদে লুকাইয়া॥
সে চাঁদ দেখিয়া রাহু আসে গরাসিতে'
পলায় বিধুরে ল'য়ে বিধি ধরণীতে॥
আকাশে কলঙ্কী শশী ছলনার তরে।
সুধাকরে লয়ে' পশে বাঙ্গালীর ঘরে॥
রমণীর মুখে চাঁদে যতনে রাখিয়া।
সসম্ভ্রমে দেয় বিধি বসন ঝাঁপিয়া॥
সুধায় বাসনা যদি, যদি সুধাকরে।
ঘোমটায় চাঁদমুখ ঢাকিবে আদরে॥
তুলোনা তুলোনা, বালা, ঘোমটা তুলোনা।
তুলিলে, কলঙ্ক হ'বে চাঁদের তুলনা॥

ভারতবাসীর গান।

(মূলতান—জলদ আড়খেমটা।)

এবার লিবারাল রাজা হয়েছে।
লাঠির চোটে, লিটন লাটে, ভারত-ছাড়া করেছে।
দুঃখনিশি হ'ল ভোর,
ভাঙো হে ঘুমের ঘোর,
লে রিপন, সুখের স্বপন, সফল হ'বে—
এ যে গাছে দাগা রয়েছে॥
আর দিতে হ'বে না কর,
টাকাতে পূরিবে ঘর,
গিন্নীর গায়ে গয়না দিয়ে প্রাণ জুড়াবে,
ভাগ্যের পাতা উড়ে গিয়েছে॥
ন আইন রবে না আর,
হাতে পাবে হাতিয়ার,
পিয়ে সীধু, গাইবে নিধু, আর কে পায়,
সুখের "মিজিনিয়ম" এসেছে॥

কালাপানি কেউ না ছোঁবে,
ধাড়ি ছানা সিবিল্ হ'বে
ঘরে বসে, নিজ বশে, হায় রে হায়,
ভবের বাঁধন এবার ছিঁড়েছে।
চলবে না আর রাজ্যতন্ত্র,
না নিলে বাঙ্গালীর মন্ত্র,
ক'রতে বিধি, প্রতিনিধি সভা হ'বে,
তাইতে লালু সেথা রয়েছে॥

——র কেত্তন।

[এটুকু ঠাট্টা নয়]

রাম নাচে, লক্ষ্মণ নাচে, নাচে হনুমান।
তার চারিদিকে নাচে হিন্দু মুসলমান॥
বাবু নাচে, বিবি নাচে, নাচে নেড়া নেড়ী।
খোশখেয়ালী খেমটাওয়ালী নাচে বাড়ী বাড়ী॥
ঈশা নাচে, মুসা নাচে, নাচে পেগম্বর।
তাই দেখে, স্বর্গে থেকে নাচে হরিহর॥
কেশব নাচে, প্রতাপ নাচে, নাচে ধর্ম্মতত্ত্ব।
দেখাদেখি, 'মিরার' নাচে হইয়া উন্মত্ত॥
চল্‌গো যারা প্রেমের গোঁড়া নাচ দেখ্‌বি চল্।
পঞ্চানন্দ নেচে বলে,—হরি হরি বল্॥

একা।

(গোবিন্দের সুর—গড়খেমটা তাল।)

বিঘোরে বিহারে চড়িনু একা।
লাগে—ধুব ধাব তায়, বিষম ধাক্কা।
আহা—রোদে চাঁদি ফাটে, ধুলা ঢুকে পেটে,
সাজ গোজ তার এমনি পাকা।
তায়—আঁকা বাঁকা গলি, বেগে যেতে চলি,
কায়া-মায়া যদি ছাড়য় চাকা,

তবে—নর্দ্দমায় পড়ি, তাবে গড়াগড়ি,
আঁখি মুদে হেরি মদিনা মক্কা।
তায়—ছুল্‌কী গমনে, ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনে,
বাজে করতাল ঘুঙুর টেক্কা,
করে—কাণ ঝালা পালা, প্রাণ পালা পালা,
চৈত মাসে যেন গাজনে ঢক্কা।
[যদি বল তার রূপ কেমন, তবে শ্রবণ কর।]
কিবা—বাঁকা ছুটী বাঁশ, শোভে ছুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলি ফক্কা,
দেয়—পাতা লতা দিয়ে, আসন গড়িয়ে,
ছেঁড়ে যদি পথে অমনি অক্কা।
দিয়ে—লাল কালো সাদা, আশমানী জরদা,
জোড়ভুরী এক বুনয় ছাঁকা,
আহা—অশ্বিনীনন্দন, তাহে বাঁধা র'ন,
প্রাণ করে তার পক্কা-ছক্কা।

ষ্ট্রাচি-বিদায় কাব্য।

"Sir John Strachey will pass away unwept, uuhonoured, and unsung."—

—"Times of India."

পঞ্চানন্দ বলিতেছেন—"This cannot, must not, be"— অতএব, ষ্ট্রাচি-বিদায় কাব্য।

[১]

সচিবের মণি, ধনস্থানে শনি,
ভারতের তুমি ছিলে হে।
পুড়িয়ে ভারতে, পরতে পরতে,
খুব বলিহারি নিলে হে।
গুডকর-অরি, তাকে কারিগিরি,
দেখাইলে, গুণধাম হে।
ভালো শিখেছিলে, পরখ দেখালে,
অবতার ঢেঁকিরাম হে।

[২]

আধ নটবর, আধ ভোজা হর,
লিটন যখন ছিলেন লাট।
লীলা-খেলা যত, ছিল মনোমত,
করে' নিয়েছিলে, ভূতের হাট॥
দেশে হাহাকার, লোক শবাকার,
ভারত-শ্মশানে হানিয়ে বাজ।
হেথা দলাদলি, হোথা ঢলাঢলি,
নাগরালি ছিল রাজার কাজ॥
তুমি ধ'রে হাল, ডিঙী বানচাল,
ভারতের ধন ভাসিয়ে দিলে।
করে' লাইসেন, শুধু নুন কেন,
কাঙালের তা'ও কাড়িয়া নিলে॥
ভুলিয়ে ধরম, ভুলিয়ে সরম,
মরম-যাতনা করিলে শেষ।
কাঙালের ছাই, তা'ও শেষে নাই,
লোটালে, লুটিতে পরের দেশ॥
মিছে কারসাজি, মিছে ভোজবাজি,
ধরা পড়ে শুধু হ'লে বেহাল।
পরে ফাঁকি দিলে, ফাঁকিতে পড়িলে,
নারিলে আখেরে ধরিতে তাল॥

[৩]

কুবুদ্ধি ব্যতীত না ছিল সম্বল,
কুকীর্ত্তি দেখালে, সে বুদ্ধির ফল ;
আয়ে অকুলান, সে সময়ে মান,
বিলাতে তাঁতির, করিলে ;
—পরের ধনেতে পোদ্দারগিরি—
ভারতের দফা সারিলে।
"আনাড়ির পাশা, পড়ে খাসা দান,"
—প্রবাদের গুণে, রাজপদে মান
পাইয়া প্রচুর, লাট বাহাদুর,
একটিন, শেষে হইলে ;

আলীগড়ে গিয়া বিজয়া বিদায়—
তাহাও যাচিয়া লইলে।

[৪]

জ্বালাতন হুকুড়ি বছর,
গ্রহ ছাড়ে এত দিন পর!
যায় যায় স্বর্ জন ষ্ট্রাচি
আয় ভাই বাহু তুলে নাচি॥
ঝড় তোল কুলা বাজাইয়া,
যাক্ তরী তীর ছাড়াইয়া।
শুভ দিন এত দিনে এল,
ভারতের মহাপাপ গেল।

[৫]

কি ধ্বজা তুলিয়া মন্ত্রি, স্বদেশে চলিলে!
এ দেশেও চূণ কালি মহার্ঘ করিলে!
চিরজীবী হও তুমি, করি আশীর্ব্বাদ;
তোমার অযশ হোক চলিত প্রবাদ।
যখন চাহিবে লোক তব মুখপানে,
জীবন্ত দেখিবে সবে কলঙ্ক-নিশানে।

সেন্‌শেষ

বা

লোক-সংখ্যা।

আবার যে তুলেছে দেশে, সেন্‌শেষের নিশান।
এতে, ছানা ধাড়ি, কড়ে রাঁড়ী,
কেউ পাবে না পরিত্রাণ।
দেখতে পাই সবাই ভাবে,
পাছে কবে ভূতে পাবে,
করবে বা কি ভূতের বাপে,
সেনে কাজের সমাধান।
আবার যে তুলেছে দেশে, সেন্‌শেষের নিশান।

বল্লাল সেন হয়ে রাজা,
তুলে দিলে কুলের ধ্বজা,
এখন, কুল কিনেরা যায় না দেখা,
কুলের দায়ে হারাই মান।
আবার যে তুলেছে দেশে সেনশেষের নিশান।
দেশে আগে ছিল ধর্ম্ম,
কর্‌'ত লোকে ক্রিয়া কর্ম্ম,
এখন, কেশব সেনের হ্যাপায় পড়ে,
হিঁদুয়ানি অক্কা পান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
তখন ছিল জাত বিচার,
কর্‌ত ব্যাভার যেমন যার,
কালে, এক টেবিলে, বামুন যবন,
উইলসেনে খানা খান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
যারা বেচে মুড়কি মুড়ি,
কর্‌'ত দুখে মুনের কড়ি,
পোড়া, লাইসেনে তার গলায় ফাঁসি,
বেঁধে' দিলে হ্যাঁচকা টান।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
ছলে বলে কি কৌশলে,
একে একে সকল নিলে,
এখন, স্ত্রী-পুরুষে, ভাবছি বসে'
সেনশেষে বা যাবে প্রাণ।
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।
কালে কালে সেনে সেনে,
দেশটা দিলে তুলো ধুনে,
ভালো, এত মুলুক বাইরে আছে,
সেনরা কি আর পায় না স্থান?
আবার যে তুলেছে দেশে, ইত্যাদি।

চিন্তাকুল—শ্রীবাউল।

[পঞ্চানন্দ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলেন। ভারতবর্ষে ওপ্রকার লোক থাকা অসম্ভব ; কারণ, সভার অভাব নাই এবং বক্তৃতার বিরাম নাই। প নন্দের আশঙ্কা এই যে, কোনও কল্পনাকুশল কবি এই অলীকবাদে অপবাদ ক যশোলাভের দুরভিসন্ধি করিয়াছেন।]

পঞ্চানন্দের গান।

দে গো তোরা দে, আমায় দে, বিলাত পাঠা'য়ে।
রাজনগরে করব ভিক্ষে গলাবাজি করিয়ে।
কোটে দে গো অঙ্গ ঢাকি, কা'লো বরণ লুকিয়ে রাখি,
হাতে মুখে সাবান মাখি
কালো জনম ভুলিয়ে।
নে গো টেনে ধুতি খুলে, নেটিব আর র'ব না মূলে,
ভর্ণাকুলার যা'ব ভুলে
চেয়ারে পা ঝুলিয়ে।
মিসেস পাঁচী গাউন-পরা, ধরাকে দেখিবে শরা,
(ও সে) হ'ল হ'লই উল্‌কী পরা,
নেবেত বিবী হ'য়ে।

খেয়াল সম্বাদ।

বহিছে বাসন্তী বায়ু; মরিছে শিহরি,
বিরহে বিরহিকুল,—নিকর্ম্মার গুরু।
রাগেতে ভৈরবরূপী খরকর রবি
উঠিয়াছে শিরোপরি। এ হেন দুপুরে,
প্রকাণ্ড প্রান্তর মাঝে, বটবৃক্ষমূলে
ভবের ভাবনা ভুলি গঞ্জিকার ঘোরে
ভোর হয়ে পঞ্চানন্দ বিরাজেন একা।
দুই-মুখা ছোটো হুঁকা, (কলি পরিপাটী)
—ক্ষুদ্র-অবয়ব এক কলিকা শিরসে
শোভে যার (শোভে যথা মাধবের শিরে)
এক গুচ্ছ শিখিপুচ্ছ) গাঁজা এক আটি

তুচ্ছ খোলা ভাটি যাহে,—আর সরঞ্জাম,
আপনি আঞ্জাম করি রেখেছেন কাছে।
নহে নিদ্রাগত দেব, নহে জাগরণে—
রাঙা আঁখি, থাকি থাকি, টানিয়া টানিয়া,
আধ মুকুলিত, পুনঃ মুদ্রিত তর্জনি
হইতেছে, শুয়ে প্রভু সটান হইয়া,
বটমূলে রাখি মাথা, যুগ্ম কাণ্ডদেশে
তুলিয়া চরণযুগ (ধ্বজবজ্রাঙ্কিত
বিনাম্বা অভাবে সদা); পত্র ভেদ করি,
খেলিছে রবির ছটা কুঞ্চিত ললাটে।
সহসা খেয়াল আসি প্রণমিল পদে,
নিবেদিল করপুটে—"গেজেলের গুরু,
কত যে ভকত তব, কত জন-মন
যোগাইতে এ দাসেরে করেছ নিয়োগ,
নহে অবিদিত তব। বংশধর যত
ভূভারতে ভারতীর, তারা ত স্মরিতে
অবশ্যই পারে মোরে, স্মরেও সর্ব্বদা;
কিন্তু প্রভু আছে যত কর্ম্ম-কাণ্ডহীন,
অকাল কুষ্মাণ্ড ভণ্ড জগতের মাঝে
—মরুর সিকতা সম চির বেসুমার—
করিতে তাদের সেবা লাঞ্ছনা যে কত,
কি আর কহিব প্রভু? বাঞ্ছা নাহি চিতে
করিতে তাদের পাপ-মুখ বিলোকন!
নিতান্ত ভকত তব, তেঁই খাটি আমি
তোমার খাতিরে প্রভু ভূতের খাটুনি।"
"স্থির হও, স্থির হও, ভকত প্রধান—"
কহিলা খেয়ালে প্রভু—ভূত নাচাইতে,
তোমারে নিযুক্ত কেন করিয়াছি বলো,
তুমি না সহিবে যদি ভূতের উৎপাত?
রাজা, রায় বাহাদুর, ভারত-তারকা,
ভারত-মুকুট আদি যত ভূত আছে,
সুযোগ্য নায়ক তুমি, পূজ্য সবাকার!

ভূভারতে, ভারতীর ভকত যাহারা
বঙ্গদেশে; ধরে প্রাণ তোমার আশ্রয়ে।
তুমি যদি করো রাগ কে আর রাখিবে,
এত অর্ব্বাচীনগণে—(শিশুর অধম)—
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা তুমি বঙ্গের গণেশ?"
নীরবিলা পঞ্চানন্দ, শান্ত ভাব ধরি
হাসিল খেয়াল এবে গরবের ভরে
নিকাশি দুপাটি দাঁত বদন-গহ্বরে,
মধ্যাহ্নে পশিলে যথা সৌরকররাশি
শার্দ্দূল-বিবরে, হায়! প্রকাশে আপনি
ভীষণ কঙ্কাল পূর্ব্বকালে কবলিত।
ভূতেশ আদেশ পুনঃ করিলা খেয়ালে
—"নির্ধূম কলিকা এবে, দেও সাজাইয়া
আরবার, দেখিব রে আঁখি ভরে তোর
ভালবাসা মুখখানি—আঁধারের মণি!
শুনিব সুমুখে তোর কেমনে মরতে
গৌরী-আরাধনে করে আমার সম্মান?
কি রঙ্গে সে রঙ্গময়ী বঙ্গভূমে গিয়া,
ভব-সঙ্গ ভুলে থাকে, কোন্ সুখ পেয়ে?
আছে কি পূজার বিধি, যথা পূর্ব্বাবধি?"
যথা আজ্ঞা, তথা কাজ; সেবক-প্রধান
যোগাইল দেব-সুধা বাষ্পযন্ত্র-যোগে।
ঢালিয়া সুধার ধারা প্রভুর শ্রবণে,
আরম্ভিল গৌরী গান একতান মনে।
"নাহি আর সেই দিন পঞ্চানন্দ প্রভু,
বঙ্গদেশে; বৎসরের শেষে যথা আগে
পূজিত সে বঙ্গবাসী তিন দিন ধরি,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া নানা ঘটা করি,
ঘটে বা প্রতিমা গড়ি সবল বাহনে
গিরিজারে; মহালক্ষ্মী, তথা বীণাপাণি,
গণপতি, কার্ত্তিকেয় (রূপে রতিপতি),

পশুপতি মহাসিংহ, মূষিক, ময়ূর,
অসুর সহিত যবে সবে সমভাবে
খাইত যে ভোগরাগ, পাইত যে পূজা।
কাহারও নাহিক মান, গৌরীর সমান
এবে বঙ্গদেশে, এবে অনন্ত উৎসব।
বারো মাস নিতি নিতি ঘরে ঘরে হয়।

পরমা শকতি গৌরী, গুহ গজাননে,
এত দিনে দিয়াছেন যার যে সম্মান।
—এখন কুমার বর শক্তিধর তাঁর
পাইতেছে অগ্রভাগ সকল পূজার,
শক্তি অভিভূত শাক্ত শক্তি চিনিয়াছে।

গজেন্দ্রবদন পুত্র গণপতি এবে
মৃগেন্দ্রের ভয়ত্রস্ত; নাহি লম্বোদর,
নাহি সে বিপুল কায়,—মূষিক সহায়ে
মাটী কেটে মাটী হয়ে মাটীতে মিশিয়া
কষ্টে শ্রেষ্ঠে কোনমতে কাটাইছে দিন।

অসুর অমর, তাই কখন কখন
নাগপাশে মোড়া দিয়া, শূল সরাইয়া
সিংহের বিক্রম ভুলে, আক্রমণ তার
এড়াইতে, চাড়া দিয়া ওঠে মাথা নাড়ি;
কিন্তু বৃথা! সাথে যার সশস্ত্র কুমার,
মৃগেন্দ্রবাহিনী কাছে সাজে কি বিক্রম?

কমলা—গৌরীর দাসী, আর নাহি পায়
দেবী সমাসনে স্থান; অচলা ভকতি,
শক্তি প্রতি এবে তার; ত্যজি বঙ্গদেশ
অশেষ বিশেষ মতে গৌরীর আদেশ,
সাগর বা সিন্ধু পারে পালিছে কমলা।

কি কব অধিক দেব, বীণাপাণি এবে,
মহামন্ত্র গৌরীতন্ত্র শিখিয়া যতনে,
গলায় কুঠার বাঁধি, কণ্ঠ কাঁপাইয়া,
শক্তিগুণ গানে সদা, ভক্তিভাবে রত।

পুলকে পূরিত তনু, দেখিয়া ত্রিলোকে,
অক্ষুণ্ণ দেবীর শক্তি, খকতির সেবা!"

বিলাতী বিধবা।

বঙ্গের বিধবাকে পদ্যের কলে ফেলিয়া অনেক ব্যক্তি কবির দলে নাম লিখাইয়াছেন (১)। কিন্তু বিলাতী বিধবা এখন পর্য্যন্ত অদলিত ক্ষেত্র; সেই জন্য আমি একবার লেখনী ধারণ করিলাম, যশস্বী হইতে পারিব না কি?—

[কবির দলের বাহারাম]

[১]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে (২)!
দুখিনী উহার মত দুনিয়াতে কই রে!
হারায়ে তৃতীয় পতি, বিরহে কাতরা অতি,
পোড়া চিন্তা দিবা রাত্তি—পাইব কি আর?
ললনা ছলনা বিধি, কেন বারবার!

[২]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
একপ্রাণে পতিশোক কতবার সই রে!
যেখানে চরণ চলে, পতি আছে ক্ষিতিতলে,
বুঝি বা করম-ফলে,—এই দশা হয়!
যত গোর, তত পতি, তবু পতি নয়।

[৩]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
কি হবে উহার দশা ভেবে সারা হই রে!
আভরণে নাই আশ, কালিয় বরণ বাস,
মুখে মাখে ছাই পাঁশ, পাউডার ব'লে,
পতি-সুখ, পতি-শোক মিটিবে না ম'লে!

[৪]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
বিষাদে চৌচির হিয়া, যেন ভাজা খই রে!

---

(১) হেম বাবুর "বিধবা রমণী" দেখ।

(২) "ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওই রে; না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে।"

মুখ চোক নাক কাণ,   সকলি আছে সমান,
যায় যেন দিনমান, কিসে যায় রাতি?
পোড়ায়, পোড়ে না হায় জীবনের বাতি!

[৫]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
তপ্ত তেলের কড়া তাহে যেন কই রে!
প্রাণ করে আই ঢাই,   শয়নেতে সুখ নাই,
তন্দ্রা যদি আসে ছাই, তাতেও স্বপন!
রমণী মরমে মরে, একি জ্বালাতন!

[৬]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
উহু উহু, মরি মরি, কাঁদিব কতই রে!
আছে দাঁড়, আছে হাল,   আছে গুণ, আছে পাল,
তবু যেন আল থাল, মাঝির অভাবে।
হানচাল হয়ে' কি রে ভরা ডুবে যাবে?

[৭]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
নহে দুধ, নহে ক্ষীর, হায় শুধু দই রে।
বহে সদা দীর্ঘশ্বাস,   নবেলে মেটে না আশ,
হেন ভাবে বারো মাস কাটান কি যায়?
নারীর জীবনে, বিধি, এত কেন দায়?

[৮]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
করুণ-রসেতে লেখা স্বভাবের বই রে!
সুখে দুখে একটানা,   যা হোক করি নে মানা
মনে তবু থাকে জানি—ফিরিবার নয়।
এ যে ভয়, বড় দায়, কি কখন হয়।

[৯]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
পথি পথি ভ্রমে, তবু পতি না মিলই রে!
ঘোর নিশি ঝড় বয়,   চারি দিকে চোর ভয়,

সতীপনা-মণিময় বিধবার হিয়া,
কেহ নাই, রাখে যার পাহারা বসিয়া।

[১০]

বিলাতী বিধবা বুঝি অই রে!
ভেঙেছে আবার তার স্বরগের মই রে!
নাই আর কারিকুরি, করিতে বয়স চুরি,
কৃতান্তেরে করে ধরি, রাখি কোন্ ছলে?
চল্লিশে চব্বিশ করা কত বার চলে? *

দশ-হরার গান।

১২৮৮ সাল ২৬শে জ্যৈষ্ঠ দশহরার দিবসে জনৈক ভিক্ষুক, বিড়ালদহের ব্রহ্মধামের দরজায় ব'সে নিম্নলিখিত গানটী গাইয়াছিল।

(রামপ্রসাদী সুরে।)

এখন কেন পেছিয়ে এলে?
তোমায় বলেছিলাম সেই সে কালে॥
ধর্ম্মের হাট বাজার খুঁজে,
কিছু কি ভাই নূতন পেলে?
তার হদ্দ করে গেছে মোদের,
বৃদ্ধ মুনি ঋষিদলে॥
ত্যজে সুরধুনী গঙ্গা,
জর্ডনে আশ্রয় নিলে;
শেষে পুকুরেতে ডুবিয়ে মাথা,
ধর্ম্মবায়ুর বেগ থামালে!
দেশী কৃষ্ণ ন'দের চাঁদে
দ্বেষ করে জিসায় ধরিলে;
এখন কেশ মুড়ায়ে গেরুয়া পরে,
হতে চাও মা শচীর ছেলে॥

---

* বাঞ্ছারাম উপহার দিলেন—পঞ্চানন্দকে; পঞ্চানন্দ দিচ্ছেন—বঙ্গ-রমণী এবং রমণীবন্ধুকে: ভরসা যে, অনুগ্রহ প্রসাদে পরিতুষ্ট হইবে।

হিন্দুর যত অনুষ্ঠান,
তখন হেয় জ্ঞান করিলে;
এবে ব্রহ্মচারী শুদ্ধাহারী,
শান্তি খোঁজো শান্তিজলে॥
এদিক্‌ ওদিক্‌, ছুটোছুটি,
ক'রে বৃথা কাল কাটালে;
সেই খুল্লে মল, তবে কেবল,
বুদ্ধির ভ্রমে, লোক হাসালে॥
তবুও ভাল, বদ্দির ছেলে,
এদ্দিনে যে রোগ টের পেলে;
ঘরে থাকে নিদান, নব বিধান,
কর্ত্তে গেলে টাউন হলে॥
দীন বলে, ভ্রান্তিঠুলি,
নাকের চসমা দাও ভাই ফেলে;
আছে আশা মনে, তোমার সনে,
আসবে ফিরে, ভেড়ার পালে॥

কুড়িয়ে পাওয়া।

বর্দ্ধমানের বড়বাজারের বড় রাস্তায়, এই কবিতা কুড়াইয়া পাইয়াছি। ভাল অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই, কিন্তু বড় ভাল লাগিয়াছে বলিয়া ছাড়িতেও পারি নাই। পাঠকগণ প্রীত হইবেন মনে করিয়া পত্রস্থ করিলাম।—(পঞ্চানন্দ)

১। কোৎথেকে হলো।

শুনে তোমার, নামের জাহির, ভিতর বাহির,
দেখতে এলেম গুণাকর!
কর নাকি, বড় কীর্ত্তি, নিত্যি নিত্যি,
কীর্ত্তিচাঁদের কুলধর॥
কত, সাগর ডিঙ্গে, গিরি লঙ্ঘ্যে,
মাথার ঘামে ভিজিয়ে পা।
লোকে, উপায় করে, পেটের তরে,
পেট তবু ভরে কি না॥

তোমায়, হয় না আন্‌তে, হয় না জান্‌তে,
সুখ-সাগরে ভাসিয়ে গা।
বসে আছ, ভাগ্যিমন্ত, জল জীয়ন্ত,
পায়ের উপর দিয়ে পা॥
নিয়ে সিধু বিধু, চৌ চাপটে, মজা লুটে,
খৈ ফোটাচ্ছ আট পওর।
বসিয়েছ, ভূতের হাট, আজব নাট,
আবকারিতে হারিয়ে হর॥
তুমি যে, গণ্ডমূর্খ, নাইকো দুঃখ,
তাতে কারুর একটি তিল।
সে তো, হবারি কথা, এঁড়ের কোথা,
মানুষের সঙ্গে হয়েচে মিল?॥
কিন্তু বাছা, একটু কষ্ট, তাইতে নষ্ট,
সকল দিক্‌টে কোরেছে।
নইলে মেলে, কত অমন, রাজার আসন,
শুধু, সেই ভয়ে লোক পেছিয়েছে॥
ঐ যে, টাকার থাকে, যাকে তাকে,
বাপটি বলা শক্ত কাজ।
তা কি, সবাই পারে, বাপ্‌রে মারে!
হোক্ না কেন মহারাজ॥
কেমন, মাথা তুলে, চাইতে হোলে,
বাধো বাধো মনে হয়।
লোকের, টিটকিরিতে, দিনে রেতে,
জগৎ যেন আঁধারময়॥
এতে, বিদ্যে বুদ্ধি, স্বভাব শুদ্ধি,
কার্দ্দানি কি কেরামৎ।
চাইনে ভারি, তবু কোর্‌তে নারি,
বাপের নামের মেরামৎ॥
হাত যখন, পাতে উদো, জোরে বুদো,
পিণ্ডিটে কে স্বায় কেড়ে?
তা, ধর্ম্ম জানে, সয় না প্রাণে,
মিথ্যে বলে কোন্ ভেড়ে॥

তাই বলি, এই কথাটা, এত মোটা,
মনে রাখ্‌লে ক্ষতি কি?
কোরে, ধোপার পোষাক, কোরে দেমাক,
লোকে বলে ছি ছি ছি॥
আমার, কথা বাছা, বড় সাঁচা,
শুনে মেনে চলতে হয়।
দেখ, জরির শেষে, * টুল, সেজে,
বসালে কিবা ফলোদয়!॥
দশের, কথা মেনে, দেখ্‌বে ভেবে,
কোথ্‌থেকে কি হয়েছে।
নইলে, হাস্‌বে লোকে, তফাৎ থেকে,
কার কি বোয়ে গিয়েছে?॥

২। হোরি।

খেলিব সদা রঙ্গে হোরি,
লালে লাল সব করি হো।
নাহি বটে বৃন্দাবন,
নগরে করিব বন,
যেখানে গোপিনী মিলে,
সোহি বন মেরি হো!
সেকালে ছিনু গোপাল;
আমি, একাই এখন একটী পাল,
এখন পালে পাল মিশিয়ে দিলে,
নিজমূর্ত্তি ধরি হো।
নাহি সে কালো কানাই,
সে সব ব্রজনারী আর নাই,
এখন, নাই দিয়ে তুলেছে মাথায়,
আমায়, কতই সুন্দরী, হো।

---

* শেষে—পর্য্যন্তে।

গোলোকে করি বিরাজ,
নাইকো আমার লোকলাজ,
আমার লোক আছে, লস্কর আছে,
আমি কেন মরি, হো।
আমি রে রাখালরাজ,
রাখালি আমার কাজ,
তোরা রাজসাজ খুলে নে,
তোদের পায়ে ধরি হো।
আমি জন্মগুণে পাইনি পদ
কর্ম্মে করিনি সম্পদ,
তবে পদে পদে আপদ্ কেন,
মাথায় নিয়ে ফিরি, হো।
আমি জানিনে রে লোকাচার,
ধারি না ধার ভদ্রতার,
তাই পাঁচ প্রকারে পাঁচ মকারে,
সদাই মজা করি হো।
আমি কিছু বুঝিনে,
ও সব কিছু খুঁজিনে,
সব, পুড়ে কেন হোক না থাক,
(আমি) বাজাব বাঁশরী, হো।
গোরাকে দিয়েছি ভার,
হরিতে ভুবনের ভার,
আরতো গৌরহরি নই রে আমি,
শুধু হরির হরি হো।
ছেড়েছি সুদর্শন চক্র,
এখন, তত্ত্ব বুঝে করি চক্র,
তবু. কুলোপানা দেখাই চক্র,
বক্র যায় উপরি, হো।
কে জানে কার কেমন মন,
আমি ভালবাসি গোবর্দ্ধন (১),

---

(১) ...নি বুঝি 'হোরি'র প্রধান ইয়ার ?

শুধু, হাম্বারবে সুখে ভবে,
যাই সব পাশরি, হো!

আন রে, একশ আট গোপিনী,
নাচুক তারা ধিনি ধিনি,
আমার, যায় যাবে সকলি যাবে,
নিব কৌপীন ডোরি, হো!

কোথায় দাদা বলাই,
তোর মধুভাণ্ড কোথা ভাই,
এমন মধু-দিনে মধু বিনে,
কেমনে প্রাণ ধরি হো।

৩। বিনয়।

কেন হে আমোদে মাতোয়ারা।
তুলে তান করছো গান,
হৈয়ে যেন জ্ঞানহারা॥

পরের তরে মাথা ব্যথা,
হয় যদি হোক্ রোগের কথা,
তা বোলে কেন না বহিবে
পরদুখে চোখে ধারা?

ছেড়ে অমন রাজত্ব ভোগ,
কেন এমন কর্ম্মভোগ,
ভুগিতে যদি ভাল লাগে,
পরকে কেন কর সারা?

তুমি যদি মনে করো,
ত্রিভুবন তারিতে পারো,
মহিমা থাকিতে তোমার,
কেন শিরে কলঙ্ক-পসরা?

হরিতে বিপদের ভার,
তোমার ও শ্রীপদের ভার,
কেন আর ভ্রমেতে তোমার,
ভ্রমিবে দুখিনী ধরা?

৪। রাস।

[অপ্রকাশ]

ভারতের জয়।

বিনামা ছন্দঃ।

(১

জয় জয় জয় ভারতের জয়!
নাচ হিমালয়, নাচ হে সাগর,
রঙ্গে গঙ্গে, তুমি উছলিয়া উঠ,
পূরব পশ্চিমে দুই ঘাট-গিরি,
গা ঝাড়িয়া উঠ, কর কোলাকুলি,
ভারত অরাতি পদানত আজি।
বাজ বাজ শঙ্খ, নগরে নগরে,
কুলবালা হুলু দাও ঘরে ঘরে,
ছাড়িয়া মায়ের কোল, হেসে এস শিশু,
মিশাও মধুর স্বর আনন্দের দিনে!
বোবার ফুটুক মুখ জয়ধ্বনি করিতে,
সুবারতা-মদিরায় অধীর হইয়া,
জনম-বধিরে
লভুক শ্রবণ-সুখ এ পবিত্র, বিজয়-উৎসবে।

(২)

চমকে বাসুকি-ফণা, কূর্ম্মপৃষ্ঠতল
স্থল জল টলমল, থমকে ধরণী;
ধ্যান ভাঙ্গা রাঙা আঁখি সহসা উন্মেষি'

উমেশ, ভ্রূভঙ্গ করি, ভৃঙ্গীমুখ পানে
চাহিলেন; শঙ্করের ভালে শশধর
থর থর—রাহু ভয়ে হায়রে যেমতি—
কম্পবান্; নন্দী নিত্য বন্দে যেই শূলে,
অবশে খসিয়া আজি, পড়িল ভূতলে,
পাদমূলে। ভুলি তাহা না তুলিল আর।

ভোলার ভকত ভোলা,—অচেতন যেন।
কক্ষভ্রষ্ট হয় হয়, লক্ষ লক্ষ গ্রহ,
উপগ্রহ, নিগ্রহিয়া নিজ নিজ বেগ,
অম্বরে সম্বরে গতি; চমকি চপলা,
চকমকে লুকাইল জলদের কোলে।

'নমো মহেশায়' বলি প্রসারিয়া কর,
দ্বিজবর দিতেছিল জাহ্নবীর তীরে,
বিল্বপত্র শম্ভুনাথে, চন্দনে চর্চ্চিয়া,
মুখে না আইল মন্ত্র, সরিল না হাত,
—নিস্পন্দ, পিত্তলময় পুত্তলের প্রায়।

বাগানে, নিশ্চিন্ত মনে, রসের সাগরে
হাবু ডুবু বাবু আজি বিভোর বিলাসে,
মাই ডিয়ার্ ইয়ার্ সঙ্গে, ডিকাণ্টার ভরা
সুবর্ণ শাম্পেন্, শেরি সুরাকুল-চূড়া;
অধরে সুধার-তার লিকার বিস্তর
স্তরে স্তরে সুসজ্জিত; প্লেটে কট্‌লেট্,
আস্বাদ-রসের সার বৃষের রসনা,
চপ্ কারি' নানামত; ফল মূল কত;
(অবিচার নাই কভু চাচার উপর)
মোসল্লম, মোতঞ্জন, কালিয়া কাবাব,
কোরমা, পোলাও, কোপ্তা, গরম গরম—
টেবিলে শোভিছে তারে; নর্ত্তকীর দল
ঝলমল পেশোয়াজ সাজিছে বরাঙ্গে—
দেবাঙ্গনা জিনি রূপে—অনঙ্গে মোহিয়া
আগে, মরতে মানবে ছলিবা-মানসে

আসিয়াছে; মিশাইয়া সারঙ্গের সনে
সুস্বর,—(সুন্দরীকণ্ঠ অতুল জগতে)
—মধুর মধুর নাচে, ধীরে ধীরে তালে
তালে, তালে দোলাইয়া সুভুজ-মৃণালে,
পৃষ্ঠে দোলাইয়া বেণী, ভুলাইয়া মন,
মৃগাক্ষী, কটাক্ষে সদা বিজুলীর খেলা;
—(হায় রে গরল কেন সুধা-সরোবরে?)—
সহসা থামিল নাচ, সহসা নীরব
হইল সারঙ্গ-রব; সুস্বর-লহরী-
লীলা ফুরাইল; গেল তবলার বোল;
ভুলিয়া গেলাশ, বাবু, ঢালিবেন মধু
মক্ষিকা-আক্রান্ত মুখে, ঠেকিয়া ঠোঁটেতে,
গেলাশ রহিল ঠোঁটে গেল না গলায়
বিন্দুমাত্র—(সিন্ধু-নীরে পশিয়া পিপাসী
বারিবিন্দু না পাইল); রমণী বেহারা
ঝিমি ঝিমি তালে তালে ঝিমিয়া ঝিমিয়া
টানিয়া পাথার দড়ি বিহ্বলে আছিল,
দিল ছাড়ি লোল রজ্জু, চাহিল চকিতে!
ঘূর্ণ-জল মাঝে মাঝি হালি ছাড়ি দিল!
কড়া ক্রান্তি সূক্ষ্ম করি সুদের হিসাব
করিতে করিতে হায়। কাই ভুলে গেল
মহাজন,—ধনকৃমি! হল ছাড়িল কৃষক
হলবাহী-বলীবর্দ্দ-লাঙ্গুল, লাঙ্গল-
মুষ্টি, যষ্টি। কক্ষচ্যুত হইল কলসী,
জলপূর্ণ, কামিনীর! অধিক কি আর,
জঙ্গমের গতি রুদ্ধ, স্থাবর চলিল,
—শুনিল সকলে যবে জয়-কোলাহল
সহসা আতঙ্ক করি' ভাবিল সকলে;
বিকল ভারতপ্রাণ করিল বা কিসে।

(৩)

আজকে কেন ভারতবাসী
আহ্লাদে আটখানা,

যারে শুধাও, সেই বল্‌বে,
কারো নাই তা জানা!
(বড়) লুকিয়ে লুকিয়ে, জাঁকের আইন
করেছিলেন লাট!
ভেবেছিলেন হুজুক করে
ভাঙ্গ'ব ভবের হাট।
রাত পোহাল, জারি হ'ল,
হুজুকের আইন।
এও কখন শুনিনি মা,
(এখনও) হচ্ছে ত রাতদিন।
ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হয়ে,
দেছলেন তায় সায়।
(তাই,) লাট ভাবলেন, মুলুক মেলেন,
আর কেটা তাঁরে পায়?
কেমন তাই, সভা করে, গলা চিরে,
মাতিয়ে আগে দেশ,
ভারতবাসী ঢেউ তুল্‌লে,
বিলেতে লাগল ঠেস্‌।
থাক্‌তেন যদি, লাট সেথানে,
সভায় উপস্থিত,
শুন্‌তেন যদি আপন কাণে
বুঝ্‌তেন আপন হিত,
বিলেত থেকে মুখ থাবড়া,
হ'ত নাকো খেতে,
বাজ্‌ত না কলঙ্ক-ঢোল,
চুক্‌ত রেতে রেতে।
(বিলেতের) সাহেব ভাল, জগৎ আলো,
বুদ্ধি-তেজে করে,
ভারতবাসীর মান রেখেছে
লাটের বকা সেরে।
(সবাই) সভ্য হচ্ছে, উঠে যাচ্ছে,
অষ্টবীর নাচন,

(নহিলে) ঘুরিয়ে কোমর, দিতাম নেচে,
কেবৃ লেগে যা ধন।
এ আমোদে নাচব না ত,
নাচ্‌ব আর কবে ?
স্বর তুলে আজ ফাটাও আকাশ
ভারতের জয় রবে।

"জয় জয় জয় ভারতের জয়,
নাচ হিমালয়, নাচ হে সাগর
রঙ্গে রঙ্গে, তুমি উছলিয়া উঠ,
পূরব পশ্চিম দুই ঘাট-গিরি,
গা ঝাড়িয়া উঠ, কর কোলাকুলি,
ভারত-অরাতি পদানত আজি।

বাজ বাজ শঙ্খ নগরে নগরে,
কুলবালা হুলু দাও ঘরে ঘরে,
ছাড়িয়া মায়ের কোল হেসে এস শিশু,
মিশাও মধুর স্বর আনন্দের দিনে।

বোবার ফুটুক মুখ জয়ধ্বনি করিতে,
সুবারতা-মদিরায় অধীর হইয়া,
জনম-বধিরে
লভুক শ্রবণ-সুখ, এ পবিত্র, বিজয়-উৎসবে।"

(৪)

নাচ হে ভারতবাসী, নাচাও জগতে ;
নাচিবে, বিচিত্র নহে, কিন্তু কোনও মতে
পঞ্চানন্দ এ আনন্দে উৎসব-কারণ
দেখিতে না পায় ? হায় শুনিতে বারণ,
যদি ঘটে বুদ্ধি কিছু থাকিত তোমার ;
মান অপমান ভেদ করিতে বিচার,
লজ্জা, ঘৃণা, হৃদরিতা, দুঃখ-অনুভব
করিতে কখন যদি ; বিশ্বস্ত বান্ধব
অপদস্থ হলে যদি দুঃখের দুর্দিনে,

দশের দয়ার পাত্র করার ছলনে
মর্ম্মচ্ছেদি বাক্যবাণে, বিষদিগ্ধ করি;
দগ্ধিয়া বিদগ্ধ হিয়া—প্রণয়ের তরী
বন্ধুর কলঙ্কহ্রদে যদি ভাসাইয়া
সারিগান গায় তাহে "নাকী" মিশাইয়া
কান্না দেখাইতে,—হায়! কত যে মরমে
বাজে হৃদয়ীর হৃদে, কতই সরমে
পোড়ে যে অন্তর তা'র, ভারতীর ভাই,
বুঝিতে সে ব্যথা যদি, (কভু বুঝ নাই)
কাঁদিত পরাণ তবে, উঠিত না হায়,
দীঘল যুগল বাহু, পাগলের প্রায়,
লাঘবে গৌরব ভারি নাচিবার কালে।
নেচ না, নেচ না, ভাই,—চূণ কালি গালে।
তোমার যতনে ভাই, চেষ্টায় তোমার
পরিবর্ত্ত হইয়াছে আইন এবার,
সত্য; কিন্তু ভেবে দেখ, কত বিশেষণ
বিলাতী সভায় ভাই পেয়েছ ভূষণ,—
"অন্ত্যজ দেশীয় পত্র, অজ্ঞান, অধম,
কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নাই সরম ভরম;
ভিক্ষাজীবী মূর্খজন, ন-গণ্য সমাজে,
ক্ষেপার খেয়াল, তাই সম্পাদক সাজে!
তুচ্ছ ভারতের কীট মশা, ক্ষুদ্রপ্রাণ
তা'র তরে সাজে না কো ব্রিটিশ-কামান।"
বিলাতী মহতী সভা মাঝে উচ্চৈঃস্বরে,
ভারত-হিতার্থী যা'র এ দুর্নাম করে,
থাকিলেও তার প্রাণ রাখিতে কি আছে?
সুধাই ভারতবাসী, তোমাদের কাছে।
ভক্ত হই, দ্রোহী হই, সাক্ষী ভগবান্,—
প্রাণ অতি তুচ্ছ মানি প্রাণাধিক মান।
লউক লেখনী কাড়ি, কাটুক রসনা,
সেও ভাল শতবার! কে করে বাসনা

করে নরাধম নামে? কে তাহে উল্লাস
প্রকাশে বল হে ভাই? তোমার প্রয়াস
সফল হইল কিসে? এ লেখার চেয়ে,
না লেখা কি ভালো নয়? কোন্ মূল্য দিয়ে
কিনিলে কেমন বস্তু? চেপে যাও ভাই,
কাটা কাণ চুলে ঢাক, নেচে কাজ নাই।
জানি হে আইন গেল, গেল দণ্ড-ভয়;
তোমাদের কথা কিন্তু তৃণতুল্য নয়।
হারাইলে জাতি কুল, না ভরিল পেট,
শত্রু মিত্র কাছে শুধু মাথা হ'ল হেঁট।
তবে কি এ নৃত্য সাজে? মাটির কলসী,
দু হাত পাটের দড়ি—এতই কি বেশী? (১)

---

(১) "ভারতের জয়"—অন্তর্গত এই শেষোক্ত কবিতাটির ছন্দ, সুর ও বাক্য-বিন্যাস অমিত্র ছন্দের ন্যায়, অথচ, ইহা মিত্রাক্ষর পয়ার, আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইন্দ্রনাথকেই এইরূপ মিত্রাক্ষর কবিতার প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। এখানে বলিয়া রাখি যে, দ্বিতীয় কাণ্ড শকাব্দ ১২৮৭।৮৮ সালে লিখিত। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ছন্দের কবিতা কোথাও আছে বলিয়া জানা যায় নাই। আজকাল এরূপ কবিতার ছড়াছড়ি.

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

পাঁচু-ঠাকুর।

তৃতীয় কাণ্ড।

সুরেন্দ্রায়ণ।

দেবচরিত্রে মুখবন্ধ।

পঞ্চানন্দ দেবতা, সুতরাং ইচ্ছা অনুসারে কখনও মুক্তদেহ, কখনও যুক্তদেহ।

এতদিন পঞ্চানন্দ মুক্তদেহ ছিলেন,—সে পেটের দায়ে; এখন যুক্তদেহ হইলেন,—সখ করিয়া। ফল কথা, বায়ূনাং বিচিত্রা গতিঃ! সেই জন্য সম্প্রতি পঞ্চানন্দের ছায়া বঙ্গবাসীর কায়াতে মিশিয়া গেল। বাস্তবিক পঞ্চানন্দ ত বঙ্গবাসীর জন্যই আবির্ভূত।

তবে যুক্তই হউন, আর মুক্তই হউন, পঞ্চানন্দ আপন আত্মা বজায় রাখিবেন, নিজের কোট কখনও ছাড়িবেন না। দেবত্বের গুণে, পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীর সহিত এক হইয়াও পৃথক্ রহিলেন; পঞ্চানন্দের ঝোঁক বঙ্গবাসী লইতে পারিবে না, সুতরাং লইবে না; আর পঞ্চানন্দ আপন ঝোঁকেই অস্থির, কাজে কাজেই বঙ্গবাসীর জন্য ঝুঁকি লইবেন না।

যেখানে ভারতের বিদ্যা বাহির হয়, হীরার লাঞ্ছনা হয়, সুন্দরকে সন্ন্যাসী হইতে হয়, পঞ্চানন্দ সেই বর্দ্ধমানপুরেই বর্ত্তমান রহিলেন। আর যাহাই হউক, ঠিকানা ঠিক রহিল।

পঞ্চানন্দ অমূল্য; এবার তাহার লৌকিক প্রমাণ উপস্থিত। অনর্থের মূল—অর্থ লইয়া পঞ্চানন্দ বঙ্গবাসীকে নিঃসম্বল করিতে ইচ্ছুক নহেন; বরং বঙ্গবাসী [illegible] সুবেশ লাভ করিলেই পঞ্চানন্দ সুখী হইবেন।

আইস ভাই! সকলে মিলিয়া পঞ্চানন্দের এই বদান্যতাকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা যাউক।

সমস্ত মাটী।

সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের গণ্ডগোলে সব মাটী হইল। বোকা লোকে এই সোজা কথাটা বুঝিতেছে না, বুঝাইলেও বুঝিবে কি না সন্দেহ। তবু আমার যেরকম গায়ের জ্বালা ধরিয়াছে, না বুঝাইয়াও আর থাকিতে পারিলাম না।

প্রথম মাটী,—খোদ পঞ্চানন্দ।

দিবা পরমানন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, আমার জগৎযোড়া খোসনাম, বাঙ্গালার সুখময় পরিণাম, ইত্যাদি সম্বন্ধে কত মনোহর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম,—এমন ঘুমটী আমার ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝে মাঝে জাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কথাটী কহি নাই; অলৌকিক প্রতিভার লক্ষণ—নিরবচ্ছিন্ন আলস্য; "জীনিয়সের" প্রকৃত পরিচয়,—নিষ্পন্দ কুঁড়েমি; ইহা জানিয়া, ইহা ভাবিয়া, কথাটী না কহিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইতেছিলাম, আবার ঘুমাইতেছিলাম। এত সাধের ঘুম আমার ভাঙ্গিয়া গেল, আবার আমাকে ইতর প্রাণীর মত কথা কহিতে হইল। এত হটগোলে কি ঘুম হয়? এমনতর বিরক্ত করিলে, কথা না কহিয়া কি থাকা যায়?

যেদিন বে-এক্তেয়ার খিলিজি সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র সম্বল করিয়া, নীরবে নবদ্বীপ প্রবেশপূর্ব্বক বঙ্গদেশ করতলস্থ করিল, সেদিন এত গোল না হইবারই কথা। কিন্তু পলাসীর যুদ্ধও ত শুনিয়াছি! (শুনিয়াছি; কেন না, চক্ষু চাহিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া কোন কিছু দেখা আমার অভ্যাস নহে; একটু কাণ লম্বা হইলেই যে কাজ হয়, তাহার জন্য চক্ষুর অপব্যয় করাটা আমাদের মত বিরাট বুদ্ধিমন্ত দেবজাতির লক্ষণ নহে)—পলাসীর যুদ্ধ শুনিয়াছি, এত গোল ত হয় নাই; বক্সরের লড়াই হইয়াছে, এত গোল হয় নাই, সেদিনকার সিপাই হাঙ্গামাতে এমন গোল হয় নাই, আত্মশাসন সম্বন্ধে মহালাটের অনুষ্ঠানপত্র পাঠমাত্র যেদিন বঙ্গদেশ স্বাধীন হইল, সেদিনও এমন গোল হয় নাই। তাহার পর বাঙ্গালী মাত্রেই অবাধে ইংরেজদিগকে কারারুদ্ধ করিবে, জেলচালান করিয়া দিবে, এই সুব্যবস্থার সূচনা যখন হইল, তখনও এত গোল হয় নাই। আজি তবে কেন বাপু এমন? কথাটা কি, না, সুরেন্দ্র কারাসাৎ হইয়াছে! উত্তম হইয়াছে, তাহার এত গোল কেন? বরং হিসাব করিয়া বুঝিতে গেলে, গোল থামিবারই কথা। পৃথিবীতে শান্তির আবির্ভাব হইবারই কথা। তা না কেবল গোল, কেবল হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে কি ঘুমানো যায়? বল দেখি, এত গোলযোগের পরে কি অলৌকিক প্রতিভার লক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখা যায়? এখন এই আমায় জাগিতে হইল, কথা কহিতে হইল, মাটী হইতে হইল। আমি বেশ ছিলাম, সুরেন্দ্র জেলে গেল, আমাকে একেবারে মাটি করিয়া গেল। সামান্য নরলোক সুরেন্দ্র,

জেলে গিয়া বিশ কোটি মানুষের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া আমাকে টিটকারি করিতেছে; আর আমি দেবতা—জেলখানার ফটকের দিকে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। এতে কে না মাটী হয়? আমি ত একেবারে ডাহা মাটী!

তারপর মাটী,—দেবতা।

আমারই জাতি, জ্ঞাতি, একচ্ছিদ্র শালগ্রামই হউন, আর নবদ্বার বিশিষ্ট বিগ্রহই হউন, তিনিও বিলক্ষণ মাটী। সুরেন্দ্র জেলে যাইবার আগেই তিনি কতক মাটী হইয়াছিলেন, অন্তত একশ বছরের কম বয়সের পাথর হইয়াছিলেন। তবু ঠাকুরের কিছু ইজ্জত ছিল, তাঁহার হইয়া দুজন হিন্দু-খৃষ্টানে যুক্তি করিয়া মেথরের ঝাড়ুপূত বারাণ্ডায় ঠাকুরকে বসিতে দিয়াছিল, বিশেষ নাস্তানাবুদের কারখানা কেহ কিছু করে নাই, অন্তত বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নাই;—অন্তর্যামী ঠাকুর অন্তরের কথা অন্তরে রাখিয়া দিলেই আর গোল হইত না। কিন্তু সুরেন্দ্র জেলে যাওয়াতে ঠাকুরটী একেবারে মাটী। সাধ করিয়াই হউক, আর দায়ে পড়িয়াই হউক, ঠাকুর সেই তিলকে তাল করিয়াছেন; করিয়া হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, নানকপন্থী, অঘোরপন্থী, সকলের শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তাঁহার মরা ইজ্জতের জন্য পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, যত্র তত্র কেবল কান্নাহাটি পড়িয়া গিয়াছে। লজ্জার কথা বলিব কি, উইলসেন পাণ্ডার 'বিরাটপূর্ব্ব' নামক মহাতীর্থের হিন্দুযাত্রীরাই এখন তাঁহার প্রধান সহায় বলিয়া লোকের মাঝে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। এতে যদি ঠাকুর মাটী না হয়, তবে আর কিসে মাটী হইবে?

চূড়ান্ত মাটী,—হাইকোর্ট।

বিচারক নরেশচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তা-বিচারকের কাছে উপস্থিত। বলিলেন,—"দাদা, ঐ বাঁড়ুয্যেদের সুরেন, ঐ যে ছোঁড়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপায়, ঐ সুরেন আমায় যা'চ্ছেতাই বোলে গালাগাল দেচে, আমায় কত কি বোলেচে, আমায় বড্ড অপমান কোরেচে, ওর একটা কিছু করো, নৈলে এ প্রাণ আমি রাখ্‌বো না, এ মুখ আর আমি দেখাবো না। আর আগে কতবার কত কথা বোলেচে, তা আমি কিছু বোল্‌তে পারি-নি। এবার আমার কোনও দোষ ছেলো না, মিচি মিচি আমায় যা'চ্ছে তাই বোলেচে, তোমার পায়ে হাত দে বল্‌চি দাদা, এবার আমার কিছু দোষ নেই। আমি তো ভালো মন্দ কিছু জানিমে, তা সুমুকে যাকে পেইচি, তাকেই জিজ্ঞেস্ কোরে তবে কাজ কোরেচি; তা তাদের কিছু না বোলে সুরেন্ কেন আমায় গাল দেবে?, এর বিহিত একটা কোত্তেই হবে; নৈলে দাদা—অ্যাঁ অ্যাঁ—আমি বুঝি খস্তা হাকিম বোলে—অ্যাঁ—আমি বুঝি কম দরের লোক

বোলে—"আঁ!"—বলিতে বলিতে দর-বিগলিত নয়ন-ধারায় নরেশের বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

তখন, জলদ-গম্ভীর স্বরে দাদার জীমূত-মন্দ্র হইল;—

"তবে রে পাষণ্ড ষণ্ড দুষ্ট দুরাচার!
বাঙ্গালীকুলের গ্লানি, অ-সিবিলিয়ান,
বাঙ্গালী-চালক তুই, বাঙ্গালীর মুখে,
দিলি গালি, যা'চ্ছেতাই বলিয়া নরেশে
—কনিষ্ঠ দোসরে মম! নয়নের পানি
নিকালিলি রে নিঠুর, কঠোর ভাষণে
তার প্রতি! অতি কোপে পড়িলি রে আজি;
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই. রোষাগ্নিসম্মুখে
মম তোর। কর্‌করে অগ্নি-শিখা যথা
উঠয়ে জলিয়া, চালে টিকার আগুন
ফুৎকারিয়া সংযোজিলে,—মধ্যাহ্ন-মরীচে
যে চালের খড় তপ্ত—হায় রে তেমতি
জালাইব তোরে আমি যা থাকে কপালে।
তোয় জালাইতে যদি বঙ্গদেশ জ্বলে,
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত যদি অগ্নিময় হয়,
তবু না ডরিব আমি, ক্ষান্ত না হইব।
পুড়েছিল হাত মুখ, তা ব'লে কি হনু—
তোদেরি রামের দাস, তোদেরি সে হনু—
লঙ্কাচালে লেজানল লাগাইতে কভু
ভুলিয়া ভাবিয়াছিল অগ্র কি পশ্চাৎ?"
কহিলা নরেশে লক্ষ্য—"যাও ভাই, নিজ
সিংহাসনে উপবেশি,—(বেশি কিছু নয়)—
ফুলবাণ হানো গিয়া মন্ত্রপূত করি,
আত্মসার করি আগে। করিতেছি পণ,
তব শিরস্পর্শ করি, এই বাণে হবে,
অ-সুরেন অ-গার্থ বা, ব্যর্থ নাহি বলি।
কিন্তু ভাই এক কথা, যা বোলে সুরেন
তোমারে দিয়া:ছ গালি, মিছা ত এবার?"

তৃতীয় কাণ্ড।

উত্তরিলা বিচারেশ নরেশ সুমতি,
শান্তভাব পরিগ্রাহি, যুড়ি দুই পাণি,—
"পূর্ব্বকৃতি, নিতি নিতি, স্মৃতিপথে আনি
গণ্য, দাদা, নিজ দাসে; দোষ কিন্তু আজি
নারিবে বলিতে কেহ, সুধাইবে যারে।
কুগ্রহ আমার, তাই নিগ্রহ প্রকাশি,
অবিশ্বাস করো দাদা! নহিলে, বিগ্রহ
বিরাজে অলিন্দে আজি, তারে স্পর্শ করি
শপথিতে পারি আমি, পারে অন্য লোকে,—
সুরেন যা বলিয়াছে, ঠিক সত্য নহে।"
ধাইল বিষম রুল শূল সম তেজে,—
আনিল সুরেনে ধরি, ভুল ভ্রান্তি কিছু
না মানিয়া, না শুনিয়া, জেলিল সুরেনে।
আপনি আপন মান বজোরে বজায়,
করিয়া বিচারি-বৃন্দ, আনন্দে অপার,
নিজ মাথে নিজে নিজে পুষ্প বরিষিল,
নিজ জয় রবে নিজ ঘর ফাটাইল;
ভাবিল উল্লাসে অতি গৌরব বাড়িল!

(ক্ষুদ্র এক কথা কবি কাতরে কহিবে,
ভরসা, সকলে ইহা স্মরণে রাখিবে।
পাঁচু যবে কবি হয়, চড়ে কল্পনায়,
সত্য মিথ্যা ভেদ তার, তখনি ফুরায়।
উপরে যা বলা গেল, বিচার ব্যাপার,
সত্য বলি, এক কথা সত্য নহে তার।
কেবল কল্পনা-লীলা ছন্দের ছাঁদুনি,
ক্ষেপার খেয়াল শুধু আঁখর-বাঁধুনি।
ইচ্ছা নাই করিবারে কোর্টাবমাননা,
ধর্ম্ম জানে, সাধ নাই যেতে জেলখানা।)

ফলে, সুরেন্দ্রনাথ জেলে গেলেন। দেশে হাহাকার, ছিছিকার, ধিক্কার, হুঙ্কার, নয়ন-লৌহিত্যাদি-করণক চিত্তবিকার" প্রভৃতি অশেষ প্রকারে বিচারকদের বিচারকে অবিচার প্রতিপাদন পুরঃসর প্রতিনিয়তই প্রত্যেক স্থানে, যানে, গানে, ধ্যানে, মৌনে, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, রাত্রিদিনে, যেখানে সেখানে, ঐ কথার আন্দোলনে এক

বিষম্বাকার কারখানা হইয়া উঠিল। এদিকে জেলখানায় খাতায় খাতায় লোক, বস্তা বস্তা চিঠি, স্তূপে স্তূপে খবর, ঝাঁকায় ঝাঁকায় খাদ্য, জালায় জালায় পেয় ইত্যাদি উপস্থিত হইতে লাগিল। এক কথায় ছেলেরা গান শিখিল—

"যা, যা,—
তোরা দিলি সাজা, আমরা করি মজা।"

হাইকোর্টও দেখিলেন, দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—

"মন্দ নয় মজা, দিতে গেলুম সাজা,
দশজনে যে তুলে দিলে সুরেনেরই ধ্বজা।"

কচি কচি ছেলেরা গাইতে লাগিল,—

"এক কথা খাঁটী, হাইকোর্ট মাটী।"

তেমনি মাটী,—ভবলুসি বানরজী।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ছেলে যদি, কোট হ্যাট পরে,
গরুভোজন করে,
তেল মাখা ছাড়ে,
আর ইংরাজী ঝাড়ে,
তাহা হইলে সে কখনই বাঙ্গালী হয় না,
সাহেবও হয় না,
নয় মানুষ, নয় ভূত,
বিতিকিচ্ছি আঁটকুড়ীর পূত—

এই ভাব দাঁড়ায়। বানরজীর তদবস্থা। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে এখন বাঙ্গালী; সুং মামলাবাজ। মনে মনে ভাবিলেন, বিচারে যা হয় হবে, কিন্তু আইনের কথা লইয়া তর্কাতর্কিটা করিতেই হইবে। বানরজী কিন্তু এ বাঙ্গালীভাবের পোষ করিলেন না; মনে মনে ঠাওরাইলেন,—"এত কাউ, কাক্ উদরস্থ করিয়াছি, আর চারিটা জনবুলকে আমি মুখের জোরে বাগাইতে পারিব না?—আমি? ভবলুসি-বানরজী? ইহা হইতেই পারে না।" গেলেন অমনি ছুরী কাঁটা এগিয়ে। বাপো! এ কি তোমার টেবিলের গোরু যে, তুমি খাঁ কোরে বাগ [illegible] কাটবে আস্ত জীয়ন্ত জনবুল হুঙ্কার দে, মাথা নেড়ে যেই দাঁড়িয়েছে, বাঁড় [illegible] বানরজীর ছুরী কাঁটা যে কোথায় ছিটকে পড়লো, তা আর কে দেখে? একবারে নিরস্ত্র, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন।

হইতে যদি বিলিতি কশাই, হে বানরজী, তবে হয় ত কাজ উদ্ধার ক পারিতে। অথবা থাকিতে যদি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-তনয়,—"তোমরা ভূতনাথ ভ পতি ভোলা-মহেশ্বরের বাহন, তোমরা দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের অবলম্বন, তো

ঐ ক্ষিতিবিদারি-শৃঙ্গাষ্টকে তৈল দিয়া দিতেছি, তোমাদের চারিটি ককুদ মর্দ্দন করিয়া দিতেছি, তোমাদের চার-আষ্টে বত্রিশখানি খুরে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, হে যণ্ডেশ্বরগণ, এ যাত্রা ক্ষমা করো”—ইত্যাদিরূপ স্তবস্তুতি দ্বারা জনবুলাবতারগণের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতে, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইত। কিন্তু তুমি যে দুইয়ের বাহির, কাজেই মাটী। তুমি জ্ঞাতসারে কোনও পাপের পাপী নও, কেবল কর্ম্মদোষে,—

“আপনি মজিলে ভাই, লঙ্কা মজাইলে।”

সার-সংগ্রহ মাটী।

একে একে সকলগুলি বিস্তারে দেখাইতে হইলে, বিস্তর কাগজ কলম মাটী হইবে। অতএব সংক্ষেপে বলি, সুরেন্দ্রনাথের এই হুজুকে—

১ লর্ড রিপণ মাটী,
২ আত্মশাসন মাটী,
৩ ইলবর্টের আইন মাটী,
৪ পালেদের কৃষ্ণদাস মাটী,
৫ ছেলেদের পরকাল মাটী,
৬ মাষ্টারদের ইহকাল মাটী,
৭ কেশব সেনের নববৃন্দাবন মাটী,
৮ শিবপ্রসাদের কুশপুত্তল মাটি,
৯ দেশের খবরের কাগজ মাটী,
১০ বিস্তর রাজরাজড়া মাটী,
১১ ইংরেজ-বাঙ্গালীর সদ্ভাব মাটী,
১২ বিস্তর সাহেবের খানা মাটী,
১৩ সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে মাটী,
১৪ হরিণবাড়ী মাটী,
১৫ ইংলিশম্যান খুব মাটী।

কত বলিব? বাঙ্গালার মাটীও মাটী। ভরসার কথা দুটী আছে, মাটী হইবেন না সুরেন্দ্রনাথের পরম পূজনীয়া জননী, আর মাটী হইবেন না আমাদের জননী জন্মভূমি। কারণ উভয়েই—“স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

কার্য্যকারণতত্ত্ব।

কার্য্যকারণ ভাবের উপলব্ধি করা, মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত নহে। কোন্ জীবে কি ফল পাওয়া যায়, কোন্ পদার্থ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয়, ইহা যদি নিঃসংশয়ে কেহ স্থির করিতে পারিত, তাহা হইলে সংসার সুখ-দুঃখের অতীত হইত। সকলেই ইহা জানে এবং মানে, তথাপি হস্তগত গোটাকতক কার্য্যকারণসম্বন্ধসূচক দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া এই দুর্জ্ঞেয় অথচ অভ্রান্ত তত্ত্বের প্রমাণপুঞ্জ বর্দ্ধন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে :—

যেহেতু

জজ নরেশচন্দ্র জানেন যে, বাঙ্গালী মাত্রেই মিথ্যাবাদী; এক প্রাণীর কথাতেও বিশ্বাস করা যায় না।

অতএব

জজ নরেশচন্দ্র একজন বাঙ্গালী ইন্টি-পেটার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, আদালতে ঠাকুর আনিলে হিন্দুর মনে কষ্ট, কিম্বা হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে না।

যেহেতু

লোকের কাছে সমাচার লইয়া, বিশ্বাস করিয়া, বিচারকের উপর কটাক্ষ করিলে পাপ নাই;

অতএব

ব্রাহ্ম পবলিক-ওপিনিয়নের নিকট সমাচার পাইয়া বিশ্বাস করিয়া বিচারকের উপর কটাক্ষ করিলে ঘোর পাপ।

যেহেতু

চোরের অধিকারভুক্ত হইয়া শালগ্রাম ঠাকুরকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে, কেহ তাহাতে ধর্ম্মহানির আশঙ্কা বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্ডগোল করে নাই।

অতএব

বিচারেশ নরেশের অধিকারে পড়িয়া ঠাকুরকে আদালতে আসিতে হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্মহানির শঙ্কা অথবা গণ্ডগোল করা অসঙ্গত।

যেহেতু

বিচারকের চক্ষে বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ বা জাতিভেদ নাই, সকলেরই প্রতি এক বিচার, সমান বিচার হইয়া থাকে।

অতএব

আদালতের অবজ্ঞা করা অপরাধে, টেলর ও কেনিক সাহেবের সম্বন্ধে যে আদেশ হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সে না হইয়া অন্যরূপ হইল।

যেহেতু

ভারতবর্ষে সাধারণের কোন একটা মত নাই; রাজনীতিঘটিত কথায় শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই, সজাতীয়তার মূলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের কোনও প্রকার একতা বা সমসংযোগ নাই।

অতএব

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হওয়াতে হিন্দু ও মুসলমান, উড়ে ও পার্শি, পাঞ্জাবী ও আসামী সমস্বরে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে। হাটে মাঠে, সহরে, পাড়া-গাঁয়ে সভা করিতেছে, চাঁদা করিয়া টাকা তুলিতেছে, ইত্যাদি।

যেহেতু

রাজপ্রতিনিধি লাট রিপণ, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যোগ্যপাত্রে যোগ্য অধিকার দিবার অভিপ্রায়ে ফৌজদারি কার্য্যবিধির কলঙ্ক মোচনের সংকল্প করিলেন, এবং ইঙ্গ-ফেরঙ্গের দল সেই জন্য দেশী লোকের উপর বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া কুৎসিত ও কটু ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল।

অতএব

এদেশের লোক ইংরেজের উপর দ্বেষ-ভাবাপন্ন লাট রিপণের শাসন-প্রণালীর দোষে রাজদ্রোহী, অতিশয় অকৃতজ্ঞ এবং জাতিবৈর প্রদর্শনকারী বলিয়া সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে

যেহেতু

এদেশের লোক আজন্ম ইংরেজী শেখে, ইংরেজীতে লেখা পড়া করে, বিতর্ক বক্তৃতা করে, বিলাত যায়, সাহেব হয়, তথাপি ইংরেজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং ইংরেজের দোষ-গুণের বিচার করিবার অযোগ্য।

অতএব

ইংরেজেরা বাঙ্গালা ভাষা শেখেন না, বাঙ্গালীর কানাচের দিকে ঘেঁসেন না, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কর্ম্ম বোঝেন না, তথাপি বাঙ্গালার হাট হদ্দ ষোলো আনা উদরস্থ করিয়া লন, সুতরাং বাঙ্গালীর পাপ-পুণ্যের বিচার করিতে নিশ্চয় যোগ্য।

সংশোধিত যাত্রা—মানভঞ্জন।

বৃন্দা। রাধে, মানময়ি! তুমি কালাচাঁদের ক'রে অপমান, শেষে আপনি হবে হতমান! এত মান ত ভাল নয়, শ্রীরাধে!

রাধা। শোনো বৃন্দে, তুমি স্বজাতি বোলে এ যাত্রা তোমায় মাফ কোল্লুম; কিন্তু ঐ কৃষ্ণ যদি এমন কথা বল্‌তো, তা হ'লে এক্ষণি কুল হানতুম, কাল সকালে জেল দিতুম। তুমি আর অমন কথা বলো না, বৃন্দে, আমার মানের গায়ে ফুলের ঘা সয় না, বৃন্দে!

বৃন্দে। কি বোল্লে শ্রীরাধে?

তোমার "মানের গায়ে ফুলের ঘা সয় না?"
রাধে, আমাদেরও আর জেলের ভয় হয় না।
এখন, কালা যদি জেলে যায়, হবে সবে ক্ষিপ্তপ্রায়,
যে নাইকো কুলে, সেও গোকুলে,
ঘটাবে এক বিষম দায়।
এখন, সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিত পদ, দেখ জেল সম্পদাস্পদ,
কেবল বাইরে যারা, তারাই সারা,
জেলে কে ভাবে বিপদ?
তাই বলি,
রাধে, তুমি সাধে সাধে জেলের কথা তুলো না।
জেলে দিলে শুধু লাঞ্ছনা, গেলে পরে ক্ষীরছানা,
দেখেও এত কারখানা, রাধে, ভুলো না আর তুলো না।
বরং আমার কথা রাখো রাই,
মানের গোড়ায় দাও গো ছাই,
তোমার কুটকুটে মান, বিষের সমান,
কোনও পক্ষের ভদ্র নাই।
রাধে, কাজ নাই আর পোড়া মানে,
ও মানে কি লোকে মানে,
তাই মানা করি রাইকিশোরী,
মান ছাড় গো মানে মানে।
নিয়ে ঘরের কুচ্ছ, পরের তুচ্ছ
সইবে কেন পার্ধ্যমাণে।
ধনি, মানের এখন মানে নাই,
আপন মানত আপন ঠাঁই,
বাঁধো কালাচাঁদে, প্রেমের ফাঁদে
এই উপদেশ ধরো রাই।

ব্যঙ্গদর্শন।

খণ্ড কাব্য।

মহাকবি শ্রীগোরাদাস বিরচিত।

একটা মহাখেদ।

এছার জীবন আর, কি সুখ রাখিয়া ?
বৃথায় এ দেহ-ভার; বঙ্গ-ভূমী যদি,
না হইল সুশিক্ষিতা! সুবিশাল দেশে—
সাতকোটী নর-নারী নিবসে যেখানে,
চলে, বলে, খায়, শোয়,—অধিক কি, মরে,
—পুরুষ দেখি না এক অপণ্ডিত যেই!
তবে কি রমণী শুধু মুরুখ রহিবে,
চিরদিন ? হবে না কি পালে পালে তারা,
হাকিম মোদের মত ? শত শত গুণ,
নারী সংখ্যা অপেক্ষায় সংখ্যা পুরুষের,
কারাগারে নিত্য দেখি ? থাকিবে কি তাই ?
বিষমতা বিনাশের উপায় চিন্তিতে,
নাহি সাম্যবাদী কেহ ? পুরুষে পুরুষ,
একাতরে ঠেলে জেলে গোরাঙ্গ-ইঙ্গিতে ;
বুঝ না কি বুদ্ধিমন্ত, শ্রীমতী শ্রীমতী,—
শ্রীমুখের আজ্ঞা বিনা যাবেনা শ্রীঘরে,
শ্রীমানের দল যথা ? পেয়াদার যম,
মুনসেফ, সদরালা, হবে না রমণী ?
আর্দ্দালীরে সিন্নি মেনে, কৃপা লভি তার,
শ্রীজজ শ্রীমেজেষ্টর দরশন করি',
পাপমুক্ত, শাপমুক্ত কভু নাহি হবে,
এ ভারতে ? লম্বোদর, নজীর-গোচরে,
বোঝিয়া, সুহুঙ্কারবে, সুগম্ভীর ভাবে,
দানিয়া শ্যামের ধন অকাতরে রামে,
রবে না রে নিরখিয়া আপীলের পথ,

লম্বা কর্ণ (১) খাড়া করি? হায় রে যেমতি,
কোলের বাছুর ছুটে পলাইলে দূরে,
কেন্দ্র করি গোঁজে, দড়ি ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া,
ত্রাসে বিরসে বৃত্ত আঁকে গোঠে, মাঠে,
[যথা যবে বাঁধা] গরু—আঁকে যথা ছেলে,
আন্দাজি অনেক বৃত্ত পরীক্ষা-মন্দিরে,
"অতিরিক্ত' (২) থাকে যদি প্রশ্ন-পত্র মাঝে।
[মালোপমা অলঙ্কার, শিখে রাখো শিশু।]
কি কথা বলিতেছিনু? ভুলে গেছি, মা!
উপমার উপসর্গে,—ভুলে যায় যথা,
করিতে অর্থের যোগ, শব্দছটা মাঝে,
বঙ্গের সু-কবি যত—[অধীনের মত;
ধরিয়া লেখনী-খন্তা, সাহিত্য-উদ্যানে,
ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট করিবার কালে
উপমা বিষম বস্তু চালাইতে পারে,
অতি অল্প লোক হেন জন্ম লভিয়াছে,
ভূভারতে। সাক্ষী দেখ, কিবা ফলাফল,
ঘটিয়াছে উপমার প্রয়োগ বিষয়ে;—
কালিদাস যে উপমা-গুণে স্বর্গবাসী,
সেই সে উপমা-দোষে কারাগারে গেল,
বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ। কি কব অধিক?

এক কাণ্ডে সুরেন্দ্রায়ণ।

(মদন তর্কালঙ্কারের রচিত)

সুরেন লিখিল, ফরেল দেখিল,
নরিশ চটিল, রুলটি ছুটিল।
পাঁচটি বসিল, চারিটি রুষিল,
মেয়াদ কশিল, পরব শেষিল।

---

(১) বলি, গরু কি লম্বকর্ণ? উপমায় যে দোষ পড়িল। —(শ্রীমল্লিনাথ শুঁড়ী।

(২) সেকালে জ্যামিতির পরীক্ষায় 'অতিরিক্ত' অর্থাৎ Extra Problem থাকিত।

পঞ্চানন্দের ডায়েরী।

মাথা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে দোষীর দোষ দিব না, এমন কোনও কথা নাই। ক্ষমা করিতে বলো, করিতে রাজি আছি;—কিন্তু সে বক্তৃতায়, কাজে নয়। কাজে কি ক্ষমা করিলে কাজ চলে? অনেকে আমাদিগকে ভাষার শত্রু, জাতির শত্রু, দেশের শত্রু মনে করিতে পারেন, করিয়া থাকেন, এবং করিবেন, তাহা জানি। কিন্তু ভাষা কি? জাতি কি? ধর্ম্ম কি? নীতি কি? দেশ কি? কিছুই নহে! শুদ্ধ মায়া, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। বরং এ সবে রোজগারের বিঘ্ন হয়, সুবিধা কখনই হয় না। টাকাটা আগে ট্যাঁকে গুঁজে এ সব ইয়ারকিতে মন দিলে, তত ক্ষতি নাই। কিন্তু যেখানে টাকা রহিল লোকের বাড়ী, সেখানে তুমি যদি সৃষ্টিছাড়া উপসর্গের পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াও, তাহা হইলে, লক্ষ্মী যে তোমার দ্বারস্থ হইয়াও কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কি তোমার মনে করা উচিত নয়?

আসল কথা, পঞ্চানন্দ নররূপে অবতীর্ণ হইলেও সাধারণ বা সাধারণীর দলভুক্ত নহেন। তিনি "স্ব স্ব প্রধান" অসাধারণ মনুষ্য। বাঙ্গালী যে গুণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, সুতরাং সমাদৃত, সেই গুণের শুদ্ধ নবনীতটুকু লইয়া পঞ্চানন্দের অন্তরাত্মা বিনির্ম্মিত। এক কথায় বলিতে গেলে, পঞ্চানন্দ বাঙ্গালীর বাঙ্গালী—অর্থাৎ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, যাহাকে সহজ ভাষায় জীনিয়স্ বলা যায়। বিশ্বাস না হয়, তাঁহার স্বহস্তে লিখিত দিনলিপি হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী স্থলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি হইবেক। দিনলিপি অবশ্যই ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়। কিন্তু ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষায় রীতিমত শিক্ষিত অন্য জাতীয় লোকে নাকি সে ইংরেজী কোনও মতেই বুঝিতে পারিবে না;—এদিকে যাহারা ইংরেজী শেখে নাই, তাহারাও ঐ ইংরেজীর মোয়াড়া লইতে সাহসী হইবে না, সেইজন্য আমি কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় "পরোপকৃতয়ে" তর্জ্জমা করিয়া দিলাম।

২৩শে আষাঢ় শনিবার, ৮–৩০ পূর্ব্বাহ্ণ। নসীরামের আসিবার কথা সকাল সকাল, এখনও আসিল না। আসিবেই বা কি করিয়া! বাপ! কালিকার ব্যাপার ত যেমন তেমন নয়! এইত আমি ঘুম থেকে উঠিলাম, কিন্তু সে কি ঘুম? মাথা ফাটিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ এমন কামড়াইতেছে যে, সে কথা আর কি বলিব? নোসেরও নিশ্চয় খোঁয়ারি ধরিয়াছে,—অমন যে গঙ্গা, তিনিও কালি মড়া আলিয়াছেন! * * * এইবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই শেষ প্রতিজ্ঞা, গুরু যদি আসিয়া পায়ের উপর মাথা কোটেন, আর মদ খাইব না। ভাবিতে গেলেই অবাক্ হইতে হয়! কে জানে, তবু কেন যে লোকে ঘরের পয়সা দিয়া দুর্নাম আর যন্ত্রণা কেনে! দোহাই মা মনসার!

আমি যদি ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছু ঠাওরাইতে পারি। যাহা হউক, মদটা আর খাওয়া হইবে না। আর যে খাইবে, সে খাউক, উচ্ছন্নে যাউক, আমি আর মদ খাইব না।

ঐ দিন, ১টা অপরাহ্ন। ভাগ্যে কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার দিন আজকে ঠিক করি নাই। এতক্ষণে আহার হইল—আহার কি রোচে? রাত্রের দরুণ এখনও চোঁয়া ঢেঁকুর মারিতেছে, তায় আবার রশুনের যে গন্ধ! চাচা বেটা এত রশুন দেয় কেন? কিন্তু তাহাও বলি, ঐ রশুনের জোরেই আমিত খাড়া আছি, নহিলে এতদিন গেঁটে বাতে পঙ্গু হইতে হইত। সমস্তই মদের ফল। হা বঙ্গসন্তান! তুমি কি চক্ষুরুন্মীলন করিবে না? কখনই কি তোমার চৈতন্য হইবে না? তোমার না হয়, না হউক, আমি কিন্তু এই তিন সত্য করিয়া ছাড়িলাম। স্বয়ং লাট সাহেব হাত বাড়াইয়া দিলেও, মদের গেলাসটী পর্য্যন্ত আর ছুঁইব না।

ঐ দিন ৫-৩০ অপরাহ্ন। সে কিরে! ইহারই মধ্যে সাড়ে পাঁচটা? বঙ্গদর্শনের জন্য আজি একটা প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া কথা দিয়াছিলাম, কিন্তু আজি ত আর কোন মতেই ঘটে না। বিশেষ, আমি একটা প্রবন্ধ লিখিলেই কি, আর, না লিখিলেই কি? এ পোড়া দেশের উন্নতি কখনই হইবে না, অভাগা জাতির দুর্গতি কিছুতেই ঘুচিবে না। * * * সন্ধ্যার পর রঙ্গিলালের বাগানে যাইবার কথা। গেলেই কিন্তু গোল। নোসে যদি আসে, সে ত ছাড়িবে না! তাহার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ করিলে হইতে পারে, বাক্যালাপ, মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিলে চলিতে পারে। কিন্তু সেটা কি ভাল? পৃথিবীতে কেহ কাহারও নহে; আর কয়দিনের জন্যই বা আসা? কেন তবে লোকের মনে কষ্ট দিয়া আপনি কষ্ট পাইব? যাহা সুখ, বন্ধুত্বেই আছে। নিতান্ত যদি নসিরাম না ছাড়ে, বাগানে যাইব। মদ না খাইলেই হইল, বাগানে যাইবার দোষ কি? বরং প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া প্রলোভন কাটানই পুরুষত্ব। সুদৃষ্টান্তে আর দশজনেরও ভাল হইতে পারে। বাগানে যাইব বৈ কি, মদটা খাইব না এই মাত্র।

ঐ দিন, ৭টা ৪৫ অপরাহ্ন। নসিরাম যে এখনও আসে না। তা ভালই হইয়াছে, আজিকে আর যাইবার কথাই উঠিবে না। একদিন কাটিয়া গেলেই এক যুগ কাটিয়া যাইবে। বাস্তবিক সংসর্গ-দোষেই মানুষ নষ্ট হয়; নহিলে আপনা আপনি কেহ কখনও মন্দ হইত না। * * * ঐ যে নসিরাম আসিতেছে। দূর কর ছাই! এইখানে বন্ধ করা যাউক, নহিলে নসিরাম যদি এসব কথা পড়ে, তাহা হইলে রাগ করিবে। বন্ধু-বান্ধবই যদি চটিল, তবে আর সংসারে থাকাই কেন?

২৪শে আষাঢ় রবিবার, ৪-৩০ অপরাহ্ন। নেশা হয় বলিয়া যদি মদ ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে পেটের ব্যারামের ভয়ে পোলাও কালিয়াও ছাড়া উচিত। কেনই বা ছাড়িব? আমি স্বীকার করিতেছি যে, গত রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করি নাই, মদ খাইয়াছিলাম, কিন্তু মদ না খাইলেও বলিতাম যে, মদ ছাড়িবার কথা

মতি কাপুরুষের কথা। অধিকন্তু মদটা ছাড়িয়া দেওয়া কি একপ্রকার রাজদ্রোহিতা নয়? আবকারিতে এক পয়সা দিব না, সরকার বাহাদুরের খয়ের খাঁ হইব কেমন করিয়া? কালি যে মদ খাইয়াছি, তাহাতে দেশেরও একটা লাভ হইয়াছে, সে কথাটা সোণার অক্ষরে লিখিয়া রাখিব; হউক মাতালের মজলিশ, কিন্তু কালি রাত্রে ইংরেজী ছাড়া এক বর্ণ বাঙ্গালা কথা কেহ কহে নাই। কবে সেদিন আসিবে, যে দিন চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত পুত্র পিতাকে ডাকিবে—"প্রিয় বাবা," মাতাকে ডাকিবে—"প্রিয় মা,' আর কেবল যে, ইংরেজীতে কথাবার্ত্তাই হইয়াছিল, তাহা নয়;—ভারতবর্ষের সমুদায় স্ত্রীলোককে মাস পাঁচ ছয়ের জন্য বিলাত পাঠাইয়া দিয়া, নাচ শিখাইয়া ডাই-বোর্সের আইন বুঝাইয়া, বিবাহের প্রতিজ্ঞাভঙ্গে স্ত্রীজাতির লাভ দেখাইয়া উন্নত করিয়া আনিবার কথা কি সেই মজলিশেই স্থির হয় নাই? সত্য কথা বলিতে কি, মেয়ে মানুষ মাত্রেই যে পর্য্যন্ত বাইজী, কি, খেমটাওয়ালী না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কাজে কাজেই বাইজী ও খেমটাওয়ালী লইয়া বাগান বজায় এবং মজলিশ রক্ষা করিতেই হইবে।

ভারত ভক্তের গান।

আমি অনুরক্ত ভারত-ভক্ত,
ভারত-মাতার সুসন্তান।
(আমার) দাও তুলে নিশান।
(ঐ)

(১)

গৌরব আমার যত,
মুখে ফুটে বোল্‌বো কত,
ভারত-উদ্ধারের ব্রত,
নিয়ে, থাকি দিনমান।
শুধু রাত্রিকালে, ইয়ার পেলে,
গড়ের মাঠে সখের প্রাণ!

(২)

পোড়া ভারতের তরে,
যখন আমায় শোকে ধরে,
ডেকে ডুকে সভা কোরে,
ইংরেজীতে ছাড়ি তান।

ও ছার মা ষা, কর্ম্মনাশা,
সভা অপমান !

(৩)

ঘুচিয়ে হাটের নেড়া,
ছেলেদের বানিয়ে ভেড়া,
ভারতে ভারত-ছাড়া,
কোচ্চে আমি যত্নবান।
আমার পেট্রিয়টি, নেহাত খাঁটি,
গোটা ভারত নেজান !

(৪)

এখন আমার কাঁধে ঝুলি,
মুখে ভারত ভারত বুলি,
দিয়েছি জলাঞ্জলি,
ভারত-মাতার কুল-মান।
এমন খোদ-বিরাগী স্বার্থত্যাগী
কে আছে আমার সমান ?

(৫)

"জেনানা" কারাগারে,
রমণী কি থাক্‌তে পারে ?
কুলে থেকে বাহির কোরে,
স্বাধীনতা করি দান।
আমি আপনি গোলাম, গেলাম গেলাম,
ভাবি নে তার অপমান !

(৬)

লেখা পড়া ষোলো কলা,
বোধোদয় বানান বলা,
নবেলের প্রেমের পালা,
কুলবালার ব্রহ্ম-জ্ঞান।
হের, নাচে গানে, তানে মানে,
ঘরে পাই এলাহীজান !

আমার খুব ভাল রুচি,
বিধবা পেলে রুচি,
বাদ দিয়ে খেঁদী পেঁচী,
মারি চোরা গোপ্তা টান।
তখন, মায়ের কান্না, বাপের ধন্না,
সকল করি তুচ্ছ জ্ঞান।

(৮)

ধোরেচি ধর্ম্ম-ধ্বজা,
মানিনে পরব্ পূজা,
সার কোরে চক্ষু-বোজা,
একটি লাফে ব্রহ্মজ্ঞান।
সাদা অনুতাপে, সকল পাপে,
হেলায় করি পিণ্ডদান।

(৯)

ঘরে বাহিরে জুতো,
রেলের গাড়ীতে গুঁতো,—
খেয়ে দেয়ে, পেয়ে ছুতো,
মন কোরেছে অভিমান।
এখন সেই রাগে, দেশ-অনুরাগে,
ধুতি ছেড়ে পেণ্টুলান।

ব্রাহ্মকোর্স।

(যাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে ভববন্ধন মোচন হইবে)

COMPULSORY SUBJECTS.

অর্থাৎ

যে সকল বিষয় লইতেই এবং মানিতেই হইবে।

১। জাতিভেদ—উচ্চতর জাতি নষ্ট করা পর্য্যন্ত।

২। স্ত্রীস্বাধীনতা—পঞ্চদশ অবধি চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত।

স্ত্রীশিক্ষা—সঙ্গীত-প্রকরণ; নৃত্য-প্রকরণ; প্রণয়-প্রকরণ; বিরহ-প্রকরণ

কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ, পিতৃমাতৃভ্রাতৃত্যাগ প্রকরণ; নাটক, উপন্যাস পদ্যরচনা, পত্ররচনা এবং গুরুজনলাঞ্ছনা।

৪। বিবাহ—বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, কুমারী বিবাহ, অচির বিবাহ, বিবি বিবাহ।

৫। উপাসনা—মন্দির-মিলন এবং নিরাকার নিরাকরণ। নয়ন-মুদ্রণ, ভেউ ভেউ করণ পর্য্যন্ত এবং পৈতা ছেঁড়া।

৬। ভারত-উদ্ধার—সম্পূর্ণ।

OPTIONAL SUBJECTS.

অর্থাৎ

যাহা লইলেও চলিবে, না লইলেও চলিবে।

১। মদ ও মুর্গী।

২। বঙ্গবাসী-বিরোধ।

৩। দেশভক্তি—(ঠোঁট হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত)।

৪। দাড়ি ও চসমা।

৫। ধনোপার্জ্জন—(পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ প্রকরণ)।

৬। রাজভক্তি—(বক্তৃতা ও ইংরেজ ভাড়ান পর্য্যন্ত।)

দুর্গোৎসব।

পহেলা পর্ব্ব—নিমন্ত্রণ-পত্র।

বর্ষা গেল, ফর্শা হোয়ে, নদীতে নাই বান।
রোদের চোটে, মাটী ফাটে, মাঠে নাইকো ধান॥
সকাল বিকাল, শুকো অকাল, চাষা ভেবে মলো।
হেসে, হেসে, শরৎ এসে, দেশে উদয় হোলো॥
বাবু ভেয়ে, ছুটি পেয়ে, দুগ্‌গো মায়ের গুণে।
নতুন শাড়ী, নিয়ে বাড়ী, যাচ্ছে রেতে দিনে॥
দুগ্‌গো পরব, দেশের গরব, বজায় থাকা ভালো।
লায়েক মুক্ত, ভোলে দুক্ত, পেয়ে সুখের আলো॥

কিন্তু হেথা, খেদের কথা, পুতুল খেলা নিয়ে।
ঘরে ঘরে, বিবাদ কোরে, ফাটায় দেশের হিয়ে॥
পরব করো, মজা মারো, দেশের পানে চাও।
বেদ কোরাণে, বিবাদ কেনে, এককাট্টা হও॥
ছিষ্টি ছাড়া, ঠাকুর গড়া, তিন-চোকো দশহেতে।
সবাই যখন, সভ্য এখন, কষ্ট পায় কি এতে?
ছেড়ে ছুড়ে, মুলুক যুড়ে, এমন তরো করো।
সবাই যাতে, হাতে হাতে, সগ্‌গ পেতে পারো॥
আসল শক্তি, যারে ভক্তি, সকল লোকে করে।
তার চেহারা, দেখ খাড়া, ঐ আছে উপরে॥
সকল ধর্ম্ম, হিঁদু, বেহ্ম, নেড়ে কেরেস্তান।
ওই মূর্ত্তি, পুজে ফূর্ত্তি, সবাই এখন পান॥
মোরা কজন, ওনার ভজন, কোরে পেয়েছি পদ।
বিমুখ যারা, ঠকে তারা, তাদেরি বিপদ॥
শক্তিসেবা, কোত্তে যেবা, আছ অভিলাষী।
চিন কি অচিন, পূজোর কদিন, মোদের বাড়ী আসি॥
হাজির হবা, সবান্ধবা, আরোজ্ঞ রাশি রাশি॥

ইতি তারিখ ২০শে শ্বেতাম্বর, হিজরী সন ১৩০২ সাল।	শ্রীআরে-দূর-রহ-মান (১)। শ্রীকায়েম-বানরজী (২)। শ্রীমহিস-নয়-রত্ন (৩)।

সাং মোকাম পূজোর দালান।

দোসরা পর্ব্ব—সংবাদপত্র প্রভৃতির মতামত।

"এক অদ্ভুত প্রতিমার অদ্ভুত নমুনা সহিত অদ্ভুত এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া, আমরা হতভম্ব হইয়াছি। মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি নাই, মতামত প্রকাশ করিব কি? এই নববিধান এবং নবজীবনের দিনে সহসাই সন্দেহ হয় যে, কোনও ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতৃত্ব ছাড়াইয়া জ্যেষ্ঠ তাতত্বের চেষ্টায় এই এক নব কাণ্ডের উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমাদেরও প্রথমে সেই সন্দেহই হইয়াছিল, কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের নাম দেখিয়া, সে সন্দেহ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে। অতএব

(১) তাৎকালিক আমীর আব্দর রহমান।
(২) ডব্লিউ সি বোনার্জী (৩) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

আমাদের [illegible] থাকিলেও, কেবল স্থান পূরণের অনুরোধে এই কয়টি সারগর্ভ [illegible] বাধ্য হইলাম। —(ভাঙ্গা বাঁশী) (১)

"[illegible] আমাদের চিরপোষিত আশালতা ফুল-ফলে সুশোভিত হইল। এত দিনে [illegible] ভারত-উদ্ধারের সোপানমার্গে প্রথম প্রস্তর পড়িল। এই নব উৎসবের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহা আমাদের এই মলিন-মুখী লেখনী [illegible] অসমর্থ। এরূপ উৎসব যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। এরূপ [illegible] উদারতা নহিলে কখনই আমাদের নষ্ট-গৌরবের নবসংস্করণের সম্ভাবনা [illegible] ফলতঃ সত্যের অনুরোধে আমরা ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না [illegible] উৎসবের নামকরণে যে পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে, তাহা না থাকিলে এবং [illegible] নিরাকার হইলেই আরও ভাল হইত। যাহা হউক, [illegible] কণা মাত্র সূচনা দেখিলেই আমাদের চিত্ত উৎফুল্ল [illegible] আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপে ভ্রাতা শ্রীবন্ত [illegible] পূজা "মন্দির" বলা হইল না?)—তিন দিন [illegible] থাকিয়া, [illegible] বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়া, কোরাণের [illegible] পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

[illegible] পানী (৩)

"নিমন্ত্রণ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমরা প্রকাণ্ড আমোদ পাই। এই ঊনবিংশ যুক্তিময় শতাব্দীতে আমরা জাতীয় সম্মিলনের উকিল হইলেও পূজা পর্ব্বের প্রয়োজন দেখিতে পাই না, ইহা আমাদের [illegible] একবার করিতেছি। প্রাচীন গ্রীসে, বা অন্ধকারাচ্ছন্ন আর্য্যসভ্যতাতে এ সকলের ব্যবহার ছিল সত্য এবং তখনকার অবস্থায় এতদ্দ্বারা কার্য্যও হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সাম্যবাদ, প্রজাতন্ত্রতা, বাষ্পীয় কল এবং বৈদ্যুতিক তারের দিনে, প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান বরং স্থানবহির্ভূত। ফলত আমরা এই উপলক্ষে যে সকল ভাল সামগ্রীর আশা করিতেছি, তাহার অনুরোধেও আমরা উপস্থিত হইতে সুখী হইব। আমরা যুক্তির এবং বিজ্ঞানের দাস,—এবং সকল যুক্তির সকল বিজ্ঞানের মূলসূত্র উদরেই প্রোথিত রহিয়াছে, সময় ইহা দেখাইবেই।"

—(হিন্দু-নাশন(৪) হইতে অনুবাদিত)

---

(১) ভাঙ্গা বাঁশী—'বঙ্গবাসী'। (২) আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

(৩) সাঁচিপানী—"সঞ্জীবনী"।

(৪) "হিন্দু নাশন"—ইংরেজি অধ্যাপক এন এন ঘোষ সম্পাদিত Indian Nation নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

তেসরা পর্ব্ব।—মারখণ্ডী পুরাণান্তর্গত চণ্ডী।

উত্তরে কোথায় বটে, কৈলাস নামেতে
ছিল কিম্বা আছে এক পাথুরে পাহাড়।
পাথর নহিলে কভু হয় না পাহাড়,
তাহা জানি। তবু সত্য কথা বলা ভাল।
চক্ষে দেখি নাই, কিম্বা স্বচক্ষে দেখেছে,
এমন লোকের মুখে..শুনি নাই, তাই
বিশেষ বর্ণনা তার করিতে অক্ষম
চিরদাস। নতুবা কি তমাল, পিয়াল,
শাল, তাল আদি গাছ গাছড়া যা আছে
অথবা মহিষ, বাঘ, আর, জানোয়ার
কৈলাসে সম্ভবে যত, তাদের বর্ণনা
করিতে ছাড়িত কভু আমার কলম?
স্থূল কথা, নাম মাত্র শোনা আছে তাই
বলিলাম। কৈলাসের কিছুই জানি না।

শিব নামে একজন কৈলাসে থাকিত,
এখন সে আছে কিনা বলিব কেমনে?
লোকে বলে সেই শিব ত্রিলোকীর রাজা।
বিশ্বাস করিতে পার, ইচ্ছা যদি হয়,
না হয়, গোল্লায় যাও;: ক্ষতিবৃদ্ধি তাতে
আমার কিছুই নাই। প্রমাণ প্রয়োগ,
যুক্তি কিম্বা তর্ক কিছু পাবে না নিশ্চয়!

বিষম গেঁজেল শিব,—এ ও শোনা কথা;
তা ছাড়া ধুতুরা, ভাঙ্গ, চলে অবিরাম।
এ লোক যে লক্ষ্মীছাড়া হবে, ইহা অনা-
য়াসে বুঝিবার কথা, বুঝাবার কিছু
দরকার দেখি না ত। বিশেষ যখন
ইংরেজী এক তোলা শিখে নাই শিব।

যেখানে যেমন কর্ত্তা, গৃহিণী তেমনি।
বিষম পাহাড়ে মেয়ে ভগবতী নাম,
শিবালয়ে ঘরকন্না তাঁরি অধিকার।

কর্ত্তা যেথা উড়ুক্করে বয়াটে, বোম্বেটে,
গিন্নী যে প্রখরা সেথা, বলাই বাহুল্য,
কাজে কাজে ভগবতী বড্ড আঁটা আঁটি
করিয়া থাকেন ঘরে, গাঁজার পয়সা
বার করে, তাঁর কাছে, হেন সাধ্য কার?
শিবের ইয়ার যারা, কাজেই নারাজ,
সদা ভগবতী প্রতি! কিসে মাগী জব্দ
হবে, তাই অহরহ চিন্তা করে তারা।
    দুরন্ত সে ভগবতী, আগেই বলেছি।
দশ হাত নাড়া দেয়, তিন চোকে চায়।
স্বামী কি আঁটিবে তারে, সেইত স্বামীকে
উঠায়, বসায়, যদি উঠ বস বলে।
যেখানে সেখানে শিব থাকেন পড়িয়া,
(সহজে ত বাড়ী যেতে সরেনাক মন)
পাহাড়ে হুড়কো মেয়ে সেই অবসরে
পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে বাঘের উপরে
চড়িয়া। ঘোড়ার পিঠে বিবিরা যেমন
ঘাটে যান, মাঠে যান, যথা অভিরুচি।
মহিষ মারিতে আর দুর্গার মতন
কৈলাসে ছিল না কেহ। দেখিয়া শুনিয়া,
মহিষমর্দ্দিনী নাম রাখিল তাঁহার।
বাঘে চড়া গ তার ভাবিল সকলে,
মাগী জানে াজবিদ্যা,—তাতেই এমন।
    দুর্গার । পুত্র, আর দুই সখী,
ঘুরে ফিরে দি াত করেন সকলে,
কিন্তু ত . সঙ্গ ছাড়া কখনই নয়।
হাতীমুখো হাঁদাপেটা বড় বেটা যেটা,
গণেশ তাহার নাম। ছোটটী কার্ত্তিক
এক সখী ধপধপে বিবির মতন,
গুণ গানে মজবুত, সরস্বতী নাম।
অন্য সখী বঙ্গদেশে নামে পরিচিত,
বাস্তবিক লক্ষ্মী-মুখ দেখেনি এ দেশ।

এই গেল দল বল; দুর্গা এই নিয়ে
কের্দ্দানি করিয়া ফেরে কৈলাস পাহাড়ে।
জাঙালে সবুজবর্ণ বেয়াড়া বজ্জাত
এক বেটা শিব-রাজ্য তোলপাড় করে,
বেহ্মজ্ঞানী বেয়াদব শিবকে মানে না।
বিষম বিব্রত সবে। শিব ত গেঁজেল,
যা কিছু রাজত্ব করা কুচনী-পাড়ায়।
বিষম অসুর সেটা, তাহে জানে মায়া,
তারে ধরিবার চেষ্টা করে যদি লোকে,
লুকায় কুহকবলে মহিষের পেটে।
শিবের ভরসা ছেড়ে প্রজাগণ এবে,
ভগবতীকাছে গিয়া আশ্রয় মাগিল;
মহিষমর্দ্দিনী মাগী মায়াতেও পটু,
উদ্ধার করিবে জানে, যদি করে মন।
কাজেও ফলিল তাই। দলবল সহ
ভগবতী গিয়া সেই অসুরে মারিল।
সেকেলে অসভ্য লোক বাহাদুরি দেখে,
দুর্গাকে ভাবিল দেবী। পূজার প্রকাশ
সে অবধি রাজ্য যুড়ে হইল দুর্গার।
অসুরঘাতিনী মূর্ত্তি সবল বাহনে
সকলেই দেখিয়াছে। বর্ণন বিফল।
বলা ত হয়েছে আগে, শিব-সহচর
বড়ই চটিয়াছিল দুর্গার উপরে।
এইবার হাতে পেয়ে, কতই লাগানে
কথা যে শিবের কাণে তুলিল তাহারা,
দেবতা জানেন, আমি কত বা বলিব?
বুঝাইল এ পূজাতে শিব-অপমান
প্রজারা করিছে, পেয়ে দুর্গার মন্ত্রণা।
গাঁজাখোর মহাদেব, বুদ্ধিও তেমনি,
(দুর্গার উপরে চটা তাহে মনে মনে
ভয়ে শুধু, মুখে কথা ফুটিত না আগে)
গাঁজায় মারিয়া দম বেদম হইয়া,

দুর্গাকে দুর্ব্বাক্য বোলে তাড়াইয়া দিল।
শিব বলে—"শুন দুর্গা, অতি মূর্খ তুমি,
সভ্যতা ভব্যতা কভু শিখ নাই কিছু;
এমন অবস্থা যদি, তোমাকে লইয়া,
ঘর করা চলে না ত। অতএব যাও,
এ সাত সমুদ্র, আর তের নদী-পারে,
বিলাতে শিখিয়া এস পতি-মন রাখা।

ফিরে এলে, যদি দেখি মানুষের মত
হইয়াছ তুমি, তবে আবার লইব।
নতুবা হইল এই দেখা, শেষ দেখা।"
আশে পাশে পঞ্চভূত ভারি খুশি হয়ে,
খিলি খিলি হাসি হাসি নাচিতে লাগিল।

রাগে দুখে অভিমানে ভগবতী সতী
বিলাতে গেলেন চলি, দল বল সহ।
আপনি বাঘের পিঠে, গণেশ ইঁদুরে,
কার্ত্তিক ময়ূরে চড়ি, লক্ষ্মী সরস্বতী
এক এক পদ্মে বসি, দিলেন চম্পট।
শক্তি-হীন, লক্ষ্মীছাড়া গণ্ডমূর্খ সবে,
গণপতি-গুরুহীন, শৌর্য্য-বীর্য্য-হত,
শ্রীভ্রষ্ট হইল রাজ্য, ভাঙ্গিল কপাল।

হেতায় বিলাত গিয়া মানুষ হইতে
ভগবতী ভর্ত্তি হোতে গেলেন ইস্কুলে।
আকার প্রকার তাঁর দেখিয়া অবাক;
ইস্কুলে লইবে কোথা, তাড়াইতে চায়।
শেষে বহু অনুরোধে এই হোলো স্থির,
ডাক্তারের হাতে দুর্গা মানুষের মত,
হইতে পারেন যদি, ভর্ত্তি করা যাবে।

দু-আঙ্গুলে লোক আছে, এই কথা ভেবে
ডাক্তার বুঝিল, হাত বেশি হোতে পারে।
দুর্গাকে করিয়া রাজি আট হাত কেটে,
রাখিল শেষ, স্বাভাবিক যাহা।

উলকী সমেত চামড়া কাটিয়া নাকের,
কপালের চোখ ঢেকে সেলাইয়া দিল।
দুর্গার বাহন বাঘ, চিড়িয়া খানায়,
কয়েদ রহিল। কিন্তু কিছু দিন পরে,
বিলাতি দারুণ শীতে লীলা সম্বরিল।
ভগবতী শিক্ষালাভে হইলেন রত।
শিখিয়া পড়িয়া ক্রমে মানুষের মত
হোলো শেষে ভগবতী। বিবিদের দেখে,
বাঘের বদলে এক কুকুর পুষিল।
গাউন পড়িয়া শাড়ী বিসর্জ্জন দিল।
এইরূপে বহুকাল হইল বিগত,
দেবীর হইল ইচ্ছা দেখিতে স্বদেশ।
অনুরোধ করিলেন কার্ত্তিক গণেশে,
লক্ষ্মী সরস্বতীকেও, কিন্তু কেহ রাজি
হইল না নিগারের মুলুকে আসিতে।
গণেশ "পারিলে-মন্দে" মেম্বর এখন'
ওজর করিল তাই। কার্ত্তিক বলিল,—
"রুষ যদি আসে তবে যেতেই ত হবে,
মিছা কেন আজি হোতে কর্ম্মভোগে যাব,
যে কদিন পারি, করি আমোদ আহ্লাদ।"
লক্ষ্মী বলে—"সে শ্মশানে আমি আর যাই?"
সরস্বতী বলিলেন—"ভট্টাচার্য্যি দলে,
খাবার বড়ই কষ্ট; আমি ত যাব না।"
একা ভগবতী তাই আসিলেন দেশে,
কুকুরে করিয়া সঙ্গী। শিব-সহচর,
দেখিয়া ভাবিল গোল, এ বেটি থাকিলে,
আবার সাবেক ধারা চালাবে নিশ্চয়।
পরামর্শ এই শেষে হইল সুস্থির,
ভুলাইয়া কাজ সারা উচিত এখন।
এই ভেবে খোষামোদ জুড়িল দুর্গার,
বলিল—"তোমাকে কিছু হবে না দেখিতে,
বহুকষ্টে বহুদিন বহু শিক্ষা তুমি

করিয়া এসেছ দেশে। কিছুকাল এবে
বসিয়া বিশ্রাম করো। বরঞ্চ ফিরিয়া
বিলাতে যাইয়া তুমি সুখভোগ কর।
নহে ত জানই, সেই গাঁজাখোর শিব,
জ্বালাতন করিবেক নিশ্চয় তোমারে।
রাজ্যরক্ষা ভার দেখ আমাদের হাতে।
শিবের চালাকি আর খাটে না কিছুই।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি চক্ষু বুজে থেকো,
রাজ্যের খারাপি কিম্বা প্রজার অসুখ;
হয় যদি আমাদের বলিও তখন।"

দুর্গাও বুঝিলা ভাল। বিশেষতঃ প্রথা,
দেখিলেন বিবিদের। স্বামীকে রাখিয়া
আপনি মুলুকে থাকা ধর্ম্ম-অনুগত।
মহামায়া মহাশক্তি মহিষ-মর্দ্দিনী
ভুলিয়া মায়ের মায়া, মজার খাতিরে,
সুদূর সাগরপারে গেলা যে চলিয়া।
উপদেশমাত্র তার রহিল হেতায়,—
"অভেদে অপক্ষপাতে ধর্ম্ম যেন থাকে।"
নিত্য যায় সমাচার দেবীর সমীপে,
প্রজারা পরম প্রীত, পূজে পূর্ব্ব মত।
কি প্রতিমা পূজা হয় কিবা আয়োজনে,
চক্ষু বুজে দেবী তাহা দেখিতে না পান।
যদি কভু চক্ষু চেয়ে চাহেন চিন্ময়ী,
চূড়ান্তই দেখিবেন পাঁচুর পুরাণে।
অতি পুরাতন এই চণ্ডী-উপাখ্যান।
সরল ভাষাই তার অকাট্য প্রমাণ।

———

দুর্গোৎসব।



—১০৪ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় কাণ্ড।

চৌঠা পর্ব্ব।—নবদুর্গোর ধেয়ান।

দুটী চক্ষু বুজে দেবী আছেন দাঁড়ায়ে।
সজ্জ্য হয়েছেন গায়ে গাউন চড়ায়ে॥
ডানি হাতে ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়ে পত পত।
বাঁ হাতে ইঙ্গিত করা ধর্ম্ম রক্ষা কত॥
ফুকারিয়া কাঁদে প্রজা মুদ্রাযন্ত্র মুখে।
বাঁ পায়ে চাপিয়া দেবী হাসিছেন সুখে॥
কুকুর হয়েছে এবে বাঘের বদলে।
জষ্টিস্ মহিষ পড়ি কাঁদে পদতলে॥
খুঁজিয়া অসুর আর পান নাই দেশে।
পিলে রোগা সেই স্থানে পড়িয়াছে এসে॥
লক্ষ্মীর বদলে এক রাক্ষস বিকট।
গরাস করয়ে দেশ চাহে কটমট॥
কোথা সেই সরস্বতী? পরিবর্ত্তে তার।
যমজ হয়েছে দুটা যম অবতার॥
ইঁদুরের পরিবর্ত্তে মদের পিপায়
গণেশ রিপণ চাচা বোসে ভাবে দায়॥
ভমসান কার্ত্তিকের কাড়িয়া আসন।
বীরপণা দেখাইছে হরসে আপন॥
বিচিত্র চালের চিত্র সদা চিত্তহর।
নিত্য কত কীর্ত্তি করে নফর চা-কর॥
বলিহারি বলি দিতে কিবা আয়োজন।
হাড়িকাঠে বাঁধা ওই বালক কজন॥
শুক্র আর শাস্তিকারী কর্ম্মকার-রূপে।
সদাই ভাবিছে, ফেলি কোনটারে যুপে॥

পঞ্চমপর্ব্ব।—পঞ্চানন্দী।

বেলপাতা আর গঙ্গাজল।
গ্যাছেন এবার রসাতল॥
আতপ চেলের নৈবিদ্দি।
তাতে আর হবে না সিদ্ধি॥

এখন, মদে মাসে, র লুসে
পূজার কর আয়োজন।
সেই বকেয়া কৃষ্ণযাত্রা।
তাতে আর ভোলে না কর্ত্তা॥
সপ্তমী টেবিলে খানা।
পরে তিন দিন পথের খানা॥
এবার, হিপ্ হিপ্ হুরে, মুল্লুক যুড়ে,
এই ভাবেতে বিসর্জ্জন।

সধবা—বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব।

[দুটো কথা লিখিব নাকি?
ঐ দেখ,
"ভ্রাতা" রুচিময়ী চসমা কসিতেছেন!
তা হউক;
বঙ্গবাসীর জয় হউক,
শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক—
লিখি]

পঞ্চানন্দের কতিপয় বিশেষ নিয়ম।

১। কাহারও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, সম্পাদকের মতামতের জন্য কেহই দায়ী নহে, সম্পাদকও না।

২। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম রুচি বটে। কেবল পঞ্চানন্দের ভিন্ন রকম রুচি হইতে পাইবে না।

৩। বঙ্গবাসী চেঁচাইলেও পঞ্চানন্দ দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্য করিতে বাধ্য নহেন। যাহারা বিধবাবিবাহের সপক্ষ, তাহারাই বাধ্য।

৪। যোগীরা কিছু খান না, ভোগীরাই খায়। পঞ্চানন্দ ভোগী, সুতরাং গালি খাইতে বাধ্য।

৫। টাকা কড়ি একাএক পঞ্চানন্দের নিকট পাঠাইতে হইবে। [গালাগালি বঙ্গবাসীকে দিলেই চলিবে।]

ভূমিকা।

মাল ভারী (১) মেয়েদের হইয়া আড়ে হাতে লাগিয়াছেন, অথচ সধবার উপর তাঁহার কৃপাকটাক্ষ হয় নাই। আমার ঘর কন্না আছে, অতএব আমি সধবাদের জন্য অদ্য রঙ্গভূমে অবতীর্ণ। এক্ষণে পাঠিকামহলে আমার পসার জমিয়া গেলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

বিচার।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ, ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই। আমি প্রতিপন্ন করিব যে, সধবাবিবাহ চতুর্গুণ শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥'

ইহার মধ্যে মৃত একটী, জীবিত চারিটি,—নষ্ট, প্রব্রজিত, ক্লীব এবং পতিত। অতএব, এ প্রমাণে যদি বিধবার পতি যোটাইয়া দেওয়া বিধি হয়, তাহা হইলে সধবার বেলায় তাহার চারিগুণ ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। ইহা অঙ্ক শাস্ত্রের কথা, সুতরাং অভ্রান্ত।

সিদ্ধান্ত হইল যে, সধবার বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু সকল সধবার নহে। জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু নাচার। শাস্ত্রের অন্যায় মতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইতে রে না। ফলে তাহাতে বিশেষ বাধিবে না। কোন্ কোন্ সধবার বিবাহ হইতে রে, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

প্রথম, যে সধবার পতি নষ্ট। পতির নষ্টামির কথা ঠাকুরাণীরা যেমন জানিতে রিবেন, আমি তেমন পারিব না। কিন্তু সাধারণভাবে কতকগুলি উপদেশ দিতে রি। মনে কর, হাতে টাকা থাকিতে পতি মহাশয় নষ্টামি করিয়া পূজার সময়ে ভাল পড় কি নূতন গহনা দিলেন না। এতদিন কেবল মান করিবার নিয়ম ছিল, সে, স্ত্র না জানার দরুণ। এখন আমার আশীর্ব্বাদে শাস্ত্র জানিয়া, আর মান নয়, কেবারে একটী বিবাহ করিয়া বসিবে। পতির নষ্টামি ঘুচিবে, সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট তির হাত এড়াইবে।

কেহ কেহ নষ্ট শব্দের অর্থ করেন—পলায়িত। তথাস্তু। হুড়কো পতির অভাব ই, আফিস হইতে বাড়ী আসেন না, বাহিরে বাহিরে নিরুদ্দেশ হন, অর্থাৎ পলান। ই গোয়াল শূন্য দেখিবে, অমনি পলায়ন সাব্যস্ত করিবে; পরক্ষণেই বিবাহ। নষ্ট তির হঠাৎ পুনরুদ্ধারে কোনও কোনও স্থলে একটু গোলের সম্ভাবনা বটে। বিশেষ রিয়া দেখি নাই, কিন্তু তদ্রূপ ক্ষেত্রে বোধ করি পঞ্চগব্যে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিবে।

(১) সামাজিক আন্দোলনকর্ত্তা বাবাজী মালাবারী।

দ্বিতীয়, যে সধবার পতি প্রব্রজিত অর্থাৎ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া জ্ঞান বা পরমার্থের জন্য যে ব্যক্তি তীর্থস্থানাদি উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে। নূতন অভিধানে, জ্ঞান মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধোপার বোঝা, পরমার্থ মানে টাকা, তীর্থস্থান মানে বিলাত প্রভৃতি জায়গা, বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।

পতি কলেজে গিয়াছেন, পত্নী একটী বিবাহ করিবে; পতি জাহাজে চড়িয়াছেন পত্নী একটী বিবাহ করিবে; পূজার সময়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার জন্য পতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মান্দ্রাজ, শিমলা বা দার্জিলিং পাহাড়ে পরিব্রজ্যা করিতে গেলেন। তখন কিছু বলিবে না, কিন্তু ইঞ্জিনের ভোঁ শুনিবে, আর এদিকে বিবাহের শঙ্খধ্বনি জুড়িয়া দিবে। অন্য পতি যেটী তখন ঘটিবে, সে নিশ্চয়ই নষ্ট, সুতরাং আবার পালটানো চলিবে, শাস্ত্র মানিলে ভাবনা কি?—বিবাহের স্রোত।

তৃতীয়, যে সধবার পতি ক্লীব, তাহার অন্য একটি পতি করা বিধি। যদি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কিছুমাত্র মানে থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে সম্প্রতি এ জাতীয় পতির অভাব নাই। ফলে ক্লীব মানে পুরুষত্বহীন; রাত্রিকালে যে ব্যক্তি ঘরের বাহির হইতে পারে না, সাহেব-সুবার কাছে যে বুক ঠুকিয়া যাইতে পারে না, সমস্ত মাস খাটিয়াও যে ব্যক্তি মাসে অন্তত একশত টাকা রোজগার করিতে পারে না, তাহার আবার পুরুষত্ব কোথায়? তদ্রূপ ক্ষেত্রে পতি পালটানোই ব্যবস্থা। কেমন সধবাদেরই পোয়াবারো—না?

চতুর্থ ক্ষেত্রেই ভারি সুবিধা। যাহার পতি পতিত, সেত বিবাহ করিবেই। দাসী আসিয়া অন্দরে খবর দিল—"বাবুর কি এখন গোয়ান আছে? বাবু বারাণ্ডায় পোড়ে র'য়"—আর বলিতে হইবে না। "পোড়ে" এই শব্দ বলিলেই সাধুভাষায় তর্জমা করিবে, পতিত। তৎক্ষণাৎ বিবাহ। বাবু কাদায় পা পিছলিয়া পতিত,—বস্। একটী বিবাহ। বাবু ঠাকুর দেবতা মানেন না, খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না, হিন্দুসমাজে পতিত; কথাটী কহিবে না কহিবে একটী বিবাহ। শিক্ষিতা মহিলা বিদেশস্থ পতির পত্রপাঠে জানিবেন—বাবু ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছেন, উত্তর না দিয়া একটী বিবাহ। এতেও যে সধবার পত্যন্তর ব্যবস্থা মিলিবে না, তাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই। কারণ, যাহার যেমন পতিই হউক না কেন, পতিত ত বটেই। তবে আর ভাবনা কি? সধবামাত্রেই এখন আমাকে ধন্যবাদ দিতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের দুঃখ দেখিয়া যাহার প্রাণ কাঁদে না, নিশ্চয় তাহার প্রাণের চক্ষু নাই। কেবল বিধবার জন্য, কিম্বা বালিকার জন্য, কিম্বা অন্তঃপুরিকার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, তাহার প্রাণও একচোখো। আমি সে পক্ষপাত ঘুচাইলাম। আমার জয়জয়কার হউক।

উপসংহার।

(করুণ রসে)

হা রমণীকুল! তোমরা এখন কত পাপেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতেছ! (১)

নানান কথা।

পঞ্চানন্দের সবই উল্টো। লর্ড রিপণ ভারত ছাড়িয়াছেন, লোক কাঁদিয়া আকুল। ধ্বজা ধরিয়া স্কুলের ছেলের কান্না, গলা চিরিয়া বাক্যবাগীশের কান্না, স্তম্ভ বোঝাই করিয়া খবুরেদের কান্না, চাঁদার খাতা কোলে করিয়া চাঁদা-সই-করাদের কান্না, রোশন-চৌকী বাজাইয়া ধুমধেমেদের কান্না, রূপার খোলে সোণার জলে লেখা কাগজ লইয়া প্রভাতী গাইয়েদের কান্না;—এ, মশাই, কান্নার আর বিরাম নাই। সেই অবধি কেহ ঘুমায় নাই, কেহ খায় নাই, কেহ গৃহস্থলীর কাজ কর্ম্ম দেখে নাই, কেহ গিন্নীর গহনা গড়াবার জন্য সোণাটুকু পর্য্যন্ত কেনে নাই। এই উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত ঘন-ঘটা-সমাচ্ছন্ন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অচল, অটল, অভ্রভেদী, অভেদ্য একমাত্র—

শ্রীমান্ পঞ্চানন্দ!

তাই বলিতেছি, পঞ্চানন্দের সবই উল্টো। বাস্তবিক কিন্তু পঞ্চানন্দ একা নয়, লর্ড রিপণ ভারত ছাড়াতে অনেকের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে; অনেকেরই সুখের সীমা পরিসীমা নাই। এই ধরো না একে একে—

১। হৃষ্ট ইংরেজ—খুসী হয় নি?

২। প্রজাহিতৈষী জমীদার—খুসী হয় নি?

৩। আঁখরের রাজা মহারাজা খুসী হয় নি?

৪। আর্টষ্টুডিও কত ছবিই বেচলে—খুসী হয় নি?

৫। বঙ্গবাসী আধা দামে তুলো খদ্দের—খুসী হয় নি?

এই পাঁচ জনের আনন্দ হইলেই ত পঞ্চানন্দ, কিন্তু এতেই কি ক্ষান্ত নাকি? আরও কত আছে! এই দেখ—

৬। লাট তমসান খুসী,—হাতে হাতে উপাধি লাভ।

৭। "ভ্রাতা" খুসী,—লোকে রিপণকে প্রায় দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, হাত-পা ওয়ালা আস্ত সাকার দেবতা। গেরো গ্যাছে!

---

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব" পুস্তকখানিও এইরূপ আক্ষেপাত্মক করুণরসে শেষ করা হইয়াছে।

৮। মেয়েরা খুসী,—বেরিয়ে যেতে পেয়েছেন লাট-বাড়ী পর্য্যন্ত।

৯। মিরার খুসী,—নইলে অত সোনাদানার বাহার কেন ? (১)

১০। ইংলিশমান খুসী,—ভয় গেল, ভরসা হ'লো।

১১। পঞ্চানন্দ ত খুসী বটেই—আবার বাধিল।

দরখাস্ত।

ববাবর শ্রীলর্ড-হৃ-পার-হীন প্রতি আগে।

পরাধীন পঞ্চানন্দ খোদ বাহাত্বরের নিবেদন সংপ্রতি হুজুরের শুভাগমন মাত্রে শ্রীযুক্ত মিষ্টার বাবু সাহেবদের পোষাক সম্বন্ধে কথন কি কথা বলিবাতে তাহা লইয়া এ পাড়ায় দাঙ্গ হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হইবাতে এপক্ষ মধ্যস্থ মনোনীত হওয়ায় আসল ব্যাওরা কি এবং কোন্ কোন্ লফজ হুজুরের শ্রীমুখ হইতে বাস্তবপক্ষে বাহির হওয়া, তাহা না জানা গতিকে বিচার করণে বহুতর গোলোযোগ হওনের সম্ভাবনা থাকা মতে হুজুরের নিকট প্রার্থনা, সেই সকল ঠিক ঠিক কথার অবিকল আবেদা নকল এপক্ষের খরচায় পাঠাইয়া দিবার অনুমতি হইলে তন্মূলে পোষকের কথা কতদূর উঠা না উঠা এবং তাহাতে জাতিবিরোধ কিম্বা জাতিবিরোধের কি কতদূর হইতে পারে তাহা দেখা যাইলে বঙ্গবাসীর দোষ কি বঙ্গদ্বেষীর দোষ তাহা সরেওয়ারা প্রকাশ পূর্ব্বক হুজুরে দাখিল করিবার অভিপ্রায় রহিল, হুজুর মালিক নিবেদন ইতি।

লাট-বাড়ীতে ধুতির অভাবে (২)

(ঢাকা ভাল কি খোলা ভাল ?)

আচ্ছা, লাট সাহেব যখন সেদিন সাহেব-সাজা বঙ্গালী বাবুদের পোষকের দোষ দিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি তৎক্ষণাৎ সেইখানেই সব কাপড় চোপড় ফেলিয়া দিয়া অভিমান দেখাইতেন, তাহা হইলে,—

প্রথম প্রশ্ন। কেহ অপ্রতিভ হইত কি না ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। অপ্রতিভ হইলে কে অপ্রতিভ হইত—লাট সাহেব, না বাবুরা ?

---

(১) সেইদিন Indian Mirror সংবাদপত্রখানি সোণার অক্ষরে রিপণের গুণগান করিয়াছিলেন।

(২) বড়লাট লর্ড ডফরিণের কাছে এদেশীয় কতিপয় সম্রান্ত ব্যক্তি ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও অঙ্গে চোগা চাপকান ছিল এবং কেহ সাহেবী পোষাকে গিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে লাট সাহেব ভারতীয়দের পক্ষে চোগা চাপকান ব্যবহারের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটু অম্ল মধুর রকমের মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তৃতীয় প্রশ্ন। লাট সাহেবের হুকুম মানিলে পুলিশ-সাহেব চটিছেন কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন। তবেই বলো দেখি, লাটের খাতির অধিক, না পুলিশের খাতির অধিক?

পঞ্চম প্রশ্ন। বলিয়া কহিয়া শেষে যেন লাট সাহেব সে দিনকার বিবরণে আবরণ দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা মান্য করিয়া, ঢাকা ভাল, না কি, যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, এখন স্পষ্ট খোলাখুলি ভাল?

বুদ্ধিবৃত্তির প্রশ্ন।

পাস-কর্‌া সদরআলা, ছ-শ টাকা মাইনে, সুশিক্ষিত না অশিক্ষিত?

উত্তর দিবার সময়ে এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; যথা (১) নেহাত বোকা ছেলে মুখস্থর জোরে পাস করিতে পারে; (২) রামের ধন রামকে দেওয়াতে বাহাদুরি নাই, রামের ধন শ্যামকে দেওয়ার তুল্য বোকামি আর নাই, (৩) রোজকারের পরিমাণ ধরিয়া বুদ্ধি-শুদ্ধির পরিমাণ হয় বটে, কিন্তু মাইনে বলিয়া আজি ডানি হাতে টাকা লইয়া, কল্য আবার কোম্পানীর কাগজের দাম বলিয়া বাঁ হাতে সেই টাকাগুলি যেখানকার সেইখানে যদি ফেরত দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোজকার বলা যায় না, বেগার দেওয়া বলিতে হয়। গিন্নীর গয়না গিন্নীরই মাইনে। তাতেও গিন্নীর রোজকার, কর্ত্তা বেকার।]

সধবার বিবাহে মজা টের্‌টা পাবে ঘরে।
সদা এবার গদো পেলে' পদা হবে পরে॥
পাঁচুঠাকুরের কথা অমৃত সমান।
বুঝে সুঝে চল্‌তে হয়, তবে থাকে মান॥

ইলবার্ট-বিল।

স্বর্গের বদলে উপসর্গ।

প্রথম সর্গ;—গর্ভসঞ্চার।

কহ দেখি কালামুখি কলম আমার,
কেমনে, কি কীর্ত্তি করি, প্রকাণ্ড পর্ব্বত,
প্রসবিল ক্ষুদ্রকায় বাচ্চা ইন্দুরের,
চীৎকারী আস্ফালি বহু প্রসব ব্যথায়,

গোরা চাপা পোড়া-দেশে। কহ দেশী লোকে,
সাদা কালো একাকার না হইল কেন,
কালো কোলো বাঙ্গালার সাদা প্রাণে কালি,
কি কৌশলে কোন্ জন ঢালিল আখেরে,
আখের না ভেবে আগে। কত যে বহিল,
বিষম বিরোধ-ঝড়, মড মড রড়ে,
কাঁপাইয়া আশাতরু নিরাশার দেশে,
আবার কেমনে সেই তরুরে যতনে,
ধরিয়া রাখার ছলে খোঁটা খাঁটা কত,
বাহির করিয়া আগে, অবশেষে উপা-
ড়িল, প্রমাণিল তাহে, যে কালো সে কালো
চিরদিন আছে, চিরদিন সে রহিবে;—
কাঁদিলে, কাটিলে, কিম্বা মহা কোলাহলে,
চেঁচাইলে সভা করি অন্যথা না হবে,
যা করো তা করো বাপু! কহ কালামুখি,
কালো জনে কালো কথা। কুকথাই তোর,
কুকণ্ঠ উগারে নিতি, তাই সাধি তোরে।
সংক্ষেপে কহিবি কিন্তু; বেশি অবসর,
এখন কাজের কালে, কভু নাহি পাবি।
(আমি যে বিব্রত সদা, ঔদরিক ব্রত,
অবলম্বি যদবধি, করিতেছি লীলা,
সোনার ভারতভূমে ভবিতব্য ভরে।)
শুনিয়া দেবের স্তুতি আয়স-অঙ্গিনী
কালো মুখে কালি মেখে কহিল আমারে;—
"কবিতায় কাল যায়, গদ্যে কি গদিব?
অথবা কাব্যিয়া যাই যতক্ষণ পারি,
(বঙ্গবাসী খুশি যাহে)—"অসিত বরণ,
ছিল গুপ্ত বঙ্গভূমে; ক্রমে রঙ্গ তার
মনের তরঙ্গভঙ্গে উপজিল মনে,
—হায়রে রঙ্গিল মন বাখানি কেমনে?
—বন্ধন আছিল নানা, ধরমে করমে,
সাগরসঙ্গম ছাড়ি যেতে মানা যাহে।

সজোরে বন্ধন ছিঁড়ি, ছিঁড়ি মায়াপাশ
অশেষ আশার দাস, আকাশ পাড়িতে
আস্ফালি মারিল লাফ; হ্রদ, নদ, নদী,
সাগর, সৈকত, কত এড়াইয়া শেষে,
শ্বেতদ্বীপে উপনীত;—গুপ্ত প্রকাশিত,
সুশ্বেত লাঞ্ছিত ক্রমে, লাঞ্ছনা ভুলিতে।
খনির গহ্বর ছাড়ি, হায় রে যেমতি,
বড় আশা মহেশের ত্রিশূল হইতে
অবশেষে কর্ম্মদোষে কর্ম্মকার করে,
ঢেঁকির মুষল—মুণ্ড মণ্ডিত করিয়া
—স্বর্গে যাইলেও যারে ধান ভাণ্ডে হয়—
লৌহ খণ্ড লোহা জন্ম করয়ে সফল।
(বোঝা বহে বঙ্গবাসী, কিন্তু সোজা কথা
বাঁকাইয়া বলি যদি বোঝেন না তিনি,
অবুঝেরে বুঝাইতে উপরের কথা
ভাঙ্গিয়া তোমাসে বলি—ধন্যবাদো মোরে)
বাঙ্গালী বিলাত গেল, সিবিল হইল।
হারাইয়া জাতিকুল সাহেব সাজিল॥
সাহেবের অধিকার চাহিয়া বসিল।
লাট উপলাট শুনি "তথাস্তু" বলিল॥
এইরূপে পর্ব্বতের গর্ভ সঞ্চরিল।
দুরন্ত দানব দলে ভীতি প্রবেশিল॥

দ্বিতীয় সর্গ ;—সাধ ভক্ষণ।

এবে হইল মহাগোল, দেশে বাজে ঢাক ঢোল
আনন্দের উতরোল, দেশ ছেয়ে ফেলিল।
ওদিকে ফিরিঙ্গি জাত, মিশিয়া সাহেব সাত
ব্রনস্থর প্রমুখাৎ, বাঁদরামি জুড়িল।
সপ্তমেতে সুর তুলি, শাসাইয়া বলে বুলি,
ভাঙ্গিব লাটের খুলি, কাল সাদা হইলে।

লোফার (১) ধবল কায়, কালো হাতে মারা যায়,
ইহা কি হইতে পায়, ধড়ে প্রাণ থাকিলে।
মহামিত্র পর্ব্বতের, মহালাট ভারতের,
যদিও পেলেন টের, বলিলেন পর্ব্বতে।
ভয় নাই ভয় নাই, তুমি আমি এক ঠাঁই,
আমিই তোমার সাঁই, কি করিবে অসতে।
জননী দেছেন বাণী, আর কারে নাহি মানি,
ধরমের বল জানি, ধর্ম্মব্রত পালিব।
সাধিতে ধর্ম্মের পণ, যদি হয় প্রয়োজন,
সব করি বিসর্জ্জন, জলে অগ্নি জ্বালিব।
আশ্রিত বা অনুগত, পারিষদ আছে যত,
সকলেই এই মত মাতৃ-আজ্ঞা রাখিবে।
পাহাড় পাহাড়ে ছেলে, অবশ্যই পাবে কোলে,
একথা অন্যথা হ'লে, শর্ম্মা বিষ ভখিবে।
নিবারিতে হুলস্থুল, ভ্রান্তে বুঝাইতে ভুল,
সব জ্বালা নিরমূল এই ভাবে করিব।
সুবোধ সুধীর সঙ্গী, কি সাহেব কি ফিরিঙ্গী,
আর যত নন্দী ভৃঙ্গী, সবাকারে ধরিব।
ধরিয়া, তাদের কথা, চুকাইব সব ব্যথা,
দেখাইব যথা তথা সাহেবের মহত্ত্ব।
নূতন কিছুই নয়, ধর্ম্মের নিয়ত জয়,
সহাইলে সব সয়, বুঝাইব এ তত্ত্ব।
অমনি ভারত যুড়ে, সবে মিলে উড়ে ফুড়ে,
ফিরিঙ্গীরে দিয়ে তুড়ে, আয়োজনে মাতিল।
সুলক্ষণ গিরিবরে, গর্ভের কল্যাণ তরে,
কত শত ঘটা করে, সাধ খাইতে দিল।

---

(১) Loafer—ইংরেজী শব্দের প্রকৃত অর্থ পঞ্চানন্দ জানেন না; তবে ইলবর্ট বিলের তর্ক বিতর্ক দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, লোফার শব্দের অর্থ রুটীওয়ালা অর্থাৎ যে সকল ইংরেজ ভারতের অন্নদাতা এবং ভারতকে অন্নদান করিবার অভিপ্রায়ে ভারতে বিচরণ করিয়া থাকেন।— পঞ্চানন্দ।

[সেকালে পঞ্চানন্দের এই টীকা পড়িয়া "সঞ্জীবনী"-সম্পাদক তাঁহার পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্গবাসী"র লেখক ইংরেজীতে এত বড় মূর্খ যে, তিনি Loafer মানে জানেন না। সাধে কি আর বলে,—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্, শিরসি মা লিখ মা লিখ'?]

ইলবার্ট বিলের পরিণাম।



জনবুল। (বাবুকে লাথি মারিয়া) কালা নিগার, তুই হামার বিচার করিবে? ক্যা? মার্ লাথ্ ড্যাম্ কালাকো!

বাঙ্গালী বাবু। (পতনোন্মুখ) যা ভেঙ্গে, এই দেখ, হৃত্ত ছাড়িনি

John Bull (kicking a Babu) D—d nigger, you wanted to try me, did'nt you! Is this your fav'rite Bill!

Babu (losing his balance) Go, go, I hav'nt let go the principle.

—৫১৪ পৃঃ।

তৃতীয় সর্গ—মূষিক প্রসব (১)।

লাট সাহেবের জয় রব দেশময়।
ফিরিঙ্গীর কুল, ভাবিয়া আকুল।
রাগে ফুলে ফুলে, অর্থ রাশি তুলে,
বিলাত পাঠায় লোক, রাঙা করে চোক।
(অমনি) লাট বাহাদুর গঙ্গারাম, বলেন বাপু থাম থাম,
পোয়াতি খালাস হোতে দাও,
তার পরে ছেলের প্রাণটা নাও।
তাতে কথা কইব না, তোমাদের দোষ গাইব না,
আত্মারামের ফুঁকে, সব যাবে চুকে।
তোমাদেরও থাকবে মান, লোকেও হবে ভক্তিমান।
বড় দিন ঘেঁসে, লাট বাহাদুর শেষে,
আপনি হোলেন ধাই, প্রসব ব্যথা নাই,
পাহাড় খালাস হোলো,
টুকটুকে এক নেংটে ইন্দুর আঁতুড়ে উপস্থিত;—
যা রে মোলো।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

অর্থাৎ

যবন, ম্লেচ্ছ, ইহুদি, ইংরেজ, বাঙ্গালী, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জগতের সমস্ত জাতির যাহা কিছু কীর্ত্তি আছে, তাহাই দেখাইবার মেলা।

(চারি আনা পয়সার মায়া অক্ষুণ্ণ, রাখিয়া সুতরাং অন্তরীক্ষের অন্তরালে অবস্থান করিয়া, পঞ্চানন্দ যাহা দেখিয়াছেন।)

কলিকাতা এই প্রদর্শনীর প্রধান আড্ডা। সচরাচর লোকে একটা প্রদর্শনীর কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক প্রদর্শনী দুইটা।

প্রথম প্রদর্শনী।

যাহার কথা সর্ব্বদা লোকের মুখে শুনা যায় না, সেই প্রথম প্রদর্শনী ইলবর্ট-ময়দানে (২) হয়। তাহাতে—

---

(১) সেকালে ইলবার্ট বিল লইয়া এংলো-ইণ্ডিয়ান দল তুমুল আন্দোলন করিতে থাকিলে, লর্ড রিপণ সদিচ্ছা সত্ত্বেও একটা আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহার নাম,—Concordat.

(২) ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে যে সব পদার্থ পঞ্চানন্দের লক্ষণীয়, তাহাই প্রদর্শনীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

ক। (১) সুশিক্ষা, (২) সুরুচি, (৩) সভ্যতা, (৪) সাহস, (৫) সদাশয়তা, (৬) ভদ্রতা, (৭) ভালমানুষি, (৮) কৃতজ্ঞতা, (৯) রাজভক্তি, (১০) রসিকতা—এই দশ পদার্থ অলঙ্কার-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। ব্রনসুন্দ্র, পরাণসেন, কি বর্ণসিংহ—এই নামের একজন মান্দ্রাজী এই খণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছে।

খ। (১) অপক্ষপাত, (২) আইনজ্ঞতা, (৩) আত্মসংযম, (৪) সুবিবেচনা, (৫) সুধীরতা, (৬) সৌম্য, (৭) শান্তভাব, (৮) সুবিচার—এই অষ্টাঙ্গ ন্যায়খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। নাম মনে নাই, একজন ইংরেজ হাকিম প্রধান পুরস্কার পাইয়াছেন।

গ। (১) প্রজাপ্রীতি, (২) কর্ত্তৃভক্তি, (৩) দুষ্টদমন, (৪) শিষ্টপালন, (৫) একৃজীবীশন, (৬) সুরাকমিশন—এই ষড়রস রাজনীতিখণ্ডে প্রদর্শিত হয়। মিঞা নিভরসা তানসেন নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইয়াছেন।

ঘ। (১) উদারতা, (২) লোকরঞ্জন, (৩) পরদুঃখ কাতরতা, (৪) দূরদৃষ্টি, (৫) নিঃস্বার্থতা—এই পঞ্চ সামগ্রী সুপাত্র-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। লোকে শুনিয়া বিস্মৃত হইবে যে, একটী তিলির ছেলে এই খণ্ডে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে।

ঙ। (১) দেশভক্তি, (২) সজাতিভক্তি, (৩) বক্তৃতাশক্তি, (৪) আত্মোৎসর্গ, (৫) হাতে হাতে স্বর্গ—এই পঞ্চ প্রদীপ নশিরাম-খণ্ডে প্রদর্শিত হয়। কে পুরস্কার পাইবে ঠিক হয় নাই। কেহ বলেন পঞ্চানন্দ পাইতে পারে, কেহ বা অন্য দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। পঞ্চানন্দ বিবেচনা করেন,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—পঞ্চানন্দই পুরস্কার পাইবার পাত্র।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী—(যাদুঘরে)।

এখনও চলিতেছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল, সংক্ষেপে বলি।

এক কথায় বলিতে হইলে, এই মহামেলায় কেবল কতকগুলো লোক, আর কতকগুলো জিনিস ভিন্ন আর কিছুই নাই।

আর এক ভাবে দেখিলে, মহামেলার কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। উত্তম বাড়ী, উত্তম আসবাব, উত্তম বন্দোবস্ত হইলেও, নচ দৈবাৎ পরং বলং। সামিয়ানায় বৃষ্টি নামক পদার্থ আট্কান যায় না, এই মেলা দেখিয়া অবধি সকলেই এ কথা স্বীকার করিতেছে।

সময়ের অনুরোধে রাজা, রাজড়া, রাণীর বেটা, কি রাজপ্রতিনিধি সকলেরই দুর্গতি কত দূর ভোগান্তিকর হইয়া পড়ে; এ তত্ত্বও মেলাতে উত্তমরূপে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।

তারযোগে বিদ্যুতের আলো সঞ্চারিত হয়, সেই তার কাটিয়া দিলেই স্বচ্ছন্দে অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারা যায়, মেলা খুলিবার দিনে ইহাও দেখান হইয়াছিল।

ধাক্কা খাইতে সকলেরই অধিকার আছে। যাহারা মনে করিত যে গরীব, দুঃখী, মুটে, মজুর ইত্যাদি গোছের লোকেরই ধাক্কা একচেটে, তাহারা মেলার পত্তন অবধি আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিতেছে। বড় বড় নক্ষত্রভূষিত, তোপ-তাপিত রাজা মহারাজারাও অনায়াসে ধাক্কা ভক্ষণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

ভারতবাসী কত রকমে আপন দুঃখ বাড়াইতে পারিবে, তাহা উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত যোগে দেখান হইতেছে।

যাহাদের পরিচ্ছদের কোন নিয়ম নাই, প্রণালী নাই, প্রকার-নির্দ্দেশ নাই—তাহারাই বাঙ্গালী; মেলাতে ইহাই দুবেলা দেখান হইতেছে।

গাঁটকাটা এবং জুয়াচোর নানারকমের আছে।

মেলাতে ইহার বিজ্ঞাপন দেখা যায়; কিন্তু ইহাদের কার্য্যপ্রণালী এখনও সাক্ষাৎকারে প্রদর্শিত হইতেছে না। হয় ইহা দেখিবার পৃথক টিকিট লইতে হয়; নয় এখনও সাজান হয় নাই বলিয়া সকলে সে খণ্ড দেখিতে পায় না। চারি আনা দিলেই মেলা দেখা যায়, বাহিরের লোকের এই বিশ্বাস। যেমন অন্য অন্য অনেক ভ্রম মেলায় গিয়া দূর করিতে পারা যায়, এই ভ্রমটাও সেইরূপেই দূর হয়। প্রথম চারি আনা কেবল আক্কেল-সেলামী; তাহার পর যত প্রবেশ করিবে, ততই পয়সা দিবে। মেলার সব বন্দোবস্ত ঠিক না হইতেই এবং সকল সামগ্রী আমদানি, কি সাজান হইবার আগেই, যে মেলা খোলা হইয়াছিল, তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। চারি আনা শুধু ঘোমটা খোলা, তা আগেও দেখা যাইত, এখনও দেখা যায়।

বিশ্বের বিদ্যা প্রকাশ।

এবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল;

অকল্যা বাই—রামমোহন কাই—এ দুটী লোক কে?

ছেলেরা জানিবে, কোথা হইতে? কিন্তু পঞ্চানন্দ জানিয়াছেন,

অকল্যা বাই, রামমোহন কাই, এরা তিন ভাই।

সংস্কৃত পরীক্ষক অনেক সৃষ্টিছাড়া কথা সৃষ্টি করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছেন, যথা ইবাকাণ্ড, বাগুক্কা, পরাবণ।

বাঙ্গালা-ওয়ালা ছাড়িবেন কেন? তিনি ছেলেদের উপঢৌকন দিলেন,—পিঞ্জর, সূর্য্যমুখী, কিঞ্জল্ক, গুগুন, দ্রবীভূত, সারথী। একবার চিন্তাতরঙ্গিণীতে দেখিয়াছিলাম,—"হর্ম্যেসিনচয়," এবার বাঙ্গালা প্রশ্নে দেখিলাম "শ্রুবা"।

সমালোচন।

জানিবে জগতবাসী লভিবে আনন্দ।
সমালোচনের কাজ লবে পঞ্চানন্দ॥
পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র, পত্রিকা প্রভৃতি।
সমালোচিবারে লওয়া আছে চিররীতি॥
অধিকন্তু নিতে রাজি কাগজ কলম।
ছুরী, কাঁচি, বঁটি, ছাতা, আরক, মলম॥
খাঁটি সরিষার তেল, রেড়ি, কেরোসিন।
দুধ, দই, ঘৃত, ননী, সূচ, আলপিন॥
চাল, দাল, নুন, কাঠ, সন্দেশ, মিঠাই।
কিছুই ফেরত নাহি দেওয়া যাবে ভাই॥
টাকা, ষ্টাম্প, হুণ্ডি, নোট, পোষ্টেল অর্ডার।
আর লওয়া যাবে গৃহিনীর অলঙ্কার॥
বিশেস এ শীতকালে দিবে ভুটী ভুটী।
বাঁধা কোপি ফুল কোপি, মটরের শুটী॥
যাহা ইচ্ছা তাই দিবে, পাঁটা কিম্বা মাচ।
খইল, বিচালি, শুধু দিবে না কদাচ॥
সমালোচকের দল লোভী অতিশয়।
সন্দ পাছে পঞ্চানন্দে, এই হেতু ভয়॥
পঞ্চানন্দ কথা সদা, অমৃত সমান।
পাঠাবে সামগ্রী যেই, সেই পুণ্যবান॥

একটা মনের কথার সূচনা।

(শর্ম্মার রচিত।

মার নাই, মরা সোজা কথা নয়।
মারে রেখে মরা, তাও কভু হয়?
সে যে পরাণের ধন,
আমার দুখ্‌মন,
কিবা মাথা নাড়ে কত কথা কয়।

তারে, দেখাইয়া মুখ,
কাটাইব বুক;
মন মোর হবে যাহে সুখময়।
আমি মানুষ গণ্ডার,
জানা ভাল তার,
কিছুই বাজেনা গায়ে সব সয়।

রুচিবিষয়ক উপদেশ।

১। রুচি দুই প্রকার, সুরুচি ও কুরুচি। আমার যে রুচি, সেই সুরুচি; পাঁচের যে রুচি, তাই কুরুচি। তাহারা নেহাৎ বর্ব্বর, তাই বলিয়াছিল—"ভিন্ন রুচিহি লোকং।"

২। আমি যদি কোন অপকর্ম্ম করি, তাহাতে আমার রুচি মন্দ হইবে না; তুমি যদি সেই অপকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া কিছু লেখো কিম্বা বলো, তাহা হইলে তোমার রুচি অতি কুৎসিত জানিবে।

৩। আমার রুচি অতি পবিত্র, তাহার প্রমাণ এই যে, ব্যাকরণ পড়িবার সময়েও আমার রোমাঞ্চ হয়, যে হেতু কুরুচির অবতার বৈয়াকরণেরা গ্রন্থ মধ্যে স্ত্রীত্ব প্রকরণের সমাবেশ করিয়াছে।

৪। "বিবাহ" এই শব্দে মন খারাপ হয়; তোমারও ঐরূপ হওয়া উচিত। আমি এখন বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছি, বিবাহের বদলে এখন তিন আইন।

৫। যখন তোমার রুচি পরিশুদ্ধ হইবে, তখন "নিদ্রাবেশে", "দিবা-দ্বিপ্রহর", "কদম্ব", "দাড়িম্ব" ইত্যাদি শব্দ আর ব্যবহার করিবে না, কারণ তাহাতে আমার বিদ্যাসুন্দর মনে পড়ে।

৬। অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে, ঈশ্বর আজিও আমার মত বিশুদ্ধ রুচি হইতে শিখিলেন না; তিনি এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কাপড় না পরাইয়া নরনারীকে সংসারে পাঠাইয়া থাকেন।

তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি রুচি সংশোধন করুন, তাহা নহিলে বঙ্গবাসীর রুচি শুধরাইতেছে না।

দুর্গোৎসব।

[২]

আমার প্রিয় বঙ্গবাসী।

এবার দুর্গোৎসবটা একটু জাঁকাইয়া করিতে হইবে। তোমার ইহাতে মত নাই, জানি, কিন্তু আমি ছাড়িব না। পূজার কটা দিন তোমায় আসিতেই হইবে।

পুতুল-পূজা ভাল নয়, তা আমি জানি, কিন্তু মনে যদি পৌত্তলিকতা না থাকে, তাহা হইলে আর ক্ষতিটা কি? আমাদের একটু আমোদ করা বৈত নয়। যেমন যাহা হইবে, সব খুলিয়া লিখিতেছি, তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই সব ঠিক্ হইবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র অবশ্য ইংরাজীতেই বাহির হইবে; ইহাতে ত্রিবিধ উপকার হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। একত, সেই "শ্রীশ্রীদুর্গা শ্রীচরণ ভরসা" ইত্যাদি লেখার পাপ এড়ান, সুতরাং ধর্ম্মরক্ষা। তারপর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ লিখিতে হইবে না; তাহাতে জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথার মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব এবং সাম্য-নীতির সম্মান করা হইবে। আর পরিশেষে, ইংরেজ-বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণ একই ভাবে হওয়াতে সজাতিকে অবজ্ঞা করার দোষটা ঘটিতে পারিবে না। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে একটু স্বাধীনভাব অবলম্বন করিলেই আমাদের আচার ব্যবহার এবং দেশের নৈতিক অবস্থা যে কত সংশোধিত এবং উন্নত করা যাইতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয় এবং আমাদের ঔদাসীন্যকে ধিক্কার করিতে ইচ্ছা করে। যাহা হউক, পত্রখানা বাড়ীর মেয়েদের নামেই বাহির করিব স্থির করিয়াছি; সভ্য দেশ মাত্রেই এই রীতি দেখা যায়। "মিসেস্ পাঁচী উপঢৌকন দিতেছেন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কমপ্লিমেণ্ট—(এমনি দরিদ্র ভাষা আমাদের যে, ইংরেজী ছাড়িয়া দিলে আর ভদ্রতা রক্ষা করিবার উপায় নাই; আর তাও বলি, "কমপ্লিমেণ্ট" পদার্থটা যে কি, আজিও বেশ ঠাওরান গেল না)—প্রতি (অমুক ব্যক্তি) এবং অনুরোধ করিতেছেন তদীয় সাক্ষাৎসুখ নিমিত্ত তিন দিন পূজা-উৎসবের"।—এই রকম একখানা কার্ড অর্থাৎ রোকা জারি করাই উচিত। তুমি ইহাতে কি বলো?

কতকগুলি পবিত্রচেতা ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের প্রতি কোনও রকম আঘাত না লাগে, এমন বন্দোবস্ত অবশ্যই করিব। তুমি জান যে, শাম্পেনের বোতল আর জোইতোনের বোতল একই চেহারার, শুদ্ধ জোইতোনে নেশা না হইয়া শুদ্ধ একটু ফুর্ত্তি হইবার অঙ্গীকার বিজ্ঞাপনে

দেখা যায়। কাজেই একত্র বসিয়া আমোদ আহ্লাদ চলিতে পারিবে, অথচ কু-লোকেও কুকথা তুলিতে পারিবে না। বাইনাচ হইবে বটে, কিন্তু সচ্চরিত্র এবং অন্তত মাইনর স্কলার্শিপ পাসের সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে কোনও বাইজীকে লইব না, ইহা আমার অটল সঙ্কল্প হইয়াছে। [টীকা;—"আমরা এই বাইজীর নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে নিজ জ্ঞানে কিছুমাত্র অবগত নহি" এই ভাবের রচনা দুই বা ততোধিক স্বাক্ষরযুক্তে আনিতে পারিলেই উপস্থিত কার্য্যের জন্য বাই-জীকে সচ্চরিত্র গণ্য করা যাইবে] গানের মধ্যে একটী গান বাইজীরা গাইতে পাই-বেন, গোড়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত কেবল গাইতে হইবে,—"মনে করো শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।"

প্রতিমা-নির্ম্মাণ বিষয়ে সুরুচি এবং সুশিক্ষার বিরোধী যে সকল অভাব বা ক্রটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিয়াছি। বিলাতের প্রসিদ্ধ ভাস্কর কোম্পানিকে প্রতিমার ফারমাইস দিয়াছি। ফরমাইস মত কাজ যদি হয়, তাহা হইলে নূতন প্রতিমা দর্শন করিয়া তুমি অবশ্যই আমার উদ্ভাবনী বুদ্ধির এবং সুরুচির সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইবে। হলুদ-পানা দশহেতে তেচোকো দুর্গার বদলে মহারাণী বিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি গড়িয়া দিতে বলিয়াছি, কেবল পোষাকটা ইংরাজী ধরণের না করিয়া শাড়ী, জামা, ওড়না দিয়া সাজাইয়া দিবে। তুমি জান যে, আমি জাতীয় ভাব এবং দেশীয় রীতি-পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী; সেই জন্য ইংরেজী পোষাকটা আমি দেখিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, আমাদের পাড়ার দত্ত-দের বামুন ঠাকরুণের মত কাপড় পরা বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ইহার কোনও মানে নাই। সে যাহা হউক, সিংহটাকে একটা পোষাক পরাইয়া দিতে বলিয়াছি। আর অসুরের গা খোলা না থাকে, তাহাও বলিয়াছি। সাপের গায়ে একটা সাটিনের ওয়াড় পরানো থাকিবে। ফলে সকল কথা এখন ভাঙ্গিয়া বলা ভাল হইতেছে না; দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত সেকেলে পুরাণের সামঞ্জস্য করিয়া, কেমন নূতন রৌচিক এবং নৈতিক বস্তু আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে।

পুরোহিতের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। যে সকল অধ্যাপক সাহেব-সুবাকে পূজা করিবার উপলক্ষে নিজ নিজ ধার্ম্মিকতা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারাই আমার বাটীর উৎসবে ব্রতী থাকিবেন। অধ্যাপকের তালিকা করিয়া দিবার জন্য ন্যায়রত্নকে অনুরোধ করা হইয়াছে, সংস্কৃত কালেজে তাঁহার দেখা না পাইলে, নারিট পর্য্যন্ত লোক যাইবে।

ভোগের এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য যাহা দরকার, তাহার জন্য কণ্ট্রাক্টরদের টেণ্ডর তলব করা হইয়াছে। তাহাতে ব্যয় কম পড়িবে অথচ বন্দোবস্তটা ভাল হইবে।

এখন পর্য্যন্ত দুইখানি টেণ্ডর পাইয়াছি, একখানি উইল্‌সেন হোটেল, অপরখানি শকুন্তল হোটেল (১) হইতে আসিয়াছে। যদি এই দুইখানির মধ্যেই বাছিয়া লইতে হয়, তা হইলে শকুন্তলা হোটেলের কন্‌ট্রাক্ট মঞ্জুর করিতে হইবে; তাহাদের বিজ্ঞাপন পা জানিতে পারিয়াছি যে, বাবুরচির পাকানো ইংরেজী-খানা তাহারা যোগাইয়া থাকে অথচ সঙ্গে সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে লোকদের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পাচকের বন্দোবস্তও তাহাদে আছে। অতি সুব্যবস্থা। অধিকন্তু শকুন্তলা হোটেলকে উৎসাহ দিলে স্বজাতি প্রতি অনুরাগ, এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তিও দেখান হইবে।

কতকগুলা বাজে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং কাঙ্গালা বাঙ্গালী যোটাইয়া একটা গোলযে করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের ছোট লাট সাহেব, হাইকোর্টের জনক জজ, ফিরিঙ্গী-সংরক্ষণী সভার সমুদয় সভ্য এবং বেধড়ক-নিরিখ ও ছুঁচোকো-উচ্ছে জমীদারির-সভার বাছাই বাছাই জনকতক ভূশূন্ড সভাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কা সারিব ঠিক করিয়াছি। স্পষ্ট বলিয়া রাখা উচিত যে, রমেশ মিত্র যদিও তোমা খুব প্রিয়পাত্র, তথাপি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেছি না। কালো মানুষ হইতে পারে, মজলিশের সময়ে এ কথা আমার ফিরিঙ্গী বন্ধুদের মনে হইলে এ দলাদলির ঘোঁট উঠিবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ, পূজার আমোদের ভিতর জাতিবিদ্বে যাহাতে না ঘটে, তাহাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমার গৃহস্বামিনী যদিও গত বৎসর উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি কা আনিয়াছেন, তথাপি বাটীর পূজার দালানে সাহেব সুবা জুতা পায়ে দিয়া যা এবং টেবিলে উন্নত প্রণালীতে ভগবতী-সেবাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন হইবে, ইহা সহ্য করিতে পারেন না। আমিও স্ত্রীলোকের মনে কষ্ট দেওয়াটা ভাল বি করি না। সেই জন্য কলিকাতার টাউনহলে পূজার ব্যাপারটা সমাধা করিবার ব করিয়াছি। আমার কোনও কোনও বন্ধু যাত্রা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে কিন্তু আমার বোধ হয়, যাত্রার বদলে কোন প্রসিদ্ধ বক্তাকে যদি ইংরেজী ও বক্তৃতা করিবার বায়না করা যায়, তাহা হইলে লোকের সমাগম বেশি হয়, জাতীয় বিড়ম্বনারও একটা হেস্তনেস্ত হইতে পারে। যে এক ঢিলে দুটো মারিতে পারে, সেইত মানুষ। এ চিঠিতে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সব চূড়ান্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার অনেক অংশে রদ বদল করিতে প্রস্তুত ও উঁদেরও একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; কারণ, যদিও তাঁহারা প্রকটভাবে যোগদান করিতে পারেন না, কিন্তু উৎসবের ব্যাপারে তাঁহারা নির্লিপ্ত নহে

(১) পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে শকুন্তলা ভবন।

সময়ে কাপড়ের দোকানে সকলকেই দেখিতে পাই, স্বর্ণকারের কাছেও অনেকের গতিবিধি হইতেছে জানি।

তোমার নিতান্ত সরল ভাবে (১)

পাঁচু।

পুনশ্চ নিবেদন। বিজয়া-দশমীর দিনে একটা নূতন রকম আমোদ করিব মনে করিয়াছি। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পৈতা খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দিব।

তোমার সত্যরূপে (২)

পাঁচু।

পুঃ পুঃ।—

এই পত্রের কথা কদাচ ফাঁস করিবে না। লোকে যদি এ সব কথা টের পায়, তাহা হইলে সময় শিরে তেমন রগড় হইবে না।

তোমার চির যথার্থরূপে—

(পাঁচু)।

হুলস্থুল কাব্য।

(অগত্যা অসম্পূর্ণ)

সুদন সমরক্ষেত্রে বীর চূড়ামণি
গর্দ্দন, গর্দ্দন যবে দিলা সাধে সাধে,
মেহেদী-শার্দ্দূল-মুখে, খার্তুম গহ্বরে,
অকালে, কহগো দেবী, গরলগারিণি,
কেমনে, বিলাতে মন্ত্রী সজোরে স্বকরে
নিতম্ব চাপড়ি নিজ, হতভম্ব ভাবে
থ্যাবাতুড়ো খেয়ে হায় চাহিলা চৌদিকে
চকা-ভকা? হেথা দেখি রুষ-ঋক্ষ রোখে,
বিষম বিক্রম করি, ভারত আক্রমে
অগ্রসর, আসিয়ার মধ্যদেশে আসি
গ্রাসিতে ভারত-রাজ্য, (ভিক্ষাভাণ্ড হায়,
অন্নহীন ভিখারীর,—গোটা দুনিয়ার!)
—ব্যাকুল বিলাত, ভেবে ভাবনার কূল
না পাইল যবে, বল, কত হুলস্থুল

---

(১) Yours most sincerely. (২) Yours truly.

কি ভাবে হইল কোথা,—বিলাতে, ভারতে
কোন্ ছল, কি কৌশল, বলের ভূমিকা
প্রকাশি, অর্থের রাশি—নাশি অকাতরে,
মাস-জল রক্ষাহেতু কি কার্য্য করিলা?
বন্দি হে অমিত্রচ্ছন্দ, মিত্র সদা মম,
প্রবন্ধে বান্ধিয়া আনি দুষ্ট-সরস্বতী,
বসাও তাহারে এই লেখনীর মুখে,
লৌহময়ী; সাদা কথা কালি আখরে,
সুপ্রখর তেজে রচি, চিরপরিচিত
উচিত সুখ্যাতি মম অক্ষত রাখিতে।
—তুমিও আসরে এস রাজভক্তি সতি।
ভারতে ভারতী-ময়ি, পতিতপাবনি,
সতী নাম, অবিরাম ঘুষিতেছে তব,
বিশেষত যদবধি বিধবা-বিবাহ
বিধির বিহিত বলি হয়েছে স্বীকৃত,
সতীপনা নির্ভাবনা হয়েছে তোমার।
রঙ্গে ভঙ্গে এস সতি, অঙ্গে পেশোয়াজ,
আর যা সুসাজ থাকে, আজি লো পরিয়া,
নিধুর মধুর সুর আঁচিয়া গলাতে,
ভুলাতে ভকতবৃন্দে, দোলাইয়া মালা,
আইস লো রাজবালা, যত ছল জান,
ষোল কলা সঙ্গে করি, অপাঙ্গে তোমার,
সেই মিঠি মিঠি দিঠি থাকে যেন সতি,
ভোলে লো ভুবন যাহে, ভুবন-ভুলানি!
—কেবল এস না তুমি রুচি পোড়ামুখি,
দু-চোখের শূল মম, তোমার জ্বালায়
সদা জ্বালাতন আমি, অনুরোধ করি
কভু না আসিও কাছে, বিলোল চক্ষিনী,
চসমা-ধারিণী ধনি, শুদ্ধিতা রমণী,
বেজায় গম্ভীরমুখী, জ্যাঠামীর খনি,
বারোমাস "ভ্রাতা" স্কন্ধে থাক বিরাজিতা।
—এস বা না এস তুমি কল্পনা-সুন্দরি,

ক্ষতি বৃদ্ধি নাই তাহে; বাহবা লইব
বুক ঠুকে বিশহাজার বঙ্গবাসীদলে।
কাঠের আসনে বসি গ্লাডষ্টোন বুড়া—
মহামন্ত্রী বিলাতের, বিষণ্ণ বদনে।
শোভিছে শিরসে শুভ্র-কেশ, অশ্রু-ধারা,
ঝরিছে ভিতিয়া গল'বন্ধ; হায় যথা.
গলে গিরি গ্রীষ্ম-শেষে—বরফমণ্ডিত।
উপমা কি দিব আর? পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ নত ভাবে বসে চারি দিকে।
তারযোগে কাল বার্ত্তা আসিয়া, কাগজে
ছাপার আকারে এবে—কালকূট সম—
নীরবে ঘুরিছে সভাগৃহে। এ উহার
চুপি চুপি চাহে মুখ পানে,—রুদ্ধশ্বাস।
কতক্ষণে কথঞ্চিত সংজ্ঞা লাভ করি,
ভীমরথী বুড়া মন্ত্রী জুড়িলা বিলাপ
উচ্চরবে, কেশগুচ্ছ—শণগুচ্ছ প্রায়—
দু-হাতে দু-মুঠা ধরি, দন্ত খিঁচাইয়া,
বলিতে লাগিলা কথা! হায়রে যেমতি,
কাঁদে বুড়ী ঠান্‌দিদী দন্তহীন মুখে,
ঝলকে ঝলকে, যবে বালিকা নাতিনী
প্রথমে স্বামীর ঘর করিবারে যায়।
"গেঁজেলের গল্প সম এ খবর তোর,
টেলিগ্রাম! সংগ্রামে যে বিলাতের মান
রাখিতে একাকী ছিল, অদ্বিতীয় বীর,
সে কি না মেহেদি-হস্তে মারা গেল আজি।
বেকচ্চায়? ইন্দুরের কলে কি ফেলিলা
কেশরিবরে বিধাতা? থুথু দিয়া ছাতু
ভিজাইলা দুঃখ দিতে? হা রে রে গর্ডন,
কেমনে দেখাব মুখ টোরি-সম্প্রদায়ে?
হাসিবে যে শত্রুকুল; টিটকারি সদা,
কেমনে সহিব হায় এ বুড়া বয়সে?
বলেছিল কার্লাইল, আমি বড় বোকা,

তাই কি ফলিল আজি? কি পাপে এ তাপ?
হায় কেন কণ্ডুয়ন করিয়া এ ব্রণ
সাধে সাধে তুলিলাম? কচ্ছ রক্ষা করা
এখন যে হ'ল ভার গোঁয়ারের হাতে?
হায়রে কুক্ষণে আমি পর-স্বাধীনতা
হরিবার সাধে কেন হনু অগ্রসর,
তুরন্ত মিশর দেশে? হায় রে যেমতি,
কুক্ষণে রামের সীতা লোভিয়া রাবণ
আপনি মজিল, স্বর্ণ-লঙ্কা মজাইল।
ইচ্ছা করে, ছেড়ে-ছুড়ে পলাইয়া যাই,
চাকুরি ইস্তফা করি। এত কি ঝঞ্ঝাট
সহে আর বুড়াহাড়ে? ত্যজি রাজ্যভার,
যাই চলি নিজ ঘরে, লাটিন গিরীক
আলোচনা করি গিয়া; আর মাঝে মাঝে,
কাটি গে ওকের গাছ বাঁচি যত দিন।"
বাহাদুরে অনুচর উপমন্ত্রী যত
বুড়ার বিলাপ শুনি বিব্রত হইল,
নিবেদিল যোড় করে—"শান্ত হও প্রভু'
আমরা গোল্লায় যাব, তুমি যদি ছাড়।
আমাদের মুখ চাহি, উচিত তোমার,
মোহমুগ্ধ না হইয়া, করিতে বিহিত।
বিশেষ বিষম কাল; এ সময়ে হাল,
ছাড় যদি, ভরা-ডুবি হবে যে নিশ্চয়।
পড়েছে বিষম গ্রীষ্ম, চিন্‌চিনে রোদ,
এসময়ে মিশেরতে—সেই বালি-বনে—
চালাকি ত খাটিবে না, চলিবে না হাত,
মারিতে বালিতে ফেলে মেহেদী বজ্জাত।
তাই বলি থাবা থুবা দিয়া থাকৃথার,
কোন-ক্রমে করিবার কর আয়োজন"।
আবার পড়িলে জল, শীতল হইলে,
বাঁচি যদি, বুঝা যাবে। সদ্য ঠুকিঠাকি,
চলুক যা হয় সেথা; কাঁচা মাথা দিতে,

বরঞ্চ ভারতী সেনা আনাও মিশরে।
মারা যায় তারা যাবে; জিতিলে গৌরব,
লভিব লাভের তলে, হবে মাছ ভাজা,
সেই সে মাছের তেলে। অধিকন্তু দেখ,
শুধু সে মিশর পানে তাকাইয়া যদি,
অবিরত থাকা যায়,—সেথা সর্ব্বনাশ!
—সেথা, সেই স্বর্ণভূমে, ভারতবরষে,
অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, গৌরবের গোড়া,
রাজ্যের মুকুটমণি, ওজন পাজন,
যে ভারত নিয়ে এবে। কি কব অধিক?
মনে কি পড়ে না প্রভু, গিয়াছ কি ভুলে,
হন্ হন্ করি রুষ ভারতের দিকে,
দিন দিন আগাইছে? কেবল কাবুল,
মাঝে থেকে জনবুলে ঋক্ষের কবল,
হইতে করিছে রক্ষা? যে জন্ম আপোশে,
সীমাবন্দী করিবারে আমিন বাহাল,
করিয়া পাঠান গ্যাছে কাবুল-সীমায়?
আপোশে রুসের ভাব ভাল ত বুঝি না।
গুরুতর কথা তাই। কেমন কেমন,
গতিমতি রুষিয়ার, দেখ না বুঝিয়া!
আবশ্যক, বেশি বেশি সেই কথা ভাবা।
এ সময়ে কাতরিয়া হাত পা ছড়ায়ে,
হও যদি ভ্যাবাকান্ত, দশায় কি হবে?
কে তবে রাখিবে মান?—যায় যাক্ মান—
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে সবাকার।
ভারত—ভবের হাট, বেচা কেনা যত,
সবই ত ভারত নিয়ে; প্লীহা-কাটা খুসি
কোথায় বিকায় আর? রাঙ দিয়া সোণা,
কোন হাটে পাওয়া যায়, সেওয়ায় ভারতে?
অতএব তাজা হও, বিহ্বলতা ছাড়,
চক্ষু চিরে চারি দিকে চাও একবার।"
নীরবিলা উপমন্ত্রী। চেতিলা সে বুড়া।

বহুক্ষণ বহু চিন্তা করি মনে মনে,
চালিয়া ডাইনে বামে মাথা ধীরে ধীরে,
বিশাল কপালভূমি রুমালে মুছিয়া,
কহিলা সে মন্ত্রিবর—“সত্য যা বলিলা!
ভারত-ভাবনা আগে ভাবাই উচিত,
যা হবার হইয়াছে, হউক যা হবে,
সুদনে মেহেদী সনে। উলশালী তথা,
যেন তেন প্রকারেণ কটা ঘাস কাটি,
থাকুক বরষা চাহি; ভরসা বিশেষ,
সদা কিছু নাই সেথা। (হায় রে দুর্ম্মতি,
ভাবিনু মারিব মশা, খেনু গালে চড়,
মশার পালক পক্ষ পর্শিতে নারিনু!)
—সত্য কি রুষিয়া তবে ভারতের পানে,
হইতেছে অগ্রসর? সীমানা-আমিনে,
মানিছে না সে দুরন্ত? নিতান্ত পামর,
কৃতান্তে আনিছে ডাকি আপনা আপনি?
কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এ ঠাঁই ও ঠাঁই,
করিছে দখল খল। জানে না সে, আমি,
এখনও জীবিত আছি? আজিও ফুৎকারে,
উড়াইতে পারি গিরি। এই বুদ্ধিবলে,
ধরাতল রসাতলে ফেলে দিতে পারি।
জ্যান্ত ফিরে যেতে ঘরে, অন্তরেতে সাধ
থাকে যদি রুষিয়ার, প্রান্ত কাবুলের
একান্ত ছাড়িবে তবে, নিকেটেও কভু
ঘেঁসিবে না, আর। তার ব্যবস্থা করিব।”
এতেক কহিয়া মন্ত্রী, ছাড়িয়া হুঙ্কার,
রোষিয়া রুষের পরে, শাসাইয়া তারে
মধ্য-আসিয়ার প্রান্তে নির্দ্দেশি তর্জ্জনী
সগর্জ্জনে বলে বাণী, বজ্রে অনুকারি,
—“যেখানে এখন তুমি আছ রে বসিয়া
এত নহে তব রাজ্য। মিছা মারা যাবে,
পড়িবে আমার কোপে, কথা না শুনিলে।

ভাল মানুষের মত অতএব বলি,
এখনি তফাৎ যাও, নতুবা লড়াই!”
উত্তর প্রতীক্ষা করি, ঋক্ষ-মুখ পানে,
চাহিয়া রহিলা মন্ত্রী। নিস্পন্দ ঋষিয়া।
বহুক্ষণ পরে, মাথা ঈষৎ তুলিয়া,
একটী কসের দাঁত কিঞ্চিৎ নিকাশি,
কটমটে মন্ত্রী-মুখ চাহি কিছু কাল,
না করিয়া বাক্যব্যয়, গম্ভীরে মস্তক
অল্প হেলাইয়া মাত্র, উত্তরিল—“উহুঁ”।
আবার পূর্ব্বের সেই ভ্রূক্ষেপ-বিহীন,
সেই সে হেলার ভাব—অজগর হেন!
তখন,—
শুকাইল সকলের মুখ।
বুকের ভিতরে ধুক ধুক॥
ভাবনায় * * * * চুল।
[illegible]তে এই উলটুল।

লড়াইস্থ সংবাদদাতার পত্র।

[প্রাপ্তি স্বীকার।]

শ্রীচরণকমলেষু—দণ্ডবৎ প্রণাম। নিবেদনঞ্চাদৌ আপনার আশীর্ব্বাদে এ দাসের সমস্ত মঙ্গল হয়, বিশেষ—পরে নিবেদন বহুকাল পরে, আপনার আজ্ঞা-পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। কিন্তু—

(অভিমান)

ঠাকুর, আমি এবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারিব কি না আপনি ইহা জিজ্ঞাসা করায় আমি যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। সেবার যখন কাবুলে লড়াই হয়, তখন আমিই ত আপনার সংবাদদাতা হইয়া গিয়াছিলাম, তবে এবার না যাইব কেন? বিশেষতঃ আমাকে লড়াই করিতে হইবে না, কাহারও সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হইবে না, কেবল সত্য মিথ্যা দু কথা দেখিয়া শুনিয়া তাহাই সাজাইয়া গোছাইয়া লেখা মাত্র। তা, বাঙ্গালী কোন কালে লেখা পড়ার কাজে পিছ-পা হইয়াছে, বলুন? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতার নিমিত্ত সে কালে সমুদ্র ডিঙ্গাইতে মানুষ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন দেখুন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া

শুদ্ধ লেখা পড়ার নিমিত্ত কত বাঙ্গালীই না সমুদ্র ডিঙ্গাইতেছে? তাহাতে আবার আমার ত চাকুরি কথা। চাকুরির জন্য বাঙ্গালী কি না করিতে পারে? অতএব আমি যাইব কি না, জিজ্ঞাসা করাটা আপনার ভাল হয় নাই। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মরিবার ভয় থাকিলেও আমি যাইতাম। কিন্তু মরিবার ভয় কি আর আছে? যখন ম্যালেরিয়ার পর ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, আর, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর পরীক্ষা সহিয়াও বাঙ্গালী নির্ব্বংশ হইতেছে না, তখন মৃত্যু শব্দটা অভিধান হইতে উঠাইয়া দিলেও বোধ করি অন্যায় হয় না। তবে, "জন্মিলে জীবের অবশ্য মরণ"— এ হিসাবে মরিবার একটা কথা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার ভাবনার বিষয় কি হইতে পারে? যে হেতু—

(রাজভক্তি)

আমার অচলা রাজভক্তির কথা আপনার অবিদিত নাই। "শ্রীশ্রীমতী মহা-রাণীর কার্য্যে" প্রাণ পরিত্যাগ করিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ চব্বিশ ঘণ্টাই প্রস্তুত, তাহা ত আপনি জানেন। প্লীহা আছে—সৌখীন রাজজ্ঞাতির ঘুঁসির জন্য; হৃদয় আছে—শিকার-পেয়ারা রাজকুটুম্বের জন্য। কত বলিব? তবে আর, যুদ্ধ ক্ষেত্রটাই এত কি বেশী? এখানে মরিতে হইলে মরিব, কাহারও সখের কি ভ্রমের জন্য! সেখানে যদি মরি, তবে মরিব—দৈবাৎ। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন। আমি নিশ্চয় যাইব, এবং বাছাই বাছাই খবর দিয়া খদ্দের মহলে আপনার পসার অটুট রাখিব ফলতঃ—

(বিলম্ব)

এতদিন আমি মধ্য আসিয়ায় পৌঁছিতাম। কিন্তু যখন সময় মত পিণ্ডিতে উপ-স্থিত হইতে পারি নাই, তখন তাড়াতাড়ি করা বৃথা, এই বিবেচনায় ইতস্ততঃ করিতে-ছিলাম, এমন সময় বিলাত হইতে খবর পাইলাম যে, লাট রোজবেরি জর্ম্মণীতে যাইতেছেন, সুতরাং আমাকে আরও বিলম্ব করিতে হইল, তাহার কারণ,

(তেলের গোল)

তেলের মীমাংসার ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল! রুষিয়ার সঙ্গে সীমানা লইয়া বিবাদটা না হয়, যুদ্ধ বাধিয়া অকারণ ধনে প্রাণে মারা যাইতে না হয়, এ ইচ্ছাটা বিলাতী রাজপুরুষদের—(আহা! তাঁহারা যে শান্তিপ্রিয়!)—বিলক্ষণ রূপেই আছে,—তাহা আপনি জানেন। সেই জন্য জর্ম্মণীর কূটমন্ত্রী বিষমার্ক যাহাতে মধ্যস্থ হইয়া গোলযোগটা মিটাইয়া দেন, তাহার চেষ্টা হইতেছে! সেই চেষ্টাতেই লাট রোজবেরির জর্ম্মণীযাত্রা। এখন, বিষমার্কের মত একটা লোককে হাত করিতে

হইলে বিস্তর তেলের আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য। দেখুন না, এই আমাদেরই বানেখা আমীরকে হাতে রাখিবার জন্য কি না করিতে হইল? সুতরাং রোজবেরির তেলের দরকার হওয়াতে দস্তুরমত পরোয়ানা আসিল যে, এ ব্যাপারে যে তেলের আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষ হইতে ফিল্‌ফৌর পাঠান যায়। পরোয়ানা আসিবামাত্র একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পড়িবারই কথা। একটু আধটু তেলের কর্ম্ম নয়, রোজ-বেরির যত তেল চাই, তাহা গোটা ভারতবর্ষ না শুষিয়া লইলে কুলায় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত তেল যদি চালান দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ, যেহেতু তেলের কল্যাণেই অনেকের জীবিকা, তেল না থাকিলে অনেকের ব্যবসা-লোপ, বৃত্তি-লোপ। কাজেই একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বিস্তর রাজা রাজড়া, আমীর ওমরা, হাকিম আমলা, চতুর্দ্দিক্ হইতে মোজাহেম দিতে আরম্ভ করিলেন। নানাস্থানে সভা হইল, কতই লম্বা চৌড়া বক্তৃতা হইতে লাগিল,—শেষে দরখাস্ত, দরখাস্তই কত! কিন্তু সকলগুলির পরিচয় দিতে গেলে, এ দুঃখের তৈল-কাহিনী কখনও ফুরাইবে না, সুতরাং কএকখানা প্রধান দরখাস্তের সার মর্ম্ম নিম্নে যথাযথ প্রকাশ করিতেছি।

(দরখাস্তের সারসংগ্রহ)

বাহাদুরি দরখাস্ত। মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর প্রভৃতি বাহাদুর দলের দরখাস্তের স্থূল মর্ম্ম এই,—আমাদের পিতৃপুরুষেরা দেউল দিতেন, অন্নসত্র দিতেন, পুষ্করিণী দিতেন—পরমার্থের জন্য। তাঁহারা কামনা করিতেন—স্বর্গ, সাক্ষী করিতেন অনন্তকাল। আমরা দিয়া থাকি খাঁটি তেল—স্বার্থের জন্য। আমরা কামনা করি—উপাধির বাহাদুরি, সাক্ষী করি—গবরমেণ্ট গেজেট; সুতরাং সব তেল যদি দেশ হইতে চলিয়া যায়, আমরা থাকিব কি লইয়া? আমাদের তেলের কারবার অতি বৃহৎ; ইস্তক লাট সাহেবের আরদালি নাগাইদ কনেষ্টবলের তল্পি-দার সর্ব্বত্রই আমাদের তেলের যোগান। দেশের সমস্ত তেল থাকিতেও আমরা কুলাইতে পারি না, পষ্টই দেখুন, কাঙ্গালীর রুক্ষ মাথায় এক ফোঁটা তেল পড়ে না; এমত অবস্থায় এ দেশের তেল বিদেশে চালান দিলে আমাদের গতি কি হইবে?

ভুয়াজারি দরখাস্ত। জনকতক ভুয়া লোক খুব নামজারি করিয়াছে, তাহাদের দরখাস্তের মর্ম্ম;—তেল আমাদের সর্ব্বস্ব! তেলের জোরে আমরা মানুষ হইয়াছি। আমাদের ইতিহাস নাই, পরিচয় দিবার পন্থা নাই, অথচ শুদ্ধ তেলের জোরে আমরা পণ্ডিত, আমরা বড় লোক, আমরা নবাব। তেলের গুণে কেবল আমাদেরই জীবন-পথ সরল হইয়াছে, এমন নয়, আমাদের বংশরক্ষার উপায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দরকার হইলে, সদর অন্দর দিয়া আমরা সমানে তেলের সরবরাহ করি;

তেলের প্রসাদে ঘরে রাজযোগ হয়, বাহিরে গোলযোগ নিবারণ হয়। আমরা তেলাপোকা—এখন পাখী হইয়াছি; তেল ছাড়িলে আমরা থাকিব কি লইয়া?

পায়াভারি দরখাস্ত। জনকতক সদয়ালা যে দরখাস্ত দাখিল করেন, তাহার মর্ম্ম এই;—আমাদের এই বড় পায়া, শুদ্ধ তেলে। আমরা লেখা পড়া করি নাই, এমন নয়, কিন্তু সে লেখা পড়ার ফলে আমাদের ঘটিত—উপোষ। তাহার পর যে দিন তেল হাতে করিলাম, সেই দিন অবধি নির্ভাবনায় খোরপোষ। এখনও আমাদের তিন প্রস্থ তেলের নিত্য প্রয়োজন, সেরেস্তাদারের হাতে সালকাবারি রিপোর্ট, তাঁহার তেল চাই। জজের হাতে জীবন-কাঠি মরণ-কাঠি,—তেল চাই। আর, আইন কানুন ভাবিয়া বিচার আচার করিতে হইলে রিটারণ দোরস্ত করিতে পারি না, সুতরাং নথীটী হাতে পড়িলেই বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে হয়, তখন নাকে দিবার জন্য আবশ্যক হয় তেল। তেল নহিলে আমাদের এক পা চলিবার উপায় নাই; কেমন করিয়া তবে তেল ছাড়িতে পারি?

[illegible] নিম্নর [illegible], কিন্তু পুঁথি নাড়িয়া উঠিতেছে। [illegible]

(খোশ খবর।)

বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকলেরই মোজাহেম মঞ্জুর করিতে হইয়াছে। পাগলদের দরখাস্ত ছিল না, তথাপি চরকা ঘুরিবার মত কিছু তেল রাখা হইয়াছে। কেহই বঞ্চিত হয় নাই, মাজিষ্টরের আরদালীদের জন্য ডিপুটী বাবুদের তেল পর্য্যন্ত মঞ্জুর হইয়াছে। পরিমাণের তালিকা বারান্তরে পাঠাইব। দুঃখের বিষয়, উকীল বাবুদের দরখাস্তখানি কেবল না-মঞ্জুর হইয়াছে! ইঁহারা চাহিয়াছিলেন হাকিমদিগকে দিবার জন্য; কিন্তু ইঁহারা যে তেল দেন, তাহা কেবল লঙ্কাফোড়ন দিবার জন্য, এই কথা প্রকাশ পাওয়াতে, ইঁহাদের তেলটুকু সরকারে জব্দ হইয়াছে এবং সেইটুকু মাত্র লাট রোজ-বেরির কাছে সবিস্তার রিপোর্ট সহ চালান গিয়াছে, তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যে বাকি কাজ চর্ব্বি দিয়া সারিবেন।

যাহা হউক, এ ব্যাপার একপ্রকার সমাধা করিয়াছি। এইবার যুদ্ধার্থে রওয়ানা হইলাম। আপনি গিন্নির প্রতি নজর রাখিবেন, তিনি যেন এই হেঁপায় বলনটিয়ারীতে নাম লেখাইয়া ফেলেন না। *

---

* (পাঁচুর টীকা)—কথায় কথায় মনে পড়িয়া গেল। চারি শ বাবু বলনুটিয়ার হইবার প্রার্থনা করিতেছেন। এ হুজুকে পঞ্চানন্দ না মাতিলে শোভা পায় না, তাই কি তাঁহার রাজভক্তির উপরেও চোট লাগিতে পারে; অতএব এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পঞ্চানন্দ বলনুটীয়ার হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু এই কয়টী সর্ত্ত আছে,—(১) বন্দুক ধরা অভ্যাস নাই, সুতরাং বন্দুকের আওয়াজের পরিবর্ত্তে পঞ্চানন্দ গলার আওয়াজ মাত্রে কাজ সারিবেন, (২) সরকার হইতে একটী

লড়াইস্থ সংবাদদাতার পত্র।

[বাজে কথা]

ঠাকুর-গো প্রণাম হই।

শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইয়া বালা-মুরগবের পশ্চিম পারে উপস্থিত হইয়াছি। সীমা-বন্দির আমীন শ্রীযুক্ত শ্রীপিতার লোমহৃদনের সঙ্গে দেখা করিয়াছি, তিনি শারীরিক ভাল আছেন, তবে বেতনে বাসা খরচ কুলায় না বলিয়া আমার কাছে একটু দুঃখপ্রকাশ করিলেন। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের অভাব নাই, সুতরাং চাঁদা তোলারও বিরাম নাই। সেই তহবিল হইতে তাঁহার সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিব বলিয়া আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছি।

[যুদ্ধের অন্বেষণ]

যুদ্ধের নিমিত্তই আমার আসা, কিন্তু যুদ্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না। ইংরেজের সঙ্গে রুসের যুদ্ধ কি সূত্রে ঘটান যাইতে পারে, তাহারই এখনও নির্ণয় হয় নাই, যুদ্ধ ত পরের কথা। তবে কাবুলকে মার খাওয়ান—সে স্বতন্ত্র কথা। তা সেবারও হইয়াছিল, এবারও হইয়াছে। সেবারের মার বিজ্ঞানের সীমার পারিতে। এবারের মারের কারণ—অজ্ঞানের সীমা। অর্থাৎ কার সীমা, কিসের সীমা, কে করিবে, কেন করিবে, এ সব নাকি কাবুল বেচারা কিছুই জানে না, সুতরাং তাহার মার খাওয়া আবশ্যক, ইহা সভ্য জগতে সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক কাবুলের জন্য দুঃখিত হইবারও কোন কারণ নাই, এমন সিংহ-ভল্লুকের মধ্যস্থ সে হয় কেন? "মাঝে থাকিলেই মারা যায়"—এ প্রবাদ ত তাহাকে মানিতেই হইবে।

[প্রহারের প্রকরণ, উভয় পক্ষ নির্দ্দোষ]

কাবুলের যৎকিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা হইতেছে, সত্য; কিন্তু সেজন্য, ইংরেজ কি রুষ, কেহই দোষী নহে, ইহা আমি সরেজমীন তদন্তে বিশেষরূপেই জানিতে পারিয়াছি। তবু যে কাবুল মার খাইতেছে, তাহার প্রণালীটা বুঝাইয়া দিলেই আপনি নিগূঢ় তত্ত্বটুকু সংগ্রহ করিতে পারিবেন। মনে করুন, কাবুল হইতেছে যেন এক দুম্ব ভেড়া, তার মাথাও আছে, লেজও আছে। এখন, এই দুম্বর এক দিকে আছেন একটী সিংহ, আর এক দিকে আছেন একটা ভালুক। দুই জনেই খুব ভাল

তল্পিদার দিতে হইবে, নহিলে ছিটা, বারুদ, গোলাগুলি, খাবার দাবার, মোট পুটুলি বহিবে কে? (৩) বেলা আটটার পূর্ব্বে এবং নটার পর পঞ্চানন্দ হইতে কাজ হইবে না. গ্রীষ্মে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না; তাই উঠিতে বিলম্ব; আর, রোদ্রে মাথা ধরে, কাজেই নটার পর অকর্ম্মণ্য। (৪) একটা মশারি চাই; কামানের শব্দ সহ্য যায়, মশার শব্দ কিছুতেই বর্দ্দাস্ত হয় না। মনে থাকে যেন, পঞ্চানন্দ এখন "সুশিক্ষিত" অথচ রাজভক্ত বাঙ্গালী।

মানুষ—পরোপকারী, নিরামিষ-ভোজী, নির্ব্বিকার, নিরাময় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক। উভয়েরই ইচ্ছা যে, দুরন্ত দুর্দ্দান্ত দুম্বটা মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, এবং অবহিত চিত্তে অনন্য মনে সেই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশামৃত পান করিয়া চিরজীবী হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এবং বিধির বিড়ম্বনায় দুম্বর একটা বই মুখ নাই। সেবারে দুম্ব ভালুকের দিকে মুখ ফিরাইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল, সুতরাং দুম্বর লেজটা তখন সিংহের মুখের কাছে আসিয়া লোলভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সিংহের ধারণা আছে যে, তাঁহার উপদেশই অমৃত, তাহা পান করিলেই অমরত্ব। কিন্তু ভালুকের কার্য্যে হস্তক্ষেপ তিনি করিবেন কেন? সুতরাং ভালুকের সঙ্গে কথাটি না কহিয়া, অথচ কেবল দুম্বর মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া লইবার মৎলবে তাহার লেজে এক কামড় দিলেন। এবার তাহারই পাল্‌টা হইয়াছে। সিংহের দিকে দুম্বর মুখ, অগত্যা ভালুক তাহার লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। তবেই দেখুন, দুম্ব নিজ দোষেই মারা যাইতেছে। ইহাতে সিংহ-ভল্লুকের অপরাধ কি? বাস্তবিক, ইংরেজ-রুষে বিবাদের কিছুমাত্র কারণ নাই; তবে উভয়েই নাকি জগতের সুখবৃদ্ধি করিতে কৃতসংকল্প, তাহাতেই যত যাহা হউক।

[কুমারাভ-দর্শনে]

যুদ্ধ খুঁজিয়া পাইলাম না, সুতরাং যুদ্ধের গোড়া রুষ-সেনাপতি কুমারাভের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে গেলাম। কাজ কর্ম্ম নাই, লাঠালাঠি মারামারি কিছুই নাই, এ বিষম গ্রীষ্মে করি কি? কাজেই বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলাম। সেনাপতি আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিলেন, কত আদর করিলেন, জলযোগের আয়োজন করিতে চাহিলেন কিন্তু সায়ংসন্ধ্যার ওজর করিয়া আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। তাহার পর দুইজনে যে কথোপকথন হইল, অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিতেছি।

[কথোপকথনে]

আমি। কি জান, ভারতবর্ষের লোভটা পরিত্যাগ করাই ভাল, নইলে তোমাদের ভদ্রস্থতা নাই।

কুমা। ভারতবর্ষে ত আমাদের লোভ নাই, আপনি অন্যায় দোষ দিতেছেন।

আমি। লোভ নাই ত এদিকে আসা কেন?

কুমা। ঠিক যে জন্য ইংরেজের আসা—সভ্যতা, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বিস্তার।

আমি। কিন্তু ইংরেজ ত এখন সে কাজ করিতেছেন, তবে আবার কেন?

কুমা। ভারতবাসীর কষ্ট মোচন হইতেছে কৈ?

আমি। (রুষেরাই কি তাহা পারিবে?

কুমা। এক শ বার পারিব। ইংরেজ স্বয়ং তাহা স্বীকার করিবে, তাহার যোগাড়ও করিতেছে।

আমি। সে কি রকম?

কুমা। ইহা আর বুঝিতেছেন না? প্রথমেই ধরুন, ইংরেজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করে না, আমরা খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু সকল কথা আজ আপনাকে বলিতে পারিব না। তবে মোটামুটী বলিয়া রাখি, ভারতবাসী স্বয়ং নিমন্ত্রণ না করিলে, আমরা পা বাড়াইব না। নিমন্ত্রণের ভরসা আমাদের বিলক্ষণ আছে।

আমি। (হাস্য সম্বরণে অপারগ হইয়া) তবে তুমি রাজভক্তির কোন খপরই রাখ না।

কুমা। রাখি। কিন্তু সে রাজভক্তি টেঁকিবে না। ইংরেজের বাহুবল আছে, বুদ্ধিবল নাই। আতঙ্কে চমকিয়া উঠা তাহার অভ্যাস—

আমি। রাজনিন্দা আর গুরুনিন্দা—তুল্য কথা। আমি আর শুনিতে চাই না। তোমরা বড় লোভী। পড় যদি কখনও কোন ডেপুটী-মাজিষ্টরের পাল্লায়, তবে টের পাইবে। সদ্য একবার দণ্ডবিধি, আর কার্যবিধি কিছু কিছু দেখিয়া রাখিও। তাহা হইলে আর তোমার অমন আলগা মুখ থাকিবে না।

কুমা। দেখিতে হইবে না, দেখিয়াছি। ঐ দণ্ডবিধি কার্য্যবিধিই আমাদের একটা ভরসার স্থল। আর আপনার ঐ ডেপুটী বাবুরাই আমাদের কতক কতক গুরুবর।

আমি। বুঝিতে পারিলাম না।

কুমা। আমার দুরদৃষ্ট।

আমি। আচ্ছা, তোমাদেরই যেন হইল, তাহা হইলে ইংরেজ পারিতেছে না, তোমরা ভারতবাসীর দুঃখমোচন করিবে কেমন করিয়া?

কুমা। বিলাত স্বর্গ, ইহা আপনারা মানেন, আমরাও মানি। কিন্তু রুষিয়াও স্বর্গ। আপনাদের পক্ষে রুষিয়া স্বর্গই শ্রেষ্ঠ। রুষিয়া পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা হইতে পারে, বিলাত পর্য্যন্ত তা হইতে পারে না। স্বর্গের বাঁধা রাস্তাই সকল দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়।

[নিদ্রাভঙ্গ]

হাসিতে হাসিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দেখি যে, আমি যে দড়ির খাটে বারো মাস শুইয়া থাকি, এখনও ঠিক সেই দড়ির খাটে শুইয়া আছি। সেই মশা, সেই ছারপোকা, সেই সমস্ত। ঢেঁকির সুখ স্বর্গেও নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

[যথাশাস্ত্র উপসংহার]

অপর সমস্ত মঙ্গল। গিন্নির গোঁপহার ছড়াটা সেক্‌রা দিয়াছে কি না, ফেরত ডাকে লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, আমি তজ্জন্য উদ্বিগ্ন রহিলাম। ইতি—

মেয়ে মানুষের দরখাস্ত।

(নয়শনিরানব্বই জন মেয়েমানুষের দস্তখতি নিম্নলিখিত দরখাস্তখানি লাটসাহেবের কাছে প্রেরিত হইয়াছে।)

অধীনীদের নিবেদন এই যে,—রুষিয়ার জারের সঙ্গে আমাদের মহারাণীর ঝগড়া বাধিবার উপক্রম দেখিয়া, দেশশুদ্ধ লোক লড়াই করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজভক্তির জন্য আমাদের পুরুষ মানুষেরা চিরদিনই প্রসিদ্ধ; কিন্তু এমন গলা-চেরা চেঁচানে রাজভক্তি এ দেশেও আগে দেখা যায় নাই। তা বেশ কথা। এ দেশে রাজভক্তি থাকাই ত ভাল, থাকাও উচিত। আপনি পুরুষদের ভর্ত্তি করিয়া লইবেন। যদি তাহারা লড়াই করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে তাহাদের পুরুষত্বের একটা দলিল হবে, দেশের মঙ্গল হবে; যদি মারা পড়ে, আপদ যাবে। কাপুরুষদের মরাই ভাল। এক ভাবনা, আমরা বিধবা হব। তা হই, হব। দুদিন না হয় বিধবা হইয়াই কাটাইব। দুঃখ কিছু চিরদিনের তরে নহে, কত প্রমথ মন্মথ আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এখন অরণ্যে রোদন করিতেছেন, আমরা যোগাড় করিয়া বিধবা হইতে পারিলে, তাহাদের দুঃখ আমাদের দুঃখ একসঙ্গেই লোপ পাবে।

কিন্তু নাথ, রাজভক্তি কি পুরুষদেরই একচেটে? আমাদের কি একটুও ভাগ নাই? আপনি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, রাজভক্তির কারণ আমাদেরই এখন বেশি বেশি। পুরুষ মহলে অনেক কান্নাকাটী শুনিতে পাওয়া যায়; তাদের এ সুখ-সাগরেও লোণা জল। টেক্স দিতে, আফিস যেতে, লাথি খেতে, কত লাঞ্ছনাই তাদের ভুগিতে হয়। কিন্তু আমাদের সে সব উৎপাত ত নাই; অধিকন্তু আছে, কেবল সুখ-সাগরে সাঁতার দেওয়া, আর বারাণ্ডাতে হাওয়া খাওয়া। আমাদেরই ত নিখুঁত রাজভক্তি।

মনে করিতে পারেন যে, আমরা অবলা। সেটি কিন্তু মিছা বদনাম; সে কালের কথা যাই হউক, এখন আমরা খুব প্রবলা, তার সন্দেহ নাই। যদি চান, ত আমাদের ভুক্তভোগী গুরুজনের সার্টিফিকেট এ বিষয়ে আমরা দাখিল করিতে পারি।

পুরুষেরা আমাদের চিরশত্রু, তাদের সঙ্গে নিত্যই আমাদের সম্মুখ-সমর, এ কথা আপনার অবিদিত নাই। তারা বরাবরই আমাদের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়, আমাদের

কলঙ্ক রটানই তাদের ধর্ম্ম। মিনতি করিতেছি, তাদের কথা শুনিয়া আমাদের কোমল প্রাণে দাগা দিবেন না। ঝগড়া করা আমাদেরই কাজ। পুরুষেরা ইয়ার ভাল হইলেও বলণ্টিয়ার হইয়া কি করিবে? বলণ্টিয়ার হইব আমরা! পুরুষে বীর হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা প্রসব করিলে ত। অতএব অনুমতি করুন, আমরা এখন বলণ্টিয়ার হই। কালে, পালে পালে অভিমন্যু পাইবেন।

এখন পুরুষেরা অস্ত্র ধরিতে জানে না, তাদের মোটেই অভ্যাস নাই, কলমটী পর্য্যন্ত দপ্তরী কাটিয়া দেয়। আমরা তবু সূচ ফুটাইতে পারি, জাঁতির ব্যবহার জানি। তার উপর, আমাদের সেই দিব্য অস্ত্র—ঝাঁটা। আশা করি, ঝাঁটার স্বাদ আপনারও অবিদিত নাই। যেখানে অস্ত্র নিয়ে কাজ, সেখানে আমাদিগকেও লওয়া উচিত। আমাদের না নেবেন কেন? জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে শক্তিকে উপেক্ষা করিবেন না। ভারত আপনাদের অধীন, কিন্তু দুনিয়ার পুরুষ আমাদের অধীন। আমরা যে "অধীনী বলি, সে আমাদের মাহাত্ম্য। জানেন না কি যে, আমাদের কটাক্ষে প্রলয় হয়?

আপনি জানেন, চিররসময়ী বাঙ্গালায় আজকাল আবার যত বীররস, গোটা পৃথিবীতে তাহা পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা কবি, বীর রসের মা। সে বাঙ্গালা পড়ে কে? পুরুষে? কখনই না। আশায় বুক বাঁধিয়া, এ বীররসের তরঙ্গ আমরাই বুক পাতিয়া লইতেছি। আর যে ধরে না, আর যে সহিতে পারি না। হৃদয় ধু ধু করিতেছে, প্রাণ হু হু করিতেছে। আমরা বলণ্টিয়ার হইতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, আমাদের শিক্ষার পরীক্ষা লউন। হাতে ধরিতেছি, মাথার দিব্য দিতেছি; অনুমতি করুন, আমরা একবার মাথার কাপড় ফেলিয়া বাহির হই। শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি চিন্তা করিবেন না; আমাদের পুরুষগুলা যদি পারে, আমরা দশবার পারিব।

বঙ্গমহিলোত্তোলনী সভা,
বৈশাখ, ১৩০৩ হিজিরা।

শুধু মুখের কথার প্রয়াসিনী
চির অধীনী
শ্রীমতী বিলাসিনী কারফরমা
„ সুলোচনা দত্ত,
„ দিগম্বরী চট্টরাজ প্রভৃতি।

দুটো বকেয়া গল্প।

(১)

সাক্ষীর জেরা হইতেছে। মুন্সেফ বাবুর টান সেই সাক্ষীর দিকে, সুতরাং যে উকীল জেরা করিয়া সাক্ষীকে নাস্তানাবুদ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, মুন্সেফ বাবু তাহার উপর খুব চটিয়া উঠিলেন। ক্রমে কথায় কথায় রাগারাগি পর্য্যন্ত হইল। তখন হাকিম ধৈর্য্যহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মত গাধা উকীল আমি কুত্রাপি দেখি নাই।"

উকীল বাবু বিনয়-নম্রভাবে উত্তর দিলেন—"তা কেমন করিয়া দেখিবেন? উকীল গাধা হইলেই যে মুন্সেফ হইয়া যায়।" তাহার পর নির্ব্বিরোধে জেরা চলিতে লাগিল।

(২)

রামেশ্বর ঘোষাল সেকেলে মোক্তার। নাছোড় হইয়া ডেপুটী বাবুর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করিতেছে। অনেকবার বুঝাইবার চেষ্টা, ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও ডেপুটী বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঘোষালের বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। তখন ডেপুটী বাবু বলিয়া ফেলিলেন—"ঘোষাল, তুমি বড় বোকা!"

ঘোষাল বক্তৃতা বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িল। ডেপুটী বাবু বৎসরাবধি এ মহকুমায় কাজ করিতেছেন, সকলকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়া যাতায়াতে, একটু চক্ষুলজ্জাও জন্মিয়াছে, কাজে কাজেই ঘোষালের ভাব দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"কি হে ঘোষাল রাগ করিলে নাকি?"

ঘোষাল। "না হুজুর, রাগ কেন করিব? তবে বড় দুঃখ হইল বটে।"

ডেপুটী। "একটা কথা বেরিয়ে গিয়েছে, তা যাইক। দুঃখ করিও না।"

ঘোষাল। "দুঃখ ত আমার জন্যে নয়, দুঃখ আপনারই জন্যে। আগে আগে যত হাকিম এই এজলাসে বসিয়াছেন, তাঁরা প্রথম দিনেই আমাকে বোকা ঠাওরাইয়া লইতেন, তা এই সামান্য কথাটা ঠিক করিতে আপনার এক বৎসর লাগিল, তাই আপনার জন্যে আমার দুঃখ হইতেছে।"

ক্ষেপা খগেশের টিপ্‌নী।

(ভারি হাসির কথা)

মশাল ধরিয়া যে আগে আগে পথ দেখাইয়া যায়, সে আপনি কিছু দেখিতে পায় না।

যে পাখা টানিয়া সমস্ত ঘর ঠাণ্ডা রাখে, সে আপনি গরমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়।

জল ছিটাইয়া পথের ধুলা যে মারিয়া দেয়, তাহাকে খুব ধুলা খাইতে হয়।

যে দিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ধুমধাম, সে দিন বাড়ীর কর্ত্তার প্রায় আহার যোটে না।

যে শ্রাদ্ধ করে, প্রায় তাহারই শ্রাদ্ধ হয়।

মাথা নাই, বাকি সবই আছে।

ভিতরে কিছু নাই গো। কিছু নাই। সব পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে। ভারত-মাতার জন্য চিন্তা, সে ত সহজ আগুন নয়। দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া জলিতেছে; এত যে বোতল বোতল ব্রাণ্ডি, ডজন ডজন সোডাওয়াটার, রাশি রাশি বরফ, তাহাতে ত সে আগুন নির্ব্বাণ হয় না, বাড়বানলের মত সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, এই মাত্র। যদি এ জলযোগ না থাকিত, তবে, দাবানল হইত,—সংসার থাকিত না। আহা! ভারত চিন্তাতেই তিনি গেলেন। এমন ভারত ছাড়া চিন্তাও কি হইতে হয়? তবু দেখ তাঁহার ঐ চিন্তা।

তোমাদের চিন্তা আর তাঁহার চিন্তা অনেক তফাৎ। বিলাতে ভারতে, পশ্চিমে পূর্ব্বে যত তফাৎ ততই, বরং তাহা হইতেও বেশি তফাৎ। তোমাদের চিন্তায় শরীর শুকায়, তত কাজ ফলে না। কিন্তু তাঁহার চিন্তায়? আর্য্যধমনীর ভিতর দিয়া মহাবেগে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত করিতে থাকে। নলের ভিতর দিয়া কলের জল তত বেগে ছুটে না, তাঁহার চিন্তায় ধমনীতে ধমনীতে আর্য্যশোণিত যেমন ছুটে। ধমনী ফাটিয়া যায় না, এই ভাগ্য। ফাটে না, কিন্তু ধমনী নাচিয়া উঠে। যখন নাচে, তখনই ভূমিকম্পের সূচনা হয়; যখন বক্তৃতারূপে কিম্বা সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তখনই আগ্নেয়গিরির উদ্‌গার—এ কি সামান্য চিন্তা।

ভিতর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। ঐ যে চেরাসিঁতি, চস্‌মা চেন, চোগা চাপকান, ছড়ি ঘড়ি, সেরেফ সেই ছাই গাদার আচ্ছাদন বৈ ত নয়। ও সব যদি না থাকিত, তবে ভিতরের ছাই ত দেশ ছাইয়া ফেলিত। পোড়া ভারতের দায়ে তাঁহার কি আর কিছু আছে?

ভারতের তরে তিনি কি না ছাড়িয়াছেন? মা বাপ, ভাই, ভগিনী, লোক লৌকতা, কুটুম কুটুম্বিতা, দয়া, মায়া, সবই ত তিনি অকাতরে অম্লানমুখে বিসর্জ্জন

করিয়াছেন। এমন যে চক্ষুলজ্জা—নিতান্ত মুটে মজুরেরও যাহা আছে, তাহাও কি আর তাঁহার আছে? তবু ত পোড়া দেশের লোকে বুঝিল না। এ দুঃখ রাখি কোথায়?

ছাড়েন নাই বটে স্ত্রীকে। তা, স্ত্রীকে ছাড়িলে সংসার চলিবে কি লইয়া? ছাড়েন নাই, পোলাও, কালিয়া, চপ, কাটলেট, কাবাব, কোপ্তা; ছার আহার নহিলে যে জীবনধারণ হয় না। সাজসজ্জা?—কেবল লোকলজ্জা নিবারণের জন্যেই ত? গাড়ী ঘোড়া?—ভারতের হিত করিতে এক ফোঁটা সময় কি নষ্ট করিবার যো আছে? কাজ যে কত বেশী! সময় যে কত কম! অন্নেয়ের মাথায় বোঝা কত! কাজে কাজেই দশ টাকা রোজগার যাহাতে হয়, তাহাই বা না করিলে এ সব চলে কিসে?

তায় তিনি একা। এক দিকে কোটি কোটি, অন্য দিকে তিনি একেশ্বর। ছোট খাটো একটী পাড়া নয়, একখানি গ্রাম নয়, একটা জেলা নয়, সামান্য যে বাঙ্গলা মুলুক তাহাও নয়,—অখণ্ড ভারতবর্ষ ষোল আনা "এক" করিতে হইবে; তাহাতে তিনি একা। দেশের লোক মরে না গা।

আবার দেশই বা কেমন? দেশের লোকগুলারই বা রকম কি? অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর। বিজ্ঞানের ব জানে না, ইংরাজীতে একখানা চিঠি লিখিতে প্রায় ত পারেই না, যে পারে, সে এক ডজন ভুল না করিয়া ছাড়ে না। ভদ্র লোকের কাছে, তাঁহার যে কত লজ্জা হয়, তাহা কি বলিবার কথা?

দেশের লোকের যদি বুদ্ধি শুদ্ধির বাষ্প বিন্দু থাকে! ইহারা কি আর্য্যসন্তান? আর্য্যের সে বীর্য্য, সে তেজ, সে উৎসাহ, সে উদ্যম, ইহাদের কৈ? আছে কেবল ইহাদের কদাচার আর কুসংস্কার। যাহা বলিয়াছে, যাহা করিয়াছে, সেই বকেয়া বাপ পিতামহ, সেই চোয়াড়ের অধম চৌদ্দপুরুষ; তাহাই ইহাদের বেদ, তাহাই ইহাদের ব্রহ্ম। তাহাতেই যদি চলিত, তবে তাঁহার জন্মগ্রহণের শ্রম স্বীকার করা কেন? কিন্তু তিনি একা। একবার মাত্র পদদলন করিয়া লক্ষ পিপীলিকা বিনষ্ট করা যায় কিন্তু একটী একটী করিয়া সেই পিপীলিকাগুলাকে মাথায় তোলা কি সোজা কথা? শুধু বাঙ্গালা হইলে যদি তাঁহার সে সামর্থ্যের কিছুমাত্র সংকারও হইত, তবে বাঙ্গালা এতদিন ভারত-ছাড়া পৃথিবী-ছাড়া হইয়া কোন্ দিন স্বর্গ লাভ করিত। কিন্তু সাধ তাঁহার আশা, তাঁহার উদ্যোগ, তাঁহার চেষ্টা, একখানি আস্ত ভারত। হয়, ভারত—না হয়, কিছুই না।

তিনি আর্য্যসন্তান, আর্য্যকুল উজ্জ্বল করিয়া কুলগৌরবে গর্ব্বিত। জগৎ যখন অজ্ঞানান্ধকারে, মিশর হাসে নাই, গ্রীস ভাসে নাই, রোম রোষে নাই—তখনকার তিনি আর্য্য। ব্যাস বাল্মীকি দ্রোণ ভীষ্ম, তাঁহার বুকের ভিতর হাডুডুডু খেলিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যনীতি, আর্য্যবিজ্ঞান, আর্য্যশিল্প,

আর্য্যভাষা, আর্য্য আচার, আর্য্য ব্যবহার—এর সব লইয়াই ত তিনি গৌরব করেন। কিন্তু ভাই, এ গুলিতে খুঁত আছে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিছুই নয়, নির্দ্দোষ কেহই নয়—সমস্তই জঞ্জালে জড়িত, আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন। প্রতীকার চাই, সংস্কার চাই, সৎকার চাই, এবং সেই মাত্রায় চীৎকার চাই। নহিলে, **তিনি** কেন জন্মিবেন? জন্ম পরিগ্রহ না করিলে, তাঁহার কি কিছু অচল ছিল?

পোড়া লোকে ইহা বোঝে না, এই আপশোষ! তাই তাঁহার সঙ্গে কেহ মিশে না, কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁসে না। তিনি একা। কিন্তু ভারতেরই দোষে ভারতের ঐক্য হয় না। তাঁহার দোষ কোথায়? তিনি ত রক্ষা করিতেও রাজি। কেন তবে লোকে করে না? ভাল ত তাহাদেরই। রক্ষাও হয় অল্পেই। তিনি এত ছাড়িয়াছেন—দেশের খাতিরে; দেশও কিছু ছাড়ুক—তাঁহার খাতিরে। ক্ষমা ঘৃণা নহিলে মিটমাট হয় না; তা, ঘৃণা তিনি যথেষ্টই করেন; ক্ষমার ত কথাই নাই; তাঁহার ক্ষমতা মত কাজ হইলে কাহারও ধড়ের সঙ্গে মাথা থাকিত নাকি? যাহাই হউক, তিনি এত সহিয়াছেন, লোকেও কিছু সহুক। তাঁহার মতে মত দিলেই সব চুকিয়া যাইবে, তাঁহার হইয়া এ কথা আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি।

কথা কি জান, আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যকর্ম্ম, আর্য্যরীতি, আর্য্যনীতি, এ সব ভাল বটে, কিন্তু তাহাতে নানা গলৎ। বিশেষতঃ শাস্ত্র খুঁজিয়া না দেখিলে কি যে কি, তাহাও ঠিক করা অসাধ্য। কিন্তু তোমরাও জান, তিনিও মানেন, আমিও মানি যে, শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক কখনও ছিলও না, কখনও হইবেও না। শাস্ত্র শিখিবার উপায়ও নাই। এখন ত আর সংস্কৃত শিখিতে সময় দেওয়া যায় না; বরং সময় থাকিলে ফরাসি জর্ম্মান অভ্যাস করা যাইতে পারে, বক্তৃতার জন্য গলা ভাঁজা যাইতে পারে। তাহাতে আবার তাঁহার কত কাজ! মীটিং আছে, সিটিং আছে, ঈটিং আছে! তা ছাড়া মার্টসিমির ডিঙ্গ পাড়া, বিধবার পতিখাড়া, সমাজে নাক ঝাড়া,—কত কি অবশ্যকর্ত্তব্য আছে। বাজে কাজ করেন কখন? তবে আসল কাজে তাঁহার খুব ঠিক; যে পাণ্ডিত্যের জন্য পাঠের প্রয়োজন নাই, তাহাতে ত তিনি পরিপূর্ণ। বুদ্ধির জোরে যাহা হয়, তাহা করিতে তিনি ত কখনই অপ্রস্তুত নহেন। বুদ্ধিতে যদি আগাগোড়া সমস্ত না কুলায়, তবে তাহার দায়ী তিনি হইবেন কেন? সে ত ভগবানের দোষ।

সে দিন তাঁহার সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। আহা! কি বিনয়নম্রভাব কেমন মধুমাখা কথা। কিবা হাত দুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, মাথা হেলিয়ে, দাঁত—থাক্, আর কাজ নাই, একবার বর্ণনার ছটাটা আরম্ভ করিলে, তাঁহার কথা আর বলা হইবে না। অতএব তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই বলি। তিনি বলিলেন,—"আমি আস্ফালন ভালবাসি না; কিন্তু ইহা বলিলে বোধ করি কেহ আমাকে দুষিতে

পারিবে না যে, একা আমার যত্নে ভারতের প্রায় পৌণে ষোল আনা দুঃখের মোচন হইয়াছে। এখন যাহা কিছু অল্পস্বল্প কষ্ট আছে, সে গুটিকতক ছোট লোকের। সে কষ্টও বেশী নয়—অন্নকষ্ট, জলকষ্ট আর বস্ত্রকষ্ট। তাহাও তাহাদেরই দোষে, আমার যত্নের ক্রটী নাই। তাহারা যদি আমার 'ভারত-ভোলানী' তহবিলে কিছু কিছু চাঁদা দেয়, এ দুঃখও তাহাদের থাকে না। কেমন করিয়া কি করিব, তাহা ঠিকঠাক হইয়াছে—বছর কতক বাঙ্গালা ভাষা বন্ধ; সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার বয়সটা বাড়াইয়া লইয়া ভারতবর্ষের মেয়েছেলে, বুড়া-হাবড়া পর্য্যন্ত আপামর সাধারণকে সিবিলিয়ান করিয়া দেওয়া, এখান থেকে টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে বিলাত ছাইয়া ফেলা, এবং—ওঃ সেদিন কখন আসিবে? গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের মত, পারলামেণ্টে নিদেন একটী কালাচাঁদ সংস্থাপন। তাহা হইলেই চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,, কিছু কি আর বাকি থাকে? আরও ছ মাস আমি চেষ্টা করিব; লোকের মতি শুধরায় উত্তম, নচেৎ আমুটি কোম্পানীর দোকান থেকে দড়ি কিনে এনে আমি গলায় দিয়ে মরিব, বাঙ্গালী দোকানের দড়িতে আমাব বিশ্বাস নাই। তোমরা কেহই আমাকে রাখিতে পারিবে না।"

বাঙ্গালীর দড়িতে তাঁহার বিশ্বাস নাই শুনিয়া আমার দুঃখ হইল। চক্ষু ছলছল করিয়া আমি বলিলাম—"অত হতাশ হইও না, বাঙ্গালীর ঘরের দড়ি দিয়াই অগ্রে চেষ্টা কর। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ যদি তাহা ফস্কায়, তখন লাকলাইন ত আছেই।"

সংবাদ-কুসুম।

গত সপ্তাহের "বঙ্গবাসী" এক পিঠ মাত্র ছাপা হইয়াই বাহির হইয়াছিল, আর এক পিঠ সাফ সাদা। গ্রাহকদের আগ্রহ কত! বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, কয়েকখানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী"র উপর টক্কর দিয়া চলিবার মৎলবে আগামী সপ্তাহ হইতে দুই পিঠই সাদা বাহির হইবে, ছাপার সংস্পর্শও থাকিবে না। পঞ্চানন্দ এ সুযোগে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আষাঢ় মাস হইতে পঞ্চানন্দ স্বতন্ত্র বাহির হইবেন;—ছাপা ত হইবেই না, কাগজ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না। মূল্য পূর্ব্ববৎ অগ্রিম দেয়।

গুলিখোর-সভার অতুল "সে-কি-রে-তোরই" লিখিয়াছেন—"আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমরা লড়াই করিতে যাইব এবং অকাতরে অষ্টপ্রহর গুলি খাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, যুদ্ধে গোলা গুলি দুই চলে, গোলা খাওয়া আমাদের অভ্যাস নাই। তাহার উপায় কি?"

ভাবনার কথা বটে। বিশেষত জনকতক "ভ্রাতা" নাকি বলাণ্টিয়ার হইতেছেন,

তাঁহাদের কল্যাণে "গোলা" যদি "নিরাকার" হইয়া যায়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ "গোল"। এক ভরসা আছে পশ্চিমে যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধে যেমন গোলা চলে, সে দেশে তেমন 'লু' চলে। দুই একত্র চালাইয়া লইতে পারিলে বোধ হয় 'গোলালু' তেমন ভয়ঙ্কর বস্তু বলিয়া আর মনে হইবে না।

কাবুলের আমীর দুই প্রস্থ কৃত্রিম দাঁত কলিকাতার একজন "দেঁতো" ডাক্তারের নিকট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। রুষিয়ার চপেটাঘাতে এক প্রস্থ, আর ইংরাজের চড়ে আর এক প্রস্থ ভাঙ্গিয়া গেলেও, আসল দাঁত কটা যদি থাকে, এই ভরসা।

দেশী লোককে সকের সিপাই করিতে কর্ত্তারা যে ইতস্তত করিতেছেন, তাহার প্রকৃত কারণ একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"দেশী লোকের রাজভক্তিতে আমাদের কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা সন্দেহ নাই। যেহেতু আমরা কেমন অপক্ষপাতে এবং দয়ার সহিত রাজত্ব করিতেছি, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। কিন্তু যাহারা সকের সেপাই হইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের প্রাণের মায়া নিশ্চয় নাই। এ অবস্থায় তাহারা যদি বন্দুক ধরিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে।"

দেশী খৃষ্টানদিগকে সকের সিপাই হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দেশী লোককে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অনুমতি না দিবারই কথা। খৃষ্টানদের ধর্ম্ম এই যে, তাহাদের এক গালে কেহ চড় মারিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ আর এক গাল পাতিয়া দেয়; শিবসাগরে সরকারের বেতনভোগী একজন হিন্দু উকীলের গালে একজন অধ্যাপক সাহেব একটীমাত্র চড় মারিয়া এবিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু উকীল বাবু আর এক গাল পাতিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, আদালতে নালিশবন্দ হইয়াছেন। যুদ্ধে কেবল চড় চাপড় নয়, প্রাণটী পর্য্যন্ত দিতে হয়। সুতরাং হিন্দুরা এখনও যোগ্য হয় নাই, এই মর্ম্মে উক্ত সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন।

বরখাস্তের দরখাস্ত।

অধীনের নিবেদনঃ—

১ দফা। সকের সিপাই হইবার দরখাস্তে আমার নাম যাহা লেখা আছে, তাহা জাল। দরখাস্তের সময়ে আমি বাড়ীতে ছিলাম না।

২ দফা। হুজুরের বিচারে আমার দস্তখৎ যদি আমারই বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে সেই দস্তখৎ আমি অজ্ঞান অবস্থায় করিয়াছি। অতএব এতদ্দ্বারা

আমি বাধ্য নহি। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টাই অজ্ঞান, তাহার ভদ্র ভদ্র সাক্ষী আছে।

৩ দফা। নিতান্তই যদি আমি সজ্ঞানে দরখাস্ত করাই সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে আমি নিবেদন করিতেছি যে, উক্ত দস্তখৎ করিবার সময়ে আমার সম্পূর্ণ আশা ছিল যে, হুজুর হইতে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে, অথচ আমি রাজভক্তি প্রদর্শন জন্য উপাধি কিম্বা খিল্লৎ কিম্বা একটা বড় চাকরি পাইব, সেই জন্যই আমি দস্তখৎ করিয়াছিলাম।

৪ দফা। যে দিন ঐ দরখাস্তে আমি দখস্তৎ করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে আমার গৃহিণীর সহিত কলহ হইয়াছিল। কিন্তু সে ঝগড়া এখন সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে, সুতরাং কারণাভাব প্রযুক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

৫। দফা। আমি খুব নিরীহ লোক, কাহারও সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতে অথবা কাঁহারও মনে কষ্ট দিতে ভাল বাসি না। এক্ষণে আমাদের বাড়ীতে ভয়ানক কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে, সকলের মনে অতিশয় কষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় আমার দরখাস্ত যদি গ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আমাকে নিতান্ত অমানুষ করা হয়। কিন্তু আপনাদের কাজ মানুষ লইয়া।

৬ দফা। আমার সাতপুরুষ কখনও অস্ত্র ধরে নাই, পিতা পর্য্যন্ত সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। আমি যদিও দুই এক দিন হোটেলে খাইয়াছি বটে, কিন্তু অতঃপর প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিরামিষ ভোজন অভ্যাস করিব। যাহাতে নরহত্যা হইবার সম্ভাবনা, এমন কাজে আমাকে ঠেলিবেন না।

৭ দফা। দণ্ডবিধির আইনে আমি দেখিয়াছি যে, আত্মহত্যার উপক্রম করিলে সাজা হইয়া থাকে। সুতরাং সিপাহি হইতে গেলেও আমার সাজা হইতে পারে; অতএব আমাকে মাপ করুন।

৮ দফা। অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করায় এবং শরীর চালনা তাদৃশ না থাকায় আমার বহুমূত্র এবং আমাশয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। তাহাতে যুদ্ধকালে ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

৯ দফা। কে জানে কেন, আমার মাথা ঘোরে এবং হাত কাঁপে। তাহাতে হাত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, অথবা কাঁপুনির চোটে নিজ পক্ষের লোককেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা। আমার আত্মীয় স্বজন আমার ভরসা অনেক দিন ছাড়িয়াছেন। হুজুরও আমার ভরসা করিবেন না।

১০ দফা। পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি যে, এ বৎসর অকাল। পিতাঠাকুরের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, সুতরাং সংবৎসর আমার কালাশৌচ। গৃহিণীর অন্তঃসত্তা হইবার সম্ভাবনা আছে। নানা কারণে একবৎসর আমার যাত্রা করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে

আমি এ সব মানিতাম না সত্য, কিন্তু ইদানী আমার মতিগতি ফিরিয়াছে। অতএব অন্তত এক বৎসর আমায় ক্ষমা করিবেন। ৺কৃপায় তৎপূর্ব্বেই সকল গোল চুকিয়া যাইবে।

১১। যদি নিতান্তই না ছাড়েন, তবে একখানি উইল করিবার নিমিত্তেও অবকাশ দিতে হইবে। সংপ্রতি আমার যে প্রকার মনের অবস্থা, তাহাতে ২।৪ মাসের মধ্যে উইল করিলে তাহা নিশ্চয় আদালতে রদ হইয়া যাইবে।

রণমদে উন্মত্ত
শ্রীরঙ্গিলাল রায়।

গৌরীসেনাষ্টক।

(১)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
দেখ রাজভক্তি-স্রোত,
অবিরত ওতপ্রোত;
ভাবনা কি?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(২)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
বরষে বরষে শুষি,
তথাপি সকলে খুশি,
ভাবনা কি?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৩)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
অকালে অন্নের কষ্ট,
লাইসেনে এবে নষ্ট,
ভাবনা কি?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৪)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
সহাইলে ঢের সবে,
আয়োজন কর তবে,
ভাবনা কি?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৫)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
সীমায় করিয়া ছল,
দেখে আসি শত্রুবল,
ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৬)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
কাঁচা মাথা যদি লাগে,
শিখ যাবে আগে আগে,
ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৭)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
আমীর না ফস্‌কে যায়,
লয় যত, দাও তায়,
ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

(৮)

ভারতে ভাবনা নাই, আছে লুণ কেন।
কাজ কি বুঝে সুজে,
লড়াই করিগে খুঁজে,
ভাবনা কি ?—লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন॥

লড়াইস্থ সংবাদদাতার পত্র।

[খাঁটি খবর]

হয় লড়াই বাধিবে, না হয় বাধিবে না—ইহা এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, সুতরাং আপনারা নির্ভাবনায় থাকিবেন। আরও নিশ্চয় হইয়াছে যে, লড়াই হউক কিম্বা না হউক, ভারতবর্ষের লোক ধনে প্রাণে মারা যাইবে। ঈশ্বর করুন, তাহাই হউক। দয়াবান্ প্রজাবৎসল রাজপুরুষদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলেই আমি সুখী।

[অন্নকষ্টের হেতু।]

পাঁচদে নামক স্থানে যে ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন, আবার সে কথা লিখিয়া ফল নাই। কথাও খুব সামান্য;—কৃষ-

রের সঙ্গে আফগানদের একটা মারামারি হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলা আফগান মরিয়াছে। প্রথম প্রথম অনেকে আশা করিয়াছিল যে, এই লোকগুলা মরাতে দুর্ভিক্ষের কতক সাহায্য হইতে পারিবে, কিন্তু আমি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি যে, দুই দলের লোকেই ভাত খায় না, সুতরাং চাউল সস্তা হইবার কোন কারণ নাই। অতএব এত প্রাণী হত্যাতেও বঙ্গের উপকার হইল না, এ দোষ বাঙ্গালীদেরই বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে ভাত খাওয়া ত এক রকম উঠিয়াই যাইতেছে, আপনি একটু মনোযোগী হইয়া এই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন, যেন, এই সুযোগে ভাতের চলনটা একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলেই ময়দার ব্যবহার চলিলেই ভবিষ্যতে লড়াই বাধিবা মাত্র দুর্ভিক্ষ বন্ধ হইতে পারিবে। আহার ব্যবহারের বিভিন্নতায় দেখুন কত দোষ হয়।

[রুষ ও ইংরেজের পরিচয়]

কিন্তু পাঁচদে-কাণ্ডে একটা খুব লাভ হইয়াছে, ইংরেজ এবং রুষ কে কেমন লোক, তাহার উত্তম পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রুষ প্রকাশ করে যে, আফগানদের বজ্জাতি দেখিয়া আমরা দায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে শাসন করিয়াছি। তাহারা ভাল মানুষের মত আমাদের কথা মানিয়া চলিলে তাহাদিগকে মার খাইতে হইত না। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; যেহেতু ইংরেজ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, রুষেরাই বজ্জাতি করিয়া আফগানদের মারিয়াছে এবং সকল ইংরেজ এই কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন। রুষের কথা কেহই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং আমরা সকলেই এখন নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি যে, রুষের মত মিথ্যাবাদী লোক ত্রিসংসারে নাই। রুষের এই কুব্যবহারে ইংরেজ খুব চটিয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপারের পর, রাগে ফুলিতে ফুলিতে ইংরেজ দুরাত্মা রুষকে বলিলেন যে, এই মুহূর্ত্তে পাঁচদে ছাড়িয়া দাও, নতুবা "যুদ্ধং দেহি"। রুষ কিন্তু যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি গোঁয়ার,—যুদ্ধের কথায় ভয় না করিয়া বলিল—"দেহি।" কিন্তু ইংরেজ নাকি বড় সদাশয়, এবং ক্ষমাগুণের অবতার বলিলেই হয়, তাই, ভাবিয়া দেখিলেন যে, কাটখোট্টা গোঁয়ারের সঙ্গে মুখোমুখি হইতে হইতে একটা হাতাহাতি হওয়া বিচিত্র নহে, তাহাতে বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও একটা কিছু হইলে লোকে ইংরেজকেই ছিছিকার করিবে। বিশেষতঃ ভদ্রলোকের রাগ অধিকক্ষণ থাকে না, খড়ের আগুনের মত যেমন জ্বলিয়া উঠে, অমনি নিবিয়া যায়। সুতরাং ইংরেজ বলিলেন—"নে বাপু, আর ছোট লোকের সঙ্গে হুজ্জুত করিতে পারি না, যাহা ভাল বুঝিস্ তাই কর্।" দেখুন একবার, ছোট লোক আর বড় লোকের তফাৎ দেখুন।

[নষ্টস্য কান্যা গতিঃ]

মানুষের মত মানুষ হইলে, ইংরেজের বদান্যতা দেখিয়া রুষ একেবারে গলা-

ইয়া পড়িত। কিন্তু সে দেবদুর্লভ ভাব পাইবেন কোথা? রুষ সেই অবধি ধরিয়াছে আজ পাঁচ দে, আজ সাত দে, ক্রমে বলিবে যা আছে সব দে। সব বিষয়েরই সীমা আছে, যত গণ্ডগোলও এই সীমা লইয়াই। সুতরাং রুষ যদি নিতান্তই সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়, তবে ইংরেজের ক্ষমার সীমাও যে ছাড়াইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? কলিতে অন্নগত প্রাণ,—তা মানুষ কি চারপোয়া ধার্ম্মিক হইতে পারে? সেই জন্য আমি রুষকে বলিয়াছি যে, ইংরেজ যদি তোমাদের উপর রাগ করেন, আমরা ভারতের লোক—তাহার জবাবদিহিতে পড়িতে পারিব না। আমাদের দোষ কি?

[আমীর সদনে]

যাহা হউক, লড়াই সম্বন্ধে দ্বিভাব দেখিয়া আমার গেঁটে বাতের আশঙ্কা হইয়াছে। সেই জন্য একটু একটু বেড়ান ভাল মনে করিয়া, সেদিন আমি আমীরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত। আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে আমীর সাহেব ভারি সন্তুষ্ট হইয়া এ কথা সে কথার পর বলিলেন—"তোমাদের পিণ্ডি দেখে এলাম। বড় খুশি হয়েছি"। আমি উত্তর করিলাম—"আমাদের আর বোল্‌ছেন কেন?—সেত আপনারই। তবে আপ্‌নি আর আমরা একই, এ কথা অবিশ্যি বল্‌তে পারেন।"

আমীর একটু হাসিলেন, আমার সৌজন্যের খুব প্রশংসা করিলেন, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন না বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

আমি সে কথা গায়ে না মাখিয়া, অন্য কথা পাড়িবার ছলে, আমীরকে বলিলাম—"পঞ্চানন্দে" দাঁতের খবর দেখেছেন?

আমীর আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখেচি বৈ কি? কিন্তু খবরটা ত ঠিক নয়।"

"ঠিক যদি নয়, তবে ঠিক কথাটাই কি? আসল সায়েবের বাড়ীর বিলিতি দাঁত আপনি নিয়েচেন, তাই শুনে দেশে ত একটা মহা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ—সকলেই ভেবে আকুল, বলে ব্যাপারখানা কি? কাজে কাজেই 'পঞ্চানন্দ' একটা খবর না দিযে থাকৃতে পাল্লেন না।"

আমীর তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত বৃত্তান্ত এইরূপে বিবৃত করিলেন,—"আমার দাঁতের গোড়ায় মাঝে মাঝে অসুখ হয়, সত্যি। কেউ কেউ বলে, বিলাতি দাঁত খুব শক্ত, তাই দুপাটী আনিয়ে পরখ কোল্লাম যে কেমন শক্ত, ভাঙ্গে কি না? কি জানো, সব রকম দেখে রাখা ভাল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরখে কি জান্‌তে পাল্লেন?"

উত্তর। "আগেও যা জানতাম, এবারেও তাই জান্‌লাম। কলে শক্ত অশক্ত আমার পক্ষে সমান; বেশকোরে দেখ্‌ছি, ও দাঁত মোটেই বোসবে না।"

এই কথার পরেই আমাদের লাট সাহেবের কাছে আমীর যে সব টাকা কড়ি, অস্ত্র শস্ত্র নজর পাইয়াছেন, তাহাই আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া আমাকে সমস্তই দেখাইলেন, দেখিয়া আমি সুখী হইলাম, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সব দেখিতে দেখিতে কথায় কথায় আমীর বাঙ্গালা ভাষার কথা তুলিলেন। বলিলেন,—"আমি বেশী শিখিতে অবকাশ পাই নাই; কিন্তু অল্প স্বল্প বাঙ্গালা যাহা শিখিয়াছি, তাহাতেই আমি মুগ্ধ।"

অল্প কথায় অধিক ভাব—বাঙ্গালায় যেমন প্রকাশ করা যায়, এমন আর কোনও ভাষাতেই পাওয়া যায় না। এই বলিয়া বার বার নিজ লিখিত বাঙ্গালা কবিতাটী আমীর আওড়াইতে লাগিলেন,—

"যার শিল, তার নোড়া
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া"
[আমীর গ্রন্থকার]

আমি ত এই কথার পর ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসি। যাহা হউক, আমী-রের বিদ্যানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। আপনি বোধ হয় জানেন না, সংপ্রতি আমীর একখানি পুস্তক রচনা করিতেছেন, পুস্তকের নাম আঙ্গো-কাবুলি ষোকাভুলারি (Vocabulary) ইহাতে ইংরেজী ও কাবুলির সকল রকম মার পেঁচের কথাবার্ত্তা শিখিতে পারা যাইবে। পুস্তক সমাপ্ত হয় নাই, হইলেই আমাকে দেখিতে দিবেন, আমীর বলিয়াছেন। সেই সময়ে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিব। আমি যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি যে, আমীর উপযুক্ত পাত্র বটে।

পৃথিবীর সমস্ত মঙ্গল। নিজ মঙ্গলের চেষ্টা দেখিবেন। ইতি—

উপদেশ।

[পঞ্চানন্দ দিতেছেন—পঞ্চানন্দকে।]

ঠাকুর রক্ষা কর। তোমার দৌরাত্ম্যে মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘরকন্না করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমার মাথা খাও, কথা রাখ, লেখা বন্ধ কর। আর ত শেষ দশাও হইয়া আসিয়াছে, আর কেন? এখন একবার মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

অন্ধকার রাত্রে চোরের পায়ের শব্দ পাইলেই কুকুর ডাকিয়া উঠে। সময়ের ফেরে তোমার লেখার আভাস পাইলেই সমালোচক চেঁচাইয়া উঠে। তুমি মন-চোরা, তোমার কলম, কলম নয়, সিঁধকাটি। সাহিত্যমন্দিরের দ্বারদেশে পালে পালে সমালোচক পোষা আর পোষায় না। তুমি ক্ষান্ত হও। যে দিন বঙ্গবাসী বঙ্গদেশ ছাড়িবে, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন একবার মনে কর।

তোমার অগ্নি বড় প্রবল, তাই রুচির মাজাঘষা নাই। তুমি জান না যে, নীতি-সূত্র কত চড়াইয়া বাঁধিতে হয়; উপর দিয়া মাছি উড়িয়া গেলে যে নীতিসূত্র ঝনন্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহাই ঠিক সুরে বাঁধা। তোমার তাহা নাই। অতএব দয়া করিয়া দিন কতক একটু সরিয়া দাঁড়াও। সুরটা একবার আগাগোড়া বাঁধা হউক, তাহার পর আসিও, তখন বুঝা যাইবে।

সে-কালের বে-আড়া লোকে একরকম রচনা করিত, বেলেল্লারা পড়িয়া খুসি হইত। গোএটা, সেক্সপিয়ার, বাইরণ, বল্‌তায়েরের রুষো, বাল্‌জাক্, বোকাচ্যো, বিদ্যাপতি, ভারত-চন্দ্র—ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেই ইহাদের জন্ম। তাহাদেরই পাপে এখনও লোকের তুষানল হইতেছে; তাহার উপর তুমি কেন, ঠাকুর? দুটি পায়ে পড়ি, তুমি অন্তর্দ্ধান হও, দিন কতক নিশ্চিন্ত হইয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন ভাবিয়া লইতে দাও।

পার যদি, এপথে কিছু সাহায্য কর। অন্দর হইতে বাহির করা কুনীতি; তাহার কথা কহা, কুরুচি। যদি পার অন্দরকে সদর কর, ভিতরে বাহিরে একদর কর। যত কু, কুলে; যাহাতে দুই কুল ধ্বসে তাহার চেষ্টা কর। কিন্তু তাহা তো তুমি পারিবে না, পারিলেও করিবে না। তাই বলি, দিন কতক আসর ছাড়িয়া দিয়া,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

দেখিতেছ না, এখন কেমন দিন সময় পড়িয়াছে? এখন আ-কার ভাবিলে বিকার উপস্থিত হয়, ঈ-কার মনে হইলে বুক গুর্ গুর্ করে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগের মধ্যে একবার মাত্র এক রাধার রুচি শুচি হইয়াছিল। তখন কালো মেঘের দায়ে চক্ষু উপাড়িতে, কালো কোকিলের দায়ে কালা হইতে, কালো চুলের জ্বালায় মাথা মুড়াইতে, আরও কত জ্বালায় কত করিতে,—শ্রীরাধার সাধ যাইত। কিন্তু সে ক দিন? সবে এই আবার সংস্কারের বাজার বসিতেছে,—দিও না, এখন বাধা দিও না। বরং ব্যাকরণের সেই বিষম প্রকরণ, পার যদি ত নূতন সংস্করণ করিয়া তাহার দূরীকরণের উপায় কর। না পার, কথাটী কহিও না, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের ভাবনা কর।

উপদেশ শুনিয়া পঞ্চানন্দ বলিলেন—তাই ত!

মোটে বিবাহ হওয়া উচিত কি না? *

(জ্ঞানান্ধ শর্ম্মার রচিত)

দেশে আর বিধবা নাই। থানের আমদানি বন্ধ হইয়াছে। একাদশী এবং নিরামিষতত্ত্ব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নময়ী লেখনীর শরণাপন্ন হইয়াছে। "বিধবা বিবাহ যে কেবল উচিত, তাহা নহে, অবশ্য দেয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য, তদন্যথায় ঘোর পাতক—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, আজি আর এ পুরাতন কথা না বলিলেও চলে। সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, সাম্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

"তবু ত আমাদের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল না। হইবে কিসে? যে জয় হইয়াছে তাহা যে আংশিক। এখনও যে পৃথিবীতে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এখনও যে ব্যভিচারের সমাচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। বিবাহ প্রথা একবারে রহিত না হইলে ত এ পাপের শান্তি হইবে না। আইস ভাই, বদ্ধপরিকর হও, কুসংস্কারে গঠিত কু-সমাজের মূলে কুঠারাঘাত কর।

"আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ও শাসনে সধবাদের পতিচর্য্যা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য কি না, তাহা দেখা উচিত। দায়ে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া যদি কেহ কোন ধর্ম্ম কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার সেই ধর্ম্মকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্যই নহে, তাহাতে তাহার কোন প্রশংসা নাই।"

বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবে যে প্রশংসাই মূল বস্তু। প্রশংসার প্রত্যাশা না থাকিলে ধর্ম্মকার্য্য করিতে নাই, যে হেতু তেমন স্থলে ধর্ম্মকার্য্য করিলে মহাপাপ, ইহা কামচ্কাটকা এবং জুলু দেশের পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সকলেই জানে এবং মানে যে গোপনে দান করা পাপ,—দেখিতে না পাইলে লোকে প্রশংসা করিবে কিপ্রকারে? সেইরূপ ঘরের কোণে বসিয়া দেবতার অর্চ্চনা করা পাপ। সেই জন্যই বিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ দান করিতে হইলে অগ্রে গেজেটে বিজ্ঞাপনের যোগাড় করেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে দঙ্গল বাঁধিয়া সদর রাস্তার ধারে জটলা করেন।

"যখন কেহ অন্যের ভয়ে, স্বাধীনতা শূন্য হইয়া, দান বা অন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন সেই ত্যাগ স্বীকারের জন্য তিনি একটুকুও প্রশংসা, একটুকুও সম্মান, একটুকুও শ্রদ্ধা পাইতে পারেন না। অন্য পুরুষের সহবাস করিতে ইচ্ছা থাকিলেও, সধবাকে লোকলজ্জা-ভয়ে, সমাজের শাসনভয়ে, বাধ্য হইয়া পাতিব্রত্যে রত হইতে হয়। ক্রীতদাস, বাধ্য হইয়া প্রভুর যে সেবা করে, দায়ে পড়িয়া কষ্ট স্বীকারের

---

* জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত "পতাকা" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বিধবা-বিবাহের সমর্থনকল্পে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এই প্রবন্ধে সেই সব কথাই যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে, কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্যে "বিধবা" স্থলে "সধবা"।

চরম দৃষ্টান্ত দেখায়, তাহার জন্য কে তাহাকে ত্যাগস্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। ছোটলোকের মেয়ে বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়া বাধ্য হইয়া অন্তের দাসীপণা স্বীকার করিয়া দিবারাত্রি শ্বশুর-পরিবারের সেবা করে, নিজের সুখের প্রতি, বিলাসের প্রতি কখনও লালসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পায় না—তাহার জীবন একটী ধারাবাহিক পরসেবা। কিন্তু এই পরসেবা দায়ে পড়িয়া; এই নিমিত্ত ইহার অধিক মূল্যও নাই। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পত্নী পত্নীই রহিয়া যায়, স্বতঃপ্রবৃত্তা পরোপকারিণীরা দেবীত্ব লাভ করে না। যখন ত্যাগস্বীকারের ও বিলাসের উভয় পথই অবারিত রহিয়াছে; তখন যিনি স্বেচ্ছায় বিলাসের কুসুমাবৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগস্বীকারের কণ্টকময় পথ অবলম্বন করেন, তিনিই প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন কেবল মাত্র পতিসেবা বা ত্যাগস্বীকারের পথ খোলা রহিয়াছে, বিলাসের পথ একেবারে মারা পড়িয়াছে, তখন যিনি ত্যাগস্বীকারের পথে চলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য কোথায়? যেমন একটা বাঘকে চিরকাল খাঁচায় পুরিয়া রাখিলে সে সাধু হইয়াছে, আপনি বলিতে পারেন না, যেমন কোন ব্যক্তিকে চিরকাল কাজে লিপ্ত করিয়া রাখিলে তাহার চুরি না করার প্রশংসা হইতে পারে না, যেমন পুরুষকে খোজা করিয়া,তাহাকে ইন্দ্রিয় দমনের জন্য প্রশংসা করা শোচনীয় ব্যঙ্গ, তেমনি সমাজপদদলিতা সধবাকে তাহার বিলাসত্যাগের জন্য প্রশংসা করা শোচনীয় ব্যঙ্গ, অবোধগম্য নীতি ব্যখ্যা, পুরুষেরর স্বার্থমূলক কুহকময় ইন্দ্রজাল বিস্তার। ঘোটকীকে শায়েস্তা করিয়া গাড়ীতে যুড়িলে ঘোটকী গাড়ী টানিয়া থাকে, আপত্তি করে না। রৌদ্রে বৃষ্টিতে যতদিন শক্তি থাকে,বেচারা গাড়ী টানিয়া সমাজের কত কাজ করে। তা বলিয়া কি ঘোটকী একটা পবিত্র পতিচর্য্যের দৃষ্টান্ত, একটা মস্ত ত্যাগস্বীকারের আদর্শ? আহাম্মক না হইলে, অবশ্য কেহ মনে করিবেন না যে,আমরা সধবাকে ঘোটকী সদৃশী বলিতেছি। আমরা এই বলি যে, পুরুষ-সমাজ নিজে সুবিধার জন্য রমণীকে ঘোটকীর মত ব্রেক করেন। যেই বিবাহযোগ্যা হয়, সেই শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া শায়েস্তা করিয়া, সমাজের, সহস্র ভয় সহস্র তাড়না অচ্ছেদ্য শাসন স্বরূপ সাজ পরাইয়া, মুখে লাগাম দিয়া, পতিচর্য্যের গাড়ীতে সধবাকে জুড়িয়া দেওয়া হয়। পুরুষ-সমাজ সেই পতিচর্য্যের গাড়ীতে চড়িয়া আরাম করিয়া চলিয়া যায়। কোন দুর্ব্বল সধবা যখন এই পতিচর্য্যের ভারি গাড়ী টানিতে পারে না, গাড়ী টানিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন পুরুষ-সমাজ নিরুপায় সধবার নির্য্যাতন স্বরূপ চাবুক চালাইতে থাকে। এই অপূর্ব্ব পতিচর্য্যের মাহাত্ম্য আমরা বুঝিতে পারি না। স্বাধীন পতিচর্য্যকে আমরা পূজা করি, কিন্তু এবম্বিধ পতিচর্য্য আমরা অনুমোদন করি না।”

“যখন কাহাকেও জোর করিয়া ত্যাগস্বীকার করান যায়, তার নাম অত্যাচার। যখন কেহ কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহার নাম পুণ্য। সধবা হওয়া অধিকাংশ স্থলে সমাজের জোর-জবরদস্তির ফল; সুতরাং যে পরিমাণে

তাহা জোর-জবরদস্তির ফল, তাহা সেই পরিমাণে অত্যাচার ও নিপীড়ন, তাহা পুণ্য ও ধর্ম্ম নহে।"

"বিবাহ প্রথার সৃষ্টি অবধি কত সধবা ব্যভিচারিণী হইয়াছে, কত ভ্রূণহত্যা হইতেছে, তাহা কি কেহ কখনও মনে ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? সধবার মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে, তাহারা অবশ্য পুরুষান্তরের কামনা করে, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কত সধবা, পুরুষান্তর করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা জানিবার জন্য কেবলমাত্র যাহারা পুরুষান্তর করিয়াছেন, তাহাদিগকে গুণিতে হইবে তাহা নহে, যাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করিতেছে অন্ততঃ তাহাদিগকেও গুণিতে হইবে। এইরূপে গুণিলে পুরুষান্তর-পক্ষপাতিনী সধবার সংখ্যা অনেক হইয়া পড়ে। কোন মতে কম হইতে পারে না। সধবাদিগের মধ্যে যে ভূরি ভূরি ব্যভিচার হইতেছে, অগণ্য ভ্রূণহত্যা হইতেছে, এই জলন্ত শোচনীয় সত্য কথা, সুধীর মহাপণ্ডিত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও কেমন করিয়া বিস্মৃত হয়েন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে, সধবারা পরপুরুষ সহবাস করিতে অনিচ্ছুক; কারণ কই, সধবারা ত তাহার জন্য মা-বাপের কাছে বলে না যে, আমাদিগকে অন্য পুরুষ যুটাইয়া দাও; অপরূপ যুক্তি, সন্দেহ নাই। বিবাহেচ্ছু বিবাহযোগ্যবয়ঃ, অবিবাহিত পুত্র, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত উপাধিধারী এবং যাহারা উত্থান কারীদিগের নিকট বড় বেয়াড়া, তাহারাও ত কই বলে না যে, মা আমার বিয়ে দাও, কিম্বা বাবা আমার বিয়ে দাও; ইহার অর্থ কি এই যে, বঙ্গীয় যুবকেরা বিবাহে অনিচ্ছুক?"

"পূর্ব্বে সতীদাহ হইত। অনেকে ইচ্ছা করিয়া সহমরণে যাইতেন। অনেকে আবার দায়ে পড়িয়া লজ্জাভয়ে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন। শুনিয়াছি, যখন চিতা জলিয়া উঠিত, জীবন্ত শরীর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইত, তখন সেই দুর্ভাগ্য বিধবা আগুনের জ্বালা সহ্য করিতে পারিত না, ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিত; তখন পারিপার্শ্বিক পুরুষগণ দুর্ব্বলের বুকে বাঁশ দিয়া, চিতার অগ্নির ভিতর তাহাকে চাপিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিত, এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া হরিবোলের রোল তুলিয়া দিয়া বধ্যমানা হতভাগিনী নারীর আর্ত্তনাদ গণ্ডগোলে ডুবাইয়া দিত। যখন দহ্যমানা রমণী চীৎকার করিতেছে 'মা-গো বাবা-গো মোলাম গেলাম গো' তখন ঐ নারীহত্যাকারিগণ তাহার অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিত—"মাগো অর্থাৎ সতী মা কালীকে ভাবিতেছেন। বাবাগো অর্থাৎ জগৎপিতাকে স্মরণ করিতেছেন। 'গেলাম গো' অর্থাৎ সতী বলিতেছে, স্বর্গে যাইতেছি। 'মোলাম গো' কথাটা স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না। এখন ঐরূপে অনেক সধবা পতিশয্যায় শুইয়া, পতিপ্রেম-অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইতে অক্ষম হন, যন্ত্রণায় চিতা হইতে নামিতে চাহেন, পুরুষগণ তাহাদিগের বুকের উপরে সমাজ শাসনরূপ বাঁশ চাপিয়া

ধরিয়া, তাহাদিগকে পাতিব্রত্যের চিতায় পোড়াইয়া জুলুম করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দিতে চাহেন, এবং তাহার সঙ্গে কতকগুলি লোক প্রলাপপূর্ণ অসার কর্কশ ও অশ্রাব্য প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার ঢাক কাঁসী বাজাইয়া 'পতিভক্তি' 'পতিভক্তি' এই রোল তুলিয়া দিয়া সাধারণের বিলাপধ্বনি ভুলাইয়া দিতে চায়, এবং দীর্ঘ-নিশ্বাস ও অশ্রু বিসর্জ্জন স্বরূপ 'মাগো' 'বাবা গো' ইত্যাদি শব্দের উপরি প্রদর্শিত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ঈদৃশ অত্যাচারকে আমরা পতিচর্য্য বলিতে পারি না।"

"বর্ত্তমান সমাজে এক শ্রেণীর হৃদয়বিহীন, লঘুচেতা স্বার্থপর ও কাপুরুষ লোক জন্মিয়াছে, যাহারা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ও উৎকৃষ্ট ভোগসুখে নিজেরা থাকিয়া, দুঃখিনী নারীদিগকে উপদেশ দিতেছেন—'তোমরা পতিচর্য্য কর, পতিচর্য্যের সমান গুণ নাই।' পতিচর্য্যের প্রতি ইহাদের পরম আদর। স্বার্থত্যাগের মহত্ব ইহাঁরা বিশেষ অনুভব করেন, ভারতের আধ্যাত্মিকতার জন্য ইহাঁদের প্রাণ কাঁদে। দেশের ধর্ম্মভাব রক্ষা করিবার জন্য ইহাঁরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, কেবল মাত্র একটু বিশেষ এই যে, এ সকল গুণকে ইহাঁরা স্ত্রীলোকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় মনে করেন। অবশ্য ইহাঁদের এই উপদেশ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। লর্ড লিটন একবার লাহোরে পাঞ্জাবীদিগকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—'ইংরাজী শিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে বিকৃত করা ভাল নয়, দেশীয় ভাষার দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা তোমাদিগের প্রকৃতি তোমাদের প্রাচীন সদ্গুণে ভূষিত থাকিবে।' ইহাও নিঃস্বার্থ উপদেশ। প্রজাপীড়ক রাজা বলে, রাজভক্তির অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, সেও নিঃস্বার্থ উপদেশ।"

"কেহ যেন ভ্রমেও না মনে করেন যে, আমরা পতিচর্য্যের মহত্ব অণুমাত্রও খর্ব্ব করিতেছি। প্রত্যুত ইহা অপেক্ষা দেখিতে অধিক সুন্দর নহে কি, যে একজন লোক, তিনি পুরুষ হউন, বা নারী হউন, নিজ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া, ভোগ বাসনা খর্ব্ব করিয়া ও নিজে ভূমিকার অতি স্বল্পস্থান অধিকার করিয়া, নিরন্তর কেবল পারিবারিক উপকার ব্রতে রত রহিয়াছেন? ইহা দেখিলেও সংসারাসক্ত মনটা একটু উন্নত হয়। অতএব পাতিব্রত্যের উপদেশ, স্বার্থনাশের উপদেশ, বৈরাগ্যের উপদেশ যত দিতে ইচ্ছা কর দাও, কিন্তু স্বাধীনতা হরণ করিয়া কঠিন শাসনে রাখিয়া বন্দীর অধম করিয়া এ উপদেশ দিলে—সে উপদেশের মূল্য থাকে না। যে গুণের মূলে স্বাধীনতা নাই, তাহার দাম কি? আমরা আবার বলি, যে কার্য্য না করিয়া গত্যন্তর নাই—তাহার জন্য প্রশংসা কি? পতিসেবা পরম অধর্ম্ম, এরূপ মত আমরা কখনই ধারণ করি নাই। আমরা বলি, নারীদিগকে পতিচর্য্যের উপদেশ দেও, স্বার্থ পরিত্যাগ ও বৈরাগ্যকে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া, তাহাদের নিকট ধারণ কর। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই উপদেশ নরনারীর হৃদয়ে

বদ্ধমূল হউক,—কিন্তু যে রমণী বৈরাগ্যের পথে না চলিয়া নির্দ্দোষ সুখের উপায় যাহা তুমি আমি অবলম্বন করিয়াছি—অবলম্বনও করিতে যায়, তখন তুমি বলিবে কেন যে—'তাহা হইবে না; আমরা তোমাকে সুখী হইতে দিব না; তোমার মন যদি না থাকে, তথাপি তোমাকে বলপূর্ব্বক পতিচর্য্যা করাইব।' ইহা কোন্ দেশের যুক্তি? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কি ক্ষোভের বিষয়।"

কিন্তু এক পুরুষাশ্রয়ের প্রশংসা করি বলিয়া সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অন্ধ হওয়া কখনই উচিত নহে। একবার স্মরণ করিয়া দেখ, আমরা নিত্য নিত্য কত ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার না প্রত্যক্ষ করিতেছি! শত শত উপন্যাসে দেখিতে পাই যে, প্রেমময়ী রমণী কোন পুরুষকে মনে মনে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, সমাজের অত্যাচারে কুপ্রথার নিপীড়নে মনের কথা মুখে না আসিতে আসিতে সেই পুরুষ চিরন্তনের জন্য অন্য রমণীর সংঙ্গে সংযোজিত হইয়া গিয়াছে। আর সেই অবলা সরলা প্রেমময়ী যাবজ্জীবন ক্ষোভের তুষানলে দগ্ধ হইয়াছে। বল দেখি ভাই, সত্যকে সাক্ষী করিয়া বল, এ দৃশ্য কি দেখা যায়? এ যাতনা কি সহা যায়? হৃদয় কি বিদীর্ণ হয় না? পাষাণ কি গলিয়া যায় না?

আবার ভাবিয়া দেখ, পারিবারিক চিত্র একবার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দেখ, শাশুড়ীর গঞ্জনা, ননদীর লাঞ্ছনা, গুরুজনের গর্জ্জন, আত্মীয়ের তর্জ্জন—ইহা কি নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা নয়?

ইতিহাস কি বলিতেছে? মহর্ষির দুই বিবাহ, বড় বউ এবং ছোট বউ। কেন তিনি বড় বউকে হাটে বেচিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন? অন্তর্যামী তিনি, পতিচর্য্যার কত কষ্ট তাহা অন্তরে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই কি হাটে বেচিতে চাহেন নাই? কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" এমন ঋষিও দুইটিকেই হাতছাড়া করিয়া স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হইতে পারেন নাই। কুপ্রথার এমনই প্রভাব? কুসংস্কারের এমনই প্রতিপত্তি? কেন, দুই অবলারই কি মনে মনে সাধ হয় নাই? এক দিনের তরেও সাধ হয় নাই?

নবমবর্ষীয়া বালিকা, প্রেম কাহাকে বলে বুঝে না, কেমন করিয়া প্রেম করিতে হয় জানে না, বালিকার পিতা পাপসমাজের নিয়ম বশে তাহাকে এক আকাট-মূর্খ সেহাখতের মুহুরি মধ্যবয়স্কের হস্তে চিরকালের তরে অর্পণ করিলেন। বল দেখি ভাই, যখন তাহার বয়স হইল, যখন সে সংসার চিনিল, যখন তাহার বিদ্যা বাড়িল, যখন সে কবিতায় মনের আগুন ঢালিতে শিখিল, তখন কি আর সেই বৃষকাষ্ঠে তাহার মন উঠে? জ্ঞান পাইলে কে অজ্ঞানে থাকিতে চায়? স্বাধীনতা বুঝিলে কে বন্ধনে থাকিতে পারে? যখন নব ভাবে চিত্ত বিভোর হয়, তখন কে না বলিতে চায়—

"আমিও তোমার কাছে শিখিব আবার
নবপাঠ মুক্তস্বরে
প্রচারিব ঘরে ঘরে
সুমঙ্গল বিশ্ব-প্রেম, মুক্তির বিধান—
যে শুনিবে, সে হেরিবে স্বর্গের সোপান ?" (১)

ভলণ্টীয়রী কাব্য।

গান।

দেখিলাম এক বীর সভার কন্দরে বসি।
ইতালী ভ্রমেতে যেন, ভারতে পড়েছে খসি॥
অঙ্গে কোট্ পেন্টুলান, টেরি কাটা ফুর্ত্তিখান।
আমরি কা'র সন্তান, হ'ল ভারত হিতৈষী॥
বলে বীর হা বিধাত, বাঙ্গালী সন্তান যত,
হয়ে বাঙ্গালীর মত, চুপ করে রয়েছে বসি।
যুদ্ধে কি বাঙ্গালী ডরে, দাও মা বন্দুক করে,
এ মহা রুষ-সমরে, আসিগে বিপক্ষে নাশি॥ ধ্রু

(কোরস্)

জয় জয় বাঙ্গালীর জয়!
ইংরেজের শত্রুক্ষয়, বাঙ্গালীই করিবে নিশ্চয়!
কি ভয়, কি ভয়! হোক্ বাঙ্গালীর জয়!
গাও বাঙ্গালীর জয়! জয় বাঙ্গালীর জয়।
জয় জয় বাঙ্গালীর জয়॥

শুনিয়া সমর-বার্ত্তা বিলাত-আলয়ে
যবে পড়ি গেলা হুলস্থুল; মন্ত্রীদল
হইল বদল, যথা তথা সেই কথা;
হেথা রুষ-ঋক্ষ আগাইছে ধীরে ধীরে

---

(১) "পতাকা"র সেই প্রবন্ধের পরে এক মহিলা প্রণীত কবিতা ছিল। উদ্ধৃত অংশটুক তাহারই।

না মানি বারণ;—যবে ভারত-ভাবনা
ভাবি মহা গোলযোগ, সমর-উদ্‌যোগ
করিবার হ'ল আয়োজন; প্রতিক্ষণ
লোকজন ভাবিতে লাগিলা;—ভয়, বুঝি
ভারত-পঙ্কজ-রবি যায় অস্তাচলে!
তকব্রীণ বুদ্ধিক্ষীণ দীন হীন হয়ে
চুপ্‌টি করিয়া বসি সিমলা পাহাড়ে
কথাটি না সরে মুখে;—ভাবিতে বসিলা
কেমনে এ ঋক্ষ-মুখ হতে, কি কৌশলে
রক্ষিব ভারত-রাজ্য—এমন সময়
কহ গো, লো কল্পনা সুন্দরি, কেমনে এ
বঙ্গভূম মাঝে পড়ি গেলা ধুমধাম,
ঘুম ছাড়ি মার কোলে কাঁদিয়া উঠিলা
শিশু, হস্ত পদ নাড়ি প্রকাশিলা ভাবে
সখের সৈনিক তারে হইতে হইবে।
পিলা-রোগী যত, শত শত একমত
হয়ে, মোটা পেট বাঁধিতে লাগিলা,—হায়
বাঁধিবার তরে তার নাহিক কোমর,
সব পেট হয়ে গেছে—উকিল, মোক্তার,
মাষ্টার, কেরাণী, ছাত্র, কত বা গণিব—
নিজ নিজ কাজ ছাড়ি দিলা; বীরমদে
মত্ত যবে বাবু, পারে কি ভাবিতে কভু
বাড়ীর ভাবনা?—বীররস মধুসম—
মাতিলে সে রসে, পারে কি থাকিতে মন
সংসার-বন্ধনে? ভূণগুচ্ছে কোথা কবে
বেঁধেছে করীরে, মদমত্ত হয়ে, যবে
ধায় নলবনে?—তেমতি এ বাবুদল—
বীরদল এবে—ডাক্ ছেড়ে বাহিরিলা
রঙ্গ ভঙ্গ করি, রণে রক্ষিতে ভারতে।
ঘুমন্ত ভারতমাতা পাশ মোড়া দিলা—
টলিল এ হেন বঙ্গ, বীরপদভরে।
কহ, ওলো কল্পনা সুন্দরি, রুচি-মাখা

ও চারু বং'ং, কোথা বীর কুলোত্ত
বঙ্গের বিপিনকৃষ্ণ, কেমনে, কি ভাবে
ভারত রক্ষার তরে কি কাজ সাধিছে।
কহ ওলো খুলে, সব কথা বাখানিয়া
বীরত্ব কাহিনী সব বঙ্গবাসী কাছে।
বসিয়া বিপিনকৃষ্ণ সভার মাঝারে
বিষাদিত মন,—আহা, ভারত-ভাবনা
ভাবিয়া বাছার মুখ শুকাইয়া গেছে;
তার পাশে চুপ করি বসেছে সকলে,
নন্দমণি, ননী, ফণী—বীরাগ্রণী যত,—
হবু যে সৈনিক দল সখের লাগিয়া
অচল অটল ভাবে বীরদল সবে
বসিয়া ভাবিছে, কেহ না কহিছে কথা।
কতক্ষণ পরে তবে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গি,
উন্মেলি সে রাঙ্গা চক্ষু কহিতে লাগিল।
বিপিন; চমকি উঠে বীরগণ যত;—
"আফগান্ ভূমে আজি, শুন বীরগণ,
লক্ষ লক্ষ রুষ-ঋক্ষ তক্ষিতে আসিছে
লক্ষ্য করি মোদের ভারত। রাজভক্ত
মোরা, ব্যক্ত চরাচর; হইবে সমর
যুঝিব, বুঝিব বল ভল্লুকের কত;
দাঁড়াইয়া সিংহ পাশে, বাড়াইয়া বাহু
ছুড়িব বন্দুক মোরা দুড়ুম দুড়ুম;—
বীরত্ব দেখিয়া সবে চমকিয়া যাবে।
কি কাজে এ গৃহ মাঝে থাকিব বসিয়া?
বাজিলে তুমুল রণ, সাজে কি বীরের
এ কাজ? ডমরুধ্বনি শুনিয়া কি পারে
থাকিতে বিবরে ফণী? শিক্ষিত যুবক
মোরা, বঙ্গ-বীর-কুল; মোরা কি ডরাই
যুঝিতে সমরে অরি সনে? মদমত্ত
করী যথা, পশিব তেমতি অরি মাঝে;
কার সাধ্য রোধে বঙ্গবীর-দল-বলে?

সত্য বটে, অনাহারে দুর্ব্বল বাঙ্গালী;
সত্য বটে, জরে জরে জর্জ্জরিত দেহ
তার। লেখাপড়া বলে মহাবলী মোরা;
স্বদেশ উদ্ধার হেতু ক্ষান্ত না হইব
কভু, ক্লান্ত যদি হয় দেহ। পড়ে শুনে
পারি কি ডরিতে কভু মরিতে সমরে?
"যে ডরে, সে ভীরু" শুনিয়াছি, কোন্ মুখে,
বল, ডরি আর আমি, ডরিবে তোমরা?
নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে? অবশ্য
যাইব রণে, নতুবা কেমনে ইংরাজ,
রক্ষিতে সক্ষম হবে আমার ভারত?
সাজ তবে সাজ, সৈন্যগণ, তাড়াতাড়ি
বাড়ীর ভাবনা ছাড়ি বিলম্ব না সহে।"
এতেক কহিয়া বীর হাঁপাতে হাঁপাতে,
জল খেয়ে এক পেট বসিয়া পড়িলা;
বীররস ঘর্ম্ম রূপে দর দর ধারে
লাগিলা ঝরিতে। কতক্ষণ পরে তবে
নন্দমণি দাঁড়াইয়া উঠিল সাহসে;
দাড়ি নেড়ে, গলা ছেড়ে আরম্ভিলা তথা;—
"সত্য যা কহিলা প্রভু; মোরাও ডরিনা
কভু মরিতে সমরে। অকলঙ্ক কুলে
কালি দিতে পারি কি আমরা? প্রাণপণ
করি রণ করিব নিশ্চয়। এক কথা
কিন্তু দাস নিবেদিবে, প্রভু, তব কাছে,—
জানি না মোরা ধরিতে বন্দুক, চালাব
কেমনে? কেমনে শত্রুকুলে খেদাইব
দূরে? লেখাপড়া শিখিয়াছি, করিয়াছি
দেহ মাটি, খাটিবার শক্তি নাই তবু
রোগে ভুগে যোগে যাগে অন্ন করে খাই।
বীররস কোথায় শিখিব, কে শিখাবে
বল, বীরকুলমণি? দেখাও যদ্যপি
প্রভু, শিখাও যতনে, পারিব তখন

দেখে শিখে, বীর-রস দেখাইতে রণে॥”—
এত বলি, নন্দমণি বসিয়া পড়িলা
নীরবে। উঠিলা বিপিন তবে গর্জ্জিতে
গর্জ্জিতে, ‘বন্দুক বন্দুক’ করি কহিলা
সঘনে; সাপটি ওভারকোট্ বাহিরে
চলিলা। লম্ফে ঝম্ফে চলে বীর প্রাঙ্গণে,—
বীরদল চলিলা পশ্চাতে; পদভরে
টলমল সভাতল; কাঁপিল মেদিনী;
বিড়াল কুকুর যত কাঁপিল সভয়ে;
অবরোধে কুলবধূ; শিমলায় রাজা;
বনে শ্যাল; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
ডুবিল গভীর জলে পুঁটিমাছ যত।

তখন—

বিপিন প্রাঙ্গণে আসি, জোরে পেণ্টালুন কসি,
দাঁড়াইল প্রাঙ্গণ মাঝারে।
আর সব বীর যত, গণা নাহি যায় কত,
ঘেরিয়া রহিল চারি ধারে॥

ফুকারি বিপিন কয়, বন্দুক ধরিতে হয়,
এই মত দুই হাতে করি।
একজন পাখা কর, অন্য জন ছাতি ধর,
নতুবা কষ্টেতে আমি মরি॥

আর জন কোরে জোর, কোমর ধরহ মোর,
দেখো, ভয়ে ছেড়োনাকো যেন।
অন্য এক লোক মাগি, আগুন দিবার লাগি,
রণ করা সোজা নয়, জেনো॥
চাকরে ডাকিয়া বল, ব্রাণ্ডি আর সোডা-জল,
প্রস্তুত করিয়া যেন রাখে।
পরিশ্রমে ক্ষুধা হবে, খাবার উদ্যোগ তবে,
করিবারে বলহ তাহাকে॥
বাঙ্গালী মণ্ডা মিঠাই, উহাতে বিশ্বাস নাই,
ডিম্ আর কট্‌লেট্ ভাল।

যোগাড় আছেই তার, ব্যাগেতে আছে ডিনার,
ভাবনার দরকার কি বল ? ॥
এই সব আয়োজন, হইল, তবে এখন
বন্দুক ছুড়িব দেখ সবে।
কবি বলে,—রহ ভাই, আমি আগে সরে যাই,
ছুড়িহ বন্দুক তুমি তবে ॥
ইতি শ্রীভলণ্টীয়ারী কাব্যে উপসর্গো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

শ্রীদীননাথ সান্যাল। (১)

রাজটপ্‌পা।

(দরবারী কানেড়া)

আমীর, তুমি কর্য়েছিলে সকলি কথায়।
সাহেব, আমি তোমা বই আর কারো নই হে,
তবে নাথ, রুষ কেন আইল হেথায় ॥
আপনি করিলে প্রেম, রাখিতে নারিলে,
প্রাণ বধু; পিণ্ডির খরচ স্বধু মোর ঘাড়ে চাপাইলে;
নজর নিয়ে, কেবল জুতা দিয়ে করিলে বিদায় ॥

শ্রীদীননাথ সান্যাল। (২)

দুর্ভিক্ষ।

(তিরস্কার)

এত বড় দুর্ভিক্ষটা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, অথচ পঞ্চানন্দ দু কথা ব বেন না; ইহা বড় অসঙ্গত। বরং এত দিন কিছু না বলাই সমূহ অন্যায় হইয়া কেবল রঙ্গরসের জন্য পঞ্চানন্দ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। হাসি তাম ফক্কড়ি সকলেই সকল সময়ে করিয়া থাকে এবং করিতেও পারে, তাহাতে বাহা

(১) ও (২) আপশোষ যে পঞ্চানন্দ রত্নাকর হইয়াও এই দুইটি রত্ন খাস সম্পত্তি ব দাবী করিতে পারেন না। তবু এ কৌস্তুভ ছাড়াও যায় না। মালিক দিয়াছেন, গৌরব আশায় পাঁচু ইহা হৃদয়ে ধারণ করিলেন। —পঞ্চানন্দ।

নাই। আর বাহাদুরী যাহাতে নাই তাহা করা না করা সমান; করিলে বরঞ্চ দোষ আছে;—তা ধর্ম্মই বলো, আর অধর্ম্মই বলো, দেশের উপকারই বলো, লোকের সর্ব্বনাশই বলো, যে বিষয়ই কেন হউক না, বাহাদুরি নহিলে সবই বৃথা। এই সে দিন মহর্ষি জ্ঞানান্ধ বলিয়াছেন যে, গুরুগঞ্জনার ভয়ে কি লোকলাঞ্ছনার দায়ে সতী সাধ্বী হইয়া থাকার চেয়ে বুক ঠুকিয়া বেশ্যা হওয়া ভাল; কেন না এতে বাহাদুরী আছে, তাতে বাহাদুরী নাই। তবেই দেখ, বাহাদুরির কত গুণ।

কি কথা বলিতে বলিতে কিসে আসিয়া পড়িলাম? দুর্ভিক্ষের কথায় পঞ্চানন্দ কিছু বলেন নাই, সেটা ভারি অন্যায় হইয়াছে, এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক ইহাই আমার প্রস্তাব। পঞ্চানন্দের মুখের কথা খসিলেই যে উপবাসীর অন্ন যুটিবে কিম্বা ম্রিয়মাণের প্রাণ বাঁচিবে, মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে, কিম্বা লাট তামশানের মন গলিবে; তাহা নহে। তবে কি না, লেখার মত লেখা হইলে বেশ বাহাদুরি আছে, দশজনের কাছে বাহাবা পাইবার আশা আছে, সেই জন্যই এ কথা তোলা হইয়াছে। হনু ভানু সকলেরই দশ কথা বলিয়াছে, এখনও লিখিতেছে, কেবল পাঁচুই একা মাঠে মারা যাইবে, ইহা ত ভাল কথা নয়!

(দোষক্ষালন)

লেখা কিছু হয় নাই, সত্য; না লেখা অন্যায় হইয়াছে, তাহাও মানি। কিন্তু তার কি কারণ নাই? কারণ আছে বৈকি, বিলক্ষণ কারণ আছে। দুটি কারণ বলি শোন।

এক কারণ, লিখিতে হইলেই লাট সাহেবকে গালাগালি দিতে হয়। তাহাতে শর্ম্মা নারাজ। লাটকে যদি গালি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তবেই এক দিকে রাম এক দিকে রাবণ, কাহার মন রাখিতে গিয়া কাহার কোপে পড়ি? এমন সঙ্কটেও কেহ কলম ধরিতে চায় কি? তুমি হয়ত বলিবে যে, ধর্ম্মে যাহা হয় তাহাই লেখো, ধর্ম্মপক্ষে থাকিলে কোনও বালাই নাই। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়, ধর্ম্মের কথা তুলিলে বিস্তর গোল আসিয়া পড়ে। সেকালে সুবিধা ছিল, ধর্ম্ম জানিবার বিষয়ে কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল না। যেবাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ, ধর্ম্ম সেই দিকে। কিন্তু এখন এই স্বাধীন শিক্ষার সময়ে, অবাধ-যুক্তির দিনে মনসাপ্প বিরোধী কনসাপ্পের হাওয়ায় খোলা প্রাণে সে কথা ত স্থান পায় না! ধর্ম্ম কি পদার্থ, মোটে ধর্ম্ম আছে কি নাই, ধর্ম্ম মানিয়া চলা উচিত কি না ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে গেলে সমাজের ইষ্ট অনিষ্টের তুলনায় কোন্ দিকটা ভারি হয় ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা করিবার জন্য অগ্রে একটা সভা সংস্থাপন, তাহার পর সেই সভার কার্য্যকরী সমিতি নিরূপণ, তাহার পর সভার কর্ম্মচারী এবং সম্পাদক মনোনীত

করণ, তাহার পর সভা আহ্বানের দিন স্থিরপূর্ব্বক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন, তাহার পর সাধারণ সভার সভাপতি নির্ব্বাচন, তাহার পর রিজলিউসন প্রকটন, তাহার পর বাক্‌পটুতা প্রদর্শন, তাহার পর একটি একটি প্রস্তাবের দ্বিতীয়ণ, তাহার পর সংশোধন, তাহার পর সংশোধনের দ্বিতীয়ণ, তাহার পর এক এক পক্ষে এক একবার হস্তোত্তোলন, তাহার পর ভোট গণন, তাহার পর মেমোরিয়াল করণ, তাহার পর বিলাতে আন্দোলন, তাহার পর পার্লিয়ামেণ্ট উত্থাপন—এইরূপ পর পর কত প্রকরণই করা আবশ্যক, অথচ ইহার একটিও এখনও হয় নাই। তবে বলো দেখি, ধর্ম্মপক্ষে থাকি কি প্রকারে? সুতরাং হয় দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, না হয় লাট সাহেবকে গালি দাও, শেষে ফলটা এরূপেই দাঁড়াইতেছে। তুমি বোকা বাঙ্গারাম, হয় ত বলিয়া বসিবে, দেশশুদ্ধ লোকের মতামত কি কখনও জানা যায়? সাত কোটি লোকের অভিপ্রায় একটি একটী করিয়া স্থির করিয়া কেহ কি কাজ করিতে পারে, তবে আবার দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার একটা মিছা কথা তুলিয়া জ্যাঠামি করো কেন?—বাবু, তুমি বুঝ না, আমি ভুক্তভোগী, অনেক ঠেকিয়া অনেক শিখিয়াছি, তোমারও শেখা উচিত। দেশের লোক বলিলে বাস্তবিক সাত কোটী লোক বুঝায় না, অনেকগুলিকেই হিসাবে বাদ দিতে হয়। প্রথমত, পাড়াগেঁয়ে লোক মাত্রই বাদ পড়িয়া যায়, তাহারা দেশে বাস করে সত্য, কিন্তু আসল কাজের বেলায় তাহাদিগকে দেশের লোক কখনই বলা যাইতে পারে না, তবে, চাষ করা, টেক্স দেওয়া, কি পরিবার প্রতিপালন করা, কি ছেলে মানুষ করা, কি এই রকম যত বাজে কাজ আছে তাহাতে তাহাদিগকে ধরো না ধরো সে আলাহিদা কথা। তাহার পর, যাহারা ইংরেজী জানে না, তাহাদিগকেও বাদ দিতে হইবে, ইহাতেই মহাপাতকনাশন পঞ্চকন্যা ছাড়া বাকি সমস্ত স্ত্রী-জাতিও বাদ পড়িয়া গেল। আবার পুরুষ দলের যে কয়টা থাকে, তাহারও ছাঁটাই করিতে হইবে,—যাহারা "উন্নতি" বোঝে না, "সংস্কার" খোঁজে না, "ভারতের তরে মজে না কোমৎ স্পেন্সর ভজে না, মোক্ষ মূলর পুজে না,—তাহারা দেশের লোকের মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। সুতরাং তাহাদিগকেও বাদ দাও। তাহা হইলেই বাদসাদ দিয়া, কোটীর "শূন্য" গুলি কাটিয়া ফেলিয়া যাহা থাকে, তাহাই হইল দেশের লোকের সংখ্যা, এবং ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই অবশ্য দেশেরও বিরুদ্ধাচরণ করা হইল। তাহা ত আমি পারিব না। কাজে কাজেই লেখাও কিছু হইতে পারে না।

এই ত গেল, না লিখিবার পক্ষে একটা কারণ। আরও একটা কারণের উল্লেখ করিব বলিয়াছি, তাহা এই যে, উপস্থিত দুর্ভিক্ষাটী বঙ্গবাসীর। আমি ধার্ম্মিক লোক, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি মনুষ্যত্ব হারাইব? শক্রর প্রতাব প্রতিপত্তি প্রসার সম্পত্তি দেখিয়া শুনিয়াও আমার চক্ষু টাটাইবে না, বুক চচ্চড়্ করিবে না? একটু দ্বেষ, একটু হিংসা, একটু রাগ, এসব কিছুই হইবে না? তাও কি কখনও

হয়? যাউক! বলিতে গেলে অনেক কথা বলিয়া ফেলিব, অতএব কিছু না বলাই ভাল। আমি দেশহিতৈষী পরোপকার উপজীবিকাধারী; ধার্ম্মিক ব্যক্তি; যে কাজে একা আমার খোস-নাম কিম্বা বাহাদুরী নাই, তাহাতে আমি কেন লিপ্ত হইব? অতএব না লেখাই ঠিক। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কথা লিখিতে গেলেও অনেক গোল; কারণ গোড়াতেই সন্দেহ,—

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কিনা, ইহা যুক্তির দ্বারাই নিরূপণ করা উচিত। আমার যুক্তিতে দুর্ভিক্ষ না হওয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার হেতুবাদ বিস্তর দেখান যাইতে পারে;—

(১) দুর্ভিক্ষ হইলে লড়াই হয় না। লড়াই হউক না হউক, লড়াইয়ের হুজুক হয় না, পিণ্ডির দরবার হয় না; মহাবীর লোমশ ধনের সেই বিরাট নর-দৌড় হয় না, ভারতসীমা রক্ষা করিবার কথা হয় না, সুতরাং ভারত থাকে না। দুর্ভিক্ষে ভারতের ধ্বংস হইবার কথা, সেই ধ্বংস নিবারণের জন্য বর্ষে বর্ষে চাঁদা আদায় হইতেছে। দেখিতেছি, ভারতের এখনও ধ্বংস হয় নাই, ভারত আজিও আছে, অধিকন্তু ভারতের অস্তিত্ব খাঁটি করিবার জন্য ভারতরক্ষায় আরও নূতন নূতন উপায় হইতেছে। সুতরাং বোঝা গেল যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(২) দুর্ভিক্ষ হইলে মহারাণীর ধর্ম্ম নষ্ট হয়। মন্ত্রীর মুখ, প্রতিনিধির মুখ, মহারাণীর মুখ একই কথা। এ মুখে যাহা হয়, ও মুখেও তাহাই ধরিয়া লওয়া যায়। সকলেই জানে যে, প্রতিনিধি-মুখে মহারাণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লাইসেনি করিয়া যাহা মজুত হইবে, মহারাণী কোনও মতেই সে তহবিল তছরুপাৎ করিবেন না। অতএব ধরিতে হইবে যে, সে তহবিলের টাকা নি-নাড় আছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৩) বিলাতের মহাসভার সকল সভ্যই দিব্য চক্ষে দেখিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই। অসভ্যদের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যই নহে।

(৪) দুর্ভিক্ষ হইলে সরকারী সেরেস্তা মিছা হয়। সরকারী সেরেস্তায় দুর্ভিক্ষ প্রকাশ নাই। যাহা প্রকাশ নাই, তাহা সাধারণের জানিবার বা আলোচনা করিবার অধিকার নাই। যদি কোনও ছোট লোকের ঘরের কোণে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, তাহা প্রাইভেট ব্যাপার, গুপ্ত-কথা। মফুজ সেখের হাঁড়ি চড়ে নাই, ইহা যদি কেহ স্বচক্ষে দেখিতে যায়, সে অনধিকারপ্রবেশের অপরাধী। অপরাধীর কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেহ স্বচক্ষে না দেখিয়া কোনও কথা বলিলে, প্রমাণবিষয়ক আইন অনুসারে তাহা অগ্রাহ্য। অতএব আইনে কানুনে, দলিলে দস্তাবেজে, যেদিক্ দিয়াই দেখ, দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৫) দুর্ভিক্ষ হইলে অন্নাভাব হয়, অন্নাভাব হইলে মান থাকে না, দশের কাছে খাটো হইতে হয়, মাথা হেট করিতে হয়। "আমি খেতে পাই না-পাই তোর কি? তুই যদি আমার অন্নাভাবের কথা রটাইয়া আমার মানহানি করিস, তবে আমি চাঁদা তুলিয়া হউক, ভিক্ষা করিয়া হউক আমার মান বাঁচাইবার জন্ত তোর নামে লাই-বেলের নালিশ করিব।" দুর্ভিক্ষের তদন্ত করিতে যাওয়াতে একজন এই কথা বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল। কাজ কি বাবা অত হাঙ্গামে, অন্নভোব হয় নাই ত হয় নাই। অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৬) দুর্ভিক্ষ হইলে মানুষ মরিত। কিন্তু মানুষের মত মানুষ একটাও মরে নাই। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৭) দুর্ভিক্ষ হইলে কেহ বারিষ্টার প্রতিপালন করিত না, সেই টাকা দিয়া কাঙ্গাল দুঃখীর প্রাণ বাঁচাইত, অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

(৮) দুর্ভিক্ষ হইলে গলার তেজ থাকিত না, চিঁ চিঁ করিত। কিন্তু সভাসমিতি সমান চলিতেছে, বক্তার বিরাম নাই; অতএব দুর্ভিক্ষ হয় নাই।

আরও অনেক যুক্তি আছে, নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই। বিরুদ্ধ পক্ষে একটি মাত্র যুক্তি আছে; অনেকেই বলিবেন যে, দুর্ভিক্ষই যদি হয় নাই, তবে পঞ্চানন্দ এমন রসে-মরা কেন? তাহার উত্তরে আমি এই বলি যে, রসের কথা না তোলাই ভাল।

শ্রীকুঞ্জসরকার, (১)
সাং নবজীবনপুর।

একটা উপাসনা।

উপাসনা-প্রণালীতেই কাহার কেমন ধর্ম্ম তাহা বুঝা যায়। সমস্ত ভারতবর্ষ আমার ধর্ম্ম জানিবার জন্ত আজ কাল ভাবিয়া আকুল। সেই সমবেত নয়নজলে সংপ্রতি দেশ ভাসিতেছে। এই যে আমার ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা, এ কেবল পরোপ-কার করিবার ভয়ঙ্কর প্রলোভন বশতঃ। আর আমি নাকি গোটা ভারতবর্ষের "পর", সুতরাং আমার উপকার করিলে চূড়ান্ত পরোপকারও হইল! কিন্তু ধর্ম্মের কথা কি মুখ ফুটিয়া বলা যায়? তা কখনই যায় না। যেহেতু বিনয় এবং নম্রতাই ধর্ম্মের

(১) তৎকালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের "নবজীবনে" তিনি সেকালের চিত্র হিসাবে এক পাঠশালার বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই পাঠশালার 'মহাশয়ে'র নাম দিয়াছিলেন,—কুঞ্জ সরকার।

সদর দেউড়ীর ধ্বজা। তা, ধর্ম্মের কথাটা বলিব না, আমি যা বলিয়া উপাসনা করি, তাই বলি; ইহাতেই আমার ধর্ম্ম বুঝিয়া লইবে।

ব্রহ্মানন্দের (১) খুড়ো পঞ্চানন্দ,

ওরফে পাঁচু খুড়ো।

হে ঈশ্বর—

তুমি ধন্য! যে, আমাকে সৃষ্টি করিতেও তোমার ভয় হয় নাই, এবং এখন পর্য্যন্ত আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ।

তুমি খুব বুদ্ধিমান্। আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইয়া তুমি নিরাকার হইয়াছ। বাস্তবিক এমন দুষ্কর্ম্মের পর সভ্য-সমাজে কোন ভদ্রলোকই বাহির হইতে পারে না। তোমার চক্ষু নাই, ইহা ডবল ভাল। এক, তুমি চক্ষুলজ্জার দায় এড়াইয়াছ;—দুই, তোমার চোখ রাঙ্গানির ভয় হইতে আমিও খালাস পাইয়াছি। আমি যত যা করি, তা যদি তুমি দেখিতে পেতে, তাহা হইলে তোমারই হউক বা আমারই হউক, একটা এস্পার ওস্পার যাহা হয় হইত, আর তোমার চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। তোমার মুখ নাই, সে আরও ভাল, কারণ তুমি মুখ সামলে চল্‌তে পার্‌তে না; আর আমারও এখন যে রকম ইস্পিরিট অর্থাৎ স্বাধীনতা-ভাবাক্রান্ত তেজ অর্থাৎ যাকে সোজা কথায় বলে 'মরাল ইনডিপেন্‌ডেন্‌স্', তাতে আমিও বর্দ্দাস্ত করিতে পারিতাম না, নিশ্চয় শান্তিভঙ্গ হইত, দুজনকেই পুলীশে ধরিয়া লইয়া যাইত, আমার শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রচারে বাধা পড়িত, সুতরাং ভারতবর্ষ গোল্লায় যাইত। তোমার হাত নাই, সে জন্য তুমি বিশেষ পুরস্কারের পাত্র হইয়াছ, (হাতও পাতিতে পারিবে না, কাজেই পুরস্কারও দিতে হইবে না। তাতেই পুরস্কারের চোট্‌টা এত।) হাত থাকিলে আমার অনেক কাজেই তুমি বাধা দিতে, খপ করিয়া চাপিয়া ধরিতে। তাহা হইলে (এইখানে নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইবে) হে প্রেমময়! দুঃখিনী ভগিনীর উদ্ধার-লীলা কে করিত! কেমন করিয়া তাহা সাঙ্গ হইত! তবেই দেখ, হাত থাকিলেই কি বিভ্রাটই উপস্থিত হইত। তোমার পা নাই, সে বহুৎআচ্ছা। এই বর্ষাকালে জুতার খরচটা খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। আর আমিও কম বাঁচি নাই, আমি যে রকম দুর্ব্বৃত্ত, সে জুতাশুদ্ধ লাথি ত আমারই পিঠে পড়িত। কিন্তু মনে করিও না যে, আমি ভয় পাইয়াছি,—আমার কাছে বাবারও খাতির নাই,—আমি পুলিশ কোর্টে তখনই তোমার নামে সফিনা বাহির করাইতাম।

কিন্তু নাথ, তোমার খাতিরেও আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। নিরাকার সাজিয়া তুমি যে একটু বোকামি করিয়াছ, ইহা আমি সত্যের অনুরোধে, ন্যায়ের

(১) পঞ্চানন্দ কাহার খুড়ো তাহা আমরা জানি না। তবে এক নব ধর্ম্মাচার্য্য "ব্রহ্মানন্দ" ছিলেন, পঞ্চানন্দ কি তাহারই খুড়ো?

অনুরোধে, যুক্তির অনুরোধে, জগৎসমক্ষে অবশ্যই প্রকাশ করিব। ভগিনীরা যখন সমবেত হইয়া হারমোনিয়ম সহযোগে তোমার গুণগান করিতে করিতে (মরি মরি) সুকণ্ঠে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকেন, তাহা তুমি একটুকুও শুনিতে পাও না! কাণ ত নাই, শুনিবে কিসে?

মাপ করিও, আমি তোমাকে পিটি করি। বাঙ্গলা ভাষায় উপাসনা করিতেছি, সেটা আমার দেশভক্তি; ইংরেজীর বুক্নি যে মাঝে মাঝে দিতেছি, সে আমার রাজভক্তি। আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ ইণ্ডিয়াতে বাস করিয়া তুমি যে এক অক্ষরও ইংরেজী জান না, ইহা আমি কোন্ প্রাণে বিশ্বাস করিতে পারি? অধিক বলা বাহুল্য, ইংরাজীটা বুঝিয়া লইবে। আর তোমার যে নাক নাই, সেটিও বোকামি। সংসারের সৌন্দর্য্যখনি, মনোহর কুসুমগুচ্ছ, রমণীহস্তে সজ্জিত হইয়াও তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। হা হরি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা, ইহা অপেক্ষা ঘৃণার কথা, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা, আর কি হইতে পারে? (ঘন ঘন করতালি।) তুমি যখন নিরাকার, তখন তুমি স্ত্রী, কি পুরুষ, তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা বৃথা। তবু মনে কেমন একটু ভাবনা হয়; যদি তুমি সাকার হইতে, তাহা হইলে ধুতি পরিতে কি পেণ্টুলান পরিতে, সাড়ী পরিতে কি গাউন পরিতে—অর্থাৎ তোমার টেষ্টটা কেমন, রুচিখানা মাৰ্জ্জিত, কি সেই সাবেক-কেলে জবড়জঙ্গ গোছ, তা একবার একবার ভাবি বই কি? যখন সমস্ত দিন ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া, গভীরা রজনীতে শান্তির কোলে, খাটে বা মাদুরে, বিছানায় বা ধূলায়, চতুর্দ্দশ পাদ পরিমিত সটান হইয়া, শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রাদেবীকে গাঢ়তর আলিঙ্গনের চেষ্টা করি, তখন ব্যাকরণ প্রকরণ ঘটিত সে কথা একবার একবার ভাবি বই কি!

ফলত নাথ! তুমি বড় উপাদেয় ভদ্রলোক। বকেয়া দেবতাদের মত নরনারীপুঞ্জকে তুমি যে চব্বিশঘণ্টা খেঁচকাও না, এ তোমার ভারি মহৎ গুণ; তোমার সুশিক্ষার পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ পাওয়া যায়। আর, তোমার মনে যে কুসংস্কারজনিত সংকীর্ণতা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে ষোলআনা উদারতা আছে, ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং তজ্জন্য মাসে চারিবার করিয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করি। বলিহারী তোমার বন্দোবস্তে! তোমারও বাড়ী নয়, আমারও বাড়ী নয়, মাঝামাঝি একটা জায়গা ঠিক করা আছে, ধার্য্য দিনে তুমি সেইখানে হাজির, আমার জন্য অকাতরে অপেক্ষা করিতেছ, আমিও ফুরসুৎ মতে যথাকালে সেইখানে উপস্থিত! আমারও সময় নষ্ট হয় না, তোমারও সময় নষ্ট হয় না; অথচ তোমার সৃষ্টি সার্থক হয়, আমার শ্রম সার্থক হয়। হপ্তা খানেকের জন্য আমি নূতন করিয়া পাপ করিবার পাট্টা পাই, তোমারও সেই সঙ্গে চৈতন্য হয়।

তুমি দয়াময়, ইহাতে আমি খুব রাজি; সুবিচার আর দয়া, এক প্রকার দা-কুমড়া সম্পর্ক। আগাগোড়া দয়া না হইলে আমার পিঠের চামড়া ত থাকিত না। যাই হউক, তোমাকে লইয়া আমি অধিক সময় নষ্ট করিতে পারি না; কারণ আমার হাতে অনেক কাজ—সদ্যই ত উকীলবাড়ীতে এক কন্‌সলটেসন আছে। সংক্ষেপে বলি, তোমার অসীম ক্ষমতা;—এমন যে তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ পৌত্তলিকদের তেত্রিশ কোটি দেবমূর্ত্তির ভিতরে একবার তুমি প্রবেশ কর না, এ বাহাদুরী একা তোমারই সম্ভবে। অতএব অধিক আর কি বলিব, তুমি অদ্বিতীয়। কিন্তু তাও বলি, তুমি দিন রাত্রি একা থাক কেমন করিয়া? অপর শুভ—ইতি।

আইনের কথা।

(পঞ্চম বর্ষীয় একটী শিশুর সম্পাদিত নিম্নলিখিত দলিল কোন এক ব্যক্তি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, (১) এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আইন মতে এই দলিল মাতব্বর হইবে কিনা? উপযুক্ত ফী না পাঠানতে আমি ওপিয়ম দিলাম না।)

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত আমি—

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীআমি, পিতার নাম জানিবার প্রয়োজন নাই, পেসা বিদ্যে শিক্ষে ও বয়াটেগিরি, হাল সাকিম সহর কলিকাতা।

কস্য চরিত্রনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সম্প্রতি আমার চরিত্র হরিয়েক লোকের দৌরাত্ম্যে নানান মতে দায়গ্রস্ত হইবাতে আমার চরিত্র বজায় করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় মহাশয়ের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি অদ্যকার তারিখ হইতে দান বিক্রয় হেবা বা অন্য কোন প্রকারে আমার চরিত্রের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না, এই সর্ত্তে আমি আপন চরিত্র নিজের জিম্মাদারিতে লইলাম, কোন প্রকারে এ চরিত্র নষ্ট হয়, কি তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি খেসারৎ হয়, তাহার দায়ী আমি সম্পূর্ণ-রূপে রহিলাম, চরিত্রের উন্নতি অবনতি ইত্যাদির সহিত আপনার কোন এলাকা রহিল না, সন সন মাস মাস দিন দিন মোতাবেক চলিত আইন এবং ভবিষ্যতে যে সকল আইন জারী হইবেক তদনুসারে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চরিত্র আঞ্জাম দিতে থাকিব, ইহাতে অন্যথা করি বা করে, তাহা বাতিল ও না-মঞ্জুর, এবং আমা কর্ত্তৃক চরিত্রের কোন অংশ নষ্ট হইলে তাহা সরকারে গ্রাহ্য হইবে না। যদি মহাশয়ের সততা বা ত্রুটী

---

(১) এক সময়ে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সিটি কলেজের ছাত্রগণের এক সভা হইয়াছিল। সে সভার আলোচ্য বিষয় ছিল,—আজীবন কাল সচ্চরিত্র সংরক্ষণ। ছাত্রদিগকে ঐ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল।

বা শৈথিল্য প্রযুক্ত আমার চরিত্রে কোন প্রকার দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মহাশয় মায় সুদ ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন, এবং এই দলিলের সমস্ত সর্ত্তে ও অঙ্গীকারে ও নিয়মে আমরা উভয় পক্ষ ও আমাদের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত সকলেই তুল্যরূপে বাধ্য হইব ও হইবেক, এতদর্থে আপন খুসিতে সুস্থ শরীরে কায়েম মেজাজে বিনা জবরদস্তিতে বাহুঁ সবাহাল তবিয়তে কেতাব হস্তে শশব্যস্তে ধীরে সুস্থে দীর্ঘে প্রস্থে এই চরিত্রনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ৭২৪৯ হিজরি তাং (ফাঁক)।

ইসাদি।

শ্রীকলনা গাঙ্গুলি (১)	শ্রীম্যাটসিনি বাঁড়ুয্যে (৪)
শ্রীঅমুক শাস্ত্রী (২)	(বাঙ্গালা দলিলে ঢেরাসই)
শ্রীমতী ফুলকুমারী ওস্তাগর	শ্রীজ্ঞানান্ধ শর্ম্মা (৫)
(চূড়ী সই)	(নিশান সই)
শ্রীমতী স্বাধীনতা দাস (৩)	শ্রীমতী পি, দেব (৬)
(তাই সই)	(টিপ সই)
শ্রীসাম্যধন মৈত্র	শ্রীরুচিরমণ আকুল (৭)

শ্রীমতী কুসুম পেসাকর

(সব সই)

বন্যা-ব্যাপার।

(পিতার বরাবর পুত্রের চিঠি)

আমার প্রিয় বাবা,

তোমার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিবার সম্মান আমি রাখি। বন্যাতে তোমাদের ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে এবং তুমি ও তোমার পরিবার এক্ষণ গাছের তলায় বাস করিতেছ, এজন্য ভারি দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহাতে তোমার একটা কুসংস্কার নষ্ট হইবে, তজ্জন্য আমি অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। শূদ্রে দেখিলে ব্রাহ্মণের ভোজন হয় না, একথা অতঃপর, ভরসা করি, আর তুমি বলিবে না। বাস্ত-

---

(১) গাঙ্গুলি উপাধিক তখনকার কোন ব্রাহ্ম বিশেষ। (২) টীকা বাহুল্য। (৩) "দাসী" স্বাধীনতা বিরোধী ভাবের উদ্দীপক বলিয়া "দাস"। (৪) টীকা বাহুল্য। ইনি সেকালে বাঙ্গালার কোন ধারই ধারিতেন না। (৫) ইনিই কি "পতাকা"র আনোয়ারলাল? 'নিশান' দেখিয়া তাহাই মনে হইতেছে। (৬) "দেবী" অপেক্ষা "দেব" পুরুষত্ব ব্যঞ্জক সুতরাং সাম্যের সহায়ক। (৭) ইনিই সেই সেকালের 'গুকুল' নাকি?

বিক জাতিভেদই সকল উন্নতির বিরোধী, তাহা এখনকার তোমার অবস্থা ও আমার অবস্থা তুলনা করিলে, বুঝিতে পারিবে। ফলতঃ অদ্য তোমাকে এ সকল উপদেশ দেওয়া আমি উচিত বিবেচনা করি না; কারণ তোমার পত্রে বিশ্বাস করি, যে এক্ষণে তোমাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। অবশ্যই তুমি এরূপ বুঝিবে না যে, আমি তোমার সকল কথাই আক্ষরিকরূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। যেহেতু 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বাহুল্য উক্তি দেখিয়া আমাদের দেশীয় ভ্রাতৃগণের লজ্জাজনক মিথ্যাবাদিতা আমি যথেষ্টই বুঝিয়াছি।

তথাপি কিছুতেই আমার তত আনন্দ হইত না, যত এক্ষণ যাইতে পারিলে তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিতে, এবং ইহা আমি গুরুতর আনন্দের সহিত করিতাম, যদি এখন আমার যাইবার সুবিধা ঘটিত। প্রায় আগামী সপ্তাহ ভরিয়া আমাদের সভার উপবেশন হইবার কথা আছে; তদ্ভিন্ন শ্রীমতী কুমারী লাঞ্ছনা ঘোষাল, যাহার সহিত আমি সম্প্রতি আদালতগিরি করিবার আনন্দ এবং ইজ্জত উপভোগ করিতেছি, তিনি তোমার পত্র শুনিয়া আমার যাওয়া আশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন এবং আমার নিকট গত কল্যই মাথা ধরার অভিযোগ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অসহায় রাখিয়া আমি কি প্রকারে যাইতে পারি? ক্ষমা করিবে, আমি এজন্য বড় দুঃখিত হইল। ইহা বলাও মাপ করিবে যে, বন্যার কথা শুনিয়া আমার যাইতে নিজেরও কিছু ভয় হইতেছে। প্রচুর বস্ত্রপরিবর্ত্তন লইয়া যাওয়া সম্ভব বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ তোমাদের দেশ এখন অত্যন্ত সোঁতা হওয়া সম্ভব, তাহাতে জুতা ভিজিয়া আমার সর্দ্দি হইলে আমি আশ্চর্য্য হইব না। তোমার মনে থাকিতে পারে, এই গত শীতকালে আমার এক দিবস কিছু কাসির আশঙ্কা হইয়াছিল। আমি আশা করি কিন্তু যে, এক্ষণ তোমাদের অঞ্চলে বন্যা হওয়াতে খুব মনোহর দৃশ্য হইয়া থাকিবে, যাহা তোমরা অবশ্যই খুব আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছ, এবং 'বিশ্বরাজ্যের বিশাল ভাব উপলব্ধি করিতেছ। যদ্যপি স্যাৎ তোমাদের অঞ্চলে এক্ষণে জলচর পক্ষী সকল অধিক হইয়া থাকে, যাহা হওয়া সম্ভব, এবং এখান হইতে বরাবর ছোট কলের নৌকা যাইতে পারে, তাহা হইলে ফেরত ডাকে আমাকে চিঠি লিখিবে, আমি শ্রীমতী লাঞ্ছনাকে সম্মত করিতে পারিলে, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শীকারের ছলে তোমাদের সাক্ষাৎকারের সুখ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে পারি।

তোমার গৃহিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইবে এবং আমার প্রিয়ভগিনীকে হৃদয়ের ভালবাসা দিবে।

বিশ্বাস করো, তোমার স্নেহমাখা পুত্র,

উপাধিপ্রাপ্ত লাহিড়ী।

ভাবুক ভ্রমণকারীর পত্র।

কাল রেলের গাড়ীতে আসিতেছিলাম, সেওড়াফুলি ষ্টেশনে কতকগুলি দুঃখী মেয়ে-মানুষ, গাড়ীতে উঠিবার জন্য হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাদের জিনিষপত্রগুলি প্লাটফরমে এমন জায়গায় রাখিয়াছে যে, গাড়ী লাগিবামাত্র সুবিধা করিয়া, সেগুলি গাড়ীতে তুলিয়া দিবে। গাড়ী লাগিল। একখানা গাড়ীতে উঠিবার মন করিয়া জিনিষগুলি একে একে তুলিতে লাগিল, কিন্তু সে গাড়ীখানি একটু দূরে ছিল, কাজেই সব জিনিষগুলি উঠিল না, সব মেয়ে মানুষ গুলিও উঠিতে পারিল না। পোঁ করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল, একটা বিলাতী কুমড়া, একটা পোঁটলা, আর একটী মেয়েমানুষ ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিল। আমি তার কান্নার স্বর শুনিতে শুনিতে গাড়ীর সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তখন অন্ধকার হইয়াছে, রাত্রি সাড়ে সাতটা।

মনে নানা চিন্তা উঠিতে লাগিল। বুড়ি মাগী হয়ত হাট বাজার করিতে আসিয়াছে, হয়ত হাটের বেসাতি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলে, ঘরে দুটো ছেলে পিলে খাইতে পাইবে। আজ তাহাদের দশায় কি হইবে? মাগী ষ্টেসনে একা থাকিল। হয়ত তার, টিকিটখানি সঙ্গীদের কাছে আছে, গাড়ী থেকে নামিল বলিয়া পাহারাওয়ালা তাহাকে পুলীশে দিবে না কি? পুলীশে যেন নাই দিলে; সে বেটী থাকে কোথা? এ রাত্রিকাল। স্থানটা যদি তার অপরিচিতই হয়! তা যাহা হইবে হউক গিয়া। মাগী মরে মরুক। তার জন্য আমার কিসের মাথা ব্যথা? রেলে এমন কত জনের কত দুর্গতি হয়, সবগুলা যদি আমি ভাবি তাহা হইলে বেশীদিন করিয়া কর্ম্মিয়া খাইতে হইবে না, নিশ্চয়ই পাগল হইব।

কিন্তু মাগী যদি গোরা হইত? ন্যাকড়া পরা দেশীমাগী না হইয়া সে যদি গাউন পরা বিলাতি মহিলা হইত আর তার কুমড়াগুলি, পোঁটলাটি, তোরঙ্গ বাক্স ঝুড়ি, সাজি, নাটকি ফাটকি এই সব জগৎ যোড়া নানা নিধি হইত, তাহা হইলে গাড়ী ছাড়িত কি না? ভগবান্ জানেন, গাড়ী ছাড়িত কি না; কিন্তু কেমন কেমন মনে হয়, যেন ছাড়িত না, ছাড়িতে পারিত না! সেই রেল ভাঙ্গা ঘণ্টা কিছুতেই ঘণ্টিত হইত না, সেই কাণ ঝালাপালা ভোঁ শব্দ কলের বাঁশির ভিতরে থাকিয়াই, গুমরে গুমরে শোঁ শোঁ করিত। অন্ততঃ মনে ত তাই হয়! কেন হয় বলুন দেখি?

গাড়ী আটকাইয়া রাখিয়া সময় নষ্ট করিয়া অনিয়ম করিয়া সেই মাগীকে গাড়ীর গভস্থ হইতে দেওয়াই যে কর্ত্তব্য ছিল, তাই বা কোন্ প্রাণে বলি? মাগীর বয়স ত মাগীর জন্যও দাঁড়াইয়া নাই, গাড়ীই বা দাঁড়াবে কেন? কালের কঠোর নিয়ম, সকলেই মাথা হেঁট করিয়া মানে। রাজার নিয়ম, রাজার জাতির নিয়ম, সে ত মহাকালের নিয়ম, না মানিবে কেন? মাগীর জন্য একমিনিট গাড়ী দাঁড়াইলে আর

এক মিনসে ছুটাছুটী আসিতেছে, তাহার জন্তও আর তিন মিনিট দাঁড়ান উচিত; অমনি, কেউ পোঁটলা পুটলি বাঁধিতেছে, কেউ একটান তামাক টানিয়া লইতেছে, কেহ তাড়াতাড়ি আঁচাইতেছে, কেহ নাকে মুখে ছুটা শুক্‌না ভাত গুজিতেছে, সকল-কারই খাতির করিয়া, গাড়ী দাঁড়াইয়াই থাকুক; তাহা হইলে আর গাড়ী চলে না, রেল উঠাইয়া দিতে হয়, একের জন্ত শতেককে কষ্ট পাইতে হয়—গাড়ী দাঁড়াইবে কেন? চলিয়াছে, সে ভালই করিয়াছে। অশিক্ষিত মাগী নিয়মের মাহাত্ম্য শিক্ষা করে নাই, নিজের কর্ম্মফল ভোগ করুক, আমার কি?

গুলিখোর এই নিয়মমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিল। উভ হইয়া, হাঁটু ছুটী যোড় করিয়া পা-দুখানি সম্মুখে একটু বাড়াইয়া হাটুতে মাথা দিয়া, চক্ষু বুজিয়া,, গুলিখোর বসিয়া আছে। পায়ের উপর একটু সুড়সুড় করিতেছে। গুলিখোর চক্ষু চাহিয়া দেখিল। দেখে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা পায়ের উপর উঠিয়াছে। তখন শান্তভাবে গাম্ভীর্য্যের সহিত নির্নিমেষ লোচনে পিপীলিকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গুলিখোর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"দেখ বাবু। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি আমার পায়ের উপর দিয়া গেলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। হয়ত তোমার বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু আজি তুমি যাইবে, কালি একটী ফড়িঙ্গ যাইবে, পরশ্ব একটী ব্যাঙ্গ, তার পরদিন ইন্দুর যাইবে, ক্রমে ক্রমে গাড়ী পাল্কী, হাতী, ঘোড়া, লোক লস্কর, সিপাই শান্ত্রী, ফৌজ পল্টন সকলেই যাইতে আরম্ভ করিবে। আমার পা দুখানি সদর রাস্তার অধম হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাকে ছাড়িয়া দিলে, অন্যকেও ধারণ করিতে পারিব না, এই বলিয়া পিঁপড়াটীকে দুটী আঙ্গুলে ধরিয়া, দু রশি পথ তফাতে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া, গুলিখোর পূর্ব্ববৎ বসিল, এবং নয়ন মুদিয়া নিয়ম-মাহাত্ম্য অনুভব করিতে লাগিল। রেলে যে এই নিয়ম-মাহাত্ম্য দেখিলাম, তাহাতে রেলের কার্ত্তাদের গুলিখুরি অনুমান করিতে পারি কি না? দর্শনশাস্ত্রের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এই ভাবে-রই ত? আবার ভাবনা হইল, গুলি কেবল কালার জন্ত, না গোরার জন্তও প্রয়োগ হয়? ভাবি, কিন্তু কিছু ঠিক করিতে পারি না। গুলিও খাই, তাহাতে সুধু মরি, বিজ্ঞতা ত বাড়ে না,—তবে গুলিখুরীতে তো এ কথার মীমাংসা হইল না।

ভাবনা, না জঙ্গল। আদিও পাওয়া যায় না, অন্তও পাওয়া যায় না। তবে আর ভাবিয়াই বা হইবে কি? হউক না হউক, আমি একা ভাবিলে ত কিছুই হইবে না। দোসরই বা পাই কোথায়?

হঠাৎ গাঢ় তীব্রস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল,—"ব্যাবু টিকেট্।" চট্‌কা ভাঙ্গিল। গাড়ী থামিয়াছে, আমি তখন হাবড়ায়। বাজে খরচ করিলাম না, অর্থাৎ একটীও বাক্যব্যয় করিলাম না। টিকিটখানি দিয়া বাড়ী আসিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে বসি-লাম। প্রবন্ধ শেষ হইল। চিন্তার চিতা খোক হইল। চিত্ত উৎফুল্ল হইল। আর

ভারতের কাজ করিলাম বলিয়া, জন্ম সার্থক মনে করিয়া প্রবন্ধটীকে ছাপার সাজে সাজাইতে, আপনার কাছে সমর্পণ করিয়া, গৃহিণীর সহিত গহনালাপে মগ্ন হইলাম।

পাঁচুর পত্র।

ব্যস্তসমস্ত পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ—

শ্রীমান্ লাট ডভরীন রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবা। শশব্যস্ত হইয়া পিণ্ডি-উদ্দেশে তুমি যাত্রা করায়, আমার শ্রীচরণদর্শন করিয়া যাইতে পার নাই। ফলত তজ্জন্য আমি রাগত নহি। উপস্থিত হুলস্থুল ক্ষেত্রে দুটা বেখরচা উপদেশ না পাইলে তুমি বিব্রত হইবা জানিয়া চুম্বকে তোমাকে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি নিম্নের লিখিত মত কার্য্য করটা করিয়া, আগতে কার্য্য আঞ্জামের সংবাদ পাইলে, সবিস্তর উপদেশ দেওয়া যাইবে।

১ দফা। আমীরকে কয়েদ করিয়া মুচিখোলায় আনিবা। তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ দুই হইবে। যেহেতু আত্ম নিয়েই ধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্ম। এদিকে নজর সববে এবং অন্য আববাবে যে টাকাগুলা আমীরসাৎ করিতে হইতেছে, তাই রাখিতে পারিলেই প্রচুর অর্থ।

২ দফা। নেহাৎ যদি ইহা না ঘটে, তবে অস্ত্র-শস্ত্র টাকা-কড়ি যা কিছু আছে, সবই আমীরকে দিবা। তাহা হইলে অসহায় বুঝিয়া আমীরের দয়া হইতে পারিবে। বন্ধু-লাভেই স্বর্গ লাভ। আমীর যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, নরকেও তাহার স্থান হইবে না।

৩ দফা। কাশ্মীর কাড়িয়া লইবা। গোলযোগ অবসানে পশ্চাৎ উপদেশের ফল জানিবা। লাভ হইলে—এঁড়ে শুদ্ধ ; যায়, পোকা নিয়েই যাবে।

৪ দফা। রাজাপ্রজাঘটিত নূতন আইনখানি যেমন চালাইয়াছ, এমনি আর খান কতক আইন চালাইবা। তাহা হইলে আহার ঔষধ দুই হইবে, লোক জব্দ থাকিবে, টাকারও টান ঘটিবে।

৫ দফা। দেশী লোককে বাদ দিয়া ফিরিঙ্গীগুলিকে সখের সিপাইগিরিতে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি দিয়া যে রাজবুদ্ধির বিস্তার হইয়াছে, তাই আর একটু বাড়াইয়া, বাগবাজার, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি আড্ডার গুলিখোর গুলিকেও ভর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়া আসিবা। কাজে ইহারাও সমান ফল দেখাইবে। বরং ফিরিঙ্গী চেয়ে এরা ভাল, এদের গুলি খাওয়া অভ্যাস আছে। ফিরিঙ্গীদের তা নাই।

পঞ্চতত্ত্ব।

(১)

পিণ্ডিতে যদি দোষ না ঘটে, তবে আমাদের মহারাণীর সঙ্গে আমীরের সম্বন্ধ নির্ণয় নিঃসন্দেহ।

(২)

একটা পাশ ফিরিবার কথা উঠিয়াছে। "খাইবার পাশ" হয়ত "শুইবার পাশ" হইবে, এইরূপ কেহ কেহ বলিতেছে। পাশ অর্থে গিরিসঙ্কট, সঙ্কটে সবই সম্ভব।

(৩)

সভ্য হইয়া লালমোহন বিলাতে থাকিলে আর তাঁহাকে এখানে পাওয়া দুষ্কর। কেহ কেহ শঙ্কা করিতেছে যে, ক্রমে মুড়ি মুড়কি পর্য্যন্ত এদেশে অপ্রাপ্য হইবে।

(৪)

মেঘে জল নাই, জলাশয়েও জল নাই; যা কিছু এখন আছে, লোকের চোখে। আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে, তাহাও থাকিবে না।

(৫)

কলের জল থাকিলে অন্য জলের প্রয়োজন হয় না; বোধ করি সেইজন্যই বর্দ্ধমানে কলের জল হওয়াতে জেলায় অন্ন-জলের অভাব হইয়াছে।

গলা ও তলা মিল নাই।

প্রশ্ন। তাদের অত বিদ্রূপ কর কেন?

উত্তর। আমি তদ্রূপ করি না বোলে। যদি তদ্রূপ করিতাম, তাহা হইলে বিদ্রূপ করিতাম না।

তৃতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

পাঁচু-ঠাকুর।

চতুর্থ কাণ্ড।

শ্রীশ্রী ৺পঞ্চানন্দ।

হায়! হায়!! হায়!!! পঞ্চানন্দ আর নাই।

সৌর জগৎ সূর্য্যহীন হইয়াছে, পৃথিবী মাটীছাড়া হইয়াছে, সমুদ্রে জল নাই, গুড়ে মিষ্ট নাই, নিম্বে তিক্ত নাই, সধবার স্বামী নাই, বিধবার বিরহ নাই,—এক পঞ্চানন্দ অভাবে অবনী অন্ধকার।

কেমন করিয়া, কোন প্রাণে, কোন্ ভাষায়, কোন্ মুখে, কোন্ কথায়, কোন্ ছন্দে, কত বড় প্রবন্ধে আজ এই শোকসমাচারে জগৎকে কান্দাইব, আমরা ভাবিয়া আকুল। আহা, ইনি যদি জন্মিবার আগেই লীলাসম্বরণ করিতেন, তাহা হইলে অদ্য আমাদিগকে এ ভাবনায় অস্থির হইতে হইত না। কিন্তু বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা, আমরা কি করিব?

কোন্ বৎসর কোথায় ইঁহার জন্ম হয়, এ সংবাদ জানিবার জন্য এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের যাবতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা নরনারীগণ কাণ খাড়া করিয়া আছেন, অতএব সবিশেষ অনুসন্ধানের অপেক্ষা না করিয়া আপাততঃ আমরা বলিতেছি যে, ১৮১৯ খৃষ্টীয় শকাব্দীতে রবি-উল-আউওল মাসের ত্রয়স্ত্রিংশৎ দিবসে মঘা নক্ষত্রে রাত্রি ৬টার সময় ইঁহার জন্মগ্রহণ হয়। তখন ভয়ানক ঝড় হইতেছিল। ইঁহার জন্মের পরক্ষণেই ঝড় থামিয়া গেল! অলৌকিক ব্যক্তিগণের আশ্চর্য্য জীবন এরূপ অদ্ভুত কাণ্ডেরই সূত্রপাত করিয়া থাকে।

বলা বাহুল্য যে, সুদূর মফস্বলে, ভূগোলের অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল এক পল্লীগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই আহারাদি করিতেন এবং যথাকালে আবশ্যকমত পরলোক যাত্রা করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ইঁহাদের কুলপ্রথাই এইরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চানন্দ

জগতে অদ্বিতীয় নামলব্ধ হইয়াও এই কুলপ্রথার অন্যথাচরণ করেন নাই। ধন্য ইঁহার, স্বদেশ-ভক্তি!

পরপদদলিত, সাতশত বৎসরের দাসত্বে জর্জ্জরিত, দুঃখিনী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় চিরাভ্যস্ত স্বাধীনতা হারান নাই। ইনি পাঠশালায় যাইবার আগে মা-বাপকে মানিতেন না,—বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষকদিগকে মানিতেন না, এবং পরিণত বয়সে কোন কিছুই মানিতেন না। কথিত আছে যে, শৈশবে ইঁহার এপ্রকার অসাধারণ তর্কশক্তি জন্মিয়াছিল যে, অনেক কষ্টে পাঠশালে যাইতে সম্মত হইয়াও বিদ্যাশিক্ষার অগ্রে যে বর্ণমালা অভ্যাস করা আবশ্যক, ইহা কেহই তাঁহাকে বুঝাইতে পারে নাই। সাত গাছা আস্ত বেত অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধির জোর বেশি ছিল; অষ্টম বেত্রে তিনি বর্ণমালার সার্থকতা স্বীকার করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কোন প্রকার কৃত্রিম বন্ধনই ইনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পঞ্চানন্দ কাপড় পরেন নাই। এই তেজস্বিতাই তাঁহার ভাবী উন্নতির সোপান হইয়া দাঁড়াইল।

ইঁহার এই এক বিশেষ গুণ ছিল যে, কোন কিছু করিতে বারণ করিলে ইনি নিশ্চয়ই তাহা করিতেন, এবং কিছু করিতে বলিলে সহজে কখনই তাহা করিতেন না। ইদানীন্তন কোন কোন মহাত্মা হিন্দুর ছেলে হইয়া নিষিদ্ধ পান ভোজনাদির দ্বারা স্বীয় তেজস্বিতা ও কু-সংস্কারের বিরোধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু এই মহা-পুরুষের মত আগাগোড়া কেহ ঠিক রাখিতে পারেন নাই। সিকি দুয়ানি আরও জন্মিয়াছে, কিন্তু ভারতে এমন ষোল আনা টাকাটী আর কখনও জন্মে নাই। অভাগা ভারত! জীবন-চরিত লেখকগণ এই কথাটুকু যেন বিশেষরূপ টুকিয়া রাখেন।

ইঁহার পরিণত বয়সের ক্রিয়া-কলাপ কাহারই অবিদিত নাই। অতি সংক্ষেপেও সকল কথা বলিতে গেলে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের মত একখানি ৭ বল্যুম পুস্তক হইয়া পড়ে।

সাহিত্য-সমাজে ইনি প্রথমে বিপ্লব উপস্থিত করেন। ং, ণ, শ, ষ, স, হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ স্বর, প্রভৃতি অনাবশ্যক এবং ক্ষতিজনক শৃঙ্খল মোচনের প্রস্তাবের ইনিই পিতা স্বরূপ। আমরা জানি, এই সকল উপসর্গের উপদ্রবেই এক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক সুশিক্ষিত স্বজাতিভক্ত, স্বদেশানুরাগী ভারতসন্তান মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, এবং কুসংস্কারের প্রশ্রয় হইবে বলিয়া আজিও সে দিক্ দিয়া ঘেঁসেন না। যদিও কাল আপন কার্য্য আপনি করিয়া লইবে, তথাপি ইঁহার অভাবে যে আমাদের দেশের কি ভয়ানক অনিষ্ট হইল, তাহা এতদ্দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে।

আমাদিগের মহাপুরুষ চিরকালই সুনীতির পরিপোষক। সুনীতির দোহাই দিয়া

গলদশ্রুলোচনে কারস্তকণ্ঠে ব্যাকরণের স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ঘটিত কুৎসিৎ নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য ইনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আজিও তাহা আমাদের কর্ণ কুহরে সকরুণ বীররসের বীণাঝঙ্কারবৎ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অনেকেই জানেন না যে, স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতি লইয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত যে জাতিভেদ সূচক অস্বাভাবিক সামাজিক নিয়ম প্রচলিত আছে, ইনিই তদ্বিরুদ্ধে প্রথম লেখনী চালন করেন। যদিও তিনি সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিধবাবিবাহরূপ পরম পবিত্র প্রথা এদেশে প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাঁর প্রস্তাবিত এই সমাজ-সংস্কারও যে অপ্রচলিত থাকিতে পারিবে না, ইহা আমাদের একান্ত বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

ধর্ম্ম বিষয়েই ইনি ভারতের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে প্রথমতঃ সময় নষ্ট, দ্বিতীয়তঃ কু-সংস্কার আবিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, স্বীয় জীবনে ইনি একথা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। একটী বেলার তরেও ইনি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন নাই, কিন্তু শুদ্ধ প্রতিভাবলে, ইনি যে সকল সমালোচনার দ্বারায় সকলের লোচন দান করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মুগ্ধ, স্তম্ভিত, এবং প্রকম্পিত হইয়াছে, ইহা না বলিয়াই বা থাকি কি প্রকারে? "জীবন যাত্রা" নামক গ্রন্থে ইনি এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, "জীবন" এক প্রকার "যাত্রা" মাত্র। প্রধান উদ্দেশ্য, লোককে ঘুমাইতে না দেওয়া, তা গান গাইয়াই হউক, আর সং সাজিয়াই হউক। তদ্ভিন্ন অন্য যাত্রায় যেমন লোক ভুলান দরকার, জীবন যাত্রাতে তাহাই দরকার—ঘরের খবর, ভিতরের কথা কেহ না জানাই ভাল, গুপো মিন্সে ক্ষৌরি হইয়া সীতা সাজিবে, ঘুঁটেকুড়ানির বেটা রাজা সাজিবে, ভদ্রলোকের ছেলে হনুমান সাজিবে—সেই ভাল। আসরে কখনও সাজ খুলিতে নাই! ইহার মতানুযায়ী সম্প্রদায়ে আজকাল প্রভূত লোকসংখ্যা দেখিয়া কোন ভারতবাসীর চিত্ত না পুলকিত হয়?

ইনি বিবাহ করেন নাই; মন্ত্র হোমাদির প্রয়োজন ইনি স্বীকার করেন না; গির্জ্জায় প্রতিজ্ঞা করা ইনি অবমাননা মনে করিতেন, এবং রেজেষ্টারী করিয়া সম্বন্ধ বন্ধনকেও ইনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু বিবাহ না করিলেও ইনি নির্ব্বংশ হইবার লোক নহেন। আশা করি, ইহাঁর কুলপ্রদীপ বংশধরেরা জগৎ উজ্জ্বল করিতে থাকিবেন। আমরা পাকা ঘরে বাস করি, আমরা নিশ্চিন্ত আছি। যাহাদের খড়ে ঘর, তাহারা অবশ্যই সাবধান থাকিবে; না থাকে, স্বীয় কুশিক্ষার ফল ভোগ করিবে।

একটা আহ্লাদের খবর দিয়া আমরা এই শোকের উচ্ছ্বাস বন্ধ করিব। পঞ্চানন্দ স্বীয় কার্য্য করিতে করিতেই লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা অল্প গৌরব সামান্য সৌভাগ্য নহে। ইংরেজীতে আছে,—He died doing his duty, he died at his post ইত্যাদি। বাঙ্গালায় ইহা ছিল না, এই প্রথম হইল।

পঞ্চানন্দের আত্মায় বরফ পড়ুক।

পাঁচু-পুরাণে শিব-নারদ সংবাদ।

বিষম বাজনা স্বর্গে উঠিল বাজিয়া।
দেবতা তেত্রিশ কোটি উঠিল নাচিয়া॥
বাজে ঢাক বাজে ঢোল দামামা দগড়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা কাঁসি বাঁশীর রগড়।
মর্ত্তলোকে যত লোক বাদাকর থাকি।
স্বর্গলাভ করিয়াছে যমে দিয়া ফাঁকি॥
“গ্যাড সেব পাঁচু”—সবে এবোল ধরিল।
তুলিল বিষম রোল আকাশ ভরিল॥
পবিত্র গাঁজায় দম বেদম করিয়া।
ঝিমাইতেছিলা শিব বিরলে বসিয়া॥
হঠাৎ শুনিয়া গোলা খাড়া করি কাণ।
নন্দিবরে ডাক দিয়া সত্বর শুধান॥
উত্তরোল দেবগণ কেন করিছেন।
উঠিয়া গিয়াছে কিরে গাঁজার লাইসেন॥
নন্দী বলে হেন সুখ কখন কি হবে।
অনায়াসে গাঁজামৃত পাবে জীব ভবে॥
তাহা কভু নহে দেব হবে আর কিছু।
সন্ধান করিয়া আসি জানাইব পিছু॥
হেন কালে নারদ আসিয়া উপনীত।
জিজ্ঞাসিলা ভোলানাথ মুনিরে ত্বরিত॥
কি কারণে এত গোল কহ মুনিবর।
হইয়াছি কৌতুকী ব্যাকুল অন্তর॥

বীণায় ঝঙ্কার দিয়া মুখে হরিবোল,
নারদ কহেন বার্ত্তা যে কারণে গোল॥
পঞ্চানন্দ লোক লীলা করি সম্বরণ
পুনরপি করিছেন স্বর্গ আরোহণ॥
দেবগণ পাঁচুসঙ্গ পাবে বারমাস।
সেই হেতু করে এবে এতেক উল্লাস॥
কথার উপরে কথা দিয়া ভূতপতি।
নারদে সুধান দেব সকাতর মতি॥
অকস্মাৎ পাঁচু কেন লীলা বন্ধ করি।
তেয়াগিয়া ভবধাম করিছে শ্রীহরি॥
নানা ভূতে নাচাইতে পাঁচুরে পাঠাই।
তবে কি জগত মাঝে আর ভূত নাই॥
হয়েছে কি বেহ্মদত্তি কুলের বিনাশ
প্রিয় হৈতে প্রিয়তম যারা মোর দাস॥
ভূতগত সদা আমি ভূতের ভাবনা।
দিবানিশি নাহি জানি অপর কামনা॥
বড় সাধে ভূতগুলা গেছে মর্ত্ত লোকে।
পাঁচুর বিহনে তারা মরিবে যে শোকে॥
তা ছাড়া জগদ্‌বাসী হইবে বিরত।
ভূতগণ জান সদা উপদ্রবে রত॥
ভুলেছ নারদ কত অনুরোধ বলে।
জগতে দিয়েছি যেতে সে ভূতের দলে॥
যখন সংসারে যেতে কুতূহলী তারা
কেমনে পাঠাই তাই ভেবে আমি সারা॥
তুমি বুঝাইলা মোরে দিলা যে আশ্বাস।
কৌশল বলিলা তেঁই করিনু বিশ্বাস॥
বায়ুরূপী ভূতগণ অদৃশ্য থাকিয়া।
কত কি করিতে পারে লোকে ফাঁকি দিয়া।
আমি যে স্বয়ম্ভু অজ্ঞ সে দৃষ্টান্তে তারা।
আচারে বিচারে সদা অজ্ঞ অজ্ঞ পারা॥
ধারে না বাপের ধার নাহি মানে মায়।
যথা ইচ্ছা যায় আসে যাহা রুচি খায়॥

বটে আমি থাকি সাথে আমার শাসন।
হেথায় করিতে নারে কদাচ লঙ্ঘন॥
কিন্তু লোকালয়ে গেলে ভূতের স্বভাব।
নিশ্চয় প্রকাশ পাবে বাড়িবে প্রভাব॥
স্বেচ্ছাচারী তারা বুঝিবে না লোকাচার।
সেই দায়ে গৃহস্থের থাকা হবে ভার॥
মানে যারা বর্ণ ধর্ম্ম আশ্রমের রীতি।
সদা জন্মাইবে সেই সাধুজন ভীতি॥
আমার উচিত করা ত্রিলোকের হিত।
ভূত ছেড়ে দিয়ে কি ঘটাব বিপরীত॥
এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া যখন।
ভূতের পুরাতে সাধ হৈনু দ্বিধা মন॥
তুমি দিলা পরামর্শ দুকুল বজায়।
বায়ু রূপ ছাড়ি ভূত লোকালয়ে যায়॥
সেই বায়ু বাঁধা আছে নরদেহাধারে।
সভায় যা দেখা যায় বক্তৃতা আকারে॥
জীবের জনম বিধি নারী গর্ভে দিয়া।
আমিও খণ্ডিতে নারি সে বিধির ক্রিয়া॥
তেঁই সে হইল তারা অভাগীর পুত।
বিকল্পেতে নরাকার হের যত ভূত॥
ইথেও সাহস পুরা না হইল মনে।
ভাবিলাম কারে দিব তা সবার সনে॥
তুমি পরামর্শ দিলা যাইতে আমারে।
সেটা কিন্তু ঘটিলনা কোনই প্রকারে॥
পার্থিব দোসর মোর পঞ্চানন্দে করি।
পাঠাইনু তেঁই আমি তব বুদ্ধি ধরি॥
পাঁচুর কথায় ভূত নাচিবে হাসিবে।
পাচুর কথায় ভূত আনন্দে ভাসিবে॥
ভুতুমি করিলে ভূতে শাসাইবে পাঁচু।
কানমলা দিবে যদি করে কাঁচু মাচু॥
এত বন্দোবস্ত করি তবে অনুরোধ।
পালিতে সমর্থ আমি আছে তব বোধ॥

তেঁই ভাবি পাঁচু কেন চলিয়া আসিল।
তেমন বে-আড়া ভূত কার হাতে দিল॥
বড়ই ব্যাকুল মন হইল মহা মুনি।
কি কারণে পাঁচু এল কহ ত্বরা শুনি॥
হেন কথা কহি শিব নিস্তব্ধ হইলা।
কিঞ্চিৎ ধেয়ান করি নারদ কহিলা॥
ধোঁড়া রোগে পঞ্চানন্দ কাতর হইয়া।
সে ধাম ছাড়িয়া দেব এল পলাইয়া॥
সে আবার কোন রোগ হৈল কি কারণ।
বিস্তারিয়া কহ মুনি করিব শ্রবণ॥
পাঁচুরে পাঠাই ঘরে ধোঁড়া নাহি দেই।
কিরূপ সে ধোঁড়া কোথা পাইলেক সেই॥
শিব কন পঞ্চানন্দে করি অতি স্নেহ।
বড় দুঃখ পাই যদি দুঃখ পায় তেঁহ॥
বিচিত্র কাহিনী সেই শুন মহেশ্বর।
দণ্ডাইয়া কহে মুনি যোড় করি কর॥
তোমার ভূতের দল পাইয়া বিদায়।
কলির প্রারম্ভে যবে নর লোকে যায়॥
বিধি বশে অভাগীর করিয়া সন্ধান।
তারতে মানবরূপে লভিলেক স্থান॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ভূত মানব আকৃতি।
বিশেষ কেবল হয় প্রকৃতি বিকৃতি॥
সে সব সংবাদ শিব নহে অগোচর।
কহিবারে প্রয়োজন দেখি না বিস্তর॥
অতঃপর শুন সেই ঘোটক সংবাদ।
যেই হেতু ঘটিয়াছে পাঁচুর প্রমাদ॥
পাশ্চাত্য সভ্যতা নামে মায়াবী ঘোটকী।
দাপটিয়া ফেরে রূপে বিশ্ব ঝকমকি॥
যথায় তথায় লোকে ঘোটকী বাখানে।
কত ধায় কত যায় ঘোটকীর টানে॥
ভুলে মায়া ভুলে দয়া আত্মীয় স্বজন।
সভ্যতা সভ্যতা করি মত্ত ত্রিভুবন॥

অভাগীর পোড়া ভাগ্য অভাগীর বেটা।
সেই ঘোটকীর তরে ক্ষেপে এটা সেটা॥
থাকে সবে চুপি চাপি পাঁচু সন্নিধানে।
অভাগী জানে না বার্ত্তা পাঁচু নাহি জানে॥
পরামর্শ করি কিন্তু ভিতরে ভিতরে।
ঘোটকী আনিতে ভূত নানা যত্ন করে॥
ভাগ্যক্রমে এক মাত্র ঘোটকী আছয়।
মায়া তার অধিপতি যতনে রাখয়॥
গোপনে সম্প্রীত করি যোগাইয়া মন।
ভূতগণ করে চেষ্টা পাইতে সে ধন॥
বুঝাইলা রাজা তবু বিবিধ প্রকারে।
সহিবে না এ ঘোটকী তোমা সবাকারে॥
কিন্তু সে ভূতের মন মানা নাহি মানে।
ঘোটকীর চেষ্টা করে গোপন সন্ধানে॥
মায়াপুর হৈতে আসে যতেক ব্যাপারী।
ভূতগণ করে সবে তাদের গোহারি॥
সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত্ত বণিক-নন্দন।
করে ষড়যন্ত্র যাহে ভুলে ভূতগণ॥
জানিয়া আদত্ত ভূত যতেক ব্যাপারী।
কহে ঘুড়ী নাহি পারি অন্য দিতে পারি॥
সে ঘোটকী আসিবে না কভু এই দেশে।
যদ্যপি ধরিয়া আনি পলাইবে শেষে॥
সুন্দর ঘোঁড়ার ডিম পারি কিন্তু দিতে।
তোমাদের উপযুক্ত ধরিবেও চিতে॥
পাঁচু নাহি পাবে টের করিবে না মানা।
অথচ ক্রমেতে হবে ঘোঁড়া ষোল আনা॥
বাওয়া ডিম হাওয়া পেয়ে আপনি ফুটিবে।
পাবে মনোমত বস্তু মজাও লুটিবে॥
আর কোথা যায় ভূত উঠিল নাচিয়া।
কিনিল ঘোঁড়ার ডিম সর্ব্বস্ব বেচিয়া॥
দিল ধর্ম্ম দিল জাতি দিল কুল মান।
দিল পরকাল দিল মুক্তির সোপান॥

ভারত ভাণ্ডার খুঁজি যে কিছু মিলিল॥
আত্মা দেহ আদি করি সব আনি দিল॥
ঐ যে ঘোঁড়ার ডিম সব দিয়া পায়।
যতেক ভূতের পাল সেই পানে ধায়॥
কেহ কোলে করে ডিম কেহ খায় চুম।
শিয়রে রাখিয়া ডিম কেহ যায় ঘুম॥
ডিম নিয়া নাচে কেহ কেহ করে খেলা।
আনন্দে বিরাম নাই ভূতের ভুবেলা॥
ডিমের রাখিল নাম উচ্চ শিক্ষা বলি।
ঘোড়ার ডিমের কথা শুনি অলি-গলি॥
দিন যায় রাত্রি যায় যায় এইভাবে।
ফুটিল ঘোঁড়ার ডিম কালের প্রভাবে॥
অপূর্ব্ব জন্মিল জীব অদ্ভুত আকার।
বিতিকিচ্ছি বস্তু এক নারি বর্ণিবার॥
মুখাকৃতি দাড়ি গোঁফ হস্ত পদ আদি।
বাগড়ে সর্ব্বদা দেহ পোসাকে আচ্ছাদি॥
শিরে টুপি জেবে ঘড়ী আর ঝোলা চেন।
পায়েতে বিলাতী বুট পরা পেণ্টুলেন॥
দেখিয়া মানুষ ভ্রম হয় সবাকার।
লাফাইয়া চলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
সদাই চিহি চিঁহিঁ করে বিজাতীয় স্বরে।
লুটালুটি ছুটাছুটি করে ও না ডরে॥
কখন বা কহে কথা মানুষের প্রায়।
পড়া বুলি ঝাড়ে যথা কাকাতু টিয়ায়॥
অকাতরে বহে ভার বিশ্বের বিদ্যার।
জানে না করিতে শুধু বুদ্ধির ব্যাভার॥
পরিচয় আছে তাই লম্বা দুটী কাণে।
আর পুচ্ছ উপাধি বলিয়া যারে মানে॥
নহে ঘোঁড়া নহে গাধা না নর বানর।
সে কিম্ভুত কিমাকার অই একতর॥
ভূতগুলা চড়ে তাই ঘোঁড়ার মতন।
যেমন দেবতা তার তেমন বাহন॥

কতক্ষণ ছাই চাপা থাকে বৈশ্বানর।
কতক্ষণ ঝুড়ি ঢাকা থাকয়ে বানর॥
কতকাল গুপ্ত প্রেমে চলে ঢাকাঢাকি।
চোরা দেয় সাধু জনে কত দিন ফাঁকি॥
পেশাদারী ধর্ম্মগিরি কত দিন চলে।
কত দিনে ভুলে লোক সংস্কারের ছলে॥
কাণাকাণি জানাজানি ক্রমে বাজে ঢাক।
দিন দুই বুজরুগি তিন দিনে ফাঁক॥
আদর যতন পেয়ে ভূতেদের ঘরে।
কিছুদিন যেতে ঘোঁড়া নিজমূর্ত্তি ধরে॥
মহাবেগে ছুটে ঘোঁড়া পিছুকরি ঝড়ে।
গৃহস্থের বেড়া কভু ডিঙ্গাইয়া পড়ে॥
আছাড়িয়া পড়ে শিশু, বুড়া থতমত।
অন্তঃপুরে পুরনারী ভয় পায় কত॥
শিহরিয়া উঠে সতী থাকি পতি পাশ।
কুলের দেবতা ভাবে ভাবী উপবাস॥
এ হেন ঘোঁড়ার লীলা কতই বর্ণিব।
কাতরে অভাগী মনে ভাবে শিব শিব॥
অভাগীর দুঃখ ক্রমে পাঁচু পেলে টের।
তখন পাঁচুর মনে হৈল বড় ফের॥
কাঙ্গালের ঘোঁড়া রোগ সর্ব্বলোকে বলে।
তাই কি ঘটিল হায় ভূত কর্ম্ম ফলে॥
পঞ্চানন্দ এই ভেবে হইল ব্যাকুল।
অভাগীর দুঃখার্ণবে নাহি দেখে কূল॥
মুখে ফু'টে অভাগীরে কিছু নাহি বলে।
রাবণের চিতা হেন চিন্তানলে জলে॥
বিস্তর সহিল পাঁচু মরমে মরিয়া।
ভূতে কত বুঝাইল ইঙ্গিত করিয়া॥
শুধু ভূতে রক্ষা নাই তাহে ঘোঁড়া রোগ।
পাঁচুর ইঙ্গিত ব্যর্থ লাভ কর্ম্মভোগ॥
অঙ্গের হইলে পীড়া অঙ্গে ক্লেশ পায়।
ঘোঁড়ারোগে পেলে ভূতে পাঁচু মারা যায়॥

ক্রমে যবে এই ভার অসহ্য হইল।
হতাশ্বাস পাঁচু মর্ত্ত্যে লীলা সম্বরিল॥
নারদ এতেক কহি বন্ধ কৈল বাণী।
শিব ক'ন এই হবে আগে আমি জানি॥
তখনি বলিয়াছিনু নারদ তোমারে।
বড় মন্দ হবে ভূতে পাঠালে সংসারে॥
এখন কি হবে বল গৃহস্থের গতি।
কে রাখিবে সোজা পথে ভূতেদের মতি॥
ছারখার হবে লোক, ভূত মারা যাবে।
অভাগীও তিনকুলে কূল নাহি পাবে॥
বল বল নারদ ইহার প্রতীকার।
কাতর হৃদয়ে দুঃখ সহে না যে আর॥

মুনিবর কুতূহলে বুঝাইয়া শিবে বলে
ভয় নাই ভেব না মহেশ।
পাঁচু যে পুরানো ঘাগী একতিল নহে রাগী
ছলমাত্র করেছে বিশেষ॥
ডাকাইয়া বল তায় যেন পাঁচু ফিরে যায়
সেইমত করহে বিধান।
কিছু বেশী অধিকার দেহ তারে এইবার
ঘুচে যাক্ রোগের নিদান॥
পঞ্চানন্দ অনুমতি কর দেব শীঘ্রগতি
ফিরে যেতে অভাগী আলয়ে।
ঘোঁড়াটি পাঁচুরে দিতে বুদ্ধি দেহ ভূত চিতে
আসিয়াছে পাঁচু যে আশয়ে॥
পাঁচু যদি ঘোঁড়া পায় বালাই চুকিয়া যায়
এই কথা জানিহ নিশ্চয়।
ঐ যে দেখিছ শিব তেমন দুরন্ত জীব
পাঁচু হাতে দেখ ত কি হয়॥
স্বদেশ স্বজাতি শিরে আর না উঠিবে ফিরে
লাগাম পড়িলে তার মুখে।
স্বার্থ করতলগত ভূতেরা বুঝিবে যত
অভাগী ভাসিবে তত সুখে॥

ঘোঁড়া সোজা রীতে চালাইলে লোকহিতে
নিশ্চয় হইবে পরিণত।
তখন শিশুর গুচ্ছ ভারত উদ্ধার পুচ্ছ
আকর্ষণে হইবে না হত॥
ভূতের মঙ্গলে ভবে আবার মঙ্গল হবে
সব লোকে বুঝিবে সন্ধান।
চিনিবে আপন পর দেখিবে আপন ঘর
হৃদয়ে জাগিবে শিবজ্ঞান।
কি আর অধিক ক'ব কিবা নাহি জানি ভব
ভুলেছ ভুলাতে ভোলানাথ।
ডাকহে পাঁচুরে ত্বরা করিও না বসুন্ধরা
একতিল ছাড়া তার সাথ॥
তথাস্তু বলিলা শিব জীব পুন পায় জীব
পঞ্চানন্দ বান্ধিয়া কোমর।
আপনি তথাস্তু ব'লে যে কথা সে কাজে ফ'লে
মারে লাফ ঘোঁড়ার উপর॥
শিব শিব বল ভাই আনন্দের সীমা নাই
পাঁচু এল নব অনুরাগে।
পুন সেই রস-রঙ্গ দুষ্টের দশন ভঙ্গ
আঙ্গিয়ার। ভাগে আগে আগে॥
অতি অনুপম কথা অমৃতের প্রায়।
যে না বুঝে তার বুদ্ধি কচুপোড়া খায়॥

দয়া।

গুরু-শিষ্যের কথোপকথন।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহা জ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

শিষ্য। একটু যে গোল হইতেছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কেমন করিয়া জানা যাইবে,

এবং সে অভিপ্রায়ের অনুমোদিতই বা কি, আর বিরুদ্ধই বা কি,—তাহাই বা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এইটুকু আমায় বলিয়া দিউন।

গুরু। এ অতি সহজ কথা। ঋষিবাক্যে যখন তোমার সংশয় হইবে, তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না করিয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এবং বিনা ভূমিকায় সুস্পষ্ট করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি যে উত্তর দিবেন, তাহাতে তুমি বিশ্বাস করিতে পার, যেহেতু আমার বিবেচনায় ঈশ্বরের মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা অল্প।

শিষ্য। আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য! কিন্তু আমার বোধ হয় যে প্রত্যেক সংশয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে ব্যয় বাহুল্য, শারীরিক কষ্ট এবং সময় নষ্ট হইবে। আমি বলি কি ঋষিদের সঙ্গে আমার মতভেদ হইলেই ঋষিদের মতটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলে হয় না?

গুরু। সেও একরকম আছে বটে। কিন্তু তদ্রূপ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ রচনা করা এবং সেই প্রবন্ধ কাগজে ছাপান তোমার কর্ত্তব্য হইবে।

শিষ্য। রাম বল, বাঁচলুম! আর আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

শিশুদিগের প্রতি উপদেশ।

[বোধোদয় হইতে সঙ্কলিত।]

১। পদার্থ তিন প্রকার। কতকগুলি চেতন, বাকিগুলি চেতন নয় অর্থাৎ অচেতন; এই হইল দুই প্রকার। ইহাছাড়া আর এক প্রকার আছে, তাহা চেতনও নয় চেতন নয়ও নয়, অর্থাৎ অচেতন নয়, কিন্তু সে গুলি ভুঁই ফোঁড়, অর্থাৎ উদ্ভিদ্। তবেই তিন প্রকার হইল।

(ক) পরিশিষ্ট। এই তিন প্রকার পদার্থ ছাড়া ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমস্তই অপদার্থ। যেমন,

২। ঈশ্বর। ঈশ্বর চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদ্‌ও নয়, কেবল নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা সকলেই দেখিয়াছে। সুতরাং বুঝাইবার দরকার নাই। আর ঈশ্বর যে চৈতন্য স্বরূপ, তাহাতে এই বুঝিবে যে, ঈশ্বর ভট্টাচার্য্যের নেড়া মাথার টীকিটীর মত, ঊর্দ্ধদিকে ভেদ করিয়া উঠে, অথচ উদ্ভিদ্ নয়। ঐ যে মাথার পরে আছে, সেইখানেই থাকে, সে স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, তথাপি অচেতন নয়; এবং কাটিয়া দিলে আবার গজায়, ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে

যে খানে ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে, অথচ চেতন পদার্থও নয়। সুতরাং ঈশ্বর নেহাৎ অপদার্থ। ফলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যেহেতু—

৩। ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ্ সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তা, অপদার্থেও এসব কাজ পারে, যেমন কাণ্ড-জ্ঞানহীন মহা মূর্খ লোকও পুস্তকাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে।

৪। সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। যেমন, গ্রন্থকার চেতন পদার্থ সুতরাং তিনিও জন্তু বিশেষ। এই জন্তু বোধোদয় না হওয়াতেই জুয়লজিকাল গার্ডেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে নাই।

৫। প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে। তাছাড়া, গোটাকতক জন্তুর ইন্দ্রিয় দোষও আছে, যথা—

৬। পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না—এ তার ইন্দ্রিয় দোষ।

৭। যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম্ম রোমশ অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশু কহে। যথা, খোঁকা; তাহার প্রত্যেক লোমকূপে রোম আছে, এবং তাহার শরীরের চর্ম্মের উপর সেই রোম আছে এবং সে চারি পায়ে হামাগুড়ি দিয়া চলে, অতএব সে পশু। বোধোদয় পড়িলে পর, তবে সে মানুষ হইবে।

যে সকল জন্তুর শরীর ভিন্ন অন্য স্থানের চর্ম্ম রোমশ হয়, যেমন কোন জন্তুর ভিস্তির চর্ম্ম, কিম্বা কোন জন্তুর তবলার চর্ম্ম, যদি রোমশ হয়, তাহা হইলেও সে জন্তুকে পশু বলা যায় না।

পরিশিষ্ট। অনেক ভদ্রলোকে আসবাবের জন্য হরিণের কি ব্যাঘ্রের রোমশ চর্ম্ম রাখিয়া থাকে। যদিও সেই সকল ভদ্রলোক জন্তু বটে, এবং যদিও তাহাদের সেই চর্ম্ম রোমে আবৃত, এবং যদিও তাহারা সেই চর্ম্ম চতুষ্পদ চেয়ারের উপর পাতিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি তাহারা পশু নহে, কারণ সে চর্ম্ম রোমশ হইলেও তাহাদের শরীরের চর্ম্ম নহে, এবং চেয়ারের চারিখানি পা থাকিলেও সে বসিয়া থাকে, চলে না।

৮। জন্তুর মধ্যে পক্ষী জাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পক্ষীর ঠোঁটে এবং পায়ে পালক হয় না, যেহেতু পক্ষী জাতির ঐ দুটী অঙ্গ সর্ব্বাঙ্গ ছাড়া। সেই ঠোট এবং সেই পা অন্য কোন জন্তুর অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হইবে। নহিলে তাহা পালকে ঢাকা থাকিত।

৯। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দুটী বই পা নয়। এ জন্য উহাকে চতুষ্পদ না বলিয়া দ্বিপদ বলা উচিত। মনুষ্যেরও দুটী বই পা নয়,

কিন্তু মনুষ্য পক্ষী নহে; সেই জন্য তাহাকে চতুষ্পদ বলা যাইবে। দুটী বই পা নাই বলিয়া যদি চতুষ্পদ বলিতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপদ বলিলে চলিতে পারে।

পরিশিষ্ট। পক্ষীর যদি তিনটী পা থাকিত; তাহা হইলেও তাহাকে একদিন চতুষ্পদ বলা যাইত। কারণ দুটি বই পা না থাকাতেই পক্ষী চতুষ্পদ হইতে পারে নাই।

১০। ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন জন্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এ জন্য কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতকগুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে সকল জন্তুই সমান। যেমন গ্রন্থকর্ত্তা এবং গাধা দুইই সমান। কারণ ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে গ্রন্থকর্ত্তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। আমরা যে গ্রন্থকর্ত্তাকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। কারণ তাহা হইলে, গাধাকেও পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করিতে হয়।

১১। মানুষ পশুর ন্যায় চারি পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ মোটেই চলেনা, কেবল দাঁড়ায়; চলিতে হইলে চারি পায়ে চলিত।

১২। মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না। খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। এইজন্য মনুষ্যেরা কচু এবং কলা পোড়াইয়া খায়। কদাচ আম কাঁটাল পেয়ারা, লিচু জাম প্রভৃতি খায় না।

১৩। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। হিন্দুর একাদশ ইন্দ্রিয়, এজন্য হিন্দু মনুষ্য নয়।

১৪। মনুষ্যেরা মুখদ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করে। অন্য জন্তুরা, মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, মুখ ছাড়া অন্য অঙ্গের দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

১৫। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না। যে হাত পা যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া সেই হাত পা পাইয়াছে। কারণ বিনা পরিশ্রমে কেহ হাত পা পাইতে পারে না।

১৬। ভিক্ষা করিলে পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন কোন বস্তু পাওয়া

যায়। যেহেতু ভিক্ষা আপন বাড়ী বসিয়াই হয়; এবং যে পিতা মরিলেই সম্পত্তি পায়, সে ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াই পাইয়া থাকে। কারণ তাহাকে শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক মাতৃগর্ভে বাস করিতে হয়, এবং পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতি পালিত হইতে হয়।

পরিশিষ্ট। ভিক্ষা করিলে কোন কোন বস্ত পাওয়া যায়, সকল বস্ত পাওয়া যায়, না; যেমন টাকা পাওয়া যায় এবং টাকা দিয়া যাহা কেনা যায়, তাহাই পাওয়া যায়, আর কিছুই পাওয়া যায় না। ভিক্ষা করিলে রৌদ্র, জল, বাতাস প্রভৃতি কোন মতেই পাওয়া যায় না।

অতএব হে বালকগণ। তোমরা কতপুণ্য ফলেই এই বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিতেছ।

RESOLUTION.

Read.—A Memorial from the Tea-planters of Assam. dated Jorehaut, 21st September 1886.

Read.—A letter of recommendation from the Defence Association. Calcutta. dated 1st April, 1886.

Read.—An editorial article in the 'Englishman' newspaper, dated 31st July 1886.

The Lieutenant-Governor has taken into his very serious and earnest consideration the strong representations of the numerous influential bodies and respectable gentlemen who have addressed him on the subject of Mr. F. W. Gibbons' conviction, and he has not failed to notice the unanimous expression of public opinion through the Imperial Press of the country. But whatever his personal inclinations may be, Sir Rivers Thompson regrets that he is unable to interfere with the course of judicial proceedings which have culminated in the disastrous result now under notice. His Honour is free to confess that but for the advantage that might be taken by seditious natives of his merciful disposition if he exercised his high prerogative of mercy in favovr of Mr. Gibbons, he would most gladly have acceded to the very reasonable and modest request of by far the largest portion of the law-abiding community of this province. As it is, His Honour regretfully feels himself bound by the judgment of the High Court in the

present case, and is therefore driven to the conclusion that Mr. Gibbons has been pro erly convicted of the charge of forgery brought against him. Sir Rivers appreciates the force of the argument based upon the precedent of the illustrious founder of British Sovereignty in India, and observes the striking parallel that exists between that case and the present. But His Honour is at the same time forced to remember the fate that deservedly overtook the Brahmin Nuncoomar upon a similar indictment, and feeling it to be his duty to hold the scales evenly between all classes without distinction of race, creed or colour, he must positively decline to interfere with the judgment of the High Court, which by the way, no body has asked him to do

The Lieutenant-Governor would have been justified in dismissing Mr. Gibbons' petition altogether, but taking into consideration the difficult position in which he was placed in connection with the tea industry in Assam, that he was discharging the very onerous duties of a pioneer of civilization in the wilds of Assam in a most insalubrious climate under a tropical sun, that he has already suffered severely from the consequences of his action, that his Past carreer has been blameless, and that during the course of the acrimonious discussion on the Ilbert Bill, his services merited the special acknowledgements of the Defence Association, His Honour is of opinion that the mere declaration of guilt of Mr. Gibbons and the announcement of the sentence of the Court will be sufficient to mark the high sense of justice of the Government of Bengal, and that the practical execution of the sentence may well, in the present instance, be left out, so that Mr. Gibbons may return to his arduous duties without any further loss of time.

It gives His Honour the greatest pleasure that in adopting the course he has done, the Government of Bengal has derived no inconsiderable moral support from a perusal of the well-considered and well-reasoned Resolution of His Excellency the Viceroy in the case of Colonel Hooper of Mandalay notoriety.

Ordered.—That Mr. F. W. Gibbons be discharged without being acquitted, and that he be appointed Lieutenant of the Assam Volunteers with summary Magisterial powers within the jurisdiction of the Tea gardens to which he has done the honour of being attached.

ভাবনার দায়ে খালাস।

কলিকাতায় জ্বর-জ্বালার খুব ধুম। ওলাউঠারও খুব রগড় লাগিয়াছে। অনেক লোক মরিতেছে, আরও অনেক লোক ভুগিতেছে। কিন্তু নির্ভাবনা। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, আর শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্—দেহ ধারণ করিলেই রোগ ভোগ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রের লিখন। কেবল স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেই ভাবনার কথা। তা, কলিকাতায় স্বাস্থ্য আর নষ্ট হইবার যো নাই। কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাস বিলাত হইতে খাস ডাক্তার সিমসেনকে আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শাস্ত্রের খাতিরে যেমন ভুগিতে হয়, মরিতে হয়, লোকে তেমনি ভুগুক্ আর মরুক, কিন্তু স্বাস্থ্যের দায়ে কলিকাতা নিশ্চিন্ত।

কুলীন ষাঁড়।

শুনিয়া পঞ্চানন্দের আহ্লাদে ধরিতেছে না। বর্দ্ধমানের ময়লাফেলা কমিসনর বাবুরা গোকুল উজ্জ্বল করিবার জন্য বিলাত হইতে কুলীন ষাঁড় আমদানী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। পণ বেশী; কিন্তু আখের ভাল হইবে। ষাঁড়ের কল্যাণে যদি কুল-মর্য্যাদার জ্ঞানটা জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে ভাল বই কি!

একটা সন্দেহ।

একজন একখানি খবরের কাগজ আনিয়া সে দিন আমার হাতে দিয়াছিল। খবরের কাগজে নাকি অনেক উপদেশ থাকে, এই শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি দেখিলাম, কাগজখানির মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "ভারত মিহির"। দেখিয়া আমার বড়ই অশ্রদ্ধা হইয়াছে। কেন না, এখনকার গলার জোর আর বুদ্ধির তোড় দেখিয়া আমার ত মনে হয় যে ভারত একটুকুও মিহির নয়, ভারত মোটার।

বরের বাজার।

রোখা কড়ি—চোখা মাল।

হাত দিও না,—লাট খাবে।

ডামিজ দিতে মারা যাবে।

যেমন দর—তেমন বর।

১ নম্বর।—বড় মানুষের ছেলে, দেখতে, শুনতে, বলতে, কইতে যেমন হতে হয়। পাড়াযোড়া বাড়ী, আস্তাবল-যোড়া গাড়ী, অভাব কিসের? আইরিন্‌চেষ্টে কোম্পানীর কাগজ রাখতো, ঘরে আইরনচেষ্ট ধল্লো না, আইরিন্‌চেষ্টে কাগজ ধল্লো না, তাই বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে সাত গাড়ী কাগজ রেখে দিয়েচে। ছেলেত রাজ-পুত্তুর, বয়েস সবে এই আঠার বছর। হিন্দু কালেজের ফোর্থ কেলাসে পোড়তো। গিরি-সেই সময় একদিন ছেলে কালেজ থেকে ফিরে এলো, গাড়ী থেকে নেবেই বাড়ীর ভেতর গেল, মা দেখলে ছেলের গোঁপ একটু একটু ঘেমেচে, সেই অবধি আর কালেজে যেতে দেয় না। তবু ছেলে লেকা-পড়ায় এই বয়েসেই সরস্বতী। বে সবুরে না কেন? কবুরে বই কি! ওদের ত অভাব নেই, টাকা-কড়ি তত চায় না, তিন হাজার ভরি সোণা, সোনা-রূপোর আটপ্রস্থ দানসামগ্রী, সহরের ভেতর এক-খান বাড়ী—সাজিয়ে গুচিয়ে অবিশ্যিই দিতে হবে—সহরের কাছে একটা বাগান। আর এমন বেশী কি? পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ। গহনার কথা বেশী আর না বল্লেও চলে, তবে জড়াও দু সুট, তা ত দিতেই হবে। ছেলের আংটী ঘড়ী, সে তোমাদের বিবেচনা। তবে এদিকে যেমন শস্তা, মেয়েটী ডানা-কাটা পরী হওয়া চাই।

২ নম্বর।—পয়সা কড়ি নেই, তবে ভাল জায়গায় হাত বাড়ান কেন? পার ত এই ছেলেটিকে কোরে দিতে পারি। আগে বাঙ্গাল দেশেই বাড়ী ছেলো বটে, কিন্তু আজকাল কোলকেত্তাতেই বাস বলতে হবে। একটা পাস পেয়েচে, আর একটা পাস সাতবার দিয়েছিল। যারা পরীক্ষে নেয়, তারা পাড়ার লোকের কাছে ঘুষ খেয়ে পাস দেয়নি। তা নাই দিলে, বিদ্বান যেমন হতে হয়, তা হয়েচে। স্বভাব চরিত্তির ঠিক যেন দেবলোকের মত। নীচু নজর নেই, সমাজে আনাগোনা করে, পেবায় চোখ বুজেই থাকে। যখন খোলে একটু ঝাপসা দেখে, তায় কিন্তু কাজের ক্ষতি হবার যো নেই। চোখে চস্‌মা এঁটেই রাখে। যখন ঘুমোয়, তখনও চস্‌মা আঁটা থাকে। স্বপনটুকু পর্য্যন্ত ঝক্‌ঝকে দেখতে পায়। বয়েস কেথা গা? তবে ছেলে বল্লেই হয়, বড় জোর আটাশ নয় আটত্রিশ। যেমন হোক্ দু টাকা

রোজগারও করে। রামকান্ত ডাক্তারের মেয়েদের সন্ধ্যে পর পড়া দেয়। মেয়েদের নেকাপড়ার ওপর ভারী নজর। তাই রোজ দুপুর বেলা পাড়ার ভেতর দে বেরোয়। চাও, অম্নে কোরে দিতে পারি। বাড়ী ঘর দুয়ার নেই, তাত একটু কোরে দিতেই হবে। তা ছাড়া এদিক ওদিকে দশহাজার টাকা। তা নয় কমিয়ে সাড়ে ন হাজার, ন হাজারেও কোরে দিতে পারি। নোক নাকি বড় ভদ্দর, আমার কথা রাখ্‌বেই রাখ্‌বে। আমায় কিন্তু তা হলে পাঁচশখানি টাকা নগদ, আর গয়দের ছুনি পরাতে হবে।

৩ নম্বর।—ছেলে যেমন হ'তে হয়। সকল কেলাসে পা দেয় না, ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে ওটে। সবে বয়েস তেরো বছর। পড়ে, হ্যার সাহেবের থার কেলাসে। একটী ছোট বোন আছে, বে হয়নি। বাপের বাড়ী খানি এগার হাজার টাকায় দত্তদের বাড়ী বাঁধা পড়েচে। বেশি কিছু নেবেও না, বেশি কিছু বল্‌বেও না। বাড়ী খানি ছাড়িয়ে দিতে হবে, আর ছোট বোনটির বে যাতে হয়। এ ধারের খরচ পত্তর; মেয়ের বাউটি গয়না; ছেলের হীরের আঙ্গটি, ঘড়ির চেন—একি আর আজকাল কাকে বল্‌তে হয় গা?

৪ নম্বর।—মেয়ে যদি জলে ফেল্‌তে মন না থাকে, তবে এম্নি বরেই দিতে হয়। উপরো উপরি তিন্‌টে পাস্, একবার দশ টাকা জলপানি সুদ্দ, পেয়েছিল। চাক্‌রি দেবার জন্য লাট্‌সাহেব দুবেলা নোক পাঠায়। ছেলে কিন্তু চাক্‌রি নেবে না, বলে আমি আরও পড়্‌বো। বাঁ চোকে একটু দোষ আছে। তা থাকুক, এমন ছেলে কামদেব। বড় কষ্টেই ছেলের বাপ এ ছেলে মানুষ কোরেছে। বাপও তেমনি ভাল মানুষ, ছেলের বে দিয়ে পেটো শুদুমের ওজন সরকারী ছেড়ে বুড়ো বয়েসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌বে মনে কোচ্চে, ছেলে কিন্তু বে কোর্ত্তে রাজি নয়, তবে আমি একদিন পাল্লে পার্ত্তে পারি। ছেলের একটী তিন শ টাকা মাইনের চাক্‌রী, গাড়ী ঘোড়া সুদ্দ আদি সুট, সাত হাজার টাকা নগদ আর এদিক্‌কার যেমন আছে, তাত আছেই। তা হাঁগা, এমন ছেলের এ আর বেশি কি? আমায় কিন্তু বাবু খুসী কর্ত্তে হবে।

৫ নম্বর।—একালে যেমন ছেলে খোঁজে। বাঁধা শরীর, যেন মাল মুগুর। জীব নষ্ট ক'রে ক'রে এমন শরীর করেচে। এই, এমন এমন সীসের গোলা দেতলার ছাত-থেকে ফেলে দিয়ে, দৌড়ে নেবে এসে উটোনে দাঁড়িয়ে তাই বুক পেতে ধরে। এ কি সোজা কের্দ্দানি? লাটসাহেব দিলে না সেই, নইলে বসন্ত-তিওড়ের দল কোরে রুশিয়ার উপর লড়াই দিতে গেছলো আরকি। ভাগ্যিস্ যায় নি, তাই কত লোক কন্যে-দায়ে উদ্ধার হয়ে যাবে। পার যদি, তো টাকার কথা কইতে হয়, নইলে মিছে কেন?

৬ নম্বর।—কুচ্ছো করা নোকের স্বভাব। সে সব কথা কি কাণে শুনতে হয় গা? বলে কিনা যে ওকালুতির পাস্ পেয়ে এখন মাথায় হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভাব্‌চে।

এও কি কথা! পড়ে পড়ে মাথার ব্যারাম হয়েচে, তাই অমন হাত দিয়ে থাকে। আকাশ পাতাল ভাবেচ, কেন ভাববে? আড্ডির ইস্কুলে নগদ পঁচিশ টাকা মাইনা পেতো, এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলো। এখন রোজ কোটে যায়, রোজ ঘরে আসে। সায়েব নাকি বলেচে যে উকিলি যদি পছন্দ না হয়, তা হলে হাকিমি কোরে দেবে। উকলি নাকি অধর্ম্মের কাজ, তাই উনি কোটে যেয়েও চোর ডাকাতের পয়সা নেন্ না। খুব ধার্ম্মিক কি না? চাওত এই সময় কথায় কথায় বে দিয়ে দিতে পারি। হাকিম হলে আর এগুতে পার্ব্বে না। খোরাক পোষাক আর কোটে যাবার গাড়ীভাড়া যদি দিতে পার তো, তোমাদের বাড়ী দু বছর থাক্‌তেও রাজি আছে। বেশত বাড়ীর ছোট ছোট ছেলপুলেদের পড়াটড়া বোলে দেবে, আর থাকবে। সে তোমাদেরও ভাল, আর তারও ভাল।

ছার কথ।

আশ্চর্য্য বাজি! আশ্চর্য্য তামাসা!! আশ্চর্য্য শিক্ষা।

বানরে সাহেব সাজে, মেম সাজে, কোচম্যান সাজে, সহিস সাজে, খানা খায়, চুরুট ফোঁকে, গাড়ী যোতে, গাড়ী হাঁকে। সাজ সজ্জায় সাহেব, ব্যবহারে সাহেব, কিছু প্রভেদ নাই, কেবল চেহারায় চেনা যায়, আর কথা কয়না।

দর্শক ডাকিতে হয় না, টাকা দিয়া লোকে টিকিট পায় না—সহজেই এত ভিড়।

আরও আশ্চর্য্য! আরও অদ্ভুত!!

হিন্দুর ছেলে সাহেব সাজে, সভ্য সাজে, বক্তা সাজে, খানা খায়, চুরুট ফোঁকে, জাহাজ চাপে, ভেসে যায়, সাজ সজ্জায় সাহেব, ব্যবহারে সাহেব, কিছু প্রভেদ নাই, কেবল চেহারায় চেনা যায়।

কথাও কয়!!!

তবু দর্শক যোটে না। ঘরের পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া দেখা দিতে বিদেশ যায়। লাভের মধ্যে হাত তালি পায়।

চমৎকার শিক্ষা।

অপূর্ব্ব সম্মিলন।

জাতীয় সংসর্গ।

"তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে,
রজনী বঞ্চয় সুখে,
প্রভাত হইলে সবে দশ দিকে ধায়।"—ইত্যাদি।

রিজোলাউসেন।

(ওবফে)

১ম সিদ্ধান্ত। এই মিলন ভিক্ষা করিতেছেন ধন্যবাদ দিতে পরস্পরকে।

২য় সিদ্ধান্ত। „ „ „ „ দুঃখ লিপিবদ্ধ করিতে যে ভামো হইতে প্রতিনিধি শুভাগমন করেন নাই।

৩য় সিদ্ধান্ত। „ „ „ „ দরখাস্ত করিতে ভারতেশ্বরীকে ইস্তফা করিতে রাজ মুকুট।

৪র্থ সিদ্ধান্ত। „ „ „ „ চাঁদ পাড়িতে হাত বাড়াইয়া।

৫ম সিদ্ধান্ত। „ „ „ „ পাইতে কেহ যাহা চাহেনা এবং চাহিলে যাহা কেহ পায় না।

অতএব হুকুম হইল যে,—

পার্লিমেণ্টের অবগত হওন এবং কার্য্যানুবর্ত্তী হওন জন্য বিলাতে নকল পাঠান যায় এবং সর্ব্বসাধারণ জনগণের গোচরার্থে পঞ্চানন্দে ছাপান যায়।

শ্রীনানা পক্ষী।
মোকাম এক বৃক্ষ।
তারিখ রজনী।

নাম রহস্য।

হিন্দু নয়, যবন নয়, পাশী একজাতি। ভাল, সেই পাশী লোকটা হিন্দুয়ানি ভাঙ্গিবার জন্য যে এত দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, তার নামটাই যে কেহ ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। খুব প্রবীণ একজন লোকের কাছে শুনিয়াছি, ইহার নাম মলবারি। তাই যদি হয়, তবে কোন্ সমাসে কি ভাবে দাঁড়ায়? কর্ম্মধারয়?— না, সে বড় যাচ্ছেতাই। তৎপুরুষ? তাও তাই। ভগবান্ জানেন, আসল নাম

কি! তবে প্রবীণ লোকের কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যৈসা কাম, তৈসা নাম।

বাজে লোকে বলে,—মল ভ.রি। কিন্তু হ্রস্ব ই, কি দীর্ঘ ঈ? মলে ভারি, কি মলের ভারী? বাজে লোকের বদ্ কথা, ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, শুধু বদ্ কথা বলিও নয়, রুচিবাগীশদের ইহাতে সুরুচি কি কুরুচি হবে, তাই বা কে জানে? অরুচি হবে না, এটা জানি। তাই তাদের খাতিরেই ছাড়িয়া দিলাম।

বঙ্গবাসী বলে,—মাল বিহারী! আশ্চর্য্য নয়। লোকটা যে রকম বিধবা, সধবা সাবালিকা, নাবালিকা লইয়া আছে হাতে লাগিয়াছে, কে জানে হবেই বা তাই। ফলে নামে রহস্য আছে! আবিষ্কারটা করা চাই।

নাটকি ফাটকি বিজ্ঞান।

১। কাঠ রাখিবার সহজ উপায়।

বর্ষাকালে ভিজা কাঠে রাঁধিতে বড় কষ্ট হয়। অথচ গরীব দুঃখী লোকের এত পয়সা নাই যে, আগে হইতে কাঠ কিনিয়া শুকাইয়া রাখে। তাহাদের জন্য এই উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিজা কাঠে স্পিরিট্ ot টরপেনটাইন spirit of Turpentine অর্থাৎ তার্পিন তৈল ক্রমাগত সাত দিন সাত রাত মালিশ করিতে হইবে তাহারপর মসটার্ড প্লাসটর অর্থাৎ রাই সরিষার রুটি করিয়া পুল্টিশের মত সেই কাঠের গায়ে বসাইয়া দিবে। যেন হাওয়া না লাগে। পরে ফারনহিটের ১৩২ ডিগ্রী গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া সেই পুল্টিশ তুলিয়া দিবে। উত্তম রূপে পুল্টিশ উঠিয়া গেলে, ২৪ ঘণ্টা ফ্যানিংমেশিন্ অর্থাৎ পাখা-কলের হাওয়া দিবে। পরে খুব চিনচিনে রোদে কাঠখানিকে ঝনঝনে করিয়া শুকাইবে। উনুনে সেই কাঠ উত্তো দিয়া রাখিলে বেশ থাকিবে।

২। বিনাবস্ত্রে শীত নিবারণ।

গায়ের কাপড় অল্প পয়সায় ভাল হয় না। বেশী পয়সা দিয়াও অনেকে কিনিতে পারে না। একটু বিজ্ঞানের সাহায্য লইলেই সকল ভাবনা চুকিয়া যায়। প্রথম,—মানুষকে বরফের রাশির মধ্যে ডুবাও। ছয় ঘণ্টা পরে সেই বরফের স্তূপ হইতে তুলিয়া ষ্টীমফারনেশ অর্থাৎ কলের চুলোর ভিতর গুঁজিয়া মুখে হারমেটিকেলি শীল অর্থাৎ এয়ার-পম্প যোগে বায়ু বাহির করিয়া উত্তম ষ্টীমকোল ভিতরে পুরিয়া দিয়া মানুষ টাকে তাহার ভিতর গালা মোহর করিয়া আঁটিয়া দাও। বার ঘণ্টা পরে বাহির করিয়া দেখিবে, তাহার আর শীতবস্ত্রের দরকার নাই।

৩। রাত্রিকালে আলোক।

তৈল সলিতা অভাবে অনেক দুঃখী লোক রাত্রিকালে আলো জ্বালিতে পারে

না। শ্রীনীচের অজার বেটরী অর্থাৎ মান-মন্দিরের চূড়া হইতে ঠিক ৬ ডিক্রী ৫৩ মিনিট দক্ষিণ দ্রাঘিমায় সিওডোলাইট পত্তন করিয়া সূর্য্যের জিনিথ [genith] হইতে আল্টীচ্যুডের (altitude) সাত হাজার তিনশ তিপান্ন মাইল নিয়ে একখানি মাটির সরা পাতিয়া ঠিক্ দুপুরের রৌদ্র ধরিয়া লইবে। পরে ব্লটিংপেপার অর্থাৎ চুষী কাগজ দিয়া সেই সরার মুখ উত্তমরূপ বন্ধ করিবে। পরে বাড়ীতে সন্ধ্যার পর স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বারঘণ্টা সেই সরায় জাল দিতে থাকিবে। তাহার পরেই দেখিতে পাইবে যে, চারিদিক তোফা ফরসা হইয়াছে—অন্ধকারের লেশমাত্রও নাই।

৪। বিনা চাউলে ভাত।

সকাল সকাল স্নান করিয়া কাজে বাহির হইবে। বেলা আড়াইটার সময় ছয় আনার লুচি কচুরি কিনিয়া খাইবে। সন্ধ্যার পর উনান ধরাইয়া হাঁড়ি চাপাইয়া হাঁড়িতে পরিমাণ মত জল দিবে। আধ বোতল রম সেই স্থানে বসিয়া আস্তে আস্তে উদরস্থ করিতে থাকিবে। আর, উনানে জাল দিবে। পরে হাঁড়ি নামাইয়া ফেণ গালিয়া দেখিতে পাইবে, যে হাঁড়িতে কিছুই নাই। তখন পান্তা ভাত বাড়িয়া খাইলেই চলিবে।

৫। রাজনৈতিক দুঃখ নিবারণের বৈজ্ঞানিক উপায়।

ক্রুড্ ওপিয়ম অর্থাৎ কাঁচা আফিম্ সাড়ে চব্বিশ তোলা, জেলখানার খাঁটি সরিষার তৈল Q, S, যতটুকু লাগে, দুই একত্র করিয়া আরবী গঁদের সাহায্যে বোলস্ পাকাও। পরে মনুমেণ্টের চোরকুটারীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ পূর্ব্বক যেমনে পার, ঐ বোলস্‌কে উদর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দাও। তাহার পর ৭২ ঘণ্টা চক্ষু বুজিয়া একচিত্তে নিরাকার ভাবিতে থাকিবে। ফল অব্যর্থ। এত প্রক্রিয়া অবলম্বনের ধৈর্য্য যাহাদের নাই, তাহারা কণ্ঠনালীর উপর গলার চতুর্দ্দিকে রজ্জু বেষ্টন পূর্ব্বক সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত সাত ফিট্ তিন ইঞ্চ উচ্চে কাড়ি কাঠে দৃঢ় বন্ধন করিয়া শরীরের পূর্ণভার পরীক্ষা করিবে। অধোমুখ পদাঙ্গুষ্ঠের প্রান্ত হইতে বসুমতীর নিকটতম ব্যবধান ছয় ইঞ্চির ন্যূন না হয়। ৯ মিনিট ৪৩ সেকেণ্ড গতে সশরীরের পরীক্ষার ফল দেখিতে পাইবে।

সিবিল সার্ব্বিস কমিশন।

সাক্ষীগণের জবানবন্দী।

(ঐতিহাসিক রহস্য)

ক্রমে লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। কমিশুনর মহাশয়েরা হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া ফেরার হইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্বয়ং পঞ্চানন্দ

আসরে অবতীর্ণ। অভয় দিয়া বলিলেন,—"চিন্তা নাই, তোমরা সরিয়া পড়, ঢাকায় গা ঢাকা দেওগে। যত এজেহার আছে, আমি আছি।"

তখন আর পায় কে? ছেলে ছোকরা ত আসিলই, মুটে মজুর পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল। কোলের ছেলে ত কোলের ছেলে, নারাণে মুদীর টিয়া পাখীটি পর্য্যন্ত এজেহার দিল। "অকুতোসাহস" পঞ্চানন্দ স্বয়ং স্বহস্তে স্ব-কলমে এজেহার লিখিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেলেন। এজেহারের সই মোহরের নকল পাইবামাত্র প্রকাশ করা যাইবে।

জু জু বিলি।

(উপলক্ষে উপাধিবর্ষণ)

আঁকর তাড়ায় ব্যাখ্যা

ওরফে

চিত্রকরের মল্লিনাথ।

দর বুঝিয়া উপাধি চিরকালই আছে। ইহাতে প্রধান সুবিধা এই যে, পক্ষপাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ যাহার যাহা কামনা স্বচ্ছন্দেই পাইতে পারে, কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকে না।

এবার কিছু বিশেষত্ব আছে। বিক্রয়ে যতদূর হইবার তাহা হইল। তাহার পরে 'বঙ্গবাসী'র দেখা দেখি—

উপহার!!!

গৌরবরণ মণ্ডলের গেজেটে উপহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

এমন সুবিধা আর হইবে না!!

ইহাতে নক্ষত্র বৃষ্টি। যাহারা পাইতেছে, তাহারা নক্ষত্র দেখিতেছে না; দিনের বেলা কদাচ কেহ দেখিলেও দেখিতে পারে, কিন্তু প্রায়ই দেখে—সরিষার ফুল।

রাজা বাদসা অনেকেই হইল। মাটীর মুখ কেহ দেখিতে পাইল না, মাটী খাইল। কেহ কেহ স্বয়ং মাটী হইল। কাহারও অন্ন কষ্ট থাকিল না, কিন্তু অন্নকষ্ট হইলে সম্পাদক তজ্জন্য দায়ী নহেন।

রেলের পানী-পাঁড়েগণ—রায় পানিপাড়ে বাহাদুর, ভিস্তীগণ—নবাব ভিস্তী-ওয়ালা খাঁ বাহাদুর; ইহার ফল সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী!

ইতিহাস খুলিয়া দেখা গেল যে, পঞ্চানন্দ অসাধারণ ব্যক্তি। পৃথিবীতে যত রকম

সৎকর্ম্মের কথা হাত-নাগাইদ সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে, পঞ্চানন্দের তাহার সবগুলিই হইয়াছে; যথা,—

(১) খয়রাতি হাঁসপাতাল, ওরফে দাতব্য চিকিৎসালয়। বড়ীর ছেলেগুলার মালওয়ারি জ্বর, তিন শ ষাট দিন লাগিয়াই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য পঞ্চানন্দের বদান্যতা—তাহাদের সকলকেই বিনা ব্যয়ে ঔষধ, পথ্য বালিশ বিছানা সমস্তই অকাতরে যোগাইতেছেন।

(২) ফিরি স্কুল অর্থাৎ বিদ্যাদান। ছেলে মেয়ের ভিতর যেটা জ্বর থেকে উঠে, সেইটেই স্কুলে পড়ে। পঞ্চানন্দের সরকার হইতে মাহিয়ানা পায়, কেতাব পায়, কাপড় চোপড় পায়, খোরাক পায়, থাকিবার ঘর পায়। পাই পয়সা দেয় না, কেহ চাহেও না। কোম্পানীর কাছে পাঁচু কিছু কিছু মাসিক এড পান; এই মাত্র।

(৩) দুর্ভিক্ষে অন্ন দান। মিসেস্ পাঁচী দুবেলা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়,—কিন্তু পঞ্চানন্দ তজ্জন্য গৌরব করিয়া বেড়ান না। গৌরব যে জন্য, তাহা এই;—পাঁচুর সেই এক সেকেলে, বকেয়া, বুড়া, অকর্ম্মণ্য, কাজের বাহির "মা" নামক একটা স্ত্রীলোক হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হওয়ায় মাঝের একাদশীর দিন সমেত উপর্য্যুপরি তিন দিনে দুবেলা আহার পাইয়াছিল; চাহিলেও পাইবার উপায় নাই জানিয়া পাঁচু দায় চাহেন নাই।

(৪) পুষ্করিণী খননাদি। সে কথা বলাই বাহুল্য—পাঁচুর কাছে দু এক পয়সা ধার লইয়া দেখিতে হয়। যে ধার করে, পাঁচুর তাহার বাড়ীতে দ করিয়া ছাড়েন।

সুতরাং খোদ পঞ্চানন্দের তোপের বরাদ্দ!!! পাঁচু আহ্লাদে আটখানা তোপ তাহার মোহাড়া করিতে পারিল না পিছাইয়া পড়িল।

মিসেস পাঁচী ইহার মাহাত্ম্য বুঝিলেন না। অশিক্ষিতা, পাশছাড়া, বর্ণাকুলার পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ কি না! পাঁচুর পিছনে তোপের প্রকোপ দেখিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন, মুখে একমাত্র বুলি—হাঁ গা, খসে কিসে?

ইতি জুবিলি।

পাঁচুর পূজা।

ভারি মজা।

অপার মায়ার মায়া কে বুঝিতে পারে।
পঞ্চানন্দ ছাড়া এই ত্রিলোক মাঝারে॥
মাটী কন ভগবতী বাঙ্গালীর তরে।
ঘরে ঘরে দেখে লোকে বছরে বছরে॥

সেই সে সমান ভাব সেই বাঁধা ঠাট।
সেই বাঁশ সেই দড়ী সেই খড় কাট॥
সেই এক পরিবার মাঝে ভগবতী।
দক্ষিণেতে মহালক্ষ্মী বামে সরস্বতী॥
ঘরের বালক দুটি কার্ত্তিক গণেশ।
সিংহের বিক্রম সেই অসুরের ক্লেশ॥
দুখে সুখে এই ভাবে তিন দিন টেলে।
বাঁচেন মাটীর মা জলে দিলে ফেলে॥
তবুও তাঁহার ক্ষতি হয়নাক তত।
অসুর বেচারা ভোগে লাঞ্ছনা যত॥
সিংহের কামড় ছাড়া নহে এক তিল।
নাগপাশে বাঁধা দেখ আর এক মুস্কিল॥
বল্লমের খোঁচা সেই বুকে আছে মারা।
আগাগোড়া দাঁতখাঁমাটী করিয়া সে সারা॥
গেল বছরের পূজা শেষ হলে পরে।
দুর্গাকে মহিষাসুর কহিল কাতরে॥
রক্ষা কর মহেশ্বরী মানিতেছি ঘাট।
বদল করিয়া দাও এ বকেয়া ঠাট॥
বড় লজ্জা করে দেবি, পূজার সময়।
সত্য বলি আত্মঘাতী হৈতে ইচ্ছা হয়॥
সকলে আমোদ করে যাহার যেমন।
আমার খালাস নাই এই বা কেমন॥
অসুরের কথা দুর্গা শুনিয়া হাসিলা।
মনোগত ভাব দেবি পরে প্রকাশিলা॥
রে অসুর, দেখ যার যা থাকে কপালে।
অবশ্যই বিধিলিপি ফলে যথাকালে॥
তথাপি পরীক্ষাহেতু করিতেছি পণ।
এবার হইতে হবে নূতন ধরণ॥
যাহার যেমন ইচ্ছা চল সেই ভাবে।
বঙ্গদেশে জন্ম লই মায়ার প্রভাবে॥
দেখিগে কাহার ভাগ্যে কি প্রকার ঘটে।
অখণ্ড বিধির লেখা বটে কি না বটে॥

অদ্ভুত দৈবের লীলা দেখাবার তরে।
দলেবলে অবতীর্ণ বাঙ্গালীর ঘরে॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া সংসারের গতি।
বাবুর গৃহিণী নিজে হৈলা ভগবতী॥
কি করি দশবাহু দুই হাতে তাঁর।
পলে পলে সৃষ্টিস্থিতি জগৎ সংহার॥
গতিক বুঝিয়া এবে দেব লম্বোদর।
বাবুর সদরকীরূপে প্রবেশিলা ঘর॥
সবাকার অগ্রভাগ সাবেক সম্মান॥
ইষ্টদেবে ফে'লে তিনি আগে পূজা পান॥
ত্রুটি নাই কোন পক্ষে উন্নতি বিস্তার।
আগে ছিলা সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি মাত্রে ভর॥
হেথা আর সিদ্ধি নহে, নেশার যে রাজা।
সেহ না কলিকা পায় এমন যে গাঁজা॥
আফিম চরস চণ্ডু ছিটা গুলি ছার।
শুধুই শাম্পেন শেরি সুরার বাজার॥
বহু সাধনার ফলে সিদ্ধি দিত যেই।
সুধাদানে অকাতর দাতা কর্ণ সেই॥
দেখিয়া শুনিয়া তাই চতুর কুমার।
হইলেন গৃহিনীর বোন্‌-পো অবতার॥
তাই তাই ঠাঁই ঠাঁই কর্ত্তার বিচার।
গৃহিনী ভগিনী সুত তবু আপনার॥
কত ভাগ্যে ঘরে এনে এ হেন কার্ত্তিক।
তাহারে শিখাতে বিদ্যা কর্ত্তার বাতিক॥
পাঠশালে যত বিদ্যা আছে তাত আছে।
ঘরে পড়া দিতে গুরু ফেরে কাছে কাছে॥
কার্ত্তিকের কু-অভ্যাস ময়ূরেতে চড়া।
ঘরাও গুরুর ঘাড়ে চেপে লন পড়া॥
কি করেন সরস্বতী ভাবিয়া চিন্তিয়া।
জেনানা মিশনীরূপে উপনীত গিয়া॥
গৃহিনীরে বিদ্যা দেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উল।
ছুচের আগায় তোলা রকমারি ফুল॥

সাদায় কালীর দাগ বর্ণ পরিচয়ে।
ষোল কলা হয় বিদ্যা ক্রমে বোধোদয়ে॥
মহালক্ষ্মী হৈলা গিয়া কর্ত্তার জননী।
ঘুচাব চঞ্চলা নাম ভাবিলা আপনি॥
তাহাও কি হয় কভু যাহার যে রীত।
সুস্থির হৈতে গিয়া হৈল বিপরীত॥
পরিতে মিলেনা বাস, চুলে বাঁটে দড়ি।
স্নেহের অভাবে সদা অঙ্গে উড়ে খড়ি॥
কতক্ষণ তিষ্ঠে বল আপনি চঞ্চলা।
পলাই পলাই ডাক ছাড়েন কমলা॥
অসুর কসুর নাই কামনা করিতে।
ভাবিল কর্ত্তার রূপ হইবে ধরিতে॥
হইয়া গৃহের স্বামী অবতীর্ণ তাই।
মনে সাধ ঘুচাইব যতেক বালাই॥
থাকিবে না কোন জ্বালা নিজে হব প্রভু।
যা-খুসি করিব কেহ বলিবে না কভু॥
কিন্তু যা কপালে থাকে তাকি লয় হয়।
ঘুরে ফিরে সেই দেশ অদৃষ্টের জয়॥
যে ঘটিল অসুরের পূজার ব্যাপারে।
ত্রিপদীর ছন্দে পাঁচু কহিবে বিস্তারে॥

কর্ত্তা হওয়া সোজা নয়, বিস্তর সহিতে হয়,
অসুর তা বুঝে নাই আগে।
আনিয়া যোগাবে কর্ত্তা, যেন সরকারী কুত্তা,
সকলে ঘুমায় কর্ত্তা জাগে॥
তরু ধরে ফুল ফল, নিবিড় পল্লবদল;
আপনি করে না কিছু ভোগ।
তপ্ত জনে দেয় ছায়া, তোষয়ে জীবের কায়া,
নিজের উপায় যাগ যোগ॥
অপরে আশ্রয় পায়, তরু নিজে ঝড় খায়,
কর্ত্তাভাব জানিবে এমতি।
কর্ত্তাগিরি বারোমাস, নামে প্রভু কাজে দাস,
যারে তারে সু-কঠিন অতি।

এত যে উন্নত বাবু, তাঁরাও আছেন কাবু,
ঝোঁক ঝাঁক কমে নাই কিছু।
ভাই-পো সোদর ভাই, ইহারাই যেন নাই,
শ্যালী-পো সম্বন্ধী পিছু পিছু॥
তখন কর্ত্তার ভাই, ইদানী গিন্নীর তাই,
হরে দরে সেই হাঁটু জল।
সেকালে ভুগিত যেই, একালেও ভোগে সেই,
গোত্র ভেদ এই মাত্র ফল॥
মূল কথা ভুলে গেছি, বাজে কথা পেড়ে দিছি,
অম্বুরের হৈল কি তা বলি।
বিধির যা মনে সাধ, কার সাধ্য করে বাধ,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কি কলি॥
গৃহিনী রহিলা ঘরে, বাবু চাকুরির তরে,
কাটান বিদেশে বারো মাস।
ডাক যোগে সমাচার, আসে যায় বারে বার,
মাঝে মাঝে আসে ফরমাস॥
ছখানা সাবান চাই চুল বাঁধা ফিতে নাই,
হইয়াছে বড়ি পুরাতন॥
রিমিলের লাবেণ্ডার, নহিলে চলেনা আর,
উলের বড়ই অনাটন॥
টাটকা প্রেমের গল্প, মূল্য যার নহে স্বল্প,
বছরেতে বার খানা চাই।
দিন যেন কেটে যায়, নিশি যে বিষম দায়,
ভেবে দেখ কত আই ঢাই॥
পুরুষের যত কর্ম্ম, রাখিতে পৈতৃক ধর্ম্ম;
এক দণ্ড নাহি অবসর।
রমণীর কত জ্বালা, তাহে বিরহিনী বালা,
একাকিনী কেবল ফাঁপর॥
সদা পথ পানে চায়, আজিও এল না হায়,
লিখেছি যে কত কি পাঠাতে।
তবে কি সকলি ফাঁকি, কেমনে ধৈরয রাখি,
না পেলে পরাণ ধরি যাতে॥

এবার আসুক মেনে, কাণ যদি নাহি আনে,
অবলা বরণ শাটী আর।
মারি কিম্বা মেরে মরি, এ দুদিন প্রাণ ধরি,
তা বাদে নিশ্চয় একধার॥
স্কন্ধোপরি একশির, অসুরের চক্ষু স্থির,
এই মর্ম্মে শেষ চিঠি পেয়ে।
মহিষ মর্দ্দিনী ঘরে, কাঁপে হিয়া থর থরে,
কেন কর্ত্তা হৈনু মাটী খেয়ে॥
সেক্‌রার বানি বাকি, একা কোন্ দিক রাখি,
বকেয়া লেলান সিংহ সেই।
আবার এবার হায়, চাপায় নূতন দায়,
যেথা যাই সেথা করে ছেই॥
রক্ষা কর জগদম্বা, ঘুচেছে মনের আম্বা,
মাটীর অসুর ছিনু সোণা।
আর নাহি চাই ভিক্ষা, পেয়েছি বিশেষ শিক্ষা,
বাবু জন্মে হৈনু তুলো-ধোনা।
কোথা লাগে নাগপাশ, বিষম এ প্রেম-ফাঁস,
নিশ্বাস ফেলিতে বুকে বাজে।
শূলে বিন্ধে এক ঠাঁই, এবে যে নিস্তার নাই,
বাক্যে জর-জর মরি লাজে॥
সিংহের কামড় সয়, কিন্তু স্বর্ণকার-ভয়;
মরমের রক্ত শুষি খায়।
ত্রাহি ত্রাহি মহামায়া, এবার ছাড়াও কায়া,
কোন ভেড়ে কর্ত্তা হৈতে চায়॥
আঁখি আছে যার, দেখুক বাহার,
ভাবের প্রতিমা অই।
বুঝে না মরম, ভাবে না সরম,
সেই দুখে ম'রে রই॥
এইত উৎসব, ঘরে ঘরে সব,
নিতুই দেখি দুবেলা।
তবু যোটাইয়া, ভাব ঘটাইয়া,
করিতে হয়রে খেলা॥

প্রতিমা পুতুলি, আছে সব গুলি,
মাথায় নাইক চাল।
চাল চুলা দুই, রবে না কিছুই,
যাক্ যাক্ কিছু কাল ॥
আঁধারে বিজনে, ভাবি মনে মনে,
দেখ দেখ মিলাইয়া।
অমিয় বিশেষ, কত উপ দেশ,
পাঁচু দেয় গিলাইয়া ॥

পাঁচুর স্তব।

ধন্ত ধন্ত মহামায়া লাগিয়াছে ধুম।
তোমার কৃপায় মোর আক্কেল গুড়ুম।

মহান্ত আমার মানিনী রাই।

সূচ ? না সূচনা।

যাত্রার লেগেছে ধুম,
খোলে বাজি ঝুম ঝুম,
পাড়া-পড়্শীর নাইক ঘুম,
সবাই উঠছে জেগে।
ছুটেছে সব কোলের ছেলে,
ধাইচে সতী পতি ফেলে,
বাঁচবে যেন যায়গা পেলে,
যাত্রা শোনবার লেগে।
অধিক কি বোলব আর,
ছেলে বুড়ো নাই বিচার,
শুধ্ কাতারে কাতার,
চায়না পিছু পানে।
কেউ পোড়্ছে হুম্‌ড়ি খেয়ে,
তারি ওপরে যাচ্ছে ধেয়ে,
দেখ্‌চে না ছেলে কি মেয়ে,
মত্ত যেন গানে।

এত লোকের উতরোল,
আসরে শুধু সোর-গোল,
থেকে থেকে হরিবোল,
যাচ্ছে কেবল শোনা।
কেউ জানেনা কিসের পালা,
গোলেত কাণ ঝালা-পালা,
তুলেছে রব 'পালা' 'পালা',
তাতেই ভুলো-ধোনা।
দলের নাকি পসার ভারি,
মুলুক যুড়ে নামের জারি,
দেশস্থদ্ধ কাজেই তারি,
হোয়েচে যেন গোঁড়া।
সময়ের ফে'রে ভ্রান্তি,
বাইরে থেকে কোর্বে শান্তি,
বুদ্ধি নাই শিকি ক্রান্তি,
বাদ গোটা দুই ছোঁড়া।
এত গোল কি তাতে থামে,
শত গুণে বাড়্চে ক্রমে,
এমনি মজা আছে নামে,
ভেবে দেখ মনে।
তায় আবার কেউ কচ্চে সন্দ,
হোলনা কি ভাল মন্দ,
নইলে কোথা পঞ্চানন্দ?—
সুধায় জনে জনে।
সুতরাং—
(এই) নিশি শেষে দূতী বেশে,
দিতে হোলো দেখা।
(হবে) কার বা রোষ, কার পরিতোষ,
যার ভালে যা লেখা।
পালা আরম্ভ।
কিন্তু কোন পালা?
এরা ত বলচে "কাশী পালা,"

সেও যে বড় বিষম জালা।
কালার জালা সবে না কি সই?
সবে না কেন? সয়।
তেমন মহাশয়,
কেউ যদি হয়।
ব্যাকুলে কূল দেখালে,
হয়ত দুকূল রয়।
(দেখ) দুনয়নে ধারা বোয়ে
অঞ্জন গিয়েছে ধুয়ে
গঞ্জনে গঞ্জনে যায় প্রাণ।
(এখন) কলঙ্ক-ভঞ্জন হোলে
তবে থাকে মান।
কি বোল্লে? কলঙ্ক ভঞ্জন?
সেত আমার কর্ম্ম নয়।
যতক্ষণ ছিল সন্ধ,
পাল্লে পাত্তেন পঞ্চানন্দ,
এখন যে পূতিগন্ধ,
ঢাকা বিষম দায়।
রোটেচে কু সংবাদ, বেধেচে বিসম্বাদ,
সেধেচে বিষম বাদ, এখনও কি সাধ,
তোমার এ কলঙ্ক যায়?
যা নয়, তা হয় না,
তা ভেবোনা যা হবে না।
বরং বোলে শ্রীহরি
কর শ্রীহরি,
হরি করিলে কৃপা আর দুখ রবে না।
হোয়েচে ছিদ্র ঘটে,
বারি আনা তায় কি ঘটে,
নিবারিতে বারিধারা কারো কথা রবে না।

কলঙ্ক ভঞ্জনের ত কথাই নাই। সে আশায় সুসার নাই। তাই বলি যে কারে দেখা যাক্‌, যদি রয়—

মান।

প্রেমময়ী মোহান্ত রাধা,
পেতেছিলেন প্রেমের ফাঁদ।
কোথা থেকে ফুঁক্‌লে বাঁশী,
বঙ্গবাসী কালাচাঁদ।
শুনে বিষম বাঁশীর গান,
শ্রীমতীর প্রাণ আন্‌চান,
চকিতে চৌদিকে চান,
যেন দিশেহারা।
ধর, ধর, ধর সখি,
অকস্মাৎ হ'লো একি
কাতর করিল দেখি,
যাই যে প্রাণে মারা।
আমি চির দিন, প্রেমের অধীন,
প্রেমেই প্রবীণ হইনু সই।
শেষকালে কালা ঘটালে যে জ্বালা,
হ'য়ে কুলবালা কেমনে সই॥
গোকুলের সাধে বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়ে,
আসি নাই সখি শ্রীমতী সাজিয়ে,
ফেটে যায় হিয়ে কিসে প্রাণ জিয়ে,
প্রাণধনে যদি ছাড়িতে হয়।
যার তরে সাজা,
হ'লো কত সাজা,
তাই যদি সখি এখন না রয়॥
নবীন বয়সে দিয়েছে যে শিক্ষা,
এলোকেশী ভাবে লয়েছি যে দীক্ষা
এই ভিক্ষা করি তাহারি পরীক্ষা
দাও দাও সখি এবে দিতে দাও।
তায় যেন বাধা
পায়না তোমার রাধা
বুঝাইয়া ব'লো মোর মাথা খাও॥

পাঁচুঠাকুর।

রবে সতী নাম কিন্তু রবে শ্যাম
নাহি হবে বাম কেহ
র'বে দুই কুল, না হবো আকুল,
কুল কুল কোরে; প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥

কলঙ্কের ডালি কেউ না সাজাবে,
কলঙ্কের ডঙ্কা কেউ না বাজাবে,
কিছু নাহি যাবে, শ্যাম কুল রবে,
সু-রব সকলে গাইবে ৷
যে আছে গোকুলে, সতী সতী বোলে,
আমারে দেখিতে ধাইবে ॥

একি হ'লো দায়, সব দিক্ যায়,
এ সময়ে কেন বাঁশরী বাজায়।
আমারে মজায়, আপনিও যায়,
এর চেয়ে বলো, কি আছে বেজায় ॥

সাধে বারে বারে শাসাই লো তারে,
ভাসাইল প্রেম, ভাসাইল মোয়।
হাসাইল লোকে, মরি মরি শোকে
কি আর অধিক কহিব তোয়।

জানিতাম যারে ব'লে রসময়,
তার একি কাজ দেখি এ সময়,
অসময়ে বাঁশী হ'লো বিষময়,
বৃন্দাবনময় কলঙ্ক রটালে।
আর নাহি সয়,
প্রাণ যে না রয়,
অকালেতে কালা কি জ্বালা ঘটালে ॥

যাক্ যাক্ সখি, যাক্ যাবে প্রাণ,
বংশীধ্বনি যেন, বিন্ধে হৃদে বাণ।
চাহিনা লো আন, কিসে থাকে মান,
এবে সখি তার, কর হে বিধান ॥

আর ক'বো না কথা,
মরমের ব্যথা,
মরমে মরিয়ে রাখিব ঢেকে।
বলো বলো শ্যামে,
বিসর্জ্জন প্রেমে,
শিখেছে প্রেমদা প্রেম দায়ে ঠেকে।
আর যদি স্মরি
কখন শ্রীহরি
তবেই বাঁশরী
বাজায় যেন।
জন্মের মতন
ভুলিনু যখন
আর জ্বালাতন
করে তবে কেন।
বি হ সহিব,
বি.হ দহিব,
না পারি রহিতে
ভখিব গরল।
দিয়ে হাত শিরে
কার ভাব কিরে,
চাহিব না ফিরে
পশিব অনল॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

এত বলি মানময়ী বদন নামাইল।
মধুর মূরতি চন্দ্র মেঘে যেন ছাইল।
প্রেমময়ী রাই—
তোমার প্রেমের মুখে ছাই লো।
প্রেমময়ী রাই—
কতমতি সাধিয়ে দূতী তারে বুঝাইল।
শ্রীমতী মান ভরে আপনা মজাইল।

প্রেমময়ী রাই,
(তো'মার) প্রেমের মুখে ছাই লো,'
প্রেমময়ী রাই—
মানময়ী বুঝো কথা, মানে মজা নাই লো!
দাওলো যতন কোরে মানের গোড়ায় ছাই লো।
প্রেমময়ী রাই—
তোমার প্রেমের মুখে ছাইলো।

* * * *

* * * *

তখন, দূতী ইঙ্গিত ক'রে বোল্‌চেন—
আর বাঁশী বাজাইওনা শ্যাম।
একবার বাজায়ে বাঁশী
গেছে রাধার কুলমান—ইত্যাদি।

ভূমিকা।

অক্ষয় চন্দ্রের গৌরব--গ্রাবুতে (১)। পঞ্চানন্দের প্রতিপত্তি পঞ্চাশ লক্ষ প্রকারে। প্রতি বৎসর পূজার সময়ে প্রতিমার প্রকরণেই কত পসারের পত্তন হয়। এবারেও আবার তাই। সেই পূজা উপস্থিত, সেই প্রতিমা প্রস্তুত। এখন একবার দুকথা বলিয়া দিলেই বিদায় পাই; কিন্তু না বলিলে—নিস্তার নাই। পাঠক পাঠিকা পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না; পথ আর ঘর, ঘর আর পথ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও কলেবরা হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব আর না;—প্রকৃতমনুসরামঃ।

কথাটা কেহ বুঝিল না। ঐ ত দুঃখ। বুঝুক আর না বুঝুক, আমিত বুঝাইয়া বলি। তাহার পর, আমার কলমের হাত যশ, আর তাহাদের বুদ্ধির কপাল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সাকিন চুঁচুড়া, ভারি একজন সুলেখক। তাঁহার কবিত্বে যেমন কল্পনা, গাঁথুনিতে ততোধিক গুণপনা। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রথম পরিচয় কিসে পাওয়া গেল? তোমরা কেহ তাহা জান কি? বকেয়া বুড়ারা জানে না, কেননা কেহ বাঙ্গালা কখন পড়েন নাই। ছোকরার দল ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে, পরীক্ষার পেঁচপোঁচেই তাহাদের প্রাণান্ত,—তাহারাও সে খবর জানে না। বিদুষীরা এখন বিজ্ঞান লইয়া অজ্ঞান হইয়াছেন, উপবিদুষীরা উপন্যাসে অস্থির। বিদায় আর

---

(১) "বঙ্গদর্শনে" সেকালে সরকার মহাশয় "গ্রাবু" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

বাপ্তি লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিব্রত, বোডের হাতে পড়িয়া পাঠশালের পণ্ডিত পাগল। গুরেরা সভাসমিতিতে উন্মত্ত। পাড়াগেঁয়েদের পুঁজি কেবল পরচর্চ্চা। চাকুরের চব্বিশ ঘণ্টাই ঘোরে. তাহাদের পাশ করিবার অবসর নাই। যাহারা বকাব, তাহারা সকলেই উমেদার; আশার আশায় আসা যাওয়া সার করিয়া কোন কমে তাহারা কাল কাটাইতেছে। পবলিক্ সেস, রোডসেস্ ইত্যাদি সেসে সেসে কলেরই দফা নিকেশ; এদিকে হাজা শুখায় চাসার চরম দশা উপস্থিত।—এ সব লাকের কি সাধ্য যে, সাহিত্যের সংবাদ রাখিবে? দেশের এখন খুব চলতি, চারি-দিকেই চক্ষু স্থির; কাজে কাজেই যাহা শুদ্ধ সত্ত্ব সাহিত্য, তাহা ছাপাখানা ছাড়িতে না ছাড়িতেই চাপা পড়িয়া যাইতেছে। ফল কথা, কেহই জানে না যে, অক্ষয়চন্দ্রে এত যশ কোথা হইতে আসিল। কেহই জানেন না যে, অক্ষয়চন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি কোথায় প্রথম স্ফূর্ত্তি পায়।

সে সব তত্ত্ববার্ত্তা, সে গুহ্য কথা তোমরা কেহ জান না; আমি জানি। আর জানেন, পঞ্চানন্দের পাঁচ ইয়ার; চরাচর যাঁহাদের চিরদিনের চলতি, তাঁহারা ভিন্ন, সকল সমাচার রাখা সকলকার সঙ্গতিতে কুলাইবে কেন?

যাহা হউক, আমি বলিতেছি, অক্ষয়চন্দ্রের গৌরব গ্রাবুতে।

বঙ্কিম বাবুর তখন বাড়ন্ত দশা, বঙ্গদর্শন বুক ফুলাইয়া বঙ্গে বিচরণ করিতেছে। শুধু বাহবা বাহবা বলিতেই কত বাবুর গলা বসিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের বঙ্গ-দর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের গ্রাবুতে মজলিস্ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি কম কথা! আজও মনে হই ..গাটা কেমন করিয়া উঠে। অক্ষয়ের গ্রাবু; অথচ গ্রাবু হইতেই অক্ষয়। যশ এক প্রকার কাঁচা বিষ্ঠা; লক্ষ্য স্থির করিয়া লোষ্ট্র ক্ষেপ করিতে পারিলে, যিনি লক্ষ্য করেন, তাঁহার গায়ে লাগিবেই লাগিবে। গায়ে একবার লাগিলে সহজে ছাড়াইবার যো নাই; ছাড়াইতে গেলে মাখিতে হয়, তাহাতে সৌরভের গৌরব কেবল বৃদ্ধি পায়। অক্ষয়চন্দ্র গ্রাবুতে যশস্বী হইয়াছেন, সে যশ গোচা-রণে (১) গাঢ় হইয়াছে; নহিলে, গোড়ায় সেই গ্রাবু।

গ্রাবুতে অক্ষয়চন্দ্র গৃহস্থালী বুঝাইয়া দিলেন। লোকে বুঝিল যে বস্তুর মর্ম্ম, বস্তুর গায়ে মাখান থাকে না; মর্ম্ম থাকে মজ্জায়। লোকে শিখিল যে, খেলা, খেলা নয়; খেলার ভিতরেও খালি তত্ত্ব কথা। সেই দিন হইতে লোকের চক্ষু ফুটিল। লোকে জানিল যে, যাহা দেখি, তাহা নয়, আর একটু কিছু বটে। বেদান্তের বীজে অঙ্কুরের উদ্গম হইল। এ জগৎ, জগৎ নয়,—কেবল মায়া; আমি তোমাকে গালাগালি দিলাম, কিন্তু সেটি ভ্রম,—আমি ভ্রম, তুমি ভ্রম, গালাগালি ভ্রম, দেওয়াও ভ্রম। তাই ছাই যদি মনে কর যে, হাঁ তত্ত্ব কথা বুঝিলাম, ভ্রমই বটে; সেও ভ্রম;

(১) অক্ষয়চন্দ্রের একখানি পুস্তকের নাম 'গোচারণের মাঠ।'

তোমারও ভ্রমও ভ্রম। বাস্তবিক আমি আমি নই, ভ্রম মাত্র; তুমিও তুমি নও, ভ্রম মাত্র। কেবল তিনি, ভ্রম নন, তিনি তা, আমিও তিনি, তুমিও তিনি; সুতরাং সত্য কেবল, তিনি তা।

বেদান্তে যেমন, বেদেও তেমনি। সাদা কথায় লেখা আছে যে, একটী গাছে দুটী পাখী; তাহার মধ্যে একটী পাখী সেই গাছের ফল খায়, অন্য পাখীটা কেবল চাহিয়া দেখে। এই সাদা কথায় যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বেদ বুঝা যায় না। বেদ বুঝিতে হইলে বুঝিতে হয় যে, গাছ মানে গাছ নয়, জীবের দেহ; পাখী মানে পাখী নয়, আত্মা;—একটী জীবাত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। ফল মানে ফল নয়, ধর্ম্মাধর্ম্মের দরুণ যে সুখ দুঃখ হয়, সেই সুখ দুঃখ। জীব নিজের কর্ম্ম ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে; পরমাত্মা সঙ্গে থাকিয়া কেবল সাক্ষী হন। তবেই হইল যে গাছকে গাছ মনে করা, পাখীকে পাখী মনে করা, ফল খাওয়াকে ফল খাওয়া মনে করা,—এ সব ভ্রম!

বন্ধু, অর্থাৎ বন্ধুনীর স্বামী কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এমন সময়ে বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। বন্ধুনীর স্বামী যখন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দ্বার ঠেলন পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র, তাঁহার চক্ষু স্থির। বন্ধু তখন বন্ধুনীর স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন—"ভ্রান্তি"। সেই এক কথায়, সেই এক "ভ্রান্তি"তে তিন জনেরই চৈতন্য হইল। পরস্পরে বুঝিলেন যে, যেটি দেখি সেটি নয়, তত্ত্ব থাকে তলায়। তজ্জন্য গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

গ্রাবুতেও সেই গভীর গবেষণা। গ্রাবু গ্রাবু নয়, আদৌ খেলাই নয়,—সংসারের প্রতিকৃতি। তাসের ছবি, তাসের ছবি নয়,—গৃহস্থালীর লোকজন। অক্ষয় চন্দ্রের গ্রাবুতে লোকে বুঝিয়াছে—ভ্রান্তি।

সেই অবধি তরঙ্গ উঠিল, আর কি? সকল বিষয়ের, সকল কথারই ব্যাখ্যা বাহির হইতে লাগিল। ব্যাখ্যাই বা কত রকম। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আধিভৌতিক ব্যাখ্যা। মহাভারতে আছে, পাশায় হারিয়া পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীকে লইয়া বনে পলাইলেন,—সুতরাং ইহা সত্য নহে, মিথ্যা। ব্যাখ্যা হইল, পঞ্চ পাণ্ডব মানে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়; দ্রৌপদী মানে, মন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সব কেবল পঞ্চানন্দের পথ পরিষ্কার করা। ইহাতে আসল কথা বুঝাইবার সুবিধা হইয়াছে মাত্র। এত যে পূজার ধূমধাম উপস্থিত,—সে কেবল ভ্রান্তি। বাস্তবিক পূজা পূজা নয়, প্রতিমা প্রতিমা নয়, দেবতা দেবতা নয়, সে সব কিছুই নয়। ইহার ব্যাখ্যা আছে,—আধ্যাত্মিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, রাজনৈতিক নয়, আর এক রকমের ব্যাখ্যা। তাহার নাম—

মর্ম্মান্তিক ব্যাখ্যা।

পুরাণে দুর্গার পরিচয়, লক্ষ্মীর পরিচয়, সরস্বতীর পরিচয়, গণেশ কার্ত্তিক অসুর

সংহ সকলেরই পরিচয় আছে। রাবণের বধের নিমিত্ত, রামচন্দ্রের অনুগ্রহের নিমিত্ত, ব্রহ্মা অকালে বোধন করিয়া এই পূজা করিয়াছিলেন, ইহাও পুরাণে আছে। দুর্গোৎসবের ফলে শত্রুনাশ হয়, জয় লাভ হয়, আরও কতকি ফল হয়;—এ সমস্ত কথাই পুরাণে আছে।

অতএব ইহার সমুদয়ই মিথ্যা।

সেইজন্য ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা যে মর্ম্মান্তিক ব্যাখ্যা, পঞ্চানন্দ তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

প্রথমে পূজা।

স্বনাম পুরুষো ধন্যঃ, সুলব্ধ প্রতিষ্ঠ, বৌবাজারের পশুপতি সিংহ মহাশয়কে সকলেই জানে। উপাধি সিংহ, কিন্তু ব্যবহারে বড় ভাল মানুষ। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত মাছ খাইয়া যান, অথচ সিংহ মহাশয় স্বয়ং নিতান্ত নিরীহ বৈষ্ণব বলিলেই হয়। তবে স্ত্রৈণ নিশ্চয় বটেন। তা, একালে কেইবা কম?

সিংহ মহাশয়ের গৃহিণী কিছু প্রবলা। ছেলে বেলা অবধি, বাপের বাড়ীতেই পাড়া কুন্দুলী বলিয়া তাঁহার খোশ নাম ছিল। লোকে তাঁহাকে "কাপ্তানী" বলিত। সিংহ মহাশয়ের ঘরে আসিয়া ইনি যেমন শান্ত হইবেন, তাহা ত বুঝাই যাইতেছে। কিন্তু গুণও আছে, ইহা বলা উচিত। সকল দিকেই নজর; লোকের থাকে দুই চক্ষু, ইহার যেন পিছন দিকেও দৃষ্টি; কোন কিছু পাশাইয়া যাইবার যোটি নাই। দুই হাতে গিন্নী যে কাজ করেন, দশ হাতেও অন্যে তাহা পারে না। আবার ঝগড়া কোন্দলের সময়েও সেই দুইহাতের নাড়া দেখিয়া পাড়ার লোক তাঁহাকে "দশবাই চণ্ডী" নাম দিয়াছিল। এমন অবস্থায় ভালমানুষ সিংহ মহাশয় যে কোন বিষয়ে টু শব্দটী করিতে পারিতেন না, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয়কিছুই নাই। সেই সূত্রে অনেকে টেপাটিপি করিয়াগিন্নীকে সিংহবাহিনী বলিত। তাঁহাকে মানে না কেবল মহেশ্বর।

পশুপতির দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠ গণপতি, কনিষ্ঠ সেনাপতি।

গণপতি ভারি জাঁকালো লোক। খবরের কাগজের সম্পাদক, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যেন নখ-দর্পণ, সকল নৈবিদ্দিতেই আগে ঠোকর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের লোকে কাজ পড়িলে আগে তাঁহারই উপাসনা করে;—যেন তিনিই সিদ্ধিদাতা। মুখ মিষ্টি. শিষ্টাচার যেন মূর্ত্তিমান; অথচ সমালোচনা আর শাসানির ইঙ্গিতে কত গৃহচ্ছিদ্রের যে সূত্রপাত করেন, কত গুপ্তশয্যায় যে তুলোধোনা করিয়া দেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আর, নাক ত সর্ব্বত্রই। কোথায় কোন্ গলির ভিতর নর্দ্দমায় দুর্গন্ধ হইয়াছে, গণপতির নাকেতাহা আগে লাগিবে; কাহারও একটা কুৎসার

কথা রটিতে না রটিতে গণপতি তাহার প্রাণ পাইবেনই পাইবেন। গণপতি কিছু মোটা-সোটা মানুষ, তাই অনেকে বলাবলি করে যে গণপতির নাক, ত নাক নয়, হাতীর শুঁড়।

কনিষ্ঠ সেনাপতি কিটকাট বাবুটি। দেখিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তবে বিদ্যাসাধ্যির কথা বলিতে পারি না। জানিবার মধ্যে জানা গিয়াছে যে, ময়ূর ভালবাসিয়া মায়ের কাছে অনেক বার ময়ূরের দাম আদায় করিয়াছেন। কিন্তু ময়ূর কখন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ময়ূরের বাচ্চা আর মুরগীর বাচ্চা প্রথমে একই রকম দেখায়; সেনাপতি প্রত্যেক বারই ময়ূর বলিয়া মুরগীর বাচ্চা কিনিয়া আনেন, বড় হইবামাত্র যাই চেনা যায়, অমনি সেটিকে মারিয়া দেন; আবার মাকে ভুলাইয়া আবার তাই করেন। সেনাপতির বীরত্বের মধ্যে একবার বলণ্টিয়ার হইবার দরখাস্ত দিয়াছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে লাট সাহেব তাহা মঞ্জুর করেন নাই, এইমাত্র জানা আছে।

সিংহবাহিনীর পরিবার বলিতে এই চারিজন। ইহা ছাড়া দুইজন আত্মীয়ার পরিচয়ও দেওয়া আবশ্যক। একজনের নাম বিমলা, আর একজনের নাম চঞ্চলা।

তাহাদের সঙ্গে গিন্নীর কি সম্পর্ক, তাহা প্রকাশ নাই। তবে দুই জনেই গিন্নীর বাপের বাড়ীর দেশের বটে। এখানে বড় একটা কাহারও আসা যাওয়া নাই, তবে গণপতি খবরের কাগজ চালাইতে আরম্ভ করা অবধি বিমলাকে কখন কখন দেখা যায়। কেন না, বিমলা এদিকে খুব মজবুত মেয়ে, এম-এ পাস; পিয়ানো বাজাইতে, নাচিতে গাইতে, মুর্ত্তিমান বলিয়া নাম-ডাক আছে। কর্ত্তা কিন্তু বিমলা চঞ্চলা কাহাকেও দেখিতে পারেন না, অথচ গিন্নীর খুব ভালবাসা বলিয়া ভয়ে কথাটি কহিতেও সাহস করেন না। গণপতির খাতিরে বিমলা কখন কখন আসেন, চঞ্চলা প্রায়ই না; তাঁহার আবার বিমলার সঙ্গে "দা-কুমড়া" সম্বন্ধ। এদিকে সিংহ-পরিবারের চাল-চুলোরও অভাব। চঞ্চলার ত বিদ্যার সখ নাই, আসিবেনই বা কেন? আর আসিলেই বা মাথা গোঁজেন কোথায়? চঞ্চলার চাল-চলনেও বিলক্ষণ বড়মানুষি, কথাবার্ত্তার লম্বাই-চৌড়াই যথেষ্ট।

মহেশ শূর একজন খুব দুরন্ত দুর্দ্দান্ত লোক, কিন্তু এইবার কারে পড়িয়াছে। কেন না, তাহার কন্যাদায় উপস্থিত। কন্যাদায়ে কড়া মেজাজ ঠাণ্ডা হয়; উদ্ধত বিনয়ী হয়, বীর পুরুষেরও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, লাখপতির ভিটাতেও ঘুঘু ডাকিতে আরম্ভ করে। মহেশ শূর এ হেন কন্যাদায়ে পড়িয়া কাজে কাজেই কাবু হইয়াছে।

মহেশ শূর সিংহ-বাড়ীর নামও সহিত না। কিন্তু এখন আর উপায় নাই, কেন না

সিংহবাহিনী, যোড়া বেটার মা। চাল-চুলা নাই বটে, পসার-প্রতিপত্তি নাই বটে; পাড়া-কুন্দুলী বলিয়া সিংহবাহিনীর খোশনাম আছে, ইহাও সত্য! আর সিংহ মহাশয় ভেড়ারও অধম, তাহাও ঠিক। কিন্তু তা হইলে কি হয়? ঐ যে একযোড়া ছেলের মা,—একালে কি সহজ কথা!

মহেশ স্থর ইহাকে উহাকে ধরিয়া ভিতরে ভিতরে খোশামোদ জুড়িয়া দিলেন। কথা চলাচলি হইতে লাগিল। সিংহবাহিনীর মনে মনে রাগ ছিল, তিনিও এই রকম একটা সুযোগই খুঁজিতেছিলেন; কতক আশা দিয়া পাঠাইলেন যে, দর দস্তরে বনিবনাও হইলে কুটুম্বিতা না হইবেই বা কেন?

একটা দিন স্থির হইল। সিংহ-বাড়ী গিয়া মহেশ স্থর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিবেন।

এদিকে সিংহবাহিনীও সমর-সাজের আয়োজন জুড়িয়া দিলেন। বিমলা চঞ্চলা চঞ্চলকেই বলিয়া পাঠাইলেন। বিবাহের কথা অতি আশ্চর্য্য কথা; যাহার বিবাহযোগ্য পুত্র থাকে, সে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খাওয়াইতে পারে। বোধ হয় সেই জন্যই মহেশ স্থরের সেই ধার্য্য দিনে বিমলা চঞ্চলা উভয়েই একযোগে সিংহবাহিনীর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের মা সবই করিতে পারে।

যথাকালে মহেশ স্থর উপস্থিত। সিংহ-পরিবারের সমাবেশ দেখিয়াই তাঁহার দাতকপাটি লাগিয়া গেল। কিন্তু তখন অসহায়, নিরুপায়। যাহার কন্যা হইয়াছে, সেত বিধাতার শাপে সহজেই নাগপাশে বাঁধা, তাহার উপর সিংহ-বাড়ীর অন্তঃপুর হইতে নানাদিকে বাণবর্ষণ হইতে লাগিল। সোনা রূপাত তুচ্ছ সামগ্রী, চঞ্চলা যে হীরা মতি জহরাতের জয় দিয়া পাঠাইলেন, তাহাতে কুবেরকেও ফকির৷ লইতে হয়। তাহার উপর বিমলার বিদ্যাপূর্ণ বক্তৃতা-সকল চালিত হইয়া আসিতে লাগিল। স্বয়ং সিংহবাহিনী ত মহামায়া;—এমন মায়াজাল বিস্তার করিলেন যে, মহেশ স্থর পলাইবার পথ দেখিতে পাইল না।

একবার মহেশ স্থর নিজমূর্ত্তি ধরিবার যোগাড় করিয়াছিল! তাড়াতাড়ি কর্ত্তা গিয়া গিন্নীকে সংবাদ দিলেন যে, বুঝিবা সম্বন্ধ ঘটে না; মহেশস্থর সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; কথাবার্ত্তার ভঙ্গী বড় ভাল বোধ হইতেছে না!

তাহাতে কি আর তখন রক্ষা পায়? সিংহবাহিনী তখন সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছেন যে এই উপলক্ষে মহেশ-মর্দ্দিনী নামটীও লইতে হইবে। সিংহ মহাশয়কে কড়া হুকুম লিখিয়া দিলেন যে, কোন মতেই ছাড়া হইবে না; কার্য্য উদ্ধার করিতেই হইবে।

সে আজ্ঞার চাকর সিংহ মশায় তখন আর কি করেন? আসিয়াই মহেশ স্থরকে

জাপটাইয়া ধরিলেন। মরণ কামড় কামড়াইয়া বসিলেন। মহেশ শ্বশুরেরও দম রক্ষা হইয়া গেল।

* * * *

ইহাই দুর্গোৎসব! ঘরে ঘরে ইহারই পূজা হইতেছে। কেবল পুরাণের ভাষা স্বতন্ত্র, এইমাত্র।

যাঁহার যোড়া ছেলে আছে, তাঁহার চাল-চুলো না থাকিলেও চঞ্চলা তাঁহার সেবা করেন। বিমলা তাঁহার গুণগান করেন। কোন্দলে যিনি কাপ্তানী, পুরাণে তিনিই কাত্যায়নী। তিনিই হন অন্নপূর্ণা ত্রিনয়নী, তিনিই মহিষাসুর-মর্দ্দিনী। তাঁহারই অনন্ত গুণ, অনন্ত মায়া।

যিনি কুৎসিৎ, কদাকার, পরছিদ্রান্বেষী, পরমন্দকারী, তিনিই হন পুরাণে গণনায়ক, গণপতি। যিনি মুর্গী-মারা, জাতিকুলহারা, পুরাণের ভাষায় তিনিই ময়ূর-বাহন কার্ত্তিক।

চঞ্চলা আর বিমলা, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর পরস্পর বিবাদ ভুলিয়া যান, যদি যোড়া ছেলের মা পান।

আর অধিক কত বলিব? বরের বাজার এমনি হইয়াছে যে, নিতান্ত কাপুরুষ, পুরুষাধম, পশু অপেক্ষাও পশু, পশুর রাজা—পুরাণে তাহারই নাম সিংহ। পশুপতি গিন্নীর গোলামী করেন, অথচ তিনিও পূজা পান।

সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, লোকে একে একে সকলেই বলবীর্য্যহীন হইতেছে। ঘরে ঘরে নিরানন্দের কোলাহল উঠিতেছে, তবু বলা হয়—আনন্দময়ীর পূজা, বঙ্গে আনন্দের দিন আসিয়াছে।

এ যাত্রা আর পূজার ফর্দ্দ শুনাইব না। দুঃখ-বহ্নিতে হোমের মন্ত্র এবার উচ্চারণ করিব না। নরবলি হয় কেমন করিয়া, তাহাও বলিব না।

পঞ্চানন্দ অকালে বোধন করিলেন। রাবণ-বধ হইবে কি?

সন ১২৯৬ সাল।

সন ১২৯৬ সাল অদ্য শুভাগমন করিলেন। পুরা একটী বৎসর সংসারে বাস করিয়া, তাহার পর ইনি পঞ্চানন্দের স্কন্ধ ছাড়িবেন। বর্ষে বর্ষে তোমরা নূতন পঞ্জী সংগ্রহ করিয়া থাক, সুতরাং তোমাদের পক্ষে ইহা নূতন সংবাদ; কিন্তু প্রাচীন পঞ্চানন্দ এই পুরাতন তথ্য পুরাকাল হইতেই অবগত আছেন। সন ১২৯৬ সাল অদ্য আসিলেন, এক বৎসর তিষ্ঠিবেন; তাহার পর, তোমার

আমার সকলেরই যে দশা, তাঁহারও তাই;—সেই দেহান্তরপ্রাপ্তি। চাও না চাও, বিশ্বাস কর আর নাই কর, নিশ্চয় দেহান্তরপ্রাপ্তি। তবে এক বিষয়ে প্রভেদ আছে, তোমার আমার পাপপুণ্য আছে, ভোগ-রাগ আছে, যোগ-যাগ আছে, ১২৯৬ সালের সে সব কিছু নাই! তুমি-আমি ঠিক স্বধর্ম্ম পালন করি না,—হয় কঠোর তপস্যা করি, না হয় উৎকট পাপ করি—হয় অকালে কালপ্রাপ্ত হইব, না হয় কালের মাত্রা ছাড়াইয়া চলিয়া যাইব। ১২৯৬ সাল কেবল স্বধর্ম্ম পালন করিবে। অকপটে, বিনা বিচারে, বিনা তর্কে স্বধর্ম্ম পালন করিবে, করিয়া পরিতুষ্ট হইবে। তাই তাহার পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। হইবার মধ্যে হইবে, কালের বশে যথাকালে তাহার দেহান্তরপ্রাপ্তি। তোমার আমার যেমন, এই ১২৯৬ সালেরও তেমনি—দেহান্তরপ্রাপ্তি অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য।

আপনি আসিয়াছে।

সন ১২৯৬ সালকে কেহ ডাকিয়া আনে নাই, ডাকিতে গেলেও সে আসিত না, আসিতেও কেহ বারণ করে নাই, বারণ করিলেও সে মানিত না। আবাহন নাই; বিসর্জন নাই, অভ্যর্থনা নাই; অবহেলা নাই, কলঙ্কও নাই, মানও নাই। সে আপনি আসিয়াছে, আপনি যাইবে। আসা অনেকে দেখিল না, যাওয়াও অনেকে দেখিবে না; কিন্তু পঞ্চানন্দ জানেন, সে যেমন আপনা আপনি আসিয়াছে, তেমনি আপনা আপনি যাইবে। বাস্তবিক—

অমন লোক হয় না।

ঐ যে কালপুরুষ বোঝা মাথায় করিয়া স্থির-পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে, উনিই সন ১২৯৬ সাল—উহার মতন লোক আর হয় না। তমসাবৃত ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাই তাহার আকৃতি স্পষ্ট দেখিতেছ না; আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতির অনুমান করিবে, তাহার পন্থা পাইতেছ না। ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, অনিশ্চয়। দোষ, কালপক্ষে, কি তোমার চক্ষে, তাহা বলিয়া কাজ নাই; কিন্তু কালাবতারের মূর্ত্তি তোমার অন্তঃকরণের আয়ত্ত হইতেছে না। ভ্রূক্ষেপ নাই, কি ভ্রূকুটী আছে, তাহা তোমরা বুঝিবে না। ওমুখে হর্ষ কি বিষাদ, রোষ কি প্রসাদ, কান্না কি হাসি, খেদ কি খুসি, তাহা তোমরা কিছুই বুঝিবে না। আরও বুঝিবে না যে,—

বোঝায় কত মজা আছে?

পঞ্চানন্দের কথা শুন, বোঝায় সব আছে। বুঝিলে সবই আছে, না বুঝিলে কিছুই নাই। আছে অথচ তোমার জ্ঞানগম্য নাই। আছে জন্ম, আছে মৃত্যু, আছে বিচ্ছেদ, আছে মিলন,—সমস্তই আছে। তোমার আশা, তোমার আশঙ্কা ঐ বোঝাতেই আছে। লাভালাভ, শুভাশুভ, জয় পরাজয়, বোঝাতেই আছে। তুমি

ফিকিরই কর আর ফাঁকিই দাও, ফাঁকিতে সে পড়িবে না, ফিকিরে সে ফিরিবে না। তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, তাহার বোঝায় তোমার জন্য যাহা আছে, তাহা তোমাকে দিবেই দিবে।

ভাবিলে কি হইবে?

ভাবিও না, ভয় করিও না। বরং ভরসা কর, ভয় টুটিবে, ভাবনা ছুটিবে। ছুটাছুটিতে ফল নাই, সবুরেই মেওয়া ফলে। ধীর হও, স্থির হও, গম্ভীর হও। যেমন পঞ্চানন্দ, তেমনি হও। হাসি মুখে অগ্রে গিয়া সন ১২৯৬ সালকে আগাইয়া লও। তাহার বোঝা সে যেমন আপনি বুঝিবে, তুমিও তেমনি আপন বোঝাই বুঝিয়া রাখ। মাথা ঠিক না থাকিলে বোঝা ঠিক থাকে না, ঠিকরিয়া পড়িয়া যায়।

যে বুঝে না সে বর্ব্বর।

নহিলে এত তাড়াতাড়ি কেন? ফলত ঐ হাতে হাতে! চক্ষু চাহিয়া দেখ না কেন সকল পালোয়ানই পঞ্চানন্দের পিছনে পড়িয়াছেন। পাছে পড়িলেও দোষ ছিল না, কিন্তু পালোয়ানের দল পাছেও পড়েন, পিছনেও লাগেন। শেষে কেবল মুখ খিঁচ-কানি আর চক্ষুঃস্থির। এত যে চোগাচাপকান, চেঁচাচেঁচি, চটপটানি—তবু সেই সন ১২৯৬ সালের সামনে পড়িয়াই চক্ষুঃস্থির। কিন্তু বলিই বা কারে? বুঝেই বা কে? কিন্তু চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যদি চর্চ্চার গুণেও চৈতন্য হয়!

চাঁদ বদনীদের চেহারা।

আঁকা হয় নাই। তা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? একেত এই বেজায় গরম সহজেই প্রাণ যায় যায়; তাহাতে আবার মশার ভন্‌ভন আর সেই পিসি পোড়ানে দংশন। এখন যদি মশারির বহির্দ্দেশে নির্ব্বাসনের আদেশ হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে? পঞ্চানন্দের ত পাঁচটা মাথা নয়, যে চাঁদ-বদনীদের চেহারা এঁকে বছরের এই পহিলা দিনে প্রলয় ঘটাবেন? সকলই সহিতে পারেন—পাঁচু সেওয়ায় সেই সন্ধ্যা বেলা ছাঁচ তলায় দাঁড়াইয়া পাঁচীর সেই ছাঁচি পেঁয়াজ চৈচুনি! স্বাদ ত জান, তবে আর মিছা জ্বালাও কেন? তাতে আবার বিবিজান বিদ্বান হইতে বসিয়াছেন; বিদুষী নহে—বিদ্বান্; এখন আর গিন্নী নয়,—গুরু। সেকালে জেনানা পাশে বদ্ধ থাকিয়া অন্তঃপুরেই এপাশ ওপাশ করিতেন, তখন একবার পাশ কাটাইয়া পালাইতে পারিলেও প্রাণের আশা ছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পাশ, আর পোড়া কপালেদের সর্ব্বনাশ। আগে যা কিছু হইত সব অজ্ঞানে, এখন আগা গোড়া বিজ্ঞানে। কিন্তু কাজ নাই আর কুৎসায়, দিন যায় না ক্ষণ যায়; দুটা কাজের কথা কহা যাক। ভূমিকায় যিনি ভড়কাইয়া যান নাই, তিনি ১২৯৬ সালের—

নূতন পঞ্জিকা।

শুনুন। প্রথমে, পদ্যে পড়ুন।
পঞ্চাধিক নবতির আয়ু হইল শেষ।
ষন্নবতি আসিলেক শাসিবারে দেশ॥
মূর্ত্তি দেখে স্ফুর্ত্তি হীন লাগে ভেবা চেকা।
কেবল অটল বুদ্ধি পঞ্চানন্দ একা॥
কাতরে কহিছে সবে, করুণা করিয়া।
বছরে কি হবে প্রভু, বল বিবরিয়া॥
পাঁচু কন, পেঁচো পাওয়া বঙ্গেশ্বরগণ।
নূতন পঞ্জিকা ফল করহ শ্রবণ॥

অস্মিন বর্ষে—

দ্বাদশ মাস। তত্র কমি বেশি নাস্তি।
বিশেষতঃ দ্বাদশ মাসের ফল কথনং।
বৈশাখেতে বিড়ম্বনা, জ্যৈষ্ঠে জ্বালাতন।
আষাঢ়ে আশ্বাস নাই, শ্রাবণে তেমন॥
ভাদ্রে ভয়, আশ্বিনেতে আশা কিছু নাই।
কার্ত্তিকে কৃতান্ত ভয়, মার্গশীর্ষে তাই॥
পৌষ মাসে পিঠে খাবে, পেটে কিছু নয়।
মাঘ মাসে মহাকষ্ট হবে দেশময়॥
ফাল্গুনে ফেরার হৈতে যাহা বাকি রবে।
চৈত্রের চালানে চিন্তা তার কিছু হবে॥
বার মাস সমভাব হ্রাস বৃদ্ধি হীন।
পাঁচুর প্রসাদে কিবা রাত্রি কিবা দিন॥

পঞ্চানন্দ।

(সচিত্র নয় ;—এই বিচিত্র।)

(১)

অনেক কাল পরে কিনা, তাই কেমন বেরুতে একটু লজ্জা-লজ্জা করিতেছে। ভক্তদের জন্য ভাবি না, বরং ভাবি ভক্তাদের জন্য। ভক্তা, না, ভক্তানী ?—গোড়াতেই ব্যাকরণ-ঘটিত এই আর এক দুর্ভাবনা। লিঙ্গ-প্রকরণে বরাবরই একটু গোল হয়। তা, নাচার।

ভক্তাই হউক, আর ভক্তানীই হউক; ইঁহাদের জন্য একটু ভাবনা বটে। যেখানে ভাবনা, সেই খানেই ভয়ের কারণ। আমার একা নয়; ভয়ের কারণ উভয়েরই।

মনে করিয়াছিলাম, বাহির হইব না। কিন্তু গরমের দিনে গিন্নিরা পর্য্যন্ত ক্ষেপি-বার যোগাড় হইয়াছিল। জল পড়িয়াছে, তবুও ত কৈ ঠাণ্ডা হইল না। তবে আর মিছা কেন, বাহির হওয়াই ভাল। বরাবর পোড়া মুখ লুকাইয়া রাখিতে পারিব না। দশ দিন অগ্র পশ্চাৎ, ধরা পড়িতেই হইবে। তবে আপনা আপনি ধরা দেওয়াই ভাল।

একটা বড় দুঃখের কথা যে, ধরা পড়িতে একাই পড়িলাম; নহিলে, 'পঞ্চানন্দ' সবাই।

শব্দানন্দ, স্পর্শানন্দ, রূপানন্দ, রসানন্দ, গন্ধানন্দ—পঞ্চানন্দ নয় কে?

মজলিসের মাঝখানে বাইজির মধুর কণ্ঠধ্বনিও শব্দ; আর সমাজের সেই এক কোণে সুধাধার সুস্বরের যে তরঙ্গ উঠে, তাহাও শব্দ। কাহারও এ শব্দে, কাহারও সে শব্দে—আনন্দ ত হয়। তবে শব্দানন্দ নয় কে?

কোথাও স্পর্শানন্দ,—কোমল পাণিপীড়নে, কোথাও বা সম্মার্জ্জনী সাহায্যে পৃষ্ঠতাড়নে। তোয়াজের কিছু তফাৎ, কিন্তু সকল ঘটেই স্পর্শানন্দ।

সূর্য্যরশ্মি যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই যে গূঢ়তম গুহা আছে, তাহাও রূপের আলোয় আলোকিত হয়। বল দেখি ভাই,—আর দিদি-মণি তুমিও বলো, রূপের আলোয় আলো হয় কি না? তখন আর ফর্‌সা কি কালো, তাও কেউ বাছে না, তাই ত রূপানন্দ।

এইবার রস। কোন রসনা জাহ্নবী-জলে তৃপ্ত; কাহারও বা ব্রাণ্ডি-পাণিতে প্রীত। কারও রস উপনিষদে, কারও বা উপন্যাসে: কিন্তু বিদ্যার বশেই হউক, আর অবিদ্যার ত্রাসেই হউক, সব সুজনই রসিক। রসে যার আনন্দ, সেই ত রসানন্দ।

বাকি কেবল গন্ধ। ভ্রমরা যাতে অন্ধ। সহরের যত নর্দ্দামা চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু গন্ধ চাপা পড়ে নাই। সেকালে যেখানে পড়িয়া থাকিতে হইত, একালে কেবল তাহাই বন্ধ। সে ত কেবল আধারের এদিক ওদিক;—আধেয় যে গন্ধ, তাহা তেমনই আছে। আর তাহাতে আনন্দও আছে। নাক সিটকাইও না, আমি তোমার পরিচয় জানি; তুমি গন্ধানন্দ।

ভাজিয়া চুরিয়া বলিলে, এই কথাতেই প্রকাণ্ড পুঁথি হয়। কিন্তু ইষারায় সারা ভাল, আমি একা নই, সবাই—পঞ্চানন্দ।

(২)

বাহির ত হইলাম, এখন বলি কি? কিন্তু না বলিলেও চলে। যে রকম পাঁচি

পাটি দন্ত ওষ্ঠাধরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর কিছু না বলিলেও চলে। পঞ্চানন্দ বাহির হইল, ইহাতেই আনন্দে আটখানা। আহ্লাদে দাঁত বাহির করিয়া পাড়া শুদ্ধ পাগলে কেবল মুখে বলে,—ঐ গো পঞ্চানন্দ।

পসার এমনই যে, না বলিলেও চলে। বাস্তবিক যদি পসারের পুঁজি একবার জমিয়া যায়; তাহা হইলে তাই ভাঙ্গাইয়া এক পুরুষ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়। আমার ত এই বিশ্বাস। তবে পর চিত্ত অন্ধকার,—পরপুরুষের কথা বলিতে পারি না। আমি আপন কথাই বলিতেছি। আমি ত কারও পর-পুরুষ নয়, ব্যাকরণ খুলিয়া দেখ না কেন, আমি যে উত্তম পুরুষ।

(৩)

মুখ যখন খোলাই গেল, তখন কিছু বলাই ভাল। চারি দিকেইত রঙ্গ, কিন্তু কোন প্রসঙ্গ বলি? এক ধরো, ধর্ম্মের কথা; সে ত আমার কর্ম্ম নয়! নব ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, অধর্ম্ম,—এ সবেরই ত কথাই নাই; যারা বাপ পিতামহের সে বকেয়া হিন্দু ধর্ম্ম ধরিয়া আছে, তাহাদেরও যে দেখি মাথা গোল। তু দশটা সটীক দেখি। সুন্দর দাড়ী টীকে যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে উপদেশের প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু যেখানে কেবল মূল অর্থাৎ টীক নয়, সেই খানেই মূলে ভুল হইবার ষোল আনা শঙ্কা। হিন্দুর মাথা ঠিক রাখিতে হইলে, সটীক থাকাই ভাল। কিন্তু এই কথাই বলিতে গেলেই ঘরে ঘরে গণ্ডগোল।

(৪)

ধর্ম্মের কথা বলা হইল না। আর কিছু বলিব না কি? বলিবার বিস্তর আছে স্থূলে স্থূলে দেখিতেও কিছু বাকি নাই। এখানকার সভা-সমিতি বল আর সেখানকার সভা-সমতাই বল, সবই আমার দেখা আছে। তবে তারাও সামলে চলেন, আমিও সামলে বলি, এই রকমটা ইচ্ছা। কিন্তু আমি সামাল সামাল করিলে কি হয়, কর্ত্তারা যে ক্রমেই অসামাল হইয়া পড়িতেছেন। সে কালের কর্ত্তারা দ্বিতীয় পক্ষে, তৃতীয় পক্ষে সংসার করিতেন; তবু সংসারীর মতন সংসার চালাইতেও পারিতেন। এখনও সেই সংসার; কিন্তু সার হন কেবল গিন্নি; কর্ত্তাটী সং সাজিয়া সরিয়া দাঁড়ান। ইনি সং, উনি সার; কাজেকাজেই সংসারে এখন কেবল দ্বন্দ্ব সমাস।

(৫)

এ যাত্রা বড় একটা কিছু না বলিয়াও পাঁচের কোঠায় পৌঁছিলাম। এইটুকুই পঞ্চানন্দী। বিরহ বিরহের পর প্রথম মিলনে এই রকমই হয়। কথা কতই আসে, মন কতই ছুটে, কিন্তু মুখ কিছুতেই ফুটে না। কত সাধ হয়, তবু কথা জুটে না। তাই আজ এইখানেই ক্ষান্ত দিই। আমার মুখ-চন্দ্র মনে করিয়া তোমার মন-চকো

কিছুকাল চাহিয়াই কেন থাকুক না। তার পর যা, তাত জানই—বাঁচি যদি দেখা হবে।

পঞ্চানন্দের বিলাত যাত্রা।

[মুখবন্ধ;—নিজের এবং পরের]

ঠাট্টাতামাসা, হাসিখুশি, রসরঙ্গ, কোনও বয়সে, কোনও কালে, কোনও যুগে, কোনও মন্বন্তরে, কোনও কল্পে করিও নাই, করা ভালও নয়। এসব ভাঁড়ামি, ইতরোমি, পেজোমি;—কাজে কাজেই আমি ইহাতে ছিলামও না, এখনও নাই, ভবিষ্যতে থাকিব না। তোমাদের ভালর তরে বল্‌তেছি, কখনও কোনও একটা কথা উপস্থিত হইলে, হেসে উড়াইবার চেষ্টা করিও না। বেশ করিয়া তলাইয়া, কথাটার মর্ম্মস্থলে ডুব দিয়া প্রবেশ করিয়া, অগ্র পশ্চাৎ, এ-পাশ ও-পাশ, অধ উর্দ্ধ, অষ্টেপৃষ্ঠে ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিবেচনা করিয়া, মুখখানি পেঁচার মতন গম্ভীর করিয়া, কোষ্ঠবদ্ধ খোলশা উদ্যমের জন্যে কোঁৎ পাড়িতে হইলে যেমন মুখের ভাবটুকু উপস্থিত হয়, সেই ভাবটি আদায় পূর্ব্বক, তাহার উপর "মনে করো শেষেরো সে দিনো ভয়ঙ্করো" গোছের মনের অবস্থা ঘটাইয়া সর্ব্ব সাকল্যে মোটের মাথায় যেমনটি দাঁড়ায়, ঠিক সেই রকমে—তবে একটা কথার সিদ্ধান্ত কি মীমাংসা করিও। যেমন কথাই কেন পড়ুক না, স্থির, ধীর, গম্ভীর হইয়া, দু-মিনিটের যায়গায় দ্বাদশ মন্বন্তর লাগে সেও ভাল, ভেবো, উড়িয়ে দিওনা। হো হো করিয়া হাস্‌লেইত হয় না; আলোড়ন, বিলোড়ন, আলোচনা, বিবেচনা বিলক্ষণরূপে করাই কর্ত্তব্য। পাৎলা, হালকা, আলগা, লোকের মতন উপর উপর যা তা একটা বলিয়া, কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া উঠলেই হয় না, ভাবা চাই। বুঝ্‌লে কি না? ভাবা চাই। তা যেমন কথা কেন হৌক্ না।

[কথাটা কি?]

কথা আছে বৈ কি? একটা কথা উঠিয়াছে বলিয়াইত তোমাদিগে সাবধান করিয়া দিতেছি। নহিলে আমার কিসের মাথা ব্যথা? কথাটা কি জানো? বিলেত যাবার কথা উঠেছে। চিরকালই যেমন গিয়ে আস্‌চে, তেমন তরো বিলেত যাওয়া নয়। এবার ধর্ম্মের জন্য ধার্ম্মিক হিন্দু ষোল আনা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বিলেত যাবেন।—ঐ! অমনি হো হো করিয়া উঠিলে? শোনোই আগে কথাটা। এই যে এত গোড়া বাঁধুনি করিলাম, তার কি এই ফল হল না কি? মিরর্ বলিতেছেন—যাইবেন; কতকগুলি পরম ভাগবত, নিষ্ঠাবান হিন্দু-সন্তান এবার শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজার বন্ধে বিলাত যাত্রা করিবেন। মিরর্ কি, তা জানো ত? মিরর্ হইতেছেন একখানি খবরের কাগজ, সেই মিরর্ এই কথা তুলিয়াছেন, পাড়িয়াছেন, এখন তোমা-

পাড়া করিতেছেন। "বঙ্গবাসী"র মতন বাঙ্গালা কাগজে বাঙ্গালা আঁখরে বিলাত যাবার কথাটা বাহির হইলে, না হয় অবিশ্বাস করিলেও চলিত, মিথ্যা মনে করিলেও হইত। এত তা নয়, মিরর্ ইংরেজীতে জাহির করিয়াছেন যে, "অর্থডক্স্ হিণ্ডুজ" অর্থাৎ কি না অর্থদক্ষ হিন্দুগণ বিলেত যাবেন।

[অর্থদক্ষ কারে বলে ?]

এইটুকু আর বুঝলে না? বোঝা উচিত, বুঝিতে হয়। যে রকম দিন সময় পড়িয়াছে, ইংরেজীতে কতকটা দখল রাখা নিতান্তই দরকার। সেই বর্ব্বর, বে আড়া, বকেয়া, বেলেল্লা বামুন পণ্ডিতের মতন হইলে কি চলে? কিছু কিছু শিখতে হয়, নিদেন একটু আধটু জেনে শুনে রাখতে হয়। এই যেমন মেক্সমুলর্ বলিলে বাঙ্গলায় মোক্ষ মূলোর হয়, অর্থাৎ যিনি মোক্ষ বিষয়ে মূলোর সদৃশ; তেমনি অর্থডক্স বলিলে বাঙ্গলায় অর্থদক্ষ হয়। তার মানে,—অর্থ বিষয়ে যিনি দক্ষ; স্বার্থে, পরার্থে, পরমার্থে, সকল অর্থেই যিনি দক্ষ, কি না সুনিপুণ, তিনি হচ্ছেন—অর্থদক্ষ। যাঁর হাতে অর্থ আছে, আপন এক্তার মত যিনি ইহকাল পরকাল গড়িয়া পিটিয়া লইতে পারেন, তিনিই অর্থদক্ষ। তবেই, অর্থদক্ষ হিন্দু বলিলে বুঝিতে হয়,—সময়ের অর্থাৎ ঘোর কলির পরম হিন্দু। তা এরা আবার বিলেত যাবেন।

[বিলেত যাবেন কেন ?]

বিলেত যাবার বিস্তর এবং বহুতর কারণ আছে। এতদিন যারা বর্ণ না মেনে বিলেত গিয়েছিলেন, তাঁরা কেবল পুরুষত্ব দেখিয়েছেন; পুরুষার্থ ঠিক রাখতে পারেন নাই। চতুর্ব্বর্গ হচ্ছে পুরুষার্থ,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এবার যারা যাচ্ছেন, তাঁরা চার বর্গই মানেন। ধর্ম্ম মানেন, তা বলাই বাহুল্য, কেননা যাওয়াটাই বলিতে গেলে, ধর্ম্মের জন্য। ত্রিসন্ধ্যা? তা বাদ যায় না; পূজা? তা দেখনা কেন, ঘরের বিগ্রহ ত আছেনই, বাহিরেও, কারও কারও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা নাই, কে বল্লে? শ্রাদ্ধ? নিত্যই চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি না চটকাইয়া জলগ্রহণ হয় না; অতিথি সেবা?—কোনও তিথিই ফাঁক যায় না, রোজই অতিথি; শৌচ?—সে কথা না বলিলেও চলে, বাহ্যে অভ্যন্তরে; আচার?—হাঁড়ি দেখিলেই ত হয়। সংক্ষেপে বলি, ধর্ম্মের কথা অধিক বলিতে হইবে কেন? ধর্ম্ম রাখিয়াইত যাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে। অবশ্য, ধর্ম্ম ষোল-আনা জাহাজে রাখিয়া যাওয়া, আবার ষোল-আনা বিলেতেও রাখিয়া আসা, আঁকে আমলে শক্ত বটে; তা বোধ হয় কতক ধর্ম্ম জাহাজে রাখিয়া, বাকিটুকু বিলাতে রাখিয়া আসিবারই বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। মোদ্দা এদেশে ধর্ম্মরাখা হচ্ছে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। তার পর, অর্থ; বিবেচনা করিয়া দেখ, অর্থই অনর্থের মূল; বিলাত যাতায়াতে অনর্থের মূল অনেকটা নষ্ট হইবে, তাহাব সন্দেহ নাই। এইবার কাম; তা নাম-কা-ওয়াস্তে ত গমন নয়, কাম-কা-ওয়াস্তেই গমন। বাকি কেবল

মোক্ষ,—সেত হাতে হাতে। ভবের বন্ধন অনেক দিনের টানাটানিতে আল্‌গা হইয়াই ত আছে, এইবার অল্প অল্প টানিলেও মোক্ষ নিশ্চয়। কেমন হে? বিলেত যাবার হেতু পেলে কি না?

[যাওয়াই ভাল]

আসল কথা বলি শোনো। যে থাক্‌বে না, তার যাওয়াই ভাল। থাকিলে কেবল মায়া বাড়ে; যে যাবে তার শীঘ্র শীঘ্র যাওয়াই ভাল। নিতান্তই যখন যাবে, তখন যাওয়াই ভাল, যাক্—ধর্ম্ম ত থাকবে। আমাদের সেই বদনের কাণ্ডটা মনে আছে ত? যে ভুলো তোমরা—তোমাদের কিচ্ছুই মনে থাকে না! বদন যখন বেধড়ক মাতাল হয়ে উঠলো, নিধুখুড়ো বদনের নিৰ্দ্দম দোয়ারি করিতে লাগিলেন। বদন যদি বার ঘণ্টা মদ খায়, বারো ঘণ্টা কামাই দেয়, নিধুখুড়ো সে বারো ঘণ্টা কিছুতেই কামাই দিতে দেন না; পাঁচ দশজন ইয়ার জুটিয়ে এটা ওটা সেটা ঘটিয়ে বদনকে পোড়াচ্ছে, নিধুখুড়ো নিজেও বসে বসে পিণ্ড জ্বালিয়ে রাখ্‌ছেনই রাখছেন। আমি একদিন নিধুখুড়োকে ডাকিয়া বলিলাম, "বলি, খুড়ো! কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ছোঁড়াটাকে শোধরাবার চেষ্টে কিছু ত করবেই না, তার উপর অমন নাগাড়ও হয়ে বইয়ে দেওয়া কি ভাল কাজ হচ্ছে?" খুড়ো মুখখানি ভারি করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমরা ছেলেমানুষ, কিছু বোঝ না। ওটা জাহান্নমে যাবেই যাবে, ও বাপের পোষা লক্ষ্মীর বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুলের পচা নখের কোণাটি পর্য্যন্ত যতদিন থাকবে, বদন আমার ততদিন ঐ একটানা স্রোতেই ভাসবে; মাঝের মধ্যে যত বিলম্ব হবে, তত বেশী লোককে মজাবে। যত সত্বর ওর শুভযাত্রা হয়, ততই মঙ্গল। আমি কি সাধে ওর সঙ্গ নিয়েছি? দুরন্ত কাজ সারবার জন্যই আমার তাড়াতাড়ি। বদ্‌নাটা ও যাবেই, তা যাক্; বাকী কটা ত বাঁচবে।" তখন বুঝিলাম যে, বদন খুড়োর ওস্তাদিটে খুব উঁচু অঙ্গের বটে। সুতরাং আমিও সেই সুরেই রাগিণী দিয়া বল্‌তেছি যে—যিনি যাবেন, তাঁর যাওয়াই ভাল।

[পঞ্চানন্দ পথ ধরিলেন]

অতএব স্বয়ং শর্ম্মা পঞ্চানন্দ আপনিও পথ ধরিলেন; পাচু পরকে পথ ধরাইতে অগ্রসর হইলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন ত করুন, আমি নিষ্কপটে দেবতাদিগকে অনুমতি দিতেছি। পুষ্পবৃষ্টি করিতে দেবতাদের প্রবৃত্তি যদি না হয়, বোয়েই গেল। অন্যান্য যার যা বৃষ্টি করবার অভিপ্রায় হয়, সে তাই বৃষ্টি করুন। ফলে পঞ্চানন্দ চলিলেন। পিছু-পা কিছুতেই নন, বিলাতের বেলাতেই বা বে-গতিক হবে কেন? বিশেষ যখন "অর্দ্ধদগ্ধ" হিন্দু, "পরম" হিন্দু, এই পূজোর ছুটীতে ছুটনোন্মুখ হইয়াছেন, ভবসিন্ধু পারে যাইতে তরণীর তল্লাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন কাণ্ডারী ত চাই। অন্য সময়ে হইলেও বা যেমন হউক, পরমের দল যখন

পূজার সময়ে প্রস্থান করিতেছেন, তখন বরং পাঁচ । আগে থাকতেই পঞ্চানন্দের যাওয়া উচিত। পথিমধ্যে পঞ্চকালঘটিত পরামর্শ অনেক উপস্থিত হইতে পারে, তথায় পৌঁছিয়া নিশ্চয় পূজার আয়োজনও করিতে হইবে; পুরুত চাই, পাঁটা চাই— পঞ্চানন্দের না গেলে কি চলে?

[যেতে হবে জলপথে]

পঞ্চানন্দ পথের যোগাড় করিতে চলিলেন। জলপথেই যাত্রা, জাহাজের যোগাড়টাত করা চাই। জাহাজে জাত বজায় রেখে যেতে হবে, জিনিষপত্র সেই রকম যাতে হয় তার ভার এই শর্ম্মারই উপর। ব্যবস্থা যা করা হয়েছে, তা বলি। সব কাজ কাণ্টাক্ট বিলি করিয়া, টেণ্ডর তলব দিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার তালিকাই কেন দেখ না?

১। সিদ্ধি—(ভারতবর্ষীয় গবরমেণ্টের আবকারি বিভাগ হইতে।)

২। তুলসী গাছ—(নর্সারি হইতে। সটনের বীজ হইতে উৎপন্ন।)

৩। কুশ—(ঐ ঐ)

৪। কলাগাছ—(শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের।)

৫। শালগ্রাম শিলা—(অপুরিদের বাড়ী।)

৬। গঙ্গামৃত্তিকা—(বরণ কোম্পানীর কারখানার।)

৭। আতপ তণ্ডুল—(গ্রেট ইষ্টার্ণের টেবল রাইস।)

৮। কাঁচকলা—(পঞ্চানন্দের নিজের ঝাড়ের।)

কোশাকুশি প্রভৃতি অন্যান্য ফার্নিচার ঐ তল্পিতে আছে। পঞ্চানন্দ সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং, পশ্চাতে প্রধান চেলা। তারপর তল্পিদার, সঙ্গে একজন সেখো। সেখোটি সাহেব নয়, উটিও পরম হিন্দু। পাঁচবার গতিবিধি করিয়াছেন, পথের পরিচয়টা ভালই জানেন, লোকটিও অতি পবিত্র। পঞ্চানন্দ নিজে পরিচ্ছদে ঠিকই আছেন। তবে জাহাজে নাকি পা টলিবার কথা, তাই পাৎলুনটা পরিয়া লইয়াছেন, নহিলে পায়ে জড়াজড়ি লাগিয়া পড়িয়া গেলে, তখন তাঁকে আর পাবে কোথা? আর কাণ্ডারী কি না? সেই জন্যে নস্যির ডিবে ছেড়ে চুরুট ধরা হইয়াছে, পাছে হাত যোড়া থাকিলে তরী চালাইবার সময়ে বেচালে বানচাল হইয়া যায়; সেই ভয়। যাক, কাজ নাই আর বাজে কথায়, এইবার যাত্রা করা যাক্;—

দুর্গা। দুর্গা। দুর্গা। শ্রীহরি। শ্রীহরি। শ্রীহরি। দুর্গা শ্রীহরি। দুর্গা শ্রীহরি! দুর্গা শ্রীহরি।

মহিষাসুরের উৎপত্তি।

১। আগমনী।

এবার মা এলেন না।

শুধু ঠাট আছে; ঠাকুরাণী নাই। যথায় তিনি নাই, তথায় গণপতিও নাই, সেনাপতিও নাই, লক্ষ্মীও নাই, সরস্বতীও নাই। কিছু নাই। আছে কেবল পশুপতির প্রতিপত্তি, আর মহিষাসুরের উৎপত্তি। অতএব বলো—জয়! মহিষাসুরের জয়।

যার মা নাই, তার কেউ নাই। তার বিঘ্নবিনাশের আশ্বাস নাই, দৈববলে বিশ্বাস নাই। সে, ধন থাক্‌লেও লক্ষ্মীছাড়া, বিদ্যা থাক্‌লেও বে-আড়া।

পশু আসি তার হিয়া করে আক্রমণ।
মহিষাসুরের ভোগ যোগায় সে জন॥

এবার সেই দশাই ঘটেছে। কেন না, মা এলেন না। অতএব, মহিষাসুরেরই জয়।

মায়েরও দোষ নাই, আস্‌বেন কেমন করে? সবে চারিদিন ছুটী; আস্‌তে নিদেন ছুটি দিন, ফিরে যেতে ছুটি :

যাতায়াত মাত্র সার, তিলেক তিষ্ঠন ভার,
ইথে কি আসিতে চিত চায়।
সন্তান পাবে না সুখ, মায়ের মনেতে দুখ,
সমান দুদিকে হায় হায়॥

অতএব,

বহু কষ্টে পঞ্চানন্দ রচে আগমনী।
অন্য কেহ শুনিবে না শুন পঞ্চাননী॥

গীত।

(রাগ,—মনে মনে; তাল,—নরম জায়গায়।)

তো'র, এলনা গো উমা গিরিরাণী।
হোলোনা হোলোনা দেখা
সে চাঁদ বদন খানি॥
নয়ন জলে বার মাস,
ভাসি তবু ধরি আশ,
আসিবে, দুঃখ নাশিবে তারিণী।

মরি হায় একি দায়,
সিংহে মহিষে মিশে কোলে উমারে পাষাণী॥
অমঙ্গল পায়ে পায়ে,
অসুরে ভুলালে মায়ে,
মা বোলে তোর উমা ত আর আস্‌বে না।
বলো না একি ছলনা
চার দিনে আসা যাওয়া
কোর্‌বেনা তোর ঈশানী॥
তাই যদি উমা করিত,
ভবের বাস ভেঙ্গে দিত,
তার আসার আশা ফুরায়ে যেত—
কোথা হিত বিপরীত
বাড়ালে মহিষ মর্দ্দিনী
শুধু মহিষের মর্দ্দানি॥

২। পুরাণ প্রকরণ।

[পূজাপাদ শয্যাগুরু শয়নাচার্য্যের হাস্য অবলম্বনে পরম ভক্ত, আরে—ছি ছি—পরামাণিক কর্ত্তৃক মূল ঋগ্‌বেদ হইতে অনুবাদিত।]

অতঃপর ভগবান লোমশনন্দন কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বে অবস্থিতি করিয়া ভক্তি ভাবে কহিলেন, হে সত্যবতী-নন্দন সৌতিকেয়, আমি সেই পুণ্যময়ী বধূ বহিষ্করণ কথা শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম; যে হেতু পরের কুৎসা শ্রবণে চিত্ত স্বতঃই পুলকিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নারী জাতির যৌবন সুলভ কলঙ্ক-কাহিনী অতীব মনোহারিণী এবং তাহাতে সংসার ক্লেশ-দগ্ধ জীবের নিস্তারের একমাত্র উপায় বিহিত রহিয়াছে। এক্ষণ আপনি সেই পতিতপাবনী জেনানামিশনীর কৈলাস গমন বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করুন।

মহর্ষি কৃষ্ণ গুম্ফ কহিলেন, হে অনঘ। তুমি ধন্য; সেই পবিত্র কথা যিনি জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি কীর্ত্তন করেন, উভয়ে ইহলোক শ্লাঘ্য এবং পরলোকে মহার্ঘ্য হইয়া থাকেন। বিলাসবতী তনয়ের সমীপে আমি যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি। রাজ পুরোহিতের পুত্রবধূ অসামান্য রূপলাবণ্যবতী যুবতী প্রমদ্বরাকে পতিকুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, সেই লোকানন্দদায়িনী ত্রিকুলপাবনী জেনানা মিশনী কিয়ৎকালের নিমিত্ত লোকদৃ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। পুলীশ নামধারী রাজানুচরেরা নানা তীর্থে সেই পুণ্যবতীর অনুসন্ধান করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া স্ব স্ব স্থানে

প্রত্যাবৃত্ত হইল। ফলতঃ অপূর্ব্ব বুদ্ধিমতী জীব নিস্তারিণী জেনেনা মিশনী তখন কৈলাসে উপস্থিতা হইয়াছিলেন; রাজকিঙ্করেরা তাঁহাকে কোথায় পাইবেক? পরম রমণীয় কৈলাস ভবন মনোমত এবং নির্জ্জন স্থান বুঝিয়া জেনানা মিশনী সংপ্রতি সেই স্থানকেই স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিলেন এবং সহসা ভগবতী দুর্গার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুর্গা সেই জেনানা মিশনীকে দৃষ্টিমাত্রে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ভীত চমকিত এবং বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিভ্রম বিলাসিনি চারু-হাসিনি, আপনি কে, কোন স্থান হইতে আসিতেছেন এবং কি নিমিত্তই বা আগমন করিয়াছেন, তাহা আমাকে কৃপা পূর্ব্বক শীঘ্র কহুন।

জেনানা মিশনী কহিলেন,—হে দুর্গে তুমি বিব্রত হইও না। আমি তোমার হিতার্থেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। আমি শুনিয়াছি যে, তুমি অতিশয় সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী, এক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। হে বরারোহে, আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, তোমার পিতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং কর্কশ-স্বভাব, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে লোকে পাষাণ কহিয়া থাকে। তোমার যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রতি আমার সমধিক দয়ার উদ্রেক হইতেছে। তোমার কোন কোন বিষয়ে দুঃখ আছে, তাহা আমাকে বল। তাঁহাকে তখন মৌনাবলম্বিনী দেখিয়া সেই প্রিয়ম্বদা জেনানা মিশনী কহিলেন, হে গৌরি, তুমি নিরক্ষরা, তুমি অবিদ্যা, তুমি লেখা পড়া বিষয়ে অনভিজ্ঞা। তজ্জন্য আত্ম দুরবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত নহ। আমি তোমার অবস্থা তোমা অপেক্ষা অনুভব করিতেছি। তোমার পিতা পাষাণ, তাহা সত্য। নতুবা তোমার বালিকা বয়সে কি নিমিত্ত কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রেরণ করে নাই এবং কি নিমিত্তই বা তোমাকে বাল্য কালে এক বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সেই স্বামী উন্মত্ত এবং সিদ্ধিপায়ী এবং লেখা পড়া জানে না, ইহাও আমি শ্রুত হইয়াছি। হে দুর্গে! রমণীগণ বাল্যাবস্থাতে বিবাহিতা হয়, ইহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। বহু পতির স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক যে পতি মনোনীত হইবার উপযুক্ত, তাহাকেই পতিত্ব পদে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। যে প্রকার অতি সামান্য বস্ত্র বিপণিতে ক্রয় করিতে হইলে বহু বস্ত্র হইতে নির্ব্বাচন করিতে হয়, পতি বিষয়েও সেইরূপ করাই বিহিত। হে শুভে। অন্য বস্তু অপেক্ষা পতিই রমণীর সমধিক প্রয়োজনীয়। পতিভিন্ন রমণীর কোন মতেই তিল মাত্র চলিতে পারে না। অশন বসন অভাবে তাদৃশ ক্ষতি হয় না, যে মত পতির অভাবে হয়। রমণী চিরসেব্যা এবং পতি তাহার পরম সেবক, পতিই রমণীর ভৃত্য হইতেও ভৃত্য, দাস হইতেও দাস। অতএব হে সতি, হে বরাননে, তুমি তোমার সেই পাষাণ পিতার উপযুক্ত শিক্ষা দাও। তোমার সেই উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত কলিকাতা গমন কর। অথবা যদি তোমার বহু-মূল্য অলঙ্কারাদি থাকে, তাহা

আমাকে অর্পণ কর; আমি তোমাকে, হে সাধ্বি, বিলাত প্রেরণ করিয়া দিব। তাহাতে তোমার অধিকতর পুণ্য এবং যশের কারণ হইবে। পুরাকালে সাধ্বী মহিলাগণ এই প্রকার বিলাত গমন করিয়া অক্ষয় স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এক্ষণেও অনেক রমণী কুলধুরন্ধরা তন্মার্গাবলম্বিনী হইতে উদ্যতা হইয়া আছেন। হে অভাগিনি! তুমি তাহাই কর, যাহা তোমার চতুর্দ্দশ পুরুষের হিতের নিমিত্ত আমি উপদেশ করিতেছি।

উগ্রবুদ্ধি বৈকটেয় কহিলেন, হে তপোধন, সেই মনোমোহিনী জেনানা-মিশনীর অমৃত-নিস্যন্দিনী বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া দুর্গা তদীয় সাধু প্রস্তাবে সত্বর সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না। যে-হেতু চিরাগত সংস্কার তদীয়া শুমতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ হইল। হে শুশ্রূষো সংস্কাররূপ প্রাচীর অতীব দুর্লঙ্ঘ্য নিতান্ত সাহসী কুলপাবন ব্যতীত অপরে তাহা সহসা উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না।

লোমশ-নন্দন এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত, দুর্গার এইরূপ কুসংস্কার দৃষ্টে জেনানা-মিশনী কি করিলেন—কৈলাসে রহিলেন অথবা প্রত্যাগমন করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার নিরতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

মহর্ষি গার্গীপুত্র কহিলেন, বৎস বিকল হইও না, রাজপুরোহিতের পুত্রবধূ বহিষ্করণ জন্য রমণী কুলশোভনা সেই জেনানা-মিশনীর তৎকালে লোকালয়ে প্রবেশকরা অবাঞ্ছনীয় ছিল, তাহা তোমার অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই নিঃস্বার্থ পর-হিতৈষিণী জেনানা-মিশনী তজ্জন্য কৈলাস পরিত্যাগ করিলেন না। অপিচ অভাগ্যবতী ভগবতীর কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করিতে যত্নশীলা হইয়া দুর্গাকে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং সদাশিবের ভিক্ষার ঝুলি ঝাড়িয়া তণ্ডুল বিক্রয় পূর্ব্বক দুই টাকা সংগ্রহ করিয়া মণি অর্ডার যোগে প্রেরণ করিলেন এবং দুর্গাকে "প্রাণদায়িনী" সংবাদপত্রের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্তা করিয়া দিলেন। এইরূপে হে সত্য-সন্ধ, দুর্গার বিদ্যা দিন দিন লম্ফে লম্ফে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কিয়ৎকাল অন্তরেই দুর্গা উত্তম উত্তম নবেল-গ্রন্থ সকল অধ্যয়নে সমর্থা হইলেন। হে বেদ-বিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ! এই সকল নবেল-গ্রন্থ অধ্যয়ন করা রমণীকুলের অতীব কর্ত্তব্য। ইহা পাঠ করিলে রমণীগণ সদ্যোমুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহার ফলে রন্ধন করিতে হয় না—অন্নাদি স্বয়ং প্রস্তুত হয়; গৃহ-কর্ম্ম করিতে হয় না, অশিক্ষিতা প্রাচীনাগণের দ্বারা স্বতঃই তাহা নিষ্পন্ন হয়; গৃহাবরোধক প্রাচীর সকল ভগ্ন হইয়া যায়, লোকলজ্জা থর-থরায়মান, গুরুজন ম্রিয়মাণ, পতিভক্তি টল-টলায়মান প্রেম-পীযুষ অন্তঃকরণে ঢলঢলায়মান হয়, নারীগণ পরাধীনা থাকে না, সম্পূর্ণ স্বাধীনা হয়। হে ধ্রুবন্ধর, যে সকল সংস্কার সর্ব্বদোষের আকর, তাহা এই সকল নবেল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংস্কার বশতঃই স্ত্রীগণ সন্তান প্রসব করে, পুরুষগণ প্রসব করে না। ফলতঃ পুরুষগণের

সংস্কার হইলে তাহারা ও কালে প্রসব করিতে পারে ইত্যাদি তত্ত্বের সূক্ষ্ম মর্ম্ম নবেল-গ্রন্থেই সুলভ।

মহাপ্রাজ্ঞ কাপেয় এতৎ শ্রবণানন্তর নিরতিশয় কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক করপুটে কহিলেন, হে বিশাল বুদ্ধি, আমি আপনাকে সবিস্তার বর্ণন করিতে বলিয়া অতীব কুকর্ম্ম করিয়াছি। যে-হেতু আমার পর্ব্বত সদৃশ ধৈর্য্য এক্ষণ বিচলিত হইতেছে, আর কোনমতে সহ্য হইতেছে না, আপনার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হইতেছে। অতএব হে জ্ঞান-ধন, আমাকে আর কিছু না বলেন সেও ভাল। কিন্তু নিতান্তই যদি না বলিয়া না ছাড়েন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া সংক্ষেপে এক নিঃশ্বাসে বলুন।

সৌতি কহিলেন, সেই বিচিত্র বক্তা গাধীসুত তখন সংক্ষেপে যাহা ব্যক্ত করিলেন, হে বৈশম্পায়ন, আমি তাহা যথাবৎ কহিতেছি, অবধান কর।

দুর্গা একদিন বিজ্ঞাপন দেখিলেন—"অসম্ভব কিছুই নহে। কিন্তু জুয়াচোরদের প্রলোভন-জনক বিজ্ঞাপন দেখিয়া আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ আগুন চাপা থাকে না নিজ গুণেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদের এই অত্যাশ্চর্য্য অত্যদ্ভুত—

পাগলের ঔষধ

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

অধিক নহে একবার মাত্র। শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ অসংখ্য অসংখ্য নরনারী এই ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে, কাহাকেও একবারের বেশী দুইবার লইতে হয় নাই। যিনি একবার লইয়াছেন, তিনি আর ফিরিয়া আইসেন নাই। আরও আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের ঔষধের গুণে হয় সারে, নয় মরে।

কিন্তু রোগ আর থাকে না ইহা নিশ্চয়। গুণের কথা নিজ মুখে অধিক বলা ভাল নয়; তথাপি আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা একেবারে গোপন করিতে পারি না। আমরা জানি, এই ঔষধের জন্য অনেকে পাগল হইয়াছেন; অনেকবার অন্নবস্ত্রের অভাব মোচন হইয়াছে,—বস্ত্রের প্রয়োজন মোটেই হয় না, অন্নের কদাচিৎ, বিধবার পতিশোক থাকে না,—বাহির .....অপেক্ষা মাত্র। কত বলিব? নির্ধনের ধন হয়, ইহা আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইতেছি।

একটীবার লইয়া দেখুন।

বিশেষতঃ পূজার সময়। বিস্তর লাভ হইবে, লইয়া দেখুন। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, ভাল হইবেই হইবে। অজ্ঞানের জ্ঞান লাভ হইবে। আমাদের এই ঔষধ লউন, আর কিছুই লইতে হইবে না। মা বাপ, ভাই ভগিনী, আত্মীয়

স্বজন, কাহারও জন্য কাপড় চোপড় লইতে হইবে না। যাঁহারা এই ঔষধ লইয়াছেন, পূজার বাজারে ওরকম আর কিছুই তাঁহারা লয়েন না, ইহা আমরা নিত্য দেখিতেছি। বাগাড়ম্বর করিতে চাহি না, একবার লউন, লইলেই টের পাইবেন

কিন্তু সাবধান।

আমরা ভিন্ন অন্য জুয়াচোরের কৃত্রিম বিজ্ঞাপনে ভুলিবেন না। আমাদের ট্রেড মার্কা একখানি বাঁশ দেখিয়া লইবেন। বিজয়াদশমীর পূর্ব্বে লইলে বিশেষ সুবিধা—

উপহার।

১ খানা বাবু-ধাক্কা—বাবুর বাপের গলাধাক্কা—বাবুর মায়ের ঘাড়ধাক্কা—ঘরদুয়ার ছেড়ে—পাছা-পেড়ে সাড়ী। এভরি-বডিকে নো-বডি করা—রস্তা দেখানে—"বডি"টা। ১ বোতল গুরুগঞ্জনাসারিণী দীন-দুঃখীতারিণী কেশপ্রসারিণী গন্ধে পাড়া আমোদিনী তেল। আর বাবুর নিজের জন্য

ডসনের জুতা।

সেকেণ্ডহেণ্ড, কিন্তু বাজে সমানই হইবে।

মূল্য অতি অল্প।

পাঁচসিকা মাত্র। সন্ধিপূজার আগে লইলে সিকি। ভিঃ পিতে চারি আনা বেশি।

হরিভক্ত সাধু কোং।"

বিজ্ঞাপন পড়িয়া দুর্গা'র আর আনন্দ ধরে না। স্থির করিলেন যে "পাগলের ঔষধ" আনাইয়া শিবকে খাওয়াতেই হইবে। তবু "সারে, না হয় মরে" এইটুকু ভাবিয়া একটু সংশয় হইল। জেনানা-মিশনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁগা গুরু মা, কি করি বলো দেখি?"

তিলার্দ্ধ সংকোচ না করিয়া "গুরুমা" উত্তর দিলেন—"এক্ষুণি। সারে; ভালই মরে, আরও ভাল। যথার্থ বোলচি ইতস্তত করো না, ফেরৎ ডাকে ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে লেখো।"

যে কথা, সেই কাজ। ঔষধ আসিল। শিবের মরণ নাই; কাজে কাজেই ক্ষেপামি সেরে গেল। অজ্ঞানের জ্ঞান সঞ্চার হইল। তাহার উপর "গুরুমা" ঘরে এবং উত্তম অর্দ্ধাঙ্গিনী ঋগ্‌বেদ থেকে বোধোদয় পর্য্যন্ত ঠাস্ বোঝাই। বাকি কেবল শিব নিজে; সেত বাজে আধখানা। বানিয়ে নিতে বড় বিলম্ব হইল না, শিব বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন।

৩। বিলি ব্যবস্থা।

একদিন আষাঢ় মাসে, রথ-যাত্রার পরেই,—এখন ত আর সে সাবেক শিবত্ব

নাই, এখন সকলেই সভ্যভব্য হ'য়েচেন—চুলোর মুখে, সন্ধ্যা বেলা সপরিবারে বসিয়া খোশগল্প হইতেছে। চুলোর মুখে বসা, সভ্যতার একটা বাঁধা ব্যবস্থা; বিলেতে সবাই বসে। শিব, বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতেছেন, মধ্যে মধ্যে বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন, ক্ষণে বা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। দুর্গা, শিবের এক পাটি ছেঁড়া মোজার মুড়ি সেলাই করিতেছেন। "গুরুমা" হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া কাশ্মীরি খেম্‌টা তালে "মনে করো শেষেরো সে দিনো ভয়ঙ্কর" ধরিয়াছেন। গণেশ একপাশে জয়ার গালের কাছে শুঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুস ফুস করিয়া কি বল্‌তেছেন, আর জয়া মুখে রুমাল দিয়ে হাস্‌চে। কার্ত্তিক যেন বিজয়ার সঙ্গে একটু বেলেল্লাগিরি করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। ফলে মজলিশ পুরা। সভ্য, নির্দ্দোষ, গার্হস্থ্য আমোদ যেমন হইতে পারে, তাহাই হইতেছে।

এমন সময়ে দুর্গা হঠাৎ মুখ তুলে ডাক্‌লেন—"নন্দী?"

দরজার বাহিরেই পর্দ্দার ঠিক ওপিঠেই বসিয়া নন্দী কি একটা সেলাই করিতেছিল। তলব মাত্রে প্রবেশ করিয়া, মাথাটি নোয়াইয়া যোড় হাতে বলিল—"হুজুর।"

দুর্গা একটু হিন্দী করিয়া—কেননা, খান্‌সামাদের সঙ্গে বাঙ্গালা কথাটা সভ্যতার রীতি-বিরুদ্ধ—নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে-রে, এই সময় আমরা একবার বাঙ্গালায় যেতাম না?"

হিন্দী আমাদের আসে না; বাঙ্গালাতেই বলিয়া যাই।

"খোদাবন্দ! সেত সেপ্টেম্বর, অক্টোবরে, এখন নয়।"

দুর্গা বলিলেন—"বহুৎ আচ্ছা।" নন্দী সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহিরে গিয়া সূচ সূতা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিল।

শিব একটু হাসিয়া বলিলেন—"সে যে পূজার ছুটিতে।"

দুর্গা। তাই বটে, সময়টা ঠিক আমার মনে আস্‌ছিল না। বর্ষার কাছাকাছি, তাই মনে হচ্ছিল।

গুরুমা। পৌত্তলিক কাণ্ডে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। এবার কোন মতেই যাওয়া হোতে পারে না।

দুর্গা। আমিই প্রায় যাচ্ছি!

গণেশ। আমার ত যাবার ইচ্ছা থাক্‌লেও ফুর্‌সুৎ নেই। সেই সময়েই আমাদের শোশ্যাল কন্‌ফারেন্স বোস্‌বে।

কার্ত্তিক। আমিত টেঁক্যো বেঁধেছি, কুকেরা অর্দ্ধদক্ষ হিন্দু টুরিষ্ট পার্টি অর্গেনাইজ কোচ্চে, আমি এবার ছুটিতে বিলেত বেড়িয়ে আস্‌ব।

শিব। ভাল কথা, তোমাদের কনফারেন্সে সহবাসের বয়সের কি কোচ্চো বলো দেখি?

গণেশ। আমিত বোধ করি যে, নিদেন এক ছেলের মা না হ'লে সহবাসে সম্মতি দিতে পার্ব্বে না, এই নিয়ম হওয়া উচিত। বারো চোদ্দ কি ষোল বছরেও আমি নিরাপদ মনে করি না। তবে কি না ভোটের কাজ, ভোটে যা হবে, তাইত হবে।

শিব। তুমিই ত গণপতি হে। তোমার দলেই ত যারা মানুষের মতন, তারা সকলেই আছে?

গুরু মা। লেডীদের সামনে, নয় ওকথাটা এখন নাই হ'লো।

ঝাঁ করিয়া অমনই গল্পটা ফিরিয়া গেল। আবার পূজার কথা; পূজার কথা হইতে পথের কথা, যাতায়াতের অসুবিধার কথা, আলোচালের নৈবেদ্যের কথা,—নানান কথা আরম্ভ হইয়া গেল। স্থির হইল যে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যাওয়া হইতেই পারে না। কার্ত্তিক মাসে যাওয়াই স্থির।

শিব যে এখন সওদাগর হইয়াছেন, সে কথাটা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। বড় গোছের একটা ডিসপেন্সারি করিয়াই শিবের কিছু সংস্থান হইয়াছে, ব্যবসা-বুদ্ধিটাও খুব পাকিয়া উঠিয়াছে। শিব প্রস্তাব করিলেন যে, বুড়া ষাঁড়েত কোন কাজ হয় না, ওটাকে কসাইদের কাছে বেচিলে হয় না? দুর্গার তাহাতে আপত্তি নাই, তিনি এখন পাকা গৃহিণী। সিংহটা কোথাও বিক্রী হয় কি না তাই ভাবিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে ব'ললেন, "আমাদের ঘরে ঘরেই একটা 'জু' হইতে পারে,—এত জানোয়ার আমাদের আছে।"

কথোপকথন এইরূপ হইতেছে, ষাঁড়টা কুটীর দাওয়াতেই চরিয়া বেড়াইতেছিল, পরামর্শটা শুনিতে পাইল। তবু শিবের ষাঁড়, বুদ্ধিশুদ্ধি একরকম আছে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালেই মিউনিসিপাল আফিসে গিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গেই ময়লার গাড়ীতে অনরারী বাহাল হইয়া গেল। ষাঁড় ঠিক ঠাওরাইয়াছিল যে, এক ত' অনরারী পদটা ভাল, তা যাই কেন হউক না। তাহার উপর নির্ব্বাচন-প্রণালী যখন প্রচলিত আছে, কালে মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান হইয়া অনরারী রাজাগিরির ভরসা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। শিবের পাল্লায় থেকে শেষে কসাইয়ের হাতে প্রাণটা কেন যায়?

ষাঁড় ত সটান সট্‌কান দিল। সিংহও বুঝিল বেগতিক, সেও প্রস্থান করিল। কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে মহিষাসুরের কাছে গিয়া উপস্থিত।

সিংহকে দেখিয়াই ত মহিষাসুরের চক্ষুস্থির। ভাবিল—"বেটা এবার এত সকাল সকাল ধোর্ত্তে এল কেন?"

মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া মহিষাসুর সিংহকে সমাদরপূর্ব্বক বসিতে দিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর মহিষ বলিল—"দেখুন সিংহ মশাই, অনেক দিন

থেকে একটা কথা আপনাকে বোল্‌বো বোল্‌বো মনে করি, তা বলবার সুযোগটা হৈয়েই ওঠে না।"

সিংহ অমনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"হান্‌ কি। বলই না!"

মহিষ। বলি, তাই বোল্‌চি যে আপনার ত দেখা পাবার যো নাই। যা দেখা সেই পুজোর কটা দিন।

সিংহ। তা বৈকি? ফুরসুৎ ত নেই।

মহিষ। আপনারা বড়লোক, বড়লোকের কাছে থাকা। আপনাদের কি ফুরসুৎ হয়? তা সে পুজোর কদিনও না-দেখারই মধ্যে। আমায় কামড়ে আপনারও সে কদিন মুখ যোড়া থাকে, আর আমার ত কথাই নেই।

সিংহ। তা বটে হে! তোমার ত অসুখ বটেই, আমারও ত সুখ নেই।

মহিষ। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অসুখ। অসুখ যা তা আপনারই। দেখুন কত নৈবিদ্দি, ভোগ-রাগ, লুচি, সন্দেশ, পাঁটা, মোষ,—তা আপনার ত কিছু করবার যো নেই। সেই আমার হাতে কামড় মেরেই মুখবুড়ে বসে থাক্‌তে হয়, গিলতেও পান না, ওগ্‌লাতেও পান না। সত্যি বলচি সিংহ মশাই আপনার জন্যে আমার কান্না পায়।

সিংহ। হাঁ হে, তুমিত বড় ভাল লোক দেখচি। এমন তরো লোক তুমি জানলে যে তোমার একটা—তা আমায় দিয়ে তোমার কি উপকার হোতে পারে বল দেখি?

মহিষ। দেখুন দেখি আপনি মনে কল্লে কি না হোতে পারে? আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

সিংহ। বলই না, কি কত্তে হবে? তাই করা যাবে এখন।

মহিষ। তা কি কর্ব্বেন?

সিংহ। কর্ব্বো না কেন? বলো।

মহিষ। বোল্‌চি কি, আপনি আমায় ছেড়ে পারেন?

সিংহ। তা কেমন কোরে হোতে পারে?

মহিষ। আজ্ঞে আমিওত তাই বোল্‌ছিলাম, তা কেমন কোরে হবে? তা হবে না কেন, হয়; আপনি মনে কোল্লেই হয়।

সিংহ। মনের কথাটাই ছাই ভেঙ্গে বলো না?

মহিষ। বোল্‌ছিলাম কি, বলি, ওদের কাকেও না যেতে দিয়ে আপনি আর আমি যদি পুজোর বাড়ীতে যাই, সে কেমন হয়?

সিংহ। তাঁরা তা শুনবেন কেন?

মহিষ। তাঁদের শোনা শুনির ভার আমার। আপনি রাজি হলেই হোলো।

সিংহ দেখিল শাপে বর। পরামর্শটা সর্ব্বাংশেই ভাল। আরও একটু

সুবিধার চেষ্টায় বলিল—"ভাল, আমি যদি রাজি হই, পূজোর ব্যাপারটা কি রকম হবে ?"

মহিষ। পূজো যা হবে, তা আপনারই, আমি বোসে বোসে আপনার লেজে তেল দিতে থাকৃব তখন। ভোগ রাগ নৈবিদ্দি যা হয়, সবই আপনার, প্রসাদটা আস্‌টা দেন ভালই, না দেন, নেই। পূজোর কদিন কামড় খোস্‌বে, সেই যে আমার পরম লাভ। তায় আবার অমনতরো কোরে আপনার কাছে ঘেঁসে বোস্‌তে পাবো, আমার মান বৃদ্ধি হবে কত ?

সিংহ। ভাল, দুর্গাকে যেন মানালে। লক্ষ্মী সরস্বতী, তারা অন্য যায়গা হোতে আসে, তারা ছাড়বে কেন ?

মহিষ। আপনি মাত্রে রাজি থাকুন, ছাড়বে সবাই। আমার আসুরী বুদ্ধি খানাই দেখুন না। আপনি যেখানে সহায়, সেখানে আমি লাগ্‌লে লক্ষ্মীকেও ছাড়াবো, সরস্বতীকেও তাড়াবো। সব ভার আমায় দিন, আপনি কেবল যথাকালে অনুগ্রহ কোরে লেজটি দিবেন, আর কিছুই ভাবতে হবে না।

সিংহ বলিল—"তথাস্তু"! সন্ধি হইয়া গেল। সিংহের পোহাবারো ষোলো আনাই লাভ। লেজে তেল দিতে পাইয়াই অসুর পরিতুষ্ট।

৪। প্রতিমা।

মহিষাসুরের মোহাড়া এবার লয় কে ? কিন্তু কার্য্য সাধনের জন্য মহিষাসুর মুক্ত বেশ ধারণ করিল; সেটা অবশ্য বাহিরে। জামাগায়ে, চটীপায়ে, মহিষাসুর দিব্য ভালমানুষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি সাজিয়া আসুরী মায়াজাল বিস্তার করিয়া ফেলিল। পূজার প্রতিমায় ঠাটখানা সেই সেকেলে গোছের রাখিয়া পশুরাজে আর নিজে সমস্ত জায়গাটা জুড়িয়া বসিবার ব্যবস্থা করিল। মাথার উপর তেত্রিশ কোটি দেবতার বদলে বসাইয়া দিল—কালেজ আর কঙ্গরস্, স্বাধীনতা আর রঙ্গরস্। সিংহের লেজ ক্রমেই ফুলিতে লাগিল; মহিষাসুর স্বহস্তে লইলেন সুয়ীট সেণ্টেড রোজী অয়েল অর্থাৎ সুবাসিত গোলাপী তৈল। পূজার দালানে টেবিল পড়িল, তাহার উপর বোতল গেলাসের বাগার বসিল। ঠাটে কিন্তু ঠিক রহিল।

৫। পঞ্চানন্দ।

বিলাত যাইতেছিলেন, খবর পাইয়া ক্ষান্ত দিলেন। পথে পথে পূজার দালানে আসিয়া অসুরের ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির। ভ্যালা, ভ্যালা, ভ্যালা! কারখানাটা কল্লে ভালো।

দূরে থেকে তোদের পায়ে করি নমস্কার।
বাঁচি যদি দেখা হবে পূজোর পর আবার॥

এবার পূজা হ'ল না।

যদি বলো যে,—এ আবার কি হ'লো? আমি তার উত্তরে বলি যে, এমন হ'তে পারে, এই রকমই হ'য়ে থাকে।

জন্ম নৈলে মৃত্যু হয় না। বীজ নৈলে গাছ হয় না, কারণ নৈলে কার্য্য হয় না। অতএব এমনটি যখন হোয়েছে, তখন ইহার কারণও আছে।

অর্থাৎ—ঐ যে গৌর বর্ণ যুবাপুরুষ, বেড়ি-পায়—শ্রীবিষ্ণুঃ,—কেমন যে মনটা হ'য়ে গিয়েছে কথা কহিতে গেলেই বেড়ি-পায়ের কথাটা আচকা মনে পড়িয়া যায়! বোলতে ছিলাম, ঐ যে পাটনাই বেলের মতন মাথা, তায় বোম্বাই তিল-ফুল-জিনি নাসা, মৃগ-লজ্জাস্পদ লোচন, কেল্লার মাঠ বিনিন্দিত কপাল, তদুপরি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের মতন তিলক ইত্যাদি ইত্যাদি অথচ অধুনা নিতান্ত দীনহীন কাঙ্গালের বেশে বিরাজমান, উনিই হচ্ছেন আমি অর্থাৎ—

স্বয়ং পঞ্চানন্দ।

তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে যে, শ্রীমুখের সে হাসি কৈ? আমি বলি,—সে হাসি কাশী পেয়েচে।

সে ভুঁড়ি কৈ—আমি ব'ল এখনও মুক্তি আছে, এই যথেষ্ট।

পঞ্চানন্দ কি বৈষ্ণব হোয়েছেন?—না, তাও না। কেন না, মুষ্টি ভিক্ষে যদিও উঠে যায় নাই সত্য, কিন্তু আজকাল মুষ্টির কিছু রকম ফিরেচে। আগে মুষ্টি ভিক্ষেতে, মুষ্টির ভিতর কিছু না কিছু থাকিত; ইদানীং বড় মুষ্টির মুষ্টি হোয়েছে; অধিকন্তু কোথাও কোথাও ষষ্টিও দেখা দেয়। কাজে কাজেই বৈষ্ণবে আর মজা নাই, পঞ্চানন্দও বৈষ্ণব হন নাই।

যদি বলো,—তবে বহির্ব্বাস কেন? তা হইলে খুলে বলিতে হয়। ও বহির্ব্বাস নয়। ও সেই প্রকাণ্ড কাণ্ডের জের। আরও খুলতে হবে কি? আচ্ছা খোলাই যাক্।

ওয়ারিণ বাহির হইল; ধর ধর ধর শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই ধরেতে এই ধরে, কাজে কাজেই পঞ্চানন্দ অধর হইয়া উঠিলেন। যে হেতু পঞ্চানন্দের জানা আছে যে, জগতের মধ্যে কেউ যদি ধর্ত্তব্য থাকেন, তা হৈলে পঞ্চানন্দকেই ধরিতে হয়। ধরাধামে আবির্ভাবের পর, পঞ্চানন্দ অনেক বারই ধরা পড়িয়াছেন, ধরা পড়িয়াই আছেন, বোল্লেও বলা যায়। এমতাবস্থায় এবার সেবার কি আছে, ধরিতে হইলে পঞ্চানন্দকে ধরিবেই, ইহাত ধরা কথা। তবু কি জানো, আশার নাকি আগাও নাই, গোড়াও নাই, খানিকটা মনের ভিতর পড়িয়াই আছে, বলি যদিই না ধরে।

কিন্তু আশা কুহকিনী। আশাকে বিশ্বাস করা সুবোধের উচিত নয়। পণ্ডিত-প্রবর পঞ্চানন্দপলক মধ্যেই—

হতাশ।

গড়াচর চন্দ্রের সেই চিরস্মরণীয় মহাবাক্য নিমেষ মধ্যে মনোমন্দিরে উদিত হইয়া উঠিল;—'ডিডী, ঢোল্লে গো ঢোল্লে।' পঞ্চানন্দের পঞ্চপ্রাণ নবদ্বারাভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল, পুলীশ পল্টনের বিকটমূর্ত্তি অন্তরাত্মার পর্দ্দার ভিতর হইতে যেন পলকে পলকে প্রকট হইতে লাগিল;—পঞ্চানন্দ পূর্ণমাত্রায় পলায়ন পরায়ণ হইলেন। তখন, বুঝিয়াই কেন লও না, পঞ্চানন্দ গণিতেছেন, দিক্ প্রলয়, আর দেখিতেছেন, কেবল পুলীশ। পোলে পুলীশ, পার হয় কে? জলে পুলীশ, ওদিকে যায় কে? ইহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ, প্রাণের ভিতর—

ত্রাস।

যখন ত্রাসের উদয় হইল, তখন পঞ্চানন্দকে আর পায় কে? পঞ্চানন্দ একদম অন্তর্দ্ধান হইলেন। ভাবনার চোটে কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই—

উর্দ্ধশ্বাস।

ইত্যবসরে পঞ্চানন্দ মহাশয়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে কাছাটা কখন খসিয়া পড়িয়া গিয়া-ছিল, কাপড় তত কসিয়া পরা ত ছিল না; কাজে কাজেই কবুল করা কর্ত্তব্য যে কর্ত্তার কাছা খোলাটা অজ্ঞান কৃত পাপ। যাহাই হউক, তদবধি কাছাটা আর সম্প্রদান করা হয় নাই। বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে কলিকালে কাছা দেওয়াটা বাজে খরচ মাত্র। তন্নিমিত্ত হে ভ্রমান্ধ জীব, তোমাদের ভ্রম হইয়াছে যে, পঞ্চানন্দ বুঝি বা বৈষ্ণব হইয়াছেন, বুঝি বা বসন ভূষণ ছাড়িয়া ঐ বাঙ্গদাস ধরিয়াছেন। ইত্যাকার অবস্থায় হস্তগত হইল বঙ্গবাসীর

নিমন্ত্রণ পত্র।

"প্রিয় পঞ্চানন্দ, পলাইয়া থাকিলে তোমার চলিতে পারে, আমাদের চলে কৈ? অন্ততঃপক্ষে পূজায় একবার দেখা না দিলে যে নেহাত বেজায় হয়।"

বুঝিলাম যে আমার বিরহে বাঙ্গালা যায় যায়। কিন্তু এপক্ষে যে নিরুপায়। পূজা হয় কিসে? জানোত তোমরা সকলেই, যে পাঁচ বাড়ী সেধে সুধে পঞ্চানন্দের পূজার আয়োজন হৈয়ে থাকে। এবার তার গোড়াতেই গোল। প্রতিমাটি পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই।

প্রতিমার অভাব।

মহাশয়েরা অবগত আছেন যে, পূজার প্রতিমাতে কতিপয় পদার্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মাটী চাই, খড় চাই, দড়ি চাই, বাঁশ চাই। মাটী মিলিতে পারে, কেননা, প্রবল প্রতাপান্বিত পায়োনিয়র অবধি প্রবীণ পঞ্চানন্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এবার

মাটী। বুঝাইয়া বলা বাহুল্য মাত্র; বিশেষতঃ কিসে যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না। তারপর—খড়। যাঁহারা খবরের কাগজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে পঞ্চানন্দের পূজার প্রতিমার খড়ের বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। এবার তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে যে, খড় প্রায় সকলেরই খাদ্য; খড় লইতে গেলে তাহাদের প্রায় খোরাক বন্ধ করা হয়। আরও জানা গিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, অনেকের চালে পর্য্যন্ত খড় নাই; ইহার উপর পঞ্চানন্দের খড় যোগাইতে হইলে, তাহাদের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়। দড়িত একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বঙ্গবাসীর সঙ্গে বড়লাটের কি একটা বিরোধ বাধিয়াছিল, মাঝে মামলাটা মিটিয়া গিয়াছে। এই খেদে বিস্তর বুদ্ধিমন্ত বীর গলায় দড়ি দিয়া সংসারের গলগ্রহত্ব ধ্বংস করিবার কামনায় রজ্জু-রাশি সংগ্রহের নিমিত্ত শশব্যস্ত হইয়া আছেন; পঞ্চানন্দ আর পাইতেছেন কেমন করিয়া? বাকি কেবল বাঁশের কথা, তাহাও বলিতে হইবে না কি? পাঁচুর বাঁশের বরাদ্দ রাজবাড়ীতে। এবার চাহিতে গেলাম, গিয়া শুনিলাম যে, বঙ্গবাসী বিলক্ষণ হিন্দু বলিয়া তাহাদিগকে একখানি আদত বাঁশ দেওয়া হইয়াছে, পঞ্চানন্দ আর পৃথক্ করিয়া পাইতে পারেন না। যাওয়া গেল বঙ্গবাসীর কাছে; বলি, বাঁশের ভাগ দাও; বঙ্গবাসী উত্তর দিলেন যে, বাঁশ পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু একখানি বাঁশে আমাদের কি হইবে, সে বাঁশ ফুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথার পর আর রাজবাড়ী যাইতে সাহস হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। প্রতিমা হয় কিসে? অতএব এবার পূজা হ'ল না।

হিন্দুমতে দুর্গোৎসব।

গ্রন্থারম্ভে কৈফিয়ৎ

[কর্ত্তা-গিন্নীর কথাবার্ত্তা ছলে]

শ্রীমতী উবাচ,—

পরাণ বঁধুয়া তুমি কোথা ছিলা এত দিন।
আঁখির আড়াল হোলে হিয়া করে চিন্ চিন্॥
কাঁচা সোণা রং মোর হোলো ভুসো কালি।
একা তুয়া বিনে লাগে সবই চোখেবালি॥
দিনের পরে দিন যায় মাসের পরে মাস।
রাতি যে যায় না বঁধু পুড়ে হৈনু পাঁশ॥
দিন নয় মাস নয় বছর ঘুরিল।
হেদে দেখ বঁধু মোর কি হোলো কি ছিল॥

গোটাটিক্ পেলে না বোলে ঘুরিয়ে দিলে রাজার বাঁশ।
রাজ-মার্গে তা রৈল পো'ড়ে লাজে মরি বারো মাস॥
চারি যুগের পুজোলোপ তোমার দারুণ অভিমানে।
তার উপর মেলে দাসীরে—বিরহের হেঁচকা টানে॥
পোড়ারমুখী পড়শী যত কত খোঁটা দিয়েচে।
বুকের উপর দিয়ে আমার পাষাণ বোয়ে গিয়েচে॥
আমার দুঃখে দুঃখী হবে এ-মনটি কেউ যুটত না।
বুকের আগুণ পুড়ত বুকে মুখে তবু ফুটত না॥
হোলো নাকো পুজো বঁধু তাতে তত খেদ নাই।
তুয়া বিনে বঁধু মুই বিরহে যে মারা যাই॥
এত কালে ভার হোলো কি আমার ভালবাসার ভার।
বয়েসে, না কপালে-দোষ শুকালো হে পারাবার॥

এই কথা শুনে, শ্রীমান স্বয়ং বোল্‌তেছেন,—

সকলই তোমারই দোষ আমি অপরাধী নই।
না হলে এ যাতনা আমি কি সাধ কোরে সই॥
হেসে যখন উড়িয়ে দিলে
তখনই ত গোল বাধালে
কুষ্ঠীখানি দেখিয়ে দিলে ছাড়াছাড়ি হোতো না।
তোমা ছাড়া আমার দেখা কেউ কখনও পেতো না॥
পড়ে কিহে মনে এখন
সেই এসে বোল্লেম যখন
বয়স তোমার ভর্ত্তি বারো হোয়েচে কি হয় নাই।
ঘর কন্না কোর্ত্তে গেলে আগে সেটি জানা চাই॥
তখন তুমি মুচকে হেসে
একটু যেন ঘুরে বোসে
রোষের লাজের ভাবটি এনে হেনে এক কটাক্ষ বাণ।
চাইলে আমার মুখের পানে আন্‌চানিয়ে আমার প্রাণ॥
ভাবি তোমার কোথায় শেখা
উস্‌কে শুধু প্রদীপ রাখা
ঘুনধরা এ বুড়ো হাড়ে যাতে রসের ঢেউ খেলে।
যে গুণের প্রাণ প্রেয়সী রৈতে নারি তোঁয় ফেলে॥

কিছু কি পড়ে মনে
চেয়ে আমার মুখের পানে
বোল্লে তুমি—মিন্‌সের আবার রঙ্গ দেখে মোরে যাই।
নাতির নাতি চোজো হোতে লাজ বাসে না কি বালাই॥
না জেনে তত্ত্ব কথা
না বুঝে মনের ব্যথা
কথটা উড়িয়ে দিলে; হোলো মাথায় বজ্রাঘাত।
আইনে চাই পুরো বারো মানবে না এক তিল তফাত॥
আইনের মাচকো ফেরে,
মুনি ঋষি পড়ে ঘুরে,
চুল চেরা বিচারের মুখে দাঁতের চুলের বিচার নাই।
বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়া ঠান্-দিদিরও সমান চাই॥
জানিস্ না ত খবর হাবি
হোথায় থেকে কোথায় পাবি
চুখিয়ে আছে ডেপুটি ভায়া ইসেরাতে লুপে নেয়।
আস্ত মানুষ সামনে পেলে ম্যাদ খাটিয়ে ছেড়ে দেয়॥
ভেঙ্গে চুরে বোলতে গেলে
কে দেবে কোন্ কলে ফেলে
নাম জানি না কাম জানি না ঠারে ঠোরে সেই ভালো!
কদম তলার কাছে থাকে রূপে করে ঘর আলো॥
সেই যদি কুষ্ঠীখানি
একবার খুলে দেখাও ধনি
তবে কি আর তোমায় ছেড়ে দেশান্তরি হোতে যাই।
ভমরে ভমরে পুঁছে মরি সারা বছর দেখা নাই॥
আর যে বোল্‌চ পুজোবন্ধ
সেটা কেবল মনের ধন্দ
হাল ফেশানে পুজো হবে এখন দেখ তারই পথ।
সাবেক গিয়ে, নেয়ে ধুয়ে উঠ্‌চে হোথা "হিন্দু মত"॥
হিন্দু মতে শোয়া খাওয়া
হিন্দু মতে বিলাত যাওয়া,
সবই হবে হিন্দু মতে মূলে ভাবনা নাই কো আর।
ঘরে বাইরে হিন্দুমতে কোর্ত্তে হবে একাকার॥

টেবিলেতে খানকি পেতে,
হবে এখন পিণ্ডি খেতে।
পিতৃলোকে হুকুম জারি হোতে বড় দেরি নাই।
ফল্গুতীরে বালি পেড়ে অসভ্যতার মুখে ছাই।
এখন যে চাই বাঁধা খালসা,
আলোচাল আর নূতন মালশা।
হিন্দু মতের পিতৃলোকে তা কি সইতে পারে।
ঘোলা গঙ্গাজলে কি আর তাদের অসুখ সারে॥
সে পিতৃলোক এখন নাই,
মিটে গেছে সে বালাই।
হিন্দু মতের পিতৃলোকে ভদ্রলোকেই এখন যায়।
খোরাক তাদের সঙ্গে থাকে বরং তারা কমোড চায়॥
দেব ঋষি আর পিতৃগণ,
সে কেলে সব বিসর্জ্জন।
এখন আবার হিন্দু মতে হাল বসতি হোতেছে।
দেখতে পাওনা কত শত জল-পন্থায় যেতেছে॥
থাকচেনা সেকেলে পূজা,
সেকেলেতে নাইকো মজা।
বাগবাজারের পুলের কাছে আয় দে-শুনে ভবি।
রায় দিয়েচেন ন্যায়রত্ন, সায় দিতেছেন কবি॥
কথা শুনে পাঁচীর মনে ভারি কুতূহল।
বল্‌রে আমায় প্রাণের পাঁচু বিস্তারিয়া বল্‌।
পত্তনেতে পদ্যপাত
অতঃপর গদ্যাঘাত
কৃপাগুণে হইবে কিঞ্চিত।
ভাবুক রসিকে যেবা
পাঁচুর করয়ে সেবা
কেহ ইথে নহিবে বঞ্চিত॥

হিন্দুমতে দুর্গোৎসবের বিবরণ।

(পৌরাণিক নহে—ঐতিহাসিক।)

সন ১২৯৭ সালের বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের পর মহিষাসুর কোন প্রকারে বরুণের সাহায্যে এবং শ্রীশ্রীমতী ভগবতীর প্রসাদাৎ দুর্গার হাত হইতে কেশমুষ্টি ছাড়াইয়া স্বীয় বুকের শূল ওড়াইয়া, সাপের বন্ধন এড়াইয়া, সিংহটাকে তাড়াইয়া প্রায় মাসাবধিকাল পরে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হওতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, হায় আমি কি নরাধম! বৎসরান্তে তিন দিন মাত্র কিঞ্চিৎ আতপ চাউল এবং কলাটা মূলাটার লোভে আমি এতাদৃক যন্ত্রণা কি কারণে সহ্য করিয়া থাকি। এই বত্রিশ বন্ধনের ভিতর থাকিয়া আমার সুখ কি? ইহা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করা ভাল, চুরী-চামারী করিয়া কারাবাস করা ভাল, অধিক কি, দুশ টাকা (১) মাহিয়ানার ডেপুটী হইয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত নিত্য নরক ভোগ করাও ভাল, তথাপি আর এ মহিষাসুরগিরি করিতে পারা যায় না। আমারও পূজা হয় বটে, কিন্তু পূজায় কি করিয়াছে? কাহারও ভাল করিতে চাহি না, ভাল করিতে পারি না বলিয়া, দুঃখিতও নহি? কেন না, ভাল করিতে যে ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা আমার নাই। কিন্তু লোকের মন্দ ত করিতে পারি, তাহাই বা না করিয়া এরূপ অবস্থায় আমি কালযাপনা করিতেছি কেন? আমাকে ধিক্, শতবার ধিক্, ততোধিক ধিক্।

এইরূপ প্রকার চিন্তা করিয়া মহিষাসুর পূজার ছুটীর পরেই ইংরেজী স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল। মহিষাসুর ছেলে ভাল, তাহাতে মনের খুব আগ্রহ আছে, টপাটপ্ ক্লাস ডিঙ্গাইতে আরম্ভ করিল, দুই চারিটা ক্লাস ডবল লম্ফেই পার হইয়া গেল। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে বিয়ে পাশ করিয়া ফেলিল। না করিবেই বা কেন,—সমস্ত নোটবুকই মহিষাসুরের কণ্ঠস্থ! অঙ্কের নোট, হিষ্টোরীর নোট, ফিলাজোফীর নোট,—নোটে নোটে মহিষাসুরের অভ্যন্তর নিফাঁক ঠাস্ বোঝাই হইয়া গেল, ন স্থানং তিলধারণং। আগাগোড়া কেবলই নোট, নগদের সম্পর্ক মাত্র রহিল না, বুদ্ধির স্থান, মনের স্থান, ধর্ম্মাধর্ম্মের স্থান, কাণ্ডাকাণ্ডের স্থান, সমস্তই নোটে নোটারণ্য, অধিক আর কি বলিব।

মহিষাসুর দেখিল যে, তাহার বিদ্যা রাখিবার স্থান এদেশে ত কোন মতেই সংকুলান হয় না; বিশেষতঃ কোঁচার খুঁটে চাদরের খুঁটে কত বিদ্যাই বা তাংড়াইতে পারে? ভেষ্ট, জ্যাকেট, কোট, ড্রোজর্ প্রভৃতির পকেটেও বহুতর স্থান পাওয়া যাইতে পারে, অথচ দারুণ শীত হইতে দুরন্ত গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত ঐ সকল পদার্থ চালাইতে পারিলে বিদ্যাও শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই অষ্টপ্রহর থাকিয়া যায়। অতএব এ প্রকার সুবিধা

---

(১) এখন মাহিয়ানা বাড়িয়াছে; কিন্তু নরকভোগ কমে নাই।

ছাড়া কোন মতেই উচিত নহে। এখন কর্ত্তব্য কি, এই খানেই ধুতি ছাড়ি, না কি বিলাতে গিয়া পোষাক ধরিয়া একেবারে দিগ্বিজয়টাও সারিয়া আসি। [এইখানেই ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অতএব খানিকটা ফাঁক রাখিতে বাধ্য হইলাম ; কেন না, পুরাণাদিতে যেমন মিথ্যা কথা চলে, ইতিহাসে তেমন মিথ্যা কথা চালাইবার পদ্ধতি নাই।—ইতি শ্রী অহং সম্পাদকঃ]।

মহিষাসুর অতি ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন, শিব টলমল করিতে লাগিলেন, আর স্থির থাকিতে পারেন না। শিবের যতগুলি বিভাগ আছে, সকল বিভাগেই মহিষাসুরের তপস্যার প্রভাব উৎকট হইয়া উঠিল। মহাদেব মহা পরিতুষ্ট হইয়া মহিষাসুরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শন দিয়া বলিলেন,—বৎস! বরং বৃণু ; তুমি কি বর ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে বল! আর যদি আমার উপর ভার দিতে রাজি থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে আবকারির সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতে প্রস্তুত আছি।

মহিষাসুর অতি বিনয়পূর্ব্বক যোড় হস্তে মহাদেবকে বলিল যে, ঠাকুর তোমার যদি এতই কৃপা হইয়াছে, তবে তোমাকে স্পষ্টই বলি, আবকারির ভার আমাকে দিবার পূর্ব্বেই সেটা আমি একরকম আয়ত্ত এবং হস্তগত করিয়াছি। সংপ্রতি আমি এই দুরবস্থাগ্রস্ত ভারতবর্ষে কিঞ্চিৎ হিন্দুমত চালাইতে ইচ্ছা করি, যেহেতু আমার দেশভক্তি যে অনন্ত ব্যাপিনী তাহা তোমার অবিদিত নহে। অতএব যদি বর দিতেই রাজি হইয়াছ, তবে এই বরই আমাকে দাও।

মহেশ্বর বলিলেন,—বৎস! তথাস্তু।

আর মহিষাসুরকে পায় কে? তখন মহিষাসুর মহাশয়ের অনেকগুলি পরিবার হইয়াছে। সবগুলিকে লইয়া তিনি সদলে, স্ববলে, সপরিবারে, সবাহনে, ভারতবর্ষের পিছনে লাগিলেন। পৃথ্বী সর্ব্বংসহা, তাহাতে কোনও আপত্তিই করিলেন না। বিশেষতঃ শিবের বর আছে।

পরন্তু গঙ্গার যেমন ভগীরথ, মহিষাসুরের তেমনি পঞ্চানন্দ। হিন্দুমতে বিলাত যাত্রার পন্থা সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করিয়া পঞ্চানন্দ মহাশয় তাহা প্রকাশ করিলেন, পাঠকবর্গ বিস্তারিত অবগত আছেন, পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র। আর পায় কে? চারি দিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল আর কি?

ক্রমে অনেক কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া আসিল, বাকি কেবল দুর্গোৎসব। পঞ্চানন্দ মহাশয় তাহারই পন্থা দেখাইয়া দিলেন।

পঞ্চানন্দ পথ প্রদর্শক ; অসুর স্বাধীন, তদুপরি শিববলে বলীয়ান, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। দেবগণ সন্ত্রস্ত হইয়া মুখে নূতন হিন্দুমতের দুর্গা প্রতিমার স্তবস্তুতি এবং অনুরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন ; যথা,—

[১] মহিষাসুর।

ধ্যেয় হে মহিষাসুর হ্যাট্ কোট পরা।
বুট যুক্ত পদাঘাতে কম্পমান ধরা॥
স্বাধীন এখন তুমি জব্দ ভগবতী।
লেজা মুড়া বাদ নাই তবোদয়ে গতি॥
অসুরের জয়, জয় অসুরের জয়।
হিন্দু মতে অবতার সদা করি ভয়॥

[২] স্বয়ং দুর্গা।

দুর্গতি দেখিয়া তোর দুঃখ হয় বাছা।
অসুর থোবে না চুল শিরে এক গাছা॥
ধরিয়াছে কেশমুষ্টি ত্রাহি ত্রাহি কর।
শুনিলে না মোর কথা এবে তুই মর॥
ধরিয়াও সিংহ তারে করে নাই গ্রাস।
তাহার উচিত শাস্তি পরাণে বিনাশ॥

[৩] গণেশ।

বলিহারি সিদ্ধিদাতা বুদ্ধি বলিহারি।
আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছ তারি॥
সময় বুঝিয়া চলে সেই সে চতুর।
না বুঝিতে যারা যেতে হইতে ফতুর॥
পরিয়াছ শার্ট, পায়ে চলুক ইজের
রক্ষা পাবে তার পন্থা করিয়াছ ঢের॥
মিছা কেন নষ্ট হয় ইন্দুর বাহন।
উচিত উদর চিন্তা করা সর্ব্বক্ষণ॥
শঙ্খচক্রে কাজ কিছু না হইত কভু।
ছুরি কাঁটা ধরা ভাল হইয়াছে প্রভু॥
অতিরিক্ত হাত দুটি লাগিয়াছে কাজে।
বুদ্ধিমান জনেই ত চারি হাত সাজে॥
সময়ের অপব্যয় করা ভাল নয়॥
খবরের কাগজের এইত সময়॥
কণ্ডুয়ন কর, মাথা হাত খালি আছে।
মনে যেন রহে ভয় টেকি ভাঙ্গে পাছে॥

[৪] লক্ষ্মী।

যাও বাছা শত গ্রন্থি মলিন বসনা।
রাখিতে তোমারে আর করিনা বাসনা॥
চুপুড়ি লওগো কাঁখে যাও ত্বরা করি।
যেমতে সেমতে পার কর গো শ্রীহরি॥
যাত্রা করিয়াছ ভাল বাড়ায়েছ পা।
যাও ঘাটে বাঁধা আছে বিলাতের না॥
কালপেঁচা উড়িতেছে মাথার উপরে।
যাও যাও ত্বরা যাও যাও দেশান্তরে॥

[৫] সরস্বতী।

মরি মরি এ কিরূপ অপরূপ তোর।
যতই দেখি গো ভেবে ততই বিভোর॥
সেই সে বিমল বাস আর কি গো থাকে।
সেজেছ যখন তুমি বেঙ্গিকা পোষাকে।
এইত শোভন যন্ত্র শোভে জানু যায়।
হইত না এ সঙ্গীত কখন বীণায়॥
বিদ্যা ছিল বাঁধা বিদ্যা স্থানের ভিতরে।
এবে বিলাইছ বিদ্যা সদরে অন্দরে॥
উঠ গো ছাপার কলে উঠ তাড়াতাড়ি।
দশটা বাজিয়া গেলে জমিবে না পাড়ি॥

[৬] কার্ত্তিক।

বাখানি কুমার তোরে দেব-সেনাপতি।
সেইত হিসাবি যেই বুঝে কালগতি॥
ছাড়িয়াছ ধনুঃশর অস্ত্র পুরাতন।
কেরাণী এখন তুমি—যখন যেমন॥
পেটই পরমপূজ্য পৃথিবীর সার।
চাকুরী নহিলে মানি পেট চলা ভার॥
পেটের মর্য্যাদা তুমি বুঝেছ যখন।
অতুল জেনেছি আমি তোমারে তখন॥
খেটে খেটে অস্থি-চর্ম্ম আছে অবশেষ।
কিন্তু চাপকানে তবু সাজিয়াছে বেস॥

ঘড়ীটিও আছে· বিভবের পরিচয়।
দু'বেলা খাবার অন্ন সবার কি রয়?
তায় কিবা আসে যায় শোভা যার কেশে।
বিলাস-বাঞ্ছিত বস্তু বাসে আর বেশে॥
তবুও যে ভুল নাই বীর-অভিমান।
সাজিতে সখের সেনা আছ আগুয়ান॥
দরখাস্তে দস্তখতে লাটের ভবনে।
পরিচিত হ'তে সাধ আছে তব মনে॥
এ গুণের একমাত্র আছে পুরস্কার।
মানব-দেহেতে সাজা বলন্ত-ইয়ার॥
কতই মূর্ত্তিতে আমি দেখিহে তোমায়
একমুখে একদিনে বলা নাহি যায়॥
কার্ত্তিক তুমিই রাজা, রায় বাহাদুর।
চাল নাই, চুলা নাই, বর্ণে ভরপুর॥
এক নিবেদন আমি করি সবিনয়ে।
ধরিয়া খাইবে পাছে মরি সেই ভয়ে॥
অসহ্য তোমার জেনে জঠর দহন।
চালে উড়ে বসিয়াছে তোমার বাহন॥

[৭] প্রতিমার পুরোভাগে।

যার বাড়ীতে পূজো হবে বাঁয়ে দাঁড়িয়ে তিনি।
ডাইনে বোসে আছেন আমার বিদ্যে শিরোমণি॥
তাঁর নামটি বোলবনাকো, বোলব তাঁরে "তিনি।"
ইনি আমার "ইনি" কভু, কভু শিরোমণি॥
তিনি আমার হোব্বা-জোব্বা সাজগোজ পরা।
ইনি আমার আদুড়গায়ে বিদ্যেতে পেট ভরা॥
তিনি নাকি হিন্দুমতে পুজোর ভক্ত ভারি।
ইনি তাইতে কেতাব নিয়ে হোলেন সহকারী॥
তিনি বোলচেন, "জগদম্বে! কেন কষ্ট পাও।
গা-গতরের ব্যথা যাবে 'হোলসম্ ফুড' খাও॥"
ইনি অমনি অভয় দিয়ে বোলচেন অভয়ায়।
"এই দেখ ব্যবস্থা আছে, দোষ কি গো মা তায়॥"

হিন্দুমতের নৈবিদ্দি আছে টেবিল যোড়া।
ভক্তগণের ভরসা প্রসাদ পাবেন থোড়া থোড়া॥
হিন্দুমতে দুর্গ পূজো ঘটার সীমা নাই।
বোল্‌তে গেলে রাত থাকে না, ভাবচি বোসে তাই॥
ক্ষান্ত দেওয়াই ভাল বি-কজ-because জান্ বাঁচান চাই।
বিজয়া কর্ব্বো বরং ফুরস্থৎ যদি পাই॥
অতএব উপসংহারে
জাতীয় সঙ্গীত।
মর্ম্ম বুঝে বন্ধুগণ হইবা মোহিত
নৈলে করিব বিহিত।

[সজাতীয়—বিজাতীয়—জাতীয় সঙ্গীত]

মিলে যত ভারত সন্তান
হিন্দু মুসলমান
পারসি খিরিষ্টান,
মোগল পাঠান
তাতার আফগান
ইস্তক মার্কিণ দেশ নাগাদ জাপান,
হৈয়ে একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়
জয় জয় জয়
হিন্দুমতে দুগ্গোচ্ছব এম্নি কোরেই হয়।

চতুর্থ কাণ্ড সমাপ্ত।

পাঁচু-ঠাকুর।

পঞ্চম কাণ্ড।

সুরুচির সাঁকো।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গবাসী আর তেমন পঞ্চানন্দ প্রকাশ করেন না কেন? আমি এ কথার উত্তর দিতেছি। বঙ্গবাসী ইহার উত্তর দিবে না; আমি দিব। আমি অর্থাৎ নিজে স্বয়ং—অস্মদ, এই যে উত্তম পুরুষ। জানত যে, একা আমি উত্তম পুরুষ; আর তোমরা যদি পাঠিকা হও ত, পুরুষই নও, মেয়েমানুষ; যদি পাঠক হও, কিন্তু চাক্‌রী থাকে তবে কা-পুরুষ; খুব সুপুরুষ হইলেও কাপুরুষ। বড় জোর না হয়, তুমি মধ্যম পুরুষ। বুঝিলে! এ হেন উত্তম পুরুষ যে আমি—ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

বলি, বরাবর যে আমিই প্রকাশ করিব, আর তোমরা দেখিবে, হাসিবে, আর মজা করবে, এ বড় বিষম কথা নহে কি? ইহাতে সাম্য রহিল কৈ? সাম্য না থাকিলে বৈষম্য। তবেই বিষম কথা হৈল কি না। আর সাম্যই মূলমন্ত্র। বাবাও এখন ভ্রাতা, মাতাঠাকুরুণ ত ভগিনী। সাম্য যাহাতে নাই, শম্মাও তাহাতে নাই।

আরও উত্তর আছে।—আমার ইচ্ছা! স্বাধীনতা কি তোমাদেরই একা থাকিবে? আমার থাকিবে না? তোমাদের সাধ হইবে—আর তৎক্ষণাৎ আমি প্রকাশ করিব—এত নেহাত আমাকে পরাধীন করা। পরের ইচ্ছায় চলা-বলা যে কত বড় পেজেমী, এগারজন মনিবের চাকরী ক'রে তোমরা তা বুঝতে পারবে না! তা ঐ বার-ইয়ারির ভিতরে থাকিয়া তোমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, ততটুকুও কি আমার নাই? পোড়া পেট আমারও আছে। সেটাও তোমরা পুরাও না। পেটের দায়ে আমার পাড়া করিয়া বেড়াইতে হয়; অথচ তোমাদের ইচ্ছা যে, পূজাই কি আর পার্ব্বণই কি, সব ফেলিয়া পঞ্চানন্দের প্রকাশ চাই। দোহাই ধর্ম্মের, এত পরাধীন হইতে আমি প্রস্তুত নই। আমি চাই—স্বাধীনতা।

মৈত্রীয় কথা না তোলাই ভাল। মিত্রের স্ত্রী মৈত্রা। ব্যাকরণে ত এই কথাই বলে। তোমরা মানো আর নাই মানো, আমার করণ কারণে এসব বিচার আছে।

তবেই দেখ, আমার পক্ষে হইল, সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী; বাহির না করাই ভাল। আক্কেলে কিছু পৌঁছিল কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমেই ধর,—অশ্লীল। প্রকাশ করিবার যো আছে? তোমরা যে রকম সুবোধ, সুরুচি, সজাগ এবং সুচতুর, এখনই প্রকাশ করিবা মাত্র অশ্লীল বলিয়া খপ করিয়া চাপিয়া ধরিবে। কাজ কি বাবু সাধে সাধে এত কেচাণ্ডে? তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। নহিলে, "পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসেও" তোমরা অশ্লীল পাও? ঘোষের পো নেহাৎ নির্ব্বোধ, তাই তিনি বলেন যে, কৈ অশ্লীল দেখাইয়া দাও দেখি! হাদে দেখ, ঘোষের পো, তোমাকেই বলি, বলি, এ তোমার কোনদেশী কোট্? অশ্লীল কি দেখানো চলে? দেখাইলেই যে অশ্লীল। ইসারায় তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, পাঞ্চালী সহ পঞ্চপাণ্ডব বিরাট রাজ্যে যখন অজ্ঞাতে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সেই অজ্ঞাতে অশ্লীল নাই, এ কথা কি আর বলা চলে? যখন অজ্ঞাত বাস, তখন অশ্লীল নাই, কোন্ পবিত্র আত্মা একথা বলিতে অগ্রসর হইতে পারে? পুলিস ত পাষণ্ড এবং পামর, সে অশ্লীল পাইবে কেন? ঘোষের পো, আমার একটী পরামর্শ শোনো। পবিত্রতার পাতকুয়ার প্রান্তে বসিয়া পারো যদি, তবে দিন কতক পরম-প্রেমের জন্য প্রাণপণে প্রার্থনা করো। তাহা হইলেই, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কেন, যাহার তাহার প্রজ্ঞাত-বাসে এমন কি প্রবাসে পর্য্যন্ত আপনা-আপনি পলকে পলকে তোমার পূত চিত্তপটে অবশ্যই অশ্লীলের উদয় হইবে। তখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবলই অশ্লীল দেখিবে।

যদি অশ্লীলের অনুসন্ধান করিতে চাও, তবে হে ঘোষের পো, যেমনটী বলিয়াছি, ঠিক যেন তেমনটী করিও। পবিত্রতার পাতকুয়ার প্রান্তে বসিয়া প্রার্থনা করিও। সাগরে কি সরোবরে, হ্রদে কি নদে, তীব্র তপস্যা করিলেও কিছুমাত্র ফল পাইবে না। সেই পচা পাতকুয়াটী চাই। তাহার পর, যখন পরমাত্মা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন সাগরের লোনা জলে দেখিবে অশ্লীল; সরোবরের শুদ্ধ সরোজে দেখিবে অশ্লীল; হ্রদের মৃদু-হিল্লোলে দেখিবে অশ্লীল; নদের প্রবল কল্লোলে দেখিবে সেই অশ্লীল; দেখিবে এবং দেখাইবে, ধরিবে এবং ধরাইবে। তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি, ঘোষের পো, আমি তোমায় দেখিতে পারি না! পেশাদারী করিয়া তুমি পয়সা পাইতেছ, আর পসারও বাড়াইতেছ, ইহাও কি আমার পোড়া প্রাণে

সহ্য হয়? পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে তুমি এখন অশ্লীল পাইতেছ না; কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, তোমার অজ্ঞাতবাস ত অজ্ঞাতবাস, স্বয়ং তোমাতেই অশ্লীল আছে। বিশ্বাস না হয়, যাইও একবার তাহাদের পাড়া দিয়া, তখনই যদি না ধরাইয়া দেয়, তবে ধিক্ আমাকে!

কিন্তু তাও বলি, ঘোষের পোকেই বলি, একান্তই যদি অশ্লীল এড়াইতে চাও, তাহারও একটা উপায় আছে। সে উপায়—এ পক্ষেরই আবিষ্কার!

সুরুচির সাঁকো চেনো? সেই সুরুচির সাঁকোর উপর দিয়া গতায়াত করিলেই অশ্লীলের আশঙ্কা একেবারেই নাই। এটা আমার পেটেণ্ট করা পদ্ধতি—নিশ্চয়, নির্ভয়, নিরাপদ। গতি-বিধিটা একটু আসমানের উপর দিয়া করিতে হয়, তা হউক; কিন্তু অশ্লীল থাকিবে অনেক দূরে।

প্রয়োগ-পদ্ধতিটা বুঝাইয়া দেব নাকি? রেলের লাইন দেখিয়াছ ত? আচ্ছা বেশ। দেখিয়াছ, মাঝখান দিয়া লাইন যায়, দুই পাশে থাকে দুই প্লাটফরম। এক প্লাটফরম ওধারে আর এক প্লাটফরম এধারে। কিন্তু ব্যবস্থা এই যে, এ প্লাটফরম হইতে ও প্লাটফরমে যাইতে হইলে, লাইন মাড়াইয়া—লাইনের উপর পা দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। লাইন যদি মাড়াইলে ত, মরিলে; ফৌজদারী সোপরদ্দ। সেই জন্য গতিবিধি হয়, আসমানের সাঁকো দিয়া। রেল-ষ্টেশনে সেগুলাকে ফুট-ব্রিজ বলে তর্জ্জমা করিলে পা-পোল বলা যায়।

তদ্রূপ জানিবে,—এই সুরুচির সাঁকো।—[পদ্য আগত প্রায়, কিন্তু আত্ম-শাসন আবশ্যক। চতুর্দ্দিকেই আত্মশাসন, ইস্তক সহরের ময়লা ফেলা নাগাইদ লাট-সভাতে কথা বলা। অতএব আত্মশাসনের বলে আমার আত্মাকে শাসিত করিয়া পদ্যে সংপ্রতি প্রবৃত্ত হওয়া গেল না। এখনও কিয়ৎক্ষণ গদ্যেই গতিবিধি করা যাক্] ঐ যে আমি সুরুচির সাঁকোর কথা বলিয়াছি, ইহাও তদ্রূপ জানিবে। এই যে মানব দেহ, ইহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত জানিবে, এক দিকের প্লাটফরম। অপরন্তু, পদতল হইতে হাঁটুর নিম্নপ্রান্ত পর্য্যন্ত অন্য এক প্লাটফরম। কাব্য করিতেই প্রয়োজন হউক, বা বিজ্ঞান বলিতেই প্রয়োজন হউক, কি সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে সোজাসুজি ঐ প্লাটফরমের প্রান্ত ছাড়াইয়া কদাচ পা বাড়াইও না। ওধারে নাকের নীচে যদি নামিলে, তবে গোঁপ আছে, না হয় নাই; উভয়তই কিন্তু অশ্লীল। অতএব নাক্ পর্য্যন্ত বস! এদিকে হাঁটুর উপর উঠিলে ত—ঐদিকে বিভীষিকা। ঐ বলিয়া ভ্রাতা-ভগিনীগণ ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে তোমাকে ধরিবার জন্য উন্মুখ, উৎকণ্ঠ, উদগ্রীব। মনে করিও না। যে, ও মুদিত চক্ষে দৃষ্টি নাই; ঐ মুদিতের মাঝে মাঝেই চপলা চমকিয়া থাকেন; ঐ চসমার ভিতর দিয়া চিলের চাহনি চলে।

ঘোষের পো, যদি বাঁচোয়া চাও, তবে সুরুচির সাঁকো আশ্রয় কর। আর ঐ

ভ্রাতা-ভগিনীগুলিকে আশীর্ব্বাদ কর, উত্তরোত্তর তাহাদের বংশবৃদ্ধি হউক, শ্রীবৃদ্ধি হউক; তোমার কোন বিপদ হইবে না। তন্নচেৎ কিন্তু নিস্তার নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[একটু বে-থাপ্ মনে হইতেছে নয়? থাপ কিন্তু খুব আছে। এ কে সাম্য, দুয়ে স্বাধীনতা, তিনে মৈত্রী, আর চারে—অশ্লীল; পঞ্চম পাইলেত এইবার? তবে কি জানো, ঐ অশ্লীলটা স্বয়ং এক পরিচ্ছেদ। সেইটে পৃথক ভাবে যদি কেহ উপহার দিবার ইচ্ছা করেন, তন্নিমিত্ত প্রথমে পঞ্চানন্দের পত্তন করিয়া পশ্চাৎ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার সন্নিবেশ করা হইয়াছে। অতএব সভাসদগণ অনুমতি করুন, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলুক।]

পঞ্চানন্দের প্রকাশ না করিবার পঞ্চম এবং প্রকৃষ্ট কারণ এই যে,—পোড়া মুখ দেখাইতে কিছু লজ্জা করে।

চুল পাকিল, দাঁত পড়িল,
নাত্‌নী দিল দেখা।
কেমন কেমন ঠেকে মনে,
রসাভাবের লেখা॥
সবাই বেজার, পূজার বাজার
হয়নি মনোমত।
এমন ক'রে একা মানুষ
মন যোগাব কত॥
চারিধারে পাওনাদারে
টেকা হয়েছে দায়।
দরজি খুড়ো, সেকরা বুড়ো
পেয়ে বসেছে তায়॥
তার উপরে পাড়া পরশী
বল্‌ছে পূজো চাই।
আমার কিন্তু রসের ভাঁড়ে
রতি-মায়া নাই॥
শুধ্ কি তাই? বেরুতে গেলে উপস্থিত আবার এক বালাই।
অশ্লীল ভায়া ক'রে দয়া
যদি বা দেয় ছেড়ে।

বিলাতি হিঁদুর পাণ্ডাগুলো
ধর্‌বে তখন তেড়ে॥
এক টানেতে বিলেত যাত্রা
বেজায় লম্বা পাড়ি।
দেখ্‌ছে এখন ভেবে চিন্তে
বড্ডো বাড়া বাড়ি॥
হিন্দুমতে বিলেত যাত্রা,
কিস্তি বন্দী ক্রমে।
হলেও, বুঝি হতে পারে,
আছে তারা এই ভ্রমে॥
হদ্দ মুদ্দ লঙ্কা এবার,
জাহাজ হচ্ছে ভাড়া।
ভাবছি আমি আমায় পেয়ে
যদি করে তাড়া॥

সত্য সত্যই কিস্তিবন্দী করিয়া ক্রমে বিলাত যাইবার পরামর্শ হইতেছে। এবারের কল্পনা—লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত। তাই ভাবিতেছি যে, বাহির হইলে, যদি আমাকেই ধরিয়া বসে! তবেই দেখ যে, বাহির হওয়াতে বিপদ কত;—তা পুজোতেই কি আর অ-পুজোতেই কি?

অতএব এবার হচ্ছে না পঞ্চানন্দের পুজো—কিম্বা পুজোর পঞ্চানন্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তোমরাই বল দেখি, এ অবস্থায় পঞ্চানন্দের পূজা হয় কেমন করিয়া? পুজো কর্‌বে কার, দুর্গার ত? দুর্গা হচ্ছেন ভগবতী; এখন ভগবতী বলিয়া পুজো কর্‌তে গেলেই ত মহা বিভ্রাট। পুজো নষ্ট, পসার নষ্ট আর স্বয়ং শর্ম্মাকেও হয়ত কৌজদারীতে পড়িয়া ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইতে হইবে। কেন, শুনিবে? ভগবতী বলিলে, তোমাদের বুদ্ধিতে কি বুঝায় বল দেখি? গরু নহে? এখন গরুর পুজো বলিতে গেলেই ত হাঙ্গামা।

পথে জুজু ঘাটে জুজু, জুজু কোথা নয়।
ডাঙ্গা জলা, উত্তর পশ্চিম শুধু জুজুর ভয়!
লাল পাগড়ী মুরোদ খাড়া সাম্‌নে হোথা ঐ।
বল দেখি কেমন করে পুজোর কথা কই?

দেখে শুনে বাস্তবিকই শর্ম্মার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ বুদ্ধিরও উদয় হইতেছে বলিলেও বলিতে পার। তা যদি না হইবে, তবে পঞ্চানন্দ পূজা করিতে এবার এমন পিছাইবেন কেন? কি জানি, পূজো করিতে গিয়া যদি প্রমাদেই পড়িতে হয়। প্রথমত, দেবী পর্ব্ব লইয়াই এত গোল। তার উপর আরও কিঞ্চিৎ গোল আছে।

সেখজী চাচা দলিজ-ঘরে
মুদিত চখে নমাজ পড়ে
পাঁদাড়েতে লাল-পাগড়ি খাড়া
জগঝম্প ঢাক কাঁশি,
বাজিও নাকো সানাই বাঁশি
খবরদার শাঁখে দিও না সাড়া
ধূপ ধুনার বদ গন্ধ
মনে হয় বড় সন্ধ

যদি যায় সেখ পাড়া দিয়ে,
পুজো ভুজো হবে পণ্ড,
শর্ম্মা হবেন লণ্ড ভণ্ড,
কাজ কি বাবু অত গোলে গিয়ে?
পাস্তা খাই কাঁশি বাজাই,
রস রগড়ে কাজ কি ভাই?
দাঁড়িয়ে দেখ রাজ-মহলের রঙ্গ।
হুম্‌কুনি আর হুহুঙ্কারে,
কত উঠে কত পড়ে.
কতবা প'ড়ে করে যম-সঙ্গ!

বলি, এমন অবস্থায় কি ভগবতীর পূজো হয়? যদি বল, ভগবতীর ছেলে-মেয়েদেরও কি পূজো হয় না, তাই বা কেমন করে হবে?

[কমলা]

কমলা এখন দেশ-ছাড়া,
ঘরে ঘরে লক্ষ্মী-ছাড়া,
উদ্‌ খাইতে ক্ষুদ নাইক ঘরে।
শূন্য ভাঁড়ে বাঁধা পাত,
তিন পহরে তাতে ভাত
তাও পাইতে আঁখে বুঁদি ঝরে।

ঘরে ঘরে দিনু সাড়া
খুঁজনু কত পল্লী-পাড়া—
কোঠর-চোখো বল্লে হাত নেড়ে।
রেখেছিনু যত্ন করে
ঝাঁপি চেপে বড় ঘরে
ওপেরেরা নিয়ে গেল কেড়ে॥
তবে আর পূজো হয় কই?

[সরস্বতী]

নিগার বেগার দেশে আর
সরস্বতীর টেকা ভার,
রুচে নাক হেথাকার পানি।
বেদ দর্শন সঙ্গে নিয়ে
তিনিও গেছেন তাই পালিয়ে,
দেশময় এই কথাইত শুনি।
বীণাপাণির অনুগ্রহ
পেলেন হেথা কেহ কেহ
সঙ্গে গিয়ে করে আরাধনা।

বঙ্কিমা আর করতালি,
বুক চাপড়াই ঢলাঢলি
দেশভক্তি দেশী নজরানা।
শর্ম্মার বড় বাক্যে ভয়
হুজুকেও সন্দ হয়,
কেমন করে পূজো হবে তবে!
ঘাঙর ঘাঙর ঘাঙর গ্যাং
এঁদো ডোবায় কোলা ব্যাং
লাফিয়ে উঠে গাইছে শুন সবে॥

[কার্ত্তিক]

নেটিবে নাচার অতি;
নেটিব চিজে মারেন লাথি;
নেটিব গন্ধ রুচে নাকো নাকে।

ম্যাষ্টি নেটিব চাল কলা,
নৈবিদ্যের ভিজে ছোলা,
দেখলেই বাবু "শেম" বলে ডাকে ।
রুচি এখন চপ মটনে
চামচ কাঁটা চাঁদ-বদনে
পঞ্চানন্দ কাজেই ভেবে সারা ।
ভাঁড়ে সম্বল সাদা ভুজো
কেমন করে হবে পুজো,
কঠিন এমন বাবুর পুজো করা ॥

[গণপতি]

গণপতি দলপতি,
নাহি অবসর পল রতি,
ছুটোছুটি অলি গলি পথে ।
আর্ত্ত শাসনে অতি দড়
চার মনেতে প্রিয় বড়
শক্ত তারে ধরা কোন মতে ॥
সভা সমিতি ঠাঁই ঠাঁই,
প্রশ্ন কর্ত্তে হবে বাছাই
হো—হো—হো দেশ গেল যে ঐ ।
রাঙ্গা মুখো বাবু রূপী
রম্ভা হাতে লপ লপি
পুজো পাবার সময় তাঁহার কৈ ?

[[illegible] চোরা]

দুম দুম কামান গোলা
সৌদামিনীর ঝল ঝলা,
সাস্ত্রী সিপাহি খাড়া সারি সারি ।
হুড়ুম হুড়ুম গোলা ফাটে,
ব্যোম ফাটিয়ে শব্দ উঠে
পূর্ব্ব তরফে ধূম লেগেছে ভারি ।
চিনে চোরা যা পান
চোখ রাঙ্গিয়ে তাই
সিংহী আছে থাবা পেতে বসে ।

হোথা ভালুক ধীরে ধীরে
আগ বাড়াচ্ছেন পামীরে
বন বালু সব রেলের বেড়ায় কণে॥
দেখে শুনে ভয় ভারি,
কাঁপেন শর্ম্মা থর থরি।
হাতে কাঁপে পূজোর ডালি খানি।
কাজ কি এত গোলে যাওয়া
হলো নাকো পূজো দেওয়া
মানে মানে থাকুক মহাপ্রাণী।

অতএব এবার হচ্চে না পূজোর পঞ্চানন্দ—
অথবা পঞ্চানন্দের পূজো!
সুতরাং এবার অস্থানেই—
উপসংহার।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

গঙ্গা নারায়ণ বল,
হরি, হরি বোল বল,
মা চলিল, অতলের তল।
বুঝি জনমের মত যায়,
কে দেখিবি, আয়, আয়, ছুটে আয়,—
আয়, আয়,—কে পড়িবি, মার রাঙ্গা পায়

বাজিছে বাজনা, ভোঁপ্পর ভোঁ,
হতেছে গাওনা, পোঁপ্পর পোঁ,
চলেছে নাচনা, কোঁক্কর কোঁ।
চারি জাতি পুত্র জননীকে বয়,
চৈতন, শামলা, হ্যাট, একত্রেতে রয়,
বিলাতী এসেন্সে দিক্ আমোদিত হয়,
কি ভয়, কি ভয়, গাও স্বদেশের জয়।
ন্যায়রত্ন ধরে তুড়ি দিয়া গান;
শামলা হ্যাট তায় করে যোগদান —

(শুনিয়া জাহ্নবী বহিল উজান,
খসিল নক্ষত্র হলো খান্ খান্,
ভাঙ্গিল পর্ব্বত, ভাঙ্গিল বিমান।)

গীত।

আমি,—চাই না ভক্তি অনুরক্তি,
চাই না শক্তি—ভগবতী,
আমি,—চাই হে।
কেবল দেশের উন্নতি।
আমি,—চাই না লক্ষ্মী,
চাই না সরস্বতী,
আমি,—চাই হে!
কেবল দেশের উন্নতি!

* * *

আমি,—চাই না জ্ঞানী গণপতি,
চাই না কার্ত্তিক সেনাপতি,
আমি,—চাই হে!
কেবল দেশের উন্নতি।

* * *

বুড়ী মাকে বিদায় দিয়ে,
থাক্‌বো আমি দেশটা লয়ে,
বেড়াবো রাজনীতি—
গীত গেয়ে!
আন্দোলন আবেদন,
করবো আমি অনুক্ষণ,
হবে তায় উদ্ধার সাধন।

* * *

ওহে বক্তৃতায় ভাঙ্গবো গলা,
মাদ্রাজ বোম্বায়ে
করবো মেলা,
রথ দেখ্‌বো আর
বেচবো কলা ;—

এ এক নূতন পদ্ধতি—
আমি,—চাই হে!
কেবল দেশের উন্নতি!

* * *

তপ জপ যজ্ঞ আরাধনা,
এ সব কেবল কবির কল্পনা,
বুজরুকিতে কিছু হবে না
হবে না—
এ যে কেবল জলের আল্পনা,—
ধর ভাই নূতন পদ্ধতি,
আমি,—চাই হে!
কেবল দেশের উন্নতি!

* * *

আমি,—চাই না আলু,
চাই না বেগুণ
চাই না তেল,
চাই না নুণ,
আমি,—চাই হে!
কেবল তরকারি।
(রাঁধা তরকারি!)
এ যে নূতন পদ্ধতি।

* * *

আমি,—চাই না ভক্তি, মহাশক্তি,
চাই না লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি,—চাই হে!
কেবল দেশের উন্নতি।
এ যে নূতন পদ্ধতি।

বহিষ্করণ।

ভূমিকা।

সেই এক দিন আর এই এক দিন। সেই কবে কোন্ কালে দেখাদিয়া, ফেরারি আসামীর মতন এত দিন লুকাইয়াছিলাম, সেই একদিন। সে দিনের কথা মনেই পড়ে না। আর আজ এই একদিন। আজ দেখাও দিতেছি আজকার কথা আমার মনেও পড়িতেছে। অতএব অদ্য পঞ্চানন্দের অন্তঃকরণ হইয়াছে সুতরাং বহিষ্করণ হইল। অর্থাৎ সোজা বাঙ্গলায় বলিতে হইলে,আজ বেরুতে মন হয়েছে বেরোন গেলো। কিন্তু প্রশ্ন,—কেন বেরুই ? উত্তর,—বিরহিণীদের জ্বালায়। এখন স্ত্রী-শিক্ষা খুব প্রবলা, পঞ্চা-নন্দের প্রচুর পাঠিকা পাঠকগুলির স্বভাব-চরিত্র অতিমৃদু। তাহাদিগকেও ঐ পাঠিকাদের মধ্যেই ধরা গেলো। কাজে কাজেই বিরহিণী বলিলে অত্র স্থানে দুই-ই বুঝিতে হইবে,—পাঠক আর পাঠিকা। তাহা ছাড়া, দীর্ঘ ঈকারান্ত বাঙ্গালীকে স্ত্রীলিঙ্গবৎ ব্যবহার করিলে, বোধ হয়, ব্যাকরণেও দোষ পড়ে না। অতএব সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখাগেলো যে, বিরহিনীদের বিরহজ্বালা নিবারণের জন্যে পঞ্চানন্দের সুরুচি-সাগরে ঢেউ খেলানো বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যে দুরন্ত গরম গেলো তাতে কার প্রাণই বা আই-ঢাই না করিয়াছে। আমারই ইচ্ছা করিতেছিল যে, এ গরমে বুঝি আর ঘরে রইতে নারি; এইবার বেরিয়ে পড়ি। আমারই যখন বেরুতে ইচ্ছা, তখন বিরহিণীরা যে বাহির হইয়া পড়েন নাই নাই,ইহাই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। গরমের সময়ে জলের অভাবে যে কাহারও কষ্ট হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কেনা না, নাই থাকিল জল। পাঁচ মিনিট অন্তর বরফের কুচি মুখে দিলেই ত সে দুঃখ দূর হইতে পারে। আসল কথা, বিরহিণীদের আই-ঢাই জলের জন্য নয়; শুদ্ধ রসের জন্য। সে রস পঞ্চা-নন্দরূপী খেজুর গাছ ভিন্ন আর কোথা পাওয়া যাইবে ? পঞ্চা-নন্দ যে সত্য সত্যই খেজুরগাছ, সে পক্ষে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। যাঁহার কখনও কণ্ডুয়ন প্রবৃত্তি হইয়াছে, তিনিই ইহার প্রমাণ দিতে পারেন। পঞ্চা-নন্দের নেহাৎ কচি পাতাটীর আগাটিতেও কুচকুচে কাঁটা! তা হউক কাঁটা। কিন্তু রস কত! বয়সের পরিপাকে রসেরও পরিপাক হইয়াছে; তা এমন হয়। বেলা বাড়িলেই রস গাঁজিয়া উঠে। ভূমিকা এই পর্য্যন্ত। ভূমিকাটুকু যাঁহার ভাল লাগিবে না, তিনি এইটুকু বাদ দিয়া পড়িবেন কিম্বা এইটুকু পড়িয়া বাদ দিবেন, তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যাইবে।

এইবার আসল কথা।

[কিন্তু দামটী খাঁটী নগদ।]

যেখানেই রস সেইখানেই রস-গ্রাহী। মধুর ভাঁড় খুলিলেই, কোথা হইতে পিঁপড়ার পাল আসিয়া পড়ে; পদ্ম ফুটিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে ভোমরা উড়ে। আমিও পঞ্চা-নন্দের পসরা পাড়িয়াছি, আর মহাশয়, বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, আবশুলা যে কত যুটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। যে রসের যেমন রসিক!

* *
*

আলিপুরের ফিশার সাহেব নিধিরাম উড়েকে দশ বেতের হুকুম দিয়া, বিশ বেত লাগাইয়া দিলেন। নিধিরাম বেত খাইয়া চুপচাপ বাড়ী চলিয়া গেলো। যাহারা বেত খাইতে পায় নাই, তাহারা চারিদিকে চেঁচাইতে লাগিল। বাঙ্গালীগুলা কাঙ্গালী কি না! তা, কঙ্গরসই করুন আর কৌন্সুলিতেই বসুন।

* *
*

চেঁচা চেঁচিতে খুব হাঙ্গামা হইয়া উঠিল! কেহ ভাবিল, ফিশারের চাকরী যাইবে; কেহ মনে করিল, ফিশারের মাথা কাটা যাইবে। কিন্তু সে সব কিছু হইল না; বরং উলটা হইল। দ্বিপদকুলতিলক ফিশারের বরং পদ বৃদ্ধিই হইল। তিনি হইলেন পুরা কালেক্টর। লোক বিস্ময়াপন্ন, চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি! কিন্তু কেন যে এমনটা হইল তাহা কেহই জানেন না; জানেন কেবল পঞ্চানন্দ। ফিশারের কৈফিয়তের গুণেই এ কারখানা হইয়াছে। পঞ্চানন্দ বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে, ইংরেজের আদালতগুলি বিচারের দোকান। ফিশার সাহেব সেই কথা ধরিয়া কৈফিয়ত দিয়াছিলেন যে, খরিদদার খুসী করিবার মতলবে আমি দশ বেত ফাও দিয়াছি। ব্যবসার মর্ম্ম ফিশার বুঝিয়াছিলেন। তাইতে তাঁহার কর্ম্ম বাড়িয়াছে। মন্দই কি!

* *
*

ঢাকা সহরে কথা উঠিয়াছে যে, বিলাতী ছাড়িতে হইবে। দেশী ধরিতে হইবে—মদ নহে,—কাপড়। কলিকাতা খোলা সহর। বোধ হয়, কলিকাতাবাসীরা দুই ছাড়িবে। দেখা যাক্, দেশ-ভক্তি বেশী কিসে? ঢাকাতে না না-ঢাকাতে?

* *
*

পরকালে কে প্রতিভাশালী হইবে, তাহার পরিচয় প্রায় আঁতুড়-ঘরেই পাওয়া যায়। এই দেখ না কেন আমাদের ন-রক্ষ ভায়া। বক্ষ অর্থাৎ ছেঁদা মাত্রই নাই যে, সেইদিক

দিয়া একটু আক্কেল পুরিয়া দিবে। আবার দেখ, তার পাল্‌টা সু-রক্ষ ভায়া। যতই ঠাস্‌ বোঝাই করিয়া দাও না কেন, এক ফোঁটাও ভিতরে থাকিবে না, বাহির হইয়া পড়িবেই পড়িবে। অথচ ছুটাই প্রতিভাশালী। মা বাপে নাম করণের সময়ে পরিণামটী না বুঝিয়া ত নাম রাখিতে পারে নাই!

* *
*

বঙ্গবাসী পড়িয়া আশ্বস্ত হই-হই, এমন সময়ে হঠাৎ হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে। বঙ্গবাসী বার বার লিখিতেছেন যে, বেনেজোলার বিবাদ মিটিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। মনে করিতে ছিলাম, ভালই হইয়াছে; দেশের লোকের বিরোধ মিটিয়া গেলেই ভাল হয়। হরি! তা নয়; দেখিতেছি যে, এ বেনেজোলা এ দেশে নহে; মহীরাবণের রাজ্য মার্কিণে।

* *
*

বাঙ্গালা মুলুকে ভারি জলকষ্ট উপস্থিত। কোন কোন জেলার মাজিষ্টর বলিতেছেন যে ভয় নাই; বর্ষা নামিলেই আর জলকষ্ট থাকিবে না। পঞ্চা-নন্দের বিবেচনায় বর্ষার ভরসাই বা করিতে হইবে কেন? চোখের জলেই প্রচুর হইবে সে পক্ষে বড় চেষ্টাও চাই না।

* *
*

মিররে দেখা গেল মীরটের এক বিদ্বান আর এক বিদুষী ক'নে সংস্কৃত শিখিয়া লায়েক হইয়া নিজে নিজেই মন্ত্র আওড়াইয়া বিনা পুরোহিতে বিবাহ করিয়াছেন। মিররের নরেন ভায়া এই অবসরে আহ্লাদে আটখানা হইয়াছেন। ভায়ার এ বুদ্ধি যোগায় নাই যে, এ ব্যাপার নূতনও নয়, চূড়ান্তও নয়। এই কলিকাতাতেই কতকাল অবধি ইহা অপেক্ষা কত বেশী দেখা গিয়াছে। এতো কেবল পুরুত বাদ। এখানে নিত্য নিত্য কত বিবাহ হইয়া যায়, গুরু পুরুত, বাপ মা, আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পায় না! কেবল পাত্র আর পাত্রী।

* *
*

সঞ্জীবনীতে দেখা গেল যে, সধবার চেয়ে বিধবা বেশী দিন বাঁচে। যে বিধবারা পাল্‌টিয়া সধবা হন, তাঁহাদের পরমায়ু, আর সেই পরিমাণে বয়স, কমিয়া যায় কিনা, এটাও জানিয়া রাখা ভাল।

* *
*

এক ব্যক্তি দুঃখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কলিকাতার মিউনিসিপালিটি আত্ম-শাসনের আদর্শ; তবে এখানে এত কেলেঙ্কারী হয় কেন? দুটী উত্তর আছে

এক,—পরবশে আত্ম-শাসন এই রকমেই হয়; দুই,—আদর্শ কি না? তা, কেরে-ভারীরও ত আদর্শ চাই! এখন যে জবাবটা যার মনে লাগুক। দেখিতে পাও না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যাই প্রকাশ পায়।

* *
*

বলদেখি, এত গরম, তবে কন্‌কনি ধরিল কেন? আর খাদের মুখে কয়লা জমিলে চিত্তে ময়লা জমে কেন? পঞ্চা-নন্দের এই হেঁয়ালি কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই, কমিশন শত করা পাঁচ টাকা।

নমুনা প্রদর্শন।

মুখবন্ধ।

[যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁদের।]

পারি সব, করিনা কিছু; ইহাতেই যত যাহা বলো। ইতিহাস গাঁথিতে পারি, কবিতা বাঁধিতে পারি, উপন্যাস ছাঁদিতে পারি—সবই পারি; তবে কি জানো, আর পাঁচ জনে নাকি প্রায়ই আমার মতন পারে, পারিয়া কোন প্রকারে দিনপাত করে, কাজে কাজেই তাদের রাঁধা ভাতে ধুলো দিতে যাওয়াটা আমা-হেন লোকের পক্ষে বেশ যেন শোভা পায় না। আমি যে পারি, তাহার নমুনা দেখিবে নাকি? তবে দেখো।

সভ্যতার ইতিহাস।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সেই বিভীষিকাময়ী রজনীতে কোরিয়ার রাণী সুজমুখী প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া খানজাহা-খাঁর শিবিরে আশ্রয় লইলেন। নরশোণিতে রাজপ্রাসাদ তখন প্লাবিত হইতেছিল। কিন্তু ইতিহাসের সেই রক্তেই কামস্কাটকার অভ্যুদয় ভিত্তি প্রোথিত হইল। ৩৫৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে কোরিয়ার রাণীর এই পলায়ন সিদ্ধ হইয়াছিল।

রাণীর পলায়নের পর নবাব পক্ষীয় সমস্ত সেনানী এবং সৈনিকগণ স্ব স্ব অস্ত্র তাঁহার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। সমুদ্রের উপকূল-সমূহে দস্যুরা ছয়মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে প্রকারে নৌহরণ করিতেছিল, তাহা সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহাতেই ভারতবর্ষের বাণিজ্য বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। মার্সমান বলেন যে, সংবৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে পঞ্চাশ কোটি মণ ধান্য, তিরানব্বই কোটি মণ গোধূম, একবাক্স নীল, একঝুড়ি পাথুরিয়া কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল; এবং বিনিময়ে

কত কোটি মণ দগ্ধ কচুর যে আমদানী হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করাই দুষ্কর। কিন্তু বাণিজ্যের এমনই বৃদ্ধি এবং কামস্কটকার সৌরভে ভারতের তখন এতই গৌরব হইয়াছে যে, ভারতবাসিগণ সমুদয় দগ্ধ কচু জাহাজ হইতে নামাইতে দেয় নাই; সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সাহিত্য বিষয়েও এই সময়ই ভারতের প্রখরতর উন্নতির কাল বলিতে হইবে। রাসভ সেন নামক মহাকবি এই সময়েই উদিত হইয়াছিলেন। কপিপুঙ্গবের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সকল অদ্যাপি জগতের উপমাস্থল হইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনায় এই সময়ের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ স্ব স্ব পিতার নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। কোন দিন অর্দ্ধ হাত কোন দিন তিন পোয়া পরিমাণে সমগ্র দেশ উন্নতির সোপানে উঠিতেছিল। কিন্তু অপক্ষপাতে ইহাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, ফাঁসী কাঠের আড়-কাঠ পর্য্যন্ত তাহারা উঠিতে পারে নাই। তবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা গিয়াছে যে, আঁতুড় নিবাসী শিশুগণ জলদগম্ভীর স্বরে যে সকল বক্তৃতা করিত, প্রাচীনেরা সকলেই হাঁ করিয়া তাহা শুনিত।

কাল প্রভাবে এ সুখসমৃদ্ধি চিরস্থায়িনী হইতে পারিল না। ১১৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগেই কোরিয়ার রাণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। অতিশয় গ্রীষ্ম নিবন্ধন স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। ছাত্রেরা বাড়ী চলিয়া গেল; মেসগুলা খালি পড়িয়া রহিল; গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত ঝিঙুলা সায়ং সন্ধ্যার পর পথের ধারে সার দিয়া দাঁড়াইল; বাজারে সকল দ্রব্যই সস্তা হইল। গোয়ালারা দুধে এত জল দিতে লাগিল যে, জলাভাবে দেশমধ্যে মহা হাহাকার উঠিল; বামুন ঠাকুরের ডাল পর্য্যন্ত পুরু হইয়া গেল।

১১ই মার্চ্চ অপরাহ্নে টাউনহলে সভা বসিয়া গেল। প্রধান প্রধান বক্তাগণ যথা-সাধ্য রাজনৈতিক কলরব করিতে লাগিল। এমন সময়ে আকাশে মেঘ উঠিয়া বিষম এক বজ্রাঘাত হইল। টাউনহলের ছাৎ ফাটিয়া গেল। বক্তাগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া ভূতলশায়ী হইল। দেশ রক্ষা পাইল। ছাত্রেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল, আর ইতিহাস মুখস্থ করিতে হইবে না।

সেই দিনের বৃত্তান্ত স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল বর্ণে অতীত সাক্ষী ইতিহাসের পোড়া কপালে সোণার দাগ পোড়াইয়া ছবি মারিয়া দেওয়া উচিত।

* *
*

ফুল।

[বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিরচিত।]

আহা কিবা ফুটেছে ফুল!
চামেলী জাঁতি যুথী পারুল শিমুল!
যেনবুড়ী শোণের নুড়ী এলিয়ে দে'ছে চুল!!
পেকে কচ্ছে তুল তুল।
তাই দেখে যুব জনের পরাণ আকুল।
হিয়া কতই ব্যাকুল।
বিরহিণী স্রোতস্বিনী ক'রে কুল কুল,
যেন সাগর পানে ছুটেছে অতুল।
বোধ হয়, কবিতা রচনা করাই ভুল!
নৈলে কেন কাব্য হবে আমার পক্ষে শূল!!
যেন নতুন কাণের দুল,
কিবা মৌমাছির হুল॥
ফুটেছে বকেয়া গাছে খাসা
টাট্‌কা ফূল!!
কবিতা লিখতে গিয়ে, মাখনু
কালি ঝুল!
পাই না বেরুলে
হাইকোর্টের কূল!!
ইত্যাদিয়ের রসিকতাই মূল!!
কবিকে আদর ক'রে বসতে দাও হে টুল।
বিরহিণীর প্রাণের ভিতর কচ্ছে
গুল্‌গুল!!
পঞ্চানন্দ প'ড়ে এবার হবে হুলস্থূল!!
সাক্ষাৎ যদি চটেন তবে দেখছি সুপ্রতুল।
বিরহিণীর কুল,
কাণে দিয়ে তুল,
বুনতে বুনতে উল্
মন দিয়ে পড়ুন্ আমার এই কাব্য-মূল!!

দামের তরে ভাবনা কিরে আমি কেনা বিনি মুল।
এর ভেতর বাদ পড়েছে গঙ্গা নদীর পুল।

* *
*

খবরের কাগজ।

শুভাগমন। বহুকাল পরে, অত্র নগরে, সশরীরে, শ্রীমানের আবির্ভাব হইয়াছে। অর্থাৎ, স্বয়ং পঞ্চানন্দ, কিচির-মিচির দেখিতে কলিকাতায় হাজির।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-কথা। কলিকাতার ময়ল-ফেলা কমিশনররা কর্ত্তব্য কাজ করেন নাই বলিয়া, হবু নরদামার মুখে দাঁড়াইয়া ছোটকর্ত্তা খুব একচোট গালি দিয়াছিলেন ইহাতে ময়লা-ফেলারা চটিয়া আগুন হইয়াছিলেন। ইহারা এত গরম যে মাখনজী প্রায় গলিয়া গিয়াছেন। বেগারে ভাগ্‌ড়া হইবে জানিলে গৃহস্থ মাত্রেই নরম হয়।

ভাষা-তত্ত্ব। অর্থাৎ এ তত্ত্ব বুঝিবার তরে বুদ্ধির অতলস্পর্শ তলায় ডুবুরি নামাইতে হইবে না। ভাষাতত্ত্ব কি না? কালীপ্রসন্ন কহেন যে যিনি পাণিনি মানেন না, তিনি বাঙ্গালাই জানেন না। পঞ্চানন্দের প্রত্যয়ও তদ্বৎ,—ভারত হইতেছেন পুরুষ, মাতা হইতেছেন প্রকৃতি। সুসন্তান বলিলেন যে, তাহা হউক তথাপি বলিতে হইবে ভারত-পিতা নহে, ভারত-মাতা। অর্থাৎ, একটুকু স্নেহ রসের চলচল ভাব অন্তঃকরণে আনিতে হইলে বাবার কঠোরতা কিঞ্চিৎ কমাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ বাবার গোঁপ কামাইয়া, কাছা খুলিয়া দিলেই যে কোমল ভাবটুকু অন্তঃকরেণ আইসে, ভারত-মাতা বলিলে ঠিক সেইটুকুই পাওয়া যায়। পরিষৎ কোন্ পক্ষে?

অজ্ঞানের দোষ। যে ব্যক্তি ভাল ইংরেজি জানে না, এই ভারত-শাসনে কঙ্গরসের দিনে তাহার মরণই মঙ্গল। প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই এ কথার দেদীপ্যমান প্রমাণ বর্ত্তমান। বিডন-বাগানে কঙ্গরসের আটচালা উঠিয়াছে, সম্মুখে ইংরেজি অক্ষরে প্রকাণ্ড "ওয়েল্‌কম"-অঙ্কিত ফলক উত্তোলিত, দোলাইত হইতেছে, পাড়াগেঁয়ে ভূত তাই দেখিতে ছুটিয়াছে। ইংরেজিতে বিদ্যা অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত। রহিয়া রহিয়া ফলকের ইংরেজিটুকু পড়িয়া বলিল,—বেলকমি। অমনি গলহস্ত।

কঙ্গরস।

[অর্থাৎ পঞ্চানন্দ হচ্চেন খেজুর-গাছ, তা'রই জিরেন কাটের রস।]

এবার বারো বছুরী; আর সম্মতির অপেক্ষা নাই। কাজে কাজেই আইনের জোরে জোর বাঁধিয়া, পঞ্চানন্দের মুখাপেক্ষা না করিয়া আদি সমাজের আধ পোয়া পথ উত্তরে সোনাগাছির গা ঘেঁসিয়া, পাঁড়ালের আড়ালে, কঙ্গরসের কারখানাটি

এবার খুবই হইয়া গেল। অধুনা পঞ্চানন্দের বুড়া বয়স, নীচের পাটীর তিনটী দাঁত গিয়াছে। উপর পাটিতেও নড়া চড়া আরম্ভ হইয়াছে। ও-বেলা আধাদশী, আর এ-বেলা আধা দশী করিয়া যোগেযাগে একাদশী সারিয়া, কোন রকমে ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে। কাজে কাজেই এখন চলচ্ছক্তিহীন। ও-পাড়ায় গতিবিধিটা আর ঘটিয়া উঠে না। কোন ক্রমে কাণে শুনিয়া কাজ সারিতে হয়, তাহাতেই দিনগত পাপক্ষয়; আর রাত্রিটাও কষ্টে কাটিয়া যায়। যাঁহাদের এখন চলা-ফেরা অভ্যাস আছে, তাঁহারা চক্ষু চাহিয়া দেখিবেন, আর যদি পঞ্চানন্দের ভুল ভ্রান্তি দেখেন, তবে না হয় খুঁড়ি দিয়া লইবেন।

যাহা হউক, সময় থাকিতে স্বর্ণ খালাস পাইয়াছে, এই পরম সৌভাগ্য। বিশারদের বৃষোৎসর্গটা আগে আগে চুকিয়া গেলেই ভাল হইত। যা হয় নাই, তার চারা নাই। কষ্টে মষ্টে তুকুড়ি সাত, আর হাতের পাঁচে পিত্ত রক্ষাটা ত চাই। খেলা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাওয়া—বাপ। তাও কি প্রাণে সহ্য হয়।

নীলু খুড়োর মাসী উনুনের উপর চাটু চাপাইয়া দেখিলেন, ভাঁড়ে তেল নাই। নীলু সুবোধ ছেলে, ভাঁড় হাতে করিয়া বাজারে ছুটিল, রাস্তার ধারে তিন জন ইয়ার আর এক জোড়া তাস। কাজে কাজেই কাতের অভাব। ভাঁড় থাকিল, বাড়ীতে চাটু ফাটিতে লাগিল, নীলুর মাসী কান্নার চোটে পাড়ায় হাট বসাইলেন। এদিকে নীলু আস্তে আস্তে ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া গ্রাবুর সাহেব বিবি বাছিতে লাগিল; আর গোলামের গৌরব দেখিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। আমার কথা নহে, পঞ্চানন্দের বাক্য নহে, ঐ নীলু খুড়োই স্বয়ং বলিয়াছিল। পরদিন পাড়ার লোকে কৈফিয়ৎ তলব করিলে, বলিয়াছিল,—"খেলা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাওয়া, বাপ! তাও কি প্রাণে সহ্য হয়'!"

বুড়া বয়সের দোষই এই। কি বলিতে বলিতে কি কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। কহিতে গেলাম কঙ্গরসের কথা, দেখ দেখি, আসিয়া পড়িলাম কোথা? কিন্তু, তাও বলি আবোল তাবোল আমি একা বাকি না, ওটা যস্মিন দেশে যদা চারঃ। একালে বড় বেশী দিন ত কেহ বাঁচে না, কাজে কাজেই ছেলেতে বুড়াতে তফাৎ খুব কম।

তা হউক। একবার ধৈর্য্য ধরিয়া কোমর বাঁধিয়া বারো বছুরী কঙ্গরস কাহিনী কহা যাউক। বঙ্গদেশে কঙ্গরসের সৌরভে দিঙমণ্ডল পরিপূরিত, ভারতের অলি গলি হইতে ভারতের ভ্রাম্যমাণ অলিকুল, অগত্যা উড্ডীয়মান। কেহ সখে, কেহ পেটের দায়ে, কেহ চক্ষু লজ্জায়, কেহ সঙ্গ দোষে। মহা হৈ হৈ, রৈ রৈ শব্দ। অন্তঃশয্যা রেলের গাড়ী (মৌলিক ফল) তাড়াতাড়ি আসিয়া হাবড়ার প্লাটফরমে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে (কুরুচির কথাটা কহিব কি?) গর্ভস্রাব।

এখন অভ্যর্থনা করে কে? অর্থাৎ ঝাঁকুড় ঝাঁটে কে! বুড়ার ত মহা ভাবনা, চক

টিপ টিপ করিতে লাগিল। সুতরাং পাত্রের অভাবে পত্র, বচনের বদলে রচন—তাই বা শুনায় কে? রাসে বিহরিতে পারে যে, অথচ নির্দ্দোষটুকু হওয়া চাই, কেন না রসের ব্যাপার হইলেও এত বাজে রস নয়—কঙ্গরস। যাহাই হউক, এবার তিল কাঞ্চনেই কার্য্যোদ্ধার। তবে এটা মানা উচিত যে, যেমন তিল, সোণাও তাহার উপযুক্ত।

খুব রগড় লাগিয়া গেল। সুরে আরম্ভ, আর চিরকাল যা হয়, বে-সুরেই শেষ। রূপের ছবি, কালের কবি, স্বয়ং রবি গলা ছাড়িয়া গাহিলে, কার কোমল প্রাণ এত কঠোর যে, ঘুপ্‌চি মেরে, আর ঘরের ভিতর বসিয়া থাকে? সে কালে গানে ভুলিত কেবল গয়লানী, এ কালে—যেখানে রাজা ও রাণী—কুচপরোয়া নেহি, বলিয়াই ফেলি—সেইখানেই বৌঠাকুরাণীর হাট।

ভানু সিংহ গাহিয়াছিল,—এখনকার কেশরদংষ্ট্রানখ বিশিষ্ট ভানু সিংহ নহে; কিন্তু তস্য দাদা পরদাদার পরদাদা, বৃদ্ধ গলিত নখদন্ত ভানু সিংহ গাহিয়াছিল,—

রসবতি, কি কহব তোয়
লাজে ডারলি মোয়।
বাঁশরি রব শুনি, জাতি কুল নাহি গণি,
ধাবন উচিত কি হোয়!

তুঝে গোকুলে মানত
তু ঝে লো সেয়ানী,
ভানু নাহি জানত
তু হু অ-গেয়ানী।

একালে যে আবার তাই গাইতে হইবে, এ বাপু কে জানিত! বেটাছেলে, কাছাখুলে, জাতিকুল ভুলে, এই ঘোর কলিকালে এমন ছুটোছুটি করিবে, তা'কি আমি জানি? নে মেনে, আমারি হার, কিন্তু তো'দের ত এই সেয়ানী!

তা'র পর, রথ দেখা আর কলা বেচা, অর্থাৎ কেন-কাহিনী। এ কেনটা বাঙ্গালা কেন নহে, এটা আসল বিলাতী কেন্—যাহার মানে বেত্র অর্থাৎ বেত। বিশ্বাস না হয়, পিঠের কাপড় খুলিয়া দেখ। আর তখন যাহারা হাত বুলাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন বহুত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তেল বুলাইতে হইবে। পাঁচু বড় একটা পাশ কথা ক'ন না; বরং তোমরা মিলাইয়া দেখিও।

তা'র পরেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ; বর্ণনে কেবল পুঁথির বৃদ্ধি, বাহারও নাই, বলিহারিও নাই।

এই সব হইল আড়ে আড়ে কথা। একটু বাঙ্গালা করিয়া বলি। যাহারা ভেড়ো বাঙ্গালী, তাহারা শুনুক, শিখুক, বুঝুক, আর মজুক।

কঙ্গরসটা হইতেছে ভারত তোলানী মেলা। ভারত এখন পতিত, তা'কে একটু টেনে টেনে তোলা, তাই দশে মিলে সুতরাং মেলা!

এখন ঐ তোলাটা একটু আধটু তোলা নহে, একেবারে তেতলায় তোলা। কঙ্গরসে গোড়ায় গড়াগড়ি, তাহার পর হুড়াহুড়ি, তাড়াতাড়ি, বিলাতী ছড়ি, তাহার পর দৌড়াদৌড়ি, অবশেষে যে যার আপন আপন বাড়ী। বছর বছর এই। সকল তন্ত্রেই ঐরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়;—পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে; উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা ইত্যাদি। সোজা বাঙ্গালায় নাগরদোলা বলিলে কতক কতক আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

· সেকালে ছিল অজ্ঞান, অর্থাৎ মোটেই ছিল না। এখন ত সেকাল নাই, এখন একাল; সাফ বিজ্ঞান, একেবারে বিগত। সেকালে যদি কেহ পড়িত, অন্যে তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিত। এখন যদি তুলিবি, তবে পুলি আন;—এ পুলি তোমার পৌষ মাসের পিঠেপুলি নহে। বিলাতী বিজ্ঞানের দড়ি দিয়া, হেঁচকা টানের আসল পুলি। বাঙ্গালিতে যাকে বলে কপিকল; কপির দল কিনা!

সাহেব স্বয়ং বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভারত যদি তুলিতে হয়, তবে পুলি চাই, আর কুলি চাই! তা আথেরে তোমরা আছো, এদিকে বড় ভাবনা নাই; বিলাতের বিল্-বৃক্ষে আমি পুলি বাঁধিয়া দিব, তোমাদের ভাবনা কি? তোমরা দড়ির যোগাড় কর, তা হইলে নিশ্চিন্ত।

প্রভু পঞ্চানন্দ কহিতেছেন যে অস্মদ্ অর্থাৎ এই অধম জন এ কাজে অপারগ। বুড়া হইয়াছি, মাথার চাঁদি ফাঁক হইয়াছে. আর বেলতলার কথা আমার কাছে তুলিও-না। তায় এ পক্ষ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণে কাক। ও বেল পাকাই হউক, আর কাঁচাই হউক, আমার কি? তবে তোমরা, হে ভারত-মাতার কৃতিসন্তানেরা, তোমরা নাকি হাটের নেড়া, তোমরা সবই পার; সাধ থাকে বড় বড় বিলাতি থান মস্তকে জড়াও আর উচ্ছন্নের টালুতে খুব কষিয়া গড়াও।

আমি শারীরিক ভাল আছি। আগতে তোমাদের কুশল লিখিবে। আমার নাতনীগুলিও ভাল আছে। সে খপর অবশ্যই তোমরা জানো। পাঁড়ালের পরদার আড়ালে তা'দের কেউ কি যায় নি? বে-পরদার কথা আমি কহিব কেন?

দূত-সংবাদ ।

[অর্থাৎ রিপোর্টারের রিপোর্ট

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুর—

মহাশয়ের পাদ পদ্মে প্রণতি পুরঃসর অধীনের নিবেদন এই যে, আমি আপনার আজ্ঞা পাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথ তো ধরিলাম। কিন্তু ঠাকুর, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, তোমার এই কলিকাতা সহরে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কাহারই থাকে না ত আমার থাকিবে কেন? তুমি আমাকে হুকুম দিলে যে কঙ্গ্রেসে কি হয়, তাহা দেখিয়া আসিতে হইবে। আমি চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে এখন কোন্ পথে যাই। ট্রামের গাড়ী উজান ভাটি সমান দৌড়িতেছে। কোন্টা উজান কোনটা ভাটি, কোন্ দিক্টাই বা মুখ, কোন দিক্টাই বা লেজ, কিছুই ঠাওরাইতে পারিলাম না। অগত্যা উত্তর পূর্ব্ব না ভাবিয়া যে ট্রামখানা সম্মুখে পাইলাম, টপ্ করিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিলাম! শুনিলাম, এ সহরে ইহাই দস্তুর। অতএব আপনার হুকুম তামিল করিতে গিয়া আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া ফেলিযাছি, তাহাতে নিজগুণে ক্ষমা চাহি-তেছি।

আপনি যাইতে বলিয়াছিলেন, আমি গেলাম। কোথায় গেলাম, সেটা প্রথম বড় বুঝিতে পারি নাই। আমার বুদ্ধির দৌড় ত আপনার মাপাই আছে। আমি জানি যেন ঠিক ঠিকানাতেই পঁহুছিয়াছি। খোদ ক্ষুদ্র লাট সাহেবের বাড়ীর পাশেই, তাঁহা-রই আশ্রয়ে যে বাগান প্রস্তুত হইয়াছে, আমি ভাবিলাম, এই বুঝি আপনার সেই বলিয়া দেওয়া বিধান-বাগান। বে-ওজর কবুল করিতেছি যে এটা আমার স্পষ্ট ভুল; কিন্তু তখন সেটা বুঝিতে পারি নাই। আপনিত অবগত আছেন যে, আমার আক্কেল কিঞ্চিৎ বিলম্বেই যোগায়।

যাহা হউক, আমি কোন স্থানের প্রতিনিধি নহি, আর নিতান্ত অসভ্য, এইটুকু স্মরণ করিয়া টিকিট কিনিতে অগ্রসর হইলাম। দ্বারে যে দ্বারী ছিল—পশ্চাৎ জানিতে পারিয়াছি যে, এ ব্যক্তি মাসে মাসে মাহিনা পায়, বলন্টিয়ার নহে দ্বারের সেই দ্বারী আমাকে দর্শক জানিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল; কিন্তু টিকিট দিল না। পয়সা লইল মোটে এক আনা, কিন্তু একবার কট্ কট্ করিয়া ঘুরাইয়া দিল। আপনি নাকি টিকিটের জন্ত আমাকে দুই টাকা দিয়াছিলেন, তাই তখন আমার মনে হইল যে ঐ কট্মট্টানিতেই এক টাকা পনের আনা শোধ গেল। তা বলিতে কি ঠাকুর, অত দণ্ড দেওয়ার চেয়ে ও এক বার কট্কটানি ভাল।

দুর্গা বলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। চতুর্দ্দিকে মহান্ কলরব, সেই এক অপূর্ব্ব শোভা। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিবর্গ সমবেত, দেখিয়াই ত আমার

মন প্রস্ত মোহিত হইয়া গেল। আপনি অবগত আছেন যে, মানুষের যখন আক্কেল গুড়ুম হয়, তখন চক্ষের দৃষ্টি ঠিক থাকে না। সেই জন্যে সে সময়ে প্রতিনিধি পুঙ্গব পুঙ্গবীদের আকার প্রকারের প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

হতভম্ব অবস্থায় কোন্ দিকে প্রথম যাইব, ইহাই ঠিক করিতে না পারিয়া সহসা একে বারে বাঘের মোহড়ায় গিয়া পড়িলাম। তখন কিন্তু ঠিক বাঘ বলিয়া আমার ঠাওর হয় নাই। সেই প্রতিনিধির ভাব মগজে ঘুরিতেছে কি না? আর বাঘ গুলিও পোষা, পিঞ্জরাবদ্ধ; হালুম করিলে কি হয়, গড়াদের ফাঁক দিয়া দাঁত ও চলে না, নখও গলে না। কাজেই তখনও আমি নির্ভয়, নিঃসংশয়। 'হালুম হালুম' শব্দে তখন মনে হইল যে, এটা বুঝি অভ্যর্থনা-সমিতির সাদর সম্ভাষণ হইতেছে।

মনোগুণে আমার নয়নবাণ তখন অন্যদিকে হানিত হইল। (দোহাই ঠাকুর! আমার ভাষার গাঁথুনির দিকে সুনজর করিবেন।) দেখি যে, গুটিকতক কালো কালো সিংহ রহিয়াছে; মহতী দুর্ভাবনা হইল, ভাবিলাম সিংহত সাদাই হয়, তবে এ কি রকম? আমার মনের সেই দিক্‌ভ্রমটা বরাবর মনে রাখিবেন; তখন জানোয়ার বলিয়া ঠাওরাইতে পারি নাই, সেই প্রতিনিধিই ভাবিতেছি। ভাবিলাম হবেও বা, এই গুলি বুঝি বিলাত-ফেরৎ।

আপনি নাকি খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার হুকুম দিয়াছিলেন, কাজে কাজেই কোন যায়গাতেই তিষ্টিয়া কিছু দেখিতে পারিতেছিলাম না। এক খাবলা এখানে এক খাবলা সেখানে। দূতের যেমনটি কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর প্রাণের ধন পঞ্চানন্দ, তাঁহার দূত আমি। আর ছাই, আমার কি একটা কাজ যে কেবলই দেখিব! ক্ষণেক দেখিতেছি, ক্ষণেক রিপোর্টের মুস্কুবিদা ভাবিতেছি, ক্ষণেক ঘাস প্রণয়িনীর পুরাকালে পীন, ইদানীং কালকবলে ক্ষীণ গণ্ডপ্রান্তবর্ত্তী শ্রবণ-বিবরে আমার এই দর্শন ফলের পীযূষ ধারা পড়িয়া পড়িয়া কেমন প্রেমের সহিত প্রবাহিত করিব, তাহাই ভাবিতেছি। ইহাতে কি দেখাই হয়, না ভাবাই যায়?

ফলতঃ তথাপি আমি দেখিতেই লাগিলাম। নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত, সেই অরণ্য-প্রাণ-মর্দ্দন জীবগণকে প্রতিনিধি মনে করিয়া দেখিতেই লাগিলাম। জলচর, স্থলচর, খেচর, উভচর, সর্ব্বচর, সবই দেখিতে লাগিলাম। তখন একটু একটু চট্‌কা যেন ভাঙ্গিতে লাগিল। মনের ভিতর হামাগুড়ি দিয়া একটু একটু করিয়া সন্দেহ যেন সন্তর্পণে প্রবেশ করিতে লাগিল। যখন দেখিলাম যে, নীল, পীত, লোহিত, বিবিধবর্ণ রঞ্জিত কতকগুলি জীব পক্ষীর আকারে ধরণীতল কাকলি কলিত করিতেছে, তখন একবার সংশয় হইল যে, ইহারা প্রতিনিধি, না পাখী? সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহকে একটুক সরিতে বলিলাম; মনকে বুঝাইলাম যে মনেরই ভ্রম, ইহারা পক্ষী নহে, প্রতিনিধিই

বটে। বুঝাইলাম যে, ইহারা একটু উড়ুক্ষু প্রতিনিধি। ইহারা যেখানে থাকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া এডাল ওডাল করাই ইহাদের কাজ। তা, প্রতিনিধি এমন হয়! আমার মন খুব পোষা মন কিনা, ঘাড় হেঁট করিয়া আমার কথাটি মানিয়া লইল।

তাহার পর দেখিলাম সর্পাকৃতি। আবার সন্দেহ, অধিকন্তু কিঞ্চিৎ ভয়। কি জানি ঠাকুর, কোন্ পাশ দিয়া ছোবল মারিবে! আমার পাঁচটি প্রাণ একেই বারে দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিবে। আবার মনকে সমঝাইলাম, সমঝাইবার সুবিধাও একটু ঘটিল, কেননা, অধিকাংশই যে নির্ব্বিষ। ইহা বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না। বলিব কি ঠাকুর, প্রায়ই ঢোঁড়া। তোমার কৃপায় দূতগিরী করিতে করিতে অনেকবার নাকি দেখিয়াছি, মাতালের দলে শুধু চাটের লোভে এমন লোক অনেক জোটে যে, তার উপরের সাত পুরুষও কখনও মদ খায় নাই, নীচের সাত পুরুষও কখনও খাইবে না। মনকে সমঝাইলাম যে, ইহারা বুঝি কঙ্করসের চাট্‌খোর প্রতিনিধি হইবে।

ক্রমেই কিন্তু গোল বাধিতে লাগিল। মনটা একগুঁয়ে কিনা! বারে বারেই সন্দেহ করে, বারে বারেই বলে যে, এগুলা প্রতিনিধি নহে, যাহা মনে হইতেছে, তাহাই বটে। বাস্তবিকই মনকে বুঝান কি সোজা। স্পষ্ট দেখিতেছি, বানরের মূর্ত্তি, হাব ভাব ভঙ্গি সবই বানরের। একবার ভাবিলাম যে, এগুলা বুঝি আসল সাহেব হইবে। অন্ততঃ এদেশের সাহেব না হউক, যে সাহেবে আমাদের সর্ব্বদা দৃশ্যমান সাহেবগুলাকে পয়দা করিয়াছে, ইহারা বুঝিবা সেই সাহেবই হইবে। পূর্ব্বপুরুষের চেহারা ত চক্ষে দেখি নাই, কেবল ডারবিনের পুঁথিতেই পড়িয়াছি। আর আমি স্বয়ং কুলিনের ছেলে, আপন ঘটকের লেখা কুলজিতে যেমন বিশ্বাস করি, অন্য জাতির কুলাচার্য্যদিগকে ও অন্য জাতির বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তেমনি বিশ্বাস করি। অপক্ষপাত ত একটা চাই! যখন ইহারা মুখ খিঁচাইতে লাগিল, উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল, তখনও মনকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলাম। মনকে বলিলাম, হে মন, তুমি ভুল করিতেছ! তুমি যেটি মনে করিতেছ, সেটি না মনে করিয়া হে মন, ভাবো না কেন যে, "অমৃতবাজার পত্রিকা" পড়িতেছ!

তখন মন আর মানে না, গোলের ক্রমেই বৃদ্ধি, চক্ষু ফিরাইলাম। কিন্তু হরি হরি, দেখিতে লাগিলাম—কেবলি গাধা। ঠাকুর, যথার্থ বলিতেছি, দোহাই ঠাকুর! তোমার দিব্য করিয়া বলিতেছি,—যে দিকে ফিরাই আঁখি, গাধাময় সকলি দেখি!

আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না, পলাইলাম; ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দ্বারিকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয় আপনার দুইটি পায় পড়ি, প্রবঞ্চনা করিবেন না, আমাকে যথার্থ বলুন, একি কঙ্করস নহে?"

দ্বারী আমার কথা শুনিয়া ভীত—চকিত—স্তম্ভিত, একেবারে থতমত! একটু সামলাইয়া আমাকে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পাগল?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে, দেখিয়া শুনিয়া প্রায় তাহাই হইয়াছি।"

দ্বারী বলিলেন,—"এ যে পশু-শালা।"

আমি তখন যোড় হাত করিয়া তাহাকে বলিলাম—"আপনি ভদ্র লোক, গালি দিবেন না। জু বলুন মাথা পাতিয়া লইব, কেন না, জু ইংরেজি, নিদেন বিলাতের আমদানী। আমরা ইদানীং মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে শানকী টানাটানি আরম্ভ করিতেছি। না হয় তাদেরই জবানে বলুন, চিড়িয়াখানা, কিন্তু অমন বেয়াড়া, বেল্লিক, চব্‌চবে বাঙ্গালা ভাষায় বলিবেন না—যে পশুশালা।"

দ্বারী মহাশয় বেশ কাজের লোক; "তোমার সঙ্গে পাগলামি করিবার ফুরসুৎ আমার নাই"—এই বলিয়া স্বহস্তে আমার গ্রীবাদেশে একটী অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক স্বজাতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে পর, আমি পথি-মধ্যে পতিত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এই আমার নিবেদন ইতি।

প্রাচীন পঞ্চানন্দের উপদেশ।

বৎসগণ! রসিকগণ! কবিগণ! ভাবুকগণ! লেখকগণ! এবং তৎ তৎ স্ত্রীলিঙ্গগণ! আমার একটা কথা শুন। যদি বিপজ্জালে জড়িত হইবার মতলবে নিতান্তই ব্যাকুল না হইয়া থাক, যদি ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্মসাৎ হইবার উৎকট বাঞ্ছা অন্তঃকরণে উদিত না হইয়া থাকে, তবে এই প্রাচীনের পরামর্শ—বুড়ার কথা—বিশেষ মন দিয়া শুন।

১। কদাচ কুরুচি বাহির করিও না। কেন না, ব্রহ্ম কোপানলে, উহা ইন্ধন স্বরূপ। কিছু লিখিতে হইলে, কিম্বা কহিতে হইলে, কদাচ অভিধানের কোন শব্দের প্রয়োগ করিও না। কেন না, বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধনের নিমিত্তে একাক্ষর কোষ আছে; প্রত্যেক অক্ষরের দু'টী দশটী করিয়া মানে আছে।

২। নিতান্তই যদি শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, না করিলে কারবার বন্ধ হয়, সংসার অচল হয়, তাহা হইলে মনের ভিতরে পাপ থাকিবে থাকুক; কোন একটি শব্দকে বাহির করিবার পূর্ব্বে, সুরুচি ঢাকিবার সদুপায় স্বরূপ শব্দটীকে প্রথম কৌপীন তাহার উপর জাঙ্গিয়া, তাহার উপর পেন্টুলান পরাইয়া তবে বাহির করিবে।

৩। "তার ভেঙ্গে দিয়েছি ঠ্যাং।
আমার সেটি খাঁটি সোণা
নাই কো তা'তে রাঙ্।

বলে গেছে ত্রিম্বক তেলাও
আর হোয়েছ স্থাং।
কুমীর-ভরা নয়কো আমার গাঙ্।
পদ্মের মধু খায় নাইকো ব্যাঙ্।" (১)

ইত্যাকার শব্দ প্রয়োগ কদাচই করিও না। ইহাতে যতগুলি শব্দ আছে, প্রত্যেক-টির দরুণ বাঙ্গালা মুলুকের অধিকাংশ অধিবাসী, নয় মাস হিসাবে, দিয়া দিতে পারেন। এই প্রথম ধরো "ভেঙ্গে দিয়েছি ঠ্যাং," এটা অতি কুকথা। ইহার উপর আমাদের খোঁড়া ডাক্তার উকীলের চিঠি দিতে পারেন। জইণ্ট মাজিষ্ট্রর কিসার সাহেব কোথায় কেমন করিয়া ঠাং ভাঙ্গিয়া ছিলেন, এখনও ষোল আনা সারে নাই,তিনি উকীলের চিঠি দিতে পারেন। যোগীন বসু গাড়ীর পাদান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবার যোগাড় করিয়াছিলেন, তিনিও দিতে পারেন। ফল কথা, যে কোন ব্যক্তির আজন্ম ঠ্যাং নাই, কিম্বা কর্ম্মফলে ঠাং ভাঙ্গিয়াছে,—স্থানে-অস্থানে গমনাগমনের দোষেই ভাঙ্গুক, কিম্বা বাতে ধরিয়াই ভাঙ্গুক, প্রত্যেকে উকীলের চিঠি দিতে পারেন। কিম্বা যাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিতে পারে, কিম্বা ঠ্যাং ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা আছে, ইঁহারা সকলেই এবং প্রত্যেকেই উকিলের চিঠি দিতে পারেন। এই গেল স্বভাবোক্তির ভাঙ্গা, এ ছাড়া রূপকের ভাঙ্গা আছে। সুতরাং ঠ্যাং ভাঙ্গাটা অতি ভয়ানক জিনিষ। আর ভাঙ্গা বাদ দিয়া, কেবল ঠ্যাং আরও ভয়ানক। কেন না, তা'তে বিস্তর সম্ভাব, অসদ্ভাব, ভাব, অভাব জন্মাতে পারে। কেননা, ঠ্যাংটা নাভী-কুণ্ডলের নিম্নভাগে;—ও-দেশটাই খারাপ। এই বিলাতী সমাজে ইষ্টাকিনের মুড়ী ছেঁড়া থাকিলেও, সে দেশের সভ্য-সামাজিকেরা, ল্যাংটো বলিয়া থাকেন। বেদান্ত মতে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, উহাকে কুরুচির তন্মাত্র বলা যাইতে পারে। ইহাতে আরও কত কথা উঠিতে পারে। ব্যাকরণের প্রকরণ ভেদে কত ভয়ানক কথাই উঠিতে পারে।

ঐরূপ "খাঁটি সোণা" বলিলে, ভয়ঙ্কর লাইবেল হইতে পারে। সনাতন দাস, স্বর্ণ বাই, ইত্যাদি যাহার নামের সঙ্গে কাঞ্চনের কিছু কাছাকাছি আছে, সেই লাই-বেল করিতে পারে। সোণাতে যদি বা পরিত্রাণ পাও, ঐ খাঁটি কথাটায় কিন্তু একেবারেই মাটি, উহার মধ্যে কত ইঙ্গিত, কত ইষারা, কত অকথা, কত কুকথা চাপা আছে, তাহাতে তুমি জান না। ঐ খাঁটিটা একটা ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। অর্থাৎ ব্রহ্মার ডিম। ফাটিলেই কত কি বাহির হইতে পারে। তুমি তাহার কিছু জান না বলিলে, ছাড়িবে না; তাহাদের ঘরে ঘরে জানা থাকিলেই যথেষ্ট।

তদ্রূপ রাঙও খুবই খারাপ। রামদাস সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধাকান্ত দেব-

(১) ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত একটি গান।

ইহাঁরা সকলেই নালিশ করিতে পারেন। ত্রিম্বক তেলাঙ বলিলে সোলাপুর লাগায়ৎ ত্রিশ কোমালী সকলেই নালিশ করিতে পারেন। এই বসন্তের পরই যাহারা বোম্বাই আম বেচিবে, তাহারাও নালিশ করিতে পারে। আর হোয়েন্থ স্যাং,—ও রজনী শুধু পড়িয়াই আছে।

পুনশ্চ দেখ, "কুমীর-ভরা গাঙ"—বলিলে কুমীর-কোলার বাঁড়ুয্যেরা চারি ভাই এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি সকলেই নালিশ করিতে পারে। আর কুমারটুলির কবরেজরা যে পারেন না, তাও নিশ্চয় বলা যায় না। কুমারীরা স্বয়ং পারেন, আর কিঞ্চিৎ কুমারী যাহার নামে যোড়া আছে, তিনি ভরা গাঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখাইয়া যে একটা কুরুক্ষেত্র কারখানা করিতে পারেন, কোন্ কোর্টের কোন্ কৌন্সিলি একথা না বলিবে? তা ছাড়া গাঙ্গে, গঙ্গাধর বাঁড়ুযো আছেন, গাঙ্গপুর ষ্টেশনে—যেখানে রেলের গাড়িতে ঠোকাঠুকি হইয়াছিল, তিনি আছেন, ইহাঁরাও নালিশ করিতে পারেনই; গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তানেরা সকলেই পারেন। ফল কথা, আপন কাসুন্দির হাঁড়ি নাড়িতে যিনি রাজী, তিনিই নালিশ করিতে পারেন। আর পদ্মের মধু, সে শুধু লাইবেল নয়, সে একেবারে অশ্লীল!!

ইস্তক চুঁচুড়া লাগাৎ বালেশ্বর সর্ব্বত্রই নালিশ চলিতে পারে। পদ্ম জেলেনী নালিশ করিতে পারে; আর মধু খানসামা, তাহার বাটীতে মাছ কিনিতে যায়, সে ত নালিশ করিতে পারেই। বইওয়ালা পদ্মনাথ, আর বৌ-পদ্দের গলিতে যত লোক থাকে, তাহারা;—ইস্তক পদ্মনাভ অথবা পদ্মনাভের সৃষ্ট পদার্থ যা কিছু ছিল, আছে বা হইবে, নালিশ করিতে পারে।

এ ছাড়া নিতান্ত চলিত কথাও কহিবার যো নাই। "তুমি কি বাড়ী বাঁধা দিয়াছ?"—এ কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই। যেহেতু বাড়ী বলিলে অনেক অনেক স্থলে গৃহিণী বুঝায়, যথা 'বাড়ীতে' আজকে বল্‌ছেলো যে, অমুক হয়েচে। বাড়ী মানে বাড়ী, ইহা বলিলে নিষ্কৃতি পাইবে না। দেখনা কেন, বিহার শব্দে অহিংসা পরমো ধর্ম্ম, চিরকৌমারব্রত, বৌদ্ধদিগের মঠ বুঝায়; কিন্তু সেটি ত কেহ ধরে না, ঐ কু-টিই ধরে। "বঙ্গবাসী"র মরসুম পড়িয়াছে, এ রকম শব্দ ব্যবহার করিবার যো নাই। মরসুমে "সুম" আছে, "কুসুমেও" সুম আছে। তবেই "সুম" কুসুমের দশ আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি হইল; কু বাদ দিলেও ছয় মাস।

ফল কথা, রুচিবিকার যে অসহ্য, তাহার প্রমাণ ত পাইয়াছ। কিন্তু সে বিকার কাটাতে যদি রুচি-মকরধ্বজের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে, বৈদ্যেরাই—।

৪। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার দরকার নাই। চুপ করিয়া থাকাই চতুরের কাজ। কথা

কহিলেই কাহারও না কাহারও কুৎসা হয়, কুৎসা হইলেই কেলেঙ্কারী; কেলেঙ্কারী হইলেই কারাবাস, কেননা, আইনে বলে যে, বাঘে বসন্তীর লাজ নাই, দর্শন কয়ন্তীরই লাজ।

৫। নিতান্তই যদি লিখিতে হয়, আর লেখাতে আমার সমান গুণপণা তোমার না থাকে, তবে নিয়ে একটা নমুনা রচিয়া দিতেছি, এই মত লিখিও! বোধ করি, ইহাতে বড় বেশী কথা উঠিবে না। রচনার নমুনা এই,—

অমুকের সঙ্গে অমুকের অমুক হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় অমুক উপস্থিত হয় হয় হইয়া উঠিল। তখন কোন রকমে অমুক অমুক পড়িয়া একটা অমুক করিয়া দিলেন। ইহাতে অমুকের দোষ, কি অমুকের দোষ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আদৌ অমুকের সহিত অমুক হইয়াছিল কি না; তাহা আমরা জানি না। আর অমুক ত সে বিষয় কিছুই জানিত না, কাজেই অমুককে অমুক করিতে হইল। অমুক বলিল যে, তুমি অমুক করিয়াছ। অমুক বলিল যে, আমি অমুকের কিছুই জানি না। ফলতঃ অমুকের যখন অমুক হইয়াছিল, তখন অমুক দিকে জেদ না করিয়া, অমুক কাজ করা ভালই হইয়াছে। আমরা মোটেই এ কথা বলিতাম না; কিন্তু অমুক না কি অমুক করিয়াছে, কাজে কাজেই উল্লেখ করিতে হইল।"

এই হইতেছে প্রশস্ত রচনা-প্রণালী। যদি নিতান্তই নাম ধাম দিতে হয়, তাহা হইলে আত্মীয় স্বজনের নাম পর্য্যন্ত ভাগ্যে ভাগ্যে করা চলে। যথা, ক্ষেত্রসেন ধার্ম্মিক লোক, ঘরের লোক, তাঁহার নাম করিলে লাইবেলের ভয় নাই। টাকার যোগাড় থাকিলেও কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারে। যদি তুমি হিন্দু হও, নগদ একটা হাজার গণিয়া দিতে পারিলেই বিশেষ গোল আর হয় না। যে হেতু শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।"

দুর্ভিক্ষ এবং বিউবনিক প্লেগ।

[বিশেষ সংবাদদাতার লিখিত]

সংবাদদাতা হইলেই সাহেব হইতে হয়; সাহেবী পরিচ্ছদ পরিতে হয়; সাহেবের মতন হাতটীও নাড়িতে হয়; মধ্যে মধ্যে রুমাল দিয়া মুখও ঘষিতে হয়; চুরুটও খাইতে হয়। রং কালো হইলেও আমি সাহেব সাজিলাম। কালো কোট, কালো পেনটুলন, আর এদিকে কালো বর্ণ আর কালো চুল যেন যমুনা যমুনা সঙ্গম। যেন কাক কাদম্বিনী সঙ্গম! যেন কালীমাখা কুলকুসুমের সহিত দ্বারিকানাথ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গম!

আপনার চেহারা ভাবিয়াই আপনি লজ্জিত হইলাম। এ দিকে ত ট্রামের পাচ

সম্বলে দশটী পয়সা মাত্র সম্বল। ভাবিয়াছিলাম, চলিয়া গিয়া পয়সা কটী বাঁচাইব; কিন্তু এ রাজবেশে চলা উচিত কি না, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ-বার্ত্তা এবং মড়ক-বার্ত্তা রিপোর্ট করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত। কলিকাতা ভারতের ভিতর। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার ব্যাপার রিপোর্ট করাই স্থির হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ভিতর ত এই দর্জ্জিপাড়া! আজ কেবল যদি দর্জ্জিপাড়ার রিপোর্ট করিয়া কাটাই, তাহা হইলে, ট্রামের এই দশটী পয়সা উপরি-পাওনা হয়। ঐ দশ পয়সায় গৃহিণীকে দিয়া যদি নলেন গুড়ের নবাৎ দিতে পারি, (কারণ গৃহিণীর সদাই অরুচি) তাহা হইলে, অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত বেশ সদ্ভাবে এবং স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। উ-হুঁ, তা হইবে না; একই রকম জিনিষ লইয়া গেলে, গৃহিণীর তাদৃশী প্রীতি হইবে না। গৃহিণী ইলিশ মাছের ডিম বড় ভাল বাসেন! কিন্তু মায়ের জ্বালায় আর তাহার খাইবার যো নাই; মুখ ফুটিয়া বলিবারও যো নাই। দুই পয়সার ইলিশমাছের ডিম লইয়া গেলে হয় না! উহুঁ, তা হইবে না, ভাজিয়া কাগজে মুড়িয়া, পকেটে করিয়া লইয়া গেলে, তবে গৃহিণী খাইতে পাইবেন। ঘরে খিল দিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া, গৃহিণী যদি ইলিশ মাছের ডিম ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে, মা কিছুতেই দেখিতে পাইবেন না। তবে গৃহিণী এক আপত্তি করিবেন ও যে সক্‌ড়ি! আমি প্রথমে বলিব, সক্‌ড়ি হইলেই বা। কেহত আর দেখিতেছে না! তাহা হইলে, আর সক্‌ড়ি হইল কেমন করিয়া? তাহাতেও যদি সহধর্ম্মিণী অসম্মতা হয়েন, তবে বলিব গঙ্গাজলে দোষ নাই। গৃহিণী যদি জিজ্ঞাসেন, তেলে ভাজা মাছের ডিম, গঙ্গা জল কোথা হইতে আসিল? আমি বলিব গঙ্গা জল না হউক, গঙ্গাতীর ত বটে। বিশেষ, উহা গঙ্গার ইলিশ। ঐ ডিমের হাড়ে হাড়ে গঙ্গার জল প্রবিষ্ট আছে! বিশেষ কথা, এই কুসুম কুসুম গরম ইলিশ মাছের ডিম ভাজা প্রণয়িনীর সম্মুখে ধরিলে, এত বিচার-বিতর্ক আদৌ উঠিবে কি না, সে পক্ষেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি বলিব, প্রাণ-প্রেয়সি! ঘোমটা দিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন কর!

গৃহিণী কচি কচি লাউ-ডগা খাইতে ভালবাসেন। আধ পয়সার তাই! ভাসানো দেশী কুল মুখরোচক,—নয়? এক পয়সার ঐ কুল। আচ্ছা, বাজারে, সরু-চাক্‌লি পাওয়া যায় কি? ভীম নাগের সন্দেশ যখন অত উৎকৃষ্ট, তখন অবশ্যই সে, সরুচাকলী না করিয়া থাকিতে পারে না। বউবাজারের বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিব, তালতলায় যাইব, ইটালিও উকি মারিয়া দেখিয়া আসিব, সরুচাকলী পাওয়া যায় কি না! তার পর, কালীঘাট! এমন কি, সেখানে, ত্রিরাত্রি হত্যা দিতেও প্রস্তুত। তাহার পর, ভবানীপুরের রমেশ মিত্রের বাড়ী। অমন,

সুবিচারকের ঘরে সরুচাকলী থাকাই সম্ভব! তথা হইতে, একেবারে যাদুঘরে আসিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিব, এখানে সরুচাকলীর 'ফসিল' পাওয়া যায় কিনা। এবং 'ফসিল' থাইলে, অন্ততঃ এই সরুচাকলীর কতক আস্বাদ পাওয়া যায় কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত (এইখানে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম একটু শোক করিয়া) ডাক্তার সিম্‌পনের নিকট গেলে হয় না! এবং সরুচাকলীতে 'বেসিলি' আছে কি না, তাহারও সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। তথা হইতে, একায়েক ধর্ম্মতলার মোড় দিয়া, লাট সাহেবের বাড়ীর সুমুক দিয়া, উইলসনের হোটেলের কাছে আসিয়া একবার ভাবিতে হইবে, ইহারা সরুচাকলী গড়ে কি না! যদি বিলাত-প্রত্যাগত কোন কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা গঙ্গাজলে চাল ডাল ভিজাইয়া, শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত ঋগ্বেদ উচ্চাচরণ করিতে করিতে উইলসন-হোটেলের কোন পাচক, সরুচাকলী প্রস্তুত করে, তবে তাহা মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইলে, কোন দোষ আছে কি না। অনেকে বলিতে পারেন, উইল সন-হোটেলের সরুচাক-লীতে নিশ্চয়ই পেঁয়াজরস থাকিবে। কিন্তু এ পেঁয়াজ-রসকে বকযন্ত্রে পাক করিয়া ডিষ্টিল করিয়া লইলে, কোন দোষ স্পর্শে কি না! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লাল-বাজারের পুলিশকোর্টে গিয়া স্বয়ং আমীর হোসেনকে একবার এ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়! তিনি যেরূপ জ্ঞানী এবং গুণী এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাহাতে যে তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যহ সরুচাকলী খান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তার পর, রাস-বিহারী ঘোষের বাড়ী। অত যাঁহার নজীর মুখস্থ, তিনি যে সরুচাকলী খান না, ইহা লোকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী সরকার হিন্দু 'ল'-য়ে অমোঘ-শক্তি। সরুচাকলী ব্যতীত ওরূপ শক্তি কাহারও সম্ভবে না; সুতরাং তাঁহার কাছ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া, একবার আচার্য্য-প্রবর মহাদেব মিশ্রের কাছে গেলে হয় না?

মহাশয়,—আপনার গৃহে সরুচাকলী আছে কি? তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—না!

আজ্ঞে আছে কি?

তিনিও আরও গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—না, এখানে কিছুই নাই; তুমি চলিয়া যাও।

আমি আরও বিনীত ভাবে যোড়হস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আজ্ঞে রসবড়া আছে কি?

তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন,—দূর হও!

আমি জিজ্ঞাসিলাম, মহাশয় রাগ করিতেছেন কেন? আমি ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণ সকলের নিকট গমন করিলাম; আমি দেবেন্দ্র—নরেন্দ্র—উপেন্দ্রের নিকট

জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথ-রমানাথ-কার্ত্তিক-হেরম্বের নিকটও এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহইত এমন রাগ করেন নাই! আপনি রাগ করিতেছেন কেন?

তিনি এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া, ঘরে খিল দিলেন। আমিও চলিয়া আসিলাম। তাহার পর, মেছুয়াবাজার মন্থন আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কোথাও সে সাধের সরুচাকলী পাইলাম না।

অবশেষে, বড়বাজার বিধ্বস্ত করিয়া. নিমতলা ঘাটে পঁহুছিলাম। শ্মশান দেখিয়াই মন উদাস হইল; ভাবিলাম, সরুচাকলী হইলেই ত শেষ হইবে না; তাহার পর আবার পায়েসের দরকার হইবে। কাজেই, ওসব লেঠায় আর কাজ নাই। ফলফুলেই গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিব।

আচ্ছা, খুদে চিংড়ী মাছ বাঁটিয়া, বড়া করিলে কেমন লাগে? আমার গৃহিনীর কেমন লাগিবে, একবার সকলে ভাবুন দেখি? অল্প-অল্প নুণ-খরো অল্প অল্প লঙ্কা বাঁটাযুক্ত আর সেই কুসুন-কুসুম গরম ত আছেই! প্রাণেশ্বরীর অবশ্যই প্রিয়তমা হইতে পারে। তবে ধরুন দুই পয়সার খুদে চিংড়ী! বাকী এখনও হাতে আছে সাড়ে চার পয়সা! কি কেনা যায়! আপনারা মনে করিতেছেন যে, পাৎখোলা কেনা হউক। কুমারটুলি গিয়া বিজয়রত্ন, এবং ভগবতী প্রসন্নের নাম করিয়া পাৎখোলা চাহিলে বোধ হয়, কিছু অমনিও পাওয়া যাইতে পারে। আর তাঁহারা যদি তাঁহাদের নাম, এ শুভ কার্য্যে সহায় করিতে না দেন, তাহা হইলে, আমি গলায় কাপড় দিয়া কুমারদের বড় কর্ত্তার নিকট যোড়হাতে যদি দুখানি পাৎখোলা চাই, তাহা হইলেও অমনি পাইতে পারি। অতএব এই সাড়ে চারি পয়সাই মজুত রহিল। এখন ভাবুন দেখি, পয়সা লইয়া কি করি? গৃহিণী যে, আর কি কি জিনিষ ভাল বাসেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। যদি জিজ্ঞাসা করি,—

প্রাণেশ্বরি কাচাগোল্লা খাইবে?

তিনি বলেন, না।

প্র। মাছের ঝোল ভালবাস?

উ। না।

প্র। চাটিম কলা ভালবাস?

উ। না।

প্র। দই ভালবাস?

উ। না।

প্র। আমানী ভালবাস?

উ। না।

প্র। ক্ষীরছানা ভালবাস ?

উ। না।

প্র। লুচি-কচুরী ভালবাস ?

উ। না।

প্র। আচ্ছা, আলুর দম ?

উ। মোটেই না।

প্র। ভুণি খিচুড়ী ?

উ। না। বমি আসে।

প্র। গলদা চিংড়ী দিয়া বুটের ডাল ?

উ। ছিঃ !

প্র। পুরাণো তেঁতুল দিয়া মৌরলা মাছের অম্বল ?

উ। দূর !

প্র। আচ্ছা, পুরাণো তেঁতুল নাই বা দিলাম, যদি কাসুন্দি আচার দিয়া করি, তাহা হইলে, ভাল লাগে কি ?

উ। দূর ছাই পাঁশ।

প্র। কোৎরা গুড় ভালবাস ?

কথা শুনিয়াই গৃহিণী উত্তর না দিয়া, রাগিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী ত রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন ; কিন্তু আমার হাতে সেই সাড়ে চারি পয়সা মজুত রহিল। এ যে বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম ! গৃহিণী কি ভাল বাসেন, না জানিলে, আমি ঐ সাড়ে চারি পয়সা লইয়া করি কি ? অর্থের সদ্ব্যয় না হইলে, পাপ সঞ্চয় হয়,—শাস্ত্রে লিখিত আছে। দেখিতেছি, প্রত্যেক বাঙ্গালী স্বামীর একটু আধটু যোগবল থাকা আবশ্যক। নহিলে তিনি গৃহিণীর মনের কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। শুনিয়াছি, যোগবলে বলীয়ান্ হইতে গেলে আঠার বৎসর অথবা তিন আঠারং চুয়ান্ন বৎসর লাগে। ঐ সাড়ে চারি পয়সা বুকপকেটে রাখিয়া আমি কি এখন চুয়ান্ন-বৎসর কাল, যোগশিক্ষা করিব ? কিন্তু ততদিনের মধ্যে গৃহিণী যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে, গৃহিণীর ভালবাসার সামগ্রী ত জানিতেই পারিলাম না ; আর জানিতে পারিলেও তাহাতে ফল হইল না ! কাজেই, যে সাড়ে চারি পয়সা, সেই সাড়ে চারি পয়সাই মজুত রহিয়া গেল !

তাই সর্ব্বসাধারণকে, সমগ্র ভারতবাসীকে, বিউবনিক প্লেগ পীড়িত বোম্বাই-বাসীকে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য-ভারতবাসীকে করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসিতেছি,—হয়, তাঁহারা গৃহিণী কি ভালবাসেন, তাহা বলিয়া দিউন ; না হয়, এই সাড়ে চারি পয়সার কিনারা করুন। যদি আপনারা এই প্রশ্নের সদুত্তর না দেন,

তাহা হইলে, অগত্যাই আমাকে হিমালয়ের গিরিগুহায় গিয়া চুয়ান্ন বৎসর কাল যোগশিক্ষা করিবার জন্তে তপস্তা করিতে হইবে।

সমালোচনা।

কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিবার উৎকট বাঞ্ছা আমার ... উঠিল কেন? তাই ভাবিতেছি,—বলি, সমালোচনা করিবার ইচ্ছাটা এত হইল কেন?

পাড়াগেঁয়ে পাঠক আর পেঁচো পাঠিকা আমার এ দুর্ভাবনার মর্ম্মই বুঝিতে পারিবে না। সমালোচনা কাহাকে বলে, তাহাই জানে না, সমালোচনার ইচ্ছা বলিলে আর কি বুঝিবে? জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার কিন্তু বিকট বাঞ্ছা হইয়াছে, সমালোচনা কিঞ্চিৎ করিতেই হইবে।

সমালোচনা কি জানো?—এই কোন কিছুর গুণ বলা আর দোষ বলা। আজ কাল সকলের গুণ সকলেই গাহিতেছে! ত্রিসংসারে নাই। বৈঠকখানায় কি বাজারে, হাটে কি গুণেরও ঘাটি হোটেলে, কেবল দেখিতে পাই, সকলেই সকলের গুণগান করিতেছে, কেহ কাহারও দোষ বলে না। কেহ কাহারও দোষ বলিলে কেহই তাহা কাণ পাতিয়া শুনেনা। কোথায় কেহ আপন মনে কাহারও দোষের কথা কহিতেছে জানিলে পৃথিবীশুদ্ধ লোক সে পথ মাড়ায় না; পাশ কাটাইয়া পলাইয়া যায়। আর হক কথা কবুল করাই ভাল; দোষও ত কাহারও কিছু নাই! কাজে কাজেই কেবলই গুণ গান—গুণ গুণ করিয়া গুণ গান, গোঁ গোঁ করিয়া গুণ গান, গাঁক্ গাঁক করিয়া গুণ গান, আর গোল করিয়া গুণ গান! সকলেই গুণধর কি না?

দোষ যখন কাহারও নাই, তখন দোষ বলিবেই বা কে, আর দোষ শুনিবেই বা কে? তবে এক চলিতে পারে—নিন্দা। "আরোপিত দোষকথনং নাম নিন্দা।" যাহার যে দোষটি কখনও ছিল না, এখনও নাই, এবং কস্মিন্ কালে হইবে না, তাহার ঘাড়ে সেই দোষটি চাপাইয়া গল্পগজল্প করার নামই নিন্দা। ত্রিসংসারে দেখিতেছি, নিন্দার ত নাম-গন্ধ নাই!

তবে দেখিতেছি, বড় বিপদ হইল। কেহ যদি দোষ না করে, কাহারও দোষের কথা কেহ যদি না শুনে, নিন্দা করা পর্য্যন্ত যদি না চলে, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে একেবারেই ব্যবসা বন্ধ হয়, অথচ ব্যবসা চালাইতে গেলে আমার সর্ব্বনাশ। কাহারও দোষের কথা যদি বলিয়া যাই, তাহা হইলে কেহই কথায় কাণ দেয় না; উল্টা লক্ষ লক্ষ লোকে আমাকেই গালি দিয়া বসে। যে ...

সেই আমাকেই গালি দেয়;—প্রফুল্ল বদনে বলিয়া বসে, পঞ্চানন্দটা বড়ই পাজী, পরনিন্দাতেই পাঁচুর প্রবৃত্তি।

তবে এখন করি কি? কুত্রাপি কাহারও দোষের লেশটুকু দেখিতে পাইতেছি না। এখন আমি করি কি? কাহাকেও গালি না দিয়া একগণ্ডূষ জল আমি গলাধঃকরণ করিতে পারি না। এখন আমি করি কি? আচ্ছা, 'বঙ্গবাসী'র সমালোচন করিলে হয় না? "বঙ্গবাসী" ত বড় জাঁক করিয়া বলে যে, কেহ আমাদের কুৎসা করিলেও ডিফামেশনের মোকদ্দমা করি না। সংপ্রতি হাতে কাজ কর্ম্ম নাই, একটু ফুরসুৎ পাওয়া গিয়াছে, "বঙ্গবাসী"র সমালোচন করিলে হয় না?

বাস্তবিক "বঙ্গবাসী"টা বড়ই বেয়াড়া। বেথড়ক বজ্জাত; বিশেষ পাজী পঞ্চানন্দের সঙ্গে যখন এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়; পরিচয় কেন, প্রণয়; প্রণয় কেন, পীরিত। বলিতে কি "বঙ্গবাসী"টা পঞ্চানন্দ-সহকারে পাজার পরাকাষ্ঠা।

"বঙ্গবাসী"টা কালো,—কালো গো কালো, খুব কালো, কষ্টিপাথরের চেয়েও কালো, কুচকুচে কালো, তেলকালির অধম কালো। আর তেম্নি মোটা;—মহাশয়, বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, সে মোটাইবা কেমন! ভুঁড়িতে এক ভয়ানক কাণ্ড। পাছা দুটা যেন পুরাতন পৃথিবী, আর নূতন পৃথিবী, আর শুধু কি মোটা, যত মেদ—ত মাংস। রাগ হয় না? গালি দিতে ইচ্ছা করে না? বেশ বাবু, তুই ত বঙ্গবাসী ত ঙ্গবাসী! কালো কেন, আর মোটা কেন? যথার্থ বলুন ত মহাশয়, কাহার রাগ না হয়?

তাই না হয় সহিলাম; চুপ করিয়াই রহিলাম, কথাটি কহিলাম না। কিন্তু তেতলা াড়ী সহ্য হয় কি? আবার সে বাড়ী বলিয়া বাড়ী! কলিকাতার বুক-চেরা বড় াস্তা—হারিসন রোডের উপর হদ্দ-বেহদ্দ বাড়ী! কাহার করুণ-হৃদয় কাতর না হইয়া াকিতে পারে? আরও কষ্ট হয়, যখন মনে হয় যে, লোকটা যদি কালো না হইয়া ফরসা ইত, তাহা হইলে কি হইত! উঃ—তাহা হইলে কি কষ্টই হইত। দুনিয়ার নরনারীকুল াহা হইলে ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, দেশ ছারখার হইত, পৃথিবী রসাতলে যাইত! াপ!—কালো না হইয়া, ফরসা হইলে কি বিষম বিপদই উপস্থিত হইত! মহাশয়েরা বিজ্ঞ ভদ্রলোক, বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, রকম-সকম দেখিয়া আমার মনটা বেজায় বেজার হইয়াছে। কালোর ভাল দেখিয়া ত' আমার কষ্ট হয়ই; ফরসা হইলে আমার রসা থাকিত না, এই ভাবনাতেই যে আমি মরিয়া গেলাম।

আবার এই "বঙ্গবাসী" পঞ্চাশ হাজার লোকে পড়ে। বলুন দেখি, প্রাণ ফাটে বুক বসিয়া যায় না, মুখ শুকায় না? ভাবিয়া ভাবিয়া আমারও পেটে ভাত পচে একবার একবার মনকে প্রবোধ দিই যে, "বঙ্গবাসী" যে পয়সাগুলা পায়, গুলা খাঁটি তামার নহে, গিল্টিকরা। কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না, প্রাণ যে াপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে! এখন আমি করি কি?

এই দেখুন, কলিকাতা ভাল, বাঙ্গালা মুলুক ভাল, ভারতের ভদ্রলোক ভাল, ইস্কুলের কচিছেলে ভাল, কলেজের ছোকরা ভাল—সবাই ভাল। কেহ কুকথা কয় না, কেহ কুকথা চায় না। তবু "বঙ্গবাসী" বিকায়! বিকায় বলিয়া বিকায়! বিশ হাজার বাঁধা বিকায়। সহ্য হয় কি? সত্যি বলুন—কাহারও সহ্য হয় কি? আমার ত হয় না! আমাদের পাড়াপরসী কাহারই সহ্য হয় না। পল্লীগ্রামে জন-প্রাণীর সহ্য হয় না। সহরে ত ষোল আনা লোকেরই সহ্য হয় না। সেইজন্যেই ত কেহ কেনে না। কেহ কেনে না বলিয়াই মনটা একটু ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু না কিনিলে কি হয়—বিকায় যে! ইহার বাড়া আর বিপদ আছে কি? "বঙ্গবাসী"র কু-কথা আর কুৎসা কেহই কেনে না, অথচ কতই বিকায়। কষ্ট রাখি কোথা, বলুন দেখি?

আপনারা আমার সঙ্গে মিশেন না; নহিলে যদি মিশিতেন ত মিলিয়া-মিশিয়া একটা উপায় করিতে পারিতাম। আমার সঙ্গে মিশিতেও বলিতে পারি না, কেন না আমি পাজী; আর আপনারা বে-পাজী। আমার সব দোষ, আপনারা নির্দ্দোষ। পরচর্চ্চাটা আপনারা একেবারেই পেয়ার করেন না, অথচ পর নিন্দাটা আমার প্রাণের প্রাণ। আমার সঙ্গে আপনারা মিশিবেন কেন, আমার সঙ্গে আপনারা পরামর্শ করি-বেন কেন? কিন্তু যদি মিশিতেন, যদি আমার কথা শুনিতেন ত একটা উপায় আমি বলিয়া দিতাম। "বঙ্গবাসী"র বিষদাঁত আমি একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিতাম। আমার বোধ হয় যে, আপনারা দশজনে একটু আধটু দোষ করিতে স্বীকার করিলে, "বঙ্গবাসী"কে বে-মালুম মাটী করিতে পারা যায়।

এই দেখুন না—কোন পুরুষে কোন পরিব্রাজক পরমহংস পাপের পা পর্য্যন্ত দেখে নাই, অথচ "বঙ্গবাসী" কাহারও কাহারও সম্বন্ধে কত কু-কথাই না বলিতেছে। আপনি জানেন, আমি জানি, আর অন্তর্যামী জানুন আর না জানুন—তিনি জানেন, পাপের পথে কেহ কখনও পা ফেলে নাই! অথচ দেখুন একবার "বঙ্গবাসী"র বে-আদবী! আমি বলি কি, সাধু সন্ন্যাসী মাত্রেই অনুগ্রহ করিয়া একটু অকর্ম্ম-কুকর্ম্ম করিলে, ভাল হয় না? তাহা হইলে "বঙ্গবাসী" এখনই বিব্রত হইয়া উঠে; কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিবে, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরিবে? কাজে কাজেই তখন বাছাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে। আজিও ক্ষান্ত, কালিও ক্ষান্ত—চিরদিনের মতন ক্ষান্ত।

এইত আমার সমালোচনা। পছন্দ না হয়, পয়সা দিও না। অন্য ভয় আমার নাই। গালি দিতে কেবল "বঙ্গবাসী" দেয়। তোমরা ত গালি দেওনা, গালি দিতে পারিবেও না। বরং উদারতা আছে, কিনিয়া গালি খাও। তোমরা আমার করিবে কি?

আচ্ছা, "বঙ্গবাসী" যদি বন্ধ হয়, অর্থাৎ পৃথিবীতে পরনিন্দা যদি লোপ পায়,

তাহলে পৃথিবী চলিবে ত? আমার ত মনে হয় যে, পৃথিবী চলিবে না, পৃথিবী তখন থমকিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ-করিয়া কেবলই তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে। তাই একবার একবার মনে হয় যে "বঙ্গবাসী" চলুক, আর পৃথিবীটাও কষ্টে শ্রেষ্টে চলুক্।

আর আমি পঞ্চানন্দ, আমার নিজের সমালোচনা চলে না। আমি পৃথিবীর পাঁকাল মাছ। তোমরাই আমার পাঁক, আমি থাকি, কিন্তু মাখি না। তোমাদিগকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া আমি খাইতে দেই। আমি প্রাণ খুলিয়া গালি দেই, তোমরাও পেট পুরিয়া গালি খাও। যখন তোমাদের অরুচি দেখিব, আমিও সরিয়া পড়িব।

দ্বিজ পঞ্চানন্দ ভণে হেঁয়ালির ছাঁদে।
যে'টা পলাইতে চায় সেই পড়ে ফাঁদে॥
বোকা জনে বেশী বলা, ধনবানে দান।
উলঙ্গ, পোষাক পরা, অন্ধের সমান॥
আছুয়ে যাহার সাড় হাত সে বুলায়।
হরি হরি বল ভাই পালা হৈল সায়॥

পেলেগের জুজু।

আঁই—মাঁই—খাঁই
আঁজ কেন মনিষ্যির গন্ধ পাঁই।
আমি এঁসেছি মুম্বাই
পেঁয়েছে খিদে
কি খাঁই—কি—খাঁই
হাঁই—হাঁই—হাঁই।
আঁমার পেঁট জ্বলে যাঁয়।
হিন্দু-মুসলমান সঁব—আঁয়, আঁয়, আঁয়॥
আমি খাঁবো খাঁবো—পাঁলাবি কোঁথায়।
আমার পেঁটের ভিতর সঁব চঁলে আঁয়॥
আঁয় আঁয় ইংরেজ—তুঁইও আঁয়।
দাঁড়া দাঁড়া তুঁই পাঁলাবি কোঁথায়॥
খাঁইব মাথার ঘি,
ভেঁজে খাব মুখের জি,
চিবাব কণ্ঠার হাঁড়,
চুষিব রক্ত ভাঙ্গিয়া ঘাঁড়।

ভীরু কাঁপুরুষ তুঁ—পালাবি কোথা?
পেঁতেছি মুখ—আয়, চলে আয় হেথা।
হাতী ঘোড়া উট পুরিব উদরে।
পাহাড় ভখিব আমি কচ্মচ করে॥
নদ নদী হ্রদ কত শোষিব সাগর,
ঘর বাড়ী রবে কত উদর ভিতর॥
পিঁপ্ড়া উকুন যত মশামাছি ডাঁস্,
গরাসে গরাসে সব করিব নিকাস্॥
লতা খাবো পাতা খাবো আর ফল ফুল,
ছেলে বুড়া যুবা খেয়ে করিব নির্ম্মূল।
কাঁচা খাবো কাঁচা খাবো পাকা নাহি চাই,
জলে গেল জলে গেল, ভুকে ম'রে যাই!
বীরসাঝে প্লেগরাজ স্বর্ণপুরী নাশিছে,
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জীবকুল গ্রাসিছে।
হিহিহি—হাহাহা লম্ফ ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে।
মার্ মার্ ঘের্ ঘার হান্ হান্ হাঁকিছে,
হুপ্ হাপ্ দুপ্ দাপ্ আশ পাশ ঝাঁকিছে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে,
হুম্ হাম্ খুম খাম ভীমশব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্রসূর্য্য পড়িছে,
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লড়িছে।
অগ্নি জ্বালি সর্পিঃ ঢালি স্বর্ণপুরী পুড়িছে,
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে।
রাজ্যখণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে,
হুল থুল কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।
মৈল জীব প্লেগপতি সিংহনাদ ছাড়িছে,
পঞ্চানন্দের তুণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে।
বাহুতুলি ধেই ধেই পঞ্চানন্দ নাচে,
তাধিয়া তাধিয়া নাচে পিশাচী পিশাচে।
বম্ বম্ বম্ বম্ মহাশব্দ গালে,
ঢলিয়া ঢলিশ কিবা ভাষে হাসে খেলে।

বড় মজা বড় মজা,
ঘরে ব'সে খাও খাজা আর গজা।
রুইমাছ পেলে খাও তার নেজা,
ভয়ে জড়সড় এবে ব্রিটনের প্রজা।
সদানন্দ পঞ্চানন্দ মহানন্দময়,
শ্মশানে আনন্দ তার—স্মরণ আলয়।

বাঙ্গালার আত্ম-শাসন।

স্বর্গের-সিঁড়ি—নির্ব্বাচন-প্রণালী। মোক্ষফল—কমিশনর-পদ-প্রাপ্তি। গোলোক ধাম—মিউনিসিপাল-গৃহ। ভোটভিক্ষা—জেলেবাড়ী।]

শুনহে ধীবর-রাজ, বলি যুড়ি কর।
বারেক মধুর বাক্যে জুড়াও অন্তর॥
জালুক-তিলক তুমি, বহুগুণ ধর।
মীনরসে মর্ত্ত্যজনে, তুমি মত্ত কর॥
তোমার অশেষ গুণ, কে বলিতে পারে?
পঞ্চমুখে পঞ্চানন, বর্ণিবারে নারে॥
তাই সে তোমার কাছে, এসেছি এখন।
"ভোট" দিয়া কিনে লও, জনম-মতন॥
পিতৃ-শ্রাদ্ধে বিশ মণ, মাছের বায়না।
লও মূল্য, গণি এবে, টাকা—পাই—আনা॥
আমি বটে রাজপুত্র—তুমি সে ধীবর।
তোমায় আমায় কিন্তু নাহিক অন্তর॥
তুমি আমি আর মুটে সবাই সমান।
সুখের সাম্যের রাজ্যে এইত বিধান॥
আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ ধরণী যখন।
জীবের সে ভেদাভেদ রহে কি কখন॥
আজ আমি তব কাছে যাচি যার তরে।
তুমিও তা পেতে পার দুই দিন পরে॥
তাই বলি মান রাখ, এবার আমার।
তোমার বারে হে মান রাখিব তোমার॥

উপস্থিত উপকার, এই মাত্র চাই।
তোমার ভোটটী ঐ দেও মোরে ভাই॥
মোর প্রেয়সীর সই জেলে-গিন্নি হন।
পূর্ব্বজন্মে ছিল কোন আত্মীয়-স্বজন॥
তুমিহে আমার দাদা,—আমি ছোট ভাই।
ভোট ছাড়া এ সংসারে কিছু নাহি চাই॥

অথ পঞ্চানন্দের গান।

(১)

আনন্দ বড় রে।
সব ধামে—সব গ্রামে—সব যামে রে!!
শুভ কামে—অবিশ্রামে—ফুল—দামে—
সব লোক জড় রে!!

(২)

এ কি ভূত গত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে!
উত্তম অধম, না হয় নিয়ম—
কেহ নাহি ধর্ম্ম-লেশে রে!!
দাতা ছিল যারা, ভিক্ষা মাগে তারা,
চোর ফিরে সাধুবেশে রে।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে,
তুল্য মূল্য গজে মেষে রে!!

(৩)

তাকুড়—তাকুড় নহবৎ বাজে—রে।
হাড়ী-ডোম-মুচিবর, হবে-রে কমিশ-নর,
রাজা হবে বাঙ্গলার মাঝে—রে!!
ভোঁ—ভোঁ—ভোরঙ্গ বাজে!
ধাঁ—ধাঁ—ধামসা গাজে!
ঝাঁ—ঝাঁ—ঝা—ঝম্ ঝম্ বাজে রে!!
ঘড়ি বাজে টন্ টন্ ঘণ্টা বাজে রন্ রন,
গন্ গন গজঘণ্টা বাজে রে।

নব গুণে নব রসে, ভুবন ভরিল যশে,
চাঁদের কলঙ্ক হইল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রে অঞ্চল-ছায়া,
ভারতের পঞ্চানন্দ—রাজে রে।

একটী গান।

[পঞ্চানন্দ উপদেশ দিতেছেন,—সুর ধরিস্ তুই, তাল রাখ্‌বো মুই।]

আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।
(যদি বলো, তা কেন চাই ?)
আমায়, কেউ জানে না, কেউ মানে না,
কেউ ডাকেনা, ভান্‌তে ধান।
(তাই) আমি চাই মিউনিসিপাল-মান!

* * *

(যদি বলো, এ মান হয় কিসে ?)
টেঁকে গুজে ঘরের কড়ি,
ছুটবো আমি কলুর বাড়ী,
তারি কাছে, তেল কিনে ভাই,
তারি পায়ে করবো দান।
আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।

* * *

(যদি বলো, তাতে লাভ কি ?)—
লাট-মহলে আনা গোনা,
(আর,) দশের মাঝে চেনা-শুনা,
বালাখানা কি শ্বেতখানা,
সকল ঘরে অধিষ্ঠান।
আমি চাই, মিউনিসিপাল-মান॥

* * *

(আরও লাভ আছে)
পটের জোরে কালুয়া গিরি ;—

এতে কি কম কারি-কুরি,
পাই যদি রায়-বাহাদুরী,
হলেমই বা লবেজান।
আমি চাই, মিউনিসিপাল-মান।

*　　*　　*

(যদি বলো, ভরসা চাই!)—
জলদি কাম বাজাও ব'লে,
যদি পিঠের ছিল্‌কে তোলে,
হরিবোল দিয়ে গোলে,
সেলাম-ঠুকে ধর্‌বো গান!
তবু চাই, মিউনিসিপাল-মান॥

রঙ্গভঙ্গে রেহাই।

রাম বলো—বাঁচা গেল। রঙ্গ ভঙ্গ রচার দায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

প্লেগের যতদিন চল্‌তি ছিল, প্লেগের কর্ত্তা মহাত্মা র‍্যাণ্ড সাহেব ততদিন খুব জম-জমাটের সঙ্গে প্লেগকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। ক্রমে প্লেগ ফুরাইল, র‍্যাণ্ড সাহেবের পরমায়ুও ফুরাইল। (১) অমন মনোহর চাকরিটা গেল, কাজে কাজেই র‍্যাণ্ড সাহেবের আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই ত আর সকল কাজ হয় না, একটুকু ইতস্ততঃ হইতে লাগিল। কাজে কাজেই অক্লান্তকুলশীল কোন বন্ধু—শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ—র‍্যাণ্ড সাহেবের সন্দেহ মিটাইয়া দিল, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাণে মারিল।

ইংরেজ বাহাদুর দেখিলেন যে, সুযোগ উপস্থিত। দুর্ভিক্ষ ফুরায়, জুবিলি মিটিয়া গেল, প্লেগ মাটী হইল, ভূমিকম্প ক্ষণিক, বন্যা স্থানিক, একটা হুজুগ ত চাই! হুজুগ নইলে মানুষ থাকিতে পারিবে কেন? কাজে কাজেই বাজীকরদের আত্মারাম সর্দ্দার অর্থাৎ দেশী খবরের কাগজগুলাকে চাপিয়া ধরিলেন। কাজে কাজেই সকল লোকেই এক বাক্যে স্বীকার করিল যে, এদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়, দেশী খবরের কাগজই তাহার কারণ। ভূমিকম্প তাই, প্লেগ তাই, ওলা উঠাও তথৈব চ। জন্ম মৃত্যু বিবাহ রোগ শোক জরা ব্যাধি—কল কথা, সংসার-বন্ধন সম্বন্ধে বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে,

---

(১) বোম্বাই-পুণা সহরে প্লেগের টীকা লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেখানকার কর্ম্মচারী—বোধ হয় কলেক্টর—র‍্যাণ্ড সাহেব (Mr, Rand) এই টীকার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই উত্তেজনার বশে একজন এদেশী লোক তাঁহাকে হত্যা কর

সমস্তই ভুল। অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, এ সমস্তই ভ্রম; প্রধান বা মূল কারণ হই-তেছে দেশী খবরের কাগজ। অতএব দাও বেটাদের বন্ধ করিয়া।

পঞ্চানন্দ শুনিয়া মহাখুসী। আর এক ছত্রও লিখিতে হইবে না। বসুজার অনুরোধ নাই, পাঁচুর পীড়াপীড়ি নাই; এখন, অত্যাতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ঠাকুরের একখানি পুথি আছে, তাহাই খুলিয়া দেখিতেছেন যে, ভ্রম কোন্‌টা—জগৎ ভ্রম, না আমি ভ্রম।

'বঙ্গবাসী' বন্ধ হইয়া গেল। ভূ-কম্পের চোটে তেতলা বাড়ী আগেই পড়িয়া গিয়াছিল; বাকী ছিল ভিটাটুকু—তাহাও বানের তোড়ে ভাসিয়া গেল। অগত্যা যোগেন বোস্ পটোল তুলিতে উদ্যত হইলেন। মহাশয়েরা জানেন যে, বেহুগ্রামের মাঠে বিস্তর পটোল জন্মে। যোগেন্ বোস্ পটোল তুলিতে তুলিতে এতই তুলিয়া ফেলিলেন যে, বাজরা ভরিয়া গেল। 'বঙ্গবাসী' বন্ধ হইল ত বহিয়া গেল! বসুজা বাজরা কোলে করিয়া পটোল বেচিতে বসিয়া গেলেন। 'বিজয়া বটিকায়' বিকার কাটাইয়া পথ্যার্থে পটোল ও পল্‌তার ব্যবস্থা করিয়া বাজরাটি বাড়াইয়া বসিলেন।

কাব্যবিশারদের কলম বন্ধ হইল। হিত-অহিত কিছুই লিখিবার যো নাই। তা যখন "মা লিখ," তখন কাজে কাজেই "শতং বদ"। কবির দল করিয়া পূজার মরশুমে কাল্‌নার কবিরাজদের বাড়ী বায়নার যোগাড় করিয়া, চিতেন সাধিবার জন্যে কোমরে চাদর বেঁধে, কপালে ফোঁটা দিয়ে, কাণে কলম গুঁজে, সদল বলে যত বারইয়ারিতলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

'বসুমতী'র দুর্ফাক হইবার কথা। সংপ্রতি ফাঁক না পাইয়া একটা মেটে ঘরের পরচালীতে ভুনিওয়ালীর দোকান খুলিয়া বসিলেন এবং চব্বিশঘণ্টা তেরেগুা ভাজিতে লাগিলেন।

'সঞ্জীবনী' মৃত প্রায়। কাহিল কঙ্কালসার, প্রায় নিরাকার; তেমন যে আকার তাহার আর কিছুই নাই। নিজের ব্যবসা বন্ধ হইল, তাহাতে দুঃখ নাই। চিরকালই পরদুঃখ-কাতর কি না! অন্যান্য খবরের কাগজগুলা যে উঠিয়া গেল, এই দুঃখেই কাঁদিয়া আকুল। কেননা, অন্য খবরের কাগজ যদি না চলে, তাহা হইলে লাইবেলও ত আর চলে না। অগত্যা সাম্যের ঠেঙ্গা ধরিয়া, মৈত্রীর কাঁধে ভর দিয়া, খুব স্বাধীনতার সহিত রোরুদ্যমানা হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

'অমৃত বাজারে'র বাজার-খরচার পয়সা জোটা ভার হইল। কিন্তু মতিভায়া ফিকির-বাজ লোক, বেকার থাকিবেন কেন? যে পথ এত দিন পরিষ্কার করিতেছিলেন, এই-বার তাহা পাকা করিয়া ধরিলেন। মাথাত এক রকম মুড়ানই ছিল, একটু বেশী করিয়া ...লেন। আরও ফের কতক মোটা মালা চাপাইয়া, কণ্ঠার হাড় ঢাকিলেন। চির-কৌপীন ...কাপড় পরা অভ্যাস। এইবার কাপড় ফেলিয়া বহির্বাসে কথঞ্চিৎ দাঁড়াইলেন। বাজীকরদের ঝোলার মত একটা ঝোলা কাঁধে

করিয়া "দেহি দেহি" আরম্ভ করিলেন। এ ঝোলার ভিতর বনমানুষের হাত ছিল কি না, সে খবর খাঁটি করিয়া পাওয়া যায় নাই।

'বেঙ্গলীকে' বগলদাবা করিয়া মাস্তবর সুরেন্দ্র ভায়া—মাস্তবরটা চাই—দশটা-পাঁচটা ছেলে পড়ান, আর ব্রহ্মাণ্ডের বাঁদর ধরিয়া ইস্তক হাটখোলা নাগাদ মুচিখোলা নাচাইয়া বেড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু বাঁদর নাচাইতে রামছাগল সঙ্গে থাকিলেই রীতিমত হয়। অধুনা রামছাগল কিছু দুষ্প্রাপ্য। একটু ফাঁপরে পড়িলেন। নরেন্দ্রভায়া কর্ম্মফলে অকপট বিশ্বাসী; সরল প্রকৃতি, তেজস্বী অথচ বিনয়ী। দিব্য-চক্ষে দেখিলেন যে, মহাপ্রলয়ের পর গাড়ল হইতেই হইবে। এও এক মহাপ্রলয়; সুতরাং গাড়লরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক রামছাগলের অভাবের প্রতিযোগী হইয়া, সুরেন্দ্র ভায়ার সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

অদ্ভুত পরীক্ষা।

দাঁড়ান-সাহেব বসা-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"কয়টা দেখা হইল?"

বসা-সাহেব। এই গোটা পাঁচ ছয়।

প্রঃ। বেশ দেখা যাচ্ছে ভাল?

উঃ। মাইক্রস্‌কোপ্‌টার জোর বড় কম। পঁচিশগুণ জোর বাড়াইয়া দিলে বোধ হয়, বেশ দেখা যায়।

প্রঃ। প্রথমটা কি দেখ্‌লে?

উঃ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

প্রঃ। কেমন দেখ্‌লে?

উঃ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বোধ হচ্ছে, সিডীশন গিজ্‌ গিজ্‌ করছে।

প্রঃ। আর দ্বিতীয়টা কি?

উঃ। আড়াই তোলা বঙ্গবাসী লইয়া দেখা গেল যে,—ছাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পঙ্গপাল কি সিডীশন, ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

প্রঃ। তিন নম্বর কি দেখ্‌লে?

উঃ। বেঙ্গলী—খুব বড় বড় বাতাসের থলে দেখা যাচ্ছে। বোধ হয়, ভিতরে পোকা থাকিবারই কথা; কিন্তু বস্তা খুলে ত দেখ্‌বার যো নাই। দেখতে গেলেই গ্যাসটা হয়ত ধাঁ ক'রে এস্কেপ করবে and for aught I know may overpower me.

দাঁড়ান-সাহেব। Damn't, আচ্ছা চলুক।

পঞ্চানন্দের কৈফিয়ত।

কালীডোনিয়া জাহাজের খোলে গো-খলের জীবাত্মার উপর যখন পুলিশের প্রতিবিম্ব পড়িল, তখন সে জীবাত্মা অবশ্যই স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। মানুষের দেহে নাকি দুটী আত্মা বাস করে, তার একটী হইতেছে জীবাত্মা; আর একটী হইতেছে পরমাত্মা। পরমাত্মা হইতেছেন সাক্ষী; তিনি সাক্ষ্য দিয়া খালাস। আর যিনি জীবাত্মা, তিনি ভুগিয়া খালাস। অতএব গো-খলের জীবাত্মা যখন স্বচ্ছ হইল, তখন পরমাত্মাটী কাজে কাজেই সাক্ষ্য দিবার ভয়ে দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল; কিন্তু পুলিশের পাহারায় কি পলাইবার যো আছে! পরমাত্মাটী পাকড়া পড়িলেন; অমনি সঙ্গে সঙ্গে এজেহার দিতে প্রস্তুত হইলেন। পরমাত্মাটী প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে, সর্ব্বৈব মিথ্যা। যাহা দেখিয়াছি, তাহা মিথ্যা; যাহা শুনিয়াছি, তাহা মিথ্যা; যেখানে যে যাহা কিছু বলিয়াছে, সবই মিথ্যা। কেবল 'তৎ'টী 'সৎ' অর্থাৎ তাহাই সত্য। এই মায়াময় জগতে জীব মাত্রেরই ভ্রম হয়; বস্তুতঃ সমস্তই স্বপ্নদৃষ্ট গজরথাদিবৎ মিথ্যা।

গো-খলের কৈফিয়ৎ অবশ্যই সন্তোষজনক। তবে সন্তোষ সত্য কি মিথ্যা; তাহা বেদান্তবাগীশকে (১) জিজ্ঞাসা না করিয়া ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কেননা সন্তোষও ত মায়িক হইতে পারে। তবে যাঁহারা বলেন যে, মায়া নিত্যা, তাঁহারা দ্বৈতবাদী। যাঁহারা বলেন, মায়াও মিথ্যা, তাঁহারা অদ্বৈতবাদী।

পঞ্চানন্দ বিষম গোলে পড়িলেন। বুঝিলেন যে, নানা মুনির নানা মত— "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" আরও বুঝিলেন যে, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম।" কিন্তু সেখানে ত যাইবার যো নাই। প্রসিদ্ধ গুহা হইল এলোরায়। সে ত বোম্বাই অঞ্চলে। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চল মনে হইলেই মন চঞ্চল হইয়া উঠে; পঞ্চানন্দের পেলেগ থানা-জংসন পার হইতে পরাঙ্মুখ। অথচ কৈফিয়ৎ একটা দেওয়া চাই। গো-খলে দিয়াছেন; পঞ্চানন্দকেও দিতে হইবে। কেননা, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" অতএব কৈফিয়ৎ—

প্রভু পঞ্চানন্দের কৈফিয়ৎপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। ধর্ম্ম অবতার আমি অজ্ঞান মায়ার বন্ধনে আমি আছি বলিয়াই আমি আছি; নহিলে আমি নাই। বন্ধন কসুন, তাহাতেও আছি। একটু আল্‌গা করুন, তাহাতেও আছি। মোট কথা, আ মায়ার বন্ধনে ছিলাম, আছি এবং থাকিব। মায়াপাশ কাটাইয়া পলাইবার পন্থা নাই, স্থানও নাই। নয়পাল অতি উচ্চ পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত; উঠিতে পারিব ন চীনের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর; প্রবেশের উপায় নাই। লবণ সমুদ্রে ডুবি

(১) ৺হরিনাথ বেদান্তবাগীশ: ইনি বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন।

ারিব না; ডুবিতে গেলে হাঁপাইয়া মরিয়া যাইব। বাকী কেবল মালাখণ্ড। কাটিয়া ও খণ্ড করিয়া, নবদ্বারের নব-রন্ধ্র-দিয়া সূত্র চালাইয়া আমাকে মালা করিয়া কলিবে।

খুড়ি। আমি অজ্ঞান বলাটা ভাল হয় নাই। আমার মগজের মধ্যে বিশ্বের াদ্যা ইদানী আলয় পাতিয়া বসিয়াছে। আমি অজ্ঞান বলিলে যদি পাপ হয়, াজ কি আমার সে উৎপাতে? দোহাই ধর্ম্মাবতার। যথার্থই বলিতেছি, আমি ানী। পরশুও যে ত্রুটি টুকু ছিল, আজ সেটুকু সারিয়া গিয়াছে। আক্কেল ্রইবার পুরা হইয়াছে।

কল কথা, পেলেগ হয় নাই। উঁ হুঁঃ, হইয়াছিল বৈ কি? কে জানে, এ াড়ার ডিম বুঝিতে পারিতেছি না,—হয়—হইয়াছিল, নয়,—হয় নাই। যেটা বলা াল, সেইটাই বলিতেছি—আমার এই একই কথা। তবে পেলেগ-দমনের ব্যবস্থা ে খুব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই হইয়াছিল, তাহা আমি হলপ করিয়া বলিতে প্রস্তুত। কিংবা র্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। তা, বৃহৎ কর্ম্মের দস্তরই ঐ। আসল কথা কি জান, াতে গোল, তাতে আমি নাই।

দিব্য করিয়া বলিতেছি, তিলক-ফিলকের কথা আমি কিছু শুনিও নাই,—জানিও া। পরম্পরায় এইমাত্র শুনিয়াছি যে. সার আইজাক নিউটন কোন্ সমুদ্রের ধারে লাখণ্ড কুড়াইতে কুড়াইতে এক মারহাট্টা বামুনের কপালের ফোঁটা চাটিয়া বেমালুম লিয়া লইয়াছিলেন। আমি এই মাত্র শুনিয়াছি, আর কিছু শুনি নাই। যাহা নিয়াছি, তাহা সত্য হইলেও উত্তম, মিথ্যা হইলেও উত্তম। আপনি কৃপা করিয়া ঝুন যে, তথাস্তু।

তর্জ্জমা কর বাবা, বিদ্যাটা একবার বোঝা যাক্।

আমার বাজরাভরা সিডিশানের বজরা ভেসেছে!
তাই চোখের জলে ভেসে ভেসে পাঁচু হেসেছে॥

খোস-খবর।

[সুটাও ভাল]

আর ভাবিতে হইবে না! স্বয়ং পঞ্চানন্দ খবরের কাগজওয়ালাদের ভাবনা াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। খবরের কাগজে কোন্ কোন কথা লেখা চলিবে তাহার কতক কতক আভাস দিয়া খোদ লাট সাহেব 'ইংলিশম্যানে'র মারফৎ ানন্দকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। লাট সাহেব লিখিয়াছেন সূত্রাকারে; পঞ্চানন্দ সহিত তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

১। আকাশের অবস্থা লিখিবে না।

বৃত্তি। আকাশের অবস্থা কখন গরম, কখন ঠাণ্ডা, কখন ঝড় ঝাপ্টা ইত্যাদি বিশিষ্ট হয়। খুব রৌদ্র হইয়াছে, এরূপ লেখা অন্যায়। কেন না, রৌদ্রে লোকের মাথা গরম হইতে পারে। মাথা গরম হইলে লোক ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে, ক্ষেপিয়া উঠিলেই রাজবিদ্রোহ করিতে পারে। ঠাণ্ডা লেখাও অন্যায়। ঝড়ের পূর্ব্বে সমস্ত প্রশান্ত। ঠাণ্ডা বলিলেই এই ইঙ্গিত করা হয় যে, এইবার ঝড় উঠিবে। ঝড় উঠিলেই মহা গোলযোগ। গোলযোগ হইলেই শান্তিভঙ্গ। শান্তিভঙ্গ হইলেই দাঙ্গা। দাঙ্গা হইলেই টাকার উৎপাত। ইত্যাদি।

২। শস্যের দর লিখিবে না।

বৃত্তি। শস্য যদি মহার্ঘ হয়, তাহা হইলেই দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল। দুর্ভিক্ষের সূচনা বলিলেই, রাজাকে শোষক বলা হইল। রাজাকে শোষক বলিলেই বিদ্রোহ। প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইলে কঙ্কাল-গুলার হাড় ছুড়িয়া গবরমেণ্টকে মারা স্বচ্ছন্দেই উপলব্ধি হয়। শস্য সস্তা বলিলে আরও দোষ। শস্য শস্তা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে। রপ্তানি বন্ধ হইলেই বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইল। তবেই ইংরেজকে লক্ষ্মীছাড়া বলা হইল। লক্ষ্মীছাড়া বলা হইলেই বিদ্রোহের সুযোগ।

৩। 'অমুক গ্রামে ক্ষেপা শেয়ালের উৎপাত হইয়াছে' এরূপ লিখিও না।

বৃত্তি। শিয়াল হইতেছে শৃগাল শব্দের অপভ্রংশ। শৃগাল বলিলেই শিবা মনে পড়ে। একটু জি আসিলেই শিবাজি হইল। তবেই হইল মহারাষ্ট্রীয় বীর। অ[illegible] বলিতে হইবে কেন? এইবার অনায়াসেই পুণা, পেলেগ, পিউনিটি পুলিশ প্রভৃতি প্রাপ্তি আপনা আপনিই হইল।

৪। জন্মমৃত্যুর কথা লিখিও না।

বৃত্তি। বেশী বেশী দেশী লোক জন্মিলে, বিদ্রোহীর দল বাড়িতে পারে। ত[illegible] জন্মের কথা বলিলেই গবরমেণ্টকে ভয় দেখান হয়। লোক কম জন্মিতেছে বলি[illegible] আরও দোষ। লোক কমিলেই মাঞ্চেষ্টরের খরিদ্দার কমিয়া গেল। কাপড় না কিনি[illegible] অছিলায় যাহারা জন্মগ্রহণ করিতে নারাজ, তাহারা ত স্পষ্ট রাজদ্রোহী। মরা আ[illegible] দোষ। হঠাৎ যদি লোকগুলা মরিয়া যায়, তাহা হইলে কটকের কি ফাঁসীর পাত্র কো[illegible] পাওয়া যাইবে? তদভাবে সুতরাং বিচারালয় বন্ধ; তাহা হইলেই সুতরাং জি[illegible] দের চাকরী যাইবে। চাকরী গেলেই ডিপুটীরা ডাকাতি আরম্ভ করিবে; না[illegible] করিবে না। করিলে লাইবেল না করিলে বেকার লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি; তা[illegible] রাজ্যে অশান্তি। যেদিক্ দিয়াই দেখ, জন্ম-মৃত্যুর আভাস দিলেই গোল।

৫। কাগজ লেখা বন্ধ করিও না।

বৃত্তি। কাগজ লেখা বন্ধ করিলে সরকারবাহাদুরের উপর ক্রোধ করা হইল। বালী, টিটেগড়, রাণীগঞ্জের কল বন্ধ হইল; তবেই আক্রোশ করিয়া সাহেবদের কারবার বন্ধ করা হইল। সে যে বিদ্রোহের বাবা। তবেই বুঝিতেছ যে, লিখিও না; কিন্তু লিখিতেই হইবে। অর্থাৎ কেবল লেখ,—কেবল লিখিয়া যাও,—লাল ফুল ছোট পাতা, গরু চরিতেছে, আর মানুষগুলা ঘাস খাইতেছে। কিন্তু এ সব কথা খুব বেশী করিয়া লিখিও না। বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ প্রথমভাগ চুরি করিয়াছে বলিয়া, তোমার নামে নালিশ করিবে, আর তোমার দফাটী রক্ষা করিয়া দিবে। ভাবনা কি রে ভাই। রাজ-পুরুষেরা কৃপা করিয়া মুক্ত হস্তে লিখিবার স্বাধীনতা তোমাকে দিয়াছেন। অতএব স্বচ্ছন্দে মনের সাধে সাদা কালী সংগ্রহ কর; করিয়া সাদা কাগজে সাদা কথায় সারাদিনই লেখ না কেন! তোমারও চুলকানি মরিবে, তাঁহারও চিন্তা দূর হইবে।

শ্রী—আমি।

তোমরা আপনা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া লিখিবে না, তাহা আমি জানি। আমার জীবনচরিত তোমরা লিখিবে কেন? যাহাদের গোড়া সরু, আগা মোটা কিম্বা যাহা-দের আগা-গোড়া সমান, তাহাদেরই জীবনচরিত লিখিয়া তোমরা বিলাইয়া বেড়াও। আঁতুড়-ঘরে সোণার ঝিনুকে দুধ খাইতে খাইতে, আখেরে সোণার ডাবরে আঁচাইয়া যে মরে, তাহার জীবনচরিতই তোমরা লেখ। না হয়, বড় বাঁশের মধ্যস্থলের মোটা পাবে-রই তোমরা খবর দাও। আমার কথা তোমরা লিখিবে কেন? আমি বড় হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, এখনও বড় হই নাই; আমার কথা তোমরা লিখিবে না, তাহা জানি।

সেই জন্য আমার কথা আমিই লিখিব। যাহার কথাই লেখা হউক,—বড়র কথাই হউক আর ছোটর কথাই হউক,—আপন কথা আপনি প্রকাশ না করিলে অন্যে তাহা জানিবে কোথা হইতে? এখন ত জানের চলন নাই; ঘরের খবর পরে জানিবে কেমন করিয়া? আর জীবন-চরিত প্রকাশের দুইটা রকম এখন চলিত হইয়াছে। এক সকলমে; এক বকলমে। যাহাদের বয়সে কুলায় না, অবকাশ হয় না, কিম্বা অন্য কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাহারাই পরস্মৈপদে কাজ সারে; এ সব লোকের যোগ্যতাও কিছু কম। তাহাদের হয়ত বিনয় কিছু বেশী; অন্যে দুটা বাড়াইয়া বলে বলুক; নিজ মুখে সেটা কিন্তু বলিতে

চায় না। হয়ত সত্যনিষ্ঠাও কিছু অধিক; যা নয়, তাহা বলিলেও যদি কাজে খোলে, তাহা হইলে অন্যে তাহা বলুক, এই ভাবিয়া তাহারা কিছু বলে না। যাহারা আত্মনেপদে জীবনচরিত লেখে, তাহারা আবার পরকে বিশ্বাস করে না; মনের যেটি বড় কথা, অন্যে হয় ত সেটাকে ছোট করিয়া দিবে; যেটি দেখাইবার সাধ, অন্যে হয়ত সেটা মোটেই দেখিবে না;—এই ভাবিয়া তাহারা আপন কথা আপনিই বলে। যে কারণেই হউক, আমার পক্ষে এই পন্থাই প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা কেহ ত লিখিবে না, আমিই লিখি।

জীবনচরিতেরও একটা আদি পর্ব্ব বা সারসংগ্রহ-পর্ব্ব থাকা ভাল। দেখিতে পাওয়া,—মহাভারতের আদিপর্ব্বের ভিতরে আঠার পর্ব্বই আছে; তাহাতে চুম্বকে সকল কথাই আছে। আমার জীবনচরিতের সেই আদিপর্ব্বটাও প্রথম বলি। আমি ছোট হইতে বড় হই নাই; যেমনটা জন্মিয়াছিলমে, তেমনটিও নাই। এক হিসাবে গোড়ায় বড় ছিলাম, এখন ছোট হইয়াছি, আর এক হিসাবে গোড়ায় ছোট ছিলাম, এখন বড় হইয়াছি। এটা হেঁয়ালী নয়,—সত্য কথা! আঁতুড়ে যখন জন্মিয়াছিলাম, তখন আমি খুবই ছোট; এখন সে হিসাবে খুবই বড় হইয়াছি। আবার আঁতুড়ে যখন জন্মিয়াছিলাম, তখন আমি খুবই বড়, তখনকার তুলনায় এখন আমি খুবই ছোট হইয়াছি। আদি পর্ব্বে এইটুকুই বুঝাইয়া বলি।

বাবা খুব বড়লোক ছিলেন, কাজে কাজেই মাও বড় মানুস। অধিক ঊর্দ্ধ পুরুষের খবর দিবার আবশ্যক বুঝি না। কেন না, উঠিতে উঠিতে আমার মূল পুরুষ মহৎ ঠাকুরে ঠেকাইলেও, নিস্তার পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

যাউক্। বড় মানুষ বাপমায়ের ঘরে জন্মিয়া আলালের ঘরের দুলাল হইলে যাহা হয়, আমিও তাহা হইয়াছি। বাবা মরিবার পর আর এক চোট বাড়িলাম; বাড়িলাম্ কিন্তু মোটেই কমিলাম না; কেন না, ভ্রাতৃরূপী দায়ভাগী কেহই আমার ছিল না। ইঙ্গিতেই বুঝিয়াছ যে, বাবার বিষয়-আশয় ভালই ছিল। তাঁহার আশয়টা কোথায় গেল, বলিতে পারি না; কিন্তু বিষয়টা সমস্তই আমার হস্তগত হইল। বিষয় পাইয়া আমি ত বাড়িলামই; আমার নাম আমা অপেক্ষাও বাড়িল। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, সংসারের সকলের কাছে আমার সুনাম বাড়ে নাই। সংসারে থাকিতে গেলে, সকলেরই শত্রু-মিত্র দুইই হয়। কেহ কাহারও শত্রু-সংখ্যা গণিয়া দেখে না,—মিত্র-সংখ্যাও গণিয়া দেখে না; কাজে কাজেই সুনাম-দুর্নামের খতিয়ান করিয়া ঠিক আঁক কাটাও একটু কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শত্রুরা কোলাহল করিতে পারে ভাল; মিত্রপক্ষ স্বভাবতই কিছু মৃদু হয়। দুইটা শত্রুতে দুই হাজার মিত্রের কাট কাটে। অতএব, সুনাম দুর্নাম শুনিয়া, সহসা একটা সিদ্ধান্ত করিও না।

আমার কথা হয় ত আজি পর্য্যন্ত মোটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয় নাই ; না হয় বড় জোর উড়া-উড়া দুটা দশটা দুর্নামই আমার শুনিয়াছ। এইবার আমা পক্ষ হইতে ষোল আনাই শুন। আমি বড় জন্মিয়াছিলাম ; তাহার পর আরও ব হইয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছি। তাহার পরে ঝাঁ করিয়া আমি ছোট হইয়া গেলাম এখনও আমি সেই ছোট ; হয় ত, তদপেক্ষাও ছোট।

আমি দানে ছোট ; কেবলই দানে ছোট ; অর্থাৎ দান করিতে করিতে ছো হইয়া পড়িয়াছি ; আমার আর কিছুই নাই। দুঃখী দুঃখিনীকে চিরদিন আমি দা করিয়াছি। দুরন্ত সংসারের বড় লোকে ভুলিয়াও যাহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ কা নাই, আমি তাহাদিগকে অজস্র দান করিয়াছি। দান করিতে করিতে সত্য সত্য আমি সর্ব্বস্বহীন দীন কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি।

দান সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে ; পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে ; পরে থাকিবে যে দান বলিলে, আত্ম-গৌরব বৃদ্ধির ইঙ্গিত করা যায়, সে দানের কথা শুনিয়াছি বটে কিন্তু বুঝি না। সে অর্থে আমি কখনও কিছু দান করি নাই। গর্ব্ব কি অভিমা প্রকাশের আশঙ্কা থাকিলে, আমার দানের ফল আছে। দান করিলে, স্বর্গ লাভ হয় দান করিলে, জন্মান্তরে ঐশ্বর্য্য লাভ হয় ; স্বর্গও ফল—যশও ফল। না হয়, দান করিলে দুঃখীর দুঃখমোচন হয়। যাহার দুঃখ যায়, তাহার সুখ হয় ; দাতাও অবশ্য সে সুখের ভাগী হয়। এই যে সুখের ভাগী হওয়া, ইহাও ত দানের ফল। অতএব দান হইল মূল্য ; তাহার ফল হইল,—তদ্বিনিময়লভ্য দ্রব্য। বাস্তবিক দানে আর বিনিময়ে কোন প্রভেদ নাই। এমন কি, পণ্ডিতেরা এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—

দাতারং কৃপণং মন্যে মৃতোঽপ্যর্থং ন মুঞ্চতি।
অদাতা পুরুষস্ত্যাগী ধনং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি॥

অর্থাৎ, কৃপণ-শব্দ যদি দোষবাচক হয়, তাহা হইলে, দাতাকেই ত কৃপণ বলিতে হয় ; কেননা, দাতা মরিয়াও ধন ছাড়ে না অর্থাৎ পরকালে বা জন্মান্তরে তাঁহার দত্ত ধনের তিনি ফল ভোগ করেন। বরং ধন ব্যয় না করিয়া যে মরিয়া যায়, তাহাকেই ত্যাগী বলিয়া প্রশংসা করিতে যয় ; কেননা, সে আপন ধন যেমনকার তেমনি রাখিয়া চলিয়া যায়। তবেই দেখ, আমি যা বলিতেছি, পণ্ডিতেও তাই বলেন। দান শব্দটা কেবল ছেলে ভুলান নাম মাত্র। প্রকৃত পক্ষে দানও যাহা, বিনিময়ও তাহাই।

বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবনচরিতটা কিছু বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যদি আমার জীবন চরিত সুখকর, সুকোমল, সুস্বাদু হইবে, তবে, আমাকে অন্ন-গাদ এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কেন ? যাহা হউক, সংক্ষেপেই এবার আদি-পর্ব্বটা সারি।

আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে গৃহস্থাশ্রম, তাহা আমি যথাসাধ্য—বরং সাধ্যাতীতরূপে অবলম্বন করিয়াছি এবং অপত্য উৎপাদন,—কর্ত্তব্য জানিয়া, সে পক্ষেও আমি কোনরূপ ত্রুটী করি নাই। আদিতে জন্ম, মধ্যে বিবাহ, অন্তে মরণ,—এই হইল, জীবনচরিতের চূড়ান্ত; দুইটীর কথা বলা হইয়াছে; আর একটী এখন মূলেই বাকী। ঠিক বলিতে গেলে, আমার জীবনচরিত ত বলাই হইল। তবে, স্থূল কথায় স্থূলবুদ্ধি লোকে সন্তুষ্ট হয় না; ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক কথা সহস্র বার না বলিলে লোকের মন উঠে না। আমিও না হয় তাই বলিতেছি।

লেখা-পড়ায় কখনই আমার অমনোযোগ ছিল না; বিশেষতঃ হাতচিঠা, হাণ্ডনোট, তমঃশুক, মরগেজ, খোস-কবলা আর বেনামী দলিল,—কতই যে লিখিয়াছি, তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারি না। সমস্ত লেখা-পড়াই আমার দানের জন্যে। রূপ, গুণ, যৌবন, হাব, ভাব, বিলাস—ইত্যাদি সত্ত্বেও যে সকল অভাগিনীকে কেহ কখন কটাক্ষেও দেখে নাই, আমি তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষে স্থান দিয়াছি। অথচ সংসারে এমনই মত-বিরোধ যে, সেই সকল লোককে কেহ কেহ ভাল বলিয়াছে, আমায় মন্দ বলিয়াছে; ভাবিয়া দেখ দেখি, যে কুল ছাড়িয়াছে, শীল ছাড়িয়াছে, ধর্ম্ম ছাড়িয়াছে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছে, তাহার মত কৃপাপাত্রী আর কেহ আছে কি? নৃত্য-গীত আদি সুকুমার বিদ্যা—গন্ধর্ব্ব লোক হইতে আনীত মহাবিদ্যা! সে বিদ্যার উৎসাহ আমি যত দিয়াছি, আর কেহ তত দিয়াছে কি? পুষ্পই সংসারে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পুষ্প ব্যবসায়ী আমার কাছে যে সাহায্য পাইয়াছে, অন্য কয়জনের কাছে তেমন পাইয়াছে? বড়ই দুঃসময় যাহার জীবন, সংসারে জাগ্রত অবস্থা যাহার নিরন্তর কষ্টকর, সুরার উপাসনা সেই করে। তাহাদের হিতার্থে আমি অকাতরে সুরেশ্বরীর স্রোতঃ প্রবাহ করিয়াছি। এ সবই আমার দান; নহিলে আমার লেখাপড়ার গৌরব কি? অত হাণ্ডনোট, অত দলিল-দস্তাবেজ; আদালতে অত টান্—উকীল বাড়ীতে অত মান, আমার হইল কিসে? যাহা হউক, নিজের গুণ, নিজের মুখে বেশী করিয়া বলা ভাল নয়। ফল কথা, উহাতেই আমি ফকীর হইয়াছি।

বিবাহ সম্বন্ধে একটা কথা তবু বলা ভাল। ভাঙ্গিয়া না বলিলে লোকে বুঝে না; নতুবা বলিতাম না যে, শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ আছে। আমি অন্ততঃ আট-আটে চৌষট্টি প্রকার বিবাহ করিয়াছি। এই বিবাহ-উপলক্ষেও আমায় অনেক দান করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সর্ব্বস্ব হারাইয়া, বয়সের পরিপাকের সঙ্গে, আমার অন্তঃকরণে বৈরাগ্যেরও সঞ্চার হইয়াছে। পৈতৃক অট্টালিকা যাহা ছিল, তাহা আমি ত্যাগ করিয়াছি। এ অবস্থাতেও একটী অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; একটী দাতব্য হাসপাতাল রাখিয়াছি; একটী পুষ্করিণী দিয়াছি; একটী রাস্তা তৈয়ার করিয়াছি;

আর সামান্য আকারে একটী সদাব্রতও চালাইতেছি। ছেলেগুলিকে খরচের অভাবে পাঠশালে দিতে পারি না; নিজেই কিছু কিছু পড়াই। বেতন লই না; গবর্ণমেণ্ট এড পর্য্যন্ত,—না। আমার অবৈতনিক স্কুলটা মন্দ কি? মেলেরিয়ার উৎপাতে রোগের অভাব নাই; আমার বাড়ীতে বিশেষতঃ। স্ত্রী পুত্রাদির চিকিৎসা এখন আমিই করি; কুইনাইনের বদলে সিন্‌কোনার গুঁড়া দিয়া ফাঁকি দিই না,—সরকারী ডাক্তারখানার সঙ্গে আমার এই প্রভেদ। এক বোতল জলের দাম ছয় আনা লই না,—ডাক্তার বাবুদের সঙ্গে আমার এই তফাৎ। ফল সমানই হয়। আমি গাছ-গাছড়া কুড়াইয়া জলে স্থলে কোন রকমে কাজ সারি। আমার রোগীদের ভিতর যেগুলি মরে, তাহা ছাড়া সবগুলিই বাঁচে। অথচ, ঔষধের দাম, পথ্যের দাম, শুশ্রূষার দাম,—কাহাকেও কিছু দিতে হয় না। দাতব্য হাসপাতাল বলা কি মিথ্যা বলা হইয়াছে? সদ্য মাঝমাঠে এক মাটীর ঘর করিয়া বাস করিতেছি। ডোবা কাটিয়া মাটী তুলিতে হইয়াছে। তাহাতে ঘরও হইয়াছে; মাটীও হইয়াছে। আর ঐটুকুর জন্যে ঘর বাহির করিতে করিতে রীতিমত রাস্তা পড়িয়া গিয়াছে। ভিক্ষা করিয়া, চুরী করিয়া, জুয়াচুরী করিয়া, যেমন করিয়া হউক,—এখনও নিত্য নিত্য সংসারের অন্ন-বস্ত্র যোগাইতেছি। তোমরা হয় ত মনে করো যে, এ সদাব্রত নয়। নয় কিসে, তাহা ত আমি বুঝি না। বড় জোর বলিতে পারো যে, এমন কথার জন্য যদি জীবন-চরিত লিখিতে হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবেরই জীবনচরিত লিখিতে হয়। তবু ভয়ে ভয়ে অনেক পরিচয় দিই নাই; আমার চিড়িয়াখানা আছে, তাহা বলি নাই। তোমরা ধনীর পক্ষপাতী; আবার অবসর বুঝিয়া তোমরা বিশ্বনিন্দুক; সেই ভয়ে এখনও বলি নাই যে, আমার চিড়িয়াখানাও আছে। আমার এ দুঃখের অবস্থাতেও শরীরের রক্ত দিয়া, আমি অবাধে জীব প্রতিপালন করি। যাহার লক্ষ লক্ষ টাকা আছে, সে অনায়াসে দুটা কি দশটা বাঘ ভাল্লুক সখ করিয়া পুষিতে পারে, কিন্তু আমাকে যাহা দায়ে পড়িয়া পুষিতে হয়, সেত তাহাও পারে না। তাহার দৌরাত্ম্যে লক্ষ লক্ষ ছারপোকা কৃপণের দ্বারস্থ কাঙ্গালীর মতন বিতাড়িত হয়; মশারির ভয়ে কোটি কোটি মশা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রাণীর ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়। মাছি পিঁপড়া স্থান পায় না, অথচ সে বড়লোক। আমার ঘরে ইহাদের অবারিত গতি এবং দিবারাত্র স্থিতি। আমি এখন ছোট লোক; আমি যখন বড়লোক ছিলাম, তখন আমারও বাঘ ভালুক ছিল, তবে সেগুলি পুষিবার মতন; তাহাদের আকৃতি অবিকল মনুষ্যবৎ। কখনও যদি গুছাইয়া আমার জীবনবৃত্তান্তের সকল পর্ব্বের সমাধান করিতে পারি, তখন না হয়, সব কথা সবিস্তারে বলিব।

কাহারও জীবনচরিত লিখিতে কি আমি বারণ করিয়াছি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভাই। আত্মস্তুতি সাধন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম কেহ কখন করিয়াছে কি?

শুনিয়াছি, একজন মার্কিন কবি জীবনচরিত লিখিবার একটা কৈফিয়ৎ বাহির করিয়াছেন। তিনি নাকি বলেন যে,—"মহতের জীবন জানিলে, আমরাও হতে পারি, মহতের প্রায়।"

কিন্তু পারি কি? যদি পারি, তবে আমি পারিলাম না কেন, তাহা আমায় বুঝাইয়া দাও। মহৎ ছিলাম, ক্ষুদ্র কেন হইলাম, ইহা আমায় শিখাইয়া দাও।

পঞ্চানন্দের টিপ্‌নি।

এদিকে আমি দিব্য ফুটু ফুটেটী,—কিন্তু মুখোস্‌ খুলিলেই গোল।

অথ বিসর্জ্জন-ব্যবস্থা।

[শেষ পর্য্যন্ত যাহা দাঁড়াইবে।]

কেমন, এইবার ত বুঝিয়াছ যে, পণ্ডিতদের দ্বারা হইবে না? অত্র প্রমাণম্‌,—

"পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে
মূর্খে দোষা হি কেবলম্‌।"

অত্র মুর্খে ইতি সপ্তম্যন্তং পদং কর্ত্তৃবাচকমেব; অর্থাৎ মুর্খে যতই বলুক, আসলটা মুর্খ। তদন্তাপকর্ষন্যায়াৎ। একটু তদন্ত করিলেই দেখিতে পাইবে, সকলেই অপকর্ষ। বিশেষ, সংবাদদাতার পত্রে অবগত হইয়াছি যে, সংবাদপত্রে সোরগোল দেখিয়া, লাট সাহেব পুলীশের প্রতি তদন্তের ভার দিয়াছেন। এখন ১০৭ ধারা অনুসারে পণ্ডিতবর্গানাম্‌ মুচলকা লওয়া উচিত কিনা, এই বিষয়েরই তদন্তাধীনত্বাৎ। ১০৭ ধারায় বলে,—একটু কেবল নিরক্ষর সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তানের জন্যই কথিত হইতেছে,—১০৭ ধারায় বলে যে, পরস্পর বিবদমান পক্ষগণের অপকর্ষ-হেতু চিত্তমলাধিক্য-প্রযুক্ত শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, অন্ততঃ শান্তিরক্ষার্থে সঙ্গিন সঙ্গিন মুচলকা লওয়া কর্ত্তব্য। অতএব, পণ্ডিতবর্গ সাবধান হউন। দেবী-বিসর্জ্জন হউক বা না হউক, জিগীষা-বিসর্জ্জন পহিলা নম্বরে আবশ্যক হইয়াছে।

এমন জিগীষা অপেক্ষা বরং জিহারিষা অর্থাৎ হারিবার ইচ্ছা ভাল। পরন্তু চুল্যাং গচ্ছন্তু পণ্ডিতাঃ—বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায়—পণ্ডিতেরা চুল্যাং অর্থাৎ যেখানে খুসী, যাউন। প্রকৃতমনুসরামঃ। বিসর্জ্জনের ব্যবস্থাটাই বলা যাউক।

এক পক্ষ বলিতেছেন,—তদন্তাপকর্ষন্যায়াৎ তিন দিনের দিন বিসর্জ্জন। অর্থাৎ তদন্তের অপকর্ষ করাই ন্যায়সঙ্গত; তাহাতে তিন দিনেই বিসর্জ্জন। তদন্ত অর্থাৎ তাঁহার অন্ত অর্থাৎ পূজার অন্ত। ইহাতে বুঝা গেল যে, তদন্তই বিসর্জ্জন। তাহারই অপকর্ষ,—অর্থাৎ যথাকালে না করিয়া, তাহার আগে যখন খুসী করিবে। চক্ষুলজ্জা-বশতঃ এবার তৃতীয় দিনে,—ভবিষ্যতে দ্বিতীয় দিনে,—এইরূপে ক্রমে ক্রমে

গোটা পূজাটাকেই অপকর্ষের ভিতর ফেলিতে হইবে ;—তাহা হইলে, লেঠা চুকিয়া গেল।

অপর পক্ষও বলিতেছেন,—তদন্তাপকর্ষ-ন্যায়াৎ। অপর পক্ষ প্রায় নিকটবর্ত্তী, চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধারের ব্যবস্থা এইবার হইবে। যদিও কেবলেন জলেন বা,—কিন্তু ফল,—পিণ্ডান্ততুল্য। তদন্তের অপকর্ষই ন্যায়সঙ্গত। এখানে তদন্ত হইতেছে বিসর্জ্জন,—সেটা পূজাও নয়; কিছুই নয়; ইহার অপকর্ষ করাই ভাল। অর্থাৎ উপযুক্ত সময় থাকুক আর না থাকুক, যাহাতে অপকর্ষ হয়, এইরূপ করিয়া করাই ভাল।

কু-কর্ম্মের বা অ-কর্ম্মের উৎকর্ষ করাটা কিছুই নয়। যাহাতে অপকর্ষ হয়, তাহাই করা ন্যায়সঙ্গত। অর্থাৎ বিসর্জ্জনটা মোটে না হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল; নিতান্তই যদি হয়, তবে, যাহাতে অপকৃষ্টতা আসিতে পারে, এইরূপ করিয়া করিতে হয়। ফলতঃ বিসর্জ্জন যদি বাদ পড়ে, তাহা হইলে, বিসর্জ্জন হইয়াছে অন্তে যাহার, সেই পূজার, আর সেই পূজা হইয়াছে অন্তে যাহার, সেই প্রবেশের অপকর্ষ,—ক্রমশঃ হইতে পারিবে। সোজা কথায়, কোন প্রকারে বিসর্জ্জনটাকে নিতান্ত হীন কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিতে পারিলে,—তদন্তাপকর্ষ ন্যায়ের জোরে এধারটাকেও বাদ দিতে পারা যাইবে।

এতাবতা দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, পূজা উঠাইয়া দেওয়া এবং আগাগোড়া বিসর্জ্জনই উভয় পক্ষেরই অনুমোদিত। আমি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া এই মধ্যস্থতা না করিয়া দিলে, উভয় পক্ষই স্ব স্ব মতের পোষকতায় স্ব স্ব প্রমাণ বাহির করিতেন, অত্র সন্দেহো নাস্তি। ইতি বিদ্বৎসম্পরামর্শঃ।

বিষয়ী লোকদের ইহাতে একটা আপত্তি হইতে পারে। পূজা যদি বন্ধ হয়, তবে পূজার বন্ধটা বন্ধ হইবে কি না? পূজা বন্ধ হইলে, অপিচ বন্ধ বন্ধ হইল বাস-? ক্ষেপ সত্য; কিন্তু কাব্যাংশেও বিস্তর সংকোচ। এই যে, সংবৎসরান্তে সুহৃৎ-সম্মিলন,—এই যে, পূজার সময় রেলওয়ে কোম্পানীর টুরিষ্ট-টিকিট বেচন,—এই যে, বৎসর বৎসর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোষ্টবদ্ধ দেশ-ভ্রমণ অর্থাৎ রেলের প্রকোষ্ঠে বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত ভু-ভারতের পরিদর্শন, ইত্যাদি অন্ ভাগান্ত যে সকল মহতী-ব্যাপার সংঘটন হইয়া থাকে,—(স্ত্রিয়াং এ্যাপ সুতরাং পুরুষাণাম উপ—বাঙ্গালা মুলুক প্রায় পৌরুষ বিহীন,—সূত্রের প্রথমাংশের অধীন আর যে কয়টী লম্ফঝম্পে প্রবীণ,—তাঁহারা দ্বিতীয়াংশের অধীন, এতাবতা মহতী ব্যাপার সিদ্ধ এব,) এই সকল মহতী ব্যাপারের সংঘটন সম্ভাবনা কিরূপে হইবে? কাব্য যদি যায় ত বাঙ্গালাই যায়; হারাণ যায়,—নারাণ যায়,—সবাই যায়! (এ আমাদের কোন রক্ষিত হারাণের কথা হইতেছে না,—অর্থাৎ অরক্ষিত না হইলে হারানই বা হইবে কেন?) কাব্য মাটী,—তাহা হইলেই

ম্যালেরিয়া মাটী; আর বিজয়া যদি উঠিয়া যায় ত বিজয়া বটিও মাটী!—লোকসানটা কিন্তু শেষ ঘরেই আসিয়া পড়িতেছে!—অতএব সিদ্ধান্ত এই হে, পূজাটা উঠান হইবে না; বিসর্জ্জন কেহ তিনদিনে করুক; আর চারিদিনে করুক, মোদ্দা করুক। বিসর্জ্জন থাকিলেই পূজা থাকিবে; পূজা থাকিলেই অনেক মজা থাকিবে আর আমরা চির পরাজিত লোক, আমাদের অত অপরাজিতারই বা খবরে কাজ কি?

এবার উপন্যাস।

প্রথম অধ্যায়,—পত্তন।

ত্রিপান্তর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। অথবা রাত্রি না হইয়া যদি বৈশাখের মধ্যাহ্ন হইত, তাহা হইলে ধূ ধূ করিত। নীল-নিথর আকাশের সীমান্ত-প্রান্তে বসিয়া বিমল সুধাকর হাস্য করিতেছে। (করুক; কিন্তু নিথরটা কি, তাহা ভাল বুঝা গেল না।) সেই অপরূপ হাস্য-জ্যোতিতে নিরন্তর সান্দ্র সুধা-বৃষ্টি হইতেছে।

(উপন্যাসের গোড়া পত্তনটাই একটু শক্ত। প্রথমে, শব্দচ্ছটায় একবার জমাট বাঁধিয়া লইতে পারিলে, পশ্চাৎ আর বড় ভাবিতে হয় না; তখন পাঠিকারা ভাষা-স্রোতে ভাসমানা হইয়া আপনা-আপনি ভাব-রসের কুমুদ-কহ্লার-কাননে লীলা-তরঙ্গ আরম্ভ করিয়া দেন। পাঠকগণ তটস্থ হইয়া দেখেন, অর্থাৎ নিরীক্ষণ করেন কিম্বা নেহারেন; আর আনন্দ-সাগরে উপপ্লুত হইয়া, ক্রমেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তখন আব ভাবনা কি?—উপন্যাস লিখিয়া গেলেই হইল।

(ত্রিপান্তর লেখাটা ভাল হয় নাই।) প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুই ক্রোশের মধ্যে কোন দিকে মনুষ্যের আবাসভূমি (উহুঁ হইল না!—হইল না!—পুনশ্চ আরম্ভ)!

প্রকাণ্ড প্রান্তর। চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিতেছে। দুই ক্রোশের মধ্যে কোন দিকে মানব-বসতির সংস্পর্শ নাই। পূর্ণিমা রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র নীল-নভস্তলে ঢল ঢল করিতেছে আর সেই চন্দ্রানন হইতে ঝলকে ঝলকে সুধারাশি উছলিয়া সংসারে পড়িতেছে। মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া, প্রকৃতি-দেবী নীরব—নিস্তব্ধ। (জমাট হয় আর কি! ঝিঁঝি পোকার সেই সুমধুর সংস্কৃত নামটা কি? কাব্যে সেটা খোলে ভাল! হুঁ—ঝিল্লীরব! পোকাটীর নাম ঝিল্লী আর শব্দটীর নাম ঝিল্লীরব। এইবার আব বদলান হইবে না;—দুর্গা বলিয়া আরম্ভ করা যাক।)

প্রকাণ্ড প্রান্তর—(ওঃ—এবার খুব!) শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে স্বর্ণকান্তি সুধাকর নীল-নভস্তলের মধ্যস্থলে আসীন হইয়া, সংসারের উপর সুধাবৃষ্টি করিতেছেন। জগৎ নীরব—নিস্তব্ধ। প্রকৃতি সুন্দরী,—মাধুরী-মুগ্ধ হইয়া, যেন দিশাহারা হইয়াছেন। নিকটে লোকালয় নাই; দুই ক্রোশের মধ্যে কোন দিকে মনুষ্যের বসতি

নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলেও, সকলি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। (আহা।) নিঃশব্দ মৃদুল-পদ-সঞ্চারী পবনের গতিমাত্র আছে, যেন শব্দ-বহনের শক্তি আর নাই। কোন দিকে ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে না। কেবল সেই নিস্তব্ধ নীল আকাশকে ভেদ করিয়া, জগৎকে যেন সুধায় প্লাবিত করিয়া,—কোমল কামিনী—কণ্ঠ-নিঃসৃত করুণ গীতিস্বর ভূলোক, দ্যুলোক, নক্ষত্রলোক ভেদ করিয়া উধাও হইয়া, কোথায় চলিতেছে! জগৎ যেন একতন্ত্রী হইয়া সেই একমাত্র স্বরশ্রবণে একাগ্রচিত্ত হইয়া রহিয়াছে! স্বর যেন মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া, মন্দাকিনীধারায় ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে। (আহা!) গীত হইতেছে,—

পিলু—যৎ।

মনোজ্ঞ—সরোজ,—মরি।
কোরকে শুকাইল!
শারদ শিশির,—
কেন তারে পরশিল!
সমীর করে সমর,
রজনী তাহে তিমির,
শশাঙ্ক সশঙ্ক যেন,—
মেঘান্তরে লুকাইল।
আশা ছিল মনোলোভা,
হইবে সৌরভ-শোভা,
দয়িত-পদ-দলিত,—
কে জানে কেন হইল!

সেই প্রান্তরের মধ্যস্থলে অশ্বত্থমূলে বসিয়া উদাসিনী একাকিনী এই গান গাহিতেছে। (অবশ্য উদাসিনীর বয়স অল্প। নহিলে উপন্যাসে আসিবে কেন?)

অদূরে সরোবর-তটে কেতকী-বন। কেতকী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, সুগন্ধ-বিস্তারে জগৎ আমোদিত করিতেছে।

কিসের ঐ ছায়া? জনপ্রাণী দৃষ্টিগোচর হইতেছে না,—তবে কিসের ঐ ছায়া? (এইবার একটী পুরুষ আসিবেন আর কি? কিন্তু আজ থাক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুরুষপ্রবরকে দেখিলেই হবে।)

(এদেশে আঁতুড়ে নামকরণের নিয়ম নাই;—যথাসময়ে উপন্যাসের নাম-করণ হইবে।)

তিন খানি পত্র।

প্রথম পত্র।

'পরম পূজনীয় শ্রীমান্ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ সেন

খুড়ামহাশয় কল্যাণবরেষু—

অশেষ প্রেমপূর্ব্বক নিবেদন,—

লাট কর্জ্জন ত কোন মতেই কথা শুনিলেন না। বাঙ্গালাটাকে ছিঁড়িয়া হু'টুকরা করিলেন। তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দুকুলে যখন আমার পূর্ব্বপুরুষের জন্ম, তখন আমাদের জ্ঞাতাশৌচ হইল, ইহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই। আর এ ছেঁড়া যখন যোড়া লাগিবে না, তখন বাঙ্গালীর চিরা' 'চ হইবে। অতএব আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিলাম, বৈধব্য-চিহ্ন সমস্ত ধারণ করিলাম; থানকাড়া ধুতী পরিব, ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না। ইহাতে যে সকল কুফল হইবে, তাহা আমি গোপনে রাখিতে চাহি না। আপনি জানেন যে, এই শ্রাবণ মাস হইতে বাঙ্গালীর আমোদ প্রমোদ বন্ধ হইবে। এ বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব হইবে না। তাহার পর, শ্যামা-পূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, রাস, চড়ক, মাঘোৎসব এবার কিছুই হইবে না। অন্ন-প্রাশন, নামকরণ, এমন কি কুমারী-বিবাহ—সধবা-বিবাহ—বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিবাহই বন্ধ হইবে। নাচ-গান, যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন, খেমটা, বাই,—এ সমস্তই বন্ধ হইবে।

মুদী চাউল বেচিবে না, গয়লা দুধ বেচিবে না, কেহ কোনও প্রকার কারবার করিবে না। বাঙ্গালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া, সমস্ত বঙ্গ এক করিবার জন্ম মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে; পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবে, কিন্তু হাত লাগাইবে না। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে, ততদিন বাঙ্গালী তপশ্চর্য্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙ্গালী বিদেশী জিনিষ স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। তবেই দেখুন খুড়া মহাশয়, অশৌচ হইল, তপস্যা হইল, বেহ্মধর্ম্ম আর থাকিল কৈ? আরও দেখুন, বাঙ্গালী করকচ খাইবে, (সে ত আর লবণ নহে, সে শুধু করকচ); তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, (অহো, কি লজ্জা! কি শোক! এত কৃষ্ণবর্ণ যে গুড়, বাঙ্গালী তাহাই খাইবে) তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময়, বাঙ্গালী আর মিউনিসিপাল কমিশনর, জেলাবোর্ড বা লোকাল-বোর্ডের সভ্য, অনারারী মাজিষ্টর থাকিতে পাইবে না (মাহিয়ানা-ওয়ালা চাকুরী অবশ্য কেহ ছাড়িবে না,—কাহাকে ছাড়িতেও বলি না)।

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, বাঙ্গালীর এই অশৌচকাল মধ্যে বিদেশী দ্রব্য কেহ স্পর্শ করিবে না। এ কারণ, সঙ্কল্প করিয়াছি যে, এবার অন্যূন পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি,

যাহাদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ কর হইবে, তাঁহারা জাহাজে না চাপিয়া মীরবহরের হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিয়া চলিয়া যাইবেন।

তবেই দেখুন, সেই পুরা হিঁতুয়ানীই আবার বজায় হইল, বেহ্মধর্ম্ম গেল। কেননা, তুটা ঠুঁটাই হওয়াতে জন্মের মতন মৈত্রীভঙ্গ হইল; মৈত্রী গেলেই স্বাধীনতা গেল। স্বাধীনতা গেলেই, কেহই কাহারও স্কন্ধে চাপিতে পাইল না। জজ চন্দ্রমাধব ঘোষের স্কন্ধে জজ সারদাচরণ মিত্র আর চাপিতে পাইল না। কবি রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে কবি নবীনচন্দ্র আর চাপিতে পাইল না। রাজনৈতিক সুরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে প্রজানৈতিক আনন্দমোহন আর চাপিতে পাইল না। আর আপনার নিজের স্কন্ধে যে মাতাজী তপস্বিনীর ভূত চাপিয়াই আছে, তাহা আর চাপিতে পাইবে না। তবেই আর সাম্য রহিল কোথায়? তবেই দেখিতেছি, রহিবার মধ্যে রহিল কেবল যোগেন বসু, আর বঙ্গবাসী। ইহা অপেক্ষা দুণার কথা আর কি হইতে পারে?

এ দেশে এখনও এমন নাস্তিক আছে, যাহারা মনে করিতে পারে যে, আমি উপরের লিখিত ভবিষ্যৎ-বাণী করি নাই। কিন্তু আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া লইবেন যে, সন ১৩১২ সালের ২৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবারের বারবেলায় ছাপার অক্ষরে আমি এ সব কথা লিখিয়া রাখিয়াছি।

আপনার প্রেমাধার ভগ্নী
শ্রীমতী সঞ্জাবনী।

পুঃ নিবেদন—

একটা কথা—বোধ হয় লিখিতে ভুলিয়াছি, কেন না, কোনওকালে আমার মাথার ঠিক নাই, এখন আরও নাই। কথাটা এই যে,—অঙ্গচ্ছেদ পারিবারিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গালীর পরিবর্দ্ধনশীল জাতীয় জীবনকে তুর্ব্বল করিয়া আনিবে। তাহাতে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। পারিবারিক সম্বন্ধ আর রহিল না; কেবল ঝি-চাকর আর বামুন-ঠাকুর লইয়া কাল কাটাইতে হইবে!! বলি কি, এ অবস্থায় একবার পঞ্চানন্দের পরামর্শ লইলে হয় না?

দ্বিতীয় পত্র।

[আসল পত্র ইংরেজীতে, দেওয়া যাইতেছে তাহার বঙ্গানুবাদ।]

পরম প্রণয়পাত্রী শ্রীমতী সঞ্জীবনীর প্রতি—

ভগ্নি,

যাহা লিখিয়াছ, যথার্থ ই লিখিয়াছ। আমি হর্ষে এবং বিষাদে এবং শোকে এবং আহ্লাদে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে সমস্ত ভারতবাসী যদি হিন্দু বনিয়া যায়, বেদমার্গের অনুসরণ করে, তাহা হইলে বঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাউক, এ দেশের যে পরম পবিত্র একতা রক্ষিত হইবে, ইহা ভাবিয়াই আমি অধীর হইয়াছি। কেন না, হিন্দু ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম। কতদিনে সাহেবেরা এবং মগেরা এবং হটেণ্টটবাসীরা হিন্দু হইবে, হইয়া এক মহাযজ্ঞের ধুমে ইস্তক জাপান নাগাদ নিউইয়র্ক, জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিবে, তাহাই আমি দিবানিশি চিন্তা করিতেছি।

কিন্তু ইহা বড় দুঃখের বিষয় এবং খেদের বিষয় যে, তোমার যুক্তিপূর্ণ পত্রে তুমি বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর নাই; এমন কি, তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত কর নাই। তুমি জান যে, বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় পবিত্র ধর্ম্ম এ সংসারে দ্বিতীয় নাই। সে জন্য আমাকে মহাবোধী সোসাইটির সভ্য হইতে হইয়াছে; এবং সতীশ বিদ্যাভূষণের পালিভাষার চর্চ্চা না থাকিলে, কি প্রকারে তোমার আমার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতে পারে, তাই ভাবিতেছি।

বুদ্ধদেবকে বাদ দিতে হইলে, আমি সহস্রবার তিব্বতের লামার ভেড়া হইয়া থাকিতে রাজী আছি; বরং 'মিররে'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিব। তুমি জান যে, 'অমৃত-বাজার-পত্রিকা'-সম্পাদক বলিয়া থাকে যে, আমি পূর্ব্বজন্মে হিপোপটেমাস অর্থাৎ সিন্ধুঘোটক ছিলাম। আমি জাতিস্মর নহি। সেইজন্য ঠিক করিয়া বলিতে পারি না যে, এ কথা সত্য কি না। কিন্তু আমার কর্ম্মফলের সামঞ্জস্যের দিকে আমার যে প্রকার দৃষ্টি, তাহাতে ঐরূপ একটা কিম্ভূত কিমাকার ছিলাম, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গচ্ছেদের পর সমস্ত বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কেন না, দুঃখিত হইবার কারণ নাই। বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, আবার বিবাহ জুড়িয়া দিলেই হইবে; কারণ, বিবাহই পরম পবিত্র ধর্ম্ম। বিশেষতঃ বিধবার পক্ষে এরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

আমার বোধ হয় যে, ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা করিয়া যত স্ত্রীলোক আছে, তাহারা যদি প্রত্যেকে কোন প্রকারে বিধবা হইয়া আবার বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে কেবল যে বঙ্গের এই অনঙ্গ-রঙ্গ বন্ধ হয়, তাহা নহে, সমাজের সর্ব্বঅঙ্গই এমনি সুন্দররূপে সংস্কৃত এবং সুগঠিত হইতে পারে। স্থূল কথা এই যে, সমাজ-সংস্কার না হইলে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কোনও মতেই নিবারণ হইবে না।

তুমি যে পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি বিলাত পাঠাইয়া তুমুল আন্দোলনের প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতে তাদৃশ সুফলের সম্ভাবনা বিবেচনা হয় না। আমার বিবেচনায় পরম পূজনীয় সদ্‌ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মরক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা প্রভৃতি ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রধান প্রধান আচার্য্যকে বিলাতে পাঠাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের পাঁচকোটী প্রতিনিধিকে

জাপানে পাঠাইয়া এবং হুগলী বৰ্দ্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও মানভূমের বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী এবং বালক বালিকাগণকে আমেরিকায় পাঠাইয়া, পনির ও পাউরুটী তৈয়ার করিবার প্রশস্ত পদ্ধতি শিক্ষা দিবার উপায় করিতে পারিলে, লর্ড কর্জ্জন কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না।

লর্ড কর্জ্জনের বিরুদ্ধে তুমি যে সংগ্রামের সূচনা করিয়া নিজের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি আশা করিয়াছিলাম যে,সমর-কৌশল সম্বন্ধে তুমি আমার পরামর্শ সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিবে। কেননা, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, যুদ্ধ চালাইবার বিষয়ে 'মিরর' সংবাদপত্রে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, জাপানের মাই-কেডো অর্থাৎ সম্রাট সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার একপ্রস্থ নকল টোগোর কাছে, আর এক প্রস্থ নকল নডজুর কাছে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতেই মুকদেনের ডাঙ্গা-যুদ্ধ এবং টুসিমার জলযুদ্ধ জাপানের পক্ষে জয়ের সহিত অবসান হইয়াছে। আমি গর্ব্ব করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু তুমি আমার দেশ-ভক্তিতে কখনই সন্দেহ করিতে পারিবে না। জাতীয় ভাষার প্রতি আমার অনুরাগ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছ। কেননা, মাইকেলের গোরের উপর আমি ইংরেজী ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ বাঙ্গলা কি সংস্কৃত, আমার জানা নাই। অতএব যুদ্ধ করা যদি নিতান্তই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'মিরর' পত্রের "প্রাপ্ত পত্র" স্তম্ভে তুমি যত খুসী, অস্ত্রের ধার দেখাইতে পার। ইংরেজী অক্ষর হইলেই আমি তাহা ছাপাইয়া দিব। ঈশ্বর তোমার সদ্বাসনা পূর্ণ করুন, আর জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মাগণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

তোমার বশংবদ ভৃত্য
খুড়া শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।
মোকাম মিরর-কার্য্যালয়।

তৃতীয় পত্র।

শ্রীমতী সঞ্জীবনী,
তথা
শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ সেন,
সমীপেষু।—

বাছা ও বাছী,

তোমরা উভয়েই বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী। অধিক আর কি বলিব। কেবল প্রার্থনা করি যে, হয় তোমাদিগকে রাখিয়া যেন আমি মরিতে পাই, আর না হয় আমি থাকিতে থাকিতে তোমরা গোল্লায় যাও

বঙ্গচ্ছেদ অঙ্গচ্ছেদ ও সব আমি বুঝি না। তবে যে দিন অবধি শুনিলাম যে, বগুড়া, রাজসাহী এবং রঙ্গপুর আমাদের হাতছাড়া হইল, সেইদিন হইতে আমার মনটা কেমন কেমন করিতেছে, ইহা আমি কবুল করি। বগুড়া আর রাজসাহী গেলেই গাঁজা গেল, রংপুর গেলেই দোক্তা গেল, তবে আর রহিল কি? তোমাদের ভগবানের দেওয়া বুদ্ধিতে যতটা খেলা খেলে, অবশ্য গাঁজা-দোক্তার ততটা শক্তি নাই, ইহা মানি। কিন্তু আমার ত ঐ অবলম্বন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে তোমরা দুঃখ না করিলেও পারিতে। কেন না, শ্রীমতী শুগালিনীর যখন শুভবিবাহ হইয়াছে, তখন খেদের স্থল কোথায়? তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, বিধবার শুভবিবাহের সহিত তুলনা করিলে অঙ্গচ্ছিন্নে কিছুই ছিন্ন হয় না ও ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

তবে নিতান্তই যদি কোন একটা কিছু করিতে হয়, আর কাটা বঙ্গ পুনরায় জোড়া দিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলি, আইস ভাই আটকোটী পূর্ব্ববঙ্গবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী, উত্তরবঙ্গবাসী, দক্ষিণ-বঙ্গবাসী, ঈশানবঙ্গবাসী, অগ্নিবঙ্গবাসী, নৈঋতবঙ্গবাসী, বায়ুবঙ্গবাসী, ঊর্দ্ধবঙ্গবাসী, অধোবঙ্গবাসী! সকলে সমস্বরে শুভদিন দেখিয়া, ইংরেজের রাজ্য ছাড়িয়া চন্দননগরের টিকিট কিনিয়া ফরাসডাঙ্গায় গিয়া বাস করি। তাহা হইলে করুন না কেন লর্ড কর্জ্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, আমরা ত সকলে একঠাঁই হইয়া থাকিব।

তোমাদের শুভদিন যে, আমার উদরাময় হইয়াছে। অধিক কি লিখিব। ভাবে বুঝ ভাবুক যে জন।

তোমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ—

শ্রীপঞ্চানন্দ।

পুঃ——আমারও একটা পুনশ্চ আছে। কেহ কেহ ভয় করিতেছে যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে রাজ্যের খরচা বাড়িয়া যাইবে; তাহাতে টেক্‌স বাড়িবে। কিন্তু আমি তাহাতে ভয় করি না। কেন না, চারি আমার তহবিলের জোরে যাহারা জাপান, জর্ম্মাণ প্রভৃতি জয় করিতে গিয়াছে, তাহারা ফিরিয়া আসিলেই টাকার অভাব কিসের? লউক না কেন কত টেক্‌স লইবে?

শ্রীপং।

নাতনার ভাবনায় পঞ্চানন্দ।

[এবার, সিদ্ধ-মৌলিক কায়স্থ দাদৃদেহে আবির্ভূতা]

নাতনী! তোর ভাবনা ভেবে ভেবে
শরীর আমার কালি হলো;
নাৎজামাই জুটবে মোর, কতো দিনে?

ভবভূমে কপোতাক্ষ-কবির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বের ঐ অমিত্রাক্ষর কবিতা—আজি কালী আমার জপমালা। অপার্য্যমানে নাতজামাই—তাও পোড়া সিদ্ধ-মৌলিক—জন্মে জুটে না। সাধ্য বাহাত্তরে নামিবার সাধ্য কখনই ছিল না। সিদ্ধ সমান ঘরে, পূর্ব্বে চলিত, বিদ্যার প্রসারে, সে পথ বন্ধ। কুলীনের প্রথম পুত্র—বামনের পক্ষে প্রাংশু লভ্য অংশুমৎ ফল—কাজেই কবিতাই একমাত্র অবলম্বন—

নাত্‌জামাই জুটবে মো—র ক—তো দিনে?

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইতেছে যে, আমাদের এই কায়েৎগুলাই, বিশেষ কুলীন কায়েৎ গুলাই—যত অনর্থের মূল! বৈবাহিক অনর্থ, সামাজিক অনর্থ, রাজনৈতিক অনর্থ, অঙ্গচ্ছেদের অনর্থ—সকল ছেদের, অনর্থের মূল,— এই—না-ক্ষত্রিয়, —না-শূদ্র,—না-ব্রাহ্ম, না-পতিত— যমের জাতি—এই কায়স্থগুলা।

তার মধ্যে সকল অনিষ্টের গোড়া—এই মহামান্য ঘোষ-ধন্য—চন্দ্রমাধব খুড়া। বাবা! সভা করিবে ত, সত্যই করিবে। বক্তৃতা হবে, হাততালি পারতালি হবে, দরখাস্ত হবে, দেশোদ্ধার হবে। বস্। তা নয়, তুমি কি না চাহিলে, চারি জাতি কায়স্থ একত্র করিতে? তা নয়, ছাই! কেবল সভাতেই হোক, কাগজে কলমে থাকুক; তা কোথায়? সভা করিবার আগে হইতেই, ভেঙ্গে ভেঙ্গে মেলন, আবার সেদিন কিনা ভেঙ্গে বারে মেলন! বলি এখন—

কোথায় বঙ্গজ তুমি, বারেন্দ্র কোথায়?
এবে যে 'আসামী' হয়ে, খাড়া কাটরায়।
বড়ুয়া বেহাই কর, বাড়িবে বড়াই,
রাঢ়ি সঙ্গে রেড়ো হয়ে, আর কাজ নাই॥
গুমান হইল গুঁড়া—নবীন বিধানে,—
পাণ্ডব-বর্জ্জিত তুমি, ধর বজ্রবানে॥

সভা করিয়া, কুটুম্বিতা করিয়া, চারি জাতি এক করিবে কি? এখন জিওগ্রাফীর জালায়, ভূগোলের গণ্ডগোলে, অস্থির হইতে হইল যে,—তার কি? যদি এতদিন বিবাহের ব্যয় কমাইবার কিছু করিতে পারিতে; তবে কত লোকের কত আশীর্ব্বাদ পাইতে। আজি আর আমাকে অনবরত জপ করিতে হইত না,—

নাৎজামাই জুটবে মোর কতো দিনে ?

আর খুড়া, তোমাকেও এই পঞ্চানন্দ পড়িয়া হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে হইত না।

তার পর, ঘোষ ধরিয়াছি,—ঘোষেদের কথাই বলি; মহামান্তের পর দেশমান্ত আইনের ডাক্তার খণ্ডঘোষের ঘোষের কথাই বলি। তুমি, দাদা, তুমিই কি সেদিন কম অনর্থটা করিলে ? তোমার সভা করার বাতিক ত বড় ছিল না। পতি হবার সাধত অনেক দিন মিটাইয়াছ! তবে আবার সভা করিয়া সেই সভার পতি হইতে গেলে কেন ? তোমার আছে তিনটা জিনিষ—পকেট, প্রাণ আর মগজ। পকেট পূরিবে, প্রাণ দিয়া খাটিবে, আর মগজ হইতে আইনের প্রস্রবণ বাহির করিবে। তুমি সভা করিতে গেলে কেন ? তুমিইত বলিয়াছিলে, বড় শ্লেষের সহিতই বলিয়াছিলে, হিন্দুরা দিগ্বিজয় করিতে, দেশ দমন করিতে না জানিতে পারে, কিন্তু তাহারা বাঁচিতে জানে ও মরিতে জানে। লাট মহালাট বলিতেছেন,—মরিতে জান ত মর। তোমাদের আর মাথা কুটিলেই কি ? বুক ফাটিলেই বা কি ? গাও দাদা—খুব চাপান দিয়াছিলে,—এইবার ৭ই আগষ্ট উতোর গাও।

আর একদিকের আর এক ঘোর—নটবর গিরিশচন্দ্র। বিল্বমঙ্গল, পূরণ পাগল—এ সকল মন্দ নহে। সৎনামি সম্প্রদায়ের কথা লিখিতে গিয়াছিলে নাকি ? তাতে কেবল অসৎ নাম হইয়াছে মাত্র; কেত ঘোষ নামেই খোস্ নাম; তাহার উপর শিশির ঘোষের কাছেই থাক—তার উপর সৎনাম কেন দাদা ? তোমার চেলার 'বিভ্রাটের' পর তোমার পুথা বলিদান ভাল; কিন্তু ওসকলে আমাকে আরও ভাবাইয়া তুলে—

নাত-জামাই জুটবে মোর কতো দিনে ?

ঘোষের পর বসু কুলীনদের উপরই না আমার রাগ! শ্রীভূপেন্দ্র বসু কোর্টে থাকুন, কৌন্সিলে থাকুন। বেশ! কন্সেট আইনে রাজপক্ষে মত দিয়াছেন; তাও ভাল—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং। কিন্তু কন্‌ফারেন্সে চৌকীদারি করিতে ময়মনসিং যাওয়া কেন ? সে মুলুকে লোক ছিল না, তাই অভাব পূরণ করিতে গমন ? না, রাঢ়ে বঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বন্ধন করিতে প্রয়াস ? বলি এখন ? এখন যে ভ্রাতৃভাবে বৈমাত্রের ভাব আনিবার জন্ত অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছে; এখন সূর্য্যনারায়ণ, জগৎনারায়ণ দুই ত আমাদের সমান হইবেন! আর ময়মনসিংহে পতিত্ব করিবার সুবিধা ত হইবে না। তোমরাই ঘুচালে ? তাহাতেই বলিতেছিলাম, কুলীন কায়স্থই যত অনর্থের মূল!

আর এক বসু—গিরিশের গণ্ড শিষ্য অমৃতলাল বসু। তিনিও একটী কম নন্। বিবাহ-বিভ্রাট বাধাইবে বাধাও। ক্ষত্রিয়ত্বের প্রয়াসিগণ রাণা প্রতাপের কথা কহিবে কেন ? তাহাতেই বলিতেছিলাম,—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের আমাই—জঙ্গবঙ্গে একজাতি

হইবার আস্বাই—যত অনর্থের মূল। এই আস্বার জোরেই ত, ভাঁড় দ্বিজ আজি রাম-দাস স্বামীর স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধান্বিত। এত কি সয় গা ?

বলিতে হইবে না,—সকলেই জানেন, ঘোষের পাপে—মিত্র, দত্ত সমান পাপী! পুঁটুলী কসিয়া বাঁধিতে কাপি ছিঁড়িল, এখন রাস্তায় খুদের ছড়াছড়ি। জাতির বন্ধন দিবে কি ? এখন দেশ পৃথক্, রাজ্য পৃথক্, রাজা পৃথক্ হইল। কায়স্থই এই অনর্থের মূল। আর কায়স্থের কায়স্থ রিজলি সাহেব সকল মূলের মহামূল। কন্‌সেণ্ট আইনের মূলে,—রিজলির কায়স্থ কলম। তাহাতে কি গণ্ডগোলই না হয়! সেন্সাস রিপোর্টেও সেই কলমের খোঁচা, বাঙ্গালার কায়স্থপুঙ্গবগণকে ক্ষেপাইয়া তুলে ও কায়স্থসভার সৃষ্টি-সাধন করে। এবারও রিজলির সেই কায়স্থকলম বঙ্গের বলিদান সাধন করিল। যমায় চিত্রগুপ্তায় রিজলি সাহেবায় নমঃ। আমি বোধ করি, সত্বর কায়স্থ-সভা আহ্বান করিয়া কায়স্থের কায়স্থকে, রিজলি গুণধামকে, সভাপতি করিলে, আমরা এই অনর্থ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারি—আর তিনিও বোধ করি অর্দ্ধ অঙ্গের লাটিয়তি না পাইয়া, আমাদের গরীয়সী সভার পতিত্ব পাইলে,—কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারেন। এখন সেই কথা—নাত্‌নী তোর ভাবনা ভেবে ভেবে, পাগল হ'লাম—

কায়স্থেরে গালি পাড়ি—পঞ্চানন্দ রঙ্গে।

পুলীশের পূজার রিপোর্ট।

ধর্ম্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু—

অধীন এই থানার এলাকাভুক্ত বদরপুর গ্রামের মসিতুল্যা চৌকীদারকে গোপনে জিজ্ঞাসা করা মতে বিশ্বাসী সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে যে,গ্রাম মজকুরের বাসিন্দা রামকুমার দত্ত অত্যন্ত স্বদেশী এবং নানাপ্রকারে সরকার বাহাদুরের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বড়লাট সাহেব বাহাদুরের হুকুম মতে যে প্রকার অনিষ্ট-স্বদেশী হইবার বাধা নাই, উক্ত দত্ত মজকুর সে প্রকার অনিষ্ট-স্বদেশী না হইয়া স্বদেশের ইষ্ট চেষ্টাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্বদেশী হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়; যেহেতু ইহাতে সরকার বাহাদুরের রাজ্য উৎপাটন হইতে পারে, তাহা হইলে হুজুরের চাকরী যাইতে পারে এবং অধীন খয়ের খাঁ কর্ম্মচারী হওন সত্বেও বিনাদোষে অধীনের রুটী মারা যাইতে পারে, তাহাতে অধীনের যে হঠাৎ ক্ষমতা হইয়াছে, তাহা লোপ পাইতে পারে এবং মান-সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইতে পারে। তাহাতে সকল পক্ষেই অমঙ্গল, বিশেষতঃ উক্ত দত্ত মজকুর ইমসন দুর্গোৎসবের সমস্ত আয়োজন সংগ্রহ করিতেছে। তাহাতে বাঁশ আছে, দড়ি আছে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র ও মাল মসলাও আবশ্যক বটে। এই দুর্গোৎসব ভয়ানক স্বদেশী, ইহাতে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত থাকিবে,

তাহারা সকলেই ইষ্ট স্বদেশী জানা যাইতেছে, কেহই অনিষ্ট স্বদেশী হইতে চাহে না। অধিকন্তু যে ব্যক্তি পূজা করিবে, সেও স্বদেশী, তাহাও উক্ত দত্ত মজকুর ঠিক করিয়াছে। ঐ দুর্গোৎসবে যে সকল কাপড় ও বাসন ও চাউল প্রভৃতি সরঞ্জাম লাগাইবে, তাহাও সমস্তই স্বদেশী; এমন কি স্বদেশী তাঁতির স্বদেশী তাঁতে স্বহস্তে বুনা কাপড় এবং স্বদেশী চাষা লোকের স্বদেশী জমিতে স্বদেশী ধান্য হইতে স্বদেশী চাউল করিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিয়াছে। এবং স্বদেশী বাজনদারের স্বদেশী ঢাক ঢোল এবং স্বদেশী সমুদ্রের স্বদেশী শঙ্খ পর্য্যন্ত বাজাইবে, তাহাতে বিস্তর লোকের বে-আইনি জনতা নিশ্চয় হইবে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এবং ইহাতে মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতির ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইয়া ঘোরতর দাঙ্গা ও তাহাতে খুন জখম হইবার সম্ভাবনা। আরও প্রকাশ পাইতেছে যে, ঐ দুর্গোৎসবে চণ্ডী পুঁথি পড়া হইবে, তাহাতে প্রচণ্ড প্রচণ্ড রাজবিদ্রোহের কথা সকল আছে।

অধীন বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধানে বিশ্বস্তরূপে জানিয়াছে যে, ঐ চণ্ডীর পুঁথিতে এক সুরথ রাজার কেচ্ছা আছে, এবং সমাধি বাণিয়ার কেচ্ছা আছে। ঐ সুরথ রাজার রাজ্যে যবন সকল প্রবেশ করিয়াছিল এবং রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাহার পর এক মুনির পরামর্শে সুরথ রাজা সেই যবন সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত রাজ্য মায় সিংহাসন, মায় আইন কানুন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল। ইহাতে খোলসা বুঝা যাইতেছে যে, ঐ যবন হজরৎ কেলাইভ সাহেব এবং তাঁহার কাচ্ছা বাচ্ছা ভিন্ন আর কেহই নহে, ইহাতে অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ প্রকাশ পাইতেছে। এবং ঐ সমাধি বাণিয়া ঘরে ঘরে ঝগড়া করিয়া বনে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেই মুনির পরামর্শে সেও মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে, ঐ ঘরে ঘরে ঝগড়ার অছিলায় মহামান্য নবাব মিরজাফর সাহেবের এবং তাঁহার স্বপক্ষ লোকদের ইসারা করিয়া সুরথ বাণিয়ার দ্বারা উক্ত দত্ত মজকুর সরকারের খয়েরখাই প্রজাদের নিন্দা করিবার মতলব করিয়াছে। এবং আপন আপন বাণিয়াগিরি চালাইবার জন্য বয়-কটের কু-মতলব আঁটিতেছে। এ মতে ঐ চণ্ডীর পুঁথির দ্বারা ভয়ঙ্কর গোলমাল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত দত্ত মজকুরের মতলব নিতান্ত সরকার বাহাদুরের লোকসান করা। তাহাতে দত্ত মজকুরের সঙ্গীন সঙ্গীন মুচলেকা না হইলে রাজত্ব রক্ষা এবং হুজুরের ও অধীনের ধন প্রাণ মান কিছুই রক্ষা হইবে না। এ মতে অধীন মফস্বলে ও সরেজমীনে অশেষ বিশেষ তদন্ত ও ছদ্মবেশে গোপন অনুসন্ধান দ্বারা চৌকীদারের এজেহারী সমস্ত বৃত্তান্ত ঠিক্ ঠিক্ জানিয়া হুজুরে নিবেদন করিয়া খালাস ইহাতে হুজুর মালিক। নিবেদন ইতি—

শ্রীতারিবুল্লা সব-ইনস্পেক্টর।

ডেপুটীর গান।

(১)

আমি সদাই ভাবি তাই
ধরম বল, করম বল,—
চাক্‌রী চেয়ে কিছু নাই

(২)

পেয়ে মহকুমার ভার
গোটা ধরা, একটু সরা
(ও ভাই) আমি অবতার,
(আমি) দশ জানি না, দেশ মানি না,
পু'শ টাকা মাইনে পাই।

(৩)

আমি কালো ডিপুটী,
বাপ খুড়ো ভাই ভায়া, সবাই
সেই চুনো পুঁটী—
আমি খুঁড়িয়ে বড়, খোঁটা দড়
আমার সমান কেহ নাই।

(৪)

আমার মেজাজ বড় গরম,
গুরু গোসাঞী পরোয়া নাই,
হই নাকো নরম—
আমায় বলে বলুক তা'রা মন্দ
তাতে কিছু ক্ষতি নাই।

(৫)

এমন ভাগ্যি কার আছে—
কত পুলীশ, কত ফুলিস
(আমায়) তুল্‌চে গো গাছে ;—
আমি রঙের গোলাম, বেকস ম'লাম,
অন্নদাতার কাছে তাই।

(৬)

ঐ যে আত্মীয় স্বজন
ভুলে গেছি, ভাসিয়ে দিছি
পেয়ে শ্রীচরণ ;—
মরি ধন্মি ধন্মি, আমার গিন্নী
জানে আমার কি বড়াই ॥

ছি-ছি-ছি-ছি !

[যার লেখা তার লেখা এটা, আমার লেখা নয় !]

মুখুটির পো কল্লি কি ? (১)
চারদিকে যে ছি—ছি—ছি !!
কেন উত্তরে ?—ঐ ছি—ছি !
আর দক্ষিণে ?—সেই ছি—ছি !
পশ্চিমে—আরও ছি !
পূবে—কেবল ছি—ছি ছি—ছি !
ঈশান কোণে—আরও ছি !
নৈর্ঋতে—শুধুই ছি !
অগ্নিকোণে—পুড়্ছে ছি !
আর, বায়ুকোণে—উড়ছে ছি !
উর্দ্ধলোকে—শতেক ছি !
অধো-দেশে—আরে—ছি !
ছি—ছি—ছি ! বল্‌বোই বা কি !!
দশদিকে ছি ; ছোট বড় ছি !
বামুনঠাকুর আর ঝি—সব্বাই ছি—ছি !!
ছি—ছি—ছি—ছি—তার উপরও ছি !
সাড়া—শব্দ যত কিছু—শুধুই ছি—ছি !

* * *

লেজের মাচা, নয়কো সাচা, গরব সাজে কি ?
ধর্ম্ম-অবতার তবু চারদিকে যে ছি !

---

(১) বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া।

পাঁচুঠাকুর।

হাতী-খেকো কয়েৎ-বেল বুঝতে পেরেছি।
নইলে কি আর, হয় গা এমন,—ছি—ছি !—ছি।
গোটা কতক শুক্‌নো টাকা দিন কতকের তরে।
মানুষ এতে ক্ষেপে নাকো, পোকা মাকড় মরে।
মানের কি আর বড়াই চলে ?—অস্পর্শী মান।
আঁস্তাকুড়েই উৎপত্তি,—আঁস্তাকুড়েই স্থান॥
আঁকের কিছু জানা আছে, ভেঙে বল্‌বো কি।
জমা চেয়ে খরচ বেশী হ'লে পরেই ছি !
হাঁকিয়ে জুড়ি কে যাচ্ছে, চিন্‌তে পেরেছি।
ঐ বুঝি সেই খুকীর বাপ্,—ছি—ছি—ছি !

* * *

মুকুটি মেয়ের কি ?
বিয়ে বল্'লে বঙ্গবাসী চ'টে বল্‌ছে ছি !
নিকে ব'ল্‌লে মোসল চটে,
ব'ল্‌বোই বা কি ?
আরে ছি—ছি—ছি !

* * *

তাল,—
এর বেলা ত ছি—ছি—কার,
বুঝ্‌তে পেরেছি।
আশে-পাশে ঘুরছে যারা,
তাদের দশা কি ?
ব'ল্‌তে কি আর বাকী আছে,
তাদেরও ছি—ছি !

* * *

উনি কে তক্র-ভুষুন ?
এইবার শুধু চাকুরী চুষুন।
জাৎ-গোত্তর ভাসিয়ে দিয়ে,
দশা হ'ল কি ?
ছি ছি—ছি, আরে ছি—ছি—ছি।

* * *

দেবী ছিলেন প্রসন্ন, তেমনি এখন বিষণ্ণ,
দশের কাছে মুখ দেখাবার—
পথ কি রেখেছি!
ছেলে বুড়ো যে দেখ্‌ছে,
সেই কর্‌ছে ছি!

* * *

ডবল গেরেট ছি!
গেরেট ছি ছি!
ইংলিশ টাইপে হ'ল ছি ছি ছি!
পাইকা ছি—ছি!
বর্জ্জাইসে ছি!
আরও ছোট অক্ষর থাক্‌লে,
ছি—ছি, ছি—ছি!
বড়র বড় ছোটর ছোট,
বাকী রইল কি?
আগাগোড়া জগৎ-জোড়া,
ছি—ছি, ছি—ছি!

* * *

গেরোস্তের ঘরে, যত্ন যদি করে,
রোদে দেয়, ঢেকে রাখে,
পাকে-পাকে গিয়ে দেখে,
কূলে পোকা ধরে না রে—
ধর্‌তে পারে কি?
বুঝলে নাকো সোজা কথা,
ছি—ছি ছি—ছি!

* * *

তবু,—তাই যদি নেহাৎ হ'ত,
তাতেই বা কি বয়ে যেত!
ভাঙলে কপাল, অমন হয়,—
তার কর্‌বে কি!
তাতেও তত ছি নাইকো,—

এতে যত ছি!
তখন তবু বলা চলে,—
আমি ক'র্‌বো কি!

* * *

এ যে,—
নিজের মুখ পুড়িয়ে নিজে,
হ'তে হ'ল আগুন ভিজে,
পুড়ে যে হবেনা ছাই, ধোঁয়ায় আঁধার হবে,
প্রথমে করাঙ্কা, শেষে চক্ষু তুটী যাবে।
গোঁতা উনোন, ভিজে কাঠ আর হবে বা কি?
ছি—ছি—ছি, শুধু ছি—ছি—ছি॥
মরমে ম'রে গেলে,
সরমে সারা হ'লে,
ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢকেলে এখন হবে কি!
দেশশুদ্ধ মেয়ে-মদ্দ ক'র্‌ছে ছি—ছি—ছি।

* * *

ছি—ছি—ছি।

মা আসিলেন না।

অস্ত্র আছে পাশ নাই, ভাবিলা ভবানী তাই,
গেলে যদি পুলীশেই ধরে।
চা-চুরুটে ছড়াছড়ি, ভিক্ষা দিতে কড়াকড়ি,
লক্ষ্মী কন যাইনা সে ঘরে॥
উনিবর্সিটীর দাপে, থর থর হিয়া কাঁপে,
বীণাপাণি কহেন কাঁদিয়ে।
আমার যে বরপুত্র, গলায় রাখে না সূত্র,
বিধবা কন্যার দেয় বিয়ে॥
পোড়োর কপালে ফাট, অপাঠ্যে করিল পাঠ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাহি মানে।
বিদ্যাতরি-কর্ণধার, হবে সেই অবতার,
ছিছি আমি যাব না সেখানে॥

সিদ্ধিদাতা গণপতি, হ'য়ে ম্রিয়মাণ অতি,
কহিছেন জননীর ঠাঁই।
মূষিক বাহন ছিল, পেলেগেতে হত হ'ল,
আমিই বা কেমনেতে যাই॥
যতেক ডাক্তার মিলে, অকাট্য যুক্তির বলে,
বলে প্লেগ মূষিকের গায়।
অচিরাৎ তোদের বংশ, যদি না করিবে ধ্বংস,
কিসে বল দেশ রক্ষা পায়॥
কার্ত্তিকেয় মহাবীর, ভয়ে সদা অস্থির,
বলে আমি যাইব না ভবে।
মনে চিন্তা সদা পাছে, টিক্‌টিকি লাগে পাছে,
তাহলেই, দফা রফা হবে॥
চোরা বলে কারে ভয়, ভবে যদি যেতে হয়,
আমিই না হয় যাব একা।
সি-কেলাসে মার্কা মারা, আমি মহাদর্পী চোরা,
পুলীশেরে বানায়েছি বোকা॥
সিংহ বলে রও রও, একা কোথা যেতে চাও,
কেন বা বড়াই কর মিছে।
যদি তুমি যাও ভবে, আর না ফিরিতে হবে,
জান না কি যম আছে পিছে॥
(তখন) লম্ফে ঝম্ফে—মহাদম্ভে দুই মহাবলী।
কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ভবে গেলা চলি॥

সিংহ-স্তোত্র।

দয়া ক'রে এই কাজটী কর সিংহ মামা।
আর কিছু চাই না, যেন ধর্ত্তে পাই ধামা॥

পঞ্চ-আনন্দ।

(১)

ভৌতিক আনন্দ।

আকাশ থেকে ঢেলা পড়ে
ভর্ত্তি দুপুর বেলা।
লোকে বলে আর কিছু নয়,
ভূত-পেরেতের খেলা॥
ডাকাতে করিল লুঠ ঢাকার ভিতরে।
চাইছে পুলীশ চোরা মাল পিমিত্তির ঘরে॥
সূক্ষ্ম বিচার যথাকালে, আগে ভাগে সাজা।
কোটালের রাজ্য-পাট বন্দী হ'ল রাজা॥

(২)

সাহিত্যিক আনন্দ।

যার রক্ষিত তার রক্ষিত পান্তভাতে ঘি।
প্রতিভা সুন্দরী পেলে আর চাই কি?
সুন্দর সুন্দর হয় বিদ্যা যদি জুটে,
ছোঁড়ারা কি হয় দেখি প্রতিভার চোটে॥

*　　*　　*

রাষ্ট্র এখন ভুবন জুড়ে,
দৈবজ্ঞির ছেলে।
প্রিন্সিপালী কর্‌বে এবার
পাঁজি পুঁথি ফেলে॥

(৩)

সামাজিক আনন্দ।

ঘোষ বোস দেবশর্ম্মা নমঃশূদ্র কাও।
লাও পর গাড়ী এবার গাড়ী পর লাও!

*　　*　　*

কেউ মরে ছোবড়া টেনে কেউ খায় শাঁস।
পোলাও পাইল পাঁচু পঞ্চাননের বাঁশ।
সেনের পোলা হ'ল রায় নরেন বাহাদুর।
বুড়া কালে লোক হাসালে দূর দূর দূর॥

(৪)

রাষ্ট্রীক আনন্দ।

দ্বাপরে কানাই ছিল ঘোষের নন্দন।
কলিতে তাঁতির কুলে দিল দরশন॥
তাহারে হরিয়াছিল অক্রুর গোঁসাই।
গোঁসাইরে কানাই দিল বৃন্দাবনে ঠাঁই॥
গোঁসাই হ'ল গুলিখোর (১) কানাই নিল ফাঁসি,
কোন্ চোখে বা কাঁদি বল,
(আমি) কোন্ চোখে বা হাঁসি?

(৫)

বাত্তিক আনন্দ।

কেউ করেছে সিডিসান, কেউ দিচ্ছে জ্ঞান।
কেউ কচ্ছে পূজার বাজার, ভাঙ্গবে যাতে মান॥
কেউ ভাবছে শিবের গান, কেউ ভানছে ধান।
বাত্তিকের চোটে পাঁচু আহ্লাদে আট খান॥
যার কান্না সেই কাঁদে, যার হাসি সেই হাসে,
পাঁচুর প্রেমের তোড়ে দুই কূল ভাসে॥
কেউ যাচ্ছে শশ্মি নিয়ে কেউ খাচ্ছে ভুখি,
যার যা খুসী করুক মরুক পঞ্চানন্দ খুসী॥

---

(১) নরেন গোঁসাই জেলে গুলি খাইয়া মারা যায়।

পাঁচ কাণ্ডে পাঁচুঠাকুর সমাপ্ত।

অন্যান্য রচনা।

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ।

"হিন্দু কাহাকে বলে?" এই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসের 'নবজীবনে' * ঐ প্রবন্ধগুলির উপসংহার হইয়াছে। আমি এই বিষয়ে কিছু বলিতে চাই।

বুঝিবার দোষে শাস্ত্র অশাস্ত্র বলিয়া মনে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, তারাপ্রসাদ বাবুরও এই দোষ ঘটিয়াছে। নানা কারণে আমি তারাপ্রসাদ বাবুকে বিশেষ সম্মান করি। আরও অনেকে করেন। সেই জন্যই তারাপ্রসাদ বাবুর ভুল দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকেরই নাকি কিছুমাত্র গুরুকরণ নাই, অথচ স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ নাকি আজি কালি অল্প স্বল্প শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, সে জন্যও মান্য ব্যক্তির ভুল শুধরাইয়া দেওয়া আরও আবশ্যক। নচেৎ তারাপ্রসাদ বাবুর কথার উপর কথা কহিতে আমি ধৃষ্টতা মনে করিতাম।

তারাপ্রসাদ বাবু কেবল নিজের বিবেচনা অনুসারে যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না; কেবল শাস্ত্রীয় কয়েকটি বচন প্রমাণের তিনি যে বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, তাহাই দেখাইব।

তারাপ্রসাদ বাবু বলেন,—"জ্ঞানীর জন্য এক পন্থা এবং জ্ঞানহীনের জন্য পৃথক্ পন্থা, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।" এই বলিয়া কতকগুলি বচন প্রমাণ তোলা হইয়াছে এবং তাহার একরকম অর্থও করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার লেখা অনুধাবন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের শাস্ত্রীয় প্রভেদ তিনি উপলব্ধি করেন নাই। কি জন্য আমি এ প্রকার বোধ করি, তাহা দেখাই।

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥

তারাপ্রসাদ বাবুর অর্থ—"যিনি নিত্য ও নিশ্চল পরব্রহ্মে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি) কোন নাম না দিয়া, এবং কোনরূপ (রক্তবর্ণ চতুরানন, কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ,

---

* 'নবজীবন'—অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সেকালের প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র।

রজতবর্ণ পঞ্চানন ইত্যাদি) আরোপ না করিয়া, তাঁহার তত্ত্ব যথার্থরূপে জানিয়াছেন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।"

"নাম না দিয়া" "রূপ আরোপ না করিয়া" এই দুই কথা ত মূল বচনে নাই। তারাপ্রসাদ বাবু তবে কোথায় পাইলেন? "বিহায়" শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া; তদ্বারা আরোপের কোন আভাস পাওয়া যায় না। বাস্তবপক্ষেও নাম এবং রূপ জীব কর্ত্তৃক আরোপিত নহে। সমস্ত সৃষ্টি যাঁহার কল্পিত, জীবের গতির জন্য নাম এবং রূপও তাঁহারই কল্পিত। মায়ার অধীনে থাকিয়া জীব যাবৎ আত্মস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান থাকে, তাবৎকালই সেই অজ্ঞান নষ্ট করিবার জন্য অধিকারি ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে। ক্রমে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মত্যাগ এবং জ্ঞানোদয় হয়। তখন অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মায়ার মোহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জীব সৃষ্টির মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করে এবং নাম ও রূপের নানাত্ব লইয়া যে সৃষ্টি, সেই নাম ও রূপের মিথ্যাত্ব জানিয়া আপনা আপনি তাহা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ নাম-রূপাত্মক নানাত্ব, স্বপ্নদৃষ্ট গজরথাদিবৎ সহজেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান এবং সহজেই পরিত্যক্ত হয়। জগৎ মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হইলেই নিশ্চল অর্থাৎ অজগৎ এবং নিত্য যে ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে জীব তখন পরিনিশ্চিত-তত্ত্ব হয় এবং তদ্রূপ হইলে তখন কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

তারাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত বচনের ইহাই প্রকৃত অর্থ। বুদ্ধিমান্ হইলে জ্ঞানী হয় না। ইংরেজী, ফারসি পড়িয়া কৃতবিদ্য হইলেও জ্ঞানী হয় না, আর আমি জ্ঞানী মনে করিলেও জ্ঞানী হইতে পারা যায় না। মায়ার বশীভূত আমরা, মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে, কখনই জ্ঞানী হইতে পারি না। জ্ঞানের অবস্থা, তুরীয় অবস্থা। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া তুমি অগ্রাহ্য কর, অন্যের তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইলে, এই সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াই চলিতে হইবে, নহিলে ভ্রম হইবেই হইবে।

তারাপ্রসাদ বাবু আরও অনেকগুলি বচন প্রমাণ তুলিয়া সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর গোলে পড়িয়াছেন। সবগুলির বিচার নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে সময় নষ্ট হইবে মাত্র। বুদ্ধিমন্ত লোক মাত্রেই উপরের ইঙ্গিত ধরিয়া বুঝিলেই তারাপ্রসাদ বাবুর ভ্রম দেখিতে পাইবেন। তবু অল্প স্থানের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটী ভুল যাহা হইয়াছে, তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥

তারাপ্রসাদ বাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন—"মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু আদির মূর্ত্তিকে যে ঈশ্বর বোধ করে, তাহার তপস্যা ক্লেশের কারণ হয়। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই।"

অন্য দোষের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। তারাপ্রসাদ বাবুর কৃত অর্থ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। মূর্ত্তৌ—সপ্তমীর প্রয়োগ; "মূর্ত্তিকে" বলিয়া অনুবাদ করা ভুল। ক্লিশ্যন্ত-তপসা—এইটুকুর অর্থ করা হইয়াছে "তপস্যা ক্লেশের কারণ হয়।" নেহাৎ জবরদস্তি! বচনটির শব্দার্থ—মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু প্রভৃতির মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং তপস্যা দ্বারা ক্লেশ করিতেছে যে জীবগণ, তাহারা জ্ঞান না হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ হয় না; কর্ম্মের পর জ্ঞান, পর তাহার মুক্তি। আর একটি অর্থ-বিকারের দৃষ্টান্ত দিব।

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাবক্তাবণম্।
কামং ক্রোধং তথা চৌর্য্যং পরদারাভিমর্ষণম্॥
বীভৎসং মরণং ক্ষোভং দুষ্ক্রিয়া বিবিধঃ (?) কলৌ।
পাষণ্ডিনো বিধাস্যন্তি বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

তারাপ্রসাদ বাবুর অর্থ—"কলিযুগে পাষণ্ডগণ বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে জন্মাপবাদ, দ্রোহ, মিথ্যা কথন, * * * ও বিবিধ দুষ্ক্রিয়া আরোপিত করিবে।"

এইটুকু বলিয়া তারাপ্রসাদ বাবু মন্তব্য করিতেছেন—"কেবল কলি-যুগের গ্রন্থে কেন, যে সমস্ত পুরাণ অন্যান্য যুগে প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতেও ঐ দোষ আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির উপর নিন্দনীয় কার্য্য আরোপিত করিয়া পুরাণকারগণ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল বচনে পুরাণকারদের কোন দোষের কথা নাই, পাষণ্ডিদের কথাই আছে। নিত্য বিচার কার্য্যে লিপ্ত তারাপ্রসাদ বাবু এক জনের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন, ইহা কি বিস্ময়ের কথা নহে? ফলে আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, গুরুকরণ ব্যতীত শাস্ত্রার্থ করিতে গেলে, এইরূপ বিড়ম্বনাই ঘটে। বাস্তবিক কোন পুরাণকার বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে জন্মাপবাদ ইত্যাদি আরোপ করেন নাই। যাহারা এইরূপ আরোপ করে, তাহারাই পাষণ্ডী। এ কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, পুরাণ পাঠ করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাদি বর্ণনা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের পুরাণকার শ্রীকৃষ্ণে কখন কামের আরোপ করেন নাই। যাহারা পাষণ্ডী, তাহারাই ভগবল্লীলার মর্ম্ম অবগত হইবার অধিকারী না হইয়া, ভগবানে কামাদির আরোপ করিয়া থাকে। তাহারাই পাষণ্ডী।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, সুতরাং কাম তাহাতে সম্ভবে না। ভগবান্ মায়ার বশীভূত নহেন, মায়াই তাঁহার বশ। তাঁহার কর্ম্ম নাই এবং ভোগও নাই। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা এবং দ্বন্দ্বাতীত। সুতরাং ভগবানের জন্ম অসম্ভব, মরণও অসম্ভব, কামক্রোধাদি জন্য কর্ম্মও অসম্ভব। মায়াধীন জীবের দৃষ্টিতে জীবের হিতসাধন জন্য তিনি কর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও,

যাস্তবপক্ষে কর্ম্মে নির্লিপ্ত। রাসবিলাসাদিতে কৃষ্ণপ্রাণা, ভক্তিময়ী, সংসারসন্ন্যাসিনী গোপিকাদের ভোগ আছে, মনোরথের পূরণ আছে। কিন্তু ভগবানের মনোরথও নাই, ভোগও নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করুন, এই মীমাংসা তাহাতেই পাইবেন। কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে নহে, সর্ব্বত্রই এইরূপ। কিন্তু অজ্ঞান, অনধিকারী, বৈদিকানুষ্ঠান-বর্জ্জিত বেদনিন্দুকেরা এ ব্যাপার বুঝিতে অসমর্থ। শাস্ত্রে ইহারাই পাষণ্ডী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দোষ পুরাণকারদের নহে, দোষ পাষণ্ডীদের। তারাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত উপরি লিখিত বচনে কলিযুগের সেই পাষণ্ডীদের ব্যবহারই বর্ণিত হইয়াছে। সহজে বুঝিলেই ত হইত যে, পুরাণেই পুরাণকারের নিন্দা থাকিবে কেন?

শাস্ত্রের মনগড়া অর্থ করিলে বড়ই অত্যাচার হয়। আমার মনের সঙ্গে যে অংশ মিলে না, তাহা ভুল, আমার মনের সঙ্গে যাহা মিলে, তাহাই ঠিক, এ ভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয় না। এরূপ করা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে সাহসের সহিত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজের মনোমত একটা নূতন শাস্ত্র তৈয়ার করা বরং ভাল, নচেৎ শাস্ত্রে অযুক্তি দোষ ঘটে। অযুক্তি ঘটাইলে অধর্ম্ম হয়। অন্তত শাস্ত্রকারদের মতে অধর্ম্ম হয়। প্রমাণ আছে,—

"যুক্তিহীনবিচারেন ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

শাস্ত্রের যুক্তি অর্থাৎ বেদানুসারী সমগ্র শাস্ত্র-গ্রন্থের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক বিচার না করিলে, কেবল বিচ্ছিন্নভাবে শাস্ত্রের একাংশ অবলম্বনপূর্ব্বক বিচার করিতে গেলে, শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। তাহাতে কেবল অনর্থই হয় এবং সেই অনর্থের অনুসরণ করিয়া অধর্ম্ম মাত্র তাহার ফল স্বরূপে লাভ করা যায়। এই কারণেই কেবল সত্যের অনুরোধে তারাপ্রসাদ বাবুর প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

লেখায় ব্যাঘাত।

লিখিব কি, লেখায় গোল পড়িয়াছে। আমি বাঙ্গালার বানান ঠিক করিতে পারি না। আজ হঠাৎ এই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এমন নয়, অনেকদিন অবধি আমি এই ভাবনায় ভাবিত। যত দিন যাইতেছে, ভাবনাও ততই বাড়িতেছে। হয়ত, অনেকে মনে করিবেন যে, আমার এই এক রঙ্গ। কিন্তু রঙ্গ নয়, প্রকৃত কথাই বলিতেছি!

বাঙ্গলাভাষার বর্ণমালা নাই, সেই জন্যই বানানের বিড়ম্বনা। এই যে অ, আ, ই; ক, খ, গ, লইয়া এতকাল আমাদের কাজ চলিয়া আসিতেছে, ইহা কতকটা গরজে এবং গায়ের জোরে। বস্তুতঃ অ, আ, ই; ক, খ, গ, বাঙ্গলার বর্ণমালা নহে, সংস্কৃতেরই বর্ণমালা। পরের পোষাক গায়ে ঠিক না হইবারই কথা।

যে পরে, কোনরকমে তাহার কাজ সারা হয় বটে কিন্তু তাহার মন খুঁৎখুঁৎ করিবেই করিবে, পোষাকেরও যদি একটা মন থাকিত, তাহা হইলে পোষকাও বোধ হয় খুঁৎখুঁৎ করিত।

বাঙ্গলার বর্ণমালা নাই। ইহা নুতন কথা কিনা জানিনা, কিন্তু ইহা যে প্রকৃত কথা, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিব। একটী একটী বর্ণ,একটি একটি পৃথক্ ধ্বনির দ্যোতক চিহ্নমাত্র। কোন একটী ভাষায় যতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি উচ্চারিত এবং ব্যবহৃত হয়, ততগুলি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের প্রয়োগ থাকিলে তবে সে ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বর্ণমালা আছে বলা যায়। মিশ্রভাষায় এই ধ্বনির সংখ্যা নিতান্ত অনিশ্চিত। কখন বাড়ে, কখন্ কমে, কিছুই বলা যায় না। এইজন্ত মিশ্রভাষাতেই বর্ণবিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা মিশ্রভাষা।

বাঙ্গলায় কতক সংস্কৃত, কতক হিন্দী, কতক উর্দ্দু, কিছু ফারসী, আজিকাল আবার কিছু কিছু ইংরেজীও জুটিয়াছে এবং জুটিতেছে। এই জন্তই বাঙ্গলাকে মিশ্রভাষা বলি। যতগুলি ভাষার শব্দ, এই বাঙ্গলা-ভাষায় আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে, ততগুলি ভিন্ন জাতীয় ধ্বনিও বাঙ্গলায় প্রয়োগ করা আবশ্তক হইতেছে। অথচ, দেশের প্রকৃতি বশতঃ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনি অবিকল রূপে তিষ্ঠিতে পারে না; ধ্বনির অল্পবিস্তর বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে, কোন একভাষার বর্ণমালাই যথাযথরূপে এই মিশ্রভাষার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না; এবং সকল ভাষার বর্ণমালা একত্র করিলেও সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

মিশ্রভাষার প্রকৃতিবশতঃ স্বতই পূর্ব্বোক্ত দোষ বা বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। তাহার উপর, আর একটা উপসর্গজনিত দোষ আছে। সে দোষ এই যে, কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অন্তান্ত বিষয়ে যেমন হউক, উচ্চারণ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারই কথা এখানে বলিতেছি। বাণিজ্যের বিস্তার, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গতাগতির বৃদ্ধি, এবং তান্নিমিত্তক আলাপের বাহুল্য বশতঃ এই পরিবর্ত্তন ঘটে। বাঙ্গলা সম্বন্ধে ইহা এখন অধিক মাত্রাতে ঘটিতেছে। একটু ভাঙ্গিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া কথা কয়টা বুঝান যাউক।

সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গলার বর্ণমালা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। জ, য, আকৃতিতে ভিন্ন হইলেও, ধ্বনির দ্যোতকতা বিষয়ে একেবারে অভেদ। এইরূপ ণ, ন, কিম্বা শ, ষ, স, নামে ও মূর্ত্তিতে পৃথক্ হইলেও, কাজে কিছুমাত্র পৃথক্ নয়। বর্গীয় ব ও অন্তস্থ ব কেবল বর্ণগণনায় পাওয়া যায় মাত্র, নহিলে নাম রূপ কিম্বা প্রয়োগ কোন বিষয়েই ইহাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

স্বরবর্ণের আরও গোলযোগ। বাঙ্গলা ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভেদ নাই। অথচ

সংস্কৃত ভাষায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘই বিশেষ লক্ষ্যের সামগ্রী। সেই সংস্কৃতের "হ্রস্ব-দীর্ঘ" বাঙ্গালায় আসিয়া, আপনিও বিব্রত, আমাদিগকেও বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছে। যেমন "ঘোষেদের হরি" আর "দাসেদের হরি" বলিয়া একনামের দুই প্রতিবেশীকে চিনিতে এবং চিনাইতে হয়, বাঙ্গালায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘ লইয়াও ঠিক সেইরকম করিতে হয়। ছেলেদের পাপের ভোগ, হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-উ, মুখস্থ না করিয়া তাহারা বর্ণমালা হইতে কোনক্রমেই নিস্তার পায় না। ই, ঈ, উ, ঊ, যদি বস্তুত বাঙ্গলায় পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনির দ্যোতক হইত, তাহা হইলে শিশুদিগকে এযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কেন? বাঙ্গলা বলিয়া সংস্কৃতের বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে হয় বলিয়াই তাহাদের এ কর্ম্মভোগ। শুধু ছেলেদেরই বা কেন? অক্ষয় দাদার তাড়নায়, আর তাঁহার ছাপাখানার অনুরোধে আমাদের অনেক 'ঈ' কে হ্রস্ব হইতে হইয়াছে। অক্ষরের মাথা ভাঙ্গিবে বলিয়া দাদা ভয় দেখাইতেন, কাজে কাজেই ভয়ে ভয়ে আমরাই মাথা খাটো করিয়া লইতাম।

আবার ঋ, ৯, স্বরবর্ণ বলিয়া বাঙ্গলাতে পরিচিত। ৯র সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গলা ভাষীর জন্মের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় কি না সন্দেহ। অথচ ৯ একজন স্বরবর্ণ। যদি ঋ আছে তবে "রি" কেন? আর 'রি'তে যদি চলে, তবে ঋ কেন? খাঁটী বাঙ্গলা-ভাষী কখনই ইহার কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন না।

আরও আছে। "শ্রুতিলিখনে" পণ্ডিত মহাশয় শুধু নম্বর কাটিয়া ছাড়িতেন না, কাণ মলিয়াও দিতেন! কিন্তু "বধূ ঠাকুরাণী" বাঙ্গালায় 'বৌ' না কি "বউ" না কি 'বঊ' তাহা আমরাও জানি না, পণ্ডিত মহাশয়ও জানেন না। কেমন করিয়া 'ঐ' লিখিব? 'ঐ' লিখি কি 'অই' লিখি, কি 'ওই' লিখি, তাই স্থির করিতে পাঁচ মিনিট আমার এই প্রবন্ধ কামাই গেল।

তবু এখনও ফলার কথা বলি নাই। য-ফলা আর ব-ফলা দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ-পরিচয়ে আমাদিগকে কেমন যন্ত্রণা দিয়াছেন, এখনকার নাটক লেখকদিগের হাতে পড়িয়া যেমনি জব্দ হইতেছেন। দৃষ্টান্ত কত দিব?—কোন একখানা নাটক কি হরিদাসের গুপ্তকথা দৃষ্টিমাত্রেই দৃষ্টান্ত। তবে "মৃত্যুতে" আবার একটী—য-ফলা কেন, এক বানানে 'সদ্যঃ' আর 'চোদ্দ' কেন চলে না, কেহ কি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন? আমাদের "দ্বারা"য় ব বাজে খরচ। "আত্মা"য় ম থাকিয়া না-থাকা; তবে চন্দ্রবিন্দু দিয়া যে 'ঁ' হয়, "ম" নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ঐ রকমে ব্যাগার দেন। আর এক রকম দেখ। অকারান্ত কি হসন্ত, বর্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুই চিনিবার যো নাই। সংস্কৃতে হস্ চিহ্ন না থাকিলেই অকার দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গালায় কোন ব্যবস্থাই নাই। এই ছত্র কতক আগে "খাটো" লিখিতে গিয়া ওকার দিব কি দিব না, ভাবিতে ভাবিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিলাম। অথচ দরকার

মত ওকার দিতে গেলে এক ওকারের খরচেই জেরবার হইয়া পড়িতে হয়। এমন কত আছে।

যেগুলি দেখাইলাম, সেগুলি বানানের সংশয়স্থল। এমন করি কি অমন করি, ইহাই সেখানে ভাবিতে হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া মূলে অভাব হয়; পুঁজিতে এক বারে কুলায় না, এরূপ ক্ষেত্রও বহুতর আছে। "এক" লিখিয়া 'এ'র যেরূপ উচ্চারণ করি, "এবং" লিখিয়া 'এ'র তেমন উচ্চারণ করি না। অথচ ঐ একের 'এ' আমাদের দুবেলা দরকার। কেহ একারেই কাজ সারেন, অনেকে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিচিকিৎস্য এক য-ফলা-আকারের (্যা) সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত মানিতে হইলে যাহা চাই, ইহাতে তাহা হয় না। ইহাতে "ই-আ" হয়। "চালে আগুন লাগিয়াছে" দেখিলে বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পায়। গৃহদাহ উপস্থিত, না কি তণ্ডুল মহার্ঘ, কোন মতেই ঠিক করা যায় না। তণ্ডুলের চালে যে আধখানা 'ই' আছে, বর্ণমালায় সে টুকুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "বোসেদের বাড়ী" বলিতে যে একটু মজা আছে, বানানে সেটুকু কিছুতেই আদায় হয় না।

এদিকে অভাবে মারা যাইতে হয়। অথচ আস্তাবলে বসিয়া বসিয়া দুই একটি বর্ণ দানা খাইতেছে, তাহাকে অন্য কাজে লাগাইবার মতি কাহারও দেখি না। একটী "ওয়া" লিখিতে—যেমন "ওয়াচণ্ডী" কিংবা 'জমা ওয়াশীল' ইত্যাদি ঐ এক'ওয়া' লিখিতে দুটী স্বরবর্ণ আর একটী সন্ধ্যক্ষর ব্যঞ্জন বর্ণের খোসামোদ করিতে হয়। অথচ, সকলে মিলিয়া অন্তস্থ ব-টাকে লাগাইয়া দিলেই সচ্ছন্দে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কেমন আমাদের অদৃষ্টের দোষ, কোথাও কোথাও কাজে লাগিয়াও বিগড়িয়া বসিয়াছে। "খাবার" হইল, তবু "খাওয়া" গেল না। 'ব' আসিল, তবু "ওয়া" গেল না।

বিস্তারে কেবল পুঁথি বাড়িবে। ফলে যাহা দেখাইলাম, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, সংস্কৃত বর্ণমালায় বাঙ্গলার কাজ ঠিক চলে না। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত-মাতৃক, তাহাতেই এই, যে অংশ অন্যান্য ভাষা হইতে আমদানি হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। উর্দ্দু এবং ইংরেজীর অনেক ধ্বনি একবারে অপ্রকাশ্য।

এই সকল হেতু উপলক্ষ করিয়াই বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা ভাষার বর্ণমালা নাই। নাম মাত্র সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গলায় স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ হয় নাই। তাহার উপর মিশ্র ভাষা বলিয়া বাঙ্গলায় আরও বিপত্তি উপস্থিত। বিষয় কর্ম্ম ঘটিত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক নহে। এই কাগজ, কলম, দোয়াৎ, জমী, জেরাৎ, মাল, লাখরাজ, কাছারী, খাজনা, দেওয়ান অবধি চৌকীদার পর্য্যন্ত সমস্ত আমলা, যত দলিল দস্তাবেজ ঘরের অনেক আশবাব প্রভৃতি কিছুই সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক নহে। এখন আবার ইংরেজীও এই রকমে বহুতর প্রবেশ করিতেছে।

সুতরাং বানানে বিষম গোল। বানান ঠিক না করিয়া লিখিব কেমন করিয়া?

ভাষায় বড় গোল।

বার বার আমাকে লিখিতে বলিবেন না। অনুরোধ রাখিতে পারি না বলিয়া আমারও লজ্জা হয়, আপনারও কাজ হয় না। তবে মিছা এ অনুরোধ করা কেন?

লিখিবার নানা গোল। বানানের কথা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি। এবার আর এক গোলের কথা বলি শুনুন। এগোল ভাষার গোল। ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু আজিকালি দেখিতে পাই যে, অনেকের সঙ্গেই আমার ভাষা মিলে না। অন্যে যাহা বলেন, কিম্বা লেখেন, অতি কষ্ট করিয়াও তাহা আমি বুঝিবার চেষ্টা করি; শেষে ঠিক বুঝিতে পারিলাম কিনা, সে সংশয়ও থাকিয়া যায়। আবার আমি এক ভাবিয়া লিখি, কি বলি, অন্যে বুঝেন আর। একি কম বিড়ম্বনা?

গোলটা কেন হইয়াছে জানেন? গোল হইয়াছে শুধু বিজাতীয় লোকের আমদানীতে। বিজাতীয় লোকে বিজাতীয় ভাষাও সঙ্গে করিয়া আইসে। আর সেই বিজাতীয় ভাষার ভিতরে বিজাতীয় ভাবই বোঝাই করা থাকে। গোল ত হইবেই।

আমাদের ভাষা সংস্কৃত। বাঙ্গালা মুলুকে বাস হইলেও সংস্কৃতই আমাদের ভাষা। বেশ প্রণিধান করিয়া বুঝুন। ডালা কুলা ধুচুনী প্রভৃতি নিতান্ত মোটা মোটা জিনিষের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার দরকার হয় না বটে, কিন্তু ভাষার কাজ ত শুধু ডালা কুলা ধুচুনী লইয়া নহে। ডালা কুলা ধুচুনীর ভিতর ভাবের গোল কিছু নাই; গোল হয়, যেখানে ভাবের পরিচায়ক পদার্থ প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই,—সেইখানে। যে পদার্থ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, কেবল অন্তরিন্দ্রিয়েরই গোচর হয়, তাহার বেলাতেই গোল। কুলা ডালা ধুচুনী বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর পদার্থ, কাজেই তাহাতে গোল নাই। কিন্তু আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রভৃতি ত বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয় না—গোলও সেইখানে রহিয়া যায়।

গোলের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইংরেজীর এই ছড়াছড়িতে। মুসলমানেরাও এদেশে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহাদের ভাষাও আমাদের ঘরে আসিয়া জুটিয়াছে; কিন্তু ইংরেজীর মত উৎপাত করিতে পারে নাই, ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের এখন যেমন মিশামিশি, আরবী ফারসীর সঙ্গে তেমন মিশামিশি কখনই হয় নাই। পরের ভাষা যেমন আসিয়াছিল, তাহা রহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তেমনি পর হইয়াই রহিয়াছে। এখন যেমন হিন্দু মুসলমান এক গ্রামে বাস করিতেছে, অথচ আদান প্রদান বিষয়ে সাবধান থাকায় হিন্দু হিন্দুই আছে, মুসলমান মুসলমানই রহিয়াছে, সেইরূপ আমাদের কথাবার্ত্তায় আরবী ফারসী চলিত থাকিলেও আরবী ফারসীর কোন শব্দ স্বরূপ পরিত্যাগ করে নাই, আমাদের কোন শব্দকেও বিকৃত করিতে পারে নাই। তবে সে সকল শব্দে তাহাদেরই উপযুক্ত

কাজ অবশ্য চলিয়া যাইতেছে। তেমন মুসলমানকে দিয়াও হিন্দুর অনেক কাজ হইতেছে, আর হিন্দুকে দিয়াও মুসলমানের অনেক কাজ হইতেছে।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তেমন সম্বন্ধটী আমরা রাখি নাই। আস্ত ইংরেজী শব্দকে গ্রহণ করিতে আমরা নিতান্তই নারাজ। গোড়াতেই বলিয়াছি যে, ভাবের দ্যোতক শব্দ লইয়াই ভাষা। তা আমরা এখন ইংরেজী ভাবটুকু গ্রহণ করি, ভাবের সেই আবরণটী বদলাইয়া দিয়া তাহাকে একটী ঘরের পোষাক পরাইয়া লই। তাহার ফলে ভাবেও গোল পড়িতেছে, ভাষাতেও দোষ ঘটিতেছে।

ইংরেজও মানুষ, হিন্দুর ছেলে বাঙ্গালীও মানুষ। কিন্তু দুটীতে ভয়ানক অমিল। বাহিরেও অমিল আছে, কিন্তু ভিতরের তুলনায় সে অমিল অতি অল্প। ভিতরে ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছের প্রভেদ। আর অধিক কি বলিব? খুব ফর্সা রঙ্গের ঘোষের পো-কে কোট-হাট পরাইয়া দিলে ঘোষের পো কিছু ইংরেজ বনিয়া যায় না; আর মোক্ষমুলরের টিকি রাখিয়া, মাথা চাঁচিয়া, তাঁহাকে উপবীত দিয়া ত্রিকচ্ছ করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেও তিনি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য হইবেন না। তবে এটুকু হয় যে, এই ভাবান্তরের দরুণ ঘোষের পো-কে আর ঘোষের পো বলিয়া ঠিক মনে হয় না, এবং মোক্ষমুলরকেও অক্‌সফোর্‌ডের সেই জর্ম্মান প্রফেসার মনে করিতে সংশয় হয়। ভাষা বিষয়েও এই উপসর্গ উপস্থিত।

এখনকার যাহারা লিখেন কি বলেন বাঙ্গালায়, তাঁহারা প্রায়ই শিখেন ইংরেজীতে তাঁহাদের মনের যে ভাবটী প্রকাশ পায়, তাহা প্রায়ই ইংরেজী ভাব, কিন্তু সেটীকে আমাদের পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহির করা হয়। অনুবাদ বা ভাষান্তর করা আজকাল খুব প্রচলিত। কিন্তু অনুবাদ বা ভাষান্তর প্রায়ই হয় না, হইতে কেবল ভাবান্তরই হয়। মনে করুন, আমি শিখিয়াছি God (গড্)। এখন গড্ শব্দ যে ভাবের পরিচায়ক, যাহাদের গড্ তাহারাই সে শব্দ-লক্ষ্য ভাবের স্বরূপ জানেন। আবার "ঈশ্বর" এই শব্দটী যাহাদের, তাহারাই ঈশ্বর পদার্থের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে। কিন্তু যদি গড্ লিখিয়া ঈশ্বর বলি, তাহা হইলে গোলযোগের সম্ভাবনা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমানদের সময়ে এ গোল হয় নাই। কিন্তু এখন এই ইংরেজীর আমলে এই গোল বিলক্ষণ হইতেছে। সংস্কৃত শব্দগুলিকে ইংরেজী ভাবের পরিচায়ক করিতে গিয়া একে আর হইয়া উঠিতেছে। সংস্কৃত বিকৃত হইতেছে, আর ইংরেজীরও প্রকৃত পরিচয় হইতেছে না।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধুনাতন যত লেখা বাহির হইতেছে, প্রায়ই তাহা এই বিকারগ্রস্ত। অবশ্য প্রত্যক্ষের বিষয় স্থূল পদার্থের কথা যে লেখায় থাকে, তাহার কথা বলিতেছি না। সূক্ষ্মভাবের কথা যেখানে, গোলও সেইখানে। তবু গোলযোগের দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব নাকি?

ইংরেজী পড়িয়া জানিলাম যে, ষাট কি পঁয়ষট্টি এই রকম কত Elements (এলিমেণ্টস) আছে। যদি বলিবার সময় ঐ শব্দেরই প্রয়োগ করি, তাহা হইলে কোন গোলই হয় না। কিন্তু তাহা না করিয়া সাহেবকে ধুতি-চাদর পরাইলাম—অর্থাৎ Elements (এলিমেণ্টস) না বলিয়া বলিলাম ভূত। এখন আমাদের গ্রন্থে লেখে যে ভূতের সংখ্যা পাঁচটি মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সেই 'এলিমেণ্ট-'গুলিকেই 'ভূত' করিয়া লইলাম। দেশী ভূত বিলাতী ভূতের কাজ করিতে গিয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট করিল; আপনিও উপহাসাস্পদ হইল, এবং নিজের চৌদ্দ পুরুষকেও গালাগালি খাওয়াইল। অর্থাৎ ইংরেজীতে শিক্ষার গুণে স্থির করিলাম যে, ভূত পাঁচটি নয়, ষাটপঁয়ষট্টিই বটে; আর ক্ষিতি, কি জল, কি তেজ, কি বায়ু, কি আকাশ, ইহারা কেহই ভূত নহে, আর যাহারা ইহাদিগকে ভূত বলিয়াছে, তাহারা নিতান্ত বর্ব্বর। বিলাতী ভূতের বেগার দিতে গিয়া দেশী ভূতের পরিচয় নষ্ট হইল। আর পূর্ব্ব পুরুষকেও গালি খাইতে হইল। এমন ভূতে পাওয়া দৃষ্টান্ত যত ইচ্ছা ততই দেওয়া যাইতে পারে।

এইজন্য আমি বলি যে, আগে ভাষার বিবাদটা মিটান যাউক, তাহার পর যাহা লিখিতে হয়, লিখিলেই চলিবে। এখনকার প্রচলিত এইরূপ ভূতগত ব্যাপারে ইংরেজীর কোন লাভ নাই, আমাদেরও সম্পূর্ণ ইষ্টক্ষতি। বিবাদ মিটাইতে হইলে সংস্কৃত শব্দগুলির স্বরূপ-পরিচয় লইতে হইবে। এই ভূতশব্দের দৃষ্টান্তে কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি।

আমাদের সৃষ্টিপ্রকরণে দেখা যায় যে, প্রকৃতি হইতে মহত্তের উৎপত্তি। এই মহান্ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। এই অহঙ্কার ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতার সৃষ্টি, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে ভূতের সৃষ্টি।

পঞ্চীকৃত ভূত লইয়াই জগৎ। অপঞ্চীকৃত ভূত ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, তাহা সূক্ষ্ম। পঞ্চীকৃত ভূতকৃত ভূতময় এই জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়করণক জ্ঞান-গম্য হয়। এখন দেখুন যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীমাত্র; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা। শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ জ্ঞান হয়; ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুর দ্বারা রূপ, জিহ্বার দ্বারা রস, এবং নাসিকার দ্বারা গন্ধ। এই পঞ্চপ্রকারের অতিরিক্ত জ্ঞান আমাদের হয় না, এবং হইতে পারে না। তাহার পর দেখুন শব্দ আকাশের গুণ; স্পর্শ বায়ুর গুণ, রূপ তেজের গুণ, রস, জলের গুণ, গন্ধ, ক্ষিতির গুণ। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, এবং ক্ষিতি এই পাঁচ বিষয়েরই জ্ঞান হইল; পাঁচের অধিক বিষয়ের জ্ঞান হইল না। আর এই পাঁচটীর নামই ভূত। তাহা যদি হইল, তবে বলুন দেখি, এই পঞ্চভূতকেই ভূত বলিব, না কি এলিমেণ্টদিগকে ভূত সংজ্ঞা দিয়া এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার উপস্থিত করিব।

আজি কালি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, আপনারা লিখেন বিজ্ঞান, বুঝেন Science লিখেন বিবেক, বুঝেন Conscience ; লিখেন যুক্তি, বুঝেন Reason ,লিখেন ব্রহ্ম, বুঝেন God লিখেন আত্মা, বুঝেন Soul ; লিখেন মুক্তি, বুঝেন Salvation, লিখেন সংস্কার, বুঝেন Idea, লিখেন বৃত্তি, বুঝেন Faculty , লিখেন ইতিহাস,বুঝেন History ; কত বলিব ? আপনারাও ত্যক্ত হইয়া উঠিবেন, আমারও কোন কাজ হইবে না।

হয় ইংরেজী ভাষা ঠিক রাখিয়া ঐ ভাষাতেই ইংরেজী ভাব প্রকাশ করুন ; এবং আমাদের ভাষা ঠিক রাখিয়া যে শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাই বুঝিবার এবং বুঝাইবার ব্যবস্থা করুন। না হয়, এখন যেমন মাথামুণ্ড করিতেছেন, তাই করুন ; আমাকে আর লিখিতে অনুরোধ করিবেন না।

বিলাত যাওয়া।

বিলাত-ফেরত হিন্দু-সন্তানকে লইয়া সমাজে চলা উচিত কি না ? অর্থাৎ হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্মে, সামাজিক আহার ব্যবহারে, পুত্রকন্যার আদান প্রদানে, তাঁহাদিগকে বর্জ্জিত করিয়া আমরা এখন যেমন চলিতেছি, সেইরূপ চলাই উচিত, না কি তাঁহাদিগকে বর্জ্জিত করা অন্যায় হইতেছে ?

কথাটা স্পষ্ট করিয়া কেহ তোলেন নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড়ই আন্দোলন হইতেছে। এ ভাব ভাল নহে। যাঁহারা বিলাত-ফেরতদিগের পক্ষ, তাঁহাদেরই উচিত যে, এই সামাজিক সমস্যার একটা সিদ্ধান্ত মীমাংসা করিয়া লন, তাহার পর সেই মীমাংসা অনুসারে চলেন। যাঁহারা বিপক্ষে, তাঁহাদের এমন মীমাংসার সাক্ষাৎ প্রয়োজন কিছু নাই, যেহেতু ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারা এ কথার মীমাংসা করিয়াই রাখিয়াছেন ; বিলাত-ফেরত ব্যক্তিদিগকে ইঁহারা সমাজে লয়েন না, লইতে ইচ্ছা করেন না, এবং কখনও যে লইবেন, এমন আভাসও দেন না। সেই জন্য বলিতেছি যে, স্বপক্ষ দলেরই এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া তোলা উচিত, এবং তুলিয়া একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করা উচিত।

স্বপক্ষদলের মধ্যে যাহারা হিন্দু সমাজভুক্ত, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি। যেহেতু সমাজভ্রষ্ট ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কিম্বা মানব প্রেমিক Philanthrophist মহাশয়দের মীমাংসা, হওয়া না হওয়া তুল্য। এ বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, সুতরাং অধিকারও নাই।

হিন্দুসমাজে থাকিয়া যাঁহারা বিলাত-ফেরতদের স্বপক্ষ, তাঁহারা সংখ্যায় খুব অল্প ; সহর বাজারে দুজন দশজন আছেন, পাড়াগাঁয়ে নাই বলিলেই হয়। পাড়াগাঁয়ে এ

ভাবনা ভাবিবার দরকারও তেমন হয় নাই, কারণ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাড়াগাঁয়ের দিকে বড় একটা কেহ ঘেঁসেন নাই।

সম্প্রতি এই সামাজিক সমস্যা একটু প্রকট ভাব অবলম্বন করিয়াছে। কলিকাতায় একটা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কতকগুলি বিলাতফেরত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া একটু ঘোঁট হইতেছে। ইহার ফল একটা দলাদলি হইয়াই ক্ষান্ত হইবে, কি ভবিষ্যতে মীমাংসার একটা সোপান হইয়া থাকিবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই উপলক্ষে বিলাত যাওয়ার বৈধাবৈধ সম্বন্ধে বিচার করা মন্দ নয়। স্বপক্ষ দল হইতেই কথাটা উঠিয়াছে, সুতরাং বিচারের একটা উপলক্ষ পাওয়া গিয়াছে। বিচার করা যাউক।

শাস্ত্রে বিলাত যাইবার নিষেধ আছে কি না? বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজভুক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত কি না? এরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে কি না? এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব না। প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কেহ ব্যাকুল হইয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিলেই পাপ স্বীকার করিতে হয়। যিনি বিলাত যাওয়াতে পাপ আছে মনে করেন, তাঁহার জন্য বিচারের প্রয়োজন নাই। তিনি অনুতাপ করুন, তুষানল করুন, যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন, তিনি আর বিলাত যাওয়ার সপক্ষতা করিবেন না, সুতরাং তাঁহার জন্য ভাবনাও নাই। যাঁহারা বলেন যে, বিলাত গেলে পাপ নাই, বিলাত-ফেরতকে সমাজে ওয়া উচিত, তাঁহাদিগকে লইয়াই কথা।

বিলাতফেরতকে সমাজে লওয়া উচিত কি না, ইহা পরের কথা। আগে দেখিতে হইবে, বিলাত যাওয়া উচিত কি না; যে কয়েকজন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তত ভাবনা নাই। একে তাঁহারা কয়েকজন মাত্র, আবার তাহার মধ্যেও সমাজভুক্ত হইবার জন্য কেহ ব্যাকুল আছেন কি না, সন্দেহ। এখন দেখা যাউক যে, আদৌ বিলাত যাওয়া উচিত কি না?

যদি বিলাত যাওয়াতে কোনও লাভ থাকে, যদি বিলাত না যাওয়াতে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা হইলে বিলাত যাওয়া অবশ্য উচিত অনুচিত, লাভালাভ দেখিয়া বুঝিতে হয়। যদি লাভ না থাকে, ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বিলাত যাওয়া কখনই উচিত নহে।

শাস্ত্রে বিলাত যাইবার বিধি আছে কি না, বিলাত গেলে জাতি নষ্ট হয় কি না, ধর্ম্ম হানি হয় কি না, সে বিচারও এখন থাকুক। হিন্দুমতে বিলাত তীর্থস্থান নহে, বিলাত যাওয়াতে আধ্যাত্মিক মঙ্গল কিছু নাই, সুতরাং সে পক্ষে শাস্ত্র খুঁজিয়া ফল কি? কিন্তু বিলাত যাওয়াতে যদি অন্য বিধ লাভ থাকে, না যাওয়াতে ক্ষতি হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিধান যাহাই কেন হউক না, বিলাত যাওয়াটা চালাইয়া লওয়াই

কাজের লোকে'র কর্তব্য। অতএব 'কাজে'র লোকের চক্ষেই একবার লাভালাভটা দেখা যাউক।

আমি বলি যে, বিলাত যাওয়াতে কোনও লাভ নাই, ক্ষতি আছে।

স্বপক্ষদল ইহা বলেন না, তাঁহারা ইহার বিপরীত কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বিলাত গেলে—

(১) দেশ পর্যটন জন্য বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

(২) সাহসাদি সদ্‌গুণের বৃদ্ধি হয়।

(৩) নানা প্রকার শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায়।

(৪) ধনোপার্জনে অধিকতর শক্তি ও সুবিধা হয়।

(৫) সুতরাং দেশের উপকার, সমাজের উন্নতি করিবার সামর্থ্য বাড়ে।

আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহার অতিরিক্ত দাবি দাওয়া বিলাত যাওয়ার স্বপক্ষে নাই। এখন এইগুলার আলোচনা করিলেই আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিবে।

গোটা দুই পাশ-কথা এইখানে বলিয়া রাখি। এক কথা এই যে, শুধু সখ মিটাই-বার জন্য সাধে সাধে যে ব্যক্তি বিলাত যায়, তাহার পোষকতা বোধ হয় কেহই করি-বেন না। সামাজিক হিতের জন্য অনেক ব্যক্তির অনেক সাধে বাধা দেওয়া আব-শ্যক। সংপ্রতি আমাদের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে শুধু সখ মিটাইবার জন্য বিলাত যাওয়াতে বাধা দেওয়া উচিত। বিলাত যাওয়াতে বিস্তর ব্যয়, সে ব্যয়ের ফল-ভোগী এখন অন্য দেশের লোক; আমরা বড় দরিদ্র; বাজে খরচ যাহাতে কম হয়, সে দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। সুতরাং অন্য দিকে লাভ না থাকিলে, সখের বিলাত যাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায়।

আর এক কথা এই যে, ব্যক্তিবিশেষের লাভ দেখিলেও বিলাত যাইবার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ সমগ্র দেশ বা সমগ্র সমাজ যে স্থলে ব্যক্তিবিশেষের লাভের ভাগী হইতে না পারে, সে স্থলে সে লাভকে লাভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ফলে, এ কথার তাদৃশ বিস্তার করিবার প্রয়োজন দেখি না। কারণ, এ পর্য্যন্ত বিলাত গিয়া তেমন লাভ কাহারও হয় নাই।

এখন যে পাঁচ দফা লাভের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, তাহার পঞ্চম দফাকে স্বতন্ত্র দফা বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন দেশের উপকার করিবার শক্তি কিম্বা ধনোপার্জ্জন করিবার শক্তি বাড়িলেই যে লাভ আছে, তাহাও নহে। শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া, বাস্তবিক আমদানি দেখিয়াই লাভের গণনা করিতে হয়। এ পর্য্যন্ত বিলাত-ফেরতের দলে সে লাভ দেখা যায় নাই। অভিজ্ঞতাই বল, আর সাহসই বল, আর অন্য কোনও সদ্‌গুণই বল, শুধু সে সদ্‌গুণে আমাদের কাজ দেখে

নাই। আরও দেখ, এ পর্য্যন্ত বিলাতি শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার ফলও আমরা কিছু পাই নাই। বিস্তর খরচ-পত্র করিয়া দুই চারি জন হয়ত শিল্প কি বিজ্ঞান কিছু শিখিয়া আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু কাজে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পরিচয় পাইবার আশাও বড় নাই। শুধু বিলাত যাওয়ার দরুণ কেহ যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অপেক্ষা বড় বৈজ্ঞানিক হইবেন, তাহাত মনে হয় না। আর, কল-কারখানা করিয়া শিল্প-কারিগরি দেখাইতে হইলেও যে বিলাত যাওয়া আবশ্যক, তাহাও আমি স্বীকার করিতে পারি না। খুব বেশি বেতন দিয়াও যদি বিলাতী শিক্ষক আনিয়া এ দেশে শিল্পাদির চর্চ্চা করা যায়, তাহা হইলে মোটের উপর লাভ বেশী হয়, আমার এই ধারণা॥

ফল কথা, এখন পর্য্যন্ত বিলাত-ফেরত কোনও ব্যক্তি বিশেষ কাজ কিছুই করাইতে পারেন নাই, ইহা নিশ্চয়। যদি ভূত কাল এবং বর্ত্তমান কাল দেখিয়া ভবিষ্যতের বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে, ইহার পরেও যে বিলাত যাওয়ার কোন ফল ফলিবে, এমন বলিতে পারা যায় না। কথাটা একটু খুলিয়াই বলি।

এপর্য্যন্ত যাঁহারা বিলাত গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বারিষ্টর, কয়েক জন সিবিলিয়ান, কয়েকজন ডাক্তার, জনকতক কৃষিশাস্ত্রজ্ঞ, জনকতক, শিক্ষক, আর একজন বড় অদ্রের কামার হইয়া আসিয়াছেন। অবশিষ্ট কতকগুলি এখনও বিলাতেই আছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই আপাততঃ ঘরের পয়সা পরকে দিয়া ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেছেন।

একটা মোটা কথা এই হইতেছে যে, কোনও হিন্দু সন্তান বিলাত যাওয়ার দরুণ এ পর্য্যন্ত বিদেশের এক পয়সাও স্বদেশে আনেন নাই। বিলাতে দুই একজন যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহার কোন অংশ এদেশে আইসে, এমন শুনা যায় না। আর, তাঁহাদের জাহাজভাড়া, আর বিলাত বাসের খরচ পত্রে আমাদের ঘরের যত টাকা গিয়াছে, তাহা ধরিয়া হিসাব করিলে, আমাদের অনেক টাকা যে পাওনা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাঁহারা দেশে আসিয়া দেশেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। চাকরি করিয়াই হউক, আর স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই হউক, কেহ কেহ ধন সঞ্চয় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা দেশেরই ধন, অন্যস্থান হইতে আমদানি করা ধন নহে। সুতরাং তাহাতে দেশের লাভ নাই। যে ধন এক জনের হস্তগত ছিল, তাহা সেই দেশেই আর একজনের হস্তগত হইয়া থাকিল, এই মাত্র।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ না থাকিলে, ইহাঁদের উপার্জ্জনের বা বেতনের টাকাগুলা ইংরেজেরা লইত, সুতরাং ইহাঁদের দ্বারা দেশের কতকটা ক্ষতি নিবারণ হইয়াছে, সেই এক লাভ। কিন্তু একথাও ঠিক নহে। বিলাত-

ফেরত ব্যক্তিদের আহার, পরিচ্ছদ, বিলাসাদি সমস্তই বিজাতীয়, ইংরেজদেরই অনুরূপ। যে যে বিষয়ে ইহাঁদের টাকা খরচ হয়, ইংরেজরা এদেশে থাকিতে ঠিক সেই সেই বিষয়েই সেই টাকা খরচ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং ব্যয়িত অর্থের ফল ভোগ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রবাসী ইংরেজ এবং বিলাতফেরত হিন্দু সর্ব্বাংশেই তুল্য। তথাপি ইহাঁদের সঞ্চিত অর্থের ভরসা করিয়া ভবিষ্যত সম্বন্ধে যদি কিছু লাভের আশা করা যায়, তাহা হইলে সে লাভ এতই অল্প এবং এ প্রকার অনিশ্চিত যে, তাহার বিনিময়ে সমাজবিদ্রোহ এবং স্বজাতিত্যাগ কোন মতেই সহ্য করা যায় না।

আমি বোধ করি যে, এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গড়ে দশ হাজার টাকা করিয়া আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অভিমানের কথা, গৌরবের কথা বাদ দিয়া শুদ্ধ টাকার হিসাবে এ মূলধনের সুদ দূরে থাকুক, আসল টাকার কি পরিমাণ আমাদের দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ আমায় বলিয়া দিতে পারেন? আমার ত ধারণা আছে যে, সমস্ত টাকাই জলে পড়িয়াছে, কিছুই আমরা ফিরিয়া পাই নাই।

তবেই দেখা গেল যে, টাকার হিসাবে আমাদের লাভ কিছুই হয় নাই এবং হইবারও আশা নাই। তবে বিলাত যাওয়া কেন? আমাদের দেশ বড় দরিদ্র, সহজ-ভর্পণেই আমাদের গঙ্গা শুকাইতেছে, তাহার উপর সাধে সাধে এ অপব্যয় বাড়াই কেন?

যাঁহারা ইংরেজী মতে শিক্ষিত, কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে দুই দশজন বিলাত যাওয়ার সপক্ষ আছেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্বরূপ সংবাদপত্রে যখন দেশের দরিদ্রতা জন্য আক্ষেপ এবং দেশীয় লোকের বিলাত যাওয়ার পোষকতা যুগপৎ দেখিতে পাই, তখন বাস্তবিকই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। গবরমেণ্টের কার্য্যে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার জন্য লর্ড রিপণ যখন আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের সীমা ছিল না, অথচ বিলাত যাইবার কথায় এই লাভালাভের গণনা ইহাঁরা কেন যে করিতে পারেন না, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই বলিতে পারেন।

টাকার লাভালাভ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। গৌরবলাভ, মর্য্যাদালাভ, কি সম্মানলাভ কিছু হয় কি না, তাহাও দেখা যাউক। মনে মনে অগৌরবেও গৌরব, অপমানেও মান ভাবা যাইতে পারে। সেইজন্য গৌরব অগৌরবের বিচার করা শক্ত। তবে আমি যে ভাবে দেখি, তাহা বলিতেছি।

ইংরেজ আমাদের রাজা হইলেও স্বজন নহেন, ইংরেজ আমাদের পর। পরের প্রসাদ, পরের অনুগ্রহ, ভিক্ষালব্ধ ধনের ন্যায় গৌরব করিবার সামগ্রী নহে। এ কথা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বিলাত-ফেরত ব্যক্তিদের কোন বিশেষ সম্মান বা

গৌরবের বস্তু নাই, ইহা আমি অসঙ্কোচে বলিব। যাঁহারা ভোজ নাচ দিয়া রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়া থাকেন, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বড়ই ধিক্কার করিয়া থাকেন। জাতি দিয়া, ধর্ম্ম দিয়া, যাহা কিছু লইয়া nationality তাহা দিয়া, যদি কেহ সিবিলিয়ান বা তদ্রূপ অন্য কিছু হয়েন, তবে সেইরূপ ধিক্কার না করি কেন? তবে যাঁহারা বলেন যে, আমাদের জাতীয়তা নাই, উৎকৃষ্ট সমাজ-প্রণালী নাই, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উপস্থিত প্রসঙ্গে তাঁহারা ধর্ত্তব্যই নহেন। হিন্দুর বিলাত যাওয়া উচিত কি না, ইহাই বিচার্য্য। হিন্দু ভাল কি না, সে কথার ত আলোচনা হইতেছে না। যাঁহারা সমাজ সংস্কারক, তাঁহারা বিলাত যাওয়ার পোষকতা করুন, কিন্তু যাঁহারা সামাজিক, তাঁহারা যেন বিলাত যাওয়ার অনুমোদন না করেন। যিনি সমাজ ছাড়িবেন, তিনি বিলাতই যাউন, আর স্বর্গেই যাউন, তাহাতে আমাদের কিছু আইসে যায় না। আমাদের সমাজ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, এই সমাজের দোষগুণ মাথায় করিয়া যিনি সমাজে থাকিতে চাহেন, তাঁহারই জন্য এ কথার অবতারণা করা হইয়াছে। (১)

মডেল ভগিনী।

[সমালোচনা(২)]

ভাতের হাঁড়ীতে ম্লেচ্ছর-হাত পড়িয়াছে। অন্দরমহলে ইংরেজী [illegible] করিয়াছে। স্রোত যদি না ফেরে, তাহা হইলে দেশের আর রক্ষা নাই। 'বাবু' কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত। সমাজ সংস্কার করিতেছেন, ধর্ম্ম-সংশোধন করিতেছেন, সভ্যতা আমদনী করিতেছেন, রুচির ব্যবসায় ধরিয়াছেন—ঘরপানে চাহিয়া দেখেন, এমন ফুরসুৎটুকু নাই।

যাহার চক্ষু আছে, হৃদয় আছে, হাত পা আছে, সে আর কেমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? যাহা চুচক্ষুর শূল, চক্ষু থাকিলে তাহা অসহ্য হইবারই কথা। তাই 'মডেল ভগিনী' বাহির হইয়াছে! গ্রন্থকার বাহির করিয়াছেন বলিলে একটু ভুল হয়; অথবা গ্রন্থকারের অবৈধ প্রশংসা করা হয়; কালধর্ম্ম, বিদ্যার বিদ্যাবতী মডেলভগিনী আপনা আপনি বাহির হইয়াছেন। গ্রন্থকার, লোক-হিতার্থে তাঁহাকে ধরিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থের উপদেশ বিফল না হইলে, গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে।

---

(১) "বঙ্গবাসী"—১৮ই মাঘ, ১২৯২ সাল।

(২) "বঙ্গবাসী"—২৩শে শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল। ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রণীত প্রসিদ্ধ উপন্যাস "মডেলভগিনী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাহার এই সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। এখন অবশ্য এই উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম কথা, গ্রন্থের নামকরণ। সময়ের যে রকম গতিক, তাহাতে মা, মাসী, খুড়ী, পিসী প্রভৃতি সম্পর্কগুলা টলটলায়মান। এখন সমস্তই "ভগিনী"। পত্নীও ভগিনী। গ্রন্থকার একথাটী গোড়াতেই ধরিয়াছেন। এই-স্থূল কথায় বিস্তর সুক্ষ্ম ভাব আছে। যিনি ভাবুক, তিনি নাম দেখিয়াই "মডেলভগিনী"র চালচলন বুঝিয়া লইতে পারিবেন। গ্রন্থের নাম সার্থক হইয়াছে।

গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং সকল কথা বলিবার সময়ও এখন হয় নাই। প্রথম খণ্ড যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই কথা আছে,—

কমলিনী একজন ডেপুটীর মেয়ে, পূর্ব্বপুরুষে ইহাদের কেহ না কেহ অবশ্যই হিন্দু ছিলেন। কিন্তু হিন্দুয়ানী এবংশ হইতে নিশ্চয় অন্তর্ধান হইয়াছে। এখন ইঁহার কোন্ ধর্ম্মকে পবিত্র করিতেছেন, ইঁহারাই জানেন, ভগবান্ জানিলেও জানিতে পারেন। এই কমলিনী এখন যুবতী, তাহার উপর ইংরেজীতে শিক্ষিতা, শিক্ষার ফলও গোছা গোছা ধরিয়াছে। কমলিনীর একজন ঘরাও শিক্ষক আছেন, ফিট্‌ফাট ছোকরা, ইংরেজীতে লায়েক, সর্ব্ব-প্রকারেই কেতা-দুরস্ত। ইনি কিন্তু মডেল-ভগিনীর অনেক উপসর্গের মধ্যে এক উপসর্গ। এমন উপসর্গ-আরও আছে; তারমধ্যে ডাক্তার বাবু, উকিল বাবু, আর সর্ব্বাপেক্ষা সাহেব বাবু মিষ্টার চাটার্জ্জী,—পরিচয় করিবার যোগ্য।

কমলিনী বিবাহিতা। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় কমলিনীর স্বামী রায় মহাশয় সন্ধ্যা আহ্নিক করা, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সুতরাং কমলিনীর উপসর্গ সম্প্রদায়েরও অসুখ। এত গুলি ভদ্রলোকের অসুখ, সুতরাং রায় মহাশয় পাগল। পাগল না হইলেও পাগল ইহা বোধ হয়, না বলিলেও চলে।

এই স্বামী-সমাগম এবং সেই উপলক্ষে কমলিনী এবং কমলিনীর উপসর্গবর্গে পরিচয় দিতেই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। কি অপরাধে কি প্রণালীতে রা মহাশয় পাগল হইতেছেন, কি উপাদানে, কেমন আয়োজনে কমলিনী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা অবশ্যই দেখান হইয়াছে। এখন পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিলেই হয় গ্রন্থের পরিচয় ইহার অধিক দিতে হইলে, গ্রন্থখানিকে মাটী করা হয়। যে রস রঙ্গ-ভর রচনা-কৌশল, সে চারুচিত্রের ছটা, সে বর্ণসমাবেশের ঘটা,—সমালোচকের আইে না! মূল না দেখিলে তাহার আস্বাদন বুঝা যায় না।

লিপিচাতুর্য্যে "মডেলভগিনী"র গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লেখক বাঙ্গালায় এখ নাই। সদর অন্দরে মাখামাখি ভাববিশিষ্ট,—নিচে নরক, উপরে স্বর্গোপম সে দোতলা বাড়ীখানির বর্ণনা, যে সে লেখকে করিতে পারে না। কপিল চাকরে পরিচয় গ্রন্থকারের নিজের ভাষা ভিন্ন অন্য কথায় দেওয়া যায় না। আর সেই চাটাজ্জ সাহেবের চিত্র—সে ফটোগ্রাফ বসিয়া বসিয়া দেখিবার সামগ্রী।

বলা বাহুল্য যে, "মডেলভগিনী" সমাজ-চিত্র। কিন্তু পরিহাস-রসিক চিত্রকরের তুলিতে আঁকা। সুতরাং অতিরঞ্জিত। শ্লেষকাব্য কেন অতিরঞ্জিত হয়, অতিরঞ্জিত করা কেন আবশ্যক, তাহা কেহ কেহ বুঝেন না। কিন্তু ভবিষ্যতের অনিষ্ট নিবারণের জন্য ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের পুষ্টি সংকৃত করিয়া বর্ত্তমানকে অতিরঞ্জিত না করিলে, Prognosis দেখাইয়া রোগের পরিচয় না দিলে, লোকের সতর্কতার শিথিলতা জন্মিবার আশঙ্কা—ইহা মনে রাখিলেই, অতিরঞ্জনের কথাটা আর বিষম সমস্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। তাই এ গ্রন্থের পাত্রপাত্রীগণও অতিরঞ্জিত। যাহা হইয়াছে, কিম্বা হইতেছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে ব্রতী নহেন। সে কাজ ঐতিহাসিকের। বাঁধ না দিলে বন্যা কোথায় যাইবে, দূরদর্শী বন্ধু তাহাই দেখাইবার যত্ন করিয়াছেন।

লেখকের সুখ্যাতি করিলাম, অখ্যাতি কিছু করিলাম না। ইহাতে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন। এমন লোক আছেন, যাহারা মনে করেন যে, গালাগালি না দিলে সমালোচনাই হয় না। সে হিসাবে আমিও গাল্যগালি দিতে পারি। বলিতে পারি যে, "মডেলভগিনী"তে অনেক "ভ্রাতা"র চিত্ত বিকার হইবে,অনেক 'ভগিনী'র গা শিহরিয়া উঠিবে। অনেক প্রচ্ছন্ন ভাবুকের ভাব-সাগরে তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে। সে দোষ কিন্তু গ্রন্থকারের নহে, আমারও নহে—দোষ আমার পোড়া কপালের। এক কথায়—বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি যে, কতকগুলি লোক লুকাইয়া লুকাইয়া এ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, একবার একবার দাঁতে জিব কাটিয়া 'ছিঃ' করিবেন, মুচকি মুচকি হাসিবেন—আর লজ্জা যদি থাকে, তাহা হইলে মনে মনে লজ্জিত হইবেন। কিন্তু যিনি পুস্তক পড়িতে জানেন, তিনি লজ্জার কারণ কিছু দেখিবেন না। দুঃখের গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অন্তরে একটু আশ্বাস লাভও করিতে পারেন।

বাঙ্গালা ভাষা।

[প্রথম পত্র (১)]

অনেকে বলেন, বাঙ্গালা ভাষার খুব উন্নতি হইয়াছে। পক্ষান্তরে সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি বলেন,—আধুনিক বাঙ্গালা লেখকেরা বড়ই সেকেলে রকমের লেখেন। এই উভয় পক্ষের কথাই আমি বুঝিতে পারি না। সেই জন্যই এ পত্র লিখিতে বসিয়াছি।

(১) "বঙ্গবাসী"তে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষ দিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি পত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। কখানি পত্রে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পত্রগুলি পরপর দেওয়া হইল। প্রথম পত্র ১৩০২ সালের ১লা অগ্রহায়ণের "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হয়।

এখনকার বাঙ্গালা লেখকদের সংখ্যা করা দুষ্কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক পুস্তিকা রাশি রাশি বাহির হইতেছে; ছোট খাটো প্রবন্ধের ত' কথাই নাই। ওদিকে সাহিত্য-পরিষদ নামে সাহিত্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশে এক সভাও হইয়াছে। কতক আলস্য, কতক ঔদাস্য, কতক অনবকাশ, কতক দুর্ভাগ্য, আর কতক সৌভাগ্য বশতঃ আমি পরের লেখা প্রায়ই পড়ি না। এত যে পুস্তক পুস্তিকা বাহির হইতেছে, প্রবন্ধাদি জাহির হইতেছে, সাহিত্য-পরিষদের পারিষদবর্গের গুণগরিমা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতেছে, এ সব আমি জানি; কিন্তু জানামাত্র। খুটাইয়া কাহারই খবর রাখি না। অথচ আমিও একজন বাঙ্গালা লেখক। ইহাতে আমার প্রতি রাগ রোষ যাহার যাহা হইবে হউক। প্রকৃত কথাটা প্রকাশ করিয়া রাখাই উচিত এবং আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে।

বলিতেছিলাম,—উন্নতির কথা। এত যে বাঙ্গালা লেখা বাহির হইতেছে, তবু বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। ঘোষ মহাশয় প্রভৃতির অভিযোগ সমূলক হইলে, লেখকদের অধিকাংশই মোটে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেন না। আবার সেদিন এই "বঙ্গবাসী"ই যে ভাবে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়াছেন, বঙ্কিম বাবুর লেখার উপর গলতির চাপ চাপাইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যের উন্নতি ত দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষা জানা লোক পাওয়াই ভার বলিয়া মনে হয়।

তবু কি মানিতে হইবে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কিম্বা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইয়াছে? বস্তুতঃ ভাষার উন্নতি বলিলে বা সাহিত্যের উন্নতি বলিলে কি বুঝা যায়? রচনা নানা প্রকারে হয়। যথা;—ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি। কিন্তু তত্তৎ নামধেয় কতকগুলা পুস্তক কোন ভাষাতে রচিত হইলেই সে ভাষার সাহিত্যসমৃদ্ধি হইয়াছে, বলিতে হইবে কি? বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপান ইতিহাস, গণিতাদি নামে খ্যাত বহুতর পুস্তকই ত হইয়াছে। সেগুলি পাশ্চাত্য সাহিত্যের গৌরবের সাক্ষীও বটে; কিন্তু তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের কি? সকল প্রকার পুস্তক সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে পারিব না; বলাও অনাবশ্যক। যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি ইঙ্গিতেই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। অতএব বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধেই সবিস্তর কিছু বলিবার ইচ্ছা করি। আমি বলি যে, যখন অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হয় নাই, অভিধান হয় নাই, বানানের বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির কথা উপহাসের বিষয় হয় না কি? শিশুর আধো আধো ভাবে ভাষার উন্নতি হওয়া কেহ বলে না; বাঙ্গালা ভাষারও এখন আধো আধো ভাব মাত্র।

ভাষার তিনটী অঙ্গ। এক অঙ্গ,—শব্দ; আর এক অঙ্গ,—বিভক্তি ও আর এক

অঙ্গ,—বাক্য। বাঙ্গালা ভাষায় তিনেরই ঠিক নাই। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের চলন আছে, হিন্দী শব্দের চলন আছে, উর্দ্দু শব্দের চলন আছে; ফারসী শব্দের চলন আছে, আরও কতরকম শব্দের চলন আছে; এখন আবার ইংরেজী শব্দও ঘনাইয়া বসিতেছে।

এক হিসাবে বলিতে পারো যে, ইহাতে ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িতেছে; ইংরেজী ভাষার গৌরব এইরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। কথা মন্দ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অভিধান না থাকাতে সময় সময় বড়ই গোলে পড়িতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকার সম্পদই বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীহট্ট, ফরিদপুরের লেখক মহাশয়েরাও বাঙ্গালা লেখেন; বীরভূম, মানভূমের মহাশয়েরাও বাঙ্গালা লেখেন; কলিকাতার ত কথাই নাই। কিন্তু ইঁহার লেখা পড়িবার সময় উঁহার ঠেকে; আর উঁহার লেখা পড়িবার সময় তাঁহার ঠেকে। শুধু অভিধান নাই—বলিয়াই ত? কোন্ শব্দ গ্রাহ্য, কোন্ শব্দ ত্যাজ্য, তাহা এখনও নিশ্চিত হয় নাই বলিয়াই ত?

আরও উপদ্রব হয়, ভাষান্তরের শব্দ লইয়া। বাঙ্গালা লেখকেরা ফারসী কি উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু যাহার যেমন ইচ্ছা বা আক্কেল তিনি তেমনই উৎকট বিকট ভাবে সেটাকে বিকৃত করিয়া লয়েন। আসল শব্দ জানা নাই, বাঙ্গালা ভাষার অভিধানও নাই, কাজেই গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। আবার সংস্কৃত শব্দ লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপাত হইয়া থাকে। যে সকলশব্দের ব্যুৎপত্তি জানা নাই, ব্যাপ্তি জানা নাই, অর্থ জানা নাই, বহুলেখকই এমন অনেক শব্দকে স্থানে অস্থানে—আপন লেখার মধ্যে গুঁজিয়া দেন। যাহাকে সে লেখা পড়িতে হয়, সেব্যক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিলে, গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া মরে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা প্রায়ই কোন কিছু বুঝিয়া পড়িবার চেষ্টা করেন না। পড়া ভাল তাই পড়েন; পড়িতে হইলে যে বুঝিতে হয়, এ ধারণাই অনেকের নাই।

এই ত গেল সামান্য গোল। সংস্কৃত শব্দ লইয়া, অথবা সংস্কৃত মূর্ত্তিযুক্ত শব্দ লইয়া বিশেষ গোলই বাধিয়া থাকে। এখনকার মূল লেখা-পড়া নাকি ইংরেজীতে, তাই আধুনিক লেখকেরা ইংরেজী শব্দের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাঙ্গলা করিয়া, নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে বড়ই ভালবাসেন। মনে কর, ইংরেজীতে আছে, Syimpathy ইহার এক অঙ্গের অর্থ হইল, সহিত বা সহ; অপর অঙ্গের অর্থ, বেদনা বা অনুভূতি। শব্দটা বাঙ্গালা করিতে হইবে; অতএব সৃষ্ট হইল,—সহানুভূতি। দেখিতে ঠিক যেন সংস্কৃত, অথচ বেদে পুরাণে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না,—সহানুভূতি। একবার একজন 'মহারথী' লেখকের লেখা পড়িতে গিয়া আমি বিপদে পড়িয়াছিলাম। লেখার ভিতরে একটা শব্দ ছিল, 'অনুপ্রাণিত', আমি আর অকাশ পাতাল খুঁজিয়া মানে

পাই না। ভাগ্যে লেখক সেইখানেই বসিয়া ছিলেন; আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বলিলেন,—কেন অনুপ্রাণিত বুঝিতে পারিলে না? অনুপ্রাণিত Inspired, আমার ঘটে আক্কেল আসিয়া পৌঁছিল; In হইলেন অনু; spir হইলেন শ্বাস, তবেই প্রাণবায়ু, তবেই প্রাণ, আর ed হইলেন ইত। এই সব সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি বুঝি কেমন করিয়া বল দেখি? অথচ অভিধান নাই।

বাঙ্গালী পাঠকের প্রায়ই মন্দাগ্নি দেখা দিয়াছে, তা কি ঔদরিক আর কি ধার্ম্মিক। পত্র বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; অতএব অদ্য অত্রৈব বিরমতু লেখনী।

[দ্বিতীয় পত্র (১)]

বাঙ্গালা ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার বহুতর শব্দেরই ব্যাপ্তি নিশ্চয় নাই। অর্থাৎ কোন একটা শব্দের অর্থ তুমি যে ভাবে বুঝ, আমি ঠিক সে ভাবে বুঝি না। তোমার বুঝাতে এবং আমার বুঝাতে হয়ত স্থূল সাদৃশ্য থাকে; কিন্তু বহু পরিমাণে অন্তর থাকিয়া যায়, ইহা নিশ্চয়। এমন হইবার হেতু এই যে, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান নাই। কোন শব্দের অর্থ লইয়া তোমার সঙ্গে আমার মতান্তর হইলে, উভয়ের মান্য প্রমাণ গ্রন্থ কিছু পাই না।

আবার বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান থাকিলেও হয় ত তাহা বড় একটা কাজে লাগিবে না। ইস্কুল পাঠশালার ছেলেদের বাদ দিলে বলিতে পারা যায় যে, কাহারও কাছে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর নাই। ইদানী অনেকে একটু আধটু বাঙ্গালা ভাষা লইয়া নাড়াচাড়া করেন বটে, কিন্তু অল্প লোকেই ভাষার প্রতি ভক্তিমান। রাজনীতি লইয়া যে চর্চ্চা হয়, তাহা বাঙ্গালা ভাষাতে হয় না; চাকরী পাইতে কিম্বা চাকরী বজায় রাখিতে বাঙ্গালা ভাষা দরকার হয় না; কাব্য-দর্শনাদির রস পরিগ্রহে ইচ্ছা থাকিলে গণ্যমান্য বাঙ্গালীরা ইংরেজীতেই সাধ মিটাইয়া থাকেন; কদাচ কেহ বা সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চাও করেন। কাজে কাজেই বাঙ্গালা ভাষার সমাদর হইবার হেতু নাই বলিতে পারা যায়। বিষয়ী বাঙ্গালীর স্বার্থের সঙ্গে যখন বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ নাই, তখন ভাষার খাতিরে ভাষার আদর হইবেই বা কেন?

কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি শিশু আপামর সাধারণ সকল বাঙ্গালীই বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়া জমা খরচ করিয়া, পত্র লিখিয়া সংসারে কাল কাটাইয়া যায়, ইহা সত্য। কিন্তু যে বাঙ্গালা ভাষা আমাদের আলোচ্য, সে বাঙ্গালা ভাষা তাহা নহে। পুস্তক প্রবন্ধ প্রভৃতি যে প্রকার ভাষাতে লেখা হয়, সেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপস্থিত বিচারে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, আমাদের গৃহস্থালী নির্ব্বাহ

(১) "বঙ্গবাসী" [illegible] অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল।

করিতে যতটুকু ভাষার দরকার হয়, তাহা বিচারের মধ্যে না ধরিলেও দোষ হয় না। কেবল ধান, চাউল, ঘটী, বাটী, খাওয়া-নেওয়া লইয়া ত ভাষা হয় না। গৌরব করিয়া ভাষাকে তখনই ভাষার মধ্যে ধরা যায়, যখন—বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ও বিচারাদি সে ভাষায় চলিতে পারে। বাঙ্গলা ভাষায় ত এসব নাই বলিলেই হয়। সংবাদপত্র চালাইতে এবং বিবিধ প্রবন্ধ সকল রচিতে আজি কালি কিছু কিছু বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার হইতেছে বটে; কিন্তু সে যেন সৌখীনের সখ মিটান গোছের। শব্দ প্রয়োগ বা রচনার রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি কি ধরাধরি নাই; স্বাধীন ভাবে যাহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনই লিখিয়া বসেন। এই সব লেখকদেরও বিড়ম্বনার এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ভাষান্তর করা। যাঁহারা লিখেন বাঙ্গলায়; তাঁহারা শিখেন প্রায় ইংরেজীতে। লিখিবার সময়ে ইংরেজী শব্দটা যেমন মনে উদিত হয়, অমনি তাহার একটা অবিকল বাঙ্গলা প্রতিরূপ খুঁজিতে বসেন। অনেকেই ভাবেন না যে, জাতিভেদে, সমাজভেদে, দেশভেদে, নীতিভেদে রীতিভেদ এবং ভাবভেদ হইয়া থাকে। অনেকেই বুঝিতে পারেন না বা বুঝিবার চেষ্টা করেন না যে জাতির সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে, সেই জাতীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইংরেজ জাতির ভাষা যেমন স্বতন্ত্র, ভাবাদিও তেমনই স্বতন্ত্র। এদিকে ব্রাহ্মণাদি জাতির ভাষা যেমন স্বতন্ত্র, ভাবাদিও তেমনই স্বতন্ত্র। কাজে কাজেই এক ভাষার কথা বলপূর্ব্বক ভাষান্তরে প্রকাশ করিতে গেলেই ভাবান্তরও ঘটিয়া উঠে। এই জন্য আজি-কালিকার বাঙ্গালা ভাষা যেন এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা। প্রায়ই দেখিতে পাই, কেমন এক রকম দেঁ-আসলা তে-আসলা গোছের রচনা; সে রচনার ভিতর হইতে ব্যবহৃত শব্দগুলির পিতৃগোত্র, মাতৃগোত্র নির্ণয় করা যেমন দুরূহ, রচনার অন্তর্নিবিষ্ট মূল ধর্ম্ম কিছু থাকিলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা ততোধিক দুরূহ। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার অভিপ্রায় স্পষ্ট করিতেছি দেখুন। অপহৃত দ্রব্য সহ চোর ধরা পড়িয়াছে—এই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া কেহ কেহ লিখিয়া বসেন, বামাল সহ চোর ধরা পড়িয়াছে। যিনি এই রকম লেখেন তিনি জানেন না যে, বামাল বলিলেই মালের সহিত বুঝায়। যেখানে বলিতে হইবে—সোজা সরল সুসাধ্য বা সুগম, অনেকেই সেখানে 'সহজ' এই শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু 'সহজ' এই শব্দের অর্থ হইতেছে—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যাহা জন্মে। বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেদিন দেখিলাম, তিনিই একখানা পুস্তক-সম্বন্ধে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন—"ইহাতে উভয় পাণ্ডিত্য ও হৃদয় সম্মিলিত আছে"। রচনাভঙ্গী নিতান্ত অদ্ভুত, কিন্তু তাহা থাকুক। ইংরেজেরা আর ইংরেজী শিক্ষিতেরা ইংরেজীতে Heart বলিলে যাহা বুঝি, ইংরেজী না-জানা বাঙ্গালী "হৃদয়" বলিলে তাহা বুঝিব কেন? এরূপ শব্দ প্রয়োগ বাঙ্গালার পণ্ডিতের

অবোধ্য, মূর্খেরও অবোধ্য। হয় ত আপত্তি হইবে যে, সহৃদয়, সুহৃৎ প্রভৃতি শব্দ চলিত আছে; তবে শুধু হৃদয়ই বা না চলিবে কেন? এরূপ আপত্তির এই মাত্র উত্তর দিলেই প্রচুর হইবে যে, শব্দ বিশেষের গ্রাহ্যতা ত্যজ্যতা পক্ষে প্রাচীন শিষ্ট প্রয়োগ ভিন্ন প্রমাণান্তর নাই। ইংরেজী শব্দের এইরূপ তরজমা; ইংরেজী বাক্যেরও তথাবিধ তরজমা; অথচ বাঙ্গলা ভাষা বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত অভিধানও নাই, ব্যাকরণও নাই।

আবার দেখুন; যে বাঙ্গালা ভাষা পুস্তক প্রবন্ধে চলিতেছে, তাহাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হয়। কিন্তু মূল সংস্কৃতে সেই শব্দগুলির যাহা অর্থ; বাঙ্গালা ভাষায় তাহা নাই। উপরে 'সহজ' শব্দের উল্লেখ করিয়াছি; আরও দুই চারিটা শব্দ দেখাইব। সংস্কৃতে 'শেষ' বলিলে বুঝায়—অবশিষ্ট বাকী; 'শেষ' বলিলে 'অন্ত' কিছুতেই বুঝায় না। বাঙ্গলা ব্যবহারে দেখিতে পাই, 'শেষ' বলিলে 'অন্ত' অর্থাৎ যাহার পর আর কিছুই নাই, এইরূপই বুঝিতে হয়। রোগের শেষ বলিলে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝিতে হইবে, রোগান্ত অর্থাৎ আরোগ্য; সংস্কৃতে বুঝিতে হইবে, তদ্বিপরীত। সংস্কৃতে 'সচরাচর' হইতেছে—চরাচরের সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সকলই, অর্থাৎ কিনা নিঃশেষরূপে সমস্তই; কিন্তু সেই 'সচরাচর' বলিলে বাঙ্গালায় বুঝিতে হইবে—সর্ব্বদা যা যেখানে সেখানে—সর্ব্বত্র বা সাধারণতঃ। সংস্কৃত "এবং" বলিলে বুঝিতে হয়—এই প্রকারে; চ, অপিচ বলিলে যাহা বুঝিতে হয়, 'এবং' শব্দে তাহা বুঝায় না; কিন্তু সংস্কৃতে যাহা বুঝায় না, 'এবং' বলিলে বাঙ্গালা ভাষাতে তাহাই বুঝায় অথচ সংস্কৃতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গলা ভাষাতে তাহাই বুঝায় না।

আমি সংস্কৃতজ্ঞ নহি; স্বল্প মাত্র সংস্কৃত যাহা দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার এই সব গোল বাধিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা জানা না জানা সমান, নহিলে বলিতাম যে, বাঙ্গালা ভাষাও ভাল জানি না। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অভিধান আছে; কাজে কাজেই সস্কৃত শিখিবারও উপায় আছে; বাঙ্গালা ভাষা শিখিবারই বা উপায় কৈ? এই যে এখন চুল চিরিয়া ভুল ধরা আরম্ভ—শ্রীবিষ্ণু—আরব্ধ—'ধরা' কোন্ লিঙ্গ? আরব্ধা হইবে নাকি?—এই যে চুল চিরিয়া ভুল ধরা আরম্ভ বা আরব্ধ বা আরব্ধা হইয়াছে, কিন্তু শুদ্ধাশুদ্ধের প্রমাণ কি, তাহা কি কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পারেন?

[তৃতীয় পত্র (১)]

বাঙ্গালা রচনার ভুল ধরা এখন আরম্ভ হইয়াছে। বর্ণবিন্যাসের ভুল ধরা হয়; শব্দবিন্যাসের ভুল ধরা হয়; আর বাক্যবিন্যাসেরও ভুল ধরা হয়। পত্রনেই আমি

(১) "বঙ্গবাসী"—২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল।

লিখিলাম আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা ভুল ধরেন, তাঁহাদের মধ্যে, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'আরম্ভ' হইয়াছে, এইরূপ না লিখিয়া লেখা উচিত ছিল 'আরব্ধ' হইয়াছে। "বঙ্গবাসী"তে "পর্য্যটকের পত্র" বাহির হইতেছে। অমনি একজন ভুল ধরিয়া বসিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, 'পর্য্যটক' হইতে পারে না, বলিতে হইবে "পর্য্যাটক"। 'সঞ্জীবনী'র লেখক লিখিবেন—অমুক কথা 'সঠিক নহে, বেঠিক'। 'হিতবাদী'র লেখক ধরিয়া বসিবেন,—সঠিকও ভুল, বেঠিকও ভুল। উত্তম কথা; কিন্তু কোন্‌টা ভুল, কিসেই বা ভুল, আর কোন্‌টাই বা ভুল নহে, তাহা জানিবার ব্যাকরণ কোথায়? ব্যাকরণ যদি না থাকিল, তবে, ইহাঁর উহাঁর তাঁহার কি তোমার কথাই বা আমি মানিব কেন? আমিও ত গায়ের জোরে বলিতে পারি যে, আমি যেটা লিখিলাম, সেইটাই ঠিক, তুমি যেটা বলিতেছ সেইটিই ভুল। প্রত্যেক 'আমি'রই এই কথা বলিবার অধিকার আছে।

বাঙ্গালা ভাষা মাত্র দশ বিশ জন মাথালো মাথালো লিখিয়ে-পাড়িয়ে কাগজ-লেখা বই-লেখা লোকের ভাষা নহে। বাঙ্গালা ভাষা ছয় সাত কোটী মানুষের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভাষা। এই ছয় সাত কোটীর ভিতর, বোধ করি, শতকরা ৯৫।৯৬ জন ঐ ১০।২০ জনের শুদ্ধাশুদ্ধ জানেও না; জানিলে, মানেও না। গৃহস্থলীর আর বাণিজ্য ব্যাপারের জমাখরচ লেখা হয়, বাঙ্গালা ভাষায়। জমিদারীর আর জমাজমির কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, (নিরূঢ় হয়, ত বলিতে পারিব না) বাঙ্গালা ভাষায়। দলিল দাস্তাবেজ, চিঠিপত্র লেখা হয় বাঙ্গালা ভাষায়। আদালতের আরজি জবাব বাদবিতণ্ডা সবই হয় বাঙ্গালা ভাষায়। অষ্ট প্রহরের কথা-বার্ত্তার কি আলাপ-আপ্যায়িতের ত কথাই নাই; তা'ত বাঙ্গালা ভাষায় হয়ই। কিন্তু এইটা বাঙ্গালা ভাষার ভিতরে শুদ্ধাশুদ্ধের চলন আছে কি? শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে একটা রাজার রাজত্ব নিত্যই চালাইতে হয়; তাঁহার শুদ্ধাশুদ্ধ তাহাতে চলে কি? যদি না চলে, তাহাকে বুঝিবার-শুনিবার কিছুই গোল হয় কি? আমাকেও প্রতিদিনই বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে পড়িতে বলিতে এবং শুনিতে হয়, পাণিন্যাদ্যনুমোদিত বাঙ্গালা ভাষা আরম্ভ করিয়া পুলিশের রাইটার-কনেষ্টবলের বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, যদি ভুল ধরিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বোধ করি, নাগাইদ সন্ধ্যাতক একদিনে আমাকে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়া কৌপীনসার হইতে হয়।

ভুল ভ্রান্তি চলিতেছে বলিয়া বরাবর ভুল ভ্রান্তিই চালাইতে হইবে, বিশুদ্ধি বিধানের কোন চেষ্টা করিতে হইবে না, একথা যে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা আমি স্বীকার করি। ভাষার বিশুদ্ধি সিদ্ধ করিতে পারিলে ভাষার উন্নতি হয়, ইহাও আমি স্বীকার করি। বাঙ্গলা ভাষাতে শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপিত হউক, ইহাও আমার অনভিপ্রেত নহে।

আমার বক্তব্য এই যে, শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণের কোন উপায়ই এখন পর্য্যন্ত বিহিত বা অবলম্বিত হয় নাই। কেবল পাঠশালের ছেলেগুলিকে কিংবা ছেলে-মেয়েগুলিকে স্বরে অ, অন্তস্থ য়, তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ, হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ মারের চোটে মুখস্থ করাইলে অথবা প্রবন্ধলেখকদিগকে পাণিনির ভয় দেখাইলে যে, শুদ্ধাশুদ্ধের নিরূপণ হইবে, ইহা আমার মনে হয় না। মনে না হইবার অনেক হেতু আছে।

সাহিত্যত্ব পুরস্কারে বিবেচনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা ভাষা আকৃতি অবয়বেও যেমন শিশু, বয়সেও তেমন শিশু। এই ইংরেজদেরই আমলে পাদরিদের পত্তন করিবার পূর্ব্বে এখনকার বাঙ্গলা ভাষার জন্ম হয় নাই বলিলে দোষ হয় না। পাদরিতে কাহারও আপত্তি থাকিলে, না হয়, রামমোহন রায়ের নাম করিতে, আমিও রাজি হইতে পারি। ভাষার অবস্থাবিচারে এ ত সেদিনকার কথা। এই সময়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন, সংশোধন, উৎকর্ষ বা উন্নতি এইমাত্র হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষা বাক্য রচনা বিষয়ে দিন দিনই বেগে বিলাতপানে ঠেলিয়া যাইতেছে। দৈব-দুর্য্যোগে যদি আমাদের বিলাতী বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়, আর ধরো যে চীনের সঙ্গে সেই সম্পর্ক পাতানো যায়, তাহা হইলে তদবধি পঞ্চাশ বৎসর পরেই তোমার আমার এই বাঙ্গালা ভাষাতে বাহুল্যরূপেই 'ফুচুঙ্গ চুঙ্গ' দেখিতে পাইবে। ইংরেজের আমলদারির আগে যাহাদের দহরম মহরম ছিল, তাহাদের হিসাবের জের এমন কাঁপিয়া আছে যে, চেষ্টা করিলেও আমাদের মরণ পর্য্যন্ত তাহা মিটাইতে পারি কি না সন্দেহ। অবস্থাগতিকে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাকে ফিরিয়া গণ্ডূষ করিতে হয়, ইহা মনে রাখা ভাল।

বাঙ্গালা মিশ্র ভাষা। এই জন্যই বাঙ্গালা ভাষাকে শাসন করা শক্ত। আটপহুরে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের তত বাড়াবাড়ি নাই; সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি আজিকালিকার পোষাকী বাঙ্গালা ভাষাতেই হইতেছে। আট-পহুরে বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক ভাষারই দাবি-দাওয়া আছে; অনেকের দাবির পরিমাণের তারতম্যও তত বেশী নয়। এমন অবস্থায় কাহার ব্যাকরণ মানি, বলুন দেখি? কতকগুলা মোটামুটি কায়দা বাঙ্গালা ভাষারও আছে। তাহা না থাকিলে ত বাঙ্গালা ভাষাকে ভাষাই বলিতাম না। যে কায়দার গুণে আমি আমরা তুমি তোমরা হাসিয়া খেলিয়া চলিতেছি চলিতেছ, হইতেছি হইতেছ প্রভৃতি পদাদি সিদ্ধ হইতেছে, তাহারই কথা এখানে বলিতেছি। কিন্তু সে সব কায়দার বলও কম, অধিকারও কম। সেই জন্য, এখন আর কেবল তাহাতে কুলাইতেছে না অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার আকৃতি অবয়ব বাড়ানো আবশ্যক বলিয়া অনেকে এখন মনে করিতেছেন। তবে কথা এই যে, কাহার কায়দা মানিব? কোন্ ভাষার ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় চালাইব?

কেহ বলিয়াছেন যে, ইংরেজী ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়াই বাঙ্গালা ভাষা চালানো উচিত অথবা, 'কেহ বলিতেছেন' বলা আমাদের ঠিক হইবে না; কেননা, এই দলের লেখকেরা না বলিয়া-কহিয়াই একেবারে ইংরেজী মূর্ত্তির বাঙ্গালা লিখিয়া ফেলিতেছেন। এই পুস্তকে 'হৃদয় ও মস্তিষ্ক' আছে, 'সভাতে যোগদান', 'মনোযোগ আকর্ষণ', 'বক্তৃতা করা' 'ধন্যবাদ দেওয়া'—ইত্যাকার বাক্য রচনা করিয়া যাঁহারা চালাইতেছেন, কোন্ ভাষার ব্যাকরণ তাঁহাদের গুরুস্থানীয়, তাহা কি বলিবার অপেক্ষা আছে?

আমাদের ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি সংস্কৃতের অনুরাগী, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাতী। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ বা কেমন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বারান্তরে আমার আপত্তি সবিস্তারে উপন্যস্ত হইবে।

[চতুর্থ পত্র (১)]

আটপৌরে বাঙ্গলা ছাড়া নবাবী আমলের বাঙ্গালা, খাঁটী মুসলমানী বাঙ্গলা, বৈষ্ণবী বাঙ্গালা, খাঁটী সংস্কৃত বাঙ্গালা, আর ইদানীন্তন খিচুড়ী বাঙ্গালা,—এতগুলি রকম রকম বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। রকম রকম এতগুলি ভাষায় পুস্তকাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আজিকালি খিচুড়ী বাঙ্গালা বা পাঁচ-মিশালী বাঙ্গালাকে মেরামত করিবার মতলবে দুই দল লোকই টানাটানি করিতেছেন। একদল টানিতেছেন ইংরেজীর দিকে, অপর দল টানিতেছেন সংস্কৃতের দিকে। জয় পরাজয় কোন পক্ষের হইবে কিনা সন্দেহ। বরং টানাটানিতে আস্ত জিনিসটা ছিঁড়িয়া যাইবার কতক সম্ভাবনা আছে।

ইংরেজী দলের বাঙ্গালা লেখকরা স্বপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশে বলিয়া-কহিয়া বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত হন নাই, ইহাই আমি জানি। সেই জন্য সংস্কৃত পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের সমীপেই আমার নিবেদনীয় কথা কিছু বেশী।

আজি-কালি বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দাদির প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যাইতেছে সত্য; কিন্তু সে সংস্কৃত বহুস্থলেই প্রাচীনসম্মত নহে। ইংরেজীর মায়াসৃষ্টি অর্থাৎ হাতগড়া সংস্কৃত শব্দ তাহার ভিতর বিস্তর দেখা যায়। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার বা উন্নতি প্রসঙ্গে সেই উপ-সংস্কৃত শব্দগুলির কি দশা ঘটান উচিত, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। কিন্তু কেহ ত সে বিচার করিতেছেন না। বিচার করিলেও তাহার সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসা হইবে কি প্রকারে? আপাততঃ এই মীমাংসার সম্ভাবনা নাই জানিয়া

১ "বঙ্গবাসী"—২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩০২ সাল।

আমিও এই বিজাতীয় সংস্কৃতের বিশেষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম না। মোটের উপর সংস্কৃত ব্যাকরণ কেন বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী নহে, তাহাই দেখাইয়া এ যাত্রায় ক্ষান্ত হইব।

সংস্কৃত ব্যাকরণে কতগুলি প্রকরণ আছে, দেখুন;—ইহার মধ্যে কোন প্রকরণ বাঙ্গালা ভাষায় খাটিতে পারে কি না, তাহা ক্রমে ক্রমে দেখা যাইবে। (১) বর্ণ, (২) বর্ণের সন্ধি, (৩) শব্দ, উপসর্গ, ধাতু আর পদ, শব্দের সঙ্গেই বিচার্য্য। (৪) শব্দের লিঙ্গ; (৫) শব্দের বিভক্তি—এই সঙ্গে কারক। (৬) ধাতুর বিভক্তি; ক্রিয়া। (৭) কৃৎপ্রকরণ; সেই সঙ্গে 'ত্ব' তুম্ প্রত্যয়ের শব্দ বিচার্য্য। (৮) তদ্ধিত; (৯) সমাস।

(১) বর্ণ। বর্ণ বা অক্ষর সকল ভাষাতেই আছে। প্রাচীন ভাষামাত্রেই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণমালা আছে। আধুনিক মিশ্র ভাষাতে কোথাও কোথাও কোন এক প্রাচীন বর্ণমালা যথাসম্ভব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইংরেজী আর ফরাসী ভাষাতে রোমক বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গালা ভাষায় নামতঃ সম্যক্‌রূপে গৃহীত হইলেও, কার্য্যতঃ বহু বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অকার অবধি হকার পর্য্যন্ত স্বর আর ব্যঞ্জনে ঊনপঞ্চাশটি বর্ণই বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালায় দেখা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি বর্ণের কাজ কিছু হয় না; কতকগুলি বর্ণের অভাব অনুভব করিতে হয়; আর কতকগুলি বর্ণ অবৈধরূপে অপভ্রষ্ট হইতেছে।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার সময়ে সংস্কৃত স্বরবর্ণগুলি যে প্রকারে বিন্যস্ত হইয়া থাকে, তাহাতে সংস্কৃতের অনুযায়ী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ ঠিক থাকে না। বাঙ্গালা ভাষাতেও স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ কখন কখন করিতে হয়; কিন্তু লিপিকার্য্যে সে প্রভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। দুইটা বাঙ্গালা শব্দ ধরুন; একটী "আমি" আর একটী 'চাঁদ'। 'আমি'তেও আকার আছে; 'চাঁদে'ও আকার আছে। কিন্তু 'আমি'র আকারটী উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, 'চাঁদে'র আকার উচ্চারণ করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে। সংস্কৃত রীতি অনুসারে বলিতে হইলে, 'আমি'র আকারকে হ্রস্ব আকার বলিতে হয়; আর 'চাঁদে' যে আকার আছে, তাহাকে দীর্ঘ আকার বলিতে হয়। সংস্কৃত আকার প্রকৃত পক্ষে হ্রস্ব আকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংস্কৃত আকার অ-কারেরই দীর্ঘ বর্ণ। কিন্তু যে-কোন কারণ বশতঃই হউক, বাঙ্গালীর মুখে অ-কারের উচ্চারণ আলা.হিদা রকমের হইয়া গিয়াছে। কাজে-কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালার হ্রস্ব আকারের অভাব হইয়াছে। এইরূপে হ্রস্ব এ-কার এবং হ্রস্ব ও-কারেরও অনুভব করিতে হয়।

বাঙ্গলা বর্ণমালায় সংস্কৃত বর্ণমালা অবলম্বন করিতে গিয়া তিনটী বর্ণের অভা

ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইলাম। সংস্কৃত বর্ণমালার কতকগুলি বর্ণ বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতানুরূপ কাজ করে না; সুতরাং আবশ্যকের অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই এখন দেখাইব। ঋ ৠ ঌ ৡ ঐ ঔ ঃ (বিসর্গ) ঞ ণ ষ বাঙ্গলা ভাষার বর্ণমালায় রাখা মিছা। 'ক্ষ' সংস্কৃত বর্ণমালায় বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাও রাখা মিছা। ঋ-কারের কার্য্য র-বর্ণে চালানই ঠিক। শব্দের মধ্যে বা অন্তে স্থিত কোন ব্যঞ্জনবর্ণ ঋ-কার যুক্ত হইলে, দ্বিত্বভাবে উচ্চারিত হইবার বিধি নাই, ইহা আমি জানি। অনুগ্রহ, এই শব্দে গ-বর্ণে র যুক্ত আছে, সেই জন্য গএর দ্বিত্ব হয়; উচ্চারণ হয়, অনুগ্‌গ্রহ। অনুগৃহীত শব্দে গ-বর্ণে ঋ-যোগ আছে; ঋ-কারের দ্বিত্ব হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষীরা এই প্রভেদ মানেন কি? পাদ্রি এই শব্দ লিখিতে হইলে, কেহ লেখেন, পাদ্রি, কেহ লেখেন পাদ্‌রি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উচ্চারণটী হয় যেন—পাদৃ। তবে ঋ-কারকে বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণ-স্বীকার করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিবার আবশ্যক কি?

ঌ-কার ঐরূপ। সৌভাগ্যক্রমে সংস্কৃতে ঌ-কারের প্রয়োগ অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় মোটেই ঌ-কারের ব্যবহার নাই। এমন স্থলে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে দুটী ঌ-কার বাঙ্গালা বর্ণমালার ভিতর রাখা হয় কেন?

ঐ ঔ বাঙ্গালা বর্ণমালায় বৃথা আছে। 'হইতে পারে'—এই কথা লিখিবার সময়ে হ-এ ঐকার দিবার রীতি এখন নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এই স্থলে ঐকারের ব্যবহার দেখা যায়।

কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা কবিও 'হইতে' লিখিবার সময় ঐকার ব্যবহার করিয়া ছন্দ মিলাইয়া দেন। কিন্তু ইহাত প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন। তবেই বুঝা গেল যে, ঐকারের যে কাজ, অ-ই বা ও-ই লিখিলেও সেই কাজই হয়। কাজ কি তবে ঐ-কার রাখিয়া? ঔ-কার সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা। অ-উ বা ও-উ-তে ঔ-কারের কাজ চলে।

বাঙ্গালা ভাষায় ঃ বিসর্গের কোন কাজই নাই। বক্ষ, মন ও যশ প্রভৃতি যে সব সংস্কৃত শব্দ খাঁটী বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বিসর্গও লোপ পাইয়াছে। 'মফস্বল' শব্দ লিখিতে কোন কোন বাঙ্গালা-ভাষী ঃ বিসর্গ ব্যবহার করিতেন; হয়ত এখন কেহ কেহ করেন, কিন্তু এস্থলে নিতান্ত ঃ বিসর্গের বাজে খরচ বলিতে হইবে।

ঞর কাজ ন-কারেই ঠিক চলে। বৈষ্ণব সাহিত্য লেখকেরা 'সন্ধিরেকপদে নিত্যঃ' এই সূত্র মানিয়া গোঁসাই ঞ দিয়া লিখিতেন—গোসাঞি। বৈষ্ণবের আমল গিয়াছে; আর ঞ রাখিয়া ফল কি? বরং ঁ চন্দ্রবিন্দুর গৌরব বাড়াইয়া তাহাকেও একটী বর্ণ করিয়া লও, আপত্তি নাই।

ণ-কার নিতান্তই বেকার। বাঙ্গালা বর্ণমালার ভিতর ইহার স্থান পাইবার অধিকার কিছুমাত্র দেখি না। ষ-ত্বৈবচ। স্থান বলিতে স লাগে; এইরূপ আরও

দুই এক 'স্থলে' লাগে; তদিতর যেখানে আবশ্যক, সেখানে শ বা ষ ব্যবহার করা হয়। দুইটীর মধ্যে যেটা ইচ্ছা বসাইয়া দাও, আপত্তি নাই; কিন্তু দুই জনেরই থাকিবার কোন অধিকার নাই।

ঙ কাজে লাগাইলে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বরং (অনুস্বার) উঠাইয়া দিয়া ঙ-বর্ণে তাহারও কাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। চোঙ—চ-এ ং দিয়াও লেখা চলে; আবার চ-তে ঙ-কার দিয়া হসন্ত ঙ লিখিয়াও চোঙ্ করা যাইতে পারে; আর ঙ-তে আ-কার দিয়া চোঙা প্রভৃতি শব্দ লেখা যাইতে পারে। চোঙ্গা লিখিয়া লুপ্ত-গ কারের কল্পনা করিবার আবশ্যক থাকে না।

অন্তঃস্থ ব নামমাত্র বাঙ্গালাতে আছে। বর্গীয় ব ব-কারের সহিত অবিকল একাকার হওয়াতে এই উৎপাত ঘটিয়াছে। অন্তঃস্থ ব-কারের আকৃতি কিছু বদল করিয়া ইহাকে কাজে লাগানো উচিত। এখন একটা 'ও' তাহার পর 'য়া'—একুনে 'ওয়া' লিখিয়া যে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, অন্তঃস্থ ব-কারকে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করিলে, সে ভোগ আর থাকে না। তবে, যদি স্বরবর্ণ 'ও'-কারে আ-কারাদি সংযোগ করিতে কাহারও অভিপ্রায় হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। তাহা হইলে অন্তঃস্থ ব বর্ণমালা হইতে উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

সংস্কৃত বর্ণমালার ইত্যাদিরূপে খারিজ দাখিল করিলে, যে বর্ণমালা দাঁড়ায়, তাহাই বঙ্গ ভাষার ঠিক উপযোগী, ইহা স্বীকার করিতে, বোধ করি, কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। তবে, প্রাচীন এবং প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিতে অবশ্যই চিত্ত কিছু ইতস্ততঃ করিতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, আমিই যে সর্ব্ব প্রথমে এই ব্যতিক্রমের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি, তাহা নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুকাল যাবৎ কতক পরিমাণে ব্যতিক্রমের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ পরিচয়ে শিশুরা যে বর্ণমালা শিখে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণের মধ্যে ঌ-ৠ বাদ দেওয়া আছে। য় ড় ঢ় ং এই চারিটি নূতন বর্ণ তিনি সংযোগ করিয়াছেন। তাহাতে যখন দেশে বিশেষ বিপ্লব কিছু হয় নাই, তখন ভরসা করা যায় যে, আমার প্রস্তাবেও কেহ শিহরিয়া উঠিবেন না।

আমার বিবেচনা হয় যে, বাঙ্গলা বর্ণমালার উক্তবিধ পরিবর্ত্তন না করিলে, অতিশয় অনিষ্ট হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে। বানান ভুল সম্ভব হয়, কেবল বর্ণমালারই দোষে; বর্ণমালা সুধরাইয়া দিলে, কখনই বানান ভুল হইতে পারিবে না। লেখা দেখিয়া উচ্চারণ শেখা চলিবে; সমস্ত বাঙ্গালা দেশে উচ্চারণের ঐক্যে ভাষাগত ঐক্য হইবার সমধিক সম্ভাবনা হইবে। আট পহুরে ভাষায় ও পোষাকী ভাষায় এখন যে অন্তর আছে, কথা কহাতে আর কথা লেখাতে এখন যে প্রভেদ আছে, তাহা আর থাকিবে না। তখন বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব নিশ্চিত হইবে, বাঙ্গলা ভাষা পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে। ভাষার উন্নতির কথা তখন ভাবা চলিবে।

ইংরেজী মন্ত্রমুগ্ধ মহাশয়েরা বলিতে পারেন যে, বানানের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষার এবং ইংরেজী সাহিত্যের যখন মহতী উন্নতি হইয়াছে, তখন বাঙ্গালা ভাষার বানান লইয়া, এত গোল করা কেন? আমি বিনয়পূর্ব্বক এই কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজী ভাষার ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা কি বাঙ্গলা সাহিত্যের তুলনা করা অন্যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষার এখনও নিতান্ত শৈশব অবস্থা, ইহাকে যে পথে লইয়া যাইবে, সেই পথেই যাইবে, কিন্তু যত হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকিবে, ভবিষ্যতে ততই বে-বাগ হইয়া পড়িবে।

সংস্কৃত পক্ষপাতীরাও আপত্তি করিতে পারেন যে, বর্ণমালা কিংবা বানান বদলাইয়া দিলে, সংস্কৃত শব্দাদির ব্যুৎপত্তি সাধন কঠিন হইবে। আমি বলি, হইবেই ত; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? বাঙ্গালা ভাষা ত স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়াই এত কথা হইতেছে। আর বাঙ্গালা ভাষাকে যদি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাষা না করিতে চাহেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি বা উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিউন। উচ্চ বিষয়ের চর্চ্চা অতঃপর পুরা সংস্কৃতেই হউক; বাঙ্গালা থাকুক কেবল পাঁচ পাঁচী কাজের নিমিত্ত।

পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল; অতএব অন্য কথা বারান্তরে।

[পঞ্চম পত্র (১)]

সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গালা ভাষায় লিপিকার্য্যে সম্যক্ উপযোগী নহে, তাহা দেখাইয়াছি। এইবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যান্য প্রকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব।

সন্ধি সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে এই এক নিয়ম আছে যে, কতকগুলি স্থলে সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে, অবশ্যই সন্ধি করিতে হইবে। তাহাতে বিকল্প বা পুরুষেচ্ছা চলিবে না। মনে করুন, যেন কর্ম্মধারয় বা তৎপুরুষ সমাস করিয়া 'কুশের আসন' এইটী বুঝাইতে 'কুশাসন' এই পদ করা গেল। এখানে "কুশ" শব্দের অন্তে অকার আছে, আর 'আসন' শব্দের আদিতে আকার আছে; এস্থলে ঐ অ-কারে আর আ-কারে সন্ধি করিয়া, 'কুশাসন' পদ করিতেই হইবে; 'কুশ আসন' পদ সংস্কৃতে কোনমতেই হইতে পারিবে না। ছান্দস, আর্ষ বা মহা-কবিপ্রয়োগে এ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেও তাহা সাধারণ লৌকিক লেখকের অনুকরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং সেই সকল অসাধারণ প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃত ব্যাকরণের যাহা নিয়ম, বাঙ্গালা ভাষায় যে, সে নিয়ম গ্রাহ্য হয় না, এমন নহে; পদে পদেই তাহার বিরুদ্ধ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় 'অই' 'হইলাম' 'যাইব' 'সেই' 'পুঁই' ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধিবিধি বাঙ্গালা ভাষায় চালাইতে গেলে এই সকল শব্দ কোনোমতেই

(১) "বঙ্গবাসী"—৭ই পৌষ, ১৩০২ সাল।

থাকিতে পারে না। সন্ধির নিয়ম মানিতে গেলে 'অই' থাকিতে পারে না, 'এ' শব্দ হইয়া যায়; 'হইলাম' থাকিতে পারে না; 'হেলাম' হইয়া যায় ইত্যাদি। যে শব্দগুলি উদাহরণস্থলে ধৃত হইল, সেগুলি খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার শব্দ। তাহাতে ত সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম চলেই না। অধিকন্তু যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় চালানো হয়, তাহাতেও সন্ধির নিত্যতা নাই। যেমন, বাঙ্গালা ভাষায় পিতৃ অন্ন পিতৃ ঋণ, পৈতৃক ঋণ প্রভৃতি শব্দ শুদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম নামিতে পেলে, এগুলি অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধি যে চলে না, সন্ধি করিতে গেলে অনেক স্থলে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠে; তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা পরিহাস কথা চিরদিন প্রচলিত আছে, অনেকেই তাহা জানেন। যদ্যপ্যেকশতটাকা ব্যয় হইল, তথাপ্যাটচালাখানা প্রস্তুত হইল না। ইহার ভিতর অনেকগুলি সন্ধি করা আছে। কতকগুলি সন্ধি করাও হয় নাই। তথাপি ইহা বাঙ্গালা ভাষায় অপাঠ্য এবং অচল। যদ্যপি একশত টাকা ব্যয় হইল, তথাপি আট-চালাখানা প্রস্তুত হইল না, এইরূপে না লিখিলে কিংবা না বলিলে, বাঙ্গালা ভাষায় বোধগম্যই হয় না।

এক পক্ষে ত দেখান গেল, বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধি কিরূপ অনুপযোগী। আবার কতকগুলি উদ্ভট সন্ধিও বাঙ্গালা ভাষায় চলিত হইয়াছে দেখা যায়। কোন কোন স্থানের লোকেরা কথা কহিবার সময়ে 'গিয়াছে' না বলিয়া 'গেছে' বলে; 'গিয়েছি' না বলিয়া 'গ্যেছি' বা 'গেছি' বলে; এসব উদ্ভট সন্ধি। সংস্কৃত ব্যাকরণে এমন সন্ধি পাওয়া যায় না। হইতেও পারে না। আবার কোথাও 'যাইতেছে' এই শব্দ সন্ধির আশ্রয় লইয়া "যেতেছি" 'যাচ্ছি' বা 'গেছি' হইয়া যায়। কিন্তু ইত্যা-কার প্রয়োগ বাঙ্গালা সাধু ভাষা অর্থাৎ পুস্তক প্রভৃতির ভাষায় অচল। আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি নিয়মের দুই একটি 'অপবাদও' বাঙ্গালা সাধু ভাষায় আছে। যেমন মনান্তর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখাতেও 'মনান্তর' এই শব্দ দেখি-য়াছি। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিতে গেলে, 'মনোন্তর' লিখিতে হয়; 'মনান্তর' হয় না। অথচ 'মনোহর' না লিখিয়া যদি 'মনহর' লিখি, তবেই সার্ব্বনাশ। পাণিনি-মানীরা নিশ্চয়ই ভুল ধরিয়া বসিবেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি যে, বাঙ্গালা ভাষার সন্ধির নিয়ম কি প্রকারে মানিব, কোথায়ই বা মানিব, তাহা কে বলিয়া দিতে পারেন? বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামধেয় কতকগুলি পুস্তক বালকদের পড়িবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে। বোধ হয়, সকলগুলিতেই সন্ধি প্রকরণও সন্নিবেশিত আছে। সকলগুলিতেই বলিয়া দেওয়া হয় যে, অ-কারের পর অ-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া আ-কার হইবে; অ-কারের পর ই-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া এ-কার হইবে; সজাত বিসর্গের পর অ-কার থাকিলে ও-কার হইবে;

ইত্যাদি। ব্যাকরণে লেখা আছে এই সব হইবে; কিন্তু কাজের বেলায় ত কই হয় না। বুদ্ধিমান্ বালক হইলে ধাঁধায় পড়ে মাত্র। বুদ্ধিমানে দেখিতে পায় যে, ব্যাকরণে নিয়ম আছে; ভাষায় কিন্তু সে নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না; বরং প্রতিপালন করিলেই ভুল হয় বা দোষ হয়, যাহা বলিবার বলো। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি প্রকরণ বাঙ্গলা ভাষায় খাটে?

আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধির নিয়মবন্ধন করাই সুকঠিন। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা পদগুলির সন্ধিযোগে একীকরণ করা ত চলেই না; এক একটা পদের মধ্যেও সন্ধির স্থল পাওয়া সত্ত্বেও সন্ধি করা চলে না।

এদিকে আবার কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে। বিসর্গান্ত সংস্কৃত শব্দগুলির প্রায়ই এই দশা। যেমন মনঃ উরঃ যশঃ বাঙ্গলা ভাষাতে মন, উর, যশ হইয়া গিয়াছে। অথচ মনের বেলায় মনান্তর শব্দ হয়; কিন্তু যশের বেলায় যশাকাঙ্ক্ষা লিখিলে অপরাধী হইতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি?

বাঙ্গালা ভাষায় আরও বিচিত্র সন্ধির উদাহরণ আছে। সে সব উদাহরণে সংস্কৃত শব্দে আর বাঙ্গালা শব্দে সন্ধির স্থল পাইয়া মিলিত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম মানিলে 'হৃৎ-মাঝারে' না লিখিয়া 'হৃন্মাঝারে' লিখিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কেহ লিখেন 'হৃৎমাঝারে' কেহ বা লিখেন 'হৃদ্-মাঝারে'। বর্গীয় জ, আর দন্ত্য ন বা ঞ যোগ করিলে সংস্কৃতে জ্ঞ হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই উৎপন্ন বর্ণের নাম গঁ। এখন মনে করুন যে, সৎ আর জ্ঞান এই দুই পদে সন্ধি করিয়া এক করিতে হইবে। সংস্কৃত নিয়মানুসারে সন্ধি করিলে সজ্‌জ্ঞান পদ সিদ্ধ হইবে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় আমি লেখা দেখিয়াছি সৎ-জ্ঞান।

অতঃপর দৃষ্টান্তের বাহুল্য করা অনাবশ্যক। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গলা ভাষায় কতদূর খাটে, আর কিরূপই বা খাটে, তাহা বোধ হয় আমি পর্য্যাপ্ত ভাবে দেখাইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত ব্যাকরণ এখনও হয় নাই; সুতরাং সর্ব্বজনমান্য সন্ধি সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধের প্রমাণও কিছুই পাইবার উপায় নাই। এমন অবস্থায় সন্ধি সম্বন্ধে সংস্কৃতের নিয়ম, বাঙ্গালা ভাষায় খাটাইতে গেলে, কতকটা গায়ের জোর প্রকাশ করা হয় না কি?

[ষষ্ঠ পত্র (১)]

শব্দাদি সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। শব্দ আর পদ সংস্কৃত ব্যাকরণে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ। ধাতুতে বিভক্তি যোগ করিলে পদ হয়। এই পদগুলি ক্রিয়াপদ। ধাতুতে

(১) 'বঙ্গবাসী'—২৮শে পৌষ, ১৩০২ সাল।

প্রত্যয়যুক্ত হইলে এবং শব্দে প্রত্যয়যুক্ত হইলে শব্দই হয়, পদ হয় না। শব্দে বিভক্তি যোগ করিলে তবে তাহা পদ হয়। পদগুলি, বিভক্তিহীন অবস্থাতে হয় শব্দ, না হয় ধাতু। হরি গুরু প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে পদ নহে—এগুলি শব্দ। প্রতি, অপি, সুতরাং প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অব্যয় শব্দ; ইহারা কখনই পদ হয় না। ধনী, ভাগ্যবান, বিদ্বান্ প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ নহে—এগুলি পদ। ভূ, কৃ প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতু; এগুলি শব্দও নহে—পদও নহে। আবার প্র, পরা প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে উপসর্গ, ইহারা শব্দও নহে—পদও নহে—ধাতুও নহে। ইহা ছাড়া প্রত্যয় আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় এ সব কিছুই নাই; অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় উপসর্গ আর ধাতু মোটেই নাই। শব্দের সঙ্গে পদের প্রভেদও প্রায় নাই।

ইহার উপর, সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ আছে। শব্দের বাচ্য যে পদার্থ, তাহার লিঙ্গ অনুসারেই যে সেই পদের বাচক শব্দের লিঙ্গ হইবে, সংস্কৃত ব্যাকরণে এমন বিধান নাই। এই দেখুন, সংস্কৃতে একটী শব্দ আছে 'দার'; 'দার' শব্দে পত্নী বুঝায়। পত্নী স্ত্রীলিঙ্গ বটে; কিন্তু সেই পত্নীরই বাচক 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ। দিক্, লতা, বীণা—ইহারা পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে; যদি কিছু বলিতে হয়, তাহা হইলে বরং ইহাদিগকে ক্লীব বলা যায়; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে দিক্, লতা, বীণা প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

আমার মনে পড়ে যে, "আর্য্যদর্শনে"র একজন আদরের লেখক একবার লিখিয়াছিলেন 'ফলবতী বৃক্ষ,' কিম্বা 'বৃক্ষ সকল ফলবতী' হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে ফলের প্রসব হয়, এই ভাবিয়াই বোধ হয় সেই লেখক মহাশয় বৃক্ষের স্ত্রীত্ব কল্পনা করিয়া 'ফলবতী' বিশেষণ জুড়িয়া দিয়াছিলেন! কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিতে হইলে, বৃক্ষ শব্দ পুংলিঙ্গ—সুতরাং 'ফলবতী' এই শব্দ বৃক্ষের বিশেষণ কোন মতেই হইতে পারে না। সেই লেখক হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ জানিতেন না; না হয় বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিতেন না। বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের লিঙ্গ হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ আছে। প্রত্যেক শব্দই হয় পুংলিঙ্গ, না হয় স্ত্রীলিঙ্গ, না হয় ক্লীবলিঙ্গ। কোন্ শব্দের কোন্ লিঙ্গ, তাহাও সংস্কৃত ব্যাকরণে স্থির করা আছে। লিঙ্গের ব্যতিক্রম কখনই হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কেবল যে শব্দের লিঙ্গ নাই, তাহা নহে; পুংলিঙ্গ এবং ক্লীব লিঙ্গের কোন ভেদ নাই; অধিকন্তু স্ত্রীত্ব বাচক শব্দেরও পুংবৎ ব্যবহার দেখা যায়। বাঙ্গালা ভাষায়—'মেয়েটী বেশ সুন্দর' 'ছেলেটী বেশ সুন্দর' 'হিতবাদী খুব শান্ত' 'সঞ্জীবনীও খুব শান্ত' এ রকম বলিলে কোন দোষ হয় না। তথাপি, 'বৃক্ষগুলি ফলবতী' বলিলে কেন যে দোষ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না!

সংস্কৃত ব্যাকরণে—শব্দের উত্তর তিন বচনে একুশ বিভক্তি করিয়া কারক পদ সিদ্ধ হয়; ইহা ছাড়া সম্বোধন পদ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় কয় প্রকার কারক আছে, জানি না। কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বন্ধ, আর অধিকরণ কারক একরকম আছে বটে; কিন্তু তাহা ছাড়া করণ, সম্প্রদান, অপাদান আছে কিনা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষাতেও বাক্য রচনায় সকল প্রকার কারকেরই ভাব প্রকাশ করিতে হয় সত্য, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি অনুসারে বিভক্তি যোগ করিয়া যে কারক পদ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাই বাঙ্গালা ভাষায় আছে কিনা, আমি বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের উত্তর কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, তাহার নির্দ্দেশ কেহ করিয়াছেন কি না, জানি না। 'দ্বারা' 'দিয়া' 'হইয়া' 'হইতে' প্রভৃতি শব্দের যোগে যে সকল বাক্য রচিত হয়, সেই 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতি, বাক্যের অন্তর্গত, কি স্বতন্ত্র কারকসূচক বিভক্তি, তাহা আমরা জানিও না, বুঝিতেও পারি না। কেহ লেখেন 'আমার দ্বারা'; কেহ লেখেন 'আমা দ্বারা,' যিনি 'আমার দ্বারা' লেখন, তিনি কি ডবল বিভক্তি লাগান বলিতে হইবে? 'রামকে দিয়া একাজ হইবে না' 'রামের দ্বারা এ কাজ হইবে না' 'রাম দ্বারা এ কাজ হইবে না'—ইহার ভিতর শুদ্ধাশুদ্ধের কোন বিচার করা চলে কি? বোধ করি চলে না। কেননা, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণই নাই; সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিবার উপায় এ সব স্থলে নাই। আবার, 'রামকে দিয়ে এ কাজ হইবে না, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রয়োগ শুদ্ধ বটে; অথচ 'ছুরীকে দিয়ে কলম কাটা যায় না, ইহা বোধ হয়, অশুদ্ধ; বলিতে হইবে—'ছুরী দিয়া কলম কাটা যায় না' কিম্বা 'ছুরীতে কলম কাটা যায় না।' 'জলেই জাল 'বাধে' বাঙ্গালা ভাষায় এই বাক্য প্রচলিত আছে। 'জলেই'—এই স্থলে কোন্ কারকের বিভক্তি আছে, বলা যায় কি? 'জলেই' পদ অধিকরণ কারকের? না কি কর্ত্তৃকারকে দ্বিতীয়া? জল পদ কর্ম্মকারকের? না কি কর্ত্তৃকারকের? বিভক্তি থাকিয়াও গোল—না থাকিয়াও গোল। এ সব স্থলে, সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যও পাইবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই বাঙ্গালা ভাষায় দেওয়াটা সমীচীন হইতেছে কি?

উপরে বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষায় মোটেই ধাতু নাই। সুতরাং ধাতুর বিভক্তি নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতু আছে; ধাতুর গণ আছে; ধাতুর পদ আছে; ধাতু লইয়া বহুতর কার্য্য আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রিয়ামূল মাত্রই ধাতু; কোথাও বা নাম ধাতু—তবু ধাতু।

বাঙ্গালায় ধাতু ত নাইই; ক্রিয়ার মূল কি, তাহাও খুঁজিয়া পাই না। সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়ার কালাদিসূচক যে সকল বিভক্তি আছে, বাঙ্গালা ভাষাতে তাহা নাই। বিধিসূচক, আশীঃসূচক প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় নাই। কালসূচক বিভক্তি

কতগুলি কি আছে, তাহারও নির্দ্দেশ বাঙ্গলা ভাষায় নাই। ইহা ছাড়া, বাঙ্গলা ভাষায় ক্রিয়া পদ সম্বন্ধে নানা প্রকার ত্রুটীই বলুন—আর ব্যভিচারই বলুন, দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ দিয়া বিষয়গুলা একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

'আছে' 'হয়' 'যায়' 'নাচে,' 'খায়' 'বলে' 'চলে' ইত্যাদিগুলি বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়া-পদ। এইগুলির ক্রিয়ামূল কেহ বলিতে পারেন কি? ধাতুর ত কথাই নাই। সংস্কৃত চল ধাতু হইতে 'চলে,' যা ধাতু হইতে 'যায়'—বলিলে আমি মানিতে পারিব না। মূর্খ বলিতে হয় বলুন; ঠাট্টা করিতে হয়, করুন; আর ক্ষমা করিতে পারেন ত ক্ষমা করুন; কিন্তু অমন ধাতু দেখাইয়া দিলে আমি মানিয়া লইতে পারিব না। পারেন ত সকলগুলিরই ধাতু দেখাইয়া দিউন; নচেৎ ধাতুর কথা তুলিবেন না। একই ভাষার ভিতর কতকগুলি পদের ধাতু আছে; আর কতকগুলি একেবারেই ধাতু-ছাড়া, ইহা কি মানিতে পারা যায়?

আবার, দেখুন, বহুতর ক্রিয়াপদের ক্রিয়ামূল থাকিলেও, তাহাদের দৌড় কত অল্প। 'আমি আছি'; 'তুমি আছ,' 'সে আছে,'—এতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় চলিল; কিন্তু আজি কালি 'আমি আছিলাম,' 'তুমি আছিলে,' 'সে আছিল' বহু কষ্টে পদ্যে চলিলেও গদ্যে অচল। 'আছিয়াছি' 'আছিয়াছিলাম' ইত্যাদির ত কথাই নাই।

নাই—এইটী ক্রিয়াপদ কি অব্যয় শব্দ, তাহা ত ঠিক করিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষায় যদি বিভক্তি থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইনি সে বিভক্তিকে বেমালুম গ্রাস করিয়া ফেলেন। যথা 'আমি নাই,' 'তুমি নাই,' 'সে নাই'!

বাঙ্গালা ভাষায় 'হয়' খুব প্রধান ক্রিয়াপদ। ইহার ধাতু বা ক্রিয়া মূল কি? চলেই বা কতদূর? 'আমি হই' 'তুমি হও' 'সে হয়' 'আমি হইলাম' 'তুমি হইলে' 'সে হইল'; 'হইতে' হইবার'—বিভক্তি বা প্রত্যয়যোগে ইহা ছাড়া আর কিছু করিবার যো আছে কি? 'হইতেছি' 'হইতেছে' ইত্যাদি পদ বিভক্তিযোগে সিদ্ধ হয়, না কি, 'হইতে' পর্য্যন্ত করিয়া তাহাতে 'আছি' 'আছ' 'আছে' 'আছিলাম' ইত্যাদি যুড়িয় তৈয়ার করা হয়? ঐ যে 'হইতে'র 'তে' কিম্বা 'হইবার' বার এই 'তে' আর 'বার বিভক্তি, না প্রত্যয়? সংস্কৃত ব্যাকরণের হিসাবে ইহারা কৃৎপ্রকরণে পড়িবে, না কি তিঙন্তের ভিতর পড়িবে?

যতদূর দেখাইলাম, ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের স্বল্পাংশই বাঙ্গালা ভাষায় খাটাইতে পারা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণাবয়ব, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং বিজ্ঞানানুমোদিত; বাঙ্গালা ভাষার আদৌ ব্যাকরণ নাই, আর এখনও এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, ব্যাকরণ করিবার সুযোগও নাই। তাহার উপর, সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর এখনও কিছুমাত্র হয় নাই। আজি কালিকার অধিকাং

ভদ্র' লোকেই বা 'শিক্ষিত' লোকেই বাঙ্গালা শিখেন না। বাঙ্গালা লিখেনও না। অধিক কি, যাঁহারা বাঙ্গালা লিখেন, তাঁহারাও বাঙ্গালা শিখেন না। কেহ, ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গালা লেখেন; কেহ বা সংস্কৃত শিখিয়া বাঙ্গালা লেখেন, কেহ বা উভয় ভাষা শিখিয়া বাঙ্গালা লেখেন; কিন্তু বাঙ্গালা লিখিবার নিমিত্ত কিম্বা বাঙ্গালা বলিবার নিমিত্ত কেহ বাঙ্গালা শিখেন না। ইহাঁদের দোষ দিবার নিমিত্ত এ কথা বলিতেছি না। যাহা প্রকৃত ঘটনা, তাহাই বলিতেছি মাত্র। বলিতেছি যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের গড়ন চলন হইবার এখনও বহু বিলম্ব আছে। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগীর, এখন হইতে ভাষা-বিষয়ে যদি তাঁহারা মনোযোগ বিধান করেন, দেশের বুদ্ধিমন্ত লোকের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কাজ করিবার সুযোগ এখন পাইতে পারেন। এই সময়ে ব্যাকরণ আর অভিধান প্রস্তুত করিবার বিষয়ে মন দিলে, অল্প আয়াসে কতক ফল হইতে পারে। এখন ভাঙ্গাচুরা করা অনেকটা সোজা; রদ-বদল করাও সোজা। ইহার পর কালক্রমে কিন্তু এ ব্যাপার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান অবস্থায়, স্থানে অস্থানে, কালে অকালে, সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দিয়া লাভ কিছুই নাই। অদ্য এই স্থানে বিরাম হউক।

[সপ্তম পত্র (১)]

বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের আর পদের প্রভেদ প্রায়ই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে এ প্রভেদ আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্য অন্য প্রকরণ বাঙ্গালা ভাষায় সম্যকরূপে খাটে না, ইহা আমি বলিয়াছি এবং কতক কতক যুক্তি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাতী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় যখন তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দিতে চাহেন, তাঁহারাও বোধ করি, সংস্কৃত ব্যাকরণের সেই সকল প্রকরণ বাঙ্গালা ভাষায় সম্যকরূপে খাটাইবার নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইবেন না। আমি বিবেচনা করি যে, বাঙ্গলা ভাষায় বহুল পরিমাণে অবিকল সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগেরই তাঁহারা পক্ষপাতী। আমার বিবেচনা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে, সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃদন্ত, তদ্ধিত এবং সমাস প্রকরণ সর্ব্বাবয়বে বাঙ্গালা ভাষায় চালাইতে তাঁহারা ব্যগ্র। অতএব কৃদন্ত তদ্ধিত আর সমাসের সম্বন্ধে বিচার করাই এখন আবশ্যক হইতেছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃৎ প্রত্যয় নামে কতকগুলি প্রত্যয় আছে। ধাতুর উত্তর সেই সকল প্রত্যয় করিয়া যে সকল শব্দ সিদ্ধ হয়, তাহাই কৃদন্ত শব্দ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষায় ধাতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃদন্ত প্রকরণ বাঙ্গালা ভাষায় কেমন করিয়া থাকিতে পারে?

(১) "বঙ্গবাসী"—৫ই মাঘ, ১৩০২ সাল।

বাঙ্গলা ভাষা যে সঙ্কর ভাষা বা মিশ্র ভাষা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চলিত ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের তাদৃশ বাহুল্য নাই বলিয়াই, আমার মনে হয়। এখন যে ভাষা করিয়া প্রবন্ধ আদি রচনা হইতেছে, তাহাকে আমি চলিত ভাষা বলিতেছি না। যে ভাষায় অষ্টপ্রহর লোকের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, পত্র লেখালেখি হইতেছে, বিষয় কার্য্যের নির্ব্বাহ হইতেছে, দলিল দস্তাবেজ লেখাপড়া হইতেছে, আদালতে বাদী প্রতিবাদীর, আসামী ফরিয়াদীর আর সাক্ষীদের এজেহার প্রভৃতি হইতেছে, আর যে ভাষায় উকীল মোক্তারদের সওয়াল জবাব বক্তৃতা পর্য্যন্ত হইতেছে, তাহাকেই আমি চলিত ভাষা বলিতেছি। এই চলিত ভাষাতে এখনও সংস্কৃত শব্দের বাড়াবাড়ি নাই।

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষা প্রধান কল্পে ব্রাহ্মণ আদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী জাতিরই ভাষা ছিল। ব্রাহ্মণ আদির ক্রিয়াকলাপ সংস্কৃত শব্দাদির যোগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই জন্য ধর্ম্মকর্ম্মের অনুরোধে তদ্ধর্ম্মী বাঙ্গালী জাতির ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দাদি কাজে কাজেই স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ যদি প্রধানতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী জাতির দেশ না হইত, তাহা হইলে, বাঙ্গালা ভাষাতে হয় ত একবারেই সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যাইত না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন যাহারা সংস্কৃতের অনুরাগী হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মী কিম্বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর বংশধর। এই যে ধর্ম্ম, জাতি বা বংশসম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের অনুরোধেই সংস্কৃত অনুরাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইয়াছে।

ধর্ম্মের সম্বন্ধ জন্য বাঙ্গালা ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দগুলি চলিয়াছে, সেগুলি বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষায় আর সংস্কৃত শব্দ থাকে কি না সন্দেহ। কথাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত, আমারও বুঝান উচিত; নহিলে গোল বাধিবে। আমাদের জাতির জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের আহার বিহার শয়ন উপবেশন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত। কাজে কাজেই যেখানে সেখানে যখন তখন শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের দহরম মহরম করিতে হয়। সুতরাং স্বচ্ছন্দেই সংস্কৃত শব্দ আমাদের বাক্যরচনায় স্থান লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা ভাষা কি কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরই ভাষা? তাহা ত নহে এখন এই বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মুসলমানে দশ আনা ছয় আনা হিস্যায় ভাগাভাগি ('হিস্যায়' কথাটা বানান করি কেমন করিয়া? স'য়ে 'য' ফলা দিলাম। ব-ফলা দেওয়া উচিত ছিল, না কি ডবল 'স' লেখা উচিত ছিল, নাকি 'হি'র পর ঃ দেওয়াই ভাল ছিল, স্থির করিতে পারিতেছি না।) যাউক। এই হিন্দু মুসলমানের দেশে বাঙ্গালা ভাষা কি হিন্দুরই ভাষা হইবে, না হিন্দু মুসলমানদ্বয়েরই ভাষা হইবে? আবার, বিষয় ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, মুসলমানের

বাঙ্গালা ভাষার দশ আনা রকম দখল করিয়া রাখিয়াছে। এখন লেখনী দ্বারা লিখি না কলমে লিখি; মসিদ্বারা লিপিকার্য্য সম্পন্ন হয়, না কলো কালী নীল কালী লাল কালী বায়লেট্‌ কালী চলে। সেহাই রোসনাইও চলে। ভূর্জ্জপত্র তালপত্র তেড়েটপত্র গাঢাকা দিয়াছে—লিখিতে হয় কাগজে। নিদর্শনপত্র 'দ' এখন নাই; দলিল দস্তাবেজ সর্ব্বত্র। খতপত্রমিদং, তমঃসুক-পত্রমিদং, খোষকোবলা পত্রমিদং সনন্দপত্রমিদং, পাট্টাপত্রমিদং, কবুলত বা কবুলিয়তপত্রমিদং; আজি কালি আবার উইল-পত্রমিদং, রসিদপত্রমিদং, এগ্রীমেণ্ট বা গিরীমেণ্ট পত্রমিদং ইত্যাদি হরকছম পত্রমিদং, বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহার উপর কাছারি আছে, আফিস আছে, আমলা আছে, পেয়াদা আছে, আরদালি আছে, চাপরাসী আছে, দপ্তরি আছে, সেরেস্তা আছে, দপ্তর আছে, দপ্তরখানা প্রভৃতি কতখানা আছে; মহাফেজ আছে, সেরেস্তাদার আছে, পেষকার আছে, কেরাণী আছে, মহোরের বা মুহুরি আছে, জমিদার আছে, আসাবরদার আছে, সোঁটাবরদার আছে; দেওয়ান কারকুন নায়েব গোমস্তা পাইক সিপাহি চৌকীদার—সমস্তই মুসলমানদের দখলে আছে। খরিদ বিক্রী কেনাবেচা লেন দেন প্রভৃতি কোন কারবারই সংস্কৃত শব্দ সহযোগে হয় না।

অবস্থা হইল এই। তবে সংস্কৃত শব্দের বেলা সংস্কৃত ধাতু খুঁজিয়া কি উপকার হইবে? কতটুকুই বা উপকার হইবে? বাঙ্গালা ভাষায় যদি ধাতুর আমদানী করিতে হয়, প্রত্যয়ের আমদানী করিতে হয়, তবে সংস্কৃত ছাড়া অন্য অন্য ভাষায় শব্দগুলির ধাতু প্রত্যয় কোথায় খুঁজিয়া পাইব? কুলো, ডালা, ধুচুনী, ঢেঁকী, ঝাটা, বাড়ন, ঝুড়ো, ঝিঁড়ে, চাউল, ডাউল, বড়ি, শিল, নোড়া কুটনো, বাটনা, রান্না, প্রভৃতির খাঁটী বাঙ্গালা কথারই ধাতু কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আর যদি বা কেহ অতি দূর পূর্ব্ব-পুরুষের গোত্র ধরিয়া ধাতুরই আবিষ্কার করেন, তাহা হইলেও সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র কৃৎ-প্রত্যয় বা অন্য প্রত্যয় কেমন করিয়াই বা কোথায় লাগাইব? তবে যদি কেহ বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটী বাঙ্গলা ব্যাকরণ এক রকম তৈয়ার হউক; আর তদতিরিক্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ, আরবী ব্যাকরণ ফারসী ব্যাকরণ, উর্দ্দু, ব্যাকরণ, ইংরেজী ব্যাকরণগুলাও বাঙ্গালাভাষী অবশ্যই শিখুক; অধিকন্তু প্রাকৃত পৈশাচী মাগধী প্রভৃতির ব্যাকরণ বাঙ্গালাভাষী শিখুকই শিখুক, তাহা হইলে, এ সাধু প্রস্তাবের প্রতিবাদ আমি কখনই করিব না।

যাহা বলিলাম, অনেকে হয় ত তাহা পরিহাস মনে করিবেন; মনে করিয়া আমাকে উপহাসে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কৃত শব্দ লইতে গিয়াও বাঙ্গালাভাষী বাঙ্গালী সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃদন্ত আদি মানিয়া চলেন নাই। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সংস্কৃত শব্দে আর পদে যে প্রভেদ আছে, তাহা বলিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায়

কখন সংস্কৃত শব্দ কখন বা সংস্কৃত পদ যথেচ্ছাচারে বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্বস শব্দ নাই; কিন্তু বিদ্বান্ শব্দ আছে, বিদুষী শব্দ আছে। তাহার উপর সংস্কৃত বিভক্তিতে বাঙ্গালা বিভক্তি চাপাইয়া 'বিদ্বানের' 'বিদ্বানকে' প্রভৃতি হইয়া থাকে। মহারাজা শব্দ সংস্কৃত নহে; তথাপি বাঙ্গালা শব্দ বটে। এইরূপ কত কৃদন্ত শব্দ আর কত পদ লইয়াই যে কত গোল আছে, তাহার শুমার করা যায় না। 'শুমার' বলাটা কি নেহাত জুলুম হইল?

তবু কেহ পর্যটক লিখিলে আমাদের 'হিতবাদী' রাগ করেন। সংস্কৃত শব্দ লইতে হয়, না হয় তাহাই লও; ধাতু প্রত্যয়ের নূতন সম্পর্ক পাতাইয়া লোককে বিব্রত করা কেন? সংস্কৃত সাহিত্যে "পর্য্যাটক" শব্দ আছে কি না জানি না; কিন্তু বাচস্পত্য অভিধানে "পর্য্যাটক" শব্দ পাই নাই। এমন অবস্থায় ইতঃপূর্ব্বে দশ বিশ জন বাঙ্গালী যদি "পর্যটক" লিখিয়া থাকেন আর 'বঙ্গবাসী'র কোন লেখক যদি সেই বাঙ্গালীদের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে 'অট' ধাতুর উত্তর 'ণক' করিয়া 'ণিৎ' কার্য্যে আদি স্বরের বৃদ্ধির বিভীষিকা দেখান কি খুব ভাল কাজ?

ফল কথা, ধাতু প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ কৃদন্ত আদির বিচার বাঙ্গালা ভাষায় চলে না। দেব বাণীর অঙ্গাভরণ দেববাণীর দৈবী দেহেই শোভা পায়।

[অষ্টম পত্র (১)]

সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে ষ্ণিক, ঢেয় প্রভৃতি কতক গুলি প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই প্রত্যয়গুলির নাম তদ্ধিতে প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হইয়া থাকে; আর শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই তদ্ধিত প্রত্যয়ে সিদ্ধ শব্দগুলির উপর বিভক্তি যোগ করিলে, তখন সেই শব্দগুলি কারক-বচন-ব্যঞ্জক পদ হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম সংস্কৃত শব্দেই খাটে; সঙ্করের ভাষাতে এই নিয়ম খাটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা ভাষায় যে শব্দগুলি অবিকল সংস্কৃত শব্দ নয়, তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিধি সে শব্দগুলির সম্বন্ধে একেবারেই অকর্ম্মণ্য। দুই একটা উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝান যাইতেছে।

দশরথের পুত্র—এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত 'দাশরথি' শব্দ হয়। এইরূপ-অগ্নিশর্ম্মি, বার্ষ্ণি, বৈয়াসকি, যৌবতেয়, ভাগিনেয়, জামদগ্ন্য, দ্বৈমাতুর, মাতৃষ্বস্রীয়-স্ত্রৈণ, গ্রাম্য, মূর্দ্ধিক, নাগর, পৌনঃ পুনিক,বাহ্য, স্বামী,দন্তুর প্রভৃতি বহুতর শব্দই তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন। ইহার মধ্যে অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলে; অনেকগুলি বা চলে না। যে গুলি চলে না, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার আবশ্যক নাই। যে গুলি চলে,

(১) "বঙ্গবাসী"—২৬শে মাঘ, ১৩০২ সাল

সে গুলি বা তাহার মধ্যে অনেকগুলি শব্দ যে তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন,ইহা অনেকেই জানেন না; কিন্তু না জানিয়াও যথাস্থানে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন কি, আজি কালি বাঙ্গালা ভাষার লেখক বলিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক তদ্ধিতাদির তত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ অল্প পরিমাণে, কেহ অধিক পরিমাণে অজ্ঞ। তবু কাজ চলিয়া যাইতেছে। শুধু কাজ চলাই বা বলি কেন? সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলেও, অনেকের ভাগ্যে বাহবা যুটিয়া যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রকরণ না জানিলেও বাঙ্গালা ভাষায়, বোধ হয়, কিছু আসে যায় না।

এদিকে আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রকরণ জানিয়া, সংস্কৃতের শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে গেলে, হয় ত হাস্যাস্পদ হইতে হয়; আর না হয় বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালাভাষীরই বোধগম্য করিয়া তুলিতে হয়। এই দেখুন, ভগিনীর পুত্র ভাগিনেয়—সংস্কৃত তদ্ধিতের নিয়মানুসারে সিদ্ধ। ভগিনী শব্দ সংস্কৃত; তাই ভাগিনেয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পিসির পুত্র পৈসেয় হইবে না; মাসীর পুত্র মাসেয় হইবেন না। তদ্ধিতের কোন প্রত্যয়ই পিসি, মাসী প্রভৃতি খাঁটী বাঙ্গালা শব্দে লাগাইবার যো নাই।

খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণের তদ্ধিতপ্রকরণ কোন কাজে আসিল না; বাঙ্গালা ভাষায় ও অপরাপর ভাষায় যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহাদের সম্বন্ধে তদ্ধিতের বিধি খাটিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

শুধু, তাহাই নহে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলে, তাহাদের উপরও বাঙ্গালা ভাষায় তদ্ধিতপ্রত্যয় চালান চলে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। অধিকংশ স্থলেই চলে না, আমার এইরূপ ধারণা। জোর করিয়া চালাইতে গেলে, নিশ্চিতই অপ্রসিদ্ধি-দোষে রচনা দুষ্ট হইয়া পড়ে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় অবিকল ভাবে স্থান লাভ করিয়াছে, সে সকল শব্দ সম্বন্ধেই তদ্ধিতের প্রত্যয়গুলি যদি প্রয়োগের অনর্হই হয়, তাহা হইলে, বিকলাঙ্গ বা বিকৃত সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় তদ্ধিতের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও চলে। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত দুই চারিটী বিকলাঙ্গ বা বিকৃত সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করিলে, বোধ করি, কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। এই দেখুন,—সংস্কৃত 'ব্যবসায়' হইতে বাঙ্গালা ভাষায় 'ব্যবসা' শব্দ চলিত হইয়াছে। সংস্কৃতমূলক অথচ অবিকল সংস্কৃত নয়, এমন শব্দ যথা শ্রীমন্ত, গুণবন্ত, মহান্ত, জীয়ন্ত বা জীবন্ত প্রভৃতি বহুতর শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় আছে। ইহাদের উপর কি তদ্ধিত প্রত্যয় চলে? কখনই চলে না।

[illegible] তাহার পর তদ্ধিত প্রত্যয়

সম্বন্ধে আর বিস্তার করিবার আবশ্যক দেখি না। সংস্কৃত সমাস সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই, আমার বক্তব্যের একাংশের উপসংহার করিব।

সংস্কৃত সমাসের বিধি বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই খাটে না। বহুপদের একপদী-করণের নামই সমাস। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আদৌ পদের সহিত বিভক্তি-শূন্য শব্দের প্রায়শঃ পার্থক্য নাই। সংস্কৃতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন—এই তিন প্রকার বচন আছে। বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিবচন মোটেই নাই; একবচন বহুবচনের প্রয়োগ সম্বন্ধেও কোন বাঁধাবাঁধি নাই; অনেক স্থলে বাক্যের ভাবেই বচন বুঝিয়া লইতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় কারকের ব্যবস্থা স্ত্রীত্ব প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রভৃতিও সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বিধিবদ্ধ নহে। কেমন করিয়া তবে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত সমাস বিধির প্রয়োগ করা যাইতে পারে?

বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ অধিকার-রূপে প্রচলিত আছে, সেগুলিকে লইয়া কোথাও কোথাও সমাস বাঁধিলেও বাঁধা যায় বটে; কিন্তু সংস্কৃত শব্দে এবং সংস্কৃতেতর শব্দে ত সমাস করা চলিবে না। বর্ণ-সন্ধি প্রকরণ সম্বন্ধে যে সকল উৎ-পাতের আশঙ্কাস্থল দেখাইয়াছি, বাঙ্গালা ভাষার সমাস প্রকরণে ততোধিক উৎ-পাতের আশঙ্কা আছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণে ছয় প্রকার সমাস আছে। বাঙ্গালায় মোটে সমাস আছে কিনা, আর যদি থাকে ত, কত প্রকার সমাস আছে, কেহ তাহার নিশ্চয় করিয়াছেন কি? আমি ত জানি না।

বাঙ্গালা ভাষাতেও বোধ হয়, সমাসের কাজ করে, এমন কতকগুলি প্রয়োগ আছে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি, সে সকল প্রয়োগ সম্বন্ধে খাটে না, এইরূপ আমার মনে হইতেছে। উদাহরণ দেখুন। বাঙ্গালা ভাষায় একটা চলিত শব্দ আছে—ধামাধরা। বোধ করি, এটা সংস্কৃত বহুব্রীহিরই অনুরূপ প্রয়োগ।

কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিলে, মনে হইতেছে যেন ধামাধরা না হইয়া ধরাধাম হইয়া পড়ে। সংস্কৃতে বাক্য হইবে—ধরা হইয়াছে ধামা যৎকর্ত্তৃক; তাহা হইলেই সমস্ত পদটা ধামাধরা না হইয়া, ধরাধাম হইবে নাকি? এইরূপ হাঁড়িহাতে, ফেনচাটা প্রভৃতি বহুতর শব্দই মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাসবিধি খাটিতেছে কৈ?

আবার দেখুন, দিন-দিন, ঘরে ঘরে প্রভৃতি বহুতর প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় আছে। এ গুলিকে কি অব্যয়ীভাব সমাসের স্থল বলিয়া, মনে করিতে হইবে? অব্যয়ার্থ-বোধক এ গুলি বটে; কিন্তু সমাস করিবার সময়ে অব্যয় শব্দ লোপ করিয়া, কি এইরূপ প্রয়োগবিধি হইয়াছে? অর্থ ধরিতে গেলে সংস্কৃত প্রতিদিনং প্রতি গৃহং ইত্যাদি প্রয়োগের সঙ্গেই ইহাদের তুল্যার্থ দেখা যাইতেছে। দিনে-দিনে—অর্থ, প্রতি দিন;

প্রতি এই শব্দটী লোপ করিয়া কিদিনে-দিনে এই সমস্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে? আমি ত কিছু ঠাওরাইতে পারিতেছি না।

[নবম পত্র (১)]

সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন অংশই বাঙ্গালা ভাষায় খাটে না, ইহা দেখাইয়াছি। যাহা যাহা দেখাইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করা উচিত বোধ হইতেছে।

আদৌ সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গালা ভাষার লিখন-পঠনে সম্যক্ উপযোগী নহে। 'এডুকেশন গেজেটে'র একজন পত্রলেখক মনে করিয়াছিলেন যে, আমি আগমসম্মত শিবোক্ত বর্ণমালার সংস্কারবিধানে প্রয়াসী হইয়াছি। কেন তাঁহার মনে এমন আশ-ঙ্কার উদয় হইল, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাঁহার মনে যেমন আশঙ্কা হইয়াছে, অন্য কাহারও মনেও সেই অমূলক আশঙ্কার উদয় হইতে পারে বলিয়া, সংশয়ের সম্ভাবনা নিরাস করা আবশ্যক হইতেছে।

মনে রাখা উচিত যে, সংস্কৃত যেমন বাঙ্গালা ভাষা নহে; বাঙ্গলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, সংস্কৃত বর্ণমালাও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা নহে। বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নাই। সংস্কৃত বর্ণমালা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা ভাষার লিখন-পঠন হইয়া থাকে। হিন্দি ভাষারও নিজস্ব বর্ণমালা নাই; সংস্কৃত বর্ণমালা অবলম্বন করিয়া হিন্দিভাষারও লিখন পঠনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সংস্কৃত বর্ণমালা সংস্কৃত লিখিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। সংস্কৃত লিখিতে পড়িতে যতগুলি বর্ণের আবশ্যক; সংস্কৃত বর্ণমালায় ঠিক ততগুলি বর্ণই আছে। বেশীও নাই, কমও নাই। সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র। সংস্কৃত শব্দের যেমনটা উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাসে ঠিক তদনুরূপ উচ্চারণই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশী সংস্কৃতজ্ঞ মহাশয়েরা প্রায়ই সংস্কৃতের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া ফেলেন। এই জন্য সংস্কৃত না জানা লোকে বুঝিতে পারে না যে, সংস্কৃত বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ কি প্রকার।

আমি উচ্চারণে অনুরূপ বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী, ইহা স্বীকার করি। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে, সেই সকল শব্দের বানান করিতে সাধারণ বাঙ্গালীদের যথেচ্ছাচার দেখা যায় অর্থাৎ প্রায়ই সংস্কৃতের অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাস তাহারা করিতে পারে না। আবার বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে, সে সকল শব্দের বানানেও সর্ব্বত্রই যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার হেতু কি? হেতু এই যে, বাঙ্গালা ভাষার নিজের বর্ণমালা নাই। বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ বহুস্থলে সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অঙ্গীভূত হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রাভেদ, ন, ণ, শ, ষ, স-এর ভেদ বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ কালে

(১) "বঙ্গবাসী"—১১ই ফাল্গুন ১৩০২ সাল।

অঙ্গীকৃত হয় না। হিন্দিভাষাতেও সংস্কৃত বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উচ্চারণ বিষয়ে সংস্কৃত বর্ণমালার মর্য্যাদা সমধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়া থাকে।

আবার দেখুন, সংস্কৃত বর্ণমালা যে বাঙ্গালা ভাষার সম্যক্ উপযোগী নহে, তাহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়েই তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাঙ্গালা বর্ণমালায় নামমাত্র দুইটা 'ব' স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আকৃতি উচ্চারণ বিষয়ে দুইটাই ঠিক একই প্রকার। দুইটা 'ব'কারের একই মূর্ত্তি করাতে যদি কোন অপরাধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ণ, ন-এর একই মূর্ত্তি করিয়া দিলেই বা অপরাধ হইবে কেন?

বস্তুত আগমসম্মত শিবোক্ত বর্ণমালা বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা নহে। আগম-সম্মত শিবোক্ত বর্ণমালা সংস্কৃতেরই বর্ণমালা। তন্ত্রশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত নহে। এতদ্দেশপ্রচলিত তন্ত্র-গ্রন্থ সকলের অধিকাংশই অবিকল দেবনাগর অক্ষরে লিখিত নহে, ইহা সত্য; কিন্তু যে অক্ষরের দ্বারা তাহা লিখিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবনাগর অক্ষরেরই রূপান্তর মাত্র। দেশ-ভেদাদি নানা কারণে সুযোগ সৌকর্য্যাদির অনুরোধে লিপিকার্য্যের এপ্রকার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বঙ্গীয় বর্ণমালা বলিলে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা মনে করা সমীচীন নহে।

এখন বোধ করি, অনায়াসেই প্রতীত হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা সম্পূর্ণ-রূপে স্বতন্ত্র হইলেও তদ্ধেতু সংস্কৃত বর্ণমালার কিছুমাত্র সংস্কার সম্ভাবনা ঘটে না। সংস্কৃত তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রেরও কোন প্রকার গৌরবহানির শঙ্কা উপস্থিত হয় না।

এই সকল কারণবশতঃ আমি বলি যে, বাঙ্গালা ভাষায় যত প্রকার ধ্বনির ব্যবহার হয়, ঠিক ততগুলি এবং তদনুরূপ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হউক। কম থাকাও ভাল নহে; বেশী থাকিয়াও কাজ নাই। ফলতঃ সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী কখনই নহে। সংস্কৃত বর্ণমালাকে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা করিয়া রাখাতে কেবল যে বাঙ্গালা ভাষার লিখন-পঠনে নানাপ্রকার ব্যাঘাত এবং উৎপাত হইতেছে, তাহা নহে; সংস্কৃত শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে এবং মন্ত্রাদির উচ্চারণেও তজ্জন্য বহু বিঘ্ন হইতেছে। আমার মনে হয়, আমাদের উচ্চারণদোষে অনেক স্থলেই আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের হানি হইয়া থাকে।

বর্ণমালা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যান্য প্রকরণও বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতেতর অংশে অনুপযোগী, ইহাও আমি দেখাইয়াছি। আরও দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধিবিধি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্‌রূপে প্রতিপাল্য নহে। দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত ধাতু, সংস্কৃতের ক্রিয়ামূল বটে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেই সকল ধাতু কোন প্রকারেই ক্রিয়ামূল হইতে পারে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণে যেগুলি উপসর্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতে-

তর শব্দে তাহাদের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। সংস্কৃত বিভক্তি সুপ তিঙ্ বাঙ্গালা ভাষায় চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে অপর যে সমস্ত প্রত্যয় আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতেতর শব্দে তাহাদেরও প্রয়োগ সম্ভবে না। সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাসবিধিও বাঙ্গালা ভাষায় খাটে না।

অবস্থা ত এই। তবে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা দেখাইয়া লোককে বিব্রত করা কেন? বাঙ্গালা ভাষার বহুতর লেখক,—এমন কি অনেক গণ্যমান্য লেখকও—সংস্কৃত ব্যাকরণ জানেন না। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ থাকাই কি শ্রেয়স্কর নহে?

অতঃপর বাঙ্গালা ভাষার শব্দ এবং বাক্য-রচনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

[দশম পত্র (১)]

যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অন্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, মুখ্যার্থে তাহাকেই শব্দ বলা যায়। সুতরাং উচ্চারণের দ্বারাই শব্দের স্বরূপ জানিতে পারা যায়; লিপির দ্বারা শব্দের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। যাহাকে লিপি বলে, তাহা শব্দের স্মারক মাত্র। যে ধ্বনির উচ্চারণ করিলে, মনের ভাব ব্যক্ত হয়, লিপি অর্থাৎ লিখিত অক্ষরের দ্বারা তাহারই সঙ্কেত করা হইয়া থাকে। কথা কহিতেই শব্দের মুখ্য প্রয়োজন; লেখাপড়া কেবল কথা কহারই অনুকল্প।

ইদানী লেখাপড়ার বাহুল্য হইয়াছে; দিন দিন আরও হইতেছে। এই জন্য লেখাপড়ার গৌরব করিতে গিয়া, শব্দের স্বরূপের প্রতি অনেকেই লক্ষ্য করেন না। মুখ্য কল্প বিস্মৃত হইয়া, অনেকেই অনুকল্পের অতিমাত্র আদর করিয়া থাকেন। এই হেতুবশতঃ বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালা নাই বলিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত বর্ণমালা সম্যক্‌রূপে বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী নহে বলিয়াছি বলিয়া আমার উপর ক্রোধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতার্থে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ক্রোধের কারণ কিছুই নাই।

উপরে যাহা যাহা বলিলাম, তাহাতে এই তাৎপর্য্যের অনুভব করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় অবিকল বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ প্রায়ই চলে না এবং চলিতেও পারে না। সংস্কৃত শব্দের যে প্রকার উচ্চারণ, বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ সে প্রকার নহে। স্থানভেদে, কালভেদে এবং স্থান কালাধীন পাত্রভেদে উচ্চারণেরও ভেদ হয়। উচ্চারকের শব্দোচ্চারণ শুনিয়া অনায়াসেই তাহার স্থানাদির নিরূপণ করিতে পারা যায়। বহুবিস্তৃত দেশে উচ্চারণ বিষয়ে যে ঐক্য বা সাদৃশ্য পাওয়া যায়, গুরুপদেশই

(১) "বঙ্গবাসী" ২৫শে ফাল্গুন, ১৩০২ সাল।

তাহার প্রধান কারণ ; লিপিক্রিয়া তাহার কারণ নহে। কালক্রমে শুরুর পর শুরুর পরিবর্ত্তনে উচ্চারণেরও রূপান্তর ব্যভিচার বা বিকার ঘটিয়া উঠে। এই সকল কারণ বশতঃ বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে এখন চক্ষুর দ্বারা সংস্কৃত শব্দের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয় ; কর্ণের দ্বারা সে পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জন্যই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষায় অবিকল বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার প্রায়ই নাই। সংস্কৃত 'শশধর' শব্দ, কিম্বা 'বিশেষণ' শব্দ কিম্বা 'পাণিনি' শব্দ, কিম্বা 'গণেশ' শব্দ কিম্বা 'বিদ্যা' শব্দ কিম্বা 'বল' শব্দ, কিম্বা 'কৌশল' শব্দ, কিম্বা অন্য যে শব্দই ধর, বাঙ্গালীর মুখে নাই ; সুতরাং বাঙ্গালীর কাণেও প্রবেশ করে না ; বাঙ্গালী ছন্দো বন্ধনকারী ; সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ মানেন না, অমিত্রাক্ষরে মিত্রাক্ষর করিয়া যান। 'পণ' শব্দে আর 'ধন' শব্দে পদ্যে মিল হয়। বাঙ্গালী কবি সংস্কৃত উচ্চারণের ভেদ ভুলিয়া, স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালা ভাষাকে মনগড়া অলঙ্কার পরাইয়া দেন। বস্তুতঃ শব্দে বাঙ্গালীর দৃষ্টি নাই ; তবু বর্ণের দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি। প্রাণের ভাবনা বাঙ্গালী ভাবে না ; অথচ লাশ লইয়া টানাটানি করিতেও ছাড়ে না। কৌতুকের কথা বটে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে, যে ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ, তাহাকে চাক্ষুষ ভাষা বলাই যেন ঠিক।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী সর্ব্বদ্বারী হইয়াও, সকল দুয়ারে একই পদ্ধতি মানিয়া চলেন না। রেলের আধিপত্য হওয়াতে, এখন অনেক বাঙ্গালীর মুখে 'থুরু-ট্রেণ' এই কথাটা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজীতে ঐ এক 'থুরু' লিখিতে সাতটী অক্ষর লাগে—টি-এইচ্-আর-ও-ইউ-জি-এইচ্। বাঙ্গলায় লিখিবার সময় ত কেহ অক্ষরের বদলে অক্ষর বসাইয়া দেন না ; যেমনটী করিয়া লিখিলে, উচ্চারণে সাদৃশ্য থাকিবে, তেমনটী করিয়াই লিখেন। ইংরেজী শব্দের বেলায় যদি এই বিধি, তবে সংস্কৃত শব্দের বেলায় এই বিধি খাটে না কেন ?

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার প্রায়ই নাই। অতএব সংস্কৃত শব্দই যখন নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আসিয়া কোথায় বসিবে ? বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকারের কথা অলীক জল্পনামাত্র।

'এডুকেশন গেজেটে'র পত্রলেখক মহাশয় বলেন যে, "ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বর্ণমালা, ভাষা, ব্যাকরণ, যতই সংস্কৃতের অনুরূপ রাখিবার চেষ্টা হইবে, ততই হৃদয়ের পবিত্রতা এবং দেশ-হিতৈষিতা দেখান হইবে। ততই ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী থাকিবে—পরস্পরের বিপরীত পথ ধরিবে না। ততই আমরা সকলে যে আসলে এক, তাহার সকল নিদর্শনই বর্ত্তমান থাকিবে। প্রাদেশিক উচ্ছৃ-ঙ্খলতা দমনে থাকিবে।" কথাগুলি সারগর্ভ, তাহার সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষা

হিন্দুর ভাষা হউক, তাহাতে ত আমার আপত্তি নাইই; অধিকন্তু বাঙ্গালাভাষী মাত্রেই হিন্দুধর্ম্মের যথাসম্ভব অনুসরণ করুক, ইহাও আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু আমরা যে "আসলে এক" ইহা মনে করিয়া দিবে কিসে—শব্দে না অক্ষরে?

দক্ষিণ-ভারতবর্ষের তেলুগুভাষীরা এবং তামিলভাষীরাআমাদের অপেক্ষা কম 'হিন্দু' বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহাদের ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালা ত অবলম্বিত হয় নাই। আসল কথা এই যে, সংস্কৃতের কাজ বাঙ্গালা ভাষায় কখনও হইবে না—তাহা হইতেই পারে না।

হিন্দুসন্তান যদি জাতিধর্ম্ম বজায় রাখিতে চায়, তবে শ্রম করিয়া সংস্কৃত শিখা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল ধরিয়া কথা কহিতে হইলে, হিন্দু বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অনুকল্পমাত্র—দুধের বদলে ঘোল! তথাপি "আসলে এক" ঠিক রাখিবার নিমিত্ত আসলের যত কাছে কাছে থাকা যায়, ততই ভাল, ইহা আমি স্বীকার করি। বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ চলিত হউক, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। দশ জনে যত্ন করিয়া যদি কেবলই সংস্কৃত শব্দ অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার করিতে পারেন, ভাষান্তরের শব্দ যদি বাঙ্গালা ভাষা হইতে একেবারে দূরীকৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও সুখের বিষয় হয়। আর সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ গ্রহণ করিতে পারিলে ত সুখের ইয়ত্তাই থাকে না। কিন্তু উচ্চারণ ত আমরা লইতে পারিব না। তবে, অক্ষরের কঙ্কাল লইয়া মারামারি করা কেন?

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহুলতা হউক, ইহা আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু ইদানীং সংস্কৃত শব্দ লইয়া যে প্রকার উপদ্রব হইতেছে, তাহার নিবারণের উপায় সর্ব্বাগ্রেই করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ বিকৃত করিয়াই লউন আর বিকলাঙ্গ করিয়াই লউন, শব্দের অর্থটা ঠিক রাখা হউক, ইহা আমার বিনীত অনুরোধ। এই নিমিত্তই বাঙ্গলা ভাষায় অভিধান সঙ্কলন বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে মনোনিবেশ করিতে বলি।

ভাষার প্রমাণ গ্রন্থ না থাকিলে, সে ভাষা আদর পাইবার যোগ্য হয় না। অভিধানই ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বাঙ্গালা ভাষায় তেমন অভিধান কৈ? অভিধান জানিয়া বা অভিধান মানিয়া কয়জন লোক বাঙ্গালা ভাষায় কথা কন কিম্বা লেখেন বা পড়েন?

দেখিতে পাই, অনেকেই এখন শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী। অনেকেই জানেন না বা মানেন না যে, সংস্কৃত শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ বহুস্থলেই গ্রাহ্য নহে। প্রসিদ্ধ অর্থ জানিয়া সেই প্রসিদ্ধ অর্থে শব্দের ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অনেকে ইহা করেন না; অথচ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতেছে, উন্নতি হইতেছে, এইরূপ কহিয়া থাকেন, এইত আমার দুঃখ।

আরও এক উপদ্রব আছে। আজ কালি অনেকে সংস্কৃতের আকৃতিবিশিষ্ট অদ্ভুত বা উদ্ভট শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই সকল শব্দসৃষ্টি সম্বন্ধে আমার ঘোরতর আপত্তি করিবার কারণ আছে। যদি সংস্কৃত মূর্ত্তির দিকেই অনুরাগ থাকে, তবে সেই অনুরাগ আর একটু বাড়াইয়া যথার্থ সংস্কৃত শব্দের অন্বেষণ করাই ত ভাল। একে অভিধান নাই, তাহার উপর হাতগড়া সংস্কৃত শব্দ তৈয়ার করিয়া ভাষাকে বিড়ম্বিত করা কখনই ভাল নয়।

বাঙ্গালা ভাষাতেও সংস্কৃতের আদর থাকা আমাদের পক্ষে হিতজনক বটে; কিন্তু সে আদর করিতে বা রাখিতে গেলে, বাঙ্গালা লেখক মাত্রেরই সংস্কৃত শিখা আবশ্যক। এখন অনেকে মোটেই সংস্কৃত না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিয়া থাকেন। ইহাঁদের মূল শিক্ষা ইংরেজীতে হয়। সেই জন্য, বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া, ইহারা নানা প্রকারে যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান না হইলে, অথবা ভাল করিয়া সংস্কৃত না শিখিলে এ যথেচ্ছাচারের নিবৃত্তি কিছুতেই হইবে না। কিন্তু ভাল করিয়া সংস্কৃত শিখা শক্ত। এ জন্য বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সঙ্কলন করা বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার লেখককে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা দেখাইলে কোন লাভ হইবে না।

আমি একে স্বল্পবিদ্য; তাহার উপর আমার অবকাশ অল্প; আলস্য অতিশয়। নানা কারণে ভাষা বিষয়ে আমার অন্তঃকরণে নানা তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। সেই হেতুই আমি এই পত্রগুলি লিখিয়া,সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণকে ক্লেশ দিতে সাহস করিয়াছি। আমি সংস্কৃতের গৌরব হানি করিবার প্রয়াসী নহি, বরং গৌরব-বর্দ্ধনেরই ইচ্ছুক। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের গৌরবে গরীয়সী হউক, ইহাও আমার অভিপ্রেত। আর যে পন্থা অবলম্বন করিলে, সেই অভিপ্রায়ের সিদ্ধি হইতে পারে, তাহারই ইঙ্গিত করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই পত্রগুলি লিখিলাম। আমি আমাকে অভ্রান্ত মনে করি না; আমার বক্তব্যে ভ্রম প্রমাদ না থাকিলেই বরং আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে। সুধীগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমাশীল হইয়া, আমার ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া দিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

ভাষান্তরে বিড়ম্বনা (১)।

'সভ্যতা' এই শব্দটী আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় বহুলরূপেই প্রচলিত হইতেছে দেখা যায়। কিন্তু এই শব্দটার প্রয়োগ যে সুষ্ঠু হইতেছে, এমন আমার মনে হয় না। ইংরেজী সিবিলাইজেশন (civilisation) শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আধুনিক

(১) "বঙ্গবাসী"—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩ সাল।

'সভ্যতা' শব্দও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু 'সভ্যতা' শব্দের আধুনিক প্রয়োগ যেমনই কেন হউক না, ইহার মৌলিক অর্থ সেরূপ নয়। যিনি সভায় থাকেন বা সভায় থাকিবার যোগ্য, তাঁহাকেই সভ্য বলিতে পারা যায়; আর সভ্যতা বলিলে সভ্যের ভাব বা সভ্যের কর্ম্মই বুঝা যায়, ইংরেজী সিবিলাইজেশন শব্দে সভ্যতা অপেক্ষা ব্যাপক পদার্থই বুঝাইয়া থাকে। সভা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা অতি সংকীর্ণ। কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমষ্টিকে সভা বলা যায় না; সমগ্র জাতির সমষ্টিকে ত সভা বলা যায়ই না। কিন্তু সিবিলাইজেশন শব্দে সমগ্র জাতিটার উপরই লক্ষ্য থাকে। কাজে কাজেই 'সিবিলাইজেশন' শব্দের যতটা ব্যাপ্তি, 'সভ্যতা' শব্দের ব্যাপ্তি তাহার সহিত তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা হয়।

প্রাচীন সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, রোমীয় বা রোমান সভ্যতা, বিলাতী সভ্যতা ইত্যাদি প্রয়োগে সভার প্রতি কোন লক্ষ্যই থাকে না; লক্ষ্য থাকে জাতিবিশেষের তত্ত্বজ্ঞান, লোক-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতির সমষ্টির প্রতি। সভ্যতা শব্দের প্রয়োগে অন্তঃকরণে ইহা অপেক্ষা সংকীর্ণ ভাবের উদয় হয় না কি? অবশ্য পারিভাষিক করিয়া লইলে, সভ্যতা শব্দে যাহা বুঝাইতে ইচ্ছা, তাহাই বুঝানো যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, সভ্যতা শব্দের এই প্রয়োগ নিতান্ত আধুনিক। ইহার লক্ষণাদির নির্দ্দেশ করিয়া পারিভাষিক প্রয়োগও কেহ করেন নাই। ভাষান্তর করিবার দায়ে ইংরেজী বহুতর শব্দের বাঙ্গলা প্রতিরূপ যে প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সভ্যতা শব্দ লইয়া তাহাই হইয়াছে মাত্র। বাঙ্গালা লেখকেরা এই সম্বন্ধে বিচার করিয়া, সভ্যতা শব্দের এই প্রয়োগ বর্জ্জন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে, অনায়াসেই করিতে পারেন।

এই অর্থসূচক সভ্যতা শব্দের পরিবর্ত্তে অপর একটা শব্দের প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করি।॰ আমার অনুরোধ গ্রাহ্য কি না, সুধীগণ তাহার বিবেচনা করিলে, আমি কৃতার্থ হইব।

আমার বোধ হয় যে, সিবিলাইজেশন শব্দের যে অর্থ, আমাদের ধর্ম্ম শব্দের অর্থও প্রায় তদনুরূপ। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা-প্রাপ্ত, তাঁহারা ধর্ম্ম বলিলে রিলিজন্ (Religion) বুঝেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় ধর্ম্ম অপেক্ষা রিলিজনের ব্যাপ্তি ক্ষুদ্রতর। উপাসনা কাণ্ডের সহিত মানুষের যতটুকু সম্বন্ধ, রিলিজন্ বলিলে মুখ্যকল্পে তাহাই বুঝায়। অথচ আমাদের ধর্ম্ম শব্দের যাহা বাচ্য, উপাসনাকাণ্ডে তাহার পর্য্যবসান হয় না। আমাদের ধর্ম্ম শব্দের আমাদের তত্ত্বজ্ঞান, লোকনীতি, আচার ব্যবহার, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায়ের সমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে। অবস্থা যখন— এইরূপ, তখন, সিবিলাইজেশন শব্দের পরিবর্ত্তে সভ্যতা না বলিয়া, ধর্ম্ম বলিলে, ভাল হয় না কি? প্রাচীন ধর্ম্ম; পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, গ্রীক ধর্ম্ম; রোমীয় বা রোমান ধর্ম্ম; বিলাতী

ধর্ম্ম—ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ করিলে, অনায়াসেই ত প্রকৃতার্থের উপলব্ধি হইতে পারে। আর, রিলিজেনের পরিবর্ত্তে উপাসনা শব্দ বা তজ্জাত অন্য শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে।

কেবল যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগৌরব রক্ষার্থে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি, তাহা নহে। ইংরেজী শিক্ষার প্রবলতায় আমাদের বহুতর শব্দের ভাবান্তর ঘটাইয়া যে অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, তাহার প্রতিবিধানের উপায় করিলে লাভ আছে বলিয়াই, আমি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। আমরা যখন 'ধর্ম্ম' এই শব্দ প্রয়োগ করি, তখন ইংরেজীওয়ালারা প্রায়ই তাহার সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিস্তর মতভেদ বাদবিতণ্ডা প্রভৃতি অন্য বিড়ম্বনা সেই হেতুই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বলিলে ধর্ম্মের এক-দেশমাত্র গ্রহণ করিয়া, বহু ব্যক্তিই বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন কোন মহাশয় স্বচ্ছন্দেই বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ভাল, কিন্তু হিন্দুর আচার ব্যবহার নীতি মন্দ। কেহ বা বলেন, হিন্দুর আচার বা নীতি কোন কোন অংশে ভাল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মটা কিছু নয়; হিন্দু ধর্ম্ম ভ্রান্তিপূর্ণ, অলীক ইত্যাদি। এরূপ বলিবার সময়ে কিম্বা ভাবিবার সময়ে বক্তাদের ইহা মনে থাকে না যে, তাঁহারা যেটুকুকে ধর্ম্ম বলিতেছেন, তাহা ধর্ম্মের একাংশ বা একাঙ্গমাত্র। বক্তাদের ইহাও মনে থাকে না যে, ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গের সমষ্টিতে এক প্রকার একীনতা আছে। মনে থাকে না বলিয়াই কেহ এটুকু বজায় রাখিয়া ওটুকুর "সংস্কার" করিতে বলেন ; কেহ বা ওটুকু বজায় রাখিয়া সেটুকু "সংস্কার" করিতে বলেন। ফলতঃ এই হেতুতে একদেশদর্শিতার যে দোষ, তাহা প্রকটভাবেই ঘটিয়া থাকে।

কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর পান ভোজন শয়নাদি সকল ব্যাপারের সঙ্গেই হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। বস্তুতঃ হিন্দুর সমুদায় কায়িক বাচিক এবং মানসিক ব্যাপারের সমষ্টিকেই যে ধর্ম্ম বলা উচিত, ইহা তাঁহারা বুঝেন না।

প্রকৃত কথা এই যে, সকল বিধিনিষেধের মূলেই বিশেষ কোন তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতিসকলের মধ্যেও কর্ত্তব্য আর অকর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়া থাকে। সেই যে কর্ত্তব্যনিরূপণ বা অকর্ত্তব্যনিরূপণ, তাহারও মূলে তত্তজ্জাতীয় শিষ্টগণের সম্মত তত্ত্ব নিহিত থাকে। অমুক কর্ম্ম উচিত, অমুক কর্ম্ম উচিত নহে ; যিনিই প্রথম এ কথা বলেন, তিনি তখন অবশ্যই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ব্বাচনের হেতুভূত তত্ত্ব মানিয়া থাকেন। কেন কর্ত্তব্য, কেন অকর্ত্তব্য, ইহা তিনি বলিতে বাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে জাতি যে পরিমাণে সমাজের উৎপত্তি, স্থিতি এবং গতির মূল তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী, সেই পরিমাণে সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণেই সেই মূলতত্ত্বের সহিত

সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নশীল থাকে। হিন্দুজাতি স্বধর্ম্মোক্ত মূল-তত্ত্বে একান্ত শ্রদ্ধাশীল ; ইতর—জাতিগণ সে পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল নহে।

এই হেতুতে জাত্যন্তরের ভিতর ভাঙ্গাগড়া বেশী বেশী হইয়া থাকে ; হিন্দুর ভিতর হয় না। বিবি বেশান্ত হিন্দুর মূল তত্ত্বের সমীচীনতা বুঝিয়াছেন। তিনি স্বদেশে বিদেশে সেই তত্ত্বের প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। যদি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, ইউরোপীয় জাতিগণের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি, পান ভোজন, শয়নাদি সকল ব্যাপারেই মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। যে সিবি-লাইজেশন এখন ইউরোপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ধ্বংস হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু সিবিলাইজেশন বা হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণরূপে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অতএব 'ধর্ম্ম' শব্দে সিবিলাইজেশন বুঝাতে সকলেরই লাভ আছে। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুর ছেলে ধর্ম্ম আর সিবিলাইজেশন একার্থ বাচক বলিয়া বুঝিলে, বহু-তর ভ্রমজাল হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

সুধীগণ আমার অনুরোধের বিষয়ে বিবেচনা করিবেন কি ?

দেবী-বিসর্জ্জনে নিবেদন (১)।

অপরাজিতা পূজা করিলে, এবার তৃতীয় দিনে বিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহা সর্ব্ব-বাদি সম্মত। অপরাজিতা পূজা না করিলেই যত গোল।

এক পক্ষ বলিতেছেন যে, দুর্গাপূজা করিলেই অপরাজিতা পূজা করিতে হয়। অপরাজিতা পূজা সকলেরই কর্ত্তব্য। অপরাজিতা পূজা না করিলে, প্রত্যবায় আছে।

অন্য পক্ষ এমন কথা বলেন না যে, অপরাজিতা পূজা সকলকে করিতে নাই ; কিম্বা অপরাজিতা পূজা করিলে, কাহারও দোষ হইতে পারে। তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, অপরাজিতা পূজা কাম্য কর্ম্ম। অপরাজিতা পূজা করিলে ফল আছে ; অপরা-জিতা পূজা না করিলে, প্রত্যবায় নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে,—যাঁহারা দেবীপূজা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই যদি অপরাজিতা পূজা বাদ না দেন, তাহা হইলে, এবার সকল গোলই মিটিয়া যায়। পণ্ডিতগণের মধ্যে মতামতি থাকে না ; শাস্ত্র-সম্বন্ধেও কোন সংশয় উপস্থিত হয় না।

যাঁহারা তৃতীয় দিনে দেবী-বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে,

---

(১) সন ১৩০৭ সালে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজায় বিসর্জ্জন ব্যবস্থা লইয়া যে মতভেদ হয়, তদুপ-লক্ষেই ইহা লিখিত এবং "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চতুর্থ দিনে দশমীর মুহূর্ত্ত ভঙ্গ হওয়াতে, বিসর্জ্জন হইতেই পারে না; দেবী-বিসর্জ্জন-প্রকরণে রঘুনন্দন স্পষ্টাক্ষরে একথা বলেন নাই বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তব্যাপিনী দশমী না পাইলে, সেই খণ্ড-দশমীতে বিসর্জ্জন না করাই, রঘুনন্দনের অভিপ্রেত।

অন্য পক্ষ বলেন যে, ঐরূপ খণ্ড-দশমীতে বিসর্জ্জন হইতে পারে না, রঘুনন্দন এমন কথা ত বলেনই নাই; বরং তাঁহার লিখার ভঙ্গীতে বুঝা যায় যে, ঐরূপ খণ্ড-দশমীতে বিসর্জ্জন হইতে পারে, ইহাই রঘুনন্দনের ধারণা। ঐরূপ খণ্ডদশমীতে বিসর্জ্জন হইতে পারে, রঘুনন্দন স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলেন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার লিখন-ভঙ্গী দেখিয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ঐরূপ খণ্ড-দশমী, বিসর্জ্জন-বিষয়ে পর্য্যুদস্ত নহে। অর্থাৎ রঘুনন্দনের মতে ঐরূপ খণ্ড-দশমীতে বিসর্জ্জন সিদ্ধ হইবে।

এইখানেই গোল। উভয় পক্ষই স্বীকার করিতেছেন যে, উপস্থিত বিরোধে রঘুনন্দন স্পষ্টাক্ষরে কোন সিদ্ধান্তই করেন নাই, রঘুনন্দনের অভিপ্রায় অনুমান করিতে গিয়াই, মতামতি হইতেছে।

এমন স্থলে, অপরাজিতা পূজা করিলেই যখন সব গোল মিটিয়া যায়, পণ্ডিতদের মধ্যে মতামতি থাকে না, তখন সকলেই একমত হইয়া, সর্ব্বত্র অপরাজিতা পূজার ব্যবস্থা করুন না কেন? সকলের পক্ষে অপরাজিতা পূজা অবশ্য-কর্ত্তব্য হউক আর না হউক,—কর্ত্তব্য বটে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহা যদি হইল, তবে অপরাজিতা-পূজা করাই ত ভাল। অপরাজিতা পূজা করিলে ঐহিক পারমার্থিক ফল লাভ হয়;—শাস্ত্রার্থ-সম্বন্ধে সংশয় থাকে না;—পণ্ডিতবর্গের মতামতি লইয়াও দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় না।

অপরাজিতা পূজা করিয়াই, বিজয়া-যাত্রা করিতে হয়। ইহাও বোধ করি, সর্ব্ববাদিসম্মত। দুর্গা পূজার পরে বিজয়া-যাত্রার কথা প্রায় সকল লোকের মুখেই শুনা যায়। তবে, যিনি দুর্গাপূজা করিবেন, তিনি বিজয়কামী হইয়াও অপরাজিতা পূজা না করিবেন কেন?

আমরা জানি যে, অনেকের বুদ্ধিতে এইরূপ উদয় হয় যে, পূর্ব্বাবধি যাহা করি নাই, নূতন করিয়া তাহা করিব কেন? এরূপ আপত্তির কিছু অর্থ নাই। যাঁহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়, তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ নূতন করিয়াই ত দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লৌকিক অবস্থার উন্নতি হইলে, এখনও ত অনেকে নূতন করিয়া, দুর্গোৎসবাদি করিতেছেন। পূর্ব্ব-পুরুষের দুর্গোৎসবাদি ছিল না বলিয়া, নূতন আরম্ভ করিতে, কাহারও ত আপত্তি হইতে দেখা যায় না। অতএব আমরা অপরাজিতা পূজা পূর্ব্বে করি নাই, সেই জন্যে এখনও করিব না, এমন বলাও শোভা পায় না। কোন আকারে অপরাজিতা পূজা যাঁহাদের আছে,

তাঁহাদের ত কথাই নাই; যাঁহারা পূর্ব্বে অপরাজিতা পূজা করেন নাই, এখন হইতে তাঁহারাও অপরাজিতা পূজা করুন,—এই আমাদের অনুরোধ।

ভাটপাড়া-নিবাসী—অধুনা কাশীবাসী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন এবং নিজ বাটীতে এই অনুষ্ঠানই করিতেছেন, ইহা আমরা অবগত হইয়াছি। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তুল্য দেশমান্য প্রবীণ অধ্যাপক যাহা করিয়াছেন, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থিতানুরূপ কার্য্য করিতে, কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।

আস্তিক মাত্রেই অবগত আছেন, এখন পুনশ্চ স্মরণ করুন—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

আমরা বিষয়ী লোক। মহাজনের পন্থানুসরণ করিয়া, অপরাজিতা-পূজাই পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া, বিবেচনা করিতেছি।

পুরী-যাত্রীর কর (১)।

পুরুষোত্তম-যাত্রীর প্রতি কর বসাইয়া, সেই করের টাকায় শ্রীক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি করার একটা কথা উঠিয়াছে। অবশ্য গবরমেণ্টই কর বসাইবেন। গবরমেণ্টই আদায় করিবেন। গবরমেণ্টই শ্রীবৃদ্ধিও করিবেন। 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক এই প্রস্তাব শুনিয়া ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন।

প্রস্তাবটী ভাল বুঝিতে পারি নাই। কাজেই আপত্তি করা সঙ্গত কি না, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। লক্ষপতির কাছেও কেহ জোর করিয়া এক পয়সা লইলে, লক্ষপতিও তাহাতে আপত্তি করেন,—ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। এ হিসাবে যাত্রীর উপর কর বসিবে,—শুনিলেই প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে! কিন্তু সব সময় সকল বিষয়ে এমন আঁৎকাইলে চলে না,—আঁৎকানো উচিতও নয়। কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে,—সে আকারে শ্রীবৃদ্ধি করিতে,—আর সেই শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিতে গোড়ায় কত ব্যয় এবং ক্রমাগত কি পরিমাণ ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা আগে দেখিতে হয়।

শ্রীক্ষেত্রের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ

(১) "বঙ্গবাসী"—৪ঠা পৌষ, ১৩১০ সাল।

বঙ্গবাসী যদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সে বিবরণ 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশ করা উচিত। ব্যয় সম্বন্ধে কি অনুমান করা হইয়াছে, তাহাও 'বঙ্গবাসী'র প্রকাশ করা উচিত। যে শ্রীবৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা না করিলে কিছু ক্ষতি আছে কিনা, তাহাও দেখা আবশ্যক।

তাহার পর দেখিতে হয় যে, যাত্রীর উপর কর বসাইয়া এই টাকা সংগ্রহ করা ভাল ?—না,—কি অন্য উপায়ে অর্থাৎ আরও সুগমে এই টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে ?

যদি যাত্রীর উপর কর বসাইলে অর্থাৎ প্রত্যেক যাত্রীর কাছে আধ আনা,—কি এক আনা,—কি দুই আনা লইলেই সে শ্রীবৃদ্ধির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে, যাত্রীর উপর কর বসিতেছে—কেবল এই বলিয়া আপত্তির কারণ কিছু দেখিতেছি না। তবে আবশ্যক হইলে তিল কুড়াইয়া কাজ সারিতে পারিলেই ত ভাল। বিস্তর যাত্রীতে অতি অল্প অল্প দিয়া, যদি বিস্তর টাকার সংস্থান করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উপায় হিসাবে সেই টাকাইত ভাল। আর যাত্রীর কাছে কর লইলে, যাত্রীর ধর্ম্মহানি হয় না, —পরকাল নষ্টও হয় না। আমার মনে হয় যে, দুই চারি পয়সায় কোন যাত্রীরই কষ্টও হইতে পারে না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, যাত্রীর উপর কর বসাইবার চেষ্টা হইতেছে, কেবল এই ধুয়া ধরিয়া আপত্তি করাটা যেন ভাল নয়। কত টাকা আবশ্যক,—আর কেনই বা সে টাকা আবশ্যক, ইহাই বিশেষ করিয়া জানা সর্ব্বাগ্রে উচিত।

যদি অনাবশ্যক কাজে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব হয়, তাহা হইলে, প্রবল আপত্তি করা উচিত। আর যদি কাজটা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে টাকা ত তুলিতেই হইবে। টাকা তুলিতে হইলে, তখন ভাবিতে হয় যে, কি আকারে টাকা তুলিলে, লোকের কষ্টবোধ অল্প হইবে। আবার আবশ্যক ব্যয়ের সঙ্গে যে প্রকাণ্ড অপব্যয় হয়, তাহাতেও অবশ্য আপত্তি করা উচিত। গবরমেণ্ট-সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারেই প্রায় সর্ব্বগ্রাসী এষ্টাবলিশমেণ্ট—সরঞ্জামী খরচ থাকে। রোডসেস্ পবলিক-ওয়ার্ক-সেসের বোধ করি মুড়াও যায়,—পেটিও যায়; যাহারা রোডসেস-পবলিকসেস্ দেয় তাহারা লেজটাও ভাল করিয়া পায় না। দেশী বুদ্ধিতে এটা অপব্যয় বলিয়াই মনে হয়। যাত্রীর উপর কর বসাইয়াই হউক, আর বড় লোকের কাছে চাঁদা তুলিয়াই হউক, তোলা টাকার স্থুল অংশ যদি এরূপ অপব্যয় হয়, তাহা হইলে শ্রীক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধির বেলাতেও আপত্তি করা চলে। কিন্তু কোথায় কি কথা হইতেছে বা হইয়াছে তাহা কিছুই জানিলাম না,—অথচ আপত্তিই হইতেছে, এ ভাবটা আমার ভাল বোধ হয় না।।

আবার বলি, কি কাজের প্রস্তাব হইতেছে ? সে কাজের আবশ্যক কিনা ? যে নির্ব্বাহ করিতে যাত্রীর উপর কর না বসাইয়া, অন্য উপায় আছে কিনা ? আর যে

উপায় বেশী সুগম কিনা ? যদি যাত্রীর উপরে কর বসানই শ্রেষ্ঠ উপায় হয়, তাহা হইলে কর আদায়ের কিরূপ শৃঙ্খলা করিলে, যাত্রীদের মনোবেদনা কম হয়, আর যাত্রী ভিন্ন অপর লোকের উপর করপীড়া না হয়, এই সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া 'বঙ্গবাসী' যদি কথা কহে, তাহা হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব।

স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা (১)।

[১]

এখন এ দেশের বালকদের বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পরতন্ত্র। কেননা, সে শিক্ষা গবরমেণ্টের অধীন, গবরমেণ্টের ইচ্ছায় এবং গবরমেণ্টের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত। রাজা হিসাবে গবরমেণ্ট আমাদের পর নহেন। রাজার ও প্রজার একই স্বার্থ—একই প্রয়োজন। কিন্তু গবরমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার যাহাদের হাতে আছে, তাঁহারা আমাদের পর। প্রধান পুরুষেরা প্রায়ই বিলাতী। তাহারা পর ত বটেই; নিম্নতর কর্ম্মচারীরা আমাদেরই লোক হইলেও আমাদের পর। এই নিম্নতর কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা বা অধিকার কিছুই নাই। কেবল প্রধান পুরুষদের আজ্ঞা প্রতিপালন করাই ইহাদের কাজ। বিদেশী, বিভাসী প্রধান পুরুষেরাই গবরমেণ্টের মাথা বা বুদ্ধি। নিম্নতর কর্ম্মচারীরা গবরমেণ্টের হাত পা বা অস্ত্র মাত্র। ইহাতেই এখন আমরা শিক্ষা বিষয়ে পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি।

গবরমেণ্টের প্রধান পুরুষেরা এবং এদেশের প্রজাবর্গ যদি সর্ব্বপ্রকারে এক-ভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে এ পরতন্ত্রতায় তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু নানা কারণে এক ভাব নাই,—একীভাবের সম্ভাবনাও নাই। এদেশের প্রজাপুঞ্জ নানাভাগে বিভক্ত; —এদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমী হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে, মুসলমান আছে, পারসী আছে, খৃষ্টান আছে,—আরও কত কি আছে। এই সকল শ্রেণীতে পরস্পরে যে, কেবল অল্প স্বল্প মতভেদ আছে, তাহা নহে। ইহাদের মূলে এত ভেদ, বিশেষতঃ হিন্দুরা লৌকিক এবং পারলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এতই বিভিন্ন, যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে এই সকল শ্রেণীর পার্থক্য এবং পৃথক্ পৃথক সত্তা রক্ষা করাই সুদুষ্কর; রক্ষা করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বর্ণাশ্রমী হিন্দু, অন্য অন্য শ্রেণীর সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের নাই। অন্য অন্য শ্রেণীর ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও সুতরাং আমাদের নাই। অন্য অন্য শ্রেণীর ভাল মন্দ করিবার সামর্থ্যই বা আমাদের কেমন করিয়া থাকিতে পারে? অন্যে আমাদের ভাবনা ভাবিতে পারিবেন না। আমাদের ভাবনা আমরাই ভাবিতে পারি। এই কারণে পরতন্ত্র-শিক্ষায় আমাদের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে।

১) "বঙ্গবাসী"—৭ই মাঘ, ১৩১২ সাল।

গবরমেণ্ট কেবল্ আমাদের একা নহেন। গবরমেণ্ট যেমন আমাদের, তেমনই মুসলমানদের, খৃষ্টানদের,—সকলেরই গবরমেণ্ট। আর এই ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যেন বেঁধা-ফোঁড়া হইয়া রহিয়াছে; সকলেরই গায়ে গায়ে মেশামেশি করিয়া বাস; পরস্পরে বিস্তর লৌকিক ব্যবহারও চলিয়া আসিতেছে। কাজে কাজেই গবরমেণ্ট এক শ্রেণীকে ছাড়াইয়া আর এক শ্রেণীর জন্যে পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক শ্রেণীর ভাল মন্দ বুঝিবার কি ভাল মন্দ করিবার শক্তিও যদি গবরমেণ্টের থাকিত, তাহা হইলেও এ অবস্থায় গবরমেণ্ট পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর ভাল মন্দের পৃথক্ পৃথক্ উপায় বিধান করিতে পারিতেন না। কাজে কাজেই যেন দায়ে পড়িয়া গবরমেণ্ট নানা বিষয়ে উদাসীন। যে কোনও প্রকারে হউক, লোক রক্ষা এবং লৌকিক ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিলেই গবরমেণ্ট যেন কৃতার্থ। অথচ আমাদের অর্থাৎ বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের ধর্ম্মসূত্র প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, চতুর্থীতে মূলা, নবমীতে লাউ পর্য্যন্ত প্রসারিত। প্রায় আমাদের সকল অর্থ-কর্ম্মই, প্রায় সকল কাম-কর্ম্মই ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ। আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে, আমাদের কর্ম্ম সম্বন্ধে, আমাদের সমাজের গঠন সংস্থান সম্বন্ধে যে গবরমেণ্ট অজ্ঞ, সে গবরমেণ্টের অধিকার-আয়ত্ত এবং সে গবরমেণ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ব্যবস্থায় আমাদের কার্য্যসিদ্ধি, আমাদের আত্মরক্ষা হইবে কেমন করিয়া? পরতন্ত্রশিক্ষায় অন্যের যদি কুলায় কুলাউক—আমাদের কিন্তু কুলায় না।

ধর্ম্ম বলিলে আমরা যাহা বুঝি, অন্যে তাহা বুঝেন না। ধর্ম্ম বলিলে সাধারণ ভাবে লোকনীতি এবং কতকগুলি সদ্গুণই অন্যে বুঝিয়া থাকে। কিন্তু আমরা সে সাধারণ ভাবে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করিতেছি না। আমাদের ধর্ম্ম শব্দ পারিভাষিক। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মের যে পরিভাষা আছে, তাহাই আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করিতেছি। ধর্ম্মের এই পারিভাষিক অর্থ সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত। এ অর্থে বর্ণাশ্রমী হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কাহারও ধর্ম্ম নাই; ধর্ম্ম থাকিতেও পারে না। পাছে আমাদের কথা বুঝিতে গোল হয়, এই ভয়ে এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া বলিতে হইতেছে।

আমরা জানি, কিন্তু অন্যে জানে না,—সুতরাং মানে না যে, যে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মের ফলে একটী অদৃষ্ট জন্মে, সেই কর্ম্মই ধর্ম্ম। তবেই দেখ, আমাদের ধর্ম্ম মানিতে হইলে অদৃষ্ট মানিতে হয়। যিনি অদৃষ্ট বুঝেন না, তিনি ধর্ম্মও বুঝেন না। অথচ অদৃষ্ট মানিলেই জন্মান্তর মানিতে হয়। কেননা, এই দেহ যতকাল থাকে, সেই কালের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে দেখিতে পাই, তাহারই নাম দৃষ্ট। এই দেহ নাশের পরে এবং আর এক দেহ পাওয়া পর্য্যন্ত, এদেহে কৃত কোনও কর্ম্ম-বিশেষের ফলে, আমাদের আত্মাতে যে সংস্কার থাকিয়া যায়,—তাহারই নাম 'অদৃষ্ট'। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। অদৃষ্ট বুঝিতে হইলে, বুঝিতে হয়

এবং মানিতে হয়, যে, প্রতিপদ্ তিথিতে কুষ্মাণ্ড খাইলে আমাদের একটী দুরদৃষ্ট হয়, সে দুরদৃষ্টের ফল এদেহে ফলে না। সে দুরদৃষ্ট জন্মান্তরে বা দেহান্তরে ফলিয়া থাকে। তাহাতেই আমরা বলি যে,প্রতিপদ্ তিথিতে কুষ্মাণ্ড খাইলে অধর্ম্ম হয়।প্রতিপদ্ তিথিতে কুষ্মাণ্ড খাইলে কোনও দৃষ্ট ফল যে মন্দ হয়,—দৃষ্ট অনিষ্ট যে কিছু হয়, তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। অর্থাৎ প্রতিপদ্ তিথিতে কুষ্মাণ্ড খাইলে তাহা যে সুস্বাদ লাগে না, কিম্বা কুষ্মাণ্ড খাইলে কোনও পীড়া বা অশান্তি হয়, তাহা নহে;—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড খাইলে দৃষ্ট ফল যাহা হইবে হউক না কেন, জন্মান্তরে বা দেহান্তরে ঐ কুষ্মাণ্ড ভক্ষণই একটা দুঃখের কারণ স্বরূপে অদৃষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। এইরূপে সর্ব্বত্রই আমাদের শুভকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম শুভাদৃষ্টের জনক হইয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মেরই নাম ধর্ম্ম। আর, আমাদের যে অশুভ কর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম অশুভ অদৃষ্টের জনক হইয়া থাকে, সেই পাপ কর্ম্মের নামই অধর্ম্ম। জন্মান্তরে বা দেহান্তরে শুভাদৃষ্টই আমাদের সুখের কারণ হয় এবং দুরদৃষ্টই আমাদের দুঃখের কারণ হয়। কোন্ কর্ম্মের ফলে শুভাদৃষ্ট জন্মে, কোন্ কার্য্যের ফলেই বা দুরদৃষ্ট জন্মে, তাহা বেদ এবং বেদানুগত স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই বলিয়া দেন। বর্ণাশ্রমী হিন্দু-সন্তান মাত্রেই বেদকে এবং বেদানুগত শাস্ত্রসকলকে অভ্রান্ত এবং পরম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

আবার অদৃষ্ট এবং জন্মান্তর মানিতে হইলেই,—বেদ ও শাস্ত্রাদি মানিতে হইলেই —ভগবৎ সৃষ্ট বর্ণভেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সঙ্করাদি জাতিগত ভেদ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রমভেদ, সুতরাং আশ্রমভেদে কর্ম্মভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতেই হয়। আর মানিতে হয় দেবতা এবং মন্ত্র।

বিজাতীয়েরা বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তি মনে করিতে পারেন, মনে করিয়া মনে মনে উপহাসও করিতে পারেন যে, স্বতন্ত্র পরতন্ত্র শিক্ষার কথা কহিতে কহিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, অদৃষ্ট জন্মান্তর, বর্ণভেদ—আশ্রমভেদ, দেবতা-মন্ত্র—এ সব উৎপাত কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? ধান ভানিতে এ মহীপালের গীত কেন?

বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি যে, প্রসঙ্গের অনুরোধেই এ সব কথা তুলিতে হইয়াছে;— ইহা ধান ভানিতে মহীপালের গীত নহে। বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের গঠন সংস্থান বুঝিতে হইলে, ধর্ম্মও বুঝিতে হয়। ধর্ম্ম না বুঝিলে কিছুই বুঝা যায় না। আর ধর্ম্ম বুঝিতে হইলেই উপরে যাহা যাহা বলিলাম সবই বুঝিতে হয়।

এখন কথা হইতেছে, বর্ণাশ্রমী হিন্দু সন্তানের শিক্ষার কথা। যে শিক্ষা শিখিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা পায়, যে শিক্ষা না শিখিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যাঘাত বা বিনাশ হয়, সেই শিক্ষাই বর্ণাশ্রমী হিন্দু-সন্তানের উচিত শিক্ষা। সে শিক্ষার অভাব হইলে বর্ণাশ্রমী

হিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাইবে। আর বর্ণাশ্রমী হিন্দুই যদি না থাকিল, তাহা হইলে এই দুই দশ দিনের দুর্ভাবনা ভাবিবারই বা প্রয়োজন কি? তাহা হইলে, খাও দাও মজা মারো, ধরা পড়িতে না হয়, এই ভাবে যাহা খুসী করিয়া যাও, আর সংসারকে ঠকাইয়া যেন তেন প্রকারেণ বাহাদুরীর বাহবা লও, এই হইলেই ত যথেষ্ট, ফলে বর্ণাশ্রমী হিন্দুর বিনাশ নাই; সনাতন ধর্ম্মের লোপ কখনই হইবে না, ইহা আমরা জানি। তবে আমাদের চিত্ত দুর্ব্বল, তাই কখনও কখনও বুকের ভিতর গুর গুর করে বলিয়া এসব কথা তুলিতে হয়। আর, সুযোগের সুলক্ষণ দেখিলে সুকথা কহিবার প্রবৃত্তিও স্ফুরিত হইয়া উঠে। সে জন্যও সময় পাইলে এ সব কথা তুলিয়া থাকি।

নানা স্থানেই নানা জনে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, বর্ত্তমান পরতন্ত্র শিক্ষা-পদ্ধতিতে আমাদের পরম অমঙ্গল হইতেছে। অনেকেরই সাধ হইয়াছে যে, আমাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হউক। এ সাধ সাধিতে কল্পনা জল্পনাও হইতেছে। এ সময়ে যদি ঠিক পথ ধরিতে হয়, তবে কি প্রকার অনুষ্ঠান করিলে, কি উপায় অবলম্বন করিলে,—যে শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা হইতে পারে,—সে শিক্ষার ব্যবস্থা বিধান করা যাইতে পারে? বর্ণাশ্রমী হিন্দুর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, বর্ণাশ্রমী হিন্দুর অনুকূল ভাবেই ত তাহা করিতে হইবে। শিক্ষাতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, সেই 'স্ব'ত আগে চিনিতে হইবে, নহিলে আত্মরক্ষা, আত্মপুষ্টি,-আত্মোৎকর্ষ বুঝাই বা যাইবে কেমন করিয়া, করাই বা যাইবে কেমন করিয়া?

আমরা আপন ভাবনাই ভাবিতেছি। অন্যেও আপন আপন ভাবনা ভাবুন। কাহারও সহিত আমাদের বিবাদ নাই, বিরোধ নাই। আর আমাদের এমন সামর্থ্যও নাই যে, আপন ভাবনা সমস্ত ভাবিয়া লইয়া, পরের ভাবনা আমরা ভাবিতে পারি। অতএব বুঝা উচিত যে, কেবল স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা কল্পনা করিলে হইবে না; পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বজাতি-প্রেমিক মুসলমানেরা এ পক্ষে যত্নবান্ হইয়াছেন। খৃষ্টানেরা ত বদ্ধপরিকর আছেনই। এ অবস্থায় বিশেষরূপে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিশেষ করিয়া আমাদের ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। কি করিলে ধর্ম্মানুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, তাহাই আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে। কেননা, ধর্ম্মানুগত শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বতন্ত্র-শিক্ষা।

স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা (১)।

[২]

একটা রব উঠিয়াছে যে, আমাদের জাতীয় রীতিতে (On national lines) জাত্যুচিত (national) শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তম কথা, কিন্তু এই "আমাদের জাতি" বলিতে কোন্ জাতি বুঝিব? কোন্ জাতিই বা বুঝা উচিত?

হিন্দু শব্দে মূলে যাহা বুঝাইত, এখন তাহা বুঝায় না। সিন্ধু নদের এপারে যে দেশ, বিদেশীরা সেই দেশকে 'হিন্দু' বলিত। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষই বিদেশীর ভাষায় 'হিন্দু' নামে পরিচিত হইল। এই 'হিন্দু' দেশে যাহার বাস, সেই হিন্দু। ইহাই হিন্দু শব্দের মূল অর্থ। এ অর্থে ভারতবর্ষের অধিবাসী মাত্রেই হিন্দু,—ব্রাহ্মণাদি হিন্দু, সঙ্কর জাতিরাও হিন্দু, বৌদ্ধও হিন্দু, মুসলমানও হিন্দু, সকলেই হিন্দু। ক্রমে চতুর্বর্ণও ক্রমে এ অর্থের সঙ্কোচ হইয়াছে; হিন্দু বলিলে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত বুঝায়; কিন্তু মুসলমান ম্লেচ্ছাদি বুঝায় না। প্রয়োজন বুঝিয়াই শব্দার্থের এ সঙ্কোচ করিতে হইয়াছিল। অন্য অন্য জাতি হইতে খাঁটি হিন্দু এতই পৃথক্, এমনই স্বতন্ত্র যে, হিন্দু বলিলে হিন্দের অধিবাসি অন্য অন্য জাতিকে আর হিন্দু বলা চলিল না। কেবল বর্ণাশ্রমী হিন্দুই হিন্দু, অন্য কেহ আর হিন্দু নহে।

ইদানী এই 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উৎপাত ঘটিয়াছে। হিন্দুর সন্তান বটে, কিন্তু নিজে আর হিন্দু নহে, এমন কোনও কোনও ব্যক্তি হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়। একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান এদেশে বারিষ্টারি করিয়া, যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া এখন বিলাতে বাস করিতেছেন, বিলাতে নিজের বাড়ীও করিয়াছেন। শুনিতে পাই যে, ইনিও হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। এমনই, বিলাত গিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, সমাজচ্যুত হইয়াছেন, এমন ব্রাহ্মণ সন্তানও হিন্দু বলিয়াই নিজের পরিচয় দেন, এ উৎপাতের প্রতীকার হইবে কিনা জানি না; কিন্তু প্রতীকার হওয়া উচিত। যিনি বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র সমূহকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, যিনি অদৃষ্ট জন্মান্তর, জাতি-বর্ণ, দেবতা-মন্ত্র মানেন না, যিনি শাস্ত্রোক্ত শৌচ-আচার-উপাসনার বিরোধী, হয়, তাঁহার হিন্দু পরিচয় পরিত্যাগ করা উচিত, না হয়, যাঁহারা বর্ণাশ্রমী, তাঁহারাই হিন্দু নাম ছাড়িয়া দিউন। যাঁহারা বর্ণাশ্রমী,—তাঁহারা বর্ণাশ্রমী নামে আত্মপরিচয় দিলেই সর্ব্বাংশে ভাল হয়। যিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন না, তিনি তাহা হইলে এ নাম গ্রহণ করিবেন না, গ্রহণ করিতে পারিবেনও না। এখন যে রকম লোক হিন্দু-পরিচয় দিয়া, যে দুরভিসন্ধি সাধন করিতেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পরিচয়

(১) "বঙ্গবাসী"—১৪ই মাঘ, ১৩১২ সাল।

দিতে হইলে সে দুরভিসন্ধি-সাধনের সে সুবিধা আর পাইবেন না। কাটা-ছেঁড়া হইয়া গেলে, উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে।

বর্ণাশ্রমী হিন্দু এবং ভারতবাসী অন্য অন্য শ্রেণীর লোক যে, এক-জাতীয় নহে, ইহা নিশ্চয়। বর্ণাশ্রমীদের জাতি-বন্ধন বড়ই দৃঢ়। অন্যের জাতি-বন্ধন মোটেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথাটা ভাঙ্গিয়া বলা যাউক।

জাতি শব্দে জন্ম বুঝায়। অশ্বথে আর বটে যে ভেদ, আমে আর আমড়ায় যে ভেদ,—তাহা জাতিগত ভেদ। অশ্বথের বীজ হইতে অশ্বথ জন্মে, বটের বীজ হইতে বট জন্মে, আমের বীজ হইতে আম জন্মে, আমড়ার বীজ হইতে আমড়াই জন্মে। জন্মগত বা বীজগত এই ভেদ থাকাতেই, অশ্বথ, বট, আম, আমড়া ভিন্ন-জাতীয় বৃক্ষ। ব্যাপকভাবে ধরিলে বৃক্ষত্বই স্বতন্ত্র জাতি বটে; কিন্তু সে স্থলে পশু-পক্ষী এবং অন্য অন্য জন্তু হইতে বৃক্ষের ব্যাবৃত্তি করাই অভিপ্রেত। ব্যাপকভাবে ধরিলে মনুষ্য মাত্রেও এক জাতি বটে, কিন্তু এ প্রকার প্রয়োগের স্থলে মনুষ্য—পশু নহে, পক্ষী নহে, বৃক্ষ নহে, এই মাত্রই বুঝায়। মনুষ্যের ভিতর যে অবান্তর ভেদ আছে, তাহা বুঝায় না। অথচ বৃক্ষ জাতির মধ্যে অশ্বথ, বট আদি অবান্তর জাতি-ভেদ যেমন প্রকৃতিসিদ্ধ, মনুষ্যের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি-ভেদও তেমনই প্রকৃতিসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" অর্থাৎ শ্রীভগবানই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ভেদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অশ্বথ বটাদির ভেদ যেমন মানুষের কল্পিত নহে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ভেদও সেইরূপ, মানুষের কল্পিত নহে। বর্ণাশ্রমি-মাত্রেই এ কথায় বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করিতে বাধ্য। বর্ণাশ্রমি-মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, এই কলিকালেও ব্রাহ্মণের ঔরসে অর্থাৎ বীজে এবং ব্রাহ্মণী ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ জন্মিতে পারে, অন্যথা ব্রাহ্মণ জন্মিতে পারে না। তবেই দেখ, জনক জননীর পরস্পরের সম্বন্ধ ঘটাইতে কত বাছবিচার আবশ্যক। আমাদের বিবাহ এই বাছবিচারের মূলেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা জাতি ভেদ স্বীকার করি বলিয়া আমাদের ভিতর জনক জননী সম্বন্ধ স্থাপনে কতই সাবধান হইতে বাধ্য হই; আবার এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে দেবতার ও মন্ত্রের আশ্রয় ভিন্ন এ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই পারি না। এই কারণে আমরা বলি যে, দেবতা মন্ত্র বর্জ্জিয়া বিবাহই হইতে পারে না। সুতরাং কেবল বর্ণাশ্রমীদেরই বিবাহ আছে, অন্য কাহারও বিবাহ নাই।

এইবার বুঝিয়া দেখ যে, "আমাদের জাতীয়" কিম্বা "জাতীয়" কিম্বা "স্বজাতীয়"—ইত্যাদি ঘটিত শব্দের প্রয়োগ হইলে, আমরাই বা কি বুঝি এবং অন্যেই বা কি বুঝে। জাত্যভিমান রক্ষা করিতে হইলে, জাতি জ্ঞানের পুষ্টি সাধন করিতে হইলে, আমরা আমাদের এই জাতি বুঝিব? না কি, যাহা বুঝিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, একেবারেই জাতি হারাইতে হয়, তাহাই বুঝিব?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "যাঁহারা "জাতীয় শিক্ষা," "জাতীয় বিদ্যালয়" ইত্যাকার তান তুলিয়াছেন, তাঁহারা অন্যত্র হউক না হউক কলিকাতায় বটে—প্রায়শই জাতি হারাইয়াছেন,—আর না হয় জাতি মানেন না। অথচ ইঁহারা বলিতেছেন "জাতীয় রীতিতে জাত্যুচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই সকল অগ্রণীদের হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিম্বা বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়াছে,—এমন প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নাই, তাহাতেই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতেছি। মানুষও সর্ব্বত্রই মানুষ, মানুষ হিসাবে মানুষ সর্ব্বত্র একই জাতি। তাহা যদি হইল, তবে, 'জাতীয়' 'জাত্যুচিত' ইত্যাদি শব্দে কি বুঝিব? যদি মানুষী রীতিতে, মানুষোচিত সাধারণ শিক্ষা ইঁহাদের অভিপ্রেত হয়, আমাদের সাধারণ জাতিরক্ষা ইঁহাদের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে 'জাতীয়' 'জাত্যুচিত' ইত্যাদি বিশেষণের প্রয়োগ ইঁহারা করিতেছেন কেন? প্রচ্ছন্নভাবে কৌশলে, বর্ণাশ্রমীদের জাতি নাশ করিতেই কি ইঁহারা ইচ্ছুক!

যদি স্বজাতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, স্বজাত্য রক্ষা যদি সংকল্পিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় রীতিতে জাত্যুচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এখন দেখা যাউক, জাত্যুচিতই বা কি, আর জাতীয় রীতিই বা কি।

আমরা বর্ণভেদ মানি এবং এই বর্ণভেদ যে জাতিগত বা জন্মাগত, তাহাও মানি। আমাদের এই অসাধারণ জাতিবোধের ফলে অন্য অন্য মনুষ্যের সহিত আমাদের কর্ম্মগত অতএব শিক্ষাগত কি কি ভেদ হয়, তাহা নিরন্তর স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। নতুবা সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গিয়া কুশিক্ষারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ভাল ত হইবেই না; বরং আরও বিভ্রাট ঘটিবে।

শিক্ষা বলিলে কর্ম্মশিক্ষাই বুঝিতে হয়। সুখলাভার্থে বা দুঃখ-প্রতিকারার্থে আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি। যে কর্ম্ম করিলে সুখলাভের সম্ভাবনা, যে কর্ম্ম করিলে দুঃখবারণের সম্ভাবনা, সেই সেই কর্ম্ম চিনিতেই এবং সেই সেই কর্ম্ম করিতেই শিক্ষার প্রয়োজন। কর্ম্মও তিন প্রকার,—যাহা এই স্থূল দেহ দ্বারা করা যায়, সেই কর্ম্মই কায়িক কর্ম্ম; যাহা বাক্‌যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা বাচিক কর্ম্ম; আর, যাহা মনে মনেই অর্থাৎ চিন্তা মাত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা মানস কর্ম্ম। অতএব কাহাকেও শিখাইতে হইলে, চিন্তার বিষয় এবং চিন্তার পদ্ধতি শিখাইতে হয়; বাক্যের বিষয় এবং বাক্য কথনের পদ্ধতি শিখাইতে হয়; কায-নিষ্পাদ্য বিষয় এবং তাহা নিষ্পাদনের পদ্ধতি শিখাইতে হয়! কোন্ মানস কর্ম্ম, কোন্ বাচিক কর্ম্ম, কোন্ কায়িক কর্ম্ম গ্রাহ্য বা কর্ত্তব্য এবং কোন্ মানস কর্ম্ম, কোন্ বাচিক কর্ম্ম, কোন্ কায়িক কর্ম্ম ত্যাজ্য বা অকর্ত্তব্য, তাহাই শিখাইতে হয়। ত্যাগ আর গ্রহণই কর্ম্ম; যাহা গ্রাহ্য, তাহা কর্ত্তব্য; যাহা ত্যাজ্য তাহা অকর্ত্তব্য।

কিন্তু সকল মানুষের গ্রাহ্য একই প্রকারের নহে; সকল মানুষের ত্যাজ্যও একই প্রকারের নহে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কর্ত্তব্যের অর্থাৎ কর্ম্মের ভেদ যত থাকুক আর না থাকুক, বর্ণাশ্রমীদের কর্ত্তব্যের আর অকর্ত্তব্যের বিশেষ ভেদ নিশ্চয়ই আছে। আবার বর্ণাশ্রমীদেরই মধ্যে কর্ম্মের এমন ভেদ আছে যে, যে কর্ম্ম ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য—শূদ্রের তাহা অকর্ত্তব্য, আবার শূদ্রের যাহা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের তাহাই অকর্ত্তব্য। ফলে, আবার এমন কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ত্তব্য, এমন কর্ম্মও আছে, যাহা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই অকর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ণাশ্রমী ভিন্ন অন্য মনুষ্যগণ এ বন্ধনের ভিতর আইসে না। বর্ণাশ্রমীদের সহিত অন্যের এই ভেদ কিসে হয়,—তাহাও বুঝিয়া রাখিতে হয়।

বলিয়াছি যে, সুখ দুঃখের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই মানুষে কর্ম্ম করে। এখন মানুষ মাত্রেই মনে করে যে, অর্থ ই সুখের কারণ আর কামই সুখের কারণ। এই নিমিত্তে সাধারণতঃ কর্ম্মও দুই শ্রেণীতে বা দুই বর্গে বিভক্ত; কতকগুলি কর্ম্ম অর্থবর্গে পড়ে,—সেগুলি অর্থ-কর্ম্ম; কতকগুলি কর্ম্ম কামবর্গে পড়ে,—সেগুলি কাম কর্ম্ম। অর্থ শব্দে বুঝিতে হয় শরীর এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক সমুদায় বাহ্য বিষয়; আর, সন্তান জননাত্মক ব্যাপারকে কাম বলে।

বর্ণাশ্রমীই কি আর অন্যেই কি, সকল মানুষেই মনে করে যে, অর্থ ই সুখ-দুঃখের কারণ এবং কামই সুখ-দুঃখের কারণ। এই জন্যে কোন্ কর্ম্ম গ্রাহ্য আর কোন্ কর্ম্ম ত্যাজ্য, এ বিষয় বিচার করিতে হইলে, কিরূপ অর্থ-কর্ম্ম করিলে সুখ হইবে—দুঃখ ঘুচিবে, আর কিরূপ কাম-কর্ম্ম করিলেই বা সুখ হইবে—দুঃখ ঘুচিবে,—মানুষে তাহা বিবেচনা করে। এই বিবেচনার ফলে, যে নিয়মাদি সংস্থাপিত হয়, সমষ্টিতে সেই নিয়মাদির নাম—নীতি। যাহারা দ্বিবর্গ-সেবী অর্থাৎ অর্থ-সেবী এবং কর্ম্মসেবী, নীতিই তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামক। নীতিশাস্ত্র অপেক্ষা উচ্চতর শাস্ত্র তাহাদের নাই। আর এই নীতিশাস্ত্র মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত;—অর্থনীতি ও কামনীতি।

কিন্তু বর্ণাশ্রমীরা ত্রিবর্গসেবী। ইহাদের কর্ম্ম, অর্থবর্গেও পড়ে, কামবর্গেও পড়ে, কিন্তু তদতিরিক্ত বিস্তর কর্ম্ম, ধর্ম্মবর্গেরও অন্তর্গত। অধিকন্তু, এই ত্রিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মেরই প্রাধান্য। বর্ণাশ্রমীর অর্থ-সেবা এবং কাম-সেবা, ধর্ম্মের অবিরোধে করিতে হয়।

সুতরাং বর্ণাশ্রমীর শিক্ষাও স্বতন্ত্র, আর শিক্ষার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্র-শিক্ষার কল্পনা (১)।

[৩]

যিনি বর্ণাশ্রমী, তিনি জানেন এবং মানেন যে, বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রই পরম প্রমাণ অর্থাৎ বেদ এবং বেদানুগত-শাস্ত্রে যে সকল উক্তি আছে, তাহা অভ্রান্ত সত্য। বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও সনাতন। বেদ কোনও ব্যক্তির কৃত নহেন, তাহাতেই বেদ অপৌরুষেয়। যিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর, বেদ তাঁহারও করা নহে। কল্পে কল্পে মহাপ্রলয়ের পর, প্রত্যেক সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা, প্রকৃতিতে প্রলীন বিশ্বসংসারের আবিষ্কার করেন, তখন বেদকেও স্মরণ করেন। ব্রহ্মা বেদের কর্ত্তা নহেন, বেদের স্মর্ত্তা মাত্র। চন্দ্র সূর্য্য যেমন সত্য, বেদও তেমনি সত্য। যতকাল পর্য্যন্ত সৃষ্টি থাকে অর্থাৎ যতকাল পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততকালই যেমন চন্দ্র সূর্য্য থাকেন, বেদও তেমনি থাকেন। তাহাতেই বলা হয় যে, বেদ অভ্রান্ত, সত্য, নিত্য এবং সনাতন। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, সে যেমন বলিতে পারে যে, দিবারাত্রির ভেদ মিথ্যা, চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা, রূপ বলিয়া কোন পদার্থই নাই, আলোক অন্ধকার বলিয়া তেজের ভাবাভাব নাই,—তেমনই যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত, সেও বলিতে পারে যে, বেদ মিথ্যা এবং বেদের উপদিষ্ট বর্ণাশ্রমাদিও মিথ্যা। কিন্তু অন্ধ দেখিতে পায় না বলিয়া, যাহা "আছে" তাহা "নাই" হয় না। অন্ধে দেখিতে পাউক আর নাই পাউক, যাহা 'নাই' তাহা নাই কিন্তু যাহা 'আছে' তাহা নিশ্চয়ই আছে। দুর্ভাগ্যের বশে বর্ণাশ্রমীর কুলে যাহার জন্ম হয় নাই, অথবা বর্ণাশ্রমীর কুলে জন্মলাভ হইলেও অধিকতর দুর্ভাগ্যের বশে যাহার জ্ঞানচক্ষু মোটেই ফোটে নাই, সে ব্যক্তি বেদের প্রমাণ্য স্বীকার করিতে না পারে, এমন কি, বেদের সত্ত্বাও অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া বেদ কখনও দুর্ব্বল হন না।

শ্রবণেন্দ্রিয়ই শব্দের প্রমাণ। যাহার শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, তাহারই শব্দজ্ঞান সম্ভবে, যাহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, তাহার শব্দজ্ঞান হইতে পারে না। স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বক্ই স্পর্শ জ্ঞানের প্রমাণ; দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুই রূপ জ্ঞানের প্রমাণ। রসনেন্দ্রিয় রসনাই কটুতিক্তাদি নানা রসজ্ঞানের প্রমাণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসাই গন্ধ জ্ঞানের প্রমাণ। এই পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে ব্যক্তির নাই, কিম্বা ইহার মধ্যে কোনও একটা বা একাধিক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রমাণ যাহার নাই, সেই সেই প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানও সে ব্যক্তির হইতে পারে না। তাহাতেই বলা গিয়া থাকে যে, যে কোনও বিষয়ের অনুভব বা জ্ঞানই কেন হউক না, বিনা প্রমাণে কোন জ্ঞান আদৌ হইতে পারে না। আমরা সংক্ষেপে বলিয়া থাকি যে, জ্ঞান মাত্রেই প্রমাণ সাপেক্ষ, অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণের অপেক্ষা রাখে এবং প্রমাণেরই অধীন।

---

(১) "বঙ্গবাসী"—২৮শে মাঘ, ১৩১২ সাল।

কিন্তু প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নহে। যে বস্তু প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে মাত্র তাহার সত্তাজ্ঞানও আমাদের হইয়া থাকে; তাহা আছে ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কখনও কখনও বস্তুর চিহ্ন মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তু-টাই আছে। ধূম অগ্নিরই চিহ্ন। কোনও স্থলে অগ্নি প্রত্যক্ষ না হইয়া ধূম মাত্র প্রত্যক্ষ হইলেও সে স্থলে অগ্নি আছে ইহা আমরা বুঝিতে পারি অর্থাৎ সে স্থলেও অগ্নিজ্ঞান আমাদের হয়। এখানে অগ্নিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদিও নাই, তথাপি আমরা অনুমানের দ্বারা অগ্নিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহাতে, প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনুমানের প্রামাণ্যও স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ যেমন এক প্রকার প্রমাণ, অনুমানও তেমনই আর এক প্রকার প্রমাণ।

প্রত্যক্ষে কুলায় না, অনুমানেও কুলায় না, অথচ আমাদের জ্ঞান হয়, এমন স্থলও আছে। এমন স্থল আছেই বা বলি কেন, এমন স্থলই সমধিক। কেবল অন্যের কথাই আমাদের অনেক জ্ঞানের প্রমাণ। কেহ বলিল যে, অমুক স্থানে অমুক পদার্থ আছে, কিম্বা অমুক স্থানে অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কথায় বিশ্বাস হইলে, সেই পদার্থ আছে, কিম্বা সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, এই জ্ঞান যখন আমাদের হয়, তখন তাহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা হইল? সেখানে প্রত্যক্ষও প্রমাণ নহে, অনুমানও প্রমাণ নহে। বক্তা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করাতে আমাদের সেই পদার্থজ্ঞান বা ঘটনা জ্ঞান হইল, সেই শব্দ মাত্রই সে স্থানে আমাদের প্রমাণ। বক্তার বাক্য অবগত হইবার পর, বক্তা সত্য বলিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা হয়ত নানা প্রকার অনু-মান করিয়া সিদ্ধান্ত করি যে, বক্তা সত্যই বলিয়াছে বটে; কিন্তু সে সকল অনুমান সেই পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের কিম্বা ঘটনা-বিষয়ক জ্ঞানের মূল প্রমাণ নহে। সে স্থলে শব্দই আমাদের জ্ঞানের প্রমাণ, অনুমানের দ্বারা সে জ্ঞান দৃঢ় হয় মাত্র।

বেদই বলিয়া দেন যে, আমরা বিধি নিষেধ মানিয়া কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে, একটি একটি কর্ম্মের ফলে আমাদের একটি একটি শুভাদৃষ্ট জন্মে; আবার বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করিলে সেই অধর্ম্মের ফলে আমাদের দুরদৃষ্ট হয়, সেই সেই অদৃষ্ট অনুসারেই আমরা জাতি লাভ করিয়া থাকি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র কি ম্লেচ্ছ, কি পশু, কি পক্ষী ইত্যাদি কুলে আমরা জন্মিয়া থাকি; সেই অদৃষ্ট অনুসারেই আমরা আয়ু পাইয়া থাকি; অধিকন্তু সেই অদৃষ্ট অনুসারেই আমাদের কর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়। বেদের শব্দ দ্বারা এই অদৃষ্ট জন্মান্তরের বিষয় জানিতে পারিয়া অনুমানের দ্বারা এই অদৃষ্ট জন্মান্তরের জ্ঞানকে আমরা দৃঢ় করিয়াও থাকি, কিন্তু বেদের শব্দই এই অদৃষ্ট জন্মান্তর জ্ঞানের মূল প্রমাণ।

বেদ যেমন অদৃষ্ট জন্মান্তর বলিয়া দেন, তেমনই সেই বেদই বলিয়া দেন যে, মানু-

যের ভিতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্করাদি বর্ণভেদ আছে, আর জাতি অনুসারে অর্থাৎ জন্ম অনুসারে ঐ বর্ণভেদ ঘটিয়া থাকে। কি প্রকার গুণভেদ থাকাতে বর্ণভেদ হয় এবং কোন্ কোন বর্ণের কি কি কর্ম্ম তাহাও বেদই বলিয়া দেন।

বেদ হইতে আমরা অদৃষ্ট-জন্মান্তরের জ্ঞান লাভ করি, জাতি-বর্ণের জ্ঞান লাভ করি; স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করি এবং ইহা ছাড়া আরও বহুতর বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। সেই বহুতর বিষয়ের মধ্যে একটী বিশেষ বিষয় এই যে, সাধারণ মনুষ্য, শারীরিক বল, তাপের বল, আলোকের বল, তাড়িতের বল প্রভৃতি লৌকিক শক্তির সাহায্যে নিজ নিজ অভিপ্রেত কার্য্য নিষ্পন্ন করে; বর্ণাশ্রমীরা তদতিরিক্ত অলৌকিক শক্তিরও সাহায্য পাইতে পারে এবং কর্ম্মবিশেষে সেই অলৌকিক শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল লৌকিক শক্তির সাহায্যে সে কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। এই অলৌকিক শক্তির নাম দেবতা এবং মন্ত্র। এক ভাবে বলিতে পারা যায় যে, দেবতা আর মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ; আবার অন্য ভাবে বলিতে হয় যে, মন্ত্র আর দেবতায় আকারে ভেদ থাকিলেও স্বরূপে কিছু ভেদ নাই। দেবতা এবং মন্ত্র দুই-ই এক।

এই সকল কথা যাহা বেদ বলেন, তাহা যে অভ্রান্ত সত্য—সে বিষয়ে বর্ণাশ্রমীর চিত্তে কোনও সংশয় থাকিতেই পারে না। আমাদের শ্লাঘার বিষয় এই যে, বেদের এই সকল আদেশ উপদেশের মধ্যে এমন একটীও আদেশ বা উপদেশ নাই, যাহা বিচারসহ নহে। প্রত্যেক আদেশই, প্রত্যেক উপদেশই, অনুমানের দ্বারা দৃঢ় এবং আরও অনুমানের দ্বারা দৃঢ়তর হইয়া থাকে। তুমি যত সূক্ষ্ম বিচারক্ষম হইবে, বেদের বাণী সম্বন্ধে তুমি ততই শ্রদ্ধা নিষ্ঠা স্থাপনের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে।

এই সকল কারণেই বর্ণাশ্রমীরা জানিতে পারেন এবং মানিয়া থাকেন যে, বেদই পরম প্রমাণ, বেদ অভ্রান্ত সত্য, বেদ নিত্য সনাতন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে এই বেদের তাৎপর্য্য অশেষ শাস্ত্রাকারে যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বর্ণাশ্রমীরা সেই সকল শাস্ত্রকেও বেদতুল্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

বর্ণাশ্রমীরা আরও জানেন যে, দেহযোগের পর দেহান্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে যে স্থানে যে যে কালে, যাহা ঘটে, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেই পারে না এবং নিজ নিজ পূর্ব্ব দশার ও উত্তর দশার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, শব্দ-প্রমাণের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তরও নাই। বেদ সেই শব্দ-প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে বর্ণাশ্রমী সেই বেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া আসিতেছেন, সেই বেদের পরীক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং অবনত মস্তকে মানিয়া লইয়াছেন যে, বেদ বাস্তবিকই পরম প্রমাণ, প্রকৃতপক্ষেই অভ্রান্ত।

কিন্তু বেদে সকল মনুষ্যের অধিকার নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সকল বর্ণাশ্রমীরও বেদে অধিকার নাই। বেদ-সেবার যোগ্যতা লাভ করিতে যে সৌভাগ্য আবশ্যক, তাহা অতি দুর্ল্লভ। এদিকে আবার যিনি অধিকারী, তিনি বেদের সেবা করিতে ব্যগ্র হইলেও বেদ তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন না; বেদ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, বেদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কেবল বর্ণাশ্রমীরই ব্যবস্থাপক; বেদ বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত মনুষ্যের ব্যবস্থাপক নহেন। এই সকল কারণেই বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে যে, বর্ণাশ্রম-সমাজ মনুষ্যের অন্য অন্য সমাজ হইতে পৃথক্ সমাজ এবং স্বতন্ত্র সমাজ; এ সমাজের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, কর্ম্ম স্বতন্ত্র, শিক্ষাও সুতরাং স্বতন্ত্র। এ সমাজের শিক্ষাবিধানে ধর্ম্মশিক্ষার প্রাধান্য যদি না থাকে, সামান্য অর্থনীতির এবং সামান্য কামনীতির আশ্রয় লইয়া যদি এ সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে কালক্রমে এ সমাজ অবশ্যই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। স্বল্পকালের কুশিক্ষার দোষে এ সমাজে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছে দেখিয়াই, যেন কোন অলক্ষ্য-শক্তি কৃপা-পরবশ হইয়া এখন হইতে সমাজকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা চতুর্দ্দিকেই শুভ-সঙ্কেত দেখিতে পাইতে-ছেন।

কিন্তু এ সমাজের সামাজিকেরা সকলে শুভ-সঙ্কেত দেখিতে পান না; কেহ হতাশ হইতেছেন, কেহ কেহ বা মূঢ় হইয়াছেন। যাঁহারা মূঢ়, তাঁহারা বিরোধীর মায়ায় মুগ্ধ হইতেছেন, পতিতের প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া আত্মহারা হইয়াছেন। ইঁহাদের দশা দেখিয়াই অনেক আত্ম-প্রেমিকও হতাশ হইতেছেন। "এই গেল, এই গেল, আর রক্ষা পায় না, আর রক্ষা পায় না" এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এ আর্ত্তনাদও ভাল। এই আর্ত্তনাদেই আত্মদৃষ্টির উদয় হইবে। এই আর্ত্তনাদে চৈতন্যের সঞ্চার সূচিত হইতেছে। বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সমাজ জাগিয়া উঠিতেছে। যতক্ষণ ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানীর যে দশা, অজ্ঞানেরও সেই দশা; ধনবন্তের যে দশা, দীনাতিদীনেরও সেই দশা; আরোগ্য-সম্পন্নের যে দশা, রোগার্ত্তেরও সেই দশা। যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখনই নিজের প্রকৃত পরিচয় চিত্ত-ভূমিতে জাগিয়া উঠে। আত্ম-পরিচয় জাগিলেই মানুষ প্রকৃতিস্থ হয়; আমরাও আবার প্রকৃতিস্থ হইব।

স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা (১)।

[৪]

বর্ণাশ্রমীর শিক্ষা বর্ণাশ্রম সমাজের উপযুক্ত হওয়াই উচিত। নহিলে বর্ণাশ্রম সমাজ রক্ষা পাইবে কেমন করিয়া? কিন্তু এ কথা কেহ ভাবিতেছেন কিনা, জানি না। ফলে, যদি বর্ণাশ্রম সমাজ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে এ ভাবনাও ভাবিতে হইবে।

বর্ণাশ্রমীর শিক্ষার ভার যদি সুদীর্ঘকাল পরের হাতে থাকে, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম সমাজের উৎসেদ হইবারই কথা। ফল কথা, বর্ণাশ্রম সমাজের গঠন, সংস্থান, ভাব এবং লক্ষ্য অন্য অন্য সমাজের গঠন, সংস্থান, ভাব এবং লক্ষ্য হইতে পৃথক্ বিধায় কেবল বিজ্ঞ বর্ণাশ্রমী মহাশয়েরাই এ সমাজের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারেন, অন্য সামাজিকেরা তাহা পারেন না; সে পক্ষে সন্দেহের স্থলমাত্র নাই।

পৃথিবীতে যত মনুষ্য-সমাজ আছে, তাহার মধ্যে বর্ণাশ্রম-সমাজই শ্রেষ্ঠ। সুখ-লাভের এবং দুঃখ-দূরীকরণের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে বর্ণাশ্রম সমাজের যে সুযোগ আছে, অন্য সমাজের তাহা নাই; অনাদি কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত এই বর্ণাশ্রম সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; অনন্তকাল এ সমাজ প্রতিষ্ঠিতই থাকিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ দেশান্তরে যে নূতন নূতন কত সমাজেরই অভ্যুদয় এবং কাল-ক্রমে বিলয় হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসে তাহার পরিচয় লও। পরিচয় লইলেই দেখিতে পাইবে যে, পৃথিবীতে যত সমাজ আছে, তাহার কোনও সমাজই বর্ণাশ্রম সমাজ অপেক্ষা প্রাচীন নহে। কোথাও বর্ণাশ্রম সমাজের অঙ্গ হীন হইয়াছে সত্য, কোথাও বা বর্ণাশ্রম-সমাজের বন্ধনের শৈথিল্য ঘটিয়াছে, তাহাও সত্য; দিন দিন যেন বর্ণাশ্রম-সমাজের শক্তিক্ষয় হইতেছে, ইহাও অস্বীকার করি না; কিন্তু বর্ণাশ্রম-সমাজ যে, অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে, ইহাও ত কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। বর্ণশ্রাম সমাজের এই স্থায়িত্বই বর্ণাশ্রম সমাজের শ্রেষ্ঠতার এক প্রধান নিদর্শন। যাহার যেমন সৌভাগ্য, তাহার তেমনই পরমায়ু হইয়া থাকে; জীবনধারণের মূলে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার না থাকিলে, দীর্ঘায়ুত্বলাভের সম্ভাবনাই থাকে না।

আমাদের এই বর্ণাশ্রম সমাজ কেবল যে সুচিরকাল বাচিয়া আছে, তাহা নহে, বিস্তর উপদ্রব, বিবিধ উৎপাত, অসংখ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াও যেমনকার, তেমনই সজীব রহিয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল, এ সমাজের রক্ষক রাজা নাই। তথাপি এ সমাজ অভিভাবক-শূন্য হইয়া, রাজ-আশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়াও,

(১) "বঙ্গবাসী"—৫ই ফাল্গুন, ১৩১২ সাল।

বিরুদ্ধাচারীর বিষমবেগ তাড়নায় তাড়িত হইয়াও, কালবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, আত্ম-গৌরবের বৈজয়ন্তী উড়াইতে ক্ষান্ত হয় নাই।

যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখিতে পান যে, এই বর্ণাশ্রম সমাজ কেমন মহাপ্রাণ, কেমন মহাবল, কেমন মহাপরাক্রম; কে এমন মূঢ় আছে যে, ইহা দেখিয়াও বিস্মিত না হয়? কে এমন অভাগ্য যে, ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে এই সনাতনের জয়োচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারে? বর্ণাশ্রম সমাজ শ্রেষ্ঠ,—কেননা, বয়সে এ সমাজ জ্যেষ্ঠ এবং এ সমাজের পরমায়ু অনন্ত। বর্ণামশ্র সমাজ শ্রেষ্ঠ,—কেননা, এ সমাজ আঘাত সহিয়াও তিষ্ঠিতে পারে; এসমাজের সহন-শক্তি অসীম।

কিন্তু শুধু বয়সে বড় বলিয়াই যে বর্ণাশ্রম সমাজ শ্রেষ্ঠ, বিস্তর সহিয়াও তিষ্ঠিয়া আছে বলিয়াই যে বর্ণাশ্রম সমাজ শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে। সুখের উপায়-সন্ধানে, সুখের উপকরণ-সংগ্রহে বর্ণাশ্রম সমাজ এ জগতে অসাধারণ। আর, অসাধারণ বলিয়াও শ্রেষ্ঠ। এমন নিরুপদ্রব, এমন সুধীর, এমন শান্ত সমাজ এ জগতে দ্বিতীয় নাই।

বড় দুঃখের কথা যে, বর্ণাশ্রমীর বংশেও দুই দশ জনের কপালে আগুন লাগিয়াছে, বুদ্ধিতেও বিষম বিকার ঘটিয়াছে। ইহারা মনে করে এবং মুখেও বলে যে, ইউরোপ আমাদের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে; জাপান যে জাপান, সেও আমাদের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখে কি যে, এই "উন্নতি" বাস্তবিক, না স্বপ্নমাত্র?

এখানে এ 'উন্নতি'র বিস্তারিত বিচার করিবার স্থল নয়। এ 'উন্নতি' বাস্তবিক উন্নতি কি না, সে পরীক্ষা করিতে হইলে পৃথক্ গ্রন্থ লিখিতে হয়। প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া সেই প্রমাণের পরীক্ষা করিবেন, এমন প্রবৃত্তি-সম্পন্ন, এমন অবসর-সম্পন্ন, আর এমন সামর্থ্য-সম্পন্ন কেহ আছেন কিনা,—না জানিলে পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেছি না। তথাপি ইঙ্গিতে দুই চারি কথা বলিতেছি। সমাজ-তত্ত্বের সমালোচনা করিতে কেহ যদি সমুৎসুক থাকেন, এই ইঙ্গিতেই তিনি অনেক আভাস পাইবেন।

জাপানের সামাজিক বিবরণ জানিবার সুযোগ আমি পাই নাই। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার সামাজিক অবস্থার প্রচুর প্রমাণ এখানে বসিয়া পাওয়া যায় এবং আমার মনে হয়, আমিও প্রচুর পরিমাণে তাহা পাইয়াছি। অতএব, 'উন্নতি'র কথা যাহা কহিব, তাহা ইউরোপ আমেরিকাকে অবলম্বন করিয়াই কহিব।

অগ্রসূচি, একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ইউরোপ আমেরিকার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 'উন্নতি' হইয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা একশত বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যা-

বিষয়ে ইউরোপ আমেরিকার যে অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় ঐ ঐ দেশে বিদ্যাবিষয়ে বিবিধ উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, এ বিদ্যা অপরা-বিদ্যা; মাত্র, কর্ম্মকার-কুম্ভকারের বিদ্যার সূক্ষ্মতর বিকাশ মাত্র। উহা পরা বিদ্যা নহে। উহাতে তত্তদ্‌দেশের সমাজের কল্যাণ ত হয়ই নাই, বরং বহুল পরিমাণে অকল্যাণেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। রুষিয়ায় আজি নরশোণিতের নদী বহিয়া যাইতেছে! কেন? সমগ্র ইউরোপ অষ্টপ্রহর আপাদ মস্তক অস্ত্রধারী হইয়া ভয়-চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেন? শ্রমীদের জন কতক প্রতিনিধি ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছে, আর তাহারই ফলে ইংলণ্ডের ধনি-সম্প্রদায়ের বুকের ভিতর যে ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতেছে, তিন হাজার ক্রোশ দূরে থাকিয়াও আমরা তাহা শুনিতে পাইতেছি। এ ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ কেন? যাহারা খাটিয়া মরিতেছে, তাহারা খাইতে পায় না; যাহারা লক্ষ্মীর আঁচল ধরিয়া কেবলই আব্দার করিতেছে, তাহারা হয় ত মণি-মাণিক্য ছড়াইয়াও ক্লান্ত হইতেছে না;—ইংলণ্ডে আমেরিকায়, ইউরোপের সর্ব্বত্র এই দৃশ্য দেখা যায়। কেন? ইংলণ্ডের মানুষও মানুষ, এখানকার মানুষও মানুষ। ইংলণ্ডের মানুষ দেখিলে এখানকার মানুষ ভয়ে জড়সড় হয় কেন? হিংস্র জন্তু দেখিলে নিরীহ প্রাণীর অন্তঃকরণে যে শঙ্কার উদয় হয়, একজন ইতর গোরাকে দেখিলে এখানকার মানুষের মনে সেইরূপ শঙ্কা হয় কেন?

যদি বল যে, রাজ-শক্তির প্রভাবে ইউরোপ বা ইংলণ্ড প্রবল, আর প্রজাশক্তির অভাবে আমরা দুর্ব্বল, তাহা হইলে এ সব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইবে না। বর্ণাশ্রমীর ভিতরেও ব্যক্তি-বিশেষে কাটাকাটি মারামারি করে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, দণ্ডিত হইয়া কারাগারে বদ্ধও হয়; কিন্তু তবুও বর্ণাশ্রমীর সাধারণ পরিচয় দিতে হইলে অকুতোভয়ে বলিতে পারা যায় যে, আজি এত অধোগতির দিনেও বর্ণাশ্রমিমাত্রেই সুশীল, শিষ্ট, সুধীর এবং শান্ত।

ম্লেচ্ছাদি সমাজের গঠন-বন্ধনে আর বর্ণাশ্রম সমাজের গঠন-বন্ধনে আকাশ-পাতাল ভেদ। এই জন্যেই এই দুই সমাজের লোকেদের প্রকৃতিতে, গুণে এবং আচারে ব্যবহারে এত ভেদ। বর্ণাশ্রমীরা বেদবিহিত আচারকে আশ্রয় করিয়া চলিয়া থাকেন, কিন্তু ম্লেচ্ছাদিরা সর্ব্বাচারবিহীন, গোখাদক এবং বেদের বিরুদ্ধভাষী ও বহুভাষী, সুতরাং তাহারা অত্যধিক পরিমাণে স্বেচ্ছাচারী। আমাদের সমাজে ধর্ম্মেরই প্রাধান্য। লোক-লোকান্তরের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে হয়;—আপাত সুখে উপেক্ষা করিয়া পরিণাম সুখের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদিগকে চলিতে হয়। ম্লেচ্ছাদি সমাজে সে পরিণাম-লক্ষ্য নাই, কাজে কাজেই ম্লেচ্ছাদির সমাজে উৎপাত উপদ্রব অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানে ব্রাহ্ম-

ণের আসন প্রতিষ্ঠিত,—ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু। অর্থে অনাদর করিতে, অর্থে উপেক্ষা করিতে, ব্রাহ্মণকে বংশ-পরম্পরাক্রমে শিখিতে হয় এবং অভ্যাস করিতে হয়; ইহার ফলে সমাজস্থ রাজস তামস লোকের সহিত ব্রাহ্মণের বিরোধ সম্ভাবনা কমিয়া যায়; অধিকন্তু ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে জীবন্ত আদর্শ দেখিয়া এবং সেই আদর্শে প্রকৃত ঐশ্বর্য্য, প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রকৃত বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া, ইতর সামাজিকেরা নত-মস্তক হয়, যথাসাধ্য দুরাকাঙ্ক্ষার দমন অভ্যাস করে; সুতরাং শান্তভাব, সুশীলতা বিনয় ঔদার্য্য এবং শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল এ সমাজের নিম্নতম স্তরেও নিয়ত পরিস্ফুত হইতে থাকে। শ্রীভগবান্, বেদ এবং ব্রাহ্মণই আমাদের সমাজের মূল, এই কারণেই আমাদের সমাজ নিরুপদ্রব।

ইউরোপ প্রভৃতি দেশের ম্লেচ্ছাদি সমাজে বেদ নাই, ব্রাহ্মণ নাই, ধর্ম্ম নাই। ম্লেচ্ছাদি সমাজে অর্থই সর্ব্বপ্রধান। আমাদের সমাজ-তত্ত্বের মূল দেখাইতে হইলে, আমরা ধর্ম্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি, কিন্তু ম্লেচ্ছাদি সমাজের মূলতত্ত্ব অর্থকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। আমরা অভিমান করিতে হইলেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধার্ম্মিকতার অভিমান করি; ম্লেচ্ছাদি সমাজ এ অভিমান করে না,—করিতে পারেও না। নাগরতাই * ম্লেচ্ছাদি সমাজের পরম পদ। সে সমাজে সন্তোষ নাই এবং সন্তোষ নিন্দারই বিষয় হয়। সে সমাজে আছে কেবল অর্থের নিমিত্ত দুরাকাঙ্ক্ষা, অনিবার্য্য অসীম বিষয়তৃষ্ণা, কাজে কাজেই সে সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান নাই, স্থান হইতেই পারে না; বণিক্‌বৃত্তি, বৈশ্যের আসন অপেক্ষা উচ্চতর আসনের কল্পনাই কেহ করিতে পারে না। এমন সমাজ উপদ্রব অশান্তির লীলা-ভূমি না হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত।

ম্লেচ্ছাদি-সমাজ দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারাই যে নিয়মিত, ম্লেচ্ছাদি-সমাজের শ্রেষ্ঠ সামাজিকেরাও তাহা অস্বীকার করেন না। অসমর্থের জয়, ক্ষীণের ক্ষয়—পশ্বাদি ইতর জন্তু এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। ম্লেচ্ছাদি-সমাজের শ্রেষ্ঠ সামাজিকেরাও অম্লানবদনে বলিয়া থাকে যে, যোগ্যের জয়, ক্ষীণের ক্ষয় (Survival of the fittest) মনুষ্য সমাজেরও নীতি বটে। তাহাই যদি হইল, তবে মানুষের সমাজে আর

---

* ইংরেজীতে (Civilisation) সিবিলাইজেশন বলে, আমি তাহাকেই 'নাগরতা' বলিতেছি। সিবিলাইজেশন শব্দের বাঙ্গালা করিতে প্রায়শই 'সভ্যতা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু এরূপ ভাষান্তর আমার পছন্দ হয় না। সভা বলিলে সভার যোগ্য বুঝায়; তাহারই ভাব বা কর্ম—সভ্যতা। সভার সঙ্গে সিবিলাইজেশনের কোনও সম্বন্ধ দেখি না, বরং নাগরতার সঙ্গে যথেষ্ট সম্বন্ধ দেখি। প্রথমতঃ অর্থাড়ম্বর লইয়াই নাগরতা, সিবিলাইজেশন শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলেও ঐ নাগরতাই আইসে, আর সিবিলাইজেশনের স্বরূপ বুঝিতে হইলেও, নাগর-সুলভ অর্থ-বিষয়ক আড়ম্বর বা উৎকর্ষ বুঝিতে হয়।

পশুর পালে প্রভেদ কি? ইতর প্রাণীদের ভিতর, যে পারে, সে অন্যকে ধরিয়া গ্রাস করে, সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, দায়ে পড়িয়া সে মরণেরই শরণ লয়। ম্লেচ্ছাদির সমাজেও ইহাই সর্ব্বজন-স্বীকৃত নীতি।

ম্লেচ্ছাদি-সমাজের সর্ব্বত্রই ধনীতে আর শ্রমীতে ঘোর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। শ্রমীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার জন্য ধনী সর্ব্বদাই ব্যগ্র। শ্রমী কিসে অহর্নিশ শ্রম করিবে, খাইতে না পাইয়াও খাটিবে, উপবাস করিতে না পারিলে মরিবে,—ধনী নিরন্তর এই ভাবনাই ভাবিতেছে, ইহারই বন্ধন বাঁধিতেছে। এদিকে শ্রমীও খাইতে না পাইয়া খড়্গহস্ত। পেটের দায়ে পাগল হইয়া ধনীর নিধন-সাধনের নিমিত্ত নিরন্তর কল্পনা করিতেছে। ইহারই ইংরেজি নাম, labour problem; বাঙ্গলায় প্রকাশ করিতে হইলে বলা যায় শ্রম-সমস্যা। ইহারই ফলে ম্লেচ্ছ-সমাজের শ্রমীদের নিয়ত ধর্ম্মঘট; আর, প্রহারের চোটে সেই ঘট-ভঙ্গ। Socialism, Convenion, Finianism, Nehilism, প্রভৃতি সামাজিক উপদ্রবের ভিন্ন ভিন্ন যে সকল আবির্ভাব দেখা যায়, তাহা ঐ শ্রম-সমস্যারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্টে এবার শ্রমীদের জনকতক প্রতিনিধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাহাতেই ইংলণ্ডে হুলস্থূল বাধিয়াছে। বর্ণাশ্রম সমাজে জন্মলাভ করিয়া যাঁহারা ইদানী রাজনীতির, অর্থনীতির এবং সমাজনীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে কি? শ্রম-সমস্যার ভীষণ ভাব তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় কি? ধর্ম্মের আর নাগরতার ফল-তারতম্য কিরূপ, তাহা দেখিবার চেষ্টা কেহ করেন কি?

কাল-দোষে আর কপাল-দোষে মূলের সে বর্ণাশ্রম সমাজ এখন আর নাই; এখন নাগরতা আসিয়া ধর্ম্মের উপর চাপিয়া পড়িয়াছে। আমাদের সমাজ-শিথিল হইয়াছে। অর্থের আর কামের কুহকে পড়িয়া অনেকেই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইতেছে, দিশাহারা হইয়া দৌড়িতেছে, আর পড়িতেছে; আবার উঠিয়া দৌড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া যাঁহারা সুধীর আত্মীয়, তাঁহারা অন্তরে ক্লেশ পাইতেছেন, কেহ বা আতঙ্কে উন্মত্তবৎ হইতেছেন, কেহ বা প্রতীকারের পন্থা চিন্তা করিতেছেন। বাস্তবিক যদি সাবধান হইতে হয়, তাহা হইলে সময় থাকিতে সাবধান হওয়াই উচিত। মনে হইতেছে যে সুযোগও বুঝি সমুপস্থিত।

যে স্ব-তন্ত্র শিক্ষার গুণে আমাদের সমাজে শান্তির সুধাধারা প্রবাহিত হইত, সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলেই আবার সুখী হইতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা ভিন্ন, সে সুখলাভের উপায়ান্তর নাই, ইহাও নিশ্চয়। আবার বর্ণাশ্রমের সুব্যবস্থায় আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে, আবার ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা-স্থাপন করিতে হইবে, আবার এ সমাজে সন্তোষ-ধর্ম্মের সদ্‌ব্রাহ্মণের পূজা যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সমাদর যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, এবং মর্য্যাদা যাহাতে

মানসে মুদ্রাঙ্কিতবৎ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইলে বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে; যেহেতু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বেরই অধীন।

স্বতন্ত্র-শিক্ষার কল্পনা (১)।

[৫]

প্রথম,—জীবিকানির্ব্বাহের শক্তিসংগ্রহ, দ্বিতীয়,—নিজের ও পরের মর্য্যাদাবোধ এবং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞান, শিক্ষার এই দুইটী উদ্দেশ্য। নিজের শরীররক্ষা এবং পরিজনগণের ভরণ-পোষণ জীবিকার অন্তর্গত। জীবিকার লক্ষ্য হইতেছে গ্রাস অর্থাৎ অন্নাদি, বাস অর্থাৎ গৃহাদি, আচ্ছাদন অর্থাৎ বস্ত্রাদি এবং যথাযোগ্যরূপ সামাজিক ব্যবহার নির্ব্বাহ। যাহার যেমন অবস্থা, তাহার অন্তঃকরণের ভাব যদি সেই অবস্থার অনুরূপ হয়, অন্যের অবস্থা বুঝিয়া চলিবার যোগ্যতা যদি হয়, আর সকল দশাতেই যদি চিত্তকে যথাসম্ভব প্রসন্ন রাখিবার সামর্থ্য জন্মে, তাহা হইলে মর্য্যাদা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মর্য্যাদা শব্দের মুখ্য বা মূল অর্থ,—সীমা। মর্য্যাদা শব্দের প্রয়োগ হইলে, অপর যে যে অর্থের উপলব্ধি হয়, সেই সকল অর্থে সর্ব্বত্রেই সীমাবুদ্ধি সংক্রান্ত থাকে।

আমরা বর্ণাশ্রমী। বর্ণভেদ অনুসারে, আশ্রমভেদ অনুসারে,—আমাদের মর্য্যাদা-ভেদ নানাপ্রকার। সে মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে, এবং সে মর্য্যাদা বুঝিয়া চলিতে হইলে, বিস্তর তত্ত্ব-কথা জানা আবশ্যক হয়, এবং নানাপ্রকার যম-নিয়ম অভ্যাস করিতে হয়। তবে, বর্ণাশ্রম সমাজের উপযুক্ত সামাজিক হইতে পারা যায়। অন্য সমাজে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ, সে আদর্শে আমাদের সমাজে কুলায় না। আমাদের সমাজে সামাজিকতা স্বতন্ত্র, মনুষ্যত্বও স্বতন্ত্র। শিক্ষাতেই এই মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; সামাজিকতাও শিক্ষারই ফল। এ সকল তত্ত্বের প্রতি যাঁহার বিশেষ দৃষ্টি নাই, শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করিতে পারিবেন না।

শিক্ষা সম্বন্ধে ইদানী যে সকল জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে, প্রধানতঃ জীবিকা বা ধনোপার্জ্জনই তাহার লক্ষ্য। সভ্যতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা প্রভৃতি গুণের দিকে লক্ষ্য যে একেবারেই থাকে না, তাহা নহে; কিন্তু যে লক্ষ্য থাকে, তাহা অবান্তর লক্ষ্য মাত্র, প্রধান লক্ষ্য নহে। জীবিকাই যেন শাঁস, আর সভ্যতার আবরণ যেন খোসা মাত্র। অন্য সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তির ভিতরটা যেমন হইবে হউক, তাহাতে তত আইসে যায়

---

(১) "বঙ্গবাসী"—১১শে ফাল্গুন, ১৩১২ সাল।

না, কিন্তু 'লেফাফা দুরস্ত' হওয়া বিশেষরূপেই আবশ্যক। কিন্তু এ কথার বিস্তার করিব না; কেননা, অন্য সমাজের দোষগুণের বিচার না করিয়াও, আমরা আমাদের সমাজের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিতে পারি।

আমরা বর্ণাশ্রমী। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররূপ জাতিভেদ আছে। জাতি অনুসারেই বর্ণ নিরূপিত হয় এবং বর্ণ অনুসারে শিক্ষাভেদও নিরূপিত আছে। বর্ণে বর্ণে এই শিক্ষাও দুই দুই ভাগে বিভক্ত; একভাগ ধর্ম্ম-শিক্ষা, মর্য্যাদা বোধাদি ইহা হইতেই হয়; অপর ভাগ জীবিকা শিক্ষা। শিক্ষার ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইলে, ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা তাহার পর। ধর্ম্মও এক প্রকার নহে; বর্ণভেদে ধর্ম্মভেদ হয়, আবার একই বর্ণের আশ্রম ভেদে ধর্ম্মভেদ হয়। ব্রাহ্মণের যাহা ধর্ম্ম, শূদ্রের তাহা ধর্ম্ম নহে; ব্রহ্মচারীর যাহা ধর্ম্ম, গৃহস্থের ধর্ম্ম তাহা নহে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আছে, শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পারে না। যাঁহারা এ সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহেন, এ সকল কথা তাঁহাদের জানা আবশ্যক, মানাও আবশ্যক। যাঁহারা আমাদের সমাজের ধ্বংস কামনা করেন, তাঁহারা সব কথা জানেন না। যদি জানেন ত বুঝেন না; বুঝেন না বলিয়া মানেন না; সুতরাং এ সমাজের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, তাঁহারা অধিকারীই হইতে পারেন না। সুবিধার কথা এই যে, সদ্ব্রাহ্মণের শিক্ষা সম্বন্ধে, সদ্ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ কস্মিনকালে ভার গ্রহণ করেন নাই, ভারগ্রহণ করিতে পারিবেন না, ভারগ্রহণ করিতেও চাহেন না। সদ্ব্রাহ্মণের শিক্ষার ভার সদ্ব্রাহ্মণের হস্তেই আছে এবং থাকিবে। আমাদের সমাজে শিক্ষা-সম্বন্ধে ব্রহ্মণদের অবনতি যে হয় নাই, এমন কথা বলিতে চাহি না। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, আমাদের সমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, মোটের উপর তাঁহাদেরও যেন ধর্ম্মহানি হইয়াছে এবং হইতেছে। ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা যেন ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। সমষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিদ্যা এবং তপস্যা দুই-ই ক্ষীণ হইতেছে, সমষ্টি বন্ধন শিথিল হইতেছে, সংহিত শক্তির ক্ষয় হইতেছে, বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্ন ভাবই যেন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এ অনিষ্টের প্রতিবিধান আবশ্যক বটে; কিন্তু অন্যকে সে উপায়বিধানের চিন্তা করিতে হইবে না;—ভগবৎপ্রসাদে আশা করা যায় যে, ব্রাহ্মণেরাই ইহার প্রতিবিধান করিবেন।

শৌচাচারসম্পন্ন, উপাসনাপরায়ণ, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ হইলেও নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এখনও স্ববৃত্তিস্থ, এই জন্যই শ্রেষ্ঠ; বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা স্ববৃত্তিচ্যুত, এই জন্যই নিকৃষ্ট। বৃত্তিদোষে এবং সংসর্গদোষে ইহাঁদের ধর্ম্মশিক্ষা নিতান্তই ক্ষীণ হইয়াছে। অদৃষ্ট অনুসারে জন্মান্তর-লাভ. অদৃষ্টেরই ফলে জাতি-আয়ু-ভোগ. উক্তজন্মের কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ বিধি-নিষেধের

পালন লক্ষ্যানুসারে নূতন নূতন অদৃষ্টের সঞ্চার। জাতিভেদ-অনুসারে বর্ণভেদ, দেবতা-মন্ত্ররূপ অলৌকিক শক্তির সত্তা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের জ্ঞাতব্য সামান্য সামান্য কথাও জানেন না, শুনিলে বুঝিতে পারেন না, কিম্বা বুঝেন না, এবং না বুঝিয়াই মানেন না,—এমন দুর্ভাগ্য বিষয়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান আজি কালি বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষয়ী ব্রাহ্মাণদের নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে, স্বরূপ বর্ণন করাই আমার অভিপ্রায়।

দুর্ভাগ্যবশে বিষয়ী ব্রাহ্মণদের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতেছি, দোষ দর্শাইবার অভিসন্ধিতে কিছু বলিতেছি না। কিন্তু যে কারণেই হউক, বিষয়ী ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্যের যে বিশেষ হানি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ হইবার কথা। ব্রাহ্মণের শিক্ষার ব্যবস্থা গবরমেণ্ট কিছুই করেন নাই, করিতে পারিবেনও না।

পঞ্চম বর্ষীয় বিষয়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান ইস্কুলে যাইতে আরম্ভ করে, সেখানে আর যাহা শিখিবে শিখুক, না শিখিবে না শিখুক, ব্রাহ্মণের শিক্ষা কিছুই শিখিতে পায় না; গৃহে পিতা-মাতার নিকটে গুরুজনের নিকটে কিছু শিখিবার সুযোগও পায় না, অবসরও পায় না। কেননা ইস্কুলের পড়ার অন্য দোষগুণ যাহা থাকিবে থাকুক, মোটের উপর চাপ এত অধিক যে, ইস্কুলের পড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে মন দিতে সময়েই কুলায় না। ইহার উপর আরও দুই প্রকার উপসর্গ আছে। এক উপসর্গ এই যে, বালকের অভিভাবক স্বয়ং যেখানে এই কুশিক্ষা-বিকারে বিকৃত, সেখানে সুশিক্ষার দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনাই থাকে না। আর দ্বিতীয় উপসর্গ এই যে, বালকের অভিভাবক যদি নিজে কুশিক্ষা-গ্রস্ত না হইয়াও থাকেন, তথাপি তিনি বিষয়মোহে আচ্ছন্ন এবং অজ্ঞান; শাসনের অভাবে এরূপ অভিভাবক অর্থের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়েন। ধর্ম্মে তাঁহার বিরাগ হয়, অতি লোভের বশে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়েন, যাঁহার যেমন প্রারব্ধ, তাহার তেমন লাভালাভ হয়, ইহা তাঁহার মনেই পড়ে না, আর যদি বা মনে পড়ে, তাহা হইলে মনে ধরে না। জুয়া-খেলায় বসিয়া জুয়াড়ী যেমন জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, এক বাজী হারে, দুই বাজী হারে, দশ বাজী হারে, তবু তাহার চৈতন্য হয় না, সর্ব্বস্ব হারাইয়াও তাহার চৈতন্য হয় না,—তেমনই এই সকল অভিভাবকেরাও অচৈতন্য হইয়া থাকেন। লক্ষ বালক এ, বি, সি পড়ে; দশ হাজার বালক এনট্রান্স পরীক্ষা দেয়, তিন হাজার এল-এ দেয়, হাজার বি-এ দেয়, আর এক শতটী বি-এল পাশ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র অভিভাবকের মধ্যে কাহারই চৈতন্য হয় না; সকলেই এই মোহে মুগ্ধ যে, অন্য যত বালকই পাশ কাটাইয়া পড়ুক না কেন, আমারটী সিধা চলিয়া যাইবে, উকীল হইবে, মুন্সেফ হইবে, ডিপুটী হইবে,—হাইকোর্টের জজই বা না হইবে কেন? ষাট বৎসরে একটী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হয়, কিন্তু সে গণনা করে কে?

আপন শিশুতে একটী একটী গুরুদাস ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান না। পরকালের দিকে পিঠ ফিরাইয়া, চক্ষুর উপর আশার জাল বাঁধিয়া, এই অভিভাবকেরা ইহকাল পরকাল দুই-ই খোয়াইতেছেন, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারেন না। নিজের হিতাহিত মাত্র যিনি বুঝেন না, সমষ্টিরূপ সমাজের হিতাহিত তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? তিনি পাড়াপড়শির ভাবনা কেমন করিয়া ভাবিবেন? অগত্যাই সমাজ-বন্ধন শিথিল হইতে শিথিলতর হইতেছে। গোড়ায় বিশৃঙ্খল পরে উচ্ছৃঙ্খল আপনা-আপনিই ঘটিয়া উঠিতেছে। হয় ত এ অভিভাবকদের আর শিক্ষা হইবে না, কিন্তু বালকদের শিক্ষা আবশ্যক। যদি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে বালকদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করিতে হইবে।

কিন্তু এ ব্যবস্থা করিবে কে, তাহাই ভাবিতেছি। যাঁহারা ধনসম্পন্ন, তাঁহারাই এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশে অধুনা যাঁহারা বিপুল ধনসম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় সর্ব্বাংশে অজ্ঞানাপন্ন। তবে, আশার বিষয় এই যে, অনেকেরই এই অবস্থা হইলেও দুই চারি জনও এমন আছেন, যাঁহাদের কিছু ধনও আছে, আর সৌভাগ্য-ক্রমে কিছু কিছু জ্ঞানও আছে। সত্য বটে, ভগবানই ভরসা, কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় দুই চারি জনের ভরসাও যে না করা যায়, এমন নহে।

এই বঙ্গভূমিতে সম্প্রতি বিষয়ী ব্রাহ্মণ-সন্তানদের কিছু কিছু ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই বহুল পরিমাণে দুশ্চিন্তা অপনীত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ একবার দাঁড়াইয়া উঠিলে অন্য বর্ণের জন্যে বিশেষ ভাবনা ভাবিতে হইবে না; মাথা উঠিলে বুক আপনি উঠে।

ব্রাহ্মণ-সন্তানকেও সম্প্রতি ধর্ম্মের প্রগাঢ় উপদেশ দিতে হইবে না। সামান্য গুটিকতক তত্ত্ব-কথা অবশ্য সকলকেই শিখাইতে হইবে। আর শিখাইতে হইবে,—শৌচাশৌচের জ্ঞান, কর্ম্মাধিকার রক্ষা, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবোধ, আর করণীয় উপাসনা।

স্ব-তন্ত্র শিক্ষার কল্পনা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষার ধর্ম্মাংশের বিশেষ বিরোধী। অন্যে পরে বা কথা, স্বয়ং শ্রীমান্ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অকুণ্ঠিত চিত্তে ছাবার অক্ষরে প্রচার করিয়াছেন যে,—"আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য রাখা উচিত। ছাত্রদিগকে আপন ধর্ম্মচর্চ্চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে।" রামেন্দ্রসুন্দর যে সে লোক নহেন। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান; জয়পতাকা উড়াইয়া এম-এ পাশ করার পর ষ্টুডেণ্টশিপ বৃত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; রিপণ কলেজের প্রিন্সিপাল স্বরূপে বোধ করি, তিনি সহস্র সহস্র বালকের শিক্ষাবিধাতা, কিন্তু তিনিই বলিতেছেন কিনা,—"আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য রাখা

উচিত।" আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের অর্থ,—ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আচরণ। রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন যে, সে বিষয়ে "সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য রাখা উচিত।" ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কিঞ্চিন্মাত্র আসক্তি বা অনুরাগ থাকে, রামেন্দ্র বাবুর মতে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। অথচ এই রামেন্দ্র বাবুই বলিতেছেন যে, ছাত্রদিগকে "আপন ধর্ম্মচর্চ্চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে।" ধর্ম্মচর্চ্চায় স্বাধীনতাও দিতে হইবে আবার সুযোগও দিতে হইবে। বালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, কেহ তাহার উপর কথাটী কহিতে পারিবে না; অথচ ধর্ম্মচর্চ্চায় "সুযোগ" দিতে হইবে। বালককে কেহ ধর্ম্ম শিখাইবে না; বালককে কেহ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে না; বালক বালক হইলেও স্বাধীন হইবে এবং স্বাধীন থাকিবে, ধর্ম্মবিষয়ে পরাধীন থাকিবে না; তবে রামেন্দ্রবাবুর মতে সুশিক্ষা হইবে। এ কথার উপর কোনও টীকা করা চলে না। কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর সদৃশ ব্যক্তি ধর্ম্মের উপর এমন খড়্গহস্ত হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অগত্যাই বিস্মিত হইতেছি।

রামেন্দ্র বাবু আমার পরিচিত। তিনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি ধর্ম্মের সঙ্গে কোনও পরিচয় করিয়াছেন? ধর্ম্মের পরিচয় কোনও দিন কি লইয়াছেন? শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ বিষয়ে কোনও দিন ধীরভাবে বিচার করিয়াছেন? না কি, ধর্ম্মের নামমাত্র শুনিয়াই, ধর্ম্মকে আততায়ী মনে করিয়া, বিনা বিচারেই ধর্ম্মকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন? রামেন্দ্র বাবুর বিস্তর পড়াশুনা আছে, তাহা আমি জানি, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের পড়াশুনা তাঁহার কিছু ঘটিয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। বাঁচিয়া থাকি ত, আলাপ করিয়া বুঝিয়া দেখিব। রামেন্দ্রবাবু কেবল আমার স্বজাতি নহেন, তিনি আমার স্বদেশী; তাঁহাকে ত সহজে ছাড়িতে পারিব না।

যাউক। আমাদের জাতীয় রীতিতে আমাদের জাত্যুচিত শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রেই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ বুঝুন আর না বুঝুন, আমাদের সমাজের গৌরব করিবার বিষয় বিস্তর আছে। বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, কেবল আমাদের সমাজ-গুরুরাই জানেন অন্য কেহ জানে না যে,—

> আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
> সামান্য-মেতৎ পশুভির্নরাণাম্,
> ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ
> ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশ্বাদিরও আছে; মানুষেরও আছে। বাষ্প যোগে রেলের উপর গাড়ী চালাইয়া, বিনা তারে সুদূর দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া, যাবতীয়

জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াও যদি আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের সুবিধা ছাড়া আর কিছু না করা যায়, তাহা হইলে এত করিয়াও মানুষ পশুরই প্রকারান্তর মাত্র হয়,—প্রকৃত পক্ষে মানুষ হইতে পারে না। পশুর যাহা নাই, যে অধিকারটুকু মানুষেরই আছে, যে বিশেষটুকু থাকাতে মানুষ মানুষ হয়, তাহা 'ধর্ম্ম'। পশুকে মানুষ করিবার উপায় চিন্তাও কেহ কেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মানুষকে পশু করিবার উপায় চিন্তা করিয়া স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ কথা এতকালে শুনিতেছি। ইহাই যদি স্বতন্ত্র শিক্ষা হয়, তাহা হইলে এমন স্বতন্ত্র শিক্ষার মস্তকে বজ্রাপাত হউক। এখন যে পরতন্ত্র শিক্ষা প্রচলিত আছে, বুঝিয়া দেখিলে, তাহাতে সান্ত্বনা লাভের স্থলও আছে। কিন্তু আমরা পৃথক্ হইয়া, স্বাধীন হইয়া যদি ধর্ম্মহীন স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে মনকে বুঝাইব কি বলিয়া?

বাস্তবিক শিক্ষার যন্ত্র পৃথক্ করিলে কিছু হইবে না, শিক্ষার তন্ত্রকেও পৃথক্ করিতে হইবে। আমাদের সমাজকে রক্ষা করিতেই হইবে, সেই জন্যই স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধর্ম্মের শরণাগত হইয়া আমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এই জন্যে ধর্ম্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিক্ষার বিধান করিতে হইবে।

স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা (১)।

[৬]

লোক-শিক্ষার দুইটী পন্থা বা উপায় আছে। এক উপায়,—দেখা শুনা; আর এক উপায়,—লেখা পড়া। সমাজে বাস করে বলিয়া, মানুষ মাত্রেই দেখিয়া শুনিয়া বিস্তর শিক্ষা করে। এ শিক্ষায় লিপির সাহায্য থাকে না বটে, অথচ ইহাই মূল শিক্ষা। সকল মানুষেই আগে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা পায়, তাহার উপর লেখা-পড়ার সাহায্যে কতক লোক আরও শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু কি স্বতন্ত্র শিক্ষার বিষয়ে, আর কি পরতন্ত্র শিক্ষার বিষয়ে,—যে কিছু আলোচনা হইয়া থাকে, সে আলোচনায় লেখা-পড়াই প্রধান লক্ষ্য। লেখা-পড়ার এ প্রাধান্যের কারণও আছে। সে কারণ এই যে গ্রন্থাদিতে একদিকে নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং বন্ধন অধিক পরিমাণে থাকে, আর একদিকে গ্রন্থাদিতে যে সকল মনের ভাব লিপিবদ্ধ হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়াতে পুরুষ পুরুষানুক্রমে নানাদেশে নানাজনের মনের উপর আধিপত্য করিবার সুযোগ পায়। যিনি যেমন লেখা-পড়া করিয়া শিক্ষালাভ করেন, প্রায়ই লেখা-পড়ার তারতম্য অনুসারে সমাজে তাঁহার তেমনই প্রতিপত্তি এবং পদমর্য্যাদাদির সম্ভাবনা হয়। যাঁহার

(১) "বঙ্গবাসী"—২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩২।

গ্রন্থাদির সাহায্যে সমধিক বিদ্যালাভ করেন, সমাজে তাঁহারাই 'ভদ্র' বলিয়া পরিগণিত হন এবং ইতর ব্যক্তির আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকেন। অতএব শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে, প্রধানতঃ লেখা-পড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আলোচনা করা আবশ্যক।

কিন্তু দেশভেদে ভাষাভেদ থাকাতে গ্রন্থাদিও সুতরাং নানা-ভাষায় রচিত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যে ভাষাতে সকল প্রকার অধ্যাত্ম-বিদ্যার গ্রন্থ এবং সকল প্রকার কলা-বিদ্যার গ্রন্থ থাকে, সেই ভাষাকেই সুসম্পন্ন বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলা যায় এবং সে দেশের সেই ভাষায় সেই দেশের লোকেই সমধিক উৎকর্ষ বা উন্নতি লাভ করিতে পারে।

ভাষা বিষয়ে বর্ণাশ্রমীদের উচ্চতর বা প্রধান আশ্রয় সংস্কৃত। মহৎকর্ম্মে সংস্কৃতই বর্ণাশ্রমীদের অবলম্বন, আর প্রাকৃত ভাষাতেই ইতর ব্যক্তির ইতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আর, ইতর ব্যক্তিদিগের সহিত ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও সেই প্রাকৃত ভাষা অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। এই কারণে বর্ণাশ্রমীদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয় ভাষারই চর্চ্চা করেন, ইতর ব্যক্তিরা কেবল প্রাকৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া লোক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, সাত আট শত বৎসর ধরিয়া এ দেশের রাজ্যভার মুসলমানদের হস্তে ছিল। তাহার পর এই দেড় শত বৎসর কাল এদেশের রাজ্য এবং বাণিজ্য ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। ইংরেজই এখন এ দেশের ক্ষত্রিয়; আবার ইংরেজই এখন এ দেশের বৈশ্য। কিন্তু ইংরেজ ত ম্লেচ্ছ, তাহাতেই ইংরেজ আমাদের ধর্ম্মের অধিকারী নন।

ইংরেজ আমাদের ধর্ম্ম জানেন না, কাজে কাজেই আমাদের ধর্ম্ম মানেনও না। ইংরেজের ধর্ম্ম না থাকাতে এবং অর্থই ইংরেজের প্রধান লক্ষ্য হওয়াতে, আমরাও দিন দিন ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছি এবং অর্থের উপাসনাই আমাদেরও চরম আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। যে কাল হইতে ধর্ম্মের আদর কমিয়া আসিতেছে এবং অর্থের আদর বাড়িয়া যাইতেছে, সেই কাল হইতে সংস্কৃতের আদর ক্রমে ক্রমে কমিতেছে এবং আমাদের কাছেও রাজভাষার আদর বাড়িতেছে, রক্ষকের অভাবে এবং প্রতিকূল কারণ সকলের প্রভাবে বর্ণাশ্রমসমাজ দিন দিন শিথিল এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে এখন আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি; অথচ অর্থের উপাসনা বিষয়েও আমরা উচ্চ হইতে পারি নাই। কেননা, ইংরেজ গবরমেণ্ট এবং ইংরেজ বণিকই অর্থের উপর আধিপত্য করিতেছেন আর অর্থ-দৈবত ম্লেচ্ছ প্রভৃতিরা অর্থের জন্য যে উৎকট যত্ন করিতে পারে, ধর্ম্মদৈবতের বংশধর আমরা, প্রাচীন সংস্কার বশে সে উৎকট যত্ন করিতে এখনও শিখি নাই। ইহার ফলে ক্ষুদ্রবৃত্তি আমাদের ভদ্রগণের উপজীব্য এবং উপাস্য হইয়াছে; আর, ইতর জন-

গণের অধিকারে কৃষি-কর্ম্মাদি সম্ম বৈশ্যবৃত্তি যাহা আছে, অগত্যা তাহারও অবনতি ঘটিতেছে। মনে রাখা উচিত যে, সমুদ্র যেমন নদ-নদী সকলের চরম গম্য, বাণিজ্যও কৃষির সেইরূপ গম্য। এখন বাণিজ্য প্রধানতঃ পরহস্তগত; সুতরাং আমাদের কৃষিও দুর্ব্বল এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, অর্থ-শাস্ত্রের অনুশাসিত অন্য অন্য কলাবিদ্যাও কৃষি-বাণিজ্যের অনুগামী।

আমরা বাঙ্গালী বর্ণাশ্রমী। আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছি এবং অজ্ঞতা-নিবন্ধন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে আমাদের উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা হইয়েছে, সুতরাং আমাদের বুদ্ধিতে সংস্কৃতের সমাদর থাকিতেছে না এবং সংস্কৃতের মর্য্যাদাও নষ্ট হইতেছে। এখন আমাদের ধর্ম্ম মলিন, অর্থ ক্ষীণ, চাকুরীই চরম লক্ষ্য, কাজে কাজেই আমাদের প্রকৃত ভাষা যে বাঙ্গালা,—তাহাও দৈন্য-দশাগ্রস্ত। ভাষার সেবা করিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি থাকিলে আমরা রাজ-ভাষারই সেবা করিয়া থাকি। সংস্কৃতের প্রয়োজন বুঝিতে পারি না, সংস্কৃতের গৌরব বুঝিব কেমন করিয়া? অল্প-স্বল্প অর্থ কর্ম্ম যাহা আমাদের হাতে আছে, তাহা অল্প-স্বল্প বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া যায়। কাজে-কাজেই আমাদেরও যেমন মলিন দশা, আমাদের ভাষারও তেমনই মলিন দশা।

বর্ণাশ্রমীর শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য;—প্রথম,—ধর্ম্ম-কর্ম্মে যোগ্যতা লাভ; দ্বিতীয়,—বৃত্তি, উপজীবিকা বা অর্থ-কর্ম্মে যোগ্যতা লাভ। বর্ণাশ্রমী ভিন্ন অন্য অন্য সকল মনুষ্যেরই শিক্ষার উদ্দেশ্য একমাত্র; বৃত্তি-শিক্ষাই সেই একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থ-কর্ম্মের ঊর্দ্ধে তাহাদের শিক্ষার গতি বা প্রসার নাই। অন্যের সঙ্গে আমাদের এই ভেদ; ইহা নিরন্তর স্মরণ রাখা আবশ্যক।

যদি আমাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, যদি আমাদের জাতি রক্ষা করিতে হয়, যদি আমাদের এই প্রাচীনতম সমাজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা হয়,—তাহা হইলে ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল অর্থ ভাবিলে চলিবে না। অগ্রে ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই হইবে, তাহার পর অর্থের উন্নতি চিন্তা করিতে হইবে। ম্লেচ্ছ কখনও বর্ণাশ্রমী হইতে পারে না, আমরা কিন্তু ম্লেচ্ছ হইতে পারি। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যদি ম্লেচ্ছত্ব স্বীকার করিয়া অর্থ-বিষয়ে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানও হই, তাহা হইলে সে প্রাধান্যও আমাদের গৌরবের সামগ্রী হইবে না, বরং আমাদের লজ্জার এবং খেদেরই কারণ হইবে। কেননা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আমাদের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। গৌরব করিতে হইলে, আমাদের প্রথম, প্রধান এবং অদ্বিতীয় গৌরব—ধর্ম্ম জন্য; আমাদের দৃষ্টিতে অর্থ অ-প্রধান, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অর্থাৎ নিম্ন পদবীর সামগ্রী।

তবেই আমাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, অগ্রে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা

াবশ্যক। ধর্ম্মশিক্ষা করিতে হইলেই সংস্কৃতের প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে ইবে। তাহার পর বৃত্তিশিক্ষার জন্যেও অর্থাৎ অর্থ-কর্ম্মের জন্যেও কোনও একটা ্যষার আশ্রয় লইতে হইবে। সে ভাষা কোন্ ভাষা ?

আমার ধারণা এই যে, সংস্কৃতে আমাদের অর্থ-কর্ম্ম সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না। র্থ-কর্ম্মের নিমিত্তে প্রাকৃত ভাষাই সম্যক্‌রূপে উপযোগী। কেননা, প্রাকৃত ভাষাতে দ্র এবং ইতর উভয় প্রকার লোকেরই সহজে অধিকার জন্মিয়া থাকে। এবং অর্থ-র্ম্মে ভদ্র এবং ইতর উভয় শ্রেণীর লোকেরই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবশ্যক য় এবং ঘটিয়া থাকে।

এখন, আমাদের অর্থ-রাজ্যে ইংরাজের আধিপত্য হওয়াতে, ইংরেজের ভাষার িকেই স্বভাবতঃ আমাদের উৎকট অনুরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বতন্ত্র শক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে, এ অনুরাগ কমাইতে হইবে। ইংরেজের সঙ্গে মামাদের এখনকার যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধই যে অনন্তকাল ব্যাপিয়া থাকিবে, ইহা নিশ্চয় রিয়া বলা যায় না। অল্পকাল মধ্যেই হউক বা দীর্ঘকাল পরেই হউক, এ সম্বন্ধ ছন্ন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধই যদি কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, াহা হইলেও এ দেশের আপামর সাধারণ লোক আপন ভাষা ছাড়িয়া দিয়া নির-চ্ছিন্ন ইংরেজী ভাষাই অবলম্বন করিবে ; এমন ত মনে হয় না। তবেই, অর্থ-শক্ষার নিমিত্তে, বাঙ্গালীর জন্যে, বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রবল এবং পুষ্ট করিয়া লইতে হইবে। পদে পদে যাহাকে পরমুখাপেক্ষা করিতে হয়, ছোট বড় সকল কাজেই যাহাকে পরের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়,—সে চিরদিনই পরাধীন থাকে, তাহার প্রকৃত উন্নতি কখনই হইতে পারে না। যত তত্ত্ব, যত উপদেশ, যত আবিষ্কার আছে, হইয়াছে এবং হইবে, তাহা শিখিবার নিমিত্তে যদি আমাদিগকে নিয়তই পরের দ্বারস্থ হইতে হয়, তাহা হইলে কোনও কাজেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না। বলিয়াছি যে, আপামর সাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা ছাড়িতে কি ভুলিতে পারিবে না। এই সঙ্গে আরও বলিতে চাহি যে, আপামর সাধারণ সকল বাঙ্গালীই দুইটা তিনটা ভাষাও শিখিয়া উঠিতে পারিবে না। বিশেষতঃ ইংরেজী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে নিঃসম্পর্ক বিদেশী ভাষা আপামর সাধারণ সকলের শিক্ষা করা অসম্ভব। এখন যাহারা সখ করিয়া বা দায়ে পড়িয়া ইংরেজী শিখিতেছে, তাহাদেরও ত ইংরেজীতে ভাল বিদ্যা হয় না। বিদ্যা ত বিদ্যা—ইংরেজী ভাষামাত্র শিখিতেই লোকের প্রাণান্ত হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখ না কেন, বাঙ্গালীর বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষাই যাহাতে বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র বা প্রধান দ্বারস্বরূপ হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ অর্থবিদ্যায় বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালীর ভাষা বড় অপুষ্ট; বাঙ্গালা ভাষায় অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থাদি নাই বলিলেও চলে। দেশের লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, অন্য অন্য ভাষা হইতে ভাষান্তরিত করিয়াই হউক, কিম্বা মূলগ্রন্থ রচনা করিয়াই হউক, আমাদের মাতৃভাষা প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষাতেই যাহাতে পৃথিবীর অর্থশাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব, উপদেশ, আবিষ্কার এবং বার্ত্তা আমরা ইচ্ছা করিলেই শিখিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করাই কর্ত্তব্য হইবে। নচেৎ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে বা অন্য বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে লোক-শিক্ষার বিধান থাকিলে, আয়ুঃক্ষয় এবং পণ্ডশ্রম ভিন্ন প্রকৃত ফললাভ কিছুতেই হইবে না।

শিক্ষার দ্বারের কথা বলিলাম। এইবার কি কি বিষয়ের শিক্ষা, কি ভাবে হওয়া উচিত, তাহাও বলা আবশ্যক হইতেছে।

প্রধানতঃ ইংরেজীতে আমাদের শিক্ষা হয় বলিয়া, ইংরেজী কথা শিখিতেই আমাদের কাল কাটিয়া যায়; সকল কার্য্য শিক্ষা আমাদের হইয়া উঠে না। ইহার উপর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তর নিষ্প্রয়োজন বিদ্যার বোঝা আমাদের বহিতে হয় বলিয়া, আমরা এতই ক্লান্ত এবং কাতর হইয়া পড়ি যে, নিতান্ত অপদার্থ হওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তরই থাকে না। কস্মিন্ কালে কাজে লাগিবে না, এমন কত পড়াই যে আমাদিগকে পড়িতে হয়, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইহার উপর যাহারা পড়িতে যায়, তাহাদের পড়া সম্বন্ধে কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই প্রেমচাঁদী পাশ হইতে পাড়া-গাঁয়ের পাঠশালের পাতাল পর্য্যন্ত প্রায় যেন একই পড়া। এ রীতিতে চলিলে সুশিক্ষা কখনই হয় না। সকলেই স্বীকার করেন যে এখন সুশিক্ষা হইতেছে না; সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথক্ রীতি অবলম্বন না করিলে, কখনই সুশিক্ষা হইবে না।

আরও, স্ব-তন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সামান্য শিক্ষা এবং বিশিষ্ট শিক্ষা- এইরূপ দুই বিভাগ করিয়া, শিক্ষার পৃথক পৃথক্ বিধান এবং ব্যবস্থা করিতে হইবে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে পড়িতে, জমাখরচ করিতে, জরিপ জমাবন্দী করিতে আর বড় জোর ইংরেজীতে মোটামুটি চিঠি-পত্র লিখিতে শিখিলেই সামান্য শিক্ষা হইতে পারে। এই শিক্ষার শিক্ষার্থীর সংখ্যাই খুব বেশী হওয়া উচিত। কেন না গবরমেণ্টের ভরসা ছাড়িতে হইলে, আমাদের দেশে বড়দরের কাজ কমই পাওয়া যায় অল্পে সন্তুষ্ট, অভিমানশূন্য অথচ কর্ম্ম-কুশল লোকই এখন আবশ্যক। এখন যাহারা ইস্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসে, তাহারা অল্পে তুষ্ট হইতে পারে না; তাহাদের অভিমানের সীমা থাকে না, অথচ তাহারা কোন কাজও জানে না। সামান্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, এ বিড়ম্বনারও প্রতিকার হইবে, সমাজেরও সুখবৃদ্ধি হইবে।

স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা।

বিশিষ্ট শিক্ষার দুই শাখা থাকিবে। এক শাখার ভাবনা মাত্র স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রবর্ত্তকদিগকে ভাবিতে হইবে, অন্য শাখার ভাবনা তাহাদিগকে ভাবিতে হইবে না। "বিশ্ববিদ্যালয়ে" এখন যে বিদ্যা শি ান হয়, সেও এক রকম বিশিষ্ট শিক্ষা। সে শিক্ষা ভালই হউক আর মন্দই হউক,—যাহারা সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, প্রায়ই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, অথবা সওদাগরদিগের ঘরে তাহারা আশ্রয় পায়। এই সকল শিক্ষার্থী জজ, মাজিষ্টর, মুনসেব, ডেপুটী, উকীল, মোক্তার, আমলা, কেরাণী ইত্যাদি হইব ভাবিয়াই, প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। স্বতন্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেও বিস্তর লোক যেমন এখন এ দিকে ছুটিতেছে, তেমনই ছুটিতে থাকিবে। বোধ হয়, বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিবে। কাজে কাজেই স্বতন্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থায় বিশিষ্ট শিক্ষার বিধান যাহা করিতে হইবে, তাহা এমন ভাবের হওয়া উচিত যে, সে শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার শিক্ষা, বিষয়-পদ্ধতি বা রীতির সহিত কোন সাদৃশ্যই যেন না থাকে।

যাহা বলিলাম, তাহার সার সংগ্রহ করিলে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গালী বর্ণাশ্রমীদের সন্তানগণের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইলে, ধর্ম্ম-শিক্ষা এবং বৃত্তি-শিক্ষা উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্তে সকলকেই কিছু কিছু সংস্কৃত শিখাইতে হইবে। তদ্ভিন্ন কি বিদ্যালয়ে কি বাটীতে বালকেরা যাহাতে স্বস্ব ধর্ম্মানুসারে শৌচ আচার এবং উপাসনা অভ্যাস করিতে পারে, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষাকেই শিক্ষার দ্বার করিতে হইবে। সমর্থ বালককে অল্পাধিক ইংরেজী বা অন্য বিদেশী ভাষা শিখাইতে আপত্তি নাই, কিন্তু শিখিতেই হইবে, এমন বিধানও যেন না থাকে। অর্থ-শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে পুষ্ট এবং গরিষ্ঠ করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে যে, সামান্য শিক্ষাই মুখ্য প্রয়োজন,—বিশিষ্ট শিক্ষা বিষয়ে ধীরে ধীরে বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে।

স্বতন্ত্রশিক্ষার কল্পনা (পরিশিষ্ট)।

"বসুমতী"-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্ব-তন্ত্র শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ * পড়িয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবুর যেমন যশঃ-প্রতিষ্ঠা, তাঁহার প্রবন্ধে তদনুরূপ বিনয়-সৌজন্যের পরিচয় আরও সুখজনক। "স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা" নামেই "বঙ্গবাসী"তে আমার কয়েকটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; বোধ হয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু তন্মধ্যে একটীমাত্র প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। তিনি যে বিতর্ক তুলিয়াছেন, আমার সকল প্রবন্ধগুলি পড়িলে হয় ত সে বিতর্ক তুলিতেন না। যাহা হউক, আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি যখন একটি প্রবন্ধও পড়িয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন আমার বক্তব্য আরও বিশদ করিবার চেষ্টা করা, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

একালে বাঙ্গালা লেখায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সময়ে সময়ে বড় গোল বাধে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও সেই গোল বাধিয়াছে। আমি যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু সর্ব্বত্র আমার সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। বহু সংস্কৃত শব্দেরই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ছাড়া পারিভাষিক অর্থও আছে। প্রায়ই আমি সেই পারিভাষিক অর্থেই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি।

---

* স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "স্বতন্ত্র-শিক্ষার কল্পনা" নামে ধারাবাহিকরূপে "বঙ্গবাসী"তে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলে, সেই সময় এ সম্বন্ধে নানাদিকে নানাভাবে আলোচনা হইতে থাকে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন "বসুমতী"তে ইন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপন প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু সেই সব মতের কোন কোনটার সমর্থন করেন নাই। ফলে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষিতীন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধও "বসুমতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে, ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ এবং তদুত্তরে লিখিত ইন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, এই উভয় প্রবন্ধই "বসুমতী" হইতে ১৩১২ সালের ২৪শে চৈত্র তারিখের "বঙ্গবাসী"তে উদ্ধৃত হয়। "স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা (পরিশিষ্ট)" বলিয়া ইন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি উপরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য, ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটিও এখানে প্রদত্ত হইল,—

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ।

"বসুমতী" পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। আপনি তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। "প্রবীণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞের প্রবন্ধের উপর মতামত প্রকাশরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনে আমি অক্ষম। তবে

বর্ণাশ্রম-সমাজ বলিলে আমি যাহা বুঝি, ক্ষিতীন্দ্র বাবুও প্রায় তাহাই বুঝিয়াছেন, মনে হইতেছে। জাতিভেদ সংঘটিত সমাজই বর্ণাশ্রম-সমাজ বটে; কিন্তু আরও বিশেষণের নিবেশ করিলে, বর্ণাশ্রম-সমাজের পরিচয় স্ফুটতর হয়। অমর-কোষে আছে "সমাজঃ পশুভিরাণাং সংঘঃ"। পশুদিগের সংঘের সংস্কৃত নাম "সমজ" এ শব্দে আকারটি নাই। মনুষ্যসংঘের সংস্কৃত নাম "সমাজ"; ইহাতে আকার আছে। "সমজে" আর "সমাজে" এইটুকু ভেদ। যে সকল মনুষ্য বহুলাংশে এক-মতাবলম্বী, তাহারাই এক সমাজভুক্ত। যত মত, তত সমাজ। আবার ঐকমত্যের সমধিক-সম্ভাবনা থাকায়, দেশব্যাপী সমাজও হইতে পারে। একটি একটি দেশে একটি একটি সমাজ ধরিলে, দেশভেদে সমাজভেদও বলিতে পারা যায়। হয় মতভেদ না হয় দেশভেদ লইয়াই সমাজভেদ হইতে পারে। নহিলে কেবল ব্যাকরণ ধরিয়া বুঝিতে গেলে, মনুষ্যের সমাজ একটীমাত্র হয়। মতভেদ লইয়া যে সমাজভেদ হইতে পারে, বর্ণাশ্রম সমাজ তাহারই অন্যতম। যে সমাজে অনাদিকাল হইতে বর্ণভেদ এবং আশ্রমভেদ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই বর্ণাশ্রম-সমাজ। অন্য সমাজে বর্ণভেদ বা আশ্রমভেদ স্বীকৃত হয় না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটী বিশুদ্ধ বর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহা সঙ্করবর্ণ। জাতির অর্থাৎ জন্মের ভেদ ধরিয়াই, বর্ণের ভেদ স্থির করা হয়।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যাহার জন্ম, সেই জাতক ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। এরূপে, জন্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়াদির বর্ণ নিরূপিত হয়। যাহারা একজাতি, তাহারাই

বিষয়ের গুরুতা বিবেচনায় আমাকে দুই একটা কথা বলিবার অবসর ও অধিকার প্রদান করিয়া-ছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

*ইন্দ্রনাথ বাবু যে উপসংহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার ত মতভেদ নাই-ই। আমি প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় আজ পনরো যোল বৎসর এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছি। আমার বিশ্বাস, কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ স্বদেশ-হিতৈষীরও সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না; "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র, শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি মহারথিগণকে ধন্য যে, তাঁহাদের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে আমোদপ্রিয়, সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের অনুরাগী অনেক নব্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের হৃদয়ে স্ব-সমাজের প্রতি অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক অনুরাগও আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। একটী প্রবাদ আছে যে, ভাল লোককেও ক্রমাগত চোর চোর বলিলে সে চোর হইয়া পড়ে এবং চোরকেও সাধু সাধু বলিলে সেও সাধু হয়। সেইরূপ আমাদেরও আশা হয় যে, এই সকল ব্যক্তি অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক অনুরাগ দেখাইতে দেখাইতে পরিণামে সত্যই নিজ নিজ সমাজের গুণগ্রাহী হইবেন। এই বিষয়ে ইন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি মহাশয়গণের অনুসরণ করিয়া যতটুকু সহায়তা করি-য়াছি, ততটুকুই নিজেকে ধন্য মনে করি।

*ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের উপসংহারটুকু এই যে, "স্বতন্ত্র শিক্ষার গুণে আমাদের সমাজে শান্তির

একবর্ণ। জাতি আর জন্ম একার্থবাচক। জন্ম দেখিয়াই বর্ণ স্থির করা হয়। গোড়ায় বর্ণ নিরূপণ করিতে হইলে, জন্ম দেখিয়া লওয়া ভিন্ন বর্ণ নিরূপণ করিবার অন্য উপায় নাই। কাহারও ধারণা এই যে, জাতি-ভেদ বলিলে কর্ম্মভেদ অর্থাৎ ব্যবসায়াদির ভেদ বুঝিতে হয়। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে জাতি-ভেদ শব্দের এমন অর্থ হইতে পারে না। জন্মের অর্থাৎ মাতৃগর্ভস্থ হইবার বহুকাল পরে কর্ম্মভেদ বা ব্যবসায়-ভেদ হইতে পারে; সুতরাং কর্ম্ম দেখিয়া, বর্ণনিরূপণ করিতে হইলে, কর্ম্মাবলম্বন বা ব্যবসায়াবলম্বন করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; শুধু তাহাই নহে, সেই কাল পর্য্যন্ত স্ববর্ণোচিত কর্ম্মশিক্ষাও বন্ধ রাখিতে হয়। ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণের কর্ম্মই শিখাইতে হইবে, শূদ্রের সন্তানকে শূদ্রোচিত কর্ম্মেরই যোগ্য করিতে হইবে। জন্মের দ্বারা কর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, কর্ম্মশিক্ষাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব মনে রাখিতে হইবে যে, কর্ম্ম অনুসারে বর্ণভেদ হয় না, বর্ণভেদ অনুসারেই কর্ম্মভেদ হয়। আর, সেই বর্ণভেদ জাতির দ্বারা অর্থাৎ জন্মের দ্বারা নিরূপিত হয়। "জাত্যা ব্রাহ্মণঃ, জাত্যা শূদ্রঃ" ইত্যাদিরূপ প্রয়োগের ইহাই অর্থ। বর্ণাশ্রম সমাজ জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, বর্ণাশ্রম-সমাজ

সুধাধারা প্রবাহিত হইত, সেই স্বতন্ত্র শিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলেই আবার আমরা সুখী হইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর সেই স্বতন্ত্র শিক্ষা ভিন্ন যে সুখলাভের উপায়ান্তর নাই, ইহাই নিশ্চয়। আবার বর্ণাশ্রমের সুব্যবস্থায় আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে, আবার ব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে, আবার এ সমাজে সন্তোষধর্ম্মা সদ্-ব্রাহ্মণের পূজা যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সমাদর যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, এবং মর্য্যাদা যাহাতে মানসে মুদ্রাঙ্কিতবৎ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

"আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি যে, ফলে অনেকের একমত হয়; কিন্তু সেই মত দাঁড় করাইতে গেলে যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়েই যত কিছু মতভেদ ও গণ্ডগোল। কথা এই বটে যে, "ব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে," কিন্তু কি উপায়ে তাহা সংঘটিত হইবে, তাহাই বিচার্য্য। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, সাধারণত মনুসংহিতাকে অবলম্বন করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, ও করিলেও টিকিতে পারিবে। তবে তাহাতে যে দুই চারিটী সাময়িক প্রথা উল্লিখিত আছে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাগ করিলেই চলিবে। মনুসংহিতার অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া মর্ম্ম অনুসরণ করিতে হইবে।

"বর্ণাশ্রম সমাজ" যে কি অর্থে ইন্দ্রনাথ বাবু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধের কোথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। সমগ্র প্রবন্ধটী পড়িয়া আমাদের অনুমান হয় যে, জাতিভেদরূপ ভিত্তির উপর সংগঠিত সমাজ অর্থেই বর্ণাশ্রম সমাজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, তাহা এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিচার করা অসম্ভব, এবং আমি তাহা করিতেও ইচ্ছা করি না। এইমাত্র বলিতে পারি যে, জাতিভেদ কোন না কোন আকারে থাকিবেই। যখন ইহা থাকিবেই, ইহার সুগঠন প্রদান করিলেই কি ভাল হয় না? আলোচনার ফলে আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে

বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই বর্ণভেদ জাতিভেদের দ্বারাই অর্থাৎ জন্মভেদের দ্বারাই লক্ষিত হয়।গুণ-কর্ম্মভেদের উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, ইহা ঠিক নহে। বরং বলিতে পারা যায় যে, জাতিভেদের উপরেই গুণ-কর্ম্মভেদ প্রতিষ্ঠিত। এ স্থলে গুণ শব্দে গুণবীজ (গুণের Potentiality) বুঝিতে হয়। অর্থাৎ জন্ম দেখিয়াই ধরিয়া লইতে হয় যে, জাতকে অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণে এবং ভূমিষ্ঠ শিশুতে পিতৃ-মাতৃবর্ণমূলক গুণের বীজ আছে। ব্রাহ্মণ-সন্তানে ব্রাহ্মণোচিত গুণবীজ আছে,শূদ্র-সন্তানে শূদ্রোচিত গুণ-বীজ আছে ইত্যাদি। এবং এই গুণ-সম্ভাবনাকে আশ্রয় করিয়াই, সেই ভ্রূণের ও পরে শিশুর সংস্কারাদি সম্পন্ন করিতে হয় এবং কর্ম্মের শিক্ষা দিতে হয়। সাধুবৃত্তিই হউক কিংবা অসাধু বৃত্তিই হউক, বৃত্তি-অবলম্বনের বহুপূর্ব্বেই গুণ এবং কর্ম্ম স্থির করিয়া লইতে হয়; বৃত্তি অবলম্বনের পর গুণ বা কর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয় না। প্রত্যেক বর্ণেরই গুণ ঈশ্বরের নিরূপিত এবং প্রত্যেক বর্ণের কর্ম্মও ঈশ্বরের বিহিত। জাতি দেখিয়াই অর্থাৎ জন্ম অনুসারেই, গুণ ধরিয়া লইতে হয় এবং কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

কর্ম্ম বলিলে বুঝিতে হয়, ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত কর্ম্ম, কিংবা ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত কর্ম্ম, কিংবা শূদ্রের জন্য বিহিত কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত কর্ম্ম ছয়টী,—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ছয় কর্ম্মের মধ্যে যজন, অধ্যয়ন এবং দান ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; অবশিষ্ট তিনটী অর্থাৎ যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা। ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও বর্ণ-ভেদ অনুসারে কর্ম্মভেদ বিহিত আছে। যাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম, যেমন ব্রাহ্মণের যজন, অধ্যয়ন, দান—তাহা অনাপৎ কালেই

বোধ হয়, জাতিভেদ সম্বন্ধে মনুসংহিতার মত এই যে, গুণকর্ম্মভেদের উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়াও কর্ত্তব্য। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি অস্বীকার করিলে সমাজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া একব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ম্ম করে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের পদবীতে রক্ষা কর এবং উপযুক্ত মর্য্যাদা দাও; কিন্তু যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত মদ্যপান, ব্যভিচার, প্রতারণা প্রভৃতি কর্ম্মে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাকে যদি ব্রাহ্মণত্ব হইতে নামাইয়া দেওয়া না হয়, তবে পাপের দণ্ড কোথায়? সমাজের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর পাপের দণ্ড সমাজের হস্তে থাকা কর্ত্তব্য। যে সমাজ এরূপ দণ্ড দিতে ভয় পায় বা অক্ষম, সেই ভীরু কাপুরুষ ও দুর্ব্বল সমাজের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

কেবল পরলোকের শাস্তির কথা বলিলে চলিবে না, ইহলোকেও শাস্তি চাই। সেইরূপ যদি কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র-বংশ পুরুষানুক্রমে সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে সেই সেই বংশ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীর অধিকার পাইবে না কেন, তাহার ত কোন যুক্তি দেখিতে পাই না) যখন ভারতে এইরূপ গুণকর্ম্মভেদে জাতিভেদ সংগঠিত হইত, তখন আত্ম-বিচ্ছেদ বিবাদ কলহ প্রভৃতির কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন অবধি দোষ-গুণ-নির্ব্বিচারে জাতিভেদ জন্মানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, তখন অবধিই মধ্যে মধ্যে গুরুতর আত্মবিচ্ছেদ বিবাদ বিপ্লব

কি, আর আপৎকালেই কি, অবশ্য করণীয়। কেবল আপৎকালে অসমর্থ পুরুষ নিম্নতর বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৃত্তি এবং বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্র-বৃত্তি কখনই অবলম্বন করিতে পারেন না;—"ন শ্ব-বৃত্ত্যা কদাচন।" এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি সম্বন্ধেও যথোচিত বিধান আছে।

এই গেল বর্ণ-ভেদ, জাতি-ভেদের কথা। এইবার আশ্রম-ভেদের কথা কিছু বলিলেই. বর্ণাশ্রম-সমাজের স্থূল পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাস বাদ দিয়া অপর তিনটী ক্ষত্রিয়ের আশ্রম, কেবল ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য বৈশ্যের আশ্রম; শূদ্রের একমাত্র আশ্রম গার্হস্থ্য। ব্রহ্মচর্য্যে, বানপ্রস্থে বা সন্ন্যাসে শূদ্রের অধিকার নাই। যে সমাজ এই বিধানে বদ্ধ, তাহা বর্ণাশ্রম-সমাজ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবুর কয়েকটী আবান্তর কথা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এইবার নিবেদন করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমি নিজ সমাজের গুণ-কীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়া, অন্যান্য জাতির সমাজকে কটূক্তি করিয়াছি।

আমি কোনও সমাজকেই কটূক্তি করি নাই। "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধে স্বকপোল-কল্পিত প্রায় কিছুই বলি নাই। আমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যথাসম্ভব শাস্ত্রের তাৎপর্য্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু যাহাকে আমার কটূক্তি মনে করিয়াছেন, তাহা প্রথমতঃ কটূক্তি নহে, স্বরূপ পরিচায়ক উক্তি, দ্বিতীয়তঃ ঐ উক্তি আমার নহে, উহা শাস্ত্রের উক্তি। ম্লেচ্ছ শব্দে কি বুঝিতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বকার যে বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমাদের সমাজে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত থাকাতে, আমি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া

প্রভৃতি সংঘটিত হইতে লাগিল। সমাজকে সজীব করিতে ইচ্ছা করিলে ন্যায়ের পুরস্কার এবং অন্যায়ের প্রতিবিধানের উপায় রাখিতেই হইবে। জন্মানুসারে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইবার একটী প্রধান কারণ আলস্য। এইরূপ জাতিভেদের উপর দণ্ডায়মান সমাজে সজীব আবশ্যক নাই।

"উপসংহারে ইন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমি একমত হইলেও তাঁহার মূল প্রবন্ধের সহিত আমি মিলিতে পারি নাই। তিনি প্রবীণ ধর্ম্মভীরু হইয়াও সংস্কার বশতঃ নিজ সমাজের গুণকীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য জাতির সমাজকে কটূক্তি করিয়াছেন। "ম্লেচ্ছাদিরা সর্ব্বাচারবিহীন গোখাদক এবং বেদের বিরুদ্ধভাষী ও বহুভাষী।" এই কথাগুলি বর্ত্তমানে হিন্দুদিগের শ্রুতিপ্রিয় হইলেও বলিতে বাধ্য যে, এগুলি অন্যায়রূপে উক্ত হইয়াছে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমাদের বর্ণাশ্রম-প্রথা আমাদের সমাজের উপযোগী বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অথবা সমাজ হইতে খসিয়া পড়িবার উপযুক্তরূপ জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রথাকে ইংরেজ-সমাজে রোপণ করিলেই যে সুফল হইবে, এ কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। ইংরাজ প্রভৃতি জাতি যদি সর্ব্বাচারবিহীন হইত, তাহা হইলে কি আজ তাহারা সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত? আমরা নিজেকে যোকবাক্যে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি যে, আমাদের জড়তা ও আলস্য শ্রেষ্ঠতম উদ-

দিয়াছি মাত্র। মূলের একটীও বিশেষণ বাদ দিই নাই, একটী বিশেষণও বাড়াইয়া বসাই নাই। মূলবচনে আছে,—

"গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"

"সর্ব্বাচারবিহীন" "বিরুদ্ধভাষী" "বহুভাষী" শব্দে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু যাহা বুঝিয়াছেন, আমি তাহা বুঝি নাই। এক হিসাবে কোনও মানুষই সর্ব্বাচারবিহীন হইতে পারে না; কোনও প্রকার না কোনও প্রকার আচারের আচরণ মানুষমাত্রই করিবেই করিবে। উদ্ধৃত বচনের 'সর্ব্বাচার' শব্দে বুঝিতে হয়, বেদবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত আচার। শাস্ত্রে বলেন যে, "ম্লেচ্ছা বেদবাহ্যাঃ" অর্থাৎ ম্লেচ্ছেরা বেদ-বহির্ভূত। বেদ-স্বীকৃত কোনও আচারও যদি ম্লেচ্ছ আচরণ করে, তাহা হইলে সে আচরণকে রাগপ্রাপ্ত আচরণ বলিয়া জানিতে হইবে; কেন না ম্লেচ্ছেরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না এবং বেদের প্রামাণ্য বুঝিতেও পারে না। রাগবশে যে আচরণ করা যায়, তাহা বিহিতাচার নহে, স্বেচ্ছাচার মাত্র। রাগ শব্দের অর্থ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মনে করুন, আমি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে প্রাতঃস্নান করিলাম, আমি রাগবশে অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে সেই প্রাতঃস্নান করিতে পারি, অথবা শাস্ত্রে বিধি আছে বলিয়াই সেই প্রাতঃস্নান করিতে পারি। আমার রাগ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি আমার ঐ প্রাতঃস্নানের প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে আমি স্বেচ্ছাচারী; আর বিধি আছে বলিয়া যদি ঐ প্রাতঃস্নান করি, তবেই আমি বিহিতাচারী। অতএব বুঝিতে হয় যে, বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অধীনতা স্বীকার না করিলেই, সর্ব্বাচারবিহীন হইতে হয়। ইহাতে কটূক্তির লেশমাত্র

ত্তির নামান্তর মাত্র এবং অন্যান্য জাতির সজীবতা রূপান্তরিত অবনতি। আমরা দিবানিশি আলস্য-শয্যায় শয়ন করিয়া কল্পনা করিতে পারি যে, আমরাই একমাত্র শুদ্ধাচারী ও ধর্ম্মের পারগামী এবং অন্যান্য জাতি সকলেই আচারবিহীন ও অধর্ম্মপরায়ণ। এইরূপ ভাবিয়া পরনিন্দা করিলেই কি আমরা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইব এবং অন্যান্য জাতি নিরয়গামী হইবে? আমার ত সে ধারণা নাই। আমার বিশ্বাস যে, প্রত্যেক জাতিই আপনাপন গুণকর্ম্মের অভিব্যক্তি সাধন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই সমাজে নিজ নিজ উপযোগী আচার-ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা এখানে যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মান দানে অগ্রসর হই, বিলাতেও সেইরূপ গ্ল্যাডষ্টোনের ন্যায় মহাত্মাদিগের প্রতি ততোধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়। গ্ল্যাডষ্টোনের ন্যায় ব্যক্তিগণ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের স্থান অধিকারে কিসে অনুপযুক্ত, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গোখাদক নাম যে ম্লেচ্ছের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বতন অনেক ঋষিও ম্লেচ্ছের শ্রেণীতে পড়িয়া যান। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সাধারণতঃ গোখাদক না হইয়াও যে অবনতিলাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্য জাতি গোখাদক হইয়া যে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে তাহাতে পূর্ব্বতন গোখাদক পবিত্র ঋষিদিগকেও ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করা আমাদের

নাই; এস্থলে স্বরূপ-নির্ব্বাচনই তাৎপর্য্য। বিরুদ্ধভাষা, বহুভাষাও এরূপ পারিভাষিক অর্থে বুঝিতে হয়।

"আমরাই একমাত্র শুদ্ধাচারী ও ধর্ম্মের পারগামী এবং অন্যান্য জাতি সকলেই আচারবিহীন অধর্ম্মপরায়ণ"—এমন আমি বলিও না, মনেও করি না। অর্থাৎ ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু যে অর্থে এই শব্দগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন, সে অর্থে আমি অমন কথা বলি না; মনেও করি না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্ম শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি কতকগুলি সদ্‌গুণসমষ্টিকেই ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য করিতে চাহেন; কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের যে অর্থ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত, সে অর্থে বর্ণাশ্রমবহির্ভূত সকলকেই ধর্ম্মহীন বলিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে যে অদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণ করা যায়, তাহা আমাদের সিদ্ধধর্ম্ম অর্থাৎ সে ধর্ম্মের ফললাভের জন্য এজন্মে আর কিছু করা আবশ্যক হয় না। সেই সেই কর্ম্মের ফলে যে যে অদৃষ্ট হইয়া আছে, সেই সেই অদৃষ্টের ফলে এবারের জাতি অর্থাৎ মনুষ্যকুলে জন্ম—ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—লাভ করিয়াছি; এবারের আয়ু অর্থাৎ ভোগকালও লাভ করিয়াছি; এবং ভোগ অর্থাৎ যে সকল সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার করিতে হয়, সেই সেই সুখ-দুঃখ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এবং সামান্যাকারে বলিতে পারা যায় যে, যে যে অর্থকে বা যে যে কামকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ভোগ নিষ্পন্ন হয়, সেই সেই অর্থ এবং কামও সেই প্রাচীন অদৃষ্টজন্যই লাভ করা যায়। অর্থ শব্দে বুঝিতে হয়—(১) ভোগায়তন অর্থাৎ নিজের শরীর এবং (২) ভোগসাধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় বিষয়। আবার, বিষয় বলিলেই বুঝিতে হয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং এই সকল গুণের আধার—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ এবং ক্ষিতি। এই সকল পারিভাষিক অর্থ

পক্ষে শোভা পায় না; সেইরূপ বর্ত্তমান উন্নত জাতিসমূহকেও গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও আমাদের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচায়ক নহে। গো অথবা কোন প্রকার জীবহিংসার সমর্থন করি না বটে, কিন্তু অযথা অপর জাতির নিন্দাও আমার প্রিয় নহে। ম্লেচ্ছগণ বহুভাষী, এ কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ইন্দ্রনাথ বাবু স্বজাতি আশ্রমের স্রোতে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়াছেন বোধ হয়। আমাদের ন্যায় বঙ্গবীরগণের এত বক্তৃতাও যে ইন্দ্রনাথ বাবুর কাছে পৌঁছায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। বহুভাষিত্বই যদি ম্লেচ্ছত্বের কারণ হয়, তবে আমার বোধ হয়, সাধারণত বাঙ্গালীই ম্লেচ্ছদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভের অধিকারী। ম্লেচ্ছদিগকে বেদের বিরুদ্ধভাষী বলা কোন কাজেরই কথা নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে কয়টা লোকে বেদের নাম শুনিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিবে? বরঞ্চ আমরা জানিয়া শুনিয়া বেদবিরুদ্ধ আচরণ করি বলিয়া আমাদিগের নিজেকেই ম্লেচ্ছ বলা কর্ত্তব্য। অপ্রয়োজনে অপরের প্রতি কটূক্তি আমার নিতান্তই অপ্রিয়, তাই এ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

"ইন্দ্রনাথ বাবু জাপানের উন্নতিকে উন্নতিই বলেন না। উন্নতি, শ্রেষ্ঠতা এ সকলই আপেক্ষিক শব্দ। আমার পক্ষে যাহা উন্নতি, অপরের পক্ষে তাহা উন্নতি না হইতে পারে। আমার কিছু

স্বীকার না করিলে, আমাদের শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যই অধিগম্য হয় না। মহাভারতে ব্যাস বলিতেছেন,—"ধর্ম্মাৎ অর্থশ্চ কামশ্চ"। সাংখ্যাচার্য্য আদিজ্ঞানী কপিল বলিতেছেন,—"জাত্যায়ুর্ভোগা বিপাকাঃ", ভৃগুপ্রোক্ত মনু-সংহিতায় দেখিতেছি যে, মহর্ষিগণ মনুকে বলিতেছেন,—

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥"

এইরূপ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম বলিলে বুঝিতে হয়—(১) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট এবং (২) এ জন্মের কৃতকর্ম্ম জন্য নূতনরূপে সঞ্চিত হইতেছে যে অদৃষ্ট। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট জন্য আমাদের জাতি, আয়ু এবং ভোগ প্রারব্ধ হয়, অর্থাৎ ফল দিতে আরম্ভ করে। আর এ জন্মের কর্ম্ম আমাদের জাতি অনুসারে নিরূপিত বা বিহিত থাকিলেও, সে কর্ম্ম করা না করা বিষয়ে, আমরা স্বাধীন; অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিতে বিধি আছে, তাহা আমরা করিতেও পারি, কিম্বা না করিতেও পারি। যে কর্ম্মের নিষেধ আছে, সে কর্ম্মের নিষেধ পালিতেও পারি, কিম্বা নিষেধ লঙ্ঘন করিতেও পারি। এই বিধিনিষেধ পালন-লঙ্ঘনের নামই ধর্ম্ম। বিধি নিষেধ পালন করিলে যে ধর্ম্ম হয়, তাহাতে শুভাদৃষ্ট জন্মে, দেহান্তরে বা জন্মান্তরে তাহার শুভ ফল পাওয়া যায়। আর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিলে যে ধর্ম্ম হয়, তাহা নিন্দিত ধর্ম্ম, তাহাকেই বলে অধর্ম্ম। তাহার ফলে অশুভ অদৃষ্ট হয়, এবং পরলোকে ও পরজন্মে সেই দুরদৃষ্টের ফল পাইতে হয়। অধর্ম্ম বলিলে ধর্ম্মের অভাব বুঝায় না, নিন্দিত ধর্ম্মই বুঝায়। এই দেহে করণীয় কর্ম্মই আমাদের সাধ্যধর্ম্ম। মন্বাদি শাস্ত্রে বা ভগবদ্-

---

অন্নসংস্থান আছে, তাই আমি এই লিখিতেছি, কিন্তু একজন ব্যবসায়ী যাহাকে নানাদিক্ দেখিয়া শুনিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে, তাহাকে লিখিতে বলিলে প্রকৃতপক্ষে কি তাহার অবনতির পথ উন্মুক্ত করা হইল না? জড়তা উন্নতি নহে, সজীবতাই উন্নতি। জাতি সজীব থাকিলে নিজ নিজ উন্নতির যথার্থ পথ নিজেই আবিষ্কার করিতে পারে। বৈদিক কাল কেন উন্নতির কাল ছিল? তখন সমাজ সজীব ছিল বলিয়াই উন্নতি হইত। কেবল বৈদিক কাল বলিয়া নহে। বেদেও এখনকার কালের উপযুক্ত নানা বদমায়েসীর কথা যথেষ্ট উল্লিখিত আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও উন্নতি হইয়াছিল—সজীবতা ছিল। পার্থিব উন্নতির প্রতি পরাঙ্মুখতা প্রদর্শিত হইত না, প্রত্যুত তাহাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান করা হইত। যখন অবধি মোহান্ধতা প্রযুক্ত ঋষিদের কালগত অভিপ্রায় অবগত না হইয়া সাধারণ ব্যক্তি পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে বিভাগের একটা প্রাচীর সংস্থাপন করিল, তখন অবধিই আমাদের অবনতির সূত্রপাত।"

"আর একটী বিষয় বলিয়া আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। ইন্দ্রনাথ বাবু যে, যুক্তি বলে বর্ণাশ্রম-সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

তিনি বলেন "অনাদি কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত এই বর্ণাশ্রম-সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; অনন্ত-

গীতার "গুণ-কর্ম্মের" কথা যাহা আছে, তাহাতে কর্ম্মশব্দে স্ব স্ব বর্ণের বিহিত কর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মই বুঝিতে হয়। তবেই ধর্ম্মশব্দের পারিভাষিক অর্থ দুইটী মাত্র,—(১) সিদ্ধধর্ম্ম, যাহা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অদৃষ্টের দ্বারা সূচিত হয় এবং (২) সাধ্যধর্ম্ম যাহা এ জন্মে নূতন শুভাশুভ অদৃষ্টের জনক হয়। তবেই বুঝিতে হইবে যে, অদৃষ্ট-সাধন-কর্ম্মই ধর্ম্ম। সকল কর্ম্ম অদৃষ্টসাধন নয়। কোনও কর্ম্ম কেবল অদৃষ্টসাধন, কোনও কর্ম্ম কেবল দৃষ্টসাধন, আর কোনও কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়ের সাধন। যে কর্ম্মের ফল এ দৃষ্টজন্ম বেদনায় অর্থাৎ এ দেহেই পাইবার কথা, তাহা দৃষ্টসাধন কর্ম্ম; যে কর্ম্মের ফল, সাধারণতঃ পরলোকে এবং দেহান্তরে পাইবার কথা, তাহা অদৃষ্টসাধন; আর, যে কর্ম্মের দুই প্রকার ফল—একপ্রকার ফল দৃষ্টজন্ম-বেদনায় এবং আর এক প্রকার ফল-অদৃষ্ট-জন্ম-বেদনায়,—তাহা দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়েরই সাধন। ফলিতার্থে ধর্ম্ম আর অদৃষ্ট একই অর্থের বাচক।

এই সম্পর্কে আর এক কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত মদ্য পান, ব্যভিচার, প্রতারণা প্রভৃতি কর্ম্মে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, সে ত ব্রাহ্মণত্বভ্রষ্ট হয়-ই এমনও অনেক কর্ম্ম আছে, যাহা না করিলে তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হইতে হয়। ক্ষত্রিয়াদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। কিন্তু তাই বলিয়া নিম্নবর্ণের ব্যক্তি উচ্চবর্ণে উঠিতে পারে না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু কোন্ কর্ম্মকে সাধুকর্ম্ম কোন্ কর্ম্মকেই বা অসাধুকর্ম্ম বলিতে চাহেন, জানি না; কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, বর্ণবিশেষের ধর্ম্মে অধিকারী হইতে হইলে, জাতি অর্থাৎ জন্মই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

কাল এ সমাজ প্রতিষ্ঠিতই থাকিবে। * * * কোথাও বর্ণাশ্রম সমাজের বন্ধনের শৈথিল্য ঘটিয়াছে, তাহাও সত্য; দিন দিন যেন বর্ণাশ্রম সমাজের শক্তিক্ষয় হইতেছে, ইহাও অস্বীকার করি না। কিন্তু এই যে শত শক্তিক্ষয় ও অঙ্গহীনতা ও বন্ধন-শৈথিল্যের মধ্যেও "বর্ণাশ্রম সমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান" রহিয়াছে, অদ্যাপি আত্মরক্ষণ করিয়া চলিতেছে, * * * বর্ণাশ্রমসমাজের এই স্থায়িত্বই বর্ণাশ্রম-সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের এক প্রধান নিদর্শন।" অনাদি কাল আমরা বর্ত্তমান শরীরে ছিলামও না এবং অনন্তকালও থাকিব না; সুতরাং ইন্দ্রনাথ বাবুর বর্ণাশ্রম সমাজের চির অস্তিত্ববিষয়ক যুক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট। তবে ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভারতের আর্য্যদের সমাজে বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের বহুল তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বাবুরও উক্তি আলোচনা করিলে সন্দেহ হয় যে, তিনিও এই বর্ণাশ্রম-সমাজের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন না। যে সমাজের অঙ্গহীনতা ঘটিতে পারিল, বন্ধন-শৈথিল্য আসিতে পারিল, এবং শক্তি ক্ষয় সম্ভব হইল, সে সমাজের চিরপ্রতিষ্ঠা ও অটুটত্ব কোথায়? এই সকল সত্ত্বেও যদি বর্ণাশ্রম সমাজের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-সমাজের নিজের গুণে নহে, কিন্তু প্রয়োজনের বলে এবং দেশের মাটীর গুণে। যে দেশে পরিবর্ত্তন-মাত্রেই সমস্কোচে দৃষ্ট হয়, যে দেশের অধিবাসিগণ বসিতে পাইলে দাঁড়াইতে চাহে না, সে দেশে যে কোন প্রথা, তা নষ্টকর হউক বা ইষ্টকর হউক, প্রয়োজনীয় হউক

শাস্ত্রীয়-বিধি নিষেধ পালন করিলে স্ব স্ব বর্ণই উৎকর্ষ লাভ করিয়া দেহান্তে ইষ্টলাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু একই দেহে জাত্যন্তরে পরিণতি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আর এক কথা এই যে, পুণ্যকর্ম্মের সামাজিক পুরস্কার বা পাপকর্ম্মের সামাজিক দণ্ড "ব্যবহারের"ই নিয়ামক। শাস্ত্রে বলে যে, পাপের দুইটী শক্তি—(১) নরকোৎপাদিকা। —(২) ব্যবহারবিরোধিকা। কর্ম্মের ফলে স্বর্গ নরক যাহা হইবার হউক, সমাজ তাহার কিছু করিতে পারে না, কিন্তু পাপীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পাপীকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারে। এই সংসর্গেরই নাম 'ব্যবহার'। পাপীর সহিত ব্যবহার ত্যাগ ভিন্ন সমাজ আর কিছুই করেও না, করিতে পারেও না।

জাপানের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া রাখি। প্রথমতঃ, অর্থ বিষয়ে উন্নতিও উন্নতি বটে, কিন্তু তাহা চরম উন্নতি নহে। লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে যে মোক্ষ হয়, তাহাই চরম উন্নতি। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অর্থাদির লাভ প্রারব্ধজন্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের শুভাদৃষ্ট থাকিলেই অর্থাদির লাভ হয়, না থাকিলে হয় না। কিন্তু মোক্ষের কথা, ধর্ম্মের কথা, ছাড়িয়া দিয়াও মনে রাখিতে হয় যে, ক্ষত্রিয়-সম্ভব উন্নতিকে বা বৈশ্য-সম্ভব উন্নতিকে অর্থাৎ যুদ্ধাদি বিষয়ক উন্নতিকে কিম্বা বাণিজ্য-কৃষি-পশুপালন-বিষয়ক উন্নতিকে সদ্-ব্রাহ্মণেরা কখনই উন্নতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না। আমাদের মতন ব্রাহ্মণ-কুলকলঙ্ককে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিচার করিতে নাই। শাস্ত্র-পরিচিত আদর্শে লক্ষ্য

বা অনাবশ্যক হউক, একবার কোন সূত্রে প্রচলিত হইয়া গেলেই তাহার চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে। যে যুক্তিবলে ইন্দ্রনাথ বাবু আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই যুক্তিবলে বোধ হয় প্রত্যেক সমাজ অন্তত প্রত্যেক সভ্যসমাজ নিজ নিজ সুপ্রতিষ্ঠতা ও অটুটত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ।

*আমি যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছি, তজ্জন্য আশা করি ইন্দ্রনাথ বাবু এবং আপনি এবং পাঠকবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সত্যই বর্ণাশ্রম সমাজের প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ বলিয়াই আমি এত কথা বলিলাম। কেবল মুখে বলিলে কি হইবে যে, আমাদের সমাজে ধর্ম্মের প্রাধান্য? কোথায় তাহার পরিচয়? একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার ফলে আমরা সুবিধা পাইলেই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর গলে ছুরিকা বসাইতে কুণ্ঠিত হই না; ধর্ম্মের নাম করিয়া মদ্য-পান ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিই, আমাদের সমাজের মঙ্গল কোথায়? আমাদের সমাজ যে এখনও আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। যেমন স্বদেশী সম্বন্ধে একটা আনন্দজনক ভাব সকলের মনে জাগ্রত হইয়াছে, সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধেও একটা দৃঢ়ভাব জাগ্রত হইলেই আমাদের মঙ্গল। স্বদেশী হাঙ্গামার ন্যায় এই বিষয়ে হল্লা করিলে চলিবে না। কয়েকটী নেতৃপদস্থ ব্যক্তি একত্র হইয়া অগ্রসর হইলেই প্রচুর কার্য্য হইবে। বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে যে সামাজিক গ্রহণরূপ আত্মীয়ের পীড়ন অত্যাচার, ইহা ক্রমশঃই সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে, কিন্তু ইহার জন্য টাউনহলে কয়টা সভা হইয়াছিল? সামা-

রাখিয়াই আমি কথা কহিয়া থাকি। মাদৃশ অসংস্কৃত, অশুচি, আচার-ভ্রষ্ট উপাসনাহীন ব্যক্তির কথা লইয়া কথা নহে। ব্রাহ্মণরক্ষা করিতে হইলেই স্বতন্ত্র শিক্ষার ভাবনা ভাবিতে হয়; আর ব্রাহ্মণরক্ষা বলিলেই সমগ্র বর্ণাশ্রম সমাজের রক্ষাও বুঝিতে হয়। অন্য সমাজে এবং বর্ণাশ্রম-সমাজে বড়ই প্রভেদ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে আমার মতের মিল হইবে কি না, ভগবান্ জানেন। তাঁহাকে আমার মতে আনিবার অভিসন্ধিতে আমি এ সব কথা বলিতেছি না। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিধি মানেন না, এমন কোনও লোককেও শাস্ত্র মানাইতে আমি প্রয়াসী হই নাই। কিন্তু দেখিতেছি যে, আমার সৌভাগ্যফলে সুধীর ব্যক্তিরাও আমার লেখা পড়িতেছেন এবং পড়িয়া বিচার করিতেছেন। অতএব আমার লেখায় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে কাহারও কোনও সংশয় না হয়, সে পক্ষে চেষ্টা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উপদেশ দিতে সাহসী হই নাই, এক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ দিতে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র।

জিক শিক্ষা, স্ব-তন্ত্র শিক্ষা সমাজের মুখপাত্রদিগের হস্তে এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের হস্তে। এখানে কাপুরুষ ভীরুদের স্থান নাই। এই সকল বিষয়ে কথা কহিতে গেলেই ঐ সেই মুখ্য কথায় আসিয়া পড়িতে হয়।

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়ই শরীর, মন ও আত্মার তেজ আসে, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূরে পলায়ন করে। বিদেশীয়ের হস্তে অপরাবিদ্যা শিক্ষাদানের সহস্র বন্দোবস্ত থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে পরাবিদ্যা স্বতই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দাও, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার একটা অবসর দাও। এইরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিতে করিতে তবে আমাদের হারানিধি শান্তি-সুখ যথাসময়ে খুঁজিয়া পাইব; সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভগবানকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, পারি না কেন? ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। শরীর ও মন দুর্ব্বল, এই কথা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য এতদিন অবলম্বন করি নাই। বেশ আজ হইতেই তাহা করিব এবং দৌর্ব্বল্যকে আমার নিকটে পদার্পণ করিতে দিব না। ভগবান্—আমার প্রাণের ভগবান্—তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব? পারিব না—তাহা পারিব না। লোকে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, পাগল বলুক বা জ্ঞানী বলুক, আমি ব্রহ্মচর্য্যের বল বুঝিয়াছি; সুতরাং কেহই আর আমাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। এই প্রকারভাবে নিজেকে নিমগ্ন কর, দেখিবে ভারতের মুখশ্রী অন্যভাব ধারণ করিবে।"

শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা (১)।

শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। অনেকগুলি পদস্থ ভদ্রলোকই বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন; ইহাতে আশা হইতেছে যে, অল্পে, অল্পে, ধীরে ধীরে, শুভ ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী প্রস্তাব আমি জানিতে পারিয়াছি। কতকগুলি পদস্থ ভদ্রলোক একত্র হইয়া 'ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্' (The National Coucil of Education) নাম দিয়া স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্যে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, অপর কতকগুলি পদস্থ ভদ্রলোক "সারস্বত আয়তন" প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ করিতেছেন। দুই পক্ষের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তাব, সুতরাং দুই পক্ষে কোন কোন বিষয়ে মতের অমিল আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অমিল হইলেও ষোল আনা অমিল নহে, ইহা একটা শুভ লক্ষণ বটে।

বালকের শিক্ষার যে ব্যবস্থা এখন প্রচলিত আছে, তাহাকে গবরমেণ্টের ব্যবস্থা বলাই উচিত। নিম্নতম পাঠশালা হইতে এণ্ট্রেন্স ইস্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবরমেণ্টের বিধানানুসারেই এবং গবরমেণ্ট কর্ম্মচারীদের পরিদর্শনেই বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তাহার পর উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ইউনিভারসিটির কর্ত্তৃপক্ষই করিয়া থাকেন। কিন্তু ইউনিভারসিটিতেও গবরমেণ্ট পক্ষীয় লোকেরই প্রাধান্য এবং ফলিতার্থে গবরমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারেই শিক্ষার বিধান হইয়া থাকে। এই জন্যই বলি যে, এখনকার প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি গবরমেণ্টের অভিপ্রায়েরই অনুরূপ এবং সে শিক্ষার ব্যবস্থা গবরমেণ্টেরই ইচ্ছায়ত্ত। গবরমেণ্টই যে আকারে, যে প্রকারে, এবং যে ভাবে বালকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, আমাদিগকে মাথা হেঁট করিয়া তাহাই মানিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের বিস্তর বুদ্ধিমন্ত লোকেরই প্রতীতি হইয়াছে যে, গবরমেণ্ট-পরিচালিত শিক্ষাতে এদেশের যথেষ্ট উপকার ত হইতেছেই না, বরং নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে। এই কারণে দেশের ভদ্রলোকে স্বতন্ত্র শিক্ষার বিধান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গবরমেণ্টের বিধানে অনিষ্ট হইতেছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে পূর্ণমাত্রায় ইষ্ট হইবে, তাহা লইয়াই মতামতি ঘটিয়াছে। ভদ্রলোকেরাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দলে 'কৌন্সিল' করিতেছেন, আর এক দলে 'আয়তন' করিতেছেন।

হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে নিম্নতম আদালতের আমলাগিরি পর্য্যন্ত এবং পুলীশে, ডাকঘরে, তারঘরে, যত চাকরী আছে, সে সবই গবরমেণ্টের হাতে। রেলে

(১) "বঙ্গবাসী"—১০ই চৈত্র, ১৩১২ সাল।

খালেও গবরমেণ্টের প্রভুত্ব। কাজে কাজেই রেলের চাকরী এবং খালের চাকরীও গবরমেণ্টের আয়ত্ত। সওদাগরেরা প্রায়ই ইংরেজ; সওদাগরি আপিসের চাকরীও গবরমেণ্টেরই ইঙ্গিতে হয় বলিতে হইবে। অতএব গবরমেণ্টি শিক্ষাতে চাকরীর দিকেই লোকের দৃষ্টি থাকে, গবরমেণ্টও চাকরী করিবার যোগ্যতা দেখিলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রকৃত বিদ্যার দিকে গবরমেণ্টের লক্ষ্য নাই; লোকেরও লক্ষ্য নাই।

রুষিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জাপান যে বাহাদুরি দেখাইয়াছে, তাহাতে এদেশের অনেক লোকেরই চক্ষু ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। পরের পদানত থাকিয়া থাকিয়া আবশ্যক দ্রব্য সকলের জন্যে ইউরোপ আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া হইয়া, এদেশের বিস্তর লোকের চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা সমস্তই বিদেশী লোকের হাতে; দেশের ভদ্র-সন্তানদের চাকরী ভিন্ন অন্য কোনও গতিই যেন নাই, এই ভাব দাঁড়াইয়াছে। আবার চাকরী করিয়া দেশের লোকের ধাতু পর্য্যন্ত বিগড়িয়া গিয়াছে। প্রায় লোকেই মনে করে যে, চাকরী যেন কত গৌরবেরই সামগ্রী। চাকরী যে নিতান্ত হেয়, নিতান্ত ঘৃণার যোগ্য, অত্যন্ত অপমানসূচক, তাহা বোধ করি, কেহই এখন মনে করে না। যে ব্যক্তি ব্যবসা করিয়া স্বাধীনভাবে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করে, কুড়ি টাকা মাহিয়ানার চাকরী-ওয়ালাকে সে ব্যক্তিও সম্মান করে, চাকরী-ওয়ালা নিজেও আপনাকে বড় মনে করে, আর দেশশুদ্ধ লোকই যেন সেই ভাবই দেখায়। ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকরী করা যে এত নিন্দিত, সেই ব্রাহ্মণই এখন চাকরীর জন্যে লালায়িত। যতদূর অধঃপাতে যাইতে হয়, তাহা এদেশের লোকে গিয়াছে।

ইহাতে গবরমেণ্টের কোনও ক্ষতি নাই, দেশের লোকেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। বুদ্ধিমন্ত লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের লোকের এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বুদ্ধিমন্ত লোকেরা বুঝিতেছেন যে, আমরা নিজে নিজে যদি নানা-প্রকার শিল্পকার্য্য চালাইতে পারি, কল-কারখানা বসাইতে পারি, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারি, তাহা হইলে অল্পকালেই এদেশের শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে; এদেশের লোকেও রীতিমত শিক্ষা পাইলে জাপানীদের মতন কৃতকর্ম্মা হইয়া উঠিতে পারে এবং যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাংসারিক অন্য অন্য সকল বিষয়েই ইউরোপ আমেরিকাকে পরাস্ত করিতে পারে। এই সব কথা ভাবিয়া চিন্তিয়াই এদেশের বড় বড় লোকে স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহারা "কৌন্সিল" করিতেছেন, তাঁহাদের যেমন এই মত, যাঁহারা "সারস্বত আয়তন" করিতেছেন, তাঁহাদেরও ঐ একই মত। এতদূর পর্য্যন্ত দুই দলে বড় কিছু অমিল নাই। শিক্ষার আকার-প্রকার লইয়াই দুই দলে মতামতি হইতেছে।

শিক্ষার আকার-প্রকার সম্বন্ধেও 'কৌন্সিলের দলে আর 'আয়তনের' দলের কতক কতক মিল আছে; দুই দলের লোকেই বুঝিয়াছেন যে, ইংরেজী ভাষা-অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে বিদ্যা শিখানতে বালকদের বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং বিদ্যাও ভাল হয় না। এই কারণে দুই দলেরই অভিপ্রায় এই যে, বালকদের মাতৃ-ভাষাতেই বালকদিগকে বিদ্যা শিখাইতে হইবে। কিন্তু 'কৌন্সিলের' দল বলেন যে, বালকদিগকে ইংরেজি ভাষাও শিখাইতেই হইবে, আর 'আয়তনের' দল বলেন যে, যে বালকের অভিভাবক ইংরেজি শিখাইতে ইচ্ছা করেন, সে বালককে অবশ্য ইংরেজি শিখান যাইবে; তবে সকল বালককে জোর করিয়া ইংরেজি শিখাইবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজী থাকুক কাম্য,—যে বালক ইংরেজি ভাষা শিখিতে চাহে, সে শিখুক; আর যে ইংরেজি ভাষা শিখিতে চাহে না, সে ইংরেজি শিখিল না বলিয়া বিদ্যা-লাভে বঞ্চিত থাকিবে, এমন ব্যবস্থা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়।

"আয়তনের" দলের আর এক ধারণা এই যে, ধর্ম্মশিক্ষা না হইলে অন্য কোন শিক্ষাতেই প্রকৃত সুফল ফলে না। বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমীদের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে আর শূদ্রের ধর্ম্মে ভেদ, ব্রাহ্মণের জীবিকায় আর শূদ্রের জীবিকায় ভেদ,—বর্ণাশ্রম সমাজ এই সকল ভেদ রক্ষা করে বলিয়াই অন্য অন্য সমাজ হইতে বর্ণাশ্রম সমাজের ভেদ আছে। এ ভেদ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম সমাজও নষ্ট হইবে। আবার যদি আমাদের শুভদিন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বর্ণাশ্রম সমাজের পরিচয়ে পরিচিত হইয়াই যেন আমরা গর্ব্ব-গৌরব করিতে পারি। নহিলে বর্ণাশ্রমভেদ নষ্ট করিয়া ম্লেচ্ছ-যবনাদির সঙ্গে একাকার হইয়া, অর্থাদি বিষয়ে আমাদের প্রাধান্য হইলেই কি আর না হইলেই কি। অতএব 'আয়তনের' দল বিবেচনা করিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ সন্তানকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া ব্রাহ্মণের শৌচ-আচার-উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা শৌচ-আচার-উপাসনা অভ্যাস করাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার জন্যে যেমন অন্য অন্য বিদ্যা শিখাইতে হইবে, শূদ্র সন্তানকেও সেইরূপ শূদ্র-ধর্ম্মাদির উপদেশ করিয়া এবং আচারাদি শিখাইয়া অন্য অন্য বিদ্যা শিখাইতে হইবে।

'কৌন্সিলে'র দল কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদূর করিতে সম্মত নহেন। ইঁহারা যে, ধর্ম্ম শিখাইতে অনিচ্ছুক তাহা নহে; তবে, ভাসা-ভাসা রকম ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত থাকিতে চাহেন। ইঁহারা ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান কোনও বালককে শিখাইবেন না, তবে কোনও বালকের অভিভাবক বারণ না করিলে, সে বালকের জন্য তাহার স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে স্থুল উপদেশের ব্যবস্থা করিবেন।

'কৌন্সিল' দলের ব্যবস্থা অনুসারে যে সকল বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বালকেরা বেতন দিয়াই বিদ্যা-শিক্ষা করিবে; 'আয়তনে'র দলের মতে বেতন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা

কেবল যে, এ দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ, তাহা নহে, অধিকন্তু বেতন দিতে পারে না বলিয়া এ দেশের অনেক বালকই বিদ্যাশিক্ষাতেই বঞ্চিত থাকে এবং বেতন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাতে নানা প্রকার অনিষ্টও ঘটে।

সংক্ষেপ করিলে দেখা যাইতেছে যে,—

(১) গবরমেণ্টি শিক্ষাতে কেবল চাকুরীর যোগ্যতা হয়, বিদ্যা হয় না বলিলেও চলে। 'কৌন্সিলের' দল এবং 'আয়তনের' দল উভয়েই প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার শিল্প-বিদ্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন।

(২) গবরমেণ্টি শিক্ষাতে আমাদের ধর্ম্মের লেশ মাত্র থাকে না, বরং প্রকারান্তরে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধে অনেক কথাই শিখান হয়। 'কৌন্সিলের' দল বালকদিগকে ধর্ম্মহীন করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন না, কিন্তু বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের অভ্যাস করাইতে চাহেন না। 'আয়তনের' দল কেবল নানা প্রকার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্ট নহেন; ইঁহারা ধর্ম্মরক্ষার দিকে, আচার-অনুষ্ঠানের দিকে এবং এইরূপে বিশেষভাবে জাতিরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহেন।

(৩) গবরমেণ্টি শিক্ষাতে ইংরেজী ভাষারই প্রাধান্য থাকাতে বালকদের বিস্তর সময় নষ্ট হয়, কষ্ট অধিক হয়, বিদ্যা অল্প হয় এবং জাত্যভিমান পুষ্ট হইতে পায় না। 'আমাদের জাতির কোন পুরুষে শৌর্য্য ছিল না; বীর্য্য ছিল না; কোন সদ্গুণ ছিল না, বিদ্যা ছিল না; কৌশল ছিল না, কিছুই ছিল না; আমরা অতি অপকৃষ্ট জাতি,—আর ইংরেজ জাতি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ জাতি। বালক কাল হইতে এইরূপ ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। ইংরেজী গ্রন্থে এই ভাবের কথা এমন সুকৌশলে সাজান থাকে যে, সেই সকল গ্রন্থ পড়িলে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতা আর আমাদের অপকৃষ্টতা যেন আপনা আপনিই আমাদের মনের ভিতর দাঁড়াইয়া যায়। কাজে কাজেই আমাদের জাত্যভিমানও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। কৌন্সিলের দল বলিতেছেন যে, এ প্রকার শিক্ষা অতি কুশিক্ষা; যাহাতে জাত্যভিমান পুষ্ট হয়, মনে মনে স্বজাতি সম্বন্ধে গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক; কিন্তু ইংরেজিও শিখিতেই হইবে। আয়তনের দলভুক্তদের মতে ইংরেজীর উপর এতটা টান যুক্তিসঙ্গত নহে। ইংরেজি না শিখিয়াও যাহাতে বালকেরা সকল বিদ্যায় বিদ্বান্ হইতে পারে, তাহারই উপায় চেষ্টা করা উচিত। তবে যে ব্যক্তি ইংরেজি শিখিতে চাহে, সে শিখুক; ইংরেজি শিক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিব কেন?

(৪) গবরমেণ্টি শিক্ষার জন্য বালকদের বেতন দিতে হয়; কৌন্সিলের মতের শিক্ষাতে বেতন দিতে হইবে। আয়তন পক্ষীয়েরা বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহেন।

যে প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা এখন প্রচলিত আছে, তাহা ছাড়া আর দুই প্রকার ব্যবস্থার সম্ভাবনা হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত পদস্থ, বুদ্ধিমন্ত ভদ্রলোকেরাই এই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের লোকের অধিকাংশই বোধ করি, এ পর্য্যন্ত বালকদের শিক্ষার ভাবনা ভাবেন নাই। কেবল জনকতক লোকে—তাঁহারা যতই বড়লোক হউক না কেন, বালকদের ভাবনা ভাবিলে কাজের কিছুই হইবে না। যাঁহারা আপনাপন সন্তানাদির মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের সকলেরই এ বিষয়ে মন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলেবে না; পরিণাম চিন্তা করিবার জন্যে সকলকেই একবার জাগিতে হইবে, ছোট বড় সকলে মিলিয়া পরামর্শ স্থির করিতে হইবে। বালকদিগকে এখন যেই স্কুলে পাঠান হয়, সে স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়ার মতন; বালকদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, কি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত, কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ সব ভাবিয়া চিন্তিযা বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত করাই অভিভাবকদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু কর্ত্তব্য হইলে কি হইবে? একদিনে দুইদিনে কি দশদিনে সকলের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উদয় হইবে না। আশার কুহক কাটাইয়া উঠিতে অনেকেই পারিবেন না। অন্যের ছেলের যাহা হইবে হউক, আমার ছেলেটি জজ হইবে, ম্যাজিষ্টর হইবে, কি আমলা হইবে, এ মোহ অনেকেরই ঘুচিবে না, সুতরাং গবর্মেণ্টি বিদ্যালয়ে ছেলে ঢুকাইবার প্রবৃত্তিও অল্পকালের মধ্যে কমিবে মনে হয় না। বিবেচনা করিয়া অল্প লোকেই কাজ করে; বিচার-শক্তি অল্প লোকেরই থাকে, অনেক লোকই অতিশয় চঞ্চল, তাহারা স্থির হইয়া কিছু ভাবিতেই পারে না; বহুতর লোক নিতান্ত অলস, তাহারা ভাবনার কাছ দিয়াও যাইতে চাহে না।

অতএব শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা হইলেও, শিক্ষার্থী বালক পাওয়া যাইবে কিনা, ইহাই প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয়। আমার মনে শঙ্কা হয় যে, শিক্ষার্থী বালক পাওয়া দুষ্কর হইবে। আমার এ শঙ্কা যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থাপকদের উচিত যে, কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা এ বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করুন। কোন্ স্থানে, কত শিক্ষার্থী বালক পাওয়া যাইতে পারে, তাহা যথাসম্ভব অনুমান করিয়া, তাহার পর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত।

তবে ইহাও বোধ হয় যে, কতকগুলি করিয়া শিক্ষার্থী সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। গবরমেণ্টি বিদ্যালয়ে যাহারা স্থান পাইবে না, তাহাদের অনেককেই পাওয়া যাইবে, আর বেতন গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দিতে পারিলে, অনেক দরিদ্র সন্তানকেও পাওয়া যাইবে। যদি এই সকল বালককে লইয়াই কার্য্যারম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে, আমার বিবেচনায়, সংপ্রতি বিশিষ্ট শিক্ষার বা উচ্চতম শিক্ষার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকাই ভাল। ক্রমে ক্রমে নূতন পদ্ধতির শিক্ষার ফল দেখিলে লোকেরও তখন অনুরাগ

হইবে, আর যেমন অনুরাগ বুঝা যাইবে, তেমনই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। সংস্থান বিবেচনা করিয়া ছোট আকারেই কার্য্য আরম্ভ করা হউক।

আর একটি কথা বলিয়া অদ্য ক্ষান্ত হইব। সে কথাটি এই যে, বিবেচনা করিয়াই হউক আর দায়ে ঠেকিয়াই হউক, যে সকল অভিভাবক নূতন ব্যবস্থা অনুসারে, বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইবেন, তাঁহারা কৌন্সিলের মতে চলিবেন, না, কি 'আয়তনের' মতে চলিবেন, তাহা যতদূর জানা যাইতে পারে, চেষ্টা করিয়া জানা উচিত। নহিলে দুই দলের মধ্যে কোন দলেরই কাজের সুবিধা হইবে না; হয় ত দলাদলি হইয়া সকল দিক্ই নষ্ট হইবে। গোড়ায় একটু বাড়াবাড়ি করাতেই আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। বাড়াবাড়ি এই যে, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খিরিষ্টান বাঙ্গালী, উড়িয়া, আসামী, বেহারী সকলের ভাবনা ভাবিয়া, সকলকে জড়াইয়া কাজের সূত্রপাত করা হইতেছে। আমার মতন নগণ্য লোকের কথা, এ হাটে বিকাইবে না, তাহা জানি; তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ—ইহা মনে করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি যে, বাঙ্গালীরা এখন বাঙ্গালী বালকের ভাবনাই ভাবুন, আর বর্ণাশ্রমীরা বর্ণাশ্রমী বালকের ভাবনাই ভাবুন। তাহা হইলে দেখিতে শুনিতে কাজটা একটুকু খাটো হইবে বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু মোটের উপর কাজ খুব খাঁটি হইবে। মুখের বচনে উদারচরিত নাই বা হইলাম, সামর্থ্য বুঝিয়া কাজ করিলে, একদিকে যেমন শক্তির অপচয় হয় না, অন্যদিকে তেমনই কাজের ফলও শীঘ্র ফলে এবং ভাল হয়।

মুসলমান, খিরিষ্টান প্রভৃতির সদ্‌বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা না হউক, আমার এমন অভিপ্রায় নহে। আমরা তাঁহাদের সৎ ও অসৎ যেমন বুঝিব, তাঁহারা আপন সৎ অসৎ তাহা অপেক্ষা আরও ভালই বুঝিতে পারিবেন; তবে জড়াজড়ি করিয়া মরিয়া কাজ কি? আমার এই নিবেদনটুকু গ্রাহ্য হইলে নূতন ব্যবস্থাপকদের মধ্যে দলাদলির সম্ভাবনাও থাকে না। আপনাপন ধর্ম্মকে বড় করিয়া চলিলে সকল গোলই মিটিয়া যায়। ব্রাহ্মদিগকে লইয়া একটুক হুঁটানাটানি আছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু এ হুঁটানাটানি যাহাতে আর না থাকে, তাহা কি কোন মতেই করা যায় না? সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তিরাই ভাবিয়া দেখুন না কেন?

রক্ষা, না, বিনাশ (১)?

আজিকালি ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছে। ধনুর্ব্বাণ, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া এ যুদ্ধ নহে। এক হিসাবে এমনও বলা চলে যে, মানুষে মানুষেও এ যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধে এক পক্ষে ধর্ম্ম, অন্য পক্ষে অর্থ; এক পক্ষে বিদ্যা, অন্য পক্ষে নাগরতা; এক পক্ষে আস্তিকতা, অন্য পক্ষে নাস্তিকতা; একপক্ষে ব্রাহ্মণ, অন্য পক্ষে ম্লেচ্ছ। ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে; ভগবান্‌ই জানেন, কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে।

বর্ণাশ্রম-সমাজ ভারতবর্ষেই আছে; অন্য কোনও দেশে নাই; থাকিতেই পারে না। বর্ণাশ্রম-সমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে ব্রাহ্মণ নাই; ব্রাহ্মণ থাকিতেও পারে না। ব্রাহ্মণ্য-গৌরবেই বর্ণাশ্রম-সমাজের গৌরব। ব্রাহ্মণ থাকিলেই বর্ণাশ্রম সমাজ থাকে, ব্রাহ্মণ না থাকিলে বর্ণাশ্রম সমাজও থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতেছেন বর্ণাশ্রম-সমাজের মস্তক; ব্রাহ্মণ্যই বর্ণাশ্রম সমাজের প্রাণ। এই ব্রাহ্মণ্যই এখন ম্লেচ্ছবুদ্ধি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য এখনও পরাভূত হয় নাই; পরিণামে ম্লেচ্ছবুদ্ধি জয়লাভ করিবে কিনা, পরিণামে ব্রাহ্মণ্যের বিনাশ হইবে কিনা, তাহা জগদম্বাই জানেন; কিন্তু কিছু পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য অভিভূত হইয়াছে। শঙ্কার কারণ, উদ্বেগের কারণ নানাদিকেই দেখা যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক বর্ণাশ্রম-সমাজ ছাড়া, মানুষমাত্রেরই কাছে অর্থ এবং কামই সর্ব্বস্ব। বর্ণাশ্রম সমাজেও অর্থের এবং কামের প্রবলতা আছে; কিন্তু অর্থ-কাম বর্ণাশ্রম সমাজের সর্ব্বস্ব নহে। বর্ণাশ্রম-সমাজে মোক্ষের প্রাধান্য এবং ধর্ম্ম-নিত্য সেবিত। বর্ণাশ্রম ছাড়া অন্য কোথাও ধর্ম্ম নাই; মোক্ষের ত প্রসঙ্গই আসিতে পারে না মোক্ষ এবং ধর্ম্মই বর্ণাশ্রম সমাজের বিশেষ। মোক্ষ আর ধর্ম্মকে লইয়াই বর্ণাশ্রম সমাজের প্রাধান্য। মানব সমাজে বর্ণাশ্রম সমাজ উৎকৃষ্ট। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ্যই ব্রাহ্মণের পরম সম্পদ, সেই ব্রাহ্মণ্য আজকালি ম্লেচ্ছবুদ্ধি কর্তৃক আক্রান্ত। ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে; হয়, ব্রাহ্মণ্যের বিনাশেই এ যুদ্ধের অবসান হইবে; না হয়, ভগবৎকৃপায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্য পুনরায় তেজোদীপ্ত হইবে এবং পুনর্ব্বার জগৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

পশু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ,—এ কথা মানুষ মাত্রেই বলিয়া থাকে। কিন্তু পশু কিসে নিকৃষ্ট, মানুষ কিসে শ্রেষ্ঠ, কয়জনে ইহা ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারে, তাহা বলা যায় না। অথচ অতি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা না করিলে, পশু অপেক্ষা মানুষ যে শ্রেষ্ঠ, ইহা কিছুতেই বলা চলে না।

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুরও আছে, মানুষেরও আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়

---

(১) "বঙ্গবাসী"—১লা বৈশাখ, ১৩১৩ সাল।

মৈথুন অপেক্ষা উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর কোনও পদার্থ যদি মনুষ্যের সাধনীয় না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে পশুই শ্রেষ্ঠ, আর মানুষ নিকৃষ্ট। কেননা, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনের জন্য মানুষ যত ব্যস্ত, বিব্রত, বিপন্ন,—কোন পশুই তেমন ব্যস্ত বিব্রত বা বিপন্ন নয়। পশুদের রোগ, শোক, ব্যসন, পরিতাপ, বন্ধন,—সবই অল্প। রোগ, শোক, ব্যসন পরিতাপ বন্ধন প্রভৃতি উৎপাত মানুষকে ক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে সত্য; মানুষে অসংখ্য প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে সত্য; মানুষে পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রা যায় সত্য; মানুষে বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে মাসেকের পথ একদিনে অতিক্রম করে সত্য; মানুষে দণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তে বার্ত্তা পাঠায়, পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে বার্ত্তা সংগ্রহ করে, এ সবই সত্য; কিন্তু তাহাতে মানুষের উৎকৃষ্টতা কোথায়? শ্রেষ্ঠতা কিসে? এত করিয়াও ইহার চরম ফল সেই ক্ষুন্নিবৃত্তি, সেই নিদ্রা, সেই দেহরক্ষা মাত্র। পশুর যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে; মানুষকে বুদ্ধিকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহাই মাত্র যদি সম্পন্ন করিতে হইল তাহা হইলে কেননা বলিব যে, পশু অপেক্ষা মানুষের অধিক-তর দুর্ভাগ্য?—পশু অপেক্ষা মানুষই নিকৃষ্ট। পশু জন্মগ্রহণ করে, বাঁচিয়া থাকে, তাহার পরে মরিয়া যায়। মানুষও জন্মগ্রহণ করে, বাঁচিয়া থাকে; কিছুকাল পরে মরিয়া যায়। যদি পশুতে মানুষে এই মাত্র প্রভেদ হয় যে, পশু নির্ভাবনায় জন্মে, নির্ভাবনায় বাঁচে, নির্ভাবনায় মরে; আর মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আগাগোড়াই দুর্ভাবনায় ভাবিয়া মরে, তাহা হইলে কেননা বলিব, যে, পশু অপেক্ষা মানুষ নিতান্তই অপকৃষ্ট জন্তু। আরও দেখ, রাগ-দ্বেষ লইয়াই পশুকে পশু-জন্ম কাটাইতে হয়। মানুষেও দেখিতে পাই যে, সেই রাগ-দ্বেষকে মাত্র সম্বল করিয়া মানবের জন্ম কাটিয়া যাইতেছে। অধিক এইটুকু যে, মানুষের রাগদ্বেষ যত ভয়ঙ্কর, পশুর রাগদ্বেষ তত ভয়ঙ্কর নহে। রাগদ্বেষের বশে পশুতে পশুতে যুদ্ধ হয়, এক পশু অন্য পশুর প্রাণ বধ পর্য্যন্ত করে। মানুষেও ত তাহাই করে। মানুষে আরও কিছু করে,—যুদ্ধ করিতে গিয়া মানুষে প্রকৃতি-দত্ত দন্ত নখর আদির প্রয়োগে পরিতুষ্ট না হইয়া শত শত প্রাণনাশক অস্ত্রাদির উদ্ভাবন করে। আবার তাহাতেও কুলায় না বলিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অতি নীচ অতি ঘৃণার্হ অস্ত্রের সাহায্য লইতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি জীবনধারণমাত্রেই মানুষেরও চরম লক্ষ্য হয়, যদি এত বুদ্ধিকৌশল কেবল এক জীবন-ধারণার্থেই ফুরাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মানুষে মনুষ্যত্ব কোথায়?

অর্থ বলিলে শরীর বুঝায় এবং ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ভোগ্য যে সকল বিষয়, তাহাও বুঝায়। কাম বলিলে সন্তান-জননের ইচ্ছা বুঝায়, যে সকল ক্রিয়া দ্বারা সেই ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝায়, এবং তাহার অনুষঙ্গী অপরাপর যে সকল ইচ্ছার বিষয়

আছে, তাহাও বুঝায়। এ অর্থ, এ কাম পশুরও আছে, মানুষেরও আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই অর্থের এবং এই কামের উপরেই প্রতিষ্ঠিত! শরীর রক্ষা করিতে, বংশ রক্ষা করিতে আর এই দুইএর অনুষঙ্গী দুঃখ দূর করিতে কিম্বা সুখলাভ করিতে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের প্রয়োজন। ইহাই মাত্র যদি মানুষেরও প্রয়োজন হয়, যে অর্থ আর যে কাম পশুর সর্ব্বস্ব ধন, সেই অর্থ আর সেই কাম যদি মানুষেরও সর্ব্বস্ব ধন হয়, তাহা হইলে পশুর সহিত তুলনায় মানুষে কিসের বড়াই করিতে পারে ?

না। কেবল অর্থ আর কামই সর্ব্বস্ব হইলে, পশু অপেক্ষা মানুষ উৎকৃষ্ট হইতেই পারে না। কিন্তু এ কথা বর্ণাশ্রম সমাজের লোকেই বুঝিতে পারে, অন্যে বুঝিতে পারে না; অন্যের বুঝিবার অধিকারই নাই। এই কারণেই বলি যে, মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রম-সমাজই শ্রেষ্ঠ। আবার বর্ণাশ্রম সমাজেও, ব্রাহ্মণে ইহা যেমন বুঝিতে পারিবেন, ক্ষত্রিয়েরাও তেমন বুঝিতে পারিবেন না, বৈশ্য তেমন বুঝিবেন না, শূদ্রে তেমন বুঝিবে না; চণ্ডালে তেমন বুঝিবে না।

মানুষে কল করে, কারখানা করে বাণিজ্য করে, নানাপ্রকার ব্যবসা করে; বিবিধ শিল্পের আবিষ্কার করে, বিবিধ কলা-বিদ্যার চর্চ্চা করে; পশুতে এ সব করিতে পারে না সত্য; কিন্তু মনে রাখিও যে, পশুর এ সব করিবার কিছুই প্রয়োজন হয় না। মানুষ যে এ সব করিতে পারে, তাহাতে মানুষের অধিকতর বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু অর্থ-কামের সেবাতেই যদি সে শক্তির পর্য্যবসান হইল, তাহা হইলে ত বৃথা এ শক্তি! এই শক্তিরই আর এক নাম ঐশ্বর্য্য। কিন্তু শুধু ঐশ্বর্য্য যে বিড়ম্বনারও কারণ হইতে পারে! তবেই ঐশ্বর্য্য শ্রেষ্ঠ, তবেই ঐশ্বর্য্য পূজনীয়, তবেই ঐশ্বর্য্য সাধনীয়,—ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি বৈরাগ্য থাকে; যদি জ্ঞান থাকে আর যদি ধর্ম্ম থাকে। বৈরাগ্য-বিরহিত, জ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মহীন ঐশ্বর্য্য,—হয়, ঐশ্বর্য্যবন্তের ভোগমাত্র সিদ্ধ করিয়াই তৃপ্ত হইতে বাধ্য হয়; না হয়, তেমন ঐশ্বর্য্য সেই ঐশ্বর্য্যবন্তের সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়া উঠে।

কোন বিষয়েই যাঁহার রাগ অর্থাৎ আসক্তি নাই, সুতরাং কোন বিষয়ে যাঁহার দ্বেষ নাই, কোনও কিছুরই অভাবে যাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হয় না; সুতরাং কোন কিছু গেল গেল করিয়া যাঁহাকে শঙ্কাযুক্ত বা চঞ্চল হইতে হয় না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যই ঐশ্বর্য্য। শক্তি-প্রয়োগেরই নাম ক্রিয়া; ক্রিয়া বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চেতনাবান্ পুরুষের ক্রিয়া মাত্রেই ফলসন্ধান থাকে অর্থাৎ এই ক্রিয়া করিলে এই ফল হইবে, অতএব এই ক্রিয়া করা হউক,—এ সংকল্প স্থির থাকে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, যাহার যত জ্ঞান, তাহার ক্রিয়া তত শুভফলজনক হইতে পারে। অজ্ঞ জনের ক্রিয়াতে ফল-সন্ধান থাকিলেও অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সে ক্রিয়ায় বাঞ্ছিত

ফলের বিপরীত ফলও ফলিতে পারে। কেবল সর্ব্বজ্ঞজনের ক্রিয়াতেই সংকল্পের অনুরূপ ফল ফলে, জ্ঞানে ত্রুটী থাকিলেই সুতরাং ফলেরও তারতম্য ঘটিতে পারে। যেখানে বৈরাগ্য থাকে, জ্ঞান থাকে, সেইখানেই ধর্ম্মও থাকেন। অতএব বৈরাগ্য-বিভূষিত, জ্ঞানগরিষ্ঠ ধর্ম্মমণ্ডিত ঐশ্বর্য্যই ঐশ্বর্য্য। তাহাতেই বলিয়াছি যে, বৈরাগ্য-বিরহিত জ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মহীন ঐশ্বর্য্য হয়, ঐশ্বর্য্যবন্তের ভোগমাত্র সিদ্ধি করিয়াই তৃপ্ত হইতে বাধ্য হয়; না হয় তেমন ঐশ্বর্য্য সেই ঐশ্বর্য্যবন্তের সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়া উঠে।

ঐশ্বর্য্যের, বৈরাগ্যের, জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের সমবায়ই ব্রাহ্মণ্য। যে ব্রাহ্মণ-শরীরে এই ব্রাহ্মণ্য, সাধনার গুণে স্ফুরিত হয়, সেই ব্রাহ্মণদেহই প্রকৃত পক্ষে সদ্-ব্রাহ্মণ-দেহ। পরমেশ্বরে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে অত্যল্পই অন্তর,—সে অন্তর,—এই প্রাকৃভৌতিক দেহ মাত্র। সে ব্রাহ্মণের দেহ খসিলে পরমেশ্বর এবং ব্রাহ্মণ,—এ দ্বৈত আর থাকে না, মিলিয়া এক হইয়া যায়, ঈশ্বরের ব্রাহ্মণ্যমূর্ত্তি ঈশ্বরের শরীরেই বিলীন হইয়া যায়।

এই ব্রাহ্মণ্যই বর্ণাশ্রম-সমাজের মস্তক-স্বরূপ, ক্ষত্রিয় এ সমাজের বাহু, বৈশ্য ইহার উরু, শূদ্র ইহার পদ; চণ্ডাল পর্য্যন্ত এ সমাজ-দেহের বিস্তার। তাহার বাহিরে যে মনুষ্য আছে, তাহারা এই সমাজের কেশ-নখাদিরূপ মলস্বরূপ।

প্রকৃত সদ্‌ব্রাহ্মণ সুদুর্ল্লভ পদার্থ—তাহাতে সন্দেহ নাই। একে ত পুঞ্জপুঞ্জ সৌভাগ্য না থাকিলে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মলাভই হয় না; বিশেষরূপে সাবধান না থাকিলে ব্রাহ্মণত্বের বীজ রক্ষা করা যায় না, আর, অতি কঠোর সাধনা ভিন্ন ব্রাহ্মণ্যের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবে না। না হউক অত্যুৎকট সাধনা, না হউক পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যের প্রাপ্তি,—কিন্তু যতটুকু সাধনা, ততটুকু যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবী-পাবন, ভূদেব ব্রাহ্মণ এখনও বর্ত্তমান আছেন, শাশ্বত কাল বর্ত্তমান থাকিবেন, তবে তেমন ব্রাহ্মণের দর্শন লাভ দুর্লভ বটে। না ঘটুক দর্শন লাভ, কিন্তু সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রভাবেই জগৎ জীবিত আছে।

তমোগুণে অভিভূত, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, ম্লেচ্ছবুদ্ধি এ সব কথা জানে না, জানাইলেও বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া দিলেও অন্তঃকরণে ধরিয়া রাখিতে পারে না; কাজে কাজেই ম্লেচ্ছ-বুদ্ধি এ সব কথা মানে না। যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, যে ম্লেচ্ছ, সে কেবল অহং জানে; ম্লেচ্ছ জানে যে আমিই সব, আমি ছাড়া ব্রহ্ম আর কিছু নাই। ব্রাহ্মণ জানে যে, ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই জ্ঞানময়, ব্রহ্মই আনন্দময়, যেটা আমার 'আমি', সেইটাই কিছু নয়। বর্ণাশ্রম সমাজ ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ম্লেচ্ছাদির সঙ্ঘ অহং-তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। এই মতভেদ জন্যই, এই বুদ্ধি-ভেদ জন্যই, ব্রাহ্মণের সহিত ম্লেচ্ছাদির বিরোধ! অর্থ-কামে বিমূঢ় থাকিয়াও ম্লেচ্ছ মনে করে,—আমি বড়; অর্থ কামকে উপেক্ষা করিয়া,

অর্থ কামে অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারেন যে, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সামান্ত মনুষ্য কৃপারই পাত্র। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রকৃতির বশ, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে অজ্ঞান, ম্লেচ্ছ সম্পূর্ণরূপেই প্রকৃতির বশ, অতএব ম্লেচ্ছ প্রাকৃত মনুষ্য মাত্র। প্রকৃতি ব্রাহ্মণের বশে, অতএব ব্রাহ্মণ সংস্কৃত। লোকায়ত প্রত্যক্ষই ম্লেচ্ছের প্রমাণ, কিন্তু শাস্ত্রই ব্রাহ্মণের প্রকৃত চক্ষু। অন্তঃপ্রকৃতির তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া ম্লেচ্ছ বাহ্য প্রকৃতির শরণাপন্ন হইয়া আত্মত্রাণের চেষ্টা করে এবং ইহাকেই বিজ্ঞানচর্চ্চা বলে; ব্রাহ্মণ অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বাহ্য প্রকৃতিকে উপহাস করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণ জানেন যে, অন্তঃপ্রকৃতিকে বশ করাই প্রকৃত বিজ্ঞান। ম্লেচ্ছ পেটের দায়ে পাগল হইয়া বিষয়ের পিছনে ছুটিয়া বেড়ায়; ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়ের তুচ্ছতা অনুভব করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র এমন কথা বলেন না যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলেই প্রকৃত সদ্‌ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্র এ কথা বলেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মই ব্রাহ্মণত্বলাভের একমাত্র দ্বারস্বরূপ; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ভিন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণত্বলাভের,—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বলাভের অন্য উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন;—

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্‌॥"

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম আবশ্যক বটেই, তাহার উপর প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, সংস্কার আবশ্যক হয় এবং বিদ্যা আবশ্যক হয়। জন্ম, সংস্কার এবং বিদ্যা এই তিনের সমবায় হইলে তবে সদ্‌ব্রাহ্মণের সম্ভব হয়। অতএব ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, ব্রাহ্মণ রক্ষার ব্যবস্থা করা সর্ব্বথাই আবশ্যক, ব্রাহ্মণ থাকিলেই বর্ণাশ্রম-সমাজও থাকিবে।

বুঝি বা মায়ার কুহকে পড়িয়া ব্রাহ্মণ সকলেও ভ্রান্তি-সাগরে মগ্ন হইতেছেন। যে ধর্ম্মের সেবা করিলে অর্থের তুচ্ছতা বুঝিতে পারা যায়, সেই ধর্ম্মের সেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া কত শত ব্রাহ্মণ-সন্তানও আজি কালি অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হইতেছেন। আরও দুর্ভাগ্যবশে কেহ কেহ বা ধর্ম্মের সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। ভিতরের প্রকৃতিতে এবং বাহিরের প্রকৃতিতে যে অসুর নিরন্তর উপদ্রব করিয়া থাকে, ভিতরের দেবতাকে সেই অসুর চাপিয়া ধরিতেছে। ইন্দ্রিয় সকল কোথায় ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আজ্ঞাকারী হইবে, তাহা না হইয়া ব্রাহ্মণেরই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া হা বিষয় হা বিষয় করিয়া উন্মত্ত হইতেছে। পুণ্যবর্ষ এই ভারতবর্ষে দেবাসুরের সংগ্রাম ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, শাস্ত্রীয় শিক্ষার অভাব হইতেছে, কু-শিক্ষার প্রভাব প্রতিক্ষণে বিস্তার লাভ করিতেছে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যও যেন দিন দিন অভিভূত হইতেছে। সঙ্কট কাল উপস্থিত; সুশিক্ষা আবশ্যক, শাস্ত্রবিহিত শিক্ষাতেই এ উপদ্রবের শান্তি হইতে পারে, শাস্ত্রবিহিত শিক্ষা ভিন্ন শান্তির উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু শুধু শাস্ত্রের অক্ষর পড়িলেই শিক্ষা হইবে না। শাস্ত্র শুনা চাই, তাহার পর শাস্ত্র বুঝা চাই; তাহার পর শাস্ত্র মনে রাখা চাই। আগে শাস্ত্র জানিতে হইবে, তাহার পর শাস্ত্র মানিতে হইবে। শৌচ-আচার উপাসনার উপদেশ শাস্ত্রের নিকট লইয়া শৌচ-আচার-উপাসনার অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই ক্রমে ক্রমে রাগ-দ্বেষের তীব্রতা কমিয়া আসিবে; কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা ধৌত হইতে থাকিবে, বুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে, পরমেশ্বরে ভক্তি হইবে, তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইবে। তখন হইবে এ যুদ্ধে জয়, তখন হইবে বর্ণাশ্রম-সমাজের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা, তখন হইবে দারিদ্র্য-দুঃখ-দগ্ধ জগতের রক্ষা।

ব্রাহ্মণের জাগরণ (১)।

সুশিক্ষা যদি হয়, তবে উত্তম। কিন্তু সুশিক্ষার অভাবে বরং অশিক্ষা ভাল, মোটেই কোন প্রকার শিক্ষা না হয় সেও ভাল, তবু কুশিক্ষা যেন না হয়।

ইহা সত্য বটে,—কেহই বলে না যে, কুশিক্ষা হউক, কিম্বা কুশিক্ষার ব্যবস্থা হউক, কিম্বা কুশিক্ষার উপায় চেষ্টা হউক,—বরং সকলেই বলে যে, সুশিক্ষাই হউক। কিন্তু সুশিক্ষাই বা কি, আর কুশিক্ষাই বা কি,—তাহা লইয়াই যত গোল। যে শিক্ষাকে আমি কুশিক্ষা মনে করি, তুমি হয় ত সেই শিক্ষাকেই সুশিক্ষা বল। যে শিক্ষাকে তুমি সুশিক্ষা মনে কর, আমার বিবেচনায় হয় ত, সেই শিক্ষাই কুশিক্ষা। তবেই বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়া রাখা ভাল যে. কি শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিব, আর কি প্রকার শিক্ষাকেই বা কুশিক্ষা বলিব।

'সু' আর 'কু' সকলের পক্ষে একই প্রকার নহে। সব দেশে এক প্রকার নহে, সব সময়েও এক প্রকার নহে। এক জনের পক্ষে যাহা 'সু' তাহাই অন্য জনের পক্ষে 'কু' হইতে পারে, এখন যাহা আমার 'সু' অন্য সময়ে তাহাই আমার 'কু' হইতে পারে। ইষ্ট যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, লক্ষ্য যদি পৃথক্ পৃথক্ হয়, উদ্দেশ্য যদি একই না হয়. অথবা এক প্রকার না হয়, তাহা হইলে 'সু'ও ভিন্ন ভিন্ন হয়, 'কু'ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। সাধু যাহা চাহেন, চোরে তাহা চাহে না, সেই জন্য সাধুর যাহা 'সু' চোরের তাহাই 'কু' আর সাধুর যাহা 'কু' চোরের তাহা 'সু'। আমরা বর্ণাশ্রমী, বর্ণাশ্রম-সমাজ রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে শিক্ষার গুণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা হইতে পারে, সেই শিক্ষাই আমাদের সুশিক্ষা, আর যে শিক্ষায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের হানি বা বিঘ্ন হইতে পারে, তাহাই

১) "বঙ্গবাসী"—১৫ই বৈশাখ, ১৩১৩ সাল।

আমাদের কুশিক্ষা। কিন্তু সে শিক্ষা আমাদের সমাজের পক্ষে কুশিক্ষা বলিয়া, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্য সমাজেও কুশিক্ষাই হইবে এমন নহে। যাহার যেমন তাহার তেমন।

শিক্ষাতে এমন ভেদ হইবার কারণ আছে। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃত, অন্যের শিক্ষা প্রাকৃত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,—এ সব প্রকৃতির ধর্ম্ম; স্বভাবতই আপনা-আপনিই প্রত্যেক মানুষের উপর এই সকল ক্ষুধা,—তৃষ্ণাদির আধিপত্য থাকে; ক্ষুধা তৃষ্ণাদি উৎপাত করিয়া থাকে। ম্লেচ্ছের যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণাদি আছে, ব্রাহ্মণ-সন্তানদেরও সেইরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে; ম্লেচ্ছ-শিক্ষায় প্রকৃতির সেবা করিতে বলে, ব্রাহ্মণের শিক্ষায় প্রকৃতিকে জয় করিতে বলে। বর্ণাশ্রম সমাজে ব্রাহ্মণই প্রধান, ব্রাহ্মণই গুরু, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণই আদর্শ। কাজে কাজেই যাহারা নিম্নবর্ণের, তাহারাও যথাসম্ভব ব্রাহ্মণেরই অনুসরণ করে এবং অনুকরণ করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, সকল বর্ণেরই শিক্ষার মূলতত্ত্ব এক হওয়াতে শিক্ষাও অনেকটা একই প্রকারের হয়। তাহাতেই মোটামুটি বলা চলে যে, বর্ণাশ্রম-সমাজের একই শিক্ষা। কিন্তু বর্ণাশ্রম-সমাজে কতকটা একই প্রকারের শিক্ষা হইলেও এক শিক্ষাতেই সকল বর্ণের শিক্ষা হইতে পারে না। বর্ণভেদে শিক্ষারও ভেদ করিতে হয়। ম্লেচ্ছাদি সমাজে ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই; কাহারই জাতিগত প্রাধান্য নাই, সকলেই সমান, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ম্লেচ্ছাদি সমাজে শিক্ষার ভাবনা ভাবিতে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির ভেদ ত মনে করিতেই হয় না, ওরূপ ভেদ ভাবিবার কারণই থাকে না।

কিসে প্রকৃতিকে জয় করিতে পারা যায়, তাহাই ব্রাহ্মণকে শিখিতে হয়। তত্ত্ব চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ জানেন যে, জন্ম হইলে কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং সেই কিছুকাল পরে মরিতে হইবে। তত্ত্ব চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারেন যে, মরিলেই আমি ফুরাই না, কেহই ফুরায় না, আমাকে আবার জন্মিতে হইবে, সকলকেই আবার জন্মিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ইহাও বুঝিতে পারেন যে, এই জন্ম-মরণ-চক্র যত কাল ঘুরিতে থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-ফল অনুসারে জাতি, আয়ু এবং সুখ-দুঃখ সাক্ষাৎকাররূপ,—যে ভোগ তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। ইহাই যদি হইল,—তবে শরীরের জন্যে, কিম্বা বিষয়ের জন্যে,—এক কথায় অর্থের জন্যে, ব্যাকুল ব্যস্ত বা বিব্রত হইব কেন? ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে সত্য, কিন্তু আহার দিয়া এ ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে ত পারিব না। অতএব আহারকে তুচ্ছ করাই ভাল, ক্ষুধা তৃষ্ণাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করাই ভাল। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন পশুরই ধর্ম্ম; আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আমারও আছে সত্য, কিন্তু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া আমিও পশু হইয়া থাকিব কেন? যাহাতে আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার উপরে উঠিতে পারি, ক্ষুধা তৃষ্ণা যাহাতে আমাকে ক্ষিপ্ত বা চঞ্চল করিতে না পারে, ইন্দ্রিয়গণের ইঙ্গিত মাত্রে যাহাতে আমাকে লম্ফ ঝম্ফ করিতে না হয়, ইন্দ্রিয়গণ

যাহাতে আমার বশীভূত হয়, যাহাতে আমি ইন্দ্রিয়ের দাস না হই, যাহাতে ইন্দ্রিয় সকল আমারই দাসত্ব করে, তাহারই উপায় আমাকে করিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মণের চিন্তা, ইহাই ব্রাহ্মণের উপদেশ, ব্রাহ্মণ আপন শরীরের দ্বারা ইহারই সাধন করিয়া থাকেন। দেখাদেখি বর্ণাশ্রম-সামাজের অন্য অন্য লোকেও, যাহার যতদূর পারিবার কথা, সে ততদূর ব্রাহ্মণের দর্শিত পথেই চলিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ম্লেচ্ছ-বুদ্ধি এ পথে যায় না; যাইতে পারেও না। চক্রের মতন ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্ম মরণ হইয়া থাকে এবং জন্ম মরণ হইবেই হইবে, ম্লেচ্ছ-বুদ্ধিতে এমন ধারণাই হয় না। ম্লেচ্ছ মোটামুটি এইটুকু বুঝিতে পারে যে, জন্ম যেমন হইয়াছে, মৃত্যুও তেমনই হইবে, কিন্তু কেন জন্ম হইল, মৃত্যুই বা কি, মরণের পরেই বা কি হয়, ম্লেচ্ছ তাহা বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চেষ্টা করিলেও কেবল আঁধার দেখে, আঁধার দেখিলে ও ভাবনাই ছাড়িয়া দেয়। তখন ম্লেচ্ছ সোজাসুজি এইরূপ স্থির করে যে, ইন্দ্রিয় সকল যাহা চাহে, তাহা যোগাইয়া দিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ হয়, তাহাতেই আমি সুখী হই। ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতে পারিলেই সুখ! কর্ণ চাহে মধুর শব্দ, ত্বক্ চাহে প্রিয় স্পর্শ, চক্ষু চাহে সুন্দর রূপ, জিহ্বা চাহে তৃপ্তিজনক রস, নাসা চাহে অনুকূল গন্ধ, আর মন চাহে এ সবই। কিন্তু ম্লেচ্ছ বুদ্ধি ভাবে না, ভাবিয়া উঠিতে পারে না যে, বিষয়ভোগেই যদি সুখ হয়, তবে দুঃখ হয় কোথা হইতে? দুঃখ হয়ই বা কেন? দুঃখ যখন হয়, তখন বিষয়ের সংযোগে কিম্বা বিষয়ের বিয়োগেই দুঃখ ত ঘটিয়া থাকে! ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সংযোগে বা বিয়োগে বিষয়ের সুখ হয়, আবার ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সংযোগে বা বিয়োগে দুঃখও হয়; এটুকু বুঝিতে পারিলেও এইখানেই ম্লেচ্ছবুদ্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে; ইহার পর ম্লেচ্ছ-বুদ্ধি আর অগ্রসর হইতে পারে না। বিষয়ের ইহাই স্বভাব; বিষয় কখনও সুখের কারণ, কখনও বা দুঃখের কারণ। ইহা যখন হইবেই হইবে, আর, বিষয়ের সংযোগ বিয়োগ যখন ঘটিবেই ঘটিবে, তখন বিষয়ের এই সংযোগ বিয়োগ অপরিহার্য্য জানিয়া সেই সংযোগ বিয়োগ যাহাতে কেবলই সুখকর হইতে পারে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করা আবশ্যক, ম্লেচ্ছ বুদ্ধিতে এই চিন্তাই প্রবলতর হয়; ইহার ফলে ম্লেচ্ছ ক্রমাগত আরও চঞ্চল হয়, বাহ্য প্রকৃতির কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কারে তৎপর হয়, অনন্ত প্রকার আসুরিক বিদ্যার এবং শিল্প কলাদির সেবাতে মত্ত হইয়া থাকে। উন্মত্ত ম্লেচ্ছ মনে করে যে, বুদ্ধি-কৌশলে অনন্তের অন্ত বাহির করিব, মহামায়াকে মানুষের কিঙ্করী করিব; ম্লেচ্ছবুদ্ধির মোহ দেখিয়া মহামায়া প্রকৃতি কেবলই অট্টহাসি হাসেন। ম্লেচ্ছ যখন মনে করে যে, এই ধরিলাম, এই ধরিলাম, তখনই মহামায়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান, আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করেন। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণও ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া, আনন্দে আপ্লুত

হইয়া, প্রেমাশ্রুর ধারা বহাইয়া জগন্মাতার লীলা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণে আর ম্লেচ্ছে ইহাই ভেদ। দেবতায় এবং অসুরেও ইহাই ভেদ।

অতএব ব্রাহ্মণের শিক্ষার লক্ষ্য থাকে সংযমে, ম্লেচ্ছের শিক্ষায় লক্ষ্য থাকে বিলাসে। ম্লেচ্ছের শিক্ষাতে সংযম নাই এমন নহে, কিন্তু সংযম তাহার চরম উদ্দেশ্য নহে; সংযম তাহার অবান্তর-সাধন মাত্র। উদ্দাম বিলাসের আশাতেই সে সংযমে ম্লেচ্ছের প্রবৃত্তি। ম্লেচ্ছ যদি মোক্ষ বুঝিত, ম্লেচ্ছ যদি মন্ত্রশক্তির চালনায় দেবতার তুষ্টি সাধনায় অধিকারী হইত, তাহা হইলে ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ হইত না; ম্লেচ্ছ বিলাসের কুহকে ভুলিত না, ম্লেচ্ছ মায়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকিত না, ম্লেচ্ছ ভোগমাত্রে পরিতৃপ্ত হইবার বাসনাও করিত না। অর্থ আর কামই ম্লেচ্ছ-বুদ্ধির অবধি, ম্লেচ্ছ-বুদ্ধির চরম গন্তব্য;—ধর্ম্ম ম্লেচ্ছ-বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না, মোক্ষের ত কথাই নাই।

কিন্তু এ সব উচ্চ কথা সকলে বুঝে না, বুঝিবার চেষ্টা করে না, হয় ত চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, এ সব তত্ত্ব ধরিয়া বিচার না করিয়া, কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ম্লেচ্ছের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কোনও মতে আমাদের পক্ষে সুশিক্ষা হইতে পারে না।

বর্ণাশ্রম-সমাজ অতি প্রাচীন সমাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সমাজে বর্ণভেদ আছে, অন্য কোনও সমাজে বর্ণভেদ নাই; ব্রাহ্মণ এ সমাজে পূজ্য, অন্য সমাজে ব্রাহ্মণই নাই। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই অর্থে উপেক্ষা করিতে এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের সেবা করিতে ব্রাহ্মণ উপদিষ্ট হন এবং শিক্ষা করেন, অন্য সমাজে এভাবের উপদেশ, এপ্রকার শিক্ষা জন্ম হইতেই কেহই পায় না। জন্মগুণেই ব্রাহ্মণের বিষয়ত্যাগী হইবার কথা, কিন্তু আর সর্ব্বত্রই দেখিবে, এমন কোনও জাতি নাই যে, সেই জাতিকে জাতি সমাজস্থ অন্য অন্য লোকের সহিত বিষয়ের লোভে সংগ্রাম করিতে পাইবে না, কি বিষয়ের জন্যে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পাইবে না। এই শিক্ষার গুণেই ব্রাহ্মণ, জাতিকে জাতিই সমাজস্থ সকল বর্ণের পূজ্য। যে শিক্ষায় বর্ণাশ্রম-সমাজের এই নিয়মটুকু প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সেই শিক্ষা প্রচলিত থাকিলে অন্য অন্য বর্ণের লোকে আপনা হইতেই ব্রাহ্মণের গ্রাস-আচ্ছাদন নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিতে পারে। ইদানী এ শিক্ষা যেমন শিথিল হইয়া আসিতেছে, ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা যত অধিক অর্থলোভী হইয়া পড়িতেছে এবং অর্থলোভে শৌচাচারভ্রষ্ট হইয়া অধঃপাতে যাইতেছে, তেমনই সমস্ত বর্ণাশ্রম সমাজের দুর্দ্দশাও বাড়িতেছে; এ অধঃপাত যদি বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আর কিছু হউক না হউক, ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। জাপান, জাপান করিয়া আর যে ক্ষেপিবে ক্ষেপুক, অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ক্ষেপিতে দেওয়া হইবে না;

ইন্দ্রিয়-সেবার দুর্ব্বুদ্ধি যাহাতে ব্রাহ্মণ-সন্তানের না হয়, তাহার উপায় বিধান করিতেই হইবে। ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল পোড়া পেটের চিন্তায় ব্রাহ্মণকে অবসন্ন হইতে দেওয়া হইবে না। যিনি জীব দিয়াছেন, তিনি আহারের ব্যবস্থা অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছেন, এই অতি সত্য উপদেশ ভুলিয়া, কি অমানুষ করিয়া ব্রাহ্মণের সন্তান বিষয়ের জন্য যাহারা তাহার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিতে আসরে নামিবে, ডোম-ডোবলের সমান হইবে, অনাদিকাল হইতে ব্রাহ্মণের যে উচ্চপদ আছে, সে পদ হইতে চ্যুত হইবে, এমনটি কিছুতেই হইতে দেওয়া হইবে না।

আশঙ্কা করিবার প্রবল কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধের উৎপাতে যাহা হয় নাই, মুসলমানের উৎপীড়নে যাহা হয় নাই,—ইংরেজের মোহিনী মায়াতে তাহা কখনই হইবে না। ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে, ব্রাহ্মণ-সন্তানের আত্ম-দৃষ্টি হইবেই হইবে, আগুনের উপর ছাই-ঢাকা পড়িয়াছে, ফু দিতে দিতেই সে ছাই উড়িয়া যাইবে; কিঞ্চিৎ যজ্ঞকাষ্ঠ যোগাইয়া দিলেই আগুন আবার জাগিয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র-শিক্ষাই সে যজ্ঞকাষ্ঠ; তাহাই ব্রাহ্মণের সুশিক্ষা। অন্যে সে সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে না বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণে নিশ্চয়ই পারিবে।

খুব সোজা করিয়া একটা কথা বলি। ব্রাহ্মণ-সন্তানমাত্রেই যে যেমন পারে, সংস্কৃত শিখুক, ন্যূনকল্পে যেটুকু আচার অনুষ্ঠান না করিলে ব্রাহ্মণ্যই নষ্ট হইয়া যায়, সে আচার অনুষ্ঠানের অভ্যাস রাখুক, চাকুরীকে ঘৃণা করুক, জীবিকার জন্যে নিতান্তই যদি চঞ্চল হয়, তবে বৈশ্য-বৃত্তি অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্য অবলম্বন করুক আর অন্যের প্রণাম গ্রহণ করিবার সময়ে ভাবিয়া দেখুক যে, ও ব্যক্তিও মানুষ আমিও মানুষ, তবে মানুষ হইয়া মানুষকে প্রণাম করিতেছে, এমন কোন্ গুণ আমার আছে? বাহুবলেআমি বড় হইতে চাহি না, ধনবলেও আমি বড় হইতে চাহি না, আমি বড় জন্ম-গুণে, কর্ম্মগুণে এবং ত্যাগের গুণে; অন্যে যাহার জন্য লালায়িত, আমার দৃষ্টিতে তাহা তৃণবৎ তুচ্ছ।

এ ভাবের বীজ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণেই আছে, সামান্য সুযোগ হইলেই, এ বীজ অঙ্কুরিত হইবে, আবার ইহা পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইবে, আবার ইহাতে এই মর্ত্ত্য-লোকেই অমৃত ফলিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সংস্কার ও শিক্ষা (১)।

মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষার প্রয়োজন। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। মানুষের মতন মানুষ হইতে হইলে বিস্তর সাধনা করিতে হয়। যে যত শুনে, যত দেখে, যত বুঝে, যত ভাবে,—সে ততটুকু মনুষ্য, মানুষ্য হইতে হইলে, মানুষের পেটে জন্ম ত আবশ্যক বটেই, শিক্ষা ততোধিক আবশ্যক। স্বর্ণ একটি ধাতু। বিনা স্বর্ণে স্বর্ণের অলঙ্কার হইতে পারে না; কিন্তু স্বর্ণ হইলেই স্বর্ণের অলঙ্কার হয়, এমন নহে। স্বর্ণ ধাতুকে পিটিয়া গড়িয়া প্রস্তুত করিলে তবে স্বর্ণের অলঙ্কার হয়; তেমনই মনুষ্য-জন্ম মনুষ্যত্বের ধাতু বটে, সেই ধাতুকে গড়িয়া পিটিয়া হইলে তবে, মনুষ্যত্ব হয়। মনুষ্যত্বের এই গড়ন পিটনের নামই শিক্ষা।

যাহা যেমন অলঙ্কার, তাহার তেমনই গড়ন-পিটন। সেইরূপ যে মানুষের যেমন মনুষ্যত্ব, তাহার শিক্ষাও তদনুরূপ; সকলের মনুষ্যত্বও একই প্রকারের নহে, আর সকলের শিক্ষাও একই প্রকারের হইতে পারে না। বর্ণাশ্রম সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারি বর্ণের শিক্ষাও চারি প্রকারের। ব্রাহ্মণ সন্তান যদি শূদ্রের উপযুক্ত শিক্ষা পায়, তাহা হইলে সে কখনও সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে পারে না; অন্য অন্য বর্ণের শিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তবে আর একবার বলিয়া রাখা ভাল যে, শূদ্রের সন্তানকে ব্রাহ্মণের শিক্ষা দিলেও সে শূদ্র-সন্তান কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না। কেননা, শূদ্রের ধাতু পৃথক্, আর ব্রাহ্মণের ধাতু পৃথক্। শূদ্রের শূদ্র ধাতুতে যতটা খাইদ, আর যে প্রকার খাইদ,—ব্রাহ্মণ ধাতুর খাইদ পরিমাণেও তত নহে, প্রকারেও তেমন নহে। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছাড়া আর যত মানুষ আছে, তাহাদের ধাতুই অন্য প্রকার।

মানুষই কি, আর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গই কি,—সকল প্রকার জীবই নিজ নিজ জাতীয় সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই যে সংস্কারের কথা বলিতেছি, ইহা স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার,—প্রাকৃত সংস্কার। বর্ণাশ্রম সমাজে এই প্রাকৃত সংস্কারের অন্যথা করিবার নিমিত্তে আরও নানাপ্রকার সংস্কার বিহিত আছে। এই বিহিত সংস্কারগুলি বৈদিক সংস্কার অর্থাৎ বেদবিহিত সংস্কার; বর্ণাশ্রমের বাহিরে এই সব বৈদিক সংস্কার নাই। মন্ত্র-শক্তি এই সকল বিহিত সংস্কারের প্রধান সাধক। বিহিত দ্রব্যের সংযোগে মন্ত্র-শক্তির যথাযথ প্রয়োগ হইলে এই সকল সংস্কার সিদ্ধ হয়। কাজে কাজেই দ্রব্যাদিতে কিম্বা দ্রব্যাদির বিহিত সংযোগে কিম্বা মন্ত্রের প্রয়োগে দোষ বা ত্রুটি থাকিলে, সংস্কারেও দোষ বা ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ-সন্তানকে

---

(১) "বঙ্গবাসী"—২২শে বৈশাখ, ১৩১৩ সাল।

সুব্রাহ্মণ করিতে হইলে এই সকল বিহিত সংস্কারের দিকে সাবধানে দৃষ্টি রাখা একান্তই আবশ্যক।

সংস্কার কাহাকে বলে, তাহা হয়ত, সকলে জানেন না। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা মোটা-মুটি এইটুকু বুঝিয়া রাখুন-যে, কোনও একটা কর্ম্ম বারংবার করাতে যখন অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মের দিকে আপনা আপনি কেমন একটা ঝোঁক হইয়া পড়ে; এই ঝোঁকই এক প্রকার সংস্কার। আবার যে পদার্থে যে শক্তি নাই, সে পদার্থে সেই শক্তির সঞ্চার হইলে, সে পদার্থেও সে শক্তির ক্রিয়া থাকে, ইহাও এক প্রকার সংস্কার। একটা উদাহরণ মনে করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই দেখুন, কোনও জড় পদার্থেরই এমন শক্তি নাই যে, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। একটুক্‌রা ইট ও জড় পদার্থ, একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে না; কিন্তু সেই ইটের টুক্‌রাটুকুকে ছুড়িয়া ফেলিলে, তাহা তখন সেই বেগে স্থানান্তরে যায়। যিনি সেই ইটের টুক্‌রাকে ছুড়েন, তাঁহারই শক্তি সেই ইটে সঞ্চারিত হয়, তাহাতেই সেই ইট তখন চলে! সেই সঞ্চারিত শক্তি ফুরাইয়া গেলে, কিম্বা প্রতিহত হইলে সে ইটের চলা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সঞ্চারিত শক্তিতে সেই ইটের টুক্‌রার যে বেগ হইয়াছিল, সেই বেগই একপ্রকার সংস্কার। কোনও সংস্কারের ফলে ক্ষণিক বা অল্পকাল স্থায়ী বিক্রিয়া হয়, কোনও সংস্কারের ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; কোন সংস্কারের ফলে বা ভাবান্তর জন্মিয়া যায় অর্থাৎ স্বভাবেরই অন্যথা হইয়া যায়। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করাতে কোনও কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয়; নিজের অভ্যাসের গুণেও কোনও কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয়; আবার দ্রব্যের গুণে বা মন্ত্রের গুণেও কোনও কোনও সংস্কার উৎপন্ন হয়। মোটামুটি এইটুকু বুঝিয়া রাখিলেই চলিতে পারে যে, সংস্কার এক প্রকার ভাবান্তর, আর যাহাতে সেই ভাবান্তর ঘটায় তাহাকেও সংস্কার বলা যায়। পুষ্করিণীতে পঙ্ক হইলে, পুষ্করিণীর তখন সেই এক ভাব হয়; পঙ্ক উদ্ধার করিলে সে ভাবের অন্যথা হইয়া পুষ্করিণীর ভাবান্তর হয়; এইরূপ স্থলে আমরা বলিয়া থাকি যে, এই পুষ্করিণীর সংস্কার হইয়াছে। পুষ্করিণীর সেই ভাবান্তরকে অর্থাৎ পঙ্কশূন্য অবস্থাকেও সংস্কার বলি, আর যেই পঙ্ক-উদ্ধার করাকেও সংস্কার বলি। প্রসবের স্বল্পকাল পরেই গোবৎস মাতৃস্তনে দুগ্ধের অন্বেষণ করিতে থাকে, গোবৎসকে কেহই বলিয়া দেয় না যে, ঐ স্থানে তোমার আহারীয় সামগ্রী আছে, আহার করিলেই তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। গোবৎসকে কেহই শিখাইয়া দেয় না, তবু যে গোবৎস অমন করে,—তাহার কারণই হইতেছে সংস্কার! গোবৎস যে সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সে সংস্কার তাহার প্রাকৃত সংস্কার। জন্মান্তরীয় ক্রিয়ার ফলে কতকগুলি সংস্কার হয়, আবার এ জন্মে ক্রিয়াবিশেষের ফলেও কতকগুলি সংস্কার হয়, আর অভ্যাসের গুণেও কতকগুলি সংস্কার হয়।

আমি যে বৈদিক সংস্কারের কথা বলিতেছিলাম, তাহা বেদে অর্থাৎ শাস্ত্রেই পাওয়া যায়, অন্য উপায়ে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না।

শাস্ত্রে যে সকল সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুই প্রকার সংস্কার জানিয়া রাখা আবশ্যক। আত্মীয় ব্যক্তির জন্ম হইলে বা মৃত্যু হইলে আমাদের যে অশৌচ হয়, তাহা এক প্রকারের সংস্কার; আর, বিবাহ, গর্ভাধান প্রভৃতি আর এক প্রকারের সংস্কার। অশৌচে যে সংস্কার হয়, তাহাতে অশৌচকালে বৈদিক কর্ম্ম-বিশেষ করিবার শক্তি আচ্ছন্ন বা নষ্ট হয়, আর বিবাহাদিতে যে সংস্কার হয়, তাহাতে বৈদিক কর্ম্মবিশেষে যোগ্যতাই জন্মে। তবেই এক প্রকার সংস্কার মলিনতার আপাদক বা ঘটক, আর অন্য প্রকার সংস্কার মলিনতা নষ্ট করিয়া শুদ্ধির বা শৌচের আপাদক বা ঘটক হয়।

বলিয়াছি যে, সাধারণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে বিস্তর সাধনা করিতে হয়,—ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে হইলে অতি কঠোর সাধনা আবশ্যক, ইহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মণের যে যে সংস্কার আবশ্যক, যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই ব্রাহ্মণের গৌরব বুঝিতে পারেন না, কিসে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না, এবং সেই জন্যে ব্রাহ্মণের পূজার প্রয়োজন, ব্রাহ্মণের সমাদরের প্রয়োজন, বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারেন না। সংস্কারের এবং শিক্ষার সামান্য পরিচয় পাইলেও অনেকে বুঝিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শিক্ষা কেন পৃথক্ হওয়া আবশ্যক, কেনই বা স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-সকলের উচ্ছেদ বা বিনাশ বাঞ্ছিত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি-বর্ণের স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রেষ্ঠ বর্ণ যে ব্রাহ্মণ, তাঁহার সংস্কারের এবং শিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাউক। অন্য অন্য বর্ণের সংস্কারের ও শিক্ষার বিষয় ইহা হইতে ক্রমশঃ বুঝিয়া লইলেই হইবে।

কাহাকেও ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, প্রথমেই তাহার জন্মের দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ পিতা, ব্রাহ্মণী মাতা না হইলে, কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না। অতএব প্রথমে জন্ম দেখিয়া, তাহার পরে যথোচিত সংস্কার ও শিক্ষার দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে।

কেবল ব্রাহ্মণ পিতা, ব্রাহ্মণী মাতা এইমাত্র হইলেই যে সদ্‌ব্রাহ্মণের বীজ পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। যে পিতা হইতে ব্রাহ্মণের বীজ পাওয়া যাইবে, সে পিতা প্রথমতঃ বীজ বপনের জন্যে পত্নীরূপ ক্ষেত্র দেখিয়া লইবেন, এবং সেই ক্ষেত্রের যথাবিধি সংস্কার করিয়া লইয়া যথাকালে তাহাতে বীজ বপন করিবেন। ক্ষেত্রের ঐ মূল সংস্কারের নাম গর্ভাধান। গর্ভাধান সংস্কারের দ্বারা বীজের এবং ক্ষেত্রের প্রাকৃতিক দোষ নষ্ট হইলে সেই বীজ ক্রমশঃ যথোচিত ভাবে পুষ্ট হইতে থাকে। বীজ ক্ষেত্রস্থ

থাকিতে থাকিতেই আরও দুইটী সংস্কার যথাক্রমে করিতে হয়। প্রথম, পুংসবন; দ্বিতীয়, সীমন্তোন্নয়ন; ইহার পরেই যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে শিশুর জাত-কর্ম্মরূপ সংস্কার করিতে হয়; তাহার পরেই শিশুর নামকরণ সংস্কার, তাহার পরে নিষ্ক্রমণ সংস্কার, তাহার পরে চূড়া সংস্কার, তাহার পরে উপনয়ন সংস্কার।

ইহা ছাড়া আরও বিবিধ প্রকারের সংস্কার আছে। এই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ শিশু বেদবিহিত শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়। তখন সেই ব্রাহ্মণ শিশু ব্রহ্মচর্য্য নামক প্রথম আশ্রমরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া এবং বেদাধ্যয়নের অধিকারী হইয়া বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে সেই মাণবক আচার্য্যের অর্থাৎ বেদগুরুর অনুমতি লইয়া যথাবিধি সমাবর্ত্তন করিবে। সমাবর্ত্তনের পর ব্রাহ্মণকুমার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যাবৎ পত্নী লাভ না করিবে, সে কাল পর্য্যন্ত স্নাতক-ব্রতাবলম্বী হইয়া থাকিবে। বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পত্নী গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমের বিহিত ধর্ম্ম পালন করিতে থাকিবে এবং যথাবিধি পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া বানপ্রস্থ নামক তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে, এবং বানপ্রস্থ ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হইলে, পরিশেষে যথাবিধি সর্ব্ব ধর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া চতুর্থ আশ্রমী অর্থাৎ ভিক্ষু হইয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে সেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন এবং যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যান।

ভাবিয়া দেখুন, ব্রাহ্মণ্য লাভের শিক্ষার ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারেন কি?

স্বদেশী। (১)

খবরের কাগজ দেখিয়া বুঝিতেছি যে, 'স্বদেশী' ঘুষ্টিঘোষণ যথেষ্টই হইতেছে। ঘুষ্টিঘোষণ যেখানে এত, সেখানে স্বদেশী কাজের পুষ্টিপোষণও কিছু না কিছু অবশ্যই হইতেছে। আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এ 'স্বদেশী' আমার মনের মতন নহে।

আমার মনের মতন না হইলেই 'স্বদেশী' যে পচিয়া গেল, তাহা নহে; সব কাজ সকলের মনের মতন কখনই হয় না। হয় ত একই সিদ্ধি, কিন্তু সাধকভেদে সাধনারও ভেদ হয়; না হয়, একে চাহে একপ্রকার সিদ্ধি, অন্যে চাহে অন্য প্রকার সিদ্ধি, কাজে কাজেই পন্থা নানাপ্রকার হইয়া দাঁড়ায়। সকল পক্ষেরই মন কতকটা খুঁৎখুঁৎ করিতে

(১) "বঙ্গবাসী"—২রা আষাঢ়, ১৩১০ সাল।

থাকে। এই স্বদেশী রকম-সকম দেখিয়া, আমারও খুঁৎখুঁতি হইতেছে। মনে হইতেছে যে, আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি অন্যভাবে স্বদেশী চালাইতাম; কিন্তু আমি জানি আমার ক্ষমতা নাই, কাজেই আমি খুঁৎখুঁৎ করিয়াই খালাস।

তবু এ স্বদেশী কেন আমার মনের মতন নহে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। যদি কোনও ক্ষমতাশালী কর্ম্মঠ পুরুষ আমার পছন্দসহি স্বদেশী ধরিতে পারেন, এবং তাহা ধরিয়া আর দশজনকে ধরাইতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। আমার কপালে সে আনন্দ থাকুক আর নাই থাকুক, যে স্বদেশী এখন চলিতেছে, তাহা কিসে আমার মনের মতন নহে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল মনে হইতেছে।

অনেক সামগ্রী দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়,—আসল আর নকল। আমার মনে হয়, যে, এখনকার এই স্বদেশীটা আসল স্বদেশী নহে, ইহা নকল স্বদেশী। ইংরেজী পড়িয়া শুনিয়া, জাপানী ভাবিয়া ভাবিয়া, এই নকল স্বদেশীর সৃষ্টিকরা হইতেছে। প্রেমের অনুরাগে এ স্বদেশীর উৎপত্তি হয় নাই, মাৎসর্য্যের বিদ্বেষেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এ স্বদেশীর পুষ্টিও ঐ প্রবৃত্তির বশেই হইতেছে। যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া এ কাজে আগুয়ান হইয়াছেন, স্বদেশের উপর তাঁহাদের ভক্তি নাই; বিদেশেই তাঁহাদের অচলা ভক্তি। স্বদেশকে ইঁহারা কোনও অংশেই বড় বলিয়া মনে করেন না, বরং ইঁহারা মনে করেন যে, এদেশ সর্ব্বাংশেই দীন-হীন—কাঙ্গাল এবং কৃপারই পাত্র; আমাদের দেশ বলিয়া এ দেশকে আমরা কৃপা করিব, কৃপা করিয়া দেশটাকে স্বর্গে তুলিয়া দিব, আমাদের কীর্ত্তিতে এদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দশের মাঝে এদেশ মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে, চাহিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে। বিদেশের উপরই ইহাদের ভক্তি ষোল আনা; এই স্বদেশকে বিদেশ করিয়া তুলিতে পারিলেই বুঝি, ইঁহারা কৃতকৃতার্থ হইবেন।

আমার মনে হয় যে, এ ভাবটা ভাল নয়। দেশের উপর এমন দয়া করার ভাব কাহারও কল্যাণকর নয়। দেশের সুসন্তান হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেশের মহত্ত্বের পরিচয় লইতে হয়, দেশের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে নিজের ক্ষুদ্রতাও আপনা-আপনি হৃদয়ঙ্গম হইবে। কৃপার ভাব ছাড়িয়া, সেবার ভাব সাধিতে হইবে। বাস্তবিক এদেশ মহতের দেশ, আমরাই অভাগা হইয়া দেশটাকে মাটি করিতেছি, এ ধারণা যখন মনের মধ্যে প্রবল হইবে, তখনই প্রকৃত স্বদেশীর কাজ আরম্ভ হইবে। বিকৃত স্বদেশীর কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা যদি কোনও দিন হয়, তবেই অলক্ষ্মী ছাড়িবে, লক্ষ্মী পদ্মাসনে বসিয়া পূজা গ্রহণ করিবেন।

বলিয়াছি যে, উপস্থিত স্বদেশী আসল স্বদেশী নহে, ইহা নকল স্বদেশী, ইহা প্রকৃত স্বদেশী নহে, ইহা বিকৃত স্বদেশী। তাহাই যদি না হইবে, তবে জয়োচ্চারণের

এত থাক্য থাকিতে, আমাদের সহস্র সহস্র মন্ত্র থাকিতে, 'বন্দে মাতরং' বলিয়া গগন কাটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে কেন? "জয় জনার্দ্দন," "জয় জগদম্বা" "জয় ভবানী" ইত্যাদী ধর্ম্মসূচক জয়ধ্বনি কাহারও মনে ধরে না কেন? উপন্যাসের 'বন্দে মাতরং' এমন ভাল লাগে কেন?

মুসলমানেরাও নাকি স্বদেশী ধরিতেছেন; কিন্তু লক্ষ্য করিও যে. তাঁহারা 'আল্লা হো আকবর' ছাড়িতেছে না। ভাবিয়া দেখ দেখি, "বন্দে মাতরমে' আর 'আল্লা হো আকবরে' মনের ভিতরে কিছু ভেদ আছে কি? যিনি উপাস্য, যিনি সর্ব্বাশ্রয়, যাঁহার কৃপার উপর নির্ভর না করিলে কোনও কার্য্যই সফল হয় না, তাঁহার শরণাগত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার ভাব ঐ "আল্লা হো আকবরে" প্রকট-রূপে বিরাজ করিতেছে কি না, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবে কি?

কিন্তু তোমাদের 'বন্দে মাতরং'টা কি? 'Rule Briatania'র সেবাদাসী পথে কুড়ানো 'Hail Mother' কে শাঁখাসাড়ী পরাইয়া চণ্ডীর পবিত্র মণ্ডপে বসাইবার চেষ্টা নহে কি? যে কোনও প্রকারে হউক, যে কোনও আকারে হউক, রাম নাম গ্রহণ করিতে তোমাদের এত ভয় হয় কেন?. ভগবানে তোমাদের কি বিশ্বাস নাই? না কি, তোমরা ভগবানের বিরোধী? মুসলমানেরা স্বদেশী হইতে সম্মত; কিন্তু তাঁহারা 'বন্দে মাতরং' ধরিতেছেন না; 'আল্লা হো আকবর' ছাড়িতেছেন না; ইহা দেখিয়াও কি তোমাদের চৈতন্য হয় না?

মুসলমানকে লইয়া এক্‌াকার করিবার কত চেষ্টাই না তোমরা করিতেছ! ভালবাসার সোহাগে তোমরা মুসলমানের দাড়ী চুমরাইয়া দিতেছ, মুসলমানের গায়ে হাত বুলাইতেছ, ভাই ভাই করিয়া কতই প্রীতি দেখাইতেছ, বুঝিতে পারি না এটা তোমাদের মৌখিক না আন্তরিক? যদি তোমাদের মনে কপটতা না থাকে, যদি মুসলমানকে জুটাইয়া তোমাদের আপন কাজ সারিয়া লইবার কু-অভিসন্ধি তোমাদের মনে না থাকে, যদি মুসলমানকে ভাই-ভাই বলিয়া, বোকা ভুলাইয়া কার্য্যোদ্ধারের কল্পনা তোমাদের মনে না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে একমন্ত্রে দীক্ষিত হও,—হয়, তাহাদিগকে 'আল্লা হো আকবর' ছাড়াইয়া 'বন্দে মাতরম্' ধরাও, না হয়—তোমরা ত নির্ব্বিকার পুরুষ,—তোমরাই 'বন্দে মাতরম্' ছাড়ো, 'আল্লা হো আকবর' ধরো!

আমার মনে হয় যে, উপস্থিত "স্বদেশী"টা 'পেট্রিয়টিসমের' নকল। এ স্বদেশীর ধাতুটুকু বিদেশী। কিন্তু কেমিকেল সোণায় সত্যিকারের কাজ হয় কি? যিনি কেমিকেল পরিয়া বাহার দেন, তিনি মনে মনে কখনই ভুলিতে পারেন না যে, আমার কাছে খাঁটি মাল নাই। সঙ্গে সঙ্গে ধরা না পড়িলেও তাঁহার মনে সর্ব্বদাই একটা 'কিন্তু' জাগিয়া থাকে। কেমিকেল সংগ্রহ করিয়া কাহারও দৈন্য দারিদ্র্য বাস্তবিক

কমে না; বরং দৈন্ত দারিদ্র্য একটুকু বাড়ে। কেননা যে পয়সার অভাব ঢাকিবার জন্মে কেমিকেল কেনা, কেমিকেল কিনিতে সেই পয়সাই আরও কিছু খরচ করিতে হয়, ইহাতে পুঁজি বাড়ে না; অভাবই বাড়ে। আপাততঃ মনে হয় বটে যে, অবস্থা লুকাইয়া দুই চারি জনকে ঠকাইয়া, কোনও রকমে এ যাত্রা কাটাইয়া আসিলাম, কিন্তু ফলে আপনা আপনিই ঠকিতে হয়। আমাদের স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া 'স্বদেশী' হওয়া, আর খাঁটি সোণা ফেলিয়া কেমিকেল কেনা,—একই কথা।

বড় অঙ্গের স্বধর্ম্মের কথা এখানে বলিতেছি না। সোজাসুজি সাধু-নীতিকেও অনেকে যে ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকে, আমি সেই ধর্ম্মের কথাই বলিতেছি। আমার মনে হয় যে, এই স্বদেশীর সঙ্গে শুধু যে ধর্ম্মের সংশ্রব নাই, তাহা নহে, অধর্ম্মের প্রচুর যোগ আছে। পারলৌকিক ধর্ম্ম দূরে থাকুক, এ স্বদেশীতে লৌকিক সাধুতারও অভাব আছে।

যাঁহারা এ স্বদেশীর পাণ্ডা, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, এদেশের লোকের যতই অধঃপাত হইয়া থাকুক না কেন, ধর্ম্মকে ষোল আনা বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। সত্য সত্যই যাহাদিগকে দেশের লোক বলিতে পারা যায়, পাড়াগাঁয়ে যাহাদের বাস, প্রাচীন ভাবের যাহারা দাস, তাহাদিগকে কোনও কিছুতে মাতাইতে হইলে ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই মাতাইতে পারা যায়, ধর্ম্ম বর্জ্জিয়া তাহাদিগকে কোনও কাজেই টানিতে পারা যায় না। পাণ্ডারা এটুকু জানেন, তাহাতেই দেশের লোককে ডাকিয়া, দেবতার মন্দিরে ইহাদিগকে দিব্য করাইয়া লয়েন। ইহা কি পাণ্ডাদের প্রবঞ্চনা নহে? পাণ্ডারা দেবতা মানেন কি? পাণ্ডারা দেব-মন্দিরের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন কি? পাণ্ডারা আপন কাজ উদ্ধারের জন্মে এইভাবে ছলনা করেন, ইহা সত্য নহে কি?

যাঁহারা স্বদেশীর পাণ্ডা, তাঁহারা প্রায়ই ইংরেজের ফেন-চাটা। আজন্ম তাঁহারা ইংরেজের ফেনই চাটিয়াছেন, এখন তাঁহারা মনে করেন যে, ফেন চাটিয়া আমরা মানুষও হইয়াছি। এ সব লোককে লইয়া কি দেশের উদ্ধার হইতে পারে? আমার ধারণা এই যে, চরিত্রহীন পুরুষের দ্বারা কানও কাজেরই সিদ্ধি হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ফেন-চাটাই যে চরিত্রহীন, বোধ করি, সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। দেখুন না কেন, যাঁহারা স্বদেশীর পাণ্ডা, তাঁহারা প্রায়ই চাকুরিয়া নহেন, অন্ত যে কোনও প্রকারে হউক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহাঁদের চাকুরী থাকিলে, ইহাঁরা স্বদেশী হইতে পারিতেন কি? এখনই যদি ইহাঁরা চাকুরী পান, তাহা হইলে ইহাঁরা স্বদেশী থাকেন কি? ডেপুটী-মাজিষ্টর হইতে হেড-কনেষ্টবল পর্য্যন্ত ফেন-চাটা চাকুরিয়ারা সকলেই ত এদেশেরই লোক; কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া সহজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন, এমন কয়জন আছেন? স্বদেশীর পাণ্ডা, আর বিদেশীর ফেন-চাটা বাস্তবিক ত একই হাঁড়ির ভাত! একটিকে টিপিয়া দেখিয়াই সমস্ত হাঁড়ির

ভাত বুঝা উচিত। একথা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি যে, ভক্তিমান্ কর্ম্মী না হইলে, পাষণ্ডের ভণ্ডামীতে ভুলিলে কার্য্যোদ্ধার হ'বে কি?

ধর্ম্ম-পরিচয়। (১)

ধর্ম্মের একটী নমস্কার আছে,—

'ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং
ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্ বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে
ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥'

এমন যে ধর্ম্ম, তাঁকে আমি নমস্কার করি। এমন কেমন,—না, এই জগৎ যে ধর্ম্মের দ্বারায় সুরক্ষিত, জগতের সুরক্ষার জন্য কোন কারণ নাই, ধর্ম্মই জগৎ সুরক্ষার একমাত্র কারণ। ধর্ম্ম আর কেমন,—না, ধর্ম্মই 'ধরা-ধারক', ধর্ম্মই ধরাকে ধরিয়া রাখেন; ধরা যে ধরিত্রীরূপে আছেন, সে কেবল ধর্ম্ম তাঁহাকে ধরিয়া আছেন বলিয়াই। অতএব বলিতে পারা যায় যে, ভুবনে যে কোন বস্তু আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের কাছে বা ধর্ম্মের সহিত তুলনায় কিছুই নাই বলিলেও চলে। এমন যে ধর্ম্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি।

যাঁহারা ইংরেজী শিখিয়া বিদ্বান হইয়াছেন, তাঁহারা 'ধর্ম্ম' এই সংস্কৃত শব্দটা শুনিলে ঝাঁ করিয়া মনে মনে একটা তর্জ্জমা করিয়া ফেলেন। কেহ ভাবিয়া লয়েন যে ধর্ম্ম —Religion, কেহ বা অনুগ্রহ করিয়া Virtue পর্য্যন্ত করিয়া লয়েন; কিন্তু ইহার অধিক বড় একটা কেহ কিছু ভাবেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমি কিন্তু ধর্ম্ম বলিলে অন্য পদার্থ বুঝি। উপরে ধর্ম্মের যে নমস্কার উদ্ধার করিলাম, সেই নমস্কার-শ্লোকের অর্থ আমি যেমন বুঝি, তাহা বুঝাইয়া বলিলেই 'ধর্ম্ম'শব্দে আমি যাহা বুঝি, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

যে ধরিয়া রাখে, সেই ধর্ম্ম। যাহা থাকিলে কোন বস্তুর সত্তা থাকে, যাহা গেলেই সে বস্তুর সত্তা নষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই আয়ুর হেতু, আয়ু ফুরাইলেই ধর্ম্ম সরিয়া যায়, ধর্ম্ম গেলেই আয়ু যায়। ততক্ষণই আয়ু থাকে, যতক্ষণ ধর্ম্ম থাকে। যতকাল ধর্ম্ম থাকে, ততকালই আয়ু থাকে। ব্যষ্টি সম্বন্ধে ইহা সত্য, সমষ্টি সম্বন্ধেও ইহা সত্য। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে এই কথাই বলিতে পারা যায়, জাতিবিশেষ সম্বন্ধেও এই কথা বলিতে পারা যায়। যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা বলিতে পারা যায়।

---

(১) "জাহ্নবী"—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সাল।

কতক্ষণ আগুন? আগুনের যাহা ধর্ম্ম, তাহা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই আগুন। আগুনের ধর্ম্ম যদি যায়, তাহা হইলে আগুনই যায়। একটা ঘট কতক্ষণ ঘট? যতক্ষণ ঘটধর্ম্ম সেখানে থাকে। যেখানে ঘটধর্ম্ম নাই, সেখানে ঘটও নাই। হিন্দু কতক্ষণ? হিন্দুধর্ম্ম যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণই হিন্দু। হিন্দুধর্ম্ম ফুরাইলে, হিন্দু জাতিও লোপ পাইবে।

কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, হিন্দু ফুরাইলেই মানুষগুলাও ফুরাইবে। হিন্দু ঘুচিয়াও মানুষ মানুষই থাকে। কেবল সে আর তখন হিন্দু থাকে না, এইমাত্র। একটাও হিন্দু মানুষ যদি না থাকে, তাহা হইলেও মানুষ থাকিবে। কেবল হিন্দু মানুষই থাকিবে না।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দুধর্ম্ম পৃথক্ পদার্থ, আর মানুষধর্ম্ম পৃথক্ পদার্থ। মনুষ্যত্ব থাকিলে যে হিন্দুত্ব থাকে, তাহা নয়; মনুষ্যধর্ম্ম এবং তাহার উপর, হিন্দুধর্ম্ম, এই দুইটা পদার্থের সমাবেশ একাধারে হইলে তবে সেই মানুষকেই হিন্দু-মানুষ বলা যায়।

ভেদাভেদ লইয়াই জগৎ। ভেদ আছে বলিয়াই জগতের বৈচিত্র্য; কিন্তু অভেদ না থাকিলে গোটা জগৎটাকে একটা জগৎ বলা চলিত না। জগৎ বলিলে একটা পদার্থেরই উপলব্ধি হয়, অথচ জগতে অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে। সেই অসংখ্য বিচিত্রতাতেই জগতের ভেদ, আর সেই বিচিত্রতার ভিতর একটা একত্ব থাকাতে তবে এই জগৎটা এক পদার্থ বলিয়া মনে করা যায়। গোড়াতে অভেদ থাকে, তাহার উপর ভেদের প্রতিষ্ঠা হয়;—তাহাতেই বিচিত্রতা হয়। তুলা আর কাপড় একত্র হইলে বালিশও হয়, তোষকও হয়। তুলা আর কাপড় উভয় স্থলেই অভিন্ন পদার্থ। বালিশেও যে তুলা যে কাপড়, তোষকেও সেই তুলা সেই কাপড়, কিন্তু ঐ তুলা ও কাপড়ের সমাবেশ বা সংযোগের বিভিন্নতা হওয়াতেই একটা হয় তোষক, অপরটা হয় বালিশ। ইহাকেই বলিতেছি অভেদের উপর ভেদের প্রতিষ্ঠা। যাহা ছিল এক, তাহাই হয় নানা। মনে কর, গোড়ায় যেন এক ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি মনে করিলেন যে, আমি এক আছি, নানা হইব। তখন সেই ব্রহ্মাই ভেদ-নিবেশ করিয়া এই জগৎ রচিয়া ফেলিলেন। বুঝিলে বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম এবং জগৎ গোড়ায় অভিন্ন; আবার ব্রহ্ম এবং জগৎ সৃষ্টিদশায় ভিন্ন।

যত সত্তাভেদ ততই ধর্ম্মভেদ। এ হিসাবে ব্যক্তি যত, ধর্ম্মও তত; কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ থাকিলেও কতকটা অভেদ থাকেই থাকে। সেই অভিন্ন অংশকে সাদৃশ্য বলে। বহু ব্যক্তির সাদৃশ্য আশ্রয় করিয়া একটা সমষ্টির কল্পনা করিলে, সেই সমষ্টির নাম হয় জাতি। 'ভূয়স্তদ্ধর্ম্মবত্ত্ব'কে সাদৃশ্য বলে। বহুপরিমাণে একই ধর্ম্ম যে যে আধারে থাকে, সেই সেই আধারে সাদৃশ্য আছে বলা যায়। তাবা হঁকাতে

যে ধর্ম্ম আছে, গুড়গুড়িতেও বহুলপরিমাণে সেই ধর্ম্মই আছে। এই কারণে তাবা হুঁকাকে আর গুড়গুড়িকে একজাতীয় বলা যায়। ধর্ম্মগত সাদৃশ্যই একজাতীয়তার মূল। বহু ব্যক্তির ধর্ম্ম এক হইলে তাহারা মিলিয়া একজাতি হয়। ধর্ম্মে ভেদ হইলেই জাতিতেও ভেদ হয়। বট, অশ্বত্থ, তাল, নারিকেল সকল গুলিতেই উদ্ভিদ্ ধর্ম্ম আছে। এ হিসাবে ইহারা সকলেই উদ্ভিজ্জজাতি। এখানে অনেকটা অভেদের উপর ধরাতেই ইহারা সকলে একজাতীয় হইল। কিন্তু ভেদমুখে ধরিলে যে যে উদ্ভিজ্জে বিশেষ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সাদৃশ্য আছে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় হইয়া যায়। এ বট গাছে, সে বট গাছে ও বট গাছে সাদৃশ্য বলিয়াই অর্থাৎ একই অসাধারণ ধর্ম্ম আছে বলিয়াই, বট আবার পৃথক্ একটা জাতি। এমনি করিয়া অশ্বত্থ এক জাতি, তাল এক জাতি, নারিকেল এক জাতি। বোধ হয় এইবার সকলেই বুঝিবেন যে, অসাধারণ ধর্ম্মই ভেদের কারণ, আর সাধারণ ধর্ম্মই অভেদের কারণ।

মানুষও জীব, পশুও জীব, পক্ষীও জীব, কৃমি-কীটও জীব। জীবধর্ম্ম ইহাদের সাধারণ ধর্ম্ম; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের অসাধারণ ধর্ম্ম ধরিয়া কেহ মানুষ, কেহ পশু, কেহ পক্ষী, কেহ কীট। ইহাদের ধর্ম্মভেদ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহাদের জাতি-ভেদও লোপ পাইবে, আর ব্যক্তিভেদও লোপ পাইবে।

এই যে ধর্ম্ম, ইহা মোটামুটি দুই প্রকার। এক ব্যক্তধর্ম্ম বা স্থূলধর্ম্ম, আর এক অব্যক্ত ধর্ম্ম বা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাই ব্যক্ত বা স্থূল, যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর হয় না, তাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যে যাহা দৃষ্টিগোচর হয়—বিনা অণুবীক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাও স্থূল, তাহাকেও আমরা সূক্ষ্ম বলি না।

কেবল জীবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া দেখিলে মানুষ আর পশু একই জাতি। মানুষের যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা ধরিলেই মানুষকে পশু হইতে ভিন্ন জাতি বলিতে পারা যায়। কেবল ক্ষুধা পিপাসা কাম নিদ্রা ভয় প্রভৃতি ধর্ম্ম ধরিয়া বুঝিতে হইলে মানুষে আর পশুতে আকৃতিগত ভেদ যতই থাকুক না কেন, বস্তুতঃ জাতিগত কোন ভেদ থাকে না। আকৃতিতে ভেদ—সেত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই থাকিবে; কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমান ধর্ম্ম বশতঃ সাদৃশ্যকে আশ্রয় করিয়া তবে মানুষকে এক পৃথক্ জাতি বলা হয়। নহিলে কেবল আকৃতিগত ভেদ আছে বলিয়া মানুষকে পৃথক্ জাতি ও পশুকে পৃথক্ জাতি বলা চলে না। আবার ক্ষুৎপিপাসারূপ ধর্ম্মমাত্র দেখিয়া জাতি-ভেদ ধরিতে হইলে তাহাতেও মানুষকে আর পশুকে পৃথক্ জাতি বলা চলে না।

এখন মানুষকে এক পৃথক্ জাতি, আর পশুকে অন্য জাতি কেন বলিয়া থাকি, তাহা দেখা ভাল। জীবন-ধারণে, মরণে, জননে, মানুষে পশুতে অভেদ। মানুষে কাঁচা সামগ্রী খায়, পাক করা সামগ্রীও খায়; পশুতেও পাক করা এবং কাঁচা উভয়ই

খায়; ইহাতেও অভেদ। মানুষে ঘর বান্ধিয়া বাস করে, অনেক পশু মানুষের করা ঘরে বাস করে। অনেক পক্ষী বাসা তৈয়ার করে, অনেক কীটেও ঘর তৈয়ারী করে। ঘর-বাড়ী করাতেও মানুষের অসাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না। ফিরিঙ্গীদের কুকুরকেও আমি চৌঘুড়ী চাপিতে দেখিয়াছি। চৌঘুড়ী চাপাতেও মানুষের অসাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না।

অনেকে মনে করেন যে, নানাধরণের বাড়ী-ঘর, তৈয়ার করিয়া, কল-কারখানা চালাইয়া, তারে-বেতারে খবরাখবর লইয়া, মানুষ যে বাহাদুরী করে, তাহাতেই তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। আমার কিন্তু এ কথা মনে ধরে না। মানুষের এই বাহাদুরীতে একটা অসাধারণ ধর্ম্ম ধরিয়া লইলেও এ অসাধারণ ধর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়াই আমার মনে হয়। আর এ অসাধারণ ধর্ম্মের ফলে মানুষকে পশু হইতে অধম বলিয়া মনে হয়। কেন আমার এমন মনে হয়, তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। এত কল-কারখানা, এত শিল্প-বিজ্ঞান,— ইহার চূড়ান্ত ফল কি? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? যদি জীবন ধারণই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পশু পক্ষীরা এ সব না করিয়াও জীবন ধারণ করে, সুতরাং পশু পক্ষীদেরই জিত। আর জীবনধারণের নিমিত্তে মানুষকে যদি এত করতে হয়, এত না করিলে যদি মানুষের জীবন কষ্টকর হয়; তবে মানুষেরই হার। মানুষে আস্তাবল করে, বানরে সেখানে বাস করে। এমন মানুষ চাহিয়া অমন বানর কি শ্রেষ্ঠ নয়? ছয় টাকা মণ চাউল;—মহারাজ হইতে মেথর পর্য্যন্ত বিব্রত; গাধা গরু শুয়ার কিন্তু বিব্রত নহে; কাহাকে বড় বলিব? মানুষকে না ঐ সব জন্তুকে? মরণ সকলের পক্ষেই নিশ্চিত, মরণ বারণ করিবার জন্য মানুষ যেমন বিব্রত, কোন পশুপক্ষী তেমন বিব্রত হয় কি? বোধ হয় না। তোমার চিকিৎসা বিজ্ঞান, তোমার হাঁসপাতাল-দাওয়াইখানা, তাহাতেই তুমি কোন্ বড় হইলে? ঠেলিতে ঠেলিতে ত সেই মৃত্যুতেই পর্য্যবসান, পশুপক্ষী ঠেলাঠেলি করে না, তাহাতেও মরে; মানুষেও মরে—কেবল বাড়ার ভাগ মরণ পর্য্যন্ত ঠেলাঠেলি করিয়াই মরে। ইহাতে মানুষের অসাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয় না।

আমার বিবেচনায় মানুষের অসাধারণ ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, কয়েকটা মোটা কথা মনে করিয়া লওয়া আবশ্যক। জীব মাত্রেই মনে করে যে, আমিই কর্ত্তা, আমি কিছু করি, তাহাতেই আমার বাঞ্ছিত ফল পাই; আমি যদি না করি, তাহা হইলে সে বাঞ্ছিত ফলও পাই না। ইহাকেই বলে পুরুষকার বুদ্ধি। এই পুরুষকার বুদ্ধি যে কেবলই মানুষের আছে তা নয়; পশুপক্ষী প্রভৃতিরও আছে। হাতী যে হাতী, সেও সার্কাসে নাচে; হাতী কেন নাচে?—হাতী ভাবে যে আমি—হাতী—অহং হস্তী শর্ম্মা, যদি না নাচি, তবে আজিকার খোরাকী পাইব না, উল্টে মার খাইব। আর যদি নাচি, তাহা হইলে খোরাকীও পাইব, মারের দায়েও রক্ষা পাইব; অতএব আমি নাচিব।

আমারি খোরাকীর—আমার ভয় নিবারণের আমিই কর্ত্তা। হাতীর এই পুরুষকার। তোমার হাইকোর্টের জজেরও তাই; চারি হাজার টাকার মাহিয়ানার লোভ আর গৃহিণীর গঞ্জনার ভয়। মানুষেও পুরুষকার, পশুতেও সেই পুরুষকার। এই পুরুষকারের মূলে থাকে অহং—কর্ত্তৃত্বাভিমান, আমিই কর্ত্তা। পুরুষকারেরই নামান্তর—কর্ম্ম, প্রযত্ন, চেষ্টা ইত্যাদি। এই গেল একটা মোটা কথা।

আর একটা মোটা কথা এই যে, সুবুদ্ধি মানুষে ঠেকিয়া বুঝিতে পারে, পুরুষকার দ্বারা সকল সময়ে সকল স্থানে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই, এমন একটা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া কখনও আমার সঙ্কল্পিত কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেয়, কখনও বা কৃত কর্ম্মের ফল পাইতে দেয় না। তখন চকিত হইয়া সুবুদ্ধি মানুষে চিন্তা করে যে, তাহার কারণ কি? কোন কারণই যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন অদৃষ্ট কারণ অবশ্যই থাকিবে। কেননা কারণ নহিলে ত কার্য্য হয় না, হেতু নহিলে ত ফল হয় না; সাধনা নহিলে ত সিদ্ধি হয় না। বাধা-বিঘ্নের কারণ আছে ইহা নিশ্চয়; সে কারণ দৃষ্ট নয় ইহাও নিশ্চয়। সুবুদ্ধি লোক তখন অদৃষ্ট কারণ খুঁজিয়া বেড়ায়। পুরুষকার ভিন্ন অদৃষ্টকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা—ইহাও আর একটা মোটা কথা।

মানুষে মানুষে আকৃতিতে যেমন ভেদ আছে, প্রকৃতিতেও তেমনি ভেদ আছে; সুতরাং বুদ্ধিতেও ভেদ আছে। তবে মানুষের সমষ্টি করিলে মানুষকেও দুই ভাগ করিতে পারা যায়। এক ভাগকে বলা যাউক সাধারণ ও অন্যভাগকে বলা যাউক অসাধারণ। কি সাধারণ, কি অসাধারণ উভয় প্রকার মানুষই বুঝিতে পারে যে, জ্ঞানের অভাবই পুরুষকারের বাধক। মানুষে যদি দেয়ালের ওপিঠে দেখিতে পাইত, দুই হাজার ক্রোশ, দশ হাজার ক্রোশ দূরে দেখিতে পাইত, দশ হাজার বৎসর বিশ হাজার বৎসর পরে যাহা হইবে, দেখিতে পাইত; তাহা হইলে পুরুষকার ব্যর্থ হইত না। দেশান্তরে বা কালান্তরে যে বিঘ্ন কিম্বা বাধা আছে, তাহা যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন প্রযত্নই নষ্ট হইবে, এমন সম্ভাবনা থাকে না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানই সব গোলের গোড়া,—এও একটা মোটা কথা।

যাঁহাদিগকে অসাধারণ মানুষ বলিতেছি, তাঁহারা ইহার উপর আর একটা কথা বলেন। তাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞানই প্রতিবন্ধক বটে; কিন্তু সে অজ্ঞান জ্ঞানেরই আবৃত্ত। তাঁহারা বলেন যে, কি মানুষ, কি পশু, কি উদ্ভিদ, কি পাথর-মাটী সবই জ্ঞানময়—পূর্ণজ্ঞান। কেবল সেই জ্ঞান অল্প বা অধিক পরিমাণে চাপা পড়িয়াছে এই মাত্র। যাহা দ্বারা এই জ্ঞান চাপা পড়ে, তাহারই নাম অজ্ঞান, প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা। এই অজ্ঞান সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই আপনা আপনি জ্ঞানের উদয় হয়। এই অজ্ঞানেরই তরতম অনুসারে এই অজ্ঞানেরই অল্প অধিক ভেদে ধর্ম্মেরও

ভেদ হয়। অজ্ঞান যত কম, ধর্ম্ম তত অধিক। উদ্ভিজ্জ, কীট, পতঙ্গাদি করিয়া ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই এই অজ্ঞানের অধীন ; কেবল ব্রাহ্মণে অজ্ঞানের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, আর নিম্নদিকে অজ্ঞানের ভাগ অধিক। যে অসাধারণ মানুষেরা এই কথা বুঝেন কিম্বা মানেন, তাঁহাদেরই এখনকার প্রচলিত নাম হিন্দু। কেবল হিন্দুরাই বুঝিতে পারেন কিম্বা মানেন যে, বুদ্ধিমন্ত জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ ; আর মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কেননা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা অল্প ; বৈশ্যের আরও অল্প ; শূদ্রের তাহা অপেক্ষাও অল্প ; ম্লেচ্ছ যবনাদি সাধারণ মানুষের আরও অল্প ; পশু পক্ষীর তদপেক্ষাও অল্প ; উদ্ভিজ্জের আরও অল্প ; অন্যান্য স্থাবরের নিতান্তই অল্প।

যাঁহারা ইংরেজীতে বিদ্বান্—শেষের কথাগুলি হয়ত তাঁহাদের পছন্দ হইবে না। কিন্তু পছন্দ, না-পছন্দ লইয়া ত কথা নহে। ধর্ম্ম-ভেদের পরিচয় বুঝাইতেই এ সব বলিতে হইতেছে। কেহ মানিবেন কি মানিবেন না, সে ভাবনায় অস্থির হইলে এখন আমার চলিবে না।

যাহা বলিলাম, তাহাতে বুঝা যাইবে যে, পুরুষকারের জাতিভেদ অনুসারে ধর্ম্মেরও ভেদ হয়। এইবার ধর্ম্মের স্বরূপ একটু ভাঙ্গিয়া বলিব। কাহারও কাহারও ধর্ম্ম উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিরই থাকে। যেমন আগুনের ধর্ম্ম, জলের ধর্ম্ম ইত্যাদি। এমন ধর্ম্মকে সিদ্ধ ধর্ম্ম বলা যায়। স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম বলিলেও চলে। আবার কাহারও কাহারও ধর্ম্ম কালের অপেক্ষা করে, অর্থাৎ উৎপত্তির ক্ষণে যে ধর্ম্ম দেখা দেয় না,—পরে তাহাতে সেই ধর্ম্মের প্রকাশ পায়, যেমন উদ্ভিদ্ জাতির ধর্ম্ম। প্রথমে বীজ-ধর্ম্মের প্রকাশ, তাহার পর অঙ্কুর-ধর্ম্মের প্রকাশ, তাহার পর ক্রমশঃ কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলের প্রকাশ। ইহাও এক প্রকার সিদ্ধ-ধর্ম্ম। তবে ইহাকে কাল-সাধ্য ধর্ম্মও বলা চলে। মানুষ প্রভৃতি জন্তুর শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতিও এই কালসাধ্য ধর্ম্ম। এই সিদ্ধ এবং কালসাধ্য ধর্ম্ম ছাড়া আর এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহা কৃতি-সাধ্য অর্থাৎ যত্ন করিয়া সাধনা করিলে তবে প্রকাশ পায়। সাধনা না করিলে প্রকাশ পায় না। আমরা যখন তখন যে ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকি, সে এই কৃতিসাধ্য ধর্ম্মের কথা। পুরুষকার করিলে, প্রযত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে, কর্ম্ম করিলে এ ধর্ম্মের উদয় হয়—না করিলে হয় না।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, ইত্যাদি যে সকল ধর্ম্মের কথা উঠে ; সে সমস্তই এই সাধ্য ধর্ম্ম। এই সাধ্য-ধর্ম্মভেদে মানুষের মধ্যে জাতিভেদ হয়।

ব্রাহ্মণও মানুষ ; আর ম্লেচ্ছও মানুষ। এ কথার অর্থ এই যে, এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহা ব্রাহ্মণেও থাকে আর ম্লেচ্ছেও থাকে। এই ধর্ম্মগুলি ব্রাহ্মণ এবং ম্লেচ্ছ জাতিরই সাধারণ ধর্ম্ম। উভয়ের এই সাধারণ ধর্ম্ম আছে বলিয়া উভয়

জাতিকে মানুষ বলা যায়। এই সকল সাধারণ ধর্ম্মের মোটের উপর একটা নাম মনুষ্য-ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব। কোন ব্রাহ্মণে যদি এই সাধারণ ধর্ম্মের অভাব কিম্বা অল্পতা থাকে তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হওয়া সত্বেও তাহার ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, না হয় নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু সে ব্যক্তির মনুষ্যত্বও মলিন হইয়াছে। তখন বলিতে হয়, সে লোকটা নিতান্তই অধঃপাতে গিয়াছে। আর যদি ম্লেচ্ছের সমান ধর্ম্মও সে ব্যক্তিতে থাকে, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, সে ব্যক্তির মনুষ্যত্ব আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব নাই। যদিবা ব্রাহ্মণত্ব থাকে, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণত্ব এত সঙ্কুচিত, এত ক্ষীণ,—এত মলিন যে, তাহার ব্রাহ্মণত্বই নাই বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম যদি কোন ব্যক্তির নাই বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তখন আমরা বলিয়া থাকি যে, এ লোকটা মানুষই নয় এটা পশু।

যে মানুষে অধিক ধর্ম্ম থাকে, সেই মানুষকেই উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়, যে মানুষে অল্প ধর্ম্ম থাকে, তাহাকে নীচ বা নিকৃষ্ট বলিতে হয়। ব্রাহ্মণজাতিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম, এই কারণেই ব্রাহ্মণজাতিই শ্রেষ্ঠ জাতি।

সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ইত্যাদি ধর্ম্ম মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। জাত্যংশে মানুষ যত উচ্চ, এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম সে জাতিতে তত অধিক থাকিবার কথা। ইহা ছাড়া, সে জাতিতে অতিরিক্ত অসাধারণ ধর্ম্মও থাকিবার কথা। যদি সেই অতিরিক্ত ধর্ম্ম কোন জাতিতে না থাকে, আর ঐ সকল সাধারণ ধর্ম্ম অধিক পরিমাণে না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে জাতি অধঃপাতে গিয়াছে। সেই অসাধারণ বা অতিরিক্ত ধর্ম্ম এবং অধিক পরিমাণে সাধারণ ধর্ম্ম যদি সেই জাতির কোন কোন ব্যক্তিতেও থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে জাতি বজায় আছে। ব্রাহ্মণের অসাধারণ ধর্ম্ম এবং অধিক পরিমাণে সাধারণ ধর্ম্ম এখনও অনেক ব্যক্তিতে আছে। তাহাতেই বলা যায় যে, ব্রাহ্মণজাতিও আছে।

যাহাকে সাধারণ লোকে গুণ বলে, মোটামুটি বলিতে গেলে ধর্ম্ম সেই গুণ। গুণ নানা প্রকার, সুতরাং ধর্ম্মও নানা প্রকার। ব্রাহ্মণের যে সকল অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহার মধ্যে একটা ধর্ম্ম হইতেছে—ক্ষমা, আর একটা অসাধারণ ধর্ম্ম—সন্তোষ। অপকার করিবার সামর্থ্য থাকিতেও যদি কোন অনিষ্টকারীর প্রত্যপকার না করা যায়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মকে বলে ক্ষমা। তোমার যাহা আছে, তাহার উপর অধিক পাইবার অনিচ্ছাকে বলে সন্তোষ। বেশ করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে মনে হয় যে, ক্ষমা কি সন্তোষ যেন সকল লোকেরই আছে; অন্ততঃ অনেক লোকেরই আছে। বাস্তবিক ক্ষমা বা সন্তোষ আছে কি না আছে, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। ক্ষমতা না থাকিলে, ক্ষমা থাকিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, কিম্বা

কোন কিছুর অভাব বোধ থাকিলে, সন্তোষ থাকিতে পারে না। আমাকে তুমি কটু কথা বলিলে, আমি তোমাকে চড় মারিতে পারি; কিন্তু মারিলাম না। ইহাতেই মনে করিও না যে, আমার ক্ষমা আছে। লোকে আমার নিন্দা করিবে, হয়ত সেই ভয়ে আমি চড় মারিলাম না। তাহা হইলে বস্তুতঃ লোকনিন্দা সহিবার ক্ষমতা আমার নাই বলিয়া চড় মারিলাম না। আবার স্থল বিশেষে হয়ত রাজদণ্ডের ভয়ে, কিম্বা অন্য কোন অনিষ্টের ভয়ে, আমি চড় মারিলাম না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে ক্ষমা চড় না মারিবার হেতু। আমার অক্ষমতাই চড় না মারিবার হেতু। এই অর্থে বলিয়াছি যে ক্ষমা, সন্তোষ প্রভৃতি ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের অসাধারণ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণের আরও অসাধারণ ধর্ম্ম আছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

উপরে আজন্ম-সিদ্ধ বা স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, কাল-সাধ্য ধর্ম্মের কথাও বলিয়াছি; এইবার কৃতি-সাধ্য বা প্রযত্ন-সাধ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

জন্মকালে কতকগুলি ধর্ম্ম বীজভাবে থাকে, প্রযত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে, সেই সূক্ষ্ম ধর্ম্মের প্রকাশ হইতে পারে; কিন্তু চেষ্টা না করিলে কোন মতেই সে ধর্ম্মের বিকাশ হয় না। এখনকার লোক যেখানে সেখানে, যখন তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেখিতে পায় না, তাহার কারণ এই যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তানে সেই জাতি-ধর্ম্ম সূক্ষ্মভাবে থাকা সত্ত্বেও সেই ধর্ম্মের প্রকাশ করাইবার প্রযত্ন বা চেষ্টা কখনও হয় নাই। তাহার উপর জাতীয় ধর্ম্ম সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিতে থাকে বটে; কিন্তু কাহারও অল্প থাকে, কাহারও বা অধিক থাকে; তাহাতেও প্রকৃত ব্রাহ্মণের দর্শন দুর্লভ হয়।

এই দেখ, কোনও ব্রাহ্মণের জাতীয় ধর্ম্মের বিকাশ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার পিতার সদ্‌ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত, তাহার মাতার সদ্‌ব্রাহ্মণের কন্যা হওয়া আবশ্যক। সেই মাতাকে ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা পিতার লাভ করা আবশ্যক। যথাশাস্ত্র গর্ভাধান হওয়া আবশ্যক, ক্রমে ক্রমে যথাশাস্ত্র সমস্ত সংস্কারই হওয়া আবশ্যক। তাহার পর উপনয়ন, তাহার পর ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ প্রথম আশ্রমের ধর্ম্মচর্চ্চা আবশ্যক; এবং হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিত্ব অথবা যথাক্রমে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস এবং তপস্যাদি আবশ্যক। এতগুলি হইলে তবে ব্রাহ্মণের সেই যে জাতীয় বীজভাব, তাহার প্রকৃত বিকাশ দেখিবার সম্ভাবনা হয়। 'মরাল ক্লাসবুক' পড়িলে, চা-বিস্কুট খাইলে, চুরুট-সিগারেট ফুঁকিলে, মোটা বেতনের চাকরী করিলে, গাড়ী-জুড়ি হাঁকাইলে যদি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বিকাশ হইত, তাহা হইলে—তোমরা দু'বেলা পথে ঘাটে পূর্ণ ব্রাহ্মণও দেখিতে পাইতে।

যাহা সাধ্য ধর্ম্ম, তাহা লাভ করিতে হইলে যথাবিধি সে ধর্ম্মের সাধনা করিতে হয়। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের যেমন অসাধারণ সাধনা আছে,—ক্ষাত্রধর্ম্ম, বৈশ্যধর্ম্ম ও শূদ্রধর্ম্ম প্রভৃতির তেমনই নির্দ্দিষ্ট সাধনা আছে। যেখানে সাধনার অভাব, সেখানে সিদ্ধির অভাব ত হইবেই। আমি সিদ্ধি দেখিতে পাইলাম না কিম্বা তুমি সিদ্ধি দেখিতে

পাইলে না, তোমার আমার পরিচিত কোন ব্যক্তিই হয়ত সিদ্ধি দেখিতে পাইলেন না; তাই বলিয়া সে সিদ্ধি যে মোটেই অসম্ভব, এমন মনে করা কখনই উচিত নয়। তোমার আমার মতন লোকের অভিজ্ঞতাই কতটুকু যে, তুমি আমি ঠিক করিব যে সম্ভব কি আর অসম্ভই কি?

আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে, অনেকেই যখন-তখন ধর্ম্মের কথা বলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করেন না। শিক্ষিত হিন্দুর ছেলে মোটেই জানেন না যে, হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ কি আর হিন্দুধর্ম্ম কেনই বা অসাধারণ। শিক্ষার অভাবই এই অজ্ঞতার একমাত্র কারণ।

আমার মনে হয় যে, এখন সব কথা বন্ধ করিয়া বিলক্ষণ ভাবে শিক্ষার চর্চ্চা হউক। কাহাকে কি শিখিতে হয়, কেমন করিয়া শিখিতে হয়, লোকে সন্ধান করিয়া একবার তা জানুক। জানিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণের অনুসন্ধান হইবে। কেননা বিনা প্রমাণে কিছুই জানিতে পারা যায় না। সাধারণ মানুষ কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কতটুকু জানিতে পারিবে? এই দেখ, মৃত্যুর পর আমি থাকিব কি থাকিব না, যদি থাকি ত কি অবস্থায় থাকিব, কোথায় কতকাল থাকিব, তাহার পরেই বা আমার কি হইবে, ইত্যাদি কথা ত প্রত্যক্ষ হইবার নহে; অথচ এ সব জানা আবশ্যক; কেননা আমি এখন যে কর্ম্ম করিতেছি, সে কর্ম্মের ফল যদি স্বর্গে বা নরকে পাইতে হয়, আবার জন্মান্তরেই যদি তাহার ফল পাইতে হয়, তাহা হইলে এখন কর্ম্ম করিবার সময়ে সাবধান হইয়া বুঝিয়া সুঝিয়া সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি, বা সে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি; কিন্তু যদি মৃত্যুর পরে কোন সংবাদই এখন না জানি, তাহা হইলে হয়ত এমন কর্ম্ম অনেক করিয়া ফেলিতে পারি যে, তাহার ফলে পরিণামে ভয়ঙ্কর কষ্ট পাইতে হইবে। অতএব পরকালের কথা অর্থাৎ মৃত্যুর পরের কথা জানিয়া রাখা নিতান্তই আবশ্যক।

পরকালের কথা শাস্ত্রেই জানিতে পারা যায়। শাস্ত্র ভিন্ন পরকালের কথা জানিবার অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রে আছে যে, মৃত্যুতে জীবের অন্ত বা ধ্বংস হয় না, মৃত্যুর পর স্বর্গে নরকে জীবের ভোগ হয়। তাহার পরও আবার জন্মান্তরে জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে নাই, তাহাও শাস্ত্রেই জানা যায়। শাস্ত্র ভিন্ন অন্য উপায়ে জানা যায় না।

শাস্ত্রে একথাও আছে যে, আকৃতিতে সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিতে সকল মানুষ একই প্রকার নয়। প্রকৃতি নাকি সূক্ষ্ম, তাহাতেই সে প্রকৃতির ভেদ সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায় না। এই প্রকৃতিভেদে মানুষ প্রথমতঃ দুই প্রকার; এক আঢ্য আর এক অনাঢ্য। এখন যাহাকে হিন্দু বলা হয়, তাহারাই আঢ্য। এই আঢ্য আবার চারি প্রকার। এক এক প্রকারকে বর্ণ বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই

চারি বর্ণ। এই বর্ণভেদ মানুষের করা নহে। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতি ভেদ এবং তাহার ভিতর আরও অসংখ্য প্রকার ভেদ যাঁহার করা, আমাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদ তাঁহারই করা।

শাস্ত্রে আরও এক কথা এই আছে যে, তাড়িত, তাপ, আলোক প্রভৃতি শক্তি-সকল যেমন আছে, তাহা ছাড়া আর এক প্রকার শক্তি আছে, তাহার নাম মন্ত্রশক্তি।

উপরে বর্ণভেদের কথা বলিয়াছি। ধর্ম্মভেদ লইয়াই এই বর্ণভেদ হয়, ইহা বোধ করি আর বুঝাইবার আবশ্যক নাই। ইহার উপর এক এক বর্ণের আবার আশ্রমভেদ আছে অর্থাৎ এক এক অবস্থায় এক এক প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম বলে। ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম। প্রথম আশ্রমে ব্রহ্মচারী, দ্বিতীয়ে গৃহস্থ, তৃতীয়ে বানপ্রস্থ, চতুর্থে সন্ন্যাসী। ক্ষত্রিয়ের তিন আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ। বৈশ্যের দুই আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য। শূদ্রের এক আশ্রম, কেবল গার্হস্থ্য। এই বর্ণভেদে এবং আশ্রমভেদে সাধ্য-ধর্ম্মের ভেদ হইয়া থাকে; তাহাতেই আমাদের ধর্ম্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের উপনয়নের পর প্রথম আশ্রম হয়, সমাবর্ত্তনের পর স্নাতক ধর্ম্ম এবং বিবাহে গার্হস্থ্য। স্থূল কথা এই যে, যেমন যেমন অধিকারের ভেদ হইতে থাকে, তেমনি তেমনি ধর্ম্মেরও ভেদ হইতে থাকে। যে আশ্রমে মন্ত্রশক্তিতে যাহার যেমন অধিকার, সে ব্যক্তি সে আশ্রমে সেইরূপ মন্ত্রশক্তির লাভে যত্ন করিতে পারে।

এই যে বর্ণভেদ, আশ্রমভেদ এবং ধর্ম্ম-ভেদের কথা বলিলাম, মোটামুটি এই ধর্ম্মের তিনটী মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তির নাম শৌচ, এক মূর্ত্তির নাম আচার, আর এক মূর্ত্তির নাম উপাসনা।

শাস্ত্র মানিব কেন, সে পৃথক্ কথা। সৌভাগ্যযোগে, সুবুদ্ধির উদয় না হইলে শাস্ত্র মানিবার সামর্থ্য জন্মে না। তবে সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ গুরুশুশ্রূষা করিলে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। শাস্ত্র জানিবার ইচ্ছা না হইলে শৌচ, আচার, উপাসনার ব্যাখ্যান করা বৃথা। সম্প্রতি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যিনি শাস্ত্রের পরিচয় না লইয়া শাস্ত্রে অবিশ্বাস করেন, তিনি নিতান্তই নির্ব্বোধ এবং দুর্ভাগ্য। অধিকন্তু আমি ধর্ম্মের উপদেশ দিতে উপস্থিত হই নাই। নিতান্ত সামান্য আকারে ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছি মাত্র। এইটুকু মনে রাখিলেই কৃতার্থ হইব যে, ধর্ম্ম আছেন বলিয়াই এই ধরিত্রীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন; ধর্ম্ম থাকাতেই তুমি আমি বাঁচিয়া আছি। আর যে পরিমাণে ধর্ম্মে আমাদের অনাস্থা বা অনাচার-অত্যাচার হইতেছে, সেই পরিমাণেই আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য বাড়িতেছে।

রাজভক্তির নিদর্শন। (১)

জনকতক নামজাদা হোমরা-চোমরা লোক পরামর্শ করিতেছেন যে, গবরমেণ্টকে ঠাণ্ডা করিবার নিমিত্ত দশে মিলিয়া রাজভক্তির একটা নিদর্শন লিখিয়া দেওয়া যাউক—এই ভাবের একটা কথা রটিয়াছে, তাই এ সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় কি তোমরা তাহা জানিতে চাহিয়াছ।

লোকে বলে, যাহা রটে, তাহার কতক কতক বটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঠিক খবরটা যে কি, তাহা না জানিয়া কেমন করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিব? তবে, এখনকার অবস্থা যে প্রকার, তাহার সবটা ধরিয়া, আমি যাহা মনে করি, তাহা বলিতে পারি। তাহাতে এখনকার রটনা আর ঘটনা বুঝিতে যদি কিছু সুবিধা হয় হউক। আর আমার কথা যদি কোন কাজেই না লাগে, নাই লাগুক। আমার কথাকে না বলা মনে করিয়াই তোমরা পরিতুষ্ট হইও,—আমিও তাহাতে অতুষ্ট হইব না।

"রাজভক্তির নিদর্শন" বলিলে কি বুঝিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রথমেই ত ভাষার গোল। গবরমেণ্ট ত সংস্কৃত লেখেনও না, সংস্কৃত বলেনও না; গবরমেণ্টের ভাষা ইংরেজী। আর তোমরা বলিতেছ "রাজভক্তি"—সেত সংস্কৃত শব্দ। গবরমেণ্ট ভক্তি চান কিনা, জানি না; যাহা চান তাহার নাম,—"লয়ালটি"। "লয়ালটি"তে ভক্তির ভাব যে থাকিতে হইবেই, এমন ত আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, একটু—"যে আজ্ঞা"র ভাব থাকিলেই যথেষ্ট "লয়ালটি" হয়। অমুক কাজ করো,—"যে আজ্ঞা।" অমুক কাজ করিও না,—"যে আজ্ঞা।" ইহাই 'লয়ালটি' বলিয়া জানি। ভক্তির সঙ্গে, প্রণয়ের সঙ্গে, কি স্নেহের সঙ্গে 'লয়ালটির' বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ কিছু ত দেখিতে পাই না। গবরমেণ্টের আসন ধরিয়া টানাটানি না করিয়া, আইন-কানুন মানিয়া, রেবিনিউ দিতে থাকো, টেক্স দিতে থাকো, সেস দিতে থাকো,—তাহা হইলেই বস! তোমার লয়ালটির গায়ে কখনই আঁচড় লাগিবে না। গবরমেণ্টের উপর যাহাতে অপ্রীতি হয়, এমন কাজ করিতে পাইবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না,—আজ কয়েক বৎসর হইল, এ মর্ম্মেরও একটা আইন হইয়াছে। আমি যাহাকে অপ্রীতি বলিতেছি, তাহার ইংরেজী নাম 'ডিসাফেকশন।' 'লয়ালটি'র খাতিরে এ আইনটাও মানিতে হইবে। তবে হাইকোর্টের একজন জজ "প্রীতির ভাবকেই অপ্রীতি বলিতে হইবে" আইনের এই মর্ম্মে যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, গবরমেণ্টের মেজাজ ঠিক থাকিলে সে ব্যাখ্যাটা না মানিলেও বোধ করি দোষ নাই। প্রীতি না থাকিলেই যে অপ্রীতি হইবে, ইহা ঠিক নহে। অপ্রীতি বলিলে বিদ্বেষই বুঝা উচিত।

---

(১) "বঙ্গবাসী"—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১৪ সাল।

গবরমেণ্ট ভালই করুন, আর মন্দই করুন, সে বিচার না করিয়া, দোষের দিকে ভালোর দিকে একেবারেই লক্ষ্য না করিয়া, গবরমেণ্টের উপর বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মাইবার সঙ্কল্প করিয়াই, কোন কিছু যদি করা যায় কি বলা যায়, তবেই এই আইনের পাল্লায় পড়িতে হয়। কিন্তু কোন ভাল আকাঙ্ক্ষা কিম্বা অমঙ্গলের আশঙ্কা প্রকাশ করিলেই যে, 'লয়ালটিতে' খুঁৎ হইবে, ইহা ত কিছুতেই মনে হয় না। যিনি ডাকিয়া হাঁকিয়া 'স্বরাজ' চাহেন, তাঁহারও নিখুঁৎ 'লয়ালটি' থাকিতে পারে। কিন্তু 'স্বরাজ' চাহেন বলিয়া, যদি তিনি গবরমেণ্টের উপর জোর জুলুম করিতে চান, কিম্বা করিতে বলেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আইনের ফাঁদে ধরা পড়িবেন।

এই ত হইল গবরমেণ্টের সঙ্গে এদেশের লোকের সম্বন্ধ। ইহাতে রাজভক্তির যে নিদর্শন একটা কিসে লাগিবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। রাজভক্তির নিদর্শন ব্যাপারটা কি, তাহাও ত বুঝিতে পারিতেছি না। 'ওগো আমরা লয়াল'—এই কথা কয়টা কলাপাতায় কি কাগজে লিখিয়া দিলে, কোন পক্ষেরই মাহাত্ম্য নাই, বরং মজাদার লোকে মনে করিতে পারে যে, গবরমেণ্টকে ঠাট্টা করাই হইতেছে। তবে কিন্তু খ্যাপাকে ঠাণ্ডা করিয়া, খ্যাপামী থামাইবার মতলব যদি থাকে, তাহা হইলে সে পৃথক্ কথা, আমি তার হাঁ'—তেও নাই, না'—তেও নাই।

ভালবাসায় কবুলতি হয় না। তার এ দেশে কবুলতির আবশ্যকও নাই। কেননা, এখনকার বাঙ্গালী, গোরার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, গোরার পিরীতের বানে, একেবারে গা ঢালিয়া দিয়াছে। যেখানে দাস-খতে দেহ-মন-প্রাণ বাঁধা, সেখানে আবার কবুলতির কথা কেন?

দাস-খতে দেহ-মন-প্রাণ বাঁধা—কাহার? আমি বিজ্ঞাসা করি,—নয় কাহার? এই যে, আমাদের দেশের মাথার মণি,—আমাদের সমাজের প্রাণ-সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত আপন পিতৃ-পুরুষের সঙ্গে একবারে কাটা-ছাড়া করিয়া ফেলিয়াছেন, সে কি ঐ দাস-খতের দরুণ নয়? যে জলাঞ্জলির প্রত্যাশায় পিতৃপুরুষগণ বংশধর রাখিয়া যান, তাহার বদলে শাস্ত্রে জলাঞ্জলি, নিজের পূর্ব্বপুরুষকে জলাঞ্জলি, সন্তানদিগকে সূতিকাগার হইতেই ইস্কুল-কলেজে তপস্যা করিতে পাঠাইয়া, নিজের পিণ্ডে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতেছেন,—ইহা কি দাস-খতের দায়ে নহে? দাস-খত না থাকিলে, ভট্টাচার্য্য কাটাইয়া কেহ কি রায় বাহাদুর হয়? শুধু ঐ একদিকেই দেখিতে হইবে কেন? এখন,—

'যে দিকে ফিরাই আঁখি,
গোর-ময় সকলি দেখি।'

ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? না, কি অস্বীকার করিতে চায়? বাঙ্গালীর ছেলে,—সাজে ফিরিঙ্গী, কাজে ফিরিঙ্গী,—চলিতে ফিরিঙ্গী, বলিতে ফিরিঙ্গী,—

কিরীঙ্গীয়ানা এখন যে আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। ভালবাসার প্রমাণ আর কিছু বাকী আছে নাকি?

এই যে আমরা দিবানিশি লাথি ঝাঁটা খাইয়া, অবার পাইলে, কদাচ কখনো মাসের কান্না কাঁদিতে বসি,—সেটা যে পিরীতেরই কোঁদল, তা আমরাও জানি, গবরমেণ্টও বুঝেন। গবরমেণ্টের রাজ্য চালাইয়া দিতেছি—আমরাই ত। গবরমেণ্টের হাকিম সাজিয়া, আমরাই আমাদের বাপখুড়াকে জেলে ঠেলি; গবরমেণ্টের পুলীশ সাজিয়া আমরাই আমাদের মা-মাসীকে ধরিয়া বাঁধিয়া আদালতে হাজির করি। আমরাই গবরমেণ্টের আমলা সাজিয়া, টেক্স আদায় করিতে গিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ঘটী বাটী কাড়িয়া আনি; আমরাই এখন শিক্ষক হইয়া বেদ ভুলাইয়া, বালকদিগকে শয়নে জাগরণে বিলাতী বুলি বলাই। পিরীত চটিলে এ সব করিতাম কি? মন ভাঙ্গিলে গবরমেণ্টের কাছে মানের কান্না কাঁদিতাম কি? বাস্তবিক এ গবরমেণ্টকে আমরা যেমন ভালবাসি, এমন ভালবাসা এ জগতে আর কেহ কাহাকেও কখনো বাসে নাই। মুখে আর পরিচয় দিতে হইবে কেন? গবরমেণ্টের জন্য আমরা লজ্জা ছাড়িয়াছি, কুল ছাড়িয়াছি, শীল ছাড়িয়াছি, জাতি ছাড়িয়াছি, ধর্ম্ম ছাড়িয়াছি,—এখন মুখে কিছু বলিলেই বা কি বাড়িবে? আর মুখে কিছু না বলিলেই বা কি কমিবে?

তবে যে মাঝে মাঝে একটু গোল বাধা গোছের হয়, তাহার কারণ আছে। আবদারের নাকি নানান আকার, তাই আমরা যখন একটা একটা আবদার ধরি, তখনই একটু একটু গোল বাধার মতন হইয়া উঠে। যখন আমরা আবদার ধরি যে, এই দেখ, আর আমার "অন্তর্গৌরঃ বহিঃ কৃষ্ণঃ" নাই—ভিতর বাহির সবটাই ধবল হইয়া গিয়াছে, তখনই গবরমেণ্ট একবার বলেন যে, না, তা ত কই এখনও হয় নাই; এখনও যে তোমার বহিঃকৃষ্ণ—বাহিরটা কালো। ঐ দেখ, এখনও তোমার চুল কালো, তোমার রং এই কালো, তোমার চখের তারা কালো;—ঠিক সমান রূপ না হইলে ত সারূপ্য হয় না।

আমাদের সবাই এ সব বুঝে না। সারূপ্য এক রকমের মুক্তি হয় বটে; কিন্তু সারূপ্যের স্বরূপ সবাই ত জানে না। আমি এ সকল কতক কতক বুঝি বটে, কিন্তু একা আমি বুঝিলেই কি, আর না বুঝিলেই কি? তাইতেই বুঝিলেও বড় একটা আমি বলি না। তবে, তোমরা খোঁচাখুচি করিতেছ, কিছু না বলিলে নয়, তাই দু'টা কথা বলিলাম। আমার অন্তরের ভাব যদি জানিতে চাও, তবে আমি বলি, কবুলতির কথাও তুলিও না,—দাস-খতও ভুলিও না। আর আমি নিজে সেই নির্ব্বাণ চাহিয়া বসিয়া আছি।

জীবনকাঠি—মরণকাঠি। (১)

পৃথিবীতে কত মহাদেশ—কত দেশ—কত প্রদেশ—কত নগর,—কত গ্রাম,—কত পল্লীই আছে। আর, সব জায়গাতেই মানুষও আছে। কিন্তু সব জায়গার মানুষ এক রকম নয়। তা থাকুক নানা রকম মানুষ; থাকুক চেহারার ভেদ, পোষাক পরিচ্ছদের ভেদ, খাদ্যাদির ভেদ, আচার-ব্যবহারের ভেদ, কিন্তু ভারতবর্ষে একটা যে বিশেষ ভেদ আছে, পৃথিবীর আর কোথাও সে ভেদটী নাই। মানুষের ভিতর বর্ণভেদই সে ভেদ। মানুষের ভিতর কতকগুলি ব্রাহ্মণ, কতকগুলি ক্ষত্রিয়, কতকগুলি বৈশ্য, কতকগুলি শূদ্র;—পৃথিবীর আর কোথাও ত এ ভেদ দেখি না। এটা একটু ভাবিবার কথা নহে কি? একটু তলাইয়া বুঝিবার কথা নহে কি?

লড়াই করিয়া, কল-কারখানা বানাইয়া, কারবার ফলাইয়া, জাপান,—এখন ইউরোপ আমেরিকার সমকক্ষ হইয়াছে। কোরিয়া যে কোরিয়া,—সেখানেও আমেরিকার সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান চলে; জাপানে ত চলেই!

আমরা—এই বর্ণভেদ-ওয়ালারাও—মনে করিলে যে লড়াই করিতে পারি না, কল গাড়িতে পারি না, জাহাজ চালাইতে পারি না, ভবঘুরে হইয়া ব্রহ্মাণ্ডময় বিবিধ ব্যাপার করিয়া আসিতে পারি না, তাহা ত মনে হয় না।

বরং মনে হয় যে, ইচ্ছা করিলে অল্প চেষ্টাতেই আমরাও জাপানের সমকক্ষ হইতে পারি,—ইউরোপের সমকক্ষ হইতে পারি,—মার্কিনের সমকক্ষ হইতে পারি, জগতের যে যেখানেই আছে, তাহার সমকক্ষ হইতে পারি। শুধু সমকক্ষই কেন,—সবার উপর হয় ত টেক্কাও দিতে পারি। তুমি বলিবে যে, ঘরের কোণে বসিয়া এমন বড়াই করা সোজা, বাস্তবিক কাজে কুলাইতে পারা যায় না। কিন্তু যাহা বলিলে বল, এ বড়াইটা ফাঁকা বড়াই বলিয়া কোন মতেই আমার ধারণা হয় না। কেন এ ধারণা হয় না, তাহা শুনিবে কি?

জগদীশ বসু বর্ণীরই ছেলে; তাহাও সর্ব্বোচ্চ বর্ণের নহে। সংসার জুড়িয়া নাম-ডাকওয়ালা এক ডজন বিজ্ঞান-পণ্ডিত আছেন কিনা সন্দেহ। জগদীশচন্দ্র বাবু এই এক ডজনের মধ্যে একজন; আর তাহাতে জনের মত জন। সুরেশ বিশ্বাসও বর্ণীর ছেলে, সেও ব্রাহ্মণের ছেলে নয়। সুরেশ বিশ্বাস বুঝি এখন ব্রেজিলের বড় সেনাপতি। ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশ। সে দেশ এখান থেকে বোধ হয় ছয় হাজার ক্রোশ দূরে। সুরেশ বিশ্বাস,—বীরপণা দেখাইয়াই এত বড় হইয়াছে। হাঁড়ির ভাত দুইটা একটা টিপিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, হাঁড়িকে হাঁড়ি ভাত সিদ্ধ হইয়াছে, কি হয় নাই। দুইটী বর্ণী সন্তানের নাম করিলাম,—তোমার যদি

(১) "বঙ্গবাসী"—১১ই আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

সাধ থাকে, তবে অনায়াসে এমন নামের মালা গাঁথিয়া লইতে পারো। তাহাতেই ত বলিতেছি যে,—আমার ধারণা এই যে, আমরা বর্ণভেদ-ওয়ালারা, ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর সকল দেশের লোকের সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারি।

পাল্লা দিতে পারি, কিন্তু পাল্লা দিতে গেলেই ঐ বর্ণভেদটুকু ছাড়িয়া দিতে হয়। বর্ণভেদ ছাড়িতে কোন মতেই আমার মন উঠে না। ঐ বর্ণভেদই যে আমাদের সর্ব্বস্ব। ঐটাই যে আমাদের শ্বাস। উহাই আমাদের বিশেষ। জগৎ জুড়িয়া কাহারও ও-টী নাই,—কেবল আমাদেরই আছে। আর—আছে বলিয়া আছে, অনাদি কাল হইতে আছে। যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য,—যতদিন পৃথিবী, ততদিনই আমরা এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র হইয়া আছি। আর সব উলট-পালট হইয়া গিয়াছে; জগতে কত আসিল, কত গেল; কত মাথা তুলিল,—কত মাটিতে মিশাইল,—কিন্তু আমরা ছিলাম,—সেই অনাদিকালে ছিলাম; আর এই আজিও আছি। ইহার পর আর আমরা থাকিব না,—এমনটা মনে করিতেও আমার বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু এ বুক ফাটিবে না; মাথার উপর ভগবান্ আছেন,—নিশ্চয় বলিতেছি, জোর করিয়া বলিতেছি,—পৃথিবী যতদিন থাকিবে, পৃথিবী ততদিন ব্রাহ্মণশূন্য হইবে না। আর —ব্রাহ্মণ যদি থাকে, তবে সবই থাকিবে। ভূদেব ব্রাহ্মণ—পৃথিবীর জলন্ত—জীবন্ত —সাক্ষাৎ দেবতা এই ব্রাহ্মণ—এমন ব্রাহ্মণ থাকিবে না, এমনও কি হয়?

কিন্তু আমরা বড় বেয়াড়া হইয়াছি; বড় গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ছার বরফ-ব্রাণ্ডির লোভে অমূল্য পরম ধন পথে পথে বিলাইয়া দিয়া, দুই হাতে ছড়াইয়া দিয়া, আমরা সাধে-সাধে কাঙ্গাল হইবার কামনা করিতেছি। বল দেখি, বলিতে কি ইচ্ছা হয় না যে, ধিক্ আমাদিগকে!

আমরা অন্যের মত হইতে পারি তাহা দেখাইয়াছি, কিন্তু অন্যেরা ত আমাদের মত হইতে পারে না। আমরা যদি নিতান্তই ছোট, নিতান্তই নগণ্য, নিতান্তই হেয়, তবু যে আমরা জগতের চেয়ে বড়। রুষিয়ার ৎ-জার, ইংলণ্ডের এম্পারার, জর্ম্মণীর কৈশর, জাপানের মিকাডো, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট যদি আপন আপন মাথার মুকুট একজন পথ-ভিখারী ব্রাহ্মণের—আজিকার দিনের ব্রাহ্মণের—পদতলে প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণের পাদুখানি ধরিয়া সর্ব্বস্ব দিবার অঙ্গীকার করিয়া প্রার্থনা করেন—"আমাকে ব্রাহ্মণ করিতে হইবে না, ক্ষত্রিয় করিতে হইবে না, বৈশ্য করিতে হইবে না,—শূদ্রের সঙ্গে সমান আসন দাও"—পথ-ভিখারী ব্রাহ্মণ এ পদও তাঁহাকে দিতে পারিবেন না। ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ বিনয়পূর্ব্বক বলিবেন যে,—এ পদের একমাত্র দাতা শ্রীভগবান্,—মানুষে ইহা দিতে পারে না। ব্রাহ্মণ আরও বলিবেন—হতাশ হইও না, কাতর হইও না, ভগবচ্চরণে মতি রাখ, জন্মান্তরে তোমার এই ভোগদেহ বদলাইয়া তুমি আবার বর্ণীর দেহ লাভ করিতে পারিবে। দেখো ভাই!

তোমার আমার শুধু জন্মগুণে—প্রাক্তন কর্ম্মগুণে কত বড় পদ। এমন যত্ন পাইয়া হেলায় হারাইতে ইচ্ছা হয় কি ?

এই যে বর্ণভেদ,—এই যে আমাদের সর্ব্বস্ব, ইহা আমরা অযত্নে নষ্ট করিতে বসিয়াছি ; কষ্ট হয় না কি ? এখনও বর্ণভেদ যায় নাই, বর্ণভেদের গোড়ায় আছে গুণভেদ—সেই গুণভেদের রক্ষা হয় আর পুষ্টি হয় কর্ম্মভেদে।

আমরা সেই কর্ম্মভেদ ভুলিতে বসিয়াছি। কর্ম্মভেদ নষ্ট হইলে গুণভেদ আপনা আপনি মুছিয়া যাইবে। ধর্ম্মে কর্ম্মভেদ, অর্থে কর্ম্মভেদ, কামে কর্ম্মভেদ,—সকল দিকেই কর্ম্মভেদ রক্ষা না করিলে, বর্ণভেদের গোড়ায় যে গুণভেদ, তাহা থাকিবে কেন ? এই কর্ম্মভেদ--এখন আমরা ঠেকাইতেছি কেবল বিবাহে,—অর্থাৎ কামবর্গের প্রশস্ত কর্ম্মে। নিন্দিত কামের সেবা করিতে যখন সাধ হয়, তখন কামবর্গেও আর এই কর্ম্মভেদের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছি না, অর্থবর্গের—ধর্ম্মবর্গের ত কথাই নাই। যদি চা'ল না শোধরাও, যদি আচার-শুদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত না কর, তাহা হইলে জগতের এই অমূল্য নিধি, জগতের এই অসাধারণ সম্পদ তোমরা হারাইয়া বসিবে। আর একবার হারাইলে পুনর্ব্বার তাহা পাইবে না। সাবধান হইবে না কি ? ফিরিয়া চাহিবে না কি ?

বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ। (১)

হাইকোর্টের জজ আশু বাবু (২) নিজের বিধবা মেয়েটিকে আবার পাত্রস্থ করিয়াছেন, এ সংবাদে আমার বিস্ময় হইল না, কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষার যে বিধান আছে, বাল্যকালে আমি সে শিক্ষা পাই নাই, আর যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম, এখন জানিতে পারিতেছি, এখন বুঝিতেছি যে, সে শিক্ষা ব্রাহ্মণ-সন্তানের অনুকূল শিক্ষা ত নহেই, সেই শিক্ষাই ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে এক প্রকার বিষ। সে শিক্ষার ফলও আমাতে ফলিয়াছে, আমি ব্রাহ্মণ হইতে ত পারিই নাই, সাধারণ মনুষ্যত্বও এ জন্মের মতন হারাইয়া ফেলিয়াছি। কালগতে ইহা বুঝিয়া এখন অনুতাপের তুষানলে পুড়িতেছি, আর যে কয়দিন বাঁচিব, এই আগুনে ধিকি ধিকি পুড়িয়া এ রক্তমাংসের পিণ্ডটাকে ছাই করিয়া, এ দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িব,—তবুও আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, নরকে গিয়া নরকভোগে যতটুকু যাইবে, তাহাই যাইবে মাত্র। অন্য দিকে প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা

(১) "বঙ্গবাসী"—২৪শে ফাল্গুন, ১৩১৪ সাল।

(২) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

করিতেছি, অতি-কাতর হইয়া দুই হাত তুলিয়া আমার পুত্র-পৌত্রদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি,—আমার পথে তোমরা কেহ চলিও না। করুণার সাগর ভগবান্ যদি করুণা করেন, আমার এই অনুতাপে আমার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইলেও হইতে পারে।

আশুতোষের দোষ কি? আশুতোষও ইংরেজী শিক্ষাই পাইয়াছেন, আমা-অপেক্ষা বিস্তর বেশী মাত্রাতেই ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছেন,—তাঁহার দোষ কি? ইংরেজীতে কেবল রক্ত-মাংসের সোহাই শিখায়, ইংরেজীতে শিখায় যে, দেহই আমি, এই দেহ ছাড়া পৃথক দেহী কেহ নাই, আর দেহস্থ ইন্দ্রিয় সকল ইংরেজী শিক্ষায় পুষ্ট এবং প্রবল হইয়া মৃত্যুর পর আর দৃষ্টি চালাইতে দেয় না। ইংরেজীতে শিখায় যে, এ জন্মের ধন-জন-লাভ এই জন্মের চেষ্টার ফলেই হয়, প্রাচীন কর্ম্মফলে অদৃষ্ট নামক একটা পদার্থের কথা শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা কথার কথা মাত্র। আমি বুঝিয়াছি, সে অদৃষ্টকে কথার কথা মনে করা নিতান্তই ভ্রান্তি। আশুতোষ এখনও ইহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি মোহে মত্ত, ধনমদিরায় মত্ত, পদগর্ব্বে একবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য,—তাঁহার দোষ কি? তাঁহার কপাল পোড়া, তিনি কখনও সুশিক্ষা পান নাই, সৎসঙ্গ কখনও তাঁহার ঘটে নাই,—তিনি করিবেন কি? তাঁহার মতন লোকে যাহা করিতে পারে, তাহাই তিনি করিয়াছেন।

তবে, তিনি দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন, এ কাজ না হইলেই ভাল হইত বটে, কিন্তু এত কাল পরে হঠাৎ কেই বা তাঁহাকে আটকাইতে পারে? আমাদের সমাজে এখনও যাঁহারা মহা-পুরুষ আছেন, তাঁহারা নির্লিপ্ত, তাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের মহিমাগুণেই সমাজ এখনও আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের এই অপ্রকট ভাব, এই সূক্ষ্ম-শক্তি সঞ্চার আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি না। আর সেই মহাপুরুষদিগকে বাদ দিলে, সমাজে আর যাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, তাঁহারা সকলেই যে ঘোর ঘুমে অবসন্ন। তাঁহারা অন্যকে তুলিবেন কি, নিজেরাই ভাসিয়া চলিয়াছেন। কে জানে, জগদম্বা কোনভাবে কি লীলা করিতেছেন! হয় ত আশুতোষের এই দুঃসাহস আমাদের সমাজের মঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়াইবে; যাঁহারা এতকাল শাস্ত্র কোলে করিয়া ঝিমাইতেছিলেন, এইবার তাঁহাদের চটকা ভাঙ্গিবে। মৃত্যুতেই আফিমের ঘুমের পর্য্যবসান হয়। আফিমের বিষে যে ব্যক্তি অবসন্ন হইতেছে, তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলেই অনেক স্থলে সে বাঁচিয়া যায়। আশুতোষ যদি আবার আমা-দিগকে জাগাইয়া দিতে পারেন, হয়ত এ সমাজ আবার বাঁচিয়াও যাইতে পারে।

বুঝিবা আমাদের সমাজ এইবার একটা সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ঋষি-মুনিদের স্থানীয় হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন, তাঁহাদের তন্দ্রা যদি কাটে, তবে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। দশ-কাহন বিশ কাহন

মানুষ মরিলে সমাজের তত ক্ষতি হয় না, দুই পণ দশপণ কুলবধূ কুল ছাড়িয়া বেশ্যা হইলেও সমাজের তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু ক্ষতি হয় যদি জাগিয়া উঠিবার সামর্থ্য কাহারও না থাকে। এইবার দেখা যাইবে, আমাদের কোন্ দশা ঘটে। ব্রাহ্মণ্যের অভিমান প্রতিষ্ঠিত করিতে ধনী ব্রাহ্মণ সন্তান আমাদের সমাজে আছেন, কি না, এইবার তাহা দেখা যাইবে।

আশু বাবুকে জব্দ করিতে চেষ্টা কেহ যেন না করেন। যদি কাহারও কোন প্রকার চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি থাকে, তবে আত্মরক্ষার নিমিত্ত যথাশক্তি ধ্যান করিবার চেষ্টা করুন। এত বড় সমাজে সত্যসত্যই আত্মীয় কেহ আছেন কি না, সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন। কে আপন, কে পর, বাছিয়া বাছিয়া তাহা বাহির করুন।

এখন হইতে কোন পথে চলিতে হইবে, আত্মীয় স্বজন একপরামর্শী হইয়া তাহা স্থির করুন। সমাজ রাখিতে হইলে, সমাজে থাকিতে হইলে—"চাচা আপনা বাঁচা" বলিলে চলিবে না। যাহারা বাঁচিতে চাহেন, একটু একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সকলে মিলিয়া এক হইতে হইবে, তাহাতে দলাদলি হয়, ক্ষতি নাই। আপন দল আর পরের দল যদি চিনিতে পারা যায়, তাহা হইলেই পরম লাভ।

কাহারও যদি এমন অভিপ্রায় হয় যে, আমাদের সমাজকে রক্ষা করা উচিত, তাহা হইলে এইবার তাঁহাকে প্রকট হইতে হইবে। যে সকল লোক "রেতে যীশু, দিনের বেলা কৃষ্ণভজা" তাহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। যে ধর্ম্মের মূলে আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠা, আবার সেই ধর্ম্মের পরিচয় যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। বালকদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি তাহা হয়, তবে মঙ্গলই হইবে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে জগদম্বার ইচ্ছা যে কি, তাহাই বুঝা যাইবে।

আশু বাবু মাথার কাপড় ফেলিয়া ভালই করিয়াছেন। ধর্ম্মে যদি তিনি বিশ্বাস না করেন, অদৃষ্ট যদি না বুঝেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ মানুষের কল্পিত তিনি যদি মনে করেন, স্বর্গ নরক জন্মান্তর যদি তাঁহার বুদ্ধিতে স্থান না পায়, তাহা হইলে কেন বলিব না যে, তিনি ভাল করিয়াছেন? এই সঙ্গে তিনি যদি আরও একটুকু করেন, তবে আরও ভাল হয়; সেইটুকু এই যে,—পৈতা বলিয়া জোলার সূতা গলায় ঝুলাইয়া লোককে আর না ঠকাইয়া তিনি খাঁটী হউন। পৈতা রাখিতে হইলে, পুলীশের গুঁতা থাকুক আর নাই থাকুক, নিত্য নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে হয়, আশুবাবু তাহা করেন কি? পৈতা রাখিতে হইলে, শাস্ত্রের আদিষ্ট শৌচাচার মানিতে হয়, আশু বাবু তাহা মানেন কি? পৈতা রাখিতে হইলে, বিবাহ প্রভৃতি যে ইহলৌকিক স্ত্রী-পুরুষের সহবাস নহে, তাহা বুঝিতে হয়। আশুবাবু তাহা বুঝেন কি? যদি তিনি এসব মানেন, তবেই তিনি পৈতা

রাখুন, যদি তিনি না মানেন, তাহা হইলে পৈতা পরায় কপটতা, পৈতা পরায় কাপুরুষতা, পৈতা পরায় নীচতা—তাঁহার মতন লোকের শোভা পায় কি ?

বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ নূতন ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমীদেরই ইহা নিষিদ্ধ। ইতর লোক যাহারা বিধি-নিষেধের বহির্ভূত, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং বিধবার পুরুষান্তরগ্রহণে নূতনত্ব কিছুই নাই। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও যাইতেছে, পরেও যাইবে—তাহাতেও নূতনত্ব কিছুই নাই, অতএব আশু বাবুর বেলায় চমকিত হইবার কারণও কিছুই নাই। দুই দিনের ধন সম্পদ তৃণ তুল্য জ্ঞান করেন, এমন লোক এখনও বিস্তর আছেন, তবে আর ভয়ের কারণ কি ? খেদেরই বা কারণ কি ? বরং যদি এই উপলক্ষে সাচ্চার বিচার আবার উঠে, তাহা হইলে, আমি ত মনে করিব যে, আবার আমাদের উপর জগদম্বার কৃপা-কটাক্ষ পড়িয়াছে।

বিধবার পিতার "সৎসাহস"।(১)

একটী ব্রাহ্মণ কন্যা বিধবা হওয়াতে, তাহার পিতা আবার সেই কন্যাটীর বিবাহ দিয়াছেন। 'প্রসূন' (২) এই সংবাদে সেই পিতার "সৎসাহসে"র প্রশংসা করিয়াছেন।

"সৎসাহস" শব্দটা এ দেশের খাঁটি শব্দ নয়, ওটা ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা, ফিরিঙ্গী বুদ্ধির আধুনিক অভিব্যক্তি। সাহস বোধ করি, সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয়; সে সাহস আবার সৎ হইবে কি করিয়া ?

যাউক "সৎসাহস" কথাটা যদি চালাইতে হয়, তাহা হইলে, যে যে স্থলে কেহ গোঁয়ারতুমি করে, সে সে স্থলে "সৎসাহস" বলা উচিত নয়। ভাল মনে করিয়া যে কোনো কাজ করা যায়, তাহাই যে "সৎসাহস," এমন মনে করিতে নাই। যে ব্রাহ্মণ-সন্তান মনে করে যে, মদ খাওয়া ভাল,কি পিঁয়াজ খাওয়া ভাল, আর ভাল ভাবিয়া যদি তাহাই খায়, তবে সে স্থলে কি "সৎসাহস" বলিব ? কুলবধূ যদি সতীত্বের অনাদর করিয়া ব্যভিচারিণী কি বেশ্যা হয়, তাহা কি "সৎসাহস" বলিব ? যে ব্যক্তি যে সমাজ-ভুক্ত, সে ব্যক্তি যদি আপন সমাজকে মূর্খের সমাজ মনে করে, কিম্বা পাজির সমাজ মনে করে, তাহা হইলে সে সমাজ ত্যাগ করাতে বরং তাহার "সৎসাহস" হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ জাতির বিধবার পুরুষান্তরগ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, সে বিচার করিব না। শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও সহিত সে বিচার হইতে পারে না। 'প্রসূন'-চালকদের সে বিচারের যোগ্যতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বিধবা

(১) "বঙ্গবাসী"—৮ই চৈত্র, ১৩১৪।

(২) বর্দ্ধমান কাটোয়া হইতে প্রকাশিত সপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

বিবাহ যে আমাদের সমাজে নিন্দিত এবং পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই অনাদৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিধবা হইয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা দশম বার আবার পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে, প্রশংসার বিষয় হয় কি পুণ্য হয়, একথা কুত্রাপি কেহই বলে না। সতীত্ব রক্ষায় অসমর্থ হইয়াই পুরুষান্তর অন্বেষণ করিতে হয়। বিধবা যদি পুরুষান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে, শাস্ত্রে যাহাকে সতীত্ব বলে, সে সতীত্বের আভাসও রক্ষা পায় কি না, তাহা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিবে। কাম-বুদ্ধিতে ভাবিলে বা লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলে, অসতীত্ব বলিয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। বেশ্যাই বা অসতী কিসে? নরহন্তা "অসৎ" কিসে?

একটা কথা মনে রাখিলে ক্ষতি নাই যে, অসমর্থ ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিবে করুক, কিন্তু কেহ যেন শ্রেষ্ঠ আদর্শ নষ্ট করিবার চেষ্টা না করে। মনে রাখা উচিত যে, হিন্দু-সমাজের লোক ইচ্ছা করিবামাত্র অনায়াসে অন্য যে-কোন সমাজে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনও সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষও আমাদের শূদ্র-সম্প্রদায়ের স্থান লাভ করিতে পারে না, দ্বিজ সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই। অন্ত্যজ চণ্ডালাদির মধ্যে এ দেশেও বিধবার পুনঃপুন বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোক তাহাদিগকে কখনো আদর্শ করে নাই। বরং তাহারাই যতদূর পারে, উচ্চশ্রেণীর লোকের অনুকরণ করে। 'প্রসূণে'র লিখিত "সৎসাহসে" কি বুঝিতে হইবে যে, অন্ত্যজ চণ্ডালাদি ম্লেচ্ছই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের অনুকরণই কর্ত্তব্য? সে পথ ত খোলাই আছে। ভালকে নামাইবার—শ্রেষ্ঠকে নষ্ট করিবার—প্রয়াস কেন? সংযম রক্ষা করিতে পারি, নাই পারি, মনুষ্যত্ব রক্ষা করা যদি কষ্টকরও হয়, তাহা হইলেও স্বেচ্ছাচারীকে ভদ্রলোক এবং অমানুষকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে।

বাঙ্গলা ভাষার সংস্কার। (১)

ভাষার সংস্কার বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে ভাষার প্রকৃতি, তাষার অবয়ব সংস্থান প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়া ভাষার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে নানা দেশ এবং দেশে দেশে পৃথক্ ভাষা আছে; তাহা ছাড়া জাতি-ভেদেও এবং সম্প্রদায়-ভেদেও কোথাও কোথাও অল্পাধিক ভাষাভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে নানা প্রকার পৃথক্ ভাষা আছে বটে, কিন্তু বোধ হয় কোনও ভাষাই অন্য ভাষার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে সম্পর্কিত না হইয়া

(১) ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী"র ১ম অধিবেশন হয়, তাহাতে পঠিত।

থাকিতে পারে না। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অনুরোধে, পর্য্যটকদের প্রয়োজনের অনুরোধে এবং অন্য অন্য বিবিধ লোকব্যবহারের অনুরোধে এক ভাষা অন্য ভাষায় প্রবেশ করিয়া কোথাও অল্প পরিমাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং কোনও এক ভাষার সংস্কার বিষয়ে যিনি চিন্তা করিতে ইচ্ছা করেন, নানাভাষায় তাঁহার অধিকার থাকা আবশ্যক এবং অসাধারণ বিচারশক্তিও থাকা আবশ্যক। সে বিদ্যা আমার নাই, তেমন বিচার-শক্তিও আমার নাই। তথাপি আমি যে সাহস করিয়া এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এই সম্মিলনের আমন্ত্রণকারী মহাত্মারা আমার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয়তঃ আমার অজ্ঞান, আমার ভ্রম, আমার প্রমাদাদি জন্য যতই কেন ত্রুটী হউক না, বিদ্বজ্জনের সম্মিলনে এই কথা তুলিয়া আমি সুশিক্ষার সুযোগ-লাভে কৃতার্থ হইতে পারিব। আমি বয়সে প্রবীণ হইলেও বিদ্যায় শিশু; কাহাকেও শিখাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই; এবং শিখিতে পারিলে কিছু কিছু শিখিবার সাধ আমার আছে। আমার বিদ্যা-শৈশবে আপনাদের যদি বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার কথাতেও আপনারা অমৃত (১) উদ্ধার করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা ভাষা মূলে প্রাকৃত ছিল কি না তাহা জানি না; কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা ভাষা যে বহু ভাষার মিশ্রণে পিণ্ডীকৃত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এখনকার বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব আছে, নানা প্রকার প্রাকৃত ভাষার প্রভাব আছে, আরবির ফারসির প্রভাব আছে, পর্ত্তুগিজ ফরাসী প্রভৃতি কত কত ভাষারই প্রভাব আছে। তাহার উপর ইদানী ইংরেজির প্রভাবের ত কথাই নাই।

প্রত্যেক ভাষারই দুইটী অবয়ব; এক অবয়বে অভিধান প্রস্তুত হয়, অন্য অবয়বে ব্যাকরণ প্রস্তুত হয়। এই অভিধানে এবং এই ব্যাকরণে ভাষার পার্থক্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে পারা যায়। কোন এক ভাষাতে যত শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং সেই সকল শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থ সমেত সেই সমুদয় শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে সে ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত হইতে পারে। আর বাক্যের অবয়ব ঘটকরূপে শব্দগুলির যেখানে যেমন যে পরিমাণ রূপান্তর হয়, কিম্বা রূপান্তর না হয়, এবং বাক্যার্থ প্রকাশ করিতে সেই শব্দগুলির যে প্রকার ক্রম বিন্যাস হয়, তাহার বিধান প্রদর্শন করাই ব্যাকরণের কার্য্য। অভিধানেই ভাষার পার্থক্য দেখা যায়, আর ব্যাকরণে ভাষার স্বাতন্ত্র্য বুঝা যায়। ভাষার আভিধানিক পার্থক্য যদি বা কখনও নষ্ট হইতে পারে, ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য কখনই নষ্ট হইতে পারে না। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোনো ভাষাই অন্য ভাষার অধীনতা স্বীকার করে না; প্রত্যেক ভাষারই ব্যাকরণতন্ত্র আপন আপন। কালপ্রভাবে বা সংসর্গপ্রভাবে এই ব্যাকরণতন্ত্রের অল্প

(১) "অমৃতং বালভাষিতম্।"

অল্প ব্যতিক্রম না হয় এমন নহে, কিন্তু প্রবাহরূপে সে তত্ত্বে একটা একতা থাকিয়া যাইবেই যাইবে।

মনের ভাব প্রকাশ করাই ভাষার কাজ। ভাব সম্পদ্ যতই অধিক হইতে থাকে, শব্দ-সম্পদেরও ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাব উজ্জ্বলও হয় মলিনও হয়, ভাব প্রশস্তও হয় নিন্দিতও হয়। যে জাতির ভাষা বা যে সম্প্রদায়ের ভাষা যত উজ্জ্বল, যত প্রশস্ত ভাব-সম্পন্ন, সে জাতি বা সে সম্প্রদায়ও ততই উন্নত এবং সম্মানার্হ হয়। ভাষার সংস্কার পক্ষে সতত এই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কিন্তু ভাষা বড় ব্যাপক পদার্থ। মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ মানুষের মনে ভাষার তরঙ্গলীলা নিরন্তর ত হইতেই থাকে, স্বপ্নাবস্থাতেও ভাষার লীলা নিবৃত্তি হয় না। মানুষের মন কখনই অকর্ম্মকৃৎ থাকিতে পারে না। চিন্তা বা ভাবনা মনের কর্ম্ম, একটি ভাবের পর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাবের উদয় হইবেই হইবে। ভাবের বিরাম থাকে না; কাজে কাজেই ভাষাও বিরাম পায় না। ভাবের প্রকার যদি অল্প হয় তাহা হইলে ভাষার প্রকারও অল্প হয়; কিন্তু প্রকার অল্প হইলেও পুনঃপুন আবৃত্তিতে মন যেমন ভাবময় হইয়াই থাকে, মানুষও কথা না কহিলেও ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাষা লইয়া কালক্ষেপন করিতে থাকে। তাহাতেই বলি যে, ভাষা বড় ব্যাপক পদার্থ।

অব্যক্ত ভাষাকে বাদ দিলে ব্যক্ত ভাষাকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক ভাগ কথোপকথন লইয়া, অন্য ভাগ লিপিবদ্ধ ভাষা লইয়া। এই লিপিবদ্ধ ভাষা আবার দুই ভাগ; এক ভাগ ব্যক্তিগত ব্যাপার নির্ব্বাহে ব্যবহৃত হয়, অন্য ভাগ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া লোকসমষ্টির নিমিত্তেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ব্যক্তির হিতসিদ্ধি তাহাতেও হয় বটে,কিন্তু ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া সমষ্টিতেই সেই লিপিবদ্ধ ভাষার লক্ষ্য থাকে। জমা-খরচ লেখা, পত্র-ব্যবহারের লেখা, দলিল-দস্তাবেজের লেখা ব্যক্তিগত হিতের ভাগে পড়ে; সমষ্টির নিমিত্তে যে লেখা, তাহাই আজি কালি সাহিত্য নামে পরিচিত।

সাহিত্য শব্দটী সংস্কৃত। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দের যে প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে সাহিত্যের বিষয় অল্প বলিয়াই বুঝা যায়। মনুষ্যকৃত শ্লোকময় বা ছন্দোময় কতকগুলি গ্রন্থই সংস্কৃতে সাহিত্য নামে পরিচিত। এই ব্যাপা অর্থে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্য বলিয়া গণিত হয় না; কিন্তু আজি কালি—সম্ভবতঃ ইংরেজির প্রভাবেই—আমরা সমষ্টি উদ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষাকেই সাহিত্য শব্দে বুঝিয়া থাকি। এখন কাব্য সাহিত্য, ইতিবৃত্ত সাহিত্য, গণিতসাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানসাহিত্য, এসব তো বলিয়াই থাকি, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য ইত্যাদি বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সাহিত্য শব্দের এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সাহিত্যের ভাষার দিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভাষণের বা কথোপকথনের ভাষায় দৃষ্টিপাত করিতে হইবে না এমন নহে। তবে সাহিত্যের ভাষা না কি দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং বহুদূর ব্যাপী, তা সাহিত্যের ভাষায় বিশেষ লক্ষ্য করিলে আমাদের আলোচনার ফল আপনা আপ ভাষণের ভাষাতেও পাওয়া যাইবে। কেননা, সাহিত্যের প্রভাব ক্রমে ক্রমে পরিস্ফু হইয়া ভাষার সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পরন্তু এইস্থলে একটি কথা বিশে করিয়া স্মরণ রাখা আবশ্যক। কথাটী এই যে, সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনে ভাষা হইতে এমন দূরে সরিয়া না পড়ে যে, সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লো পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনি ষ্ঠতা থাকে, ততই ভাল; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটী পৃথক্ ভাষা হই দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশে অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়। পরে উদাহরণ দেখাইয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তা আলোচনা করিব।

ভাষা যতক্ষণ মুখে মুখে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাষা যেন তরল, ভাষায় আঁট থা না, যেন টল টল করে, ভাষায় জমাট বাঁধে না, যেন এলাইয়া এলাইয়া থাকে। লিপি বদ্ধ হইবার সময়ে ভাষার আর সে ভাব থাকিতে পায় না। রস থিতাইলে তাহা দানা বাঁধিয়া যেমন মিছরি হয়, লিপিবদ্ধ হইলে ভাষাও যেন দানা বাঁধা গোছের হয় তখন একটু কঠিন হয়, কিন্তু সেই কঠিনতাতেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রাণসঞ্চা হয়। ভাষার ময়লামাটিও, বেশী হউক, কম হউক, কাটিয়া যায়। ইহাতেই বলিতেি যে, সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী হয়, ইহার ফলেই সাহিত্যে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হয়।

ভাষার এই যে দানা বাঁধার কথা বলিতেছি, সাহিত্যের এই যে গৌরবের সূচন করিতেছি, ইহা প্রধানতঃ ব্যাকরণের বিধানের গুণেই হইয়া থাকে। ব্যাকরণে বিধানবশে ভাষার একটা স্থিরমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ভাষা তখন অসংযত থাকিতে পা না, অনিয়ত হইতে পারে না; সংযমের আর নিয়মের শাসনে প্রামাণিকতা লাভ করে এবং তাহার ফলে লেখকদের এবং ভাষকদের মনের ভিতর একটা একতা স্থাপিত হ এবং তাহাতে ভাষার প্রসার বৃদ্ধির সুযোগ হয়।

এখন দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিবৃদ্ধি হইতেছে; বাঙ্গালা সাহিত্য অমন্দ গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় নাই সত্য কেবল বাঙ্গালা শিখিয়া কোনও ব্যক্তি বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এমন অবস্থ এখনও হয় নাই, ইহাও সত্য; কিন্তু এমনটি হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষার সংস্কা

রের সুযোগ হইয়াছে, আমি এরূপ মনে করি। "কাঁচ বেলায় নোয় বাঁশ, পাকিলে পরে ট্যাস টাস"—একথা কেবল বাঁশের পক্ষে খাটে তাহা নহে, অনেক বিষয়েই খাটে। আঁশ মোটা হইলে, গাঁইট পাকিয়া উঠিলে, তখন সংস্কার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও ঠিক গড়ে নাই, গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র। বাঙ্গালা ভাষা এখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই, স্বাধীন হইবার যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। আজিও বাঙ্গালা ভাষা নিতান্তই পরমুখাপেক্ষী। প্রতিপাদক্ষেপেই বাঙ্গালা ভাষাকে পরের মুখ পানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। আমার ধারণা এই যে, এখনও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বড় সাহসীর মতন এই কথাটি বলিয়া ফেলিলাম। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ এখন চলিতেছে। আমি সে সব গ্রন্থ দেখি নাই, অথচ অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলাম যে, এখনও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই। বাস্তবিক যদি ভাল ব্যাকরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা হইবে না; কিন্তু তাহা হইলেও আমার এই উক্তিতে ভাষার কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই;—কেবল আমার কথাগুলা বৃথা হইবে, এই মাত্র।

আমি কেমন ব্যাকরণ চাই, এইবার তাহার ইঙ্গিত করিতেছি। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা যদি সিদ্ধই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই প্রস্তাবকে কৈফিয়তের হিসাবে ধরিয়া লইলেই চলিবে; আর যদি সিদ্ধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার প্রস্তাব সুধীগণের বিচার্য্য হইবে এবং তাহা হইলেই আমার উদ্যম সার্থক হইব।

বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা এখন বহুভাষার মিশ্রণে পিণ্ডীকৃত; কিন্তু ব্যাকরণ সম্বন্ধে অন্য কোনও ভাষার তাদৃশ আধিপত্য না থাকিলেও, বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের আধিপত্য লইয়া যেন একটা সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া আমার মনে হয়। দেখিতে পাই যে, একদল সাহিত্যচালক মহারথী পদে পদেই সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ধরিয়া সাহিত্যপথের পথিকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেন। ইঁহাদের আদেশ বা উপদেশ মানিতে হইলে, সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যক হয়। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, অনেক জনের, অন্ততঃ আমার, উদ্দেশ্য সফল হইবে না, ইহা নিশ্চয়। এই উদ্দেশ্য-বিরোধে ক্ষতিবৃদ্ধির কেমন সম্ভাবনা, তাহা আমি সংক্ষেপে বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

বাঙ্গালা এখন বাঙ্গালীর ভাষা, কেবল বর্ণাশ্রমীর ভাষা নহে; সংস্কৃত কেবল বর্ণাশ্রমীর ভাষা। অন্য অন্য জাতির বা অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উপর বর্ণাশ্রমীদের প্রভাব বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু সে প্রভাব বিস্তার করিতে গেলে বর্ণাশ্রমী-

দেরই যে অনিষ্ট ঘটিবে না, এমন আমার মনে হয় না। কিন্তু একথা যদি ছাড়িয়াই দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুইটি আপত্তি আমি কোনোও মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারি না। প্রথম আপত্তি এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করিতে হইলে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকৃত পক্ষে কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারিবে না, আর স্বতন্ত্র যদি না হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা কখনও আত্মগৌরবে সম্পন্ন হইবে না। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী নহে। এই দ্বিতীয় আপত্তির একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

লিপিকর্ম্ম বা লেখাই সাহিত্যের বাহন। ভাষা বা শব্দ কতকগুলি স্ফুটধ্বনির সমষ্টি মাত্র। একটি একটি স্ফুট ধ্বনিকে বর্ণ বা অক্ষর বলে। এই বর্ণ বা অক্ষরই ভাষার অবয়ব। যে শব্দে যতগুলি বর্ণ থাকে—একটি মাত্র বর্ণেও একটী শব্দ হইতে পারে, আবার অনেক বর্ণ মিলিত হইয়াও একটি শব্দ হইতে পারে—শব্দের অবয়ব-স্বরূপ সেই বর্ণের বা বর্ণগুলির উচ্চারণ হইলে শব্দ তখন শ্রুতিগোচর হয় এবং তাহাতে উচ্চারকের অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়। শব্দের সমষ্টি লইয়াই ভাষা, অতএব মনে রাখা উচিত যে, ভাষা বা শব্দ বা বর্ণ প্রকৃত পক্ষে কর্ণে শুনিবারই সামগ্রী, চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে। কিন্তু কণ্ঠের স্বর, যতই উচ্চ হউক না কেন, অধিক দূর যাইতে পারে না এবং উচ্চারণের কিছুক্ষণ পরেই লুপ্ত হইয়া যায়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শব্দ স্বল্পকাল-পরিচ্ছিন্ন এবং স্বল্পদেশব্যাপী। এই শব্দকে বিস্তীর্ণদেশ-ব্যাপী এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত লিপির প্রয়োজন। লিপির এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে এক একটি বর্ণের এক একটি চক্ষুগ্রাহ্য সঙ্কেত আছে। এই সঙ্কেত-গুলিকেই আমরা বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি; বাস্তবিক এই সঙ্কেতগুলি স্বরূপতঃ বর্ণ বা অক্ষর নহে, সঙ্কেতগুলি বর্ণের প্রতিনিধি মাত্র। কাণে যাহা শুনা যায়, বাস্তবিক তাহাই বর্ণ, সঙ্কেতটি দেখিলে সেই বর্ণের স্মরণ হয় এবং লেখক মুখে বলিলে যে বর্ণ শুনা যাইত, সঙ্কেত দেখিয়া পাঠকের মনে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সেই শব্দের বা ধ্বনির উদয় হইয়া থাকে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, সেই লিপিই নির্দ্দোষ, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কেত থাকে। মনে করুন 'ক' এই সঙ্কেতটি দেখিলে যদি পাঠকের মনে 'ক' এই ধ্বনিরই উদয় হয়, অন্য কোনও ধ্বনির উদয় না হয়, তাহা হইলেই সঙ্কেতটি নির্দ্দোষ হইল। কিন্তু 'ক' এই সঙ্কেতটি দেখিয়া যদি 'খ' কিম্বা 'চ' কিম্বা অন্য কোনও ধ্বনির উদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সঙ্কেতে দোষ ঘটিল এবং সমস্ত লিপি দোষগ্রস্ত হইল।

এখন যে কারণেই হউক, বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব লিপি-সঙ্কেত নাই; সংস্কৃতের সঙ্কেত লইয়াই আমরা বাঙ্গালা লেখার কাজ সারিয়া আসিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সঙ্কেতগুলি যে যে ধ্বনির উচ্চারণের স্মারক, বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক সেই সেই

ধ্বনির উচ্চারণ নাই; কতকগুলি আছে, কতকগুলি নাই। বাঙ্গলায় মূর্দ্ধন্য 'ণ' বলি, কিন্তু মূর্দ্ধন্য ণকারের যে উচ্চারণ বাঙ্গালায় সে উচ্চারণ একেবারেই নাই। সে উচ্চারণ নাই বলিয়াই আমরা দন্ত্য 'ন', মূর্দ্ধন্য 'ণ', এইরূপ বিশেষণ দিয়া উহাদের পরিচয় করিয়া থাকে। দেখুন 'ক' এই বর্ণটির বেলায় কণ্ঠ্য 'ক' ত বলিতে হয় না, শুধু 'ক' বলিলেই হয়। তবে 'ণ' কারের বেলায় 'মূর্দ্ধন্য' এই বিশেষণটি লাগাই কেন? বাস্তবিক বাঙ্গালায় এই মূর্দ্ধন্য 'ণ' টি ঠিক যেন "সোণার পাথরে বাটি" কিম্বা "কাঁঠালের আমসত্ব।"

এই যে উচ্চারণ আর লিপিসঙ্কেত, ইহা লইয়া বেদে খুব বাঁধাবাঁধি আছে শুনিতে পাই। এই উচ্চারণ ব্যাপার বেদাঙ্গ ব্যাকরণের বিষয় নহে, ইহা এক পৃথক্ বেদাঙ্গের বিষয়, সে বেদাঙ্গের নাম 'শিক্ষা।' বেদ প্রধানতঃ পারলৌকিক বিষয়েই দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে ততটা পারলৌকিকতা না থাকাতে, এই উচ্চারণ-প্রকরণ লৌকিক ব্যাকরণের বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই জন্যেই ব্যাকরণের প্রসঙ্গে আমি এই বানানের কথা তুলিয়াছি। লৌকিক সংস্কৃত ব্যাকরণেও বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে উপদেশ আছে এবং সংস্কৃত বর্ণগুলির উপযোগিতা স্থির রাখিবার অভিপ্রায়েই কোন্ বর্ণের উচ্চারণস্থান কোথায়, তাহার উপদেশ থাকে। সংস্কৃত বর্ণমালা সংস্কৃত উচ্চারণেরই ঠিক উপযোগী; কিন্তু বাঙ্গালাতে উচ্চারণের ভেদ থাকাতে সংস্কৃত বর্ণমালা সর্ব্বাংশে বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী হইতে পারে না।

অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, সংস্কৃতে এই কয়টি স্বরবর্ণ আছে। ইহার মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এই পাঁচটি হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে পনেরটি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরূপে গণিত হয়। সংস্কৃতে এ, ঐ, ও, ঔ, এই চারিটি সন্ধ্যক্ষর, অর্থাৎ 'অ' বর্ণে 'ই' বর্ণে মিলিয়া 'এ' 'অ' বর্ণের এবং 'এ'-কারের সন্ধিতে 'ঐ,' 'অ' বর্ণে 'উ' বর্ণে 'ও' এবং 'অ' বর্ণে 'ও'-কারে মিলিত হইয়া 'ঔ' হয়। সংস্কৃতে এ, ঐ, ও, ঔ, হ্রস্ব স্বর নহে; এ কয়টী বর্ণের মোটে হ্রস্ব নাই।

তাহার পর সংস্কৃত 'অ' কণ্ঠ্য বর্ণ, আর 'ঐ' কণ্ঠ হইতেই দীর্ঘমাত্রায় উচ্চারিত হইয়া যে 'আ' হয় তাহাও ঐ কণ্ঠ্য বর্ণ। এই 'অ' 'আ' একই স্থান হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা পরস্পরের সবর্ণ বা সমান বর্ণ। এইরূপে 'ই' 'ঈ' উভয়েই তালব্য এবং পরস্পরের সবর্ণ; উ, ঊ, ওষ্ঠ্য এবং সবর্ণ, ঋ, ৠ, মূর্দ্ধন্য এবং সবর্ণ ঌ, ৡ, দন্ত্য এবং সবর্ণ; কিন্তু 'এ' কারের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং তালু, সুতরাং একার বর্ণসঙ্কর। এইরূপে ঐ, ও, ঔ, এই তিনটিও বর্ণসঙ্কর।

এখন দেখুন, সংস্কৃতের এই স্বরবর্ণগুলি সংস্কৃতে যে কাজ করে, বাঙ্গালায় সেই কাজ করে কি না। আমি দেখাইতেছি যে, তাহা করে না।

সংস্কৃতের যেটি প্রথম স্বরবর্ণ, বাঙ্গালায় সেটি প্রথম স্বরবর্ণ নহে। বাঙ্গালায় প্রথম স্বরবর্ণটি অর্থাৎ 'অ' বিশুদ্ধ কণ্ঠ্যবর্ণ নহে; সেই জন্যে বাঙ্গালা অ-কারকে দীর্ঘ করিয়াই

উচ্চারণ করুন, প্লুত করিয়াই উচ্চারণ করুন,কিছুতেই 'আ' হইবে না। 'আ'-কারের যাহা হ্রস্ব তাহাই সংস্কৃতের আদ্য স্বরবর্ণ। আমাদে বাবা, কাকা, মামা, দাদা শব্দে যে 'আ' শুনিতে পাওয়া যায়, সেইটিই সংস্কৃতের আদ্য স্বর। কিন্তু বাঙ্গালা আদ্য স্বরটি কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলিয়া সংস্কৃত আদ্য স্বরবর্ণের সবর্ণও নহে। তাহার ফলে বাঙ্গালা 'অ'-কারে এবং 'আ'-কারে যে সন্ধি করা হয়, সে কেবল গায়ের জোরেই করা হয়; সে সন্ধি অস্বাভাবিক এবং ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ।

একটা স্থূল কথা এখানে বলিয়া রাখি। বাঙ্গালায় দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ অতি বিরল। ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ প্রশ্ন প্রভৃতি স্থলেই আমরা দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ করি, এবং গানে প্লুত স্বরের প্রয়োগ অবশ্যই করি; কিন্তু তদ্ভিন্ন স্থলে আমরা দীর্ঘস্বরের কাছ দিয়া বড় একটা যাই না। আমাদের 'এ'কার 'ও'কারও হ্রস্ব। সংস্কৃত ইহা অসম্ভব। বাঙ্গালায় 'ঐ'কার এবং 'ঔ'কার বস্তুতঃ সন্ধ্যক্ষর নহে। দ্রুত উচ্চারিত বর্ণদ্বয়ই আমাদের 'ঐ'কারে 'ঔ'কারে থাকিয়া যায়।

আমাদের 'ঐ'-কার বস্তুতঃ ওই, আমাদের ঔকার বস্তুতঃ ওউ এই কারণে 'কৈ' লিখিতে কেহ 'ক'তে ঐকার লাগাইয়া দেন, কেহ বা ক'র পরে একটী ই বসাইয়া দেন। ব'য়ে ঔকার বৌ, কি ব উ বৌ, এ প্রশ্ন তুলিলে দাঙ্গা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহার পর হ্রস্বই কি আর দীর্ঘই কি, মূর্দ্ধন্য স্বরবর্ণ এবং দন্ত্য স্বরবর্ণ বাঙ্গালাতে মোটেই নাই। সংস্কৃত ঋ বাঙ্গালার 'র'তে ইকার, সংস্কৃত '৯' বাঙ্গালার ল'তে ইকার। তবেই বুঝা গেল যে সংস্কৃত স্বরমালার সঙ্কেতগুলি এবং তাহাদের ক্রমবিন্যাস আমরা দৃষ্টতঃ লইলেও কাজে লই না। তবেই সংস্কৃত স্বরমালা কোনও মতেই বাঙ্গালার স্বরমালা হইল না।

স্বরবর্ণের নিমিত্ত আমাদের আরও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। 'এক' এই শব্দের গোড়াতে যে স্বরের উচ্চারণ করিলাম, বাঙ্গালায় তাহার কোন সাঙ্কেতিক অক্ষর পাওয়া যায় না। কেহ শুধু 'য' কার লিখিয়া বসেন। কেহ 'য'র গায়ে 'য' করে দেন, আবার কেহ 'এ'র গায়ে 'য' করে দিয়া ফেলেন। বাঙ্গালায় হ্রস্ব 'এ' আছে, কিন্তু 'এ' দীর্ঘ, 'এ' ভেদ করিবার চিহ্নভেদ বাঙ্গালাতে নাই। ওকারের বেলায়ও এইরূপ। স্বরবর্ণে এই, ব্যঞ্জনবর্ণেও ভাবিবার বিষয় আছে।

ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ, র, ল, হ,—এই বর্ণগুলিতে কোন গোল নাই। তবে সংস্কৃতে সংস্কৃতের আদ্যস্বর যোগে ইহাদের উচ্চারণ হয়, বাঙ্গালায় বাঙ্গালারই আদ্যস্বর যোগে ইহাদের উচ্চারণ করিতে হয়, এইমাত্র ভেদ। সংস্কৃতে কা, খা, গা, ঘা, ইত্যাদি বলিতে হয়; বাঙ্গালায় ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি বলি।

ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধে প্রথম গোল তালব্য বর্গে এবং মূর্দ্ধন্য বর্গে। কণ্ঠ্য দন্ত্য এবং

ওষ্ঠ্যে সংস্কৃতের সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই আমার ধারণা। তালব্য বর্গের অনুনাসিক বর্ণ ঞ, বাঙ্গালাতে কখনও কখনও 'ন'। প্রাচীন লেখাতে গোস্বামীর বাঙ্গালা মূর্ত্তিতে ঐ তালব্য অনুনাসিকটী লাগিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে ঁ (চন্দ্রবিন্দু) লাগান হয়। আর সঞ্চয়, বাঞ্ছা, সঞ্জয়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দের অনুনাসিকটি স্পষ্টই 'ন'। বাঙ্গালায় একটী শব্দে কেবল এই অনুনাসিকটি অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়াছে—অন্তঃস্থ 'য' এ আকার আর 'চ' এর নীচে 'ঞ'তে আকার দিয়া বোধ করি সকলেই যাচিঞা পড়িয়া থাকে। মূর্দ্ধন্য বর্গের অনুনাসিকটীর কথা কিছু বলিতে হইবে না। সকলেই জানেন ওটী কেবল শোভার্থ; বরং মূর্দ্ধন্য 'ষ'-এর আশ্রয় পাইলে, কোন দেশে ঁ-যুক্ত কোথাও বা ঁ-হীন 'ট' হইয়া দাঁড়ান্। স্বয়ং কৃষ্ণ বিষ্ণুই তাহার সাক্ষী। তিনটী উষ্ম বর্ণের মধ্যে বাঙ্গালায় মূর্দ্ধন্য 'ষ'-কারের প্রচুর প্রয়োগ আছে, দন্ত্য 'স'কারের কদাচিৎ। তালব্য 'শ' কারের ব্যবহার থাকা আমি জানি না।

চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর। ইকারে অকারে 'য', ঋকারে অকারে 'র' ৯কারে অকারে 'ল', উ সংকারে অকারে 'ব'। প্রথমটিকে 'জ'কারের কাজ কেন করিতে হয় জানি না; চতুর্থটি নামমাত্র আছে, কাজের বেলায় কেন নাই, এবং তাহার মূর্ত্তিই বা কেন অবিকল বকারের মত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি না। প্রাচীন লেখায় বকারে এবং এই অন্তঃস্থ চতুর্থ বর্ণের মূর্ত্তিতে ভেদ দেখিয়াছি। নাগর অক্ষরেও দেখিতে পাই, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালায় দুইবারই 'ব' লিখি এবং 'ব' বলি, অথচ এই চতুর্থ অন্তঃস্থের ভূরি প্রয়োগ বাঙ্গালাতেও আছে। এখন আমরা উয়, ওয় লিখিয়া একটা কিম্ভুত-কিমাকার বানানের সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু চতুর্থ অন্তঃস্থের একটা সঙ্কেত করিয়া লইলেই যে উপদ্রবের নিবৃত্তি করিতে পারি, এটা ভাবি না। খাওয়া, হওয়া, হুয়ার, পোঁয়ার ইত্যাদি শব্দের বানান স্মরণ করিলেই আমার খেদের হেতু বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

যাহা বলিলাম, তাহার সারসংগ্রহ করিলে এই দাঁড়ায় যে, প্রচলিত ব্যঞ্জন বর্ণমালায় কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া আর কতকটা কমাইয়া না লইলে বাঙ্গালা ভাষার যথাযথ বর্ণমালা প্রস্তুত হইবে না। স্বরবর্ণমালার কেবল ঋ, ৯ বাদ দিলেই হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সংস্কৃত সঙ্কেতগুলির সংস্কৃত উচ্চারণগুলি আদায় করিয়া লওয়া আবশ্যক হইবে। জানিয়া লইতে হইবে যে, সংস্কৃত 'অ'—দাদা, কাকার 'আ।' সংস্কৃত 'ে' (য ফলা) প্রায় বাঙ্গলা হ্রস্ব একার, সংস্কৃত 'ঐ' বাঙ্গলায় এক শব্দের একার ও সংস্কৃত 'ঔ' বাঙ্গালায় দীর্ঘ 'অ।' আর এ পন্থা স্বীকৃত না হইলে বাঙ্গালা স্বরগুলির নূতন সঙ্কেত গড়িয়া লইতে হইবে।

বানান সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলিবার আছে। যে সকল শব্দের অন্তে অকার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, প্রায় সেগুলির উচ্চারণের সময় অকার বাদ দিয়া হসন্ত করিয়া

লওয়া হয়। সংস্কৃতে এমন করা ত চলেই না, উড়িয়াতেও চলে না। দাস কটক, বালেশ্বর, লবণ ইত্যাদি যত অকারান্ত শব্দই মনে করিবেন,বাঙ্গালাতে তাহার সবগুলিই হসন্ত—দাস্, কটক্, বালেশ্বর্, লবন্ ইত্যাদি; কিন্তু উড়িয়াতে সবগুলিই অকারান্ত। বাঙ্গালায় অকারান্ত করিয়া লিখিবার উপায় না থাকায় অগত্যা ওকারান্ত করিয়া তাহাদের উড়িয়া উচ্চারণ দেখাইতেছি—দাসো, কটকো, বালেশ্বরো, লবণো ইত্যাদি। বাঙ্গালাতে আকার, ইকার, উকার প্রভৃতির যেমন চিহ্ন আছে, অকারের তেমনই একটি চিহ্ন থাকিলে সুবিধা হয়। পূর্ব্বে এইরূপ চিহ্ন ছিল বলিয়াই আমার ধারণা। প্রাচীন প্রয়োগ, 'করহ' 'শুনহ' ইত্যাদি স্থলে যে 'হ' কারের চিহ্ন দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ 'হ' নহে, অকারেরই জ্ঞাপক মাত্র। অন্ত্য অকার উচ্চারণ করিতে হইলে ঐ চিহ্নটি তাহারই সূচক। এখন আমরা ওটিকে উড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু উড়াইয়া দিয়া ফাঁপড়েও পড়িয়াছি। এখন একটা উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। যত নাম শব্দ আছে এবং বিশেষণ শব্দ আছে, তাহাদের মধ্যে ত য, র, ল, ব, ড়, ঢ়, এই সাতটি বর্ণ ছাড়া আর সকল অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্ণই হসন্ত উচ্চারিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। তান্ত শব্দের অকারবিশিষ্ট উচ্চারণ এবং অকারশূন্য উচ্চারণ বোধ হয় সমান সমানই হইবে; নহিলে হসন্ত ত বা ৎ এইরূপ একটা বিশেষ চিহ্নের সৃষ্টি হইয়াছে কেন? আর বোধ হয় যে হসন্ত য, হসন্ত র, হসন্ত ল, হসন্ত ব,লিখিতে হইলে প্রাচীন লেখায় এখনকার হসন্ত চিহ্নের মত ঐ অক্ষর গুলির নিম্নে একটি একটি তির্য্যক রেখা (্) দেওয়া হইত। য় এবং র এই দুইটী অক্ষরের নিম্নে এখন যে ফুট্‌কী থাকে, ইহা বোধ হইতেছে নিতান্ত আধুনিক। পূর্ব্বে 'ব' কারের পেট কাটিয়া দিলেই 'র' হইত। যাহা হউক, একটা কোনও উপায় করিতে পারিলে ভাল হয়। উপায় না করিলে সময়ে সময়ে বড় গোলে পড়িতে হয়। বাঙ্গালায় দেয় (অর্থাৎ দান করে) এবং দেয় (অর্থাৎ দিবার যোগ্য) এক বানানেই বানান করা হয়; বার (অর্থাৎ পালা) এবং বার (অর্থাৎ দ্বাদশ), ভাল (অর্থাৎ কপাল এবং ভাল (অর্থাৎ প্রশস্ত), সব (অর্থাৎ সমুদয়) এবং সব (অর্থাৎ সহ্য করিব) প্রভৃতি শব্দেও ঐ বিপত্তি। যেমন খণ্ড ৎ আছে, হয় তেমনি খণ্ড য, খণ্ড র, খণ্ড ল, খণ্ড ব গড়িয়া লওয়া হউক, না হয় যেখানে হসন্ত উচ্চারণ, সেইখানে হসন্ত চিহ্ন দিবার বিধান হউক। আবার কেবল বিধান করিলেও চলিবে না, বিধান মানা চাই। দেখুন এখন অখণ্ড অর্থাৎ অকার সমেত ত এবং খণ্ড অর্থাৎ অকারহীন ৎ, এই দুই বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কেত থাকিতেও মত (অর্থাৎ অভিপ্রায়, বুদ্ধি) এবং মত (অর্থাৎ সদৃশ) আমরা একই প্রকারে লিখিয়া থাকি। বিধান মানিয়া চলিলে উৎপাত, জাত, ভাত, সমেত, ক্ষেত, ইত্যাদি স্থলে অখণ্ড ত লেখা কোনও মতে উচিত নহে।

ফলকথা, বাঙ্গালা ভাষার উপযুক্ত বর্ণসঙ্কেত অবধারিত না হইলে, বানানের গোল-

যোগ এবং বানান ভুলের বিভ্রাট অনিবার্য্য। মানুষ স্বভাবতঃ প্রচলিতের পক্ষপাতী, অন্যে প্রচলিতের আংশিক বিপর্য্যয় করিতেও কুণ্ঠিত, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমি নিতান্ত উদ্ভট বা অতি নূতন প্রস্তাব যে উত্থাপন করি নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতকটা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন; তাঁহার বর্ণমালায় য়, ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ যোগ করিয়া এবং তখনকার প্রচলিত ক্ষ আর সংস্কৃতের দীর্ঘ ৯ ও দীর্ঘ ঋ কার বাদ দিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালার শোধনের বা সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

এইবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে মোটামুটি এই কয়টি প্রকরণ আছে,—সন্ধি, সুবন্ত, তিঙন্ত, স্ত্রীপ্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিত, কারক এবং সমাস। বাঙ্গালায় ইহার মধ্যে কোনও প্রকরণেরই উপযোগিতা নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃত, সেগুলি বাদ দিলে অন্য কোনও অংশে সন্ধি চলে না। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গালার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 'তথাপ্যাটচালাখানায়' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পড়িয়া রহিয়াছে। তবে সংস্কৃত সন্ধির সমুদয় নিয়মগুলি মানুষের স্বাভাবিক সংস্কারের অনুগত হউক, কিম্বা না হউক, অধিকাংশই যে স্বভাবের অনুকূল বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কথোপকথনের বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

দেশের মাটির, দেশের জলের, দেশের রোদের, দেশের বাতাসের গুণে বাঙ্গালী স্বল্পাক্ষর শব্দের বড়ই পক্ষপাতী; দুই অক্ষরের শব্দ পাইলে বাঙ্গালী তিন অক্ষরের শব্দ লইতে চায় না; তিন অক্ষরের শব্দ পাইলে চারি অক্ষরের দিকে যায় না। কিন্তু মাটি, জল, রোদ, বাতাস বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একই প্রকারের নহে; অল্প অল্প অন্তরেই ইহাদের গুণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যোজনান্তর ভাষা, ঐ ভেদই এই প্রবাদের মূল। শিক্ষা-ভেদের বা সংসর্গভেদের কথা এখানে তুলিতেছি না, কেবল মাটি, জল, রোদ, বাতাসের ভেদের কথাই এখানে বলিতেছি। এই ভেদের ফল এক হিসাবে বড়ই অনিষ্টকর; কেন না, যোজনান্তরে ভাষাভেদ হইলে সামাজিক ঐক্যস্থাপনের এবং লোকব্যবহারের প্রসার বৃদ্ধির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই অনিষ্টের প্রতিবিধান করিতেই সাধুভাষা কল্পিত হইয়াছে। লিপিকর্ম্মের নিমিত্তে সাধুভাষাই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া প্রমাণরূপে স্বীকৃত এবং সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কথোপকথনের সময়ে সাধু ভাষার এ সমাদর কেহ রাখে না। আপন আপন স্থানভেদের অনুকূল করিয়া লোকে সেই সাধুভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লয়; তাহারই ফলে 'খাইতেছি' ইত্যাদি শব্দের সাধুকল্পিত রূপ ভাঙ্গা গড়া হইয়া কোন স্থানে খাত্তেছি, কোন স্থানে খাতিছি, কোন স্থানে খেতেছি, কোন স্থানে খেচি,

কোন স্থানে খাচ্ছি প্রভৃতি নানা রূপ ধরিয়া থাকে। এই ভাঙ্গাগড়াতে সন্ধির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়; আর এই সন্ধিকেই আমি স্বভাবানুগত সন্ধি বলিতেছি। এই দেখুন 'খা' ছিল ইতেছি, সন্ধি করিলেই খেতেছি হয়, খাৎ ছিল ছি, সন্ধি করিলেই খাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙ্গালা সাধু ভাষায় সন্ধির ভয় বা সন্ধির প্রতি বিরাগ এতই প্রবল যে, প্রাচীন লেখকেরা 'ঞ' এই অক্ষরের আশ্রয় লইয়া সন্ধিভীতিতে আত্মরক্ষা করিতেন। রাঢ় দেশে বীরভূম অঞ্চলে সানুনাসিকের প্রকোপ কিছু বেশী বটে, কিন্তু হঞা, খাঞা, গিঞা, মুঞি, তোঁঞি প্রভৃতি বানান সে প্রকোপের ফলে নহে। অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি স্বরূপে আমরা এখন 'ইয়া' লিখিয়া থাকি; পূর্ব্বে স্বরের 'আ' লিখিবার রীতি ছিল। য় লিখিলে পূর্ব্বের 'ই' টা বৃথা হয়। এখন দেখুন যে, প্রাচীন রীতিতে 'হইআ' লিখিতে গেলে সন্ধি ব্যাঘ্রলক্ষনে আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়ে। 'হ' অকারান্ত বর্ণ তাহার পরে 'ই'—ব্যাকরণ বলিলেন "সন্ধিরেকপদে নিত্যা:," তবেই 'হ' কারের পর একটি ব্যঞ্জন আনিতে হইল; ই তালব্য স্বর, 'ঞ' তালব্য ব্যঞ্জন; এই দুই বর্ণে যতটা সাজাত্য, ইকারের সঙ্গে অন্য কোনও বর্ণেরই ততটা সাজাত্য নাই; অগত্যাই 'হ' কারের পর 'ঞ' আসিলেন, আর সেই 'ঞ' তে আকার দিলেই 'হঞা' আসিলেন। কেহ বা অন্যরূপে সন্ধির কাজে সারিলেন। 'ই' তে 'আ'তে 'য়া,' তিনি লিখিলেন হয়া, বোধ করি পাবনা অঞ্চলে কথোপকথনে 'হয়া' বলে। কোথাও বা 'হ'র উচ্চারণ প্রকট রাখিবার নিমিত্তে ঐ অন্তঃস্থ 'য়' কারের দ্বিত্ব করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে লেখা হয় 'হয্যা।' আবার অন্য কেহ বা ঐ সন্ধির ভয়েই 'ঐ' কারের আশ্রয় লইয়া 'হৈয়া' লিখিয়া দিলেন! প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার করিতে গিয়া আমরা নানা স্থানে নানা রহস্যের কল্পনা করিয়া থাকি; কিন্তু প্রায়শঃই দেখিবেন সন্ধিভীতি প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকাই বহুবিধ পাঠান্তরের বা বানানের একমাত্র কারণ।

অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে, সংস্কৃতের সন্ধিবিধান লইয়া বাঙ্গালা ভাষার বিব্রত হইবার প্রয়োজন নাই। সত্য বটে যে, সমাসে জোড়া এবং সমাসে না-জোড়া বিস্তর সংস্কৃত পদ বা শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অবিকল ব্যবহার হইয়া থাকে। সে সকল শব্দের ভিতরে ভিতরে সন্ধিও করা থাকে। আবার অনেক ছুটা শব্দ সন্ধির নিয়মানুসারে আমরা জুড়িয়া লই; কিন্তু সে অনুরোধেও বাঙ্গালা ব্যাকরণে সন্ধি আদৌ আবশ্যক বলিয়া আমি স্বীকার করি না। যে সকল শব্দে সন্ধি করা আছে, যেমন—মহাশয়, সদাশয়, যথেষ্ট, অভিপ্রেত প্রভৃতি, সেগুলিকে বাঙ্গালার পক্ষে রূঢ় শব্দ মনে করিয়া লইলেই চলিতে পারে। ফারসি কি আরবি কি ইংরাজী কি লাটিন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা সংঘটন লইয়া আমরা মাথা ধরাই না; সংস্কৃত শব্দের বেলাতেও আমরা সে পথে না চলিব কেন? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষাকে পৃথক্

এবং স্বতন্ত্র করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত গৌরব কখনও হইবে না। 'নিয়ম অনুসারে' কিম্বা 'অন্ত অন্ত' না লিখিয়া, 'নিয়মানুসারে' কিম্বা 'অন্তান্ত' লিখিতেই হইবে, ইহা আমি মানিতে চাই না। বাঙ্গালাতে যত ভাষার শব্দ লইয়াছি বা লইতেছি, তত ভাষারই ব্যাকরণ লই নাই বা লইবও না। সংস্কৃত সম্বন্ধে এ কথার ব্যতিক্রমের কারণ দেখি না। আর বাঙ্গালা ব্যাকরণ যে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র, তাহা কেবল সন্ধিতে নহে, ব্যাকরণের অন্ত অন্ত প্রকরণ সম্বন্ধেও বটে, তাহা দেখাইতেছি।

সুবন্ত প্রকরণ ধরা যাউক। সুবন্তের সঙ্গে সঙ্গে কারকেরও আলোচনা করিব এবং আনুষঙ্গিক বলিয়া বচনের ও লিঙ্গের কথা কহিব।

সংস্কৃতে তিন বচন এবং শব্দের তিন লিঙ্গ। বাঙ্গালায় বলিতে গেলে বচন একটী মাত্র। মানুষের বেলায়, কি বড় জোর বুদ্ধিমন্ত জন্তুর বেলায়, আর সর্ব্বনামে এক বচনের এবং বহু বচনের ভেদ আছে; কিন্তু অন্ত জন্তুর কি অন্ত পদার্থের বেলায় সে ভেদ থাকে না। তাহারা,-তোমরা, আমরা, আর ব্রাহ্মণেরা, শূদ্রেরা, যবনেরা, ইত্যাদিতেই বহুবচনের 'রা' শুনিতে পাই। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে বানরের সম্মান বাড়াতে এখানেও আমরা কখনও কখন 'বানরদের' আদর করি, কিন্তু এমন প্রয়োগের বিশেষ প্রসিদ্ধি বোধ করি নাই। তাহার পর বাঙ্গালা ব্যাকরণে দ্বিবচনের' প্রসঙ্গই নাই।

সংস্কৃত শব্দের লিঙ্গ আছে। শব্দ মাত্রেই হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ, নয় ক্লীবলিঙ্গ। বাঙ্গালায় শব্দের লিঙ্গ নাই। ময়রাণী বাস্তবিক স্ত্রীলোক বলিয়াই ঐ আনীটুকু পায়, কিন্তু ময়রাণীশব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ নয়। সংস্কৃত দার শব্দে স্ত্রী বুঝায়, কিন্তু দার শব্দটি পুংলিঙ্গ। কোনও কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণে দেখিয়াছি যে, লতা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু এটা স্পষ্ট ভুল। একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর রচনায় ফলবতী বৃক্ষ পড়িয়াছিলাম। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সে রচনায় দোষ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে দোষ মনে করি না। সংস্কৃত বৃক্ষ পুংলিঙ্গ হইবে হউক, কিন্তু বাঙ্গালায় গাছও পুংলিঙ্গ নয়, বৃক্ষও পুংলিঙ্গ নয়। আমাদের একজন পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃতের অনুরাগভরে একদিন সূত্র গড়িয়া শিখাইতেছিলেন যে, "আকারান্তা মেয়ে লিঙ্গা"। একজন ছাত্র ধরিয়া বসিল যে, বাবা, কাকা, জেঠা, মামা—ইহাদের কি হইবে? তাহারাও কি স্ত্রীলিঙ্গ? পণ্ডিত মহাশয় নিজকৃত সূত্রে যোগ করিলেন "গোঁপদাড়ী বিবর্জ্জিতা।" আবার আপত্তি হইল যে, বাবা খুড়া যদি মাকুন্দ হন? পণ্ডিত মহাশয় লিঙ্গপ্রকরণ ছাড়িয়া দিলেন।

সংস্কৃত সুবন্তে একুশটি বিভক্তি। সেই বিভক্তি ধরিয়া কারক-ভেদ আদি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় বিভক্তি বলিতে গেলে মোটে তিন প্রস্থ। এক প্রস্থে আছে 'এ,' 'তে,' ইহা কর্ত্তা কারক, করণ কারকে এবং অধিকরণ কারকে লাগে, আর

এক গ্রন্থে আছে, 'কে,' 'রে,' ইহা কর্ম্মকারকে লাগে, আর সম্বন্ধের বিভক্তি 'র'। 'দ্বারা,' 'দিয়া,' 'হইতে,' এগুলিকে বিভক্তি বলা যায় না; এগুলি একটি একটি স্বতন্ত্র শব্দ। বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারক নাই; সম্প্রদান কারক থাকিতেই পারে না। সংস্কৃতে পরলোকের সহিত এবং অদৃষ্টের সহিত ইহলোকের যে বন্ধন আছে, বাঙ্গালায় সে বন্ধন মনেই করিতে হয় না। অতএব নিঃসঙ্কোচে এক কথাতেই বলিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত সুবন্ত প্রকরণের সহিত বা কারক বিধান প্রকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের কোন অংশেরই সম্পর্কও নাই, মিলও নাই।

তিঙন্তেও ঐ কথা। সংস্কৃত ক্রিয়াপদে বচনভেদ সূচিত হয়, বাঙ্গালায় তাহা হয় না। বাঙ্গালায় বিধিলিঙএর বা আশীর্লিঙএর স্থান নাই। অন্য অন্য লকারের অনুরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালাতে নাই বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। আর বিভক্তির মিলত কোন মতেই হইতে পারে না। সর্ব্বোপরি সংস্কৃতে ক্রিয়া পদের মূল যে ধাতু, বাঙ্গালায় সেই ধাতুর অনুরূপ কোন পদার্থই নাই। ভূ, কৃ, গম্ ইত্যাদির নাম ধাতু। ভবতি, কুর্ব্বতঃ, গচ্ছন্তি—এগুলি যেমন ঐ ভূ, কৃ, গম্ ধাতুতে গড়া, সংস্কৃতের কি তিঙন্তের কি অন্য প্রকরণের শব্দ বা পদ মাত্রেই তেমনই কোন না কোন ধাতুতে গড়া। বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দ আছে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ধাতুটুকুও আছে, তাহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলা যায় না যে, বাঙ্গালাতেও ধাতু আছে। বাঙ্গালার তিঙন্তের অনুরূপ পদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন নহে, অন্য এক জাতীয় ক্রিয়ামূল হইতে নিষ্পন্ন। বাঙ্গালাতে অনুজ্ঞার ক্রিয়ার এবং আরও কোথাও কোথাও, মধ্যম পুরুষের দুইটি ভাব আছে; একটিকে সাধারণ ভাব, আর একটিকে নিম্ন ভাব বলা যাইতে পারে। 'তুমি যাও' এখানে মধ্যম পুরুষের সাধারণভাবের প্রয়োগ, আর 'তুই যা' এখানে 'যা' পদটিকে আমি নিম্ন ভাবের প্রয়োগ বলিতেছি। বাঙ্গালাতে অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের নিম্ন ভাবটি ক্রিয়াপদের মূল বলিয়া আমার ধারণা। 'দিতেছি' এই ক্রিয়া পদের মূল, সংস্কৃত দা ধাতু নহে। দা ধাতুকে মূল বলা যেমন সঙ্গত, লাটিন বা গ্রীক ভাষার তৎসদৃশ মূলকে মূল বলাও তেমনই সঙ্গত। বাঙ্গালায় কতকগুলি ক্রিয়ামূল এই স্থানে সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চাই যে, বাঙ্গালার ক্রিয়ামূল সর্ব্বত্রই অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষের নিম্ন ভাব। এই ধরুন—বক্, রাখ্, রাগ্, বাঁচ্, আঁচ, সাজ্, বুঝ্, কাট্, লুট্, পড়্, কাঁদ্, সাধ্, শুন্ বা শোন্, ফাঁপ্, ভাব, কয়্, ভুল্, বা ভোল্, বইস্, গাহ্, রহ্—এইগুলি ব্যঞ্জনান্ত, আবার হ, যা, খা, শো বা শু, দে, নে এইগুলি স্বরান্ত। দেখুন ইহার সবগুলি অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের নিম্নভাব। আরও যত মূল দেখিবেন, সমস্তই এইরূপ। ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে হইলে আমরা এই মূলে 'আ' বিভক্তি যোগ করিয়া থাকি। পূর্ব্ববঙ্গের, সর্ব্বত্র না হউক, কোথাও কোথাও 'অন্' যোগ করা হইয়া থাকে; যেমন,—রাখা রাখন, বাঁচা বাঁচন; কাটা, কাটন্ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনা-

ন্তের বেলায়ও এই নিয়ম। স্বরান্তের বেলায় ঐ আ-যোগের পূর্ব্বে বা অন্ যোগের পূর্ব্বে একটা অন্তঃস্থ 'ব' দেওয়া হয়; যেমন,—হওা, হওন, খাওা, খাওন, দেওা, দেওন ইত্যাদি। আর এই মূলের উপর ক্রিয়াপদ গড়িতে অসমাপিকায় ইয়া, নিমিত্তার্থে 'ইতে', বর্ত্তমানকালের প্রথম পুরুষে 'এন' 'এ', মধ্যম পুরুষে 'ও', উত্তম পুরুষে 'ই,' অতীতকালের প্রথম পুরুষে 'ইলেন,' 'ইলেক,' 'ইল,' মধ্যম পুরুষে 'ইলাম,' ভবিষ্যতের প্রথম পুরুষে 'ইবেন,' 'ইবে'; মধ্যম পুরুষে 'ইবা' উত্তম পুরুষে 'ইব'; অনুজ্ঞার ভবিষ্যতে 'ইও' ইস্, অনুজ্ঞার বর্ত্তমানে প্রথম পুরুষে 'উন,' 'উক্,' মধ্যম পুরুষে 'ও,' উত্তম পুরুষে 'ই'। একটা মূলের রূপ করিয়া দেখাই।

ক্রিয়ার মুল 'কর্'।

ক্রিয়াভাব—কর্+আ=করা।
অসমাপিকা—কর্+ইয়া=করিয়া।
নিমিত্তার্থে—কর্+ইতে=করিতে।

বর্ত্তমান-কাল।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
কর্+এন=করেন। কর্+এ=করে।	কর্+ও=করো।	কর্+ই=করি।

অতীত-কাল।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
কর্+ইলেন=করিলেন।	কর্+ইলা=করিলা।	কর্+ইলাম=করিলাম।

ভবিষ্যৎকাল।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
কর্+ইবেন=করিবেন।	কর্+ইবা=করিবা।	কর্+ইব=করিব।

অনুজ্ঞা (বর্ত্তমান)।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
কর্+উন=করুন।	কর্+ও=করো।	কর্+ই=করি।

অনুজ্ঞা (ভবিষ্যৎকাল)।

মধ্যম পুরুষ।

কর্+ইও=করিও। কর্+ইস্=করিস্।

সংস্কৃত সবল এবং বাঙ্গালা দুর্ব্বল ভাষা। সংস্কৃত সবল, কেননা একটি একটি ধাতুর উপরে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি এবং প্রত্যয় যোগ করিয়া কত শব্দনই গড়া যায়। বাঙ্গা-

লায় ধাতু নাই; ক্রিয়ামূলগুলিও ক্ষীণ, বেশী পোড়ও সহিতে পারে না, বেশী ঘাও সহিতে পারে না। 'আছ্' এই একটি ভগ্নমূলকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালায় অনেকগুলি ক্রিয়াপদের কাল-ভেদ করিয়া লইতে হয়, যেমন, 'করি'তে 'আছি' যোগ করিয়া গড়িতে হইল করিতেছি; এইরূপ করিতেছ, করিতেছে, ইত্যাদি। আবার ঐরূপই করিতেছিল, করিতেছিনা, "করিতেছিলাম, করিয়াছিল, করিয়াছিলাম ইত্যাদি। 'আছ্' এইটিকে ভগ্নমূল বলিয়াছি; ক্রিয়ার সকল ভাবে কেবল 'আছ্' লইয়া কাজ হয় না। 'যা' এটাও ঐরূপ ভগ্নমূল, 'যা' ক্রিয়া সমস্ত ভাবে চলে না; 'যাইয়াছে' শিষ্টপ্রয়োগ নহে; গিয়াছেই শিষ্টপ্রয়োগ। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। ইদানী কেহ কেহ 'গিয়াছে' এই পদের পরিবর্ত্তে 'গেছে' বা 'গ্যাছে' লিখিয়া থাকেন। এরূপ লেখাতে প্রমাণস্বরূপে সাধুভাষা স্থির থাকে না। এবং পদ সাধনে অকারণে ব্যভিচার ঘটান হয়। 'ই আছে' বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'য়াছে' বা 'এছে' লিখিতে হইলে, সর্ব্বত্রই ঐ একই রূপ লেখা উচিত।

সংস্কৃত সুবন্ত তিঙন্তের সহিত বাঙ্গলার কোনও মিল নাই এবং থাকিতেই পারে না, ইহা বিস্তারিত করিয়া দেখানই বাহুল্য। কেন না, সুবন্ত তিঙন্তই প্রত্যেক ভাষার মেরুদণ্ড স্বরূপ। ভাষায় ভাষায় অন্ত ভেদ না থাকিলেও অথবা অন্ত অংশের ভেদ অল্প হইলেও সুবন্তে তিঙন্তে ভেদ থাকিবেই থাকিবে।

স্ত্রী-প্রত্যয়েও বাঙ্গালা ভাষার দুর্ব্বলতা; এবং সেই হেতুতে সংস্কৃতের সহিত ভেদ বিলক্ষণরূপেই দেখা যায়। বাঙ্গালায় স্ত্রীপ্রত্যয় আছে। হ্রস্ব বা দীর্ঘ-ঈ এবং আনী বানী—তা হ্রস্ব 'ই' কারান্তই হউক বা দীর্ঘ 'ঈ' কারান্তই হউক—যোগ করিয়া স্ত্রীবাচক শব্দ করা যায় বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতি বুঝাইতে প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দের রূপান্তর করিতে হইবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি নাই। পাঁঠি বলিলেও চলে মেদিছাগল বলিলেও চলে, গয়লানী বলিলেও চলে বা গোয়ালাবৌ, গোয়ালাঝি, বা গোয়ালার মেয়ে বলিলেও চলে। পুরুষ মানুষও মানুষ স্ত্রীও মানুষ। আবার বিশেষণেও স্ত্রীত্বের খাতিরে বহু বিচার করা না করা, শব্দের রূপান্তর করা না করা, বক্তার বা লেখকের সম্পূর্ণ ইচ্ছায়ত্ত। সুন্দর মেয়েটি, এমেয়েটি কেমন সুন্দর, এপুরুষটা খোঁড়া, ও মেয়েটি খোঁড়া ইত্যাদি প্রয়োগ ত নির্দ্দোষ বটেই, সাদা, কালা, ময়লা, ফর্সা, ভাল, মন্দ ইত্যাদি শব্দের স্ত্রীত্বসাধন মোটেই করিবার জো নাই। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু, ফারসি এত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করিয়াও বাঙ্গালাকে স্ত্রীত্ব প্রকরণে কোট ছাড়াইতে পারে নাই।

কৃৎ প্রকরণের কথা না তুলিলেও চলে। সংস্কৃতের কৃৎ প্রত্যয়গুলি ধাতুর উপরেই কাজ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালায় মোটেই ধাতু নাই। বাঙ্গালা ক্রিয়া মূল হইতে 'আ' যোগে ভাব বাচক শব্দ করা যায়। 'যি আ' যোগে দুই চারিটা

কর্ত্তাবাচক শব্দও করা যায়; যেমন গাইআ, খাইআ, বাজয়িআ, নাচয়িআ ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল শব্দের সাধু প্রয়োগ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সংস্কৃত কোনও প্রত্যয়ই, বাঙ্গালায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন, কোনও শব্দে লাগান যায় না। যে পড়ে তাহাকে পড়ুয়া, লোকটাকে মারাই বিধি, এস্থলে মারিতব্য কি মারণীয় কি মার্য্য, এসব কিছুই বলিবার জো নাই। তদ্ধিত প্রত্যয় সম্বন্ধেও ঐ কথা।

বাঙ্গালায় একটা 'মন্ত' প্রত্যয় ছিল, কিন্তু সেটা অনাদরে মারা গিয়াছে। ধনমন্ত, ভাগ্যমন্ত, আক্কেলমন্ত, শ্রীমন্ত প্রভৃতি কথোপকথনে ত শুনিতামই, প্রাচীন পুথিতেও যেন কোথাও কোথাও দেখিয়াছি। আর ওালা বা অয়লা, যেমন ঘাসওালা বা ঘাস অয়লা, দুধওালা বা দুধ অয়লা, এবং স্ত্রীবাচক ওালী বা অয়লী বা ঔলী এখনও যেন আনাচে কানাচে উকি ঝুঁকি মারে। আমার বিবেচনায় একটু আদর করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে স্থান দিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গালায় কিছু কিছু সমাস আছে। দা কাটা তামাকে, দা-কাটা বোধ হয় করণ-তৎপুরুষ; আর কলম-কাটা ছুরিতে কলম-কাটা বোধ হয় কর্ম্মতৎপুরুষ; তবে তৃতীয়া তৎপুরুষ, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলিবার জো নাই, কেন না সংস্কৃত বিভক্তির ক্রমসংখ্যার সঙ্গে বাঙ্গালা বিভক্তির ক্রমসংখ্যা মিলিবে না। ধামাধরা, হাঁড়িহাতে প্রভৃতি শব্দে সমাস আছে কি নাই, আর যদি থাকে তবে অমুক সমাস কিনা, সে বিচার করা আমার কর্ম্ম নয়। তবে সংস্কৃত সমাস সংস্কৃতে খাটে, বিভক্তির কাঙ্গাল বাঙ্গালাতে খাটিবে না, একথা বলিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে না।

আমি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিতেছি না, রচনা করিতে পারি এমনও মনে করি না। উপস্থিতক্ষেত্র ব্যাকরণ রচনার স্থলও নহে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কারের নিমিত্তে দিগ্দর্শন করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি ইহাই মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নহে, এবং বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ করিতে হইলে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালিলে কাজ হইবে না। আরও দেখাইতে চাই যে, বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের দিকে অযথা পক্ষপাতের ফল লাভ না হইয়া লোকসানই হইবে। সংস্কৃতে আমার বিদ্যা নাই অথচ বিলক্ষণ ভক্তি অনুরাগ আছে, ইহা বলিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। ভক্তি অনুরাগ আছে বলিয়াই আমি ইঙ্গিত করিতেছি যে, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কার চেষ্টা করা উচিত। নহিলে এখনকার বাঙ্গালা ভাষার যে একটা দোষ দেখিতে পাই, তাহা ক্রমশঃ আরও প্রবল হইতে পারে। দোষটা এই যে,সংস্কৃত শব্দের অজ্ঞানকৃত অযথার্থ প্রয়োগ জন্য বিস্তর সংস্কৃত শব্দের ধর্ম্ম এবং শক্তি নষ্ট হইতেছে। শুধু এই-টুকু হইলেও সর্ব্ব হইত, কিন্তু দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাতে সংস্কৃত শব্দের বিকৃত অর্থ শিখিয়া কেহ কেহ সংস্কৃতের সেই বিকৃতির আরোপ করেন এবং অভিসন্ধি নির্দ্দোষ

হইলেও বুদ্ধিমালিন্য প্রযুক্ত নিজের এবং পরের ইহকাল পরকালের হানি করিয়া থাকেন। সভাস্থলে একথার দৃষ্টান্ত উদাহরণ দেওয়া উচিত মনে করি না।

অভিধানের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে সে প্রয়োজন আরও প্রকট হইবে, এইরূপ আশা করি। শব্দ-কল্পদ্রুম কিম্বা বাচস্পত্য, অমরকোষ কিম্বা মেদিনী বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান নহে। ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ আমি যখন তখন দেখিয়া থাকি; উহা সুন্দর সংগ্রহ। দোষের মধ্যে বহুতর বাঙ্গালা শব্দই উহাতে পাওয়া যায় না। আমি প্রকৃতিবাদের নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু প্রকৃতিবাদে বা ঐ প্রকারের অন্য সংগ্রহে আমাদের কুলায় না, ইহাই বলিতে চাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যত শব্দ পাওয়া যায়, তাহার নিরবশেষ সংগ্রহ আবশ্যক। আর সংগৃহীত প্রত্যেক শব্দের মূল এবং যে ভাষার সেই শব্দ, সে ভাষায় সেশব্দ কি কি অর্থ প্রকাশ করে এবং পরে বাঙ্গলায় সে শব্দ কোন্ স্থলে কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই প্রয়োগটি দেখাইয়া অভিধানখানির রচনা করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আরও এমন চেষ্টাও করিতে হইবে যে, প্রদেশে প্রদেশে কথোপকথনে যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, সাহিত্যে সে সকল শব্দের মূর্ত্তি আছে কি না। আর সেই সেই মূর্ত্তিতে যদি অন্তর থাকে, অর্থাৎ প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রভেদও যেন অভিধানে দেখান হয়। ইহা যদি হয়, তবেই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত সংস্কার হইতে পারিবে।

রচনার রীতি সম্বন্ধে এবং শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা ভাবিবার মতন আছে। এখন যাঁহারা বাঙ্গালা লেখেন বা বাঙ্গালা বলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই শিক্ষা ইংরেজিতে, তাহার উপর কেহ কেহ বা সংস্কৃত জানেন, কাহারও কাহারও বা সংস্কৃতের আমেজ আছে। সাধ করিয়া কেহ কেহ বা বাঙ্গালায় প্রাচীন নবীন রচনাও কিছু কিছু পড়েন। ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষার উপর ইংরেজির ভাবনা-পদ্ধতির, ইংরেজির রচনা-রীতির, ইংরেজির প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যের প্রকোপ অতি মাত্রাতেই অনুভব করিতে হয়। সর্ব্বপ্রকারেই বা সকল স্থলেই যে ইহা নিন্দনীয়, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু কোন্‌টুকুই বা সম্পদ আর কোন্‌টুকুই বা বিপদ, বুঝি, সবক্ষেত্রে তাহার বিচার হয় না। 'তিনি বলিলেন তিনি আসিবেন না', এ রীতি ইংরেজির। 'তিনি আসিবেন না বলিলেন,' বা 'তিনি বলিলেন যে আমি যাইব না' ইহাই আমাদের দেশীয় রীতিসঙ্গত। কোন্ রীতি বর্জ্জনীয়, বা কোন্ রীতি গ্রহণীয়, দশজনের মতন দশজন তাহার বিচার করুন, এই আমার অনুরোধ। তাহার পর ইংরেজিতে ভাবিয়া বা ইংরেজি-বাঙ্গালাতে মিশাইয়া ভাবিয়া, বাঙ্গালায় লিখিবার সময়ে আমরা যেন একটু তাড়াতাড়ি করি বলিয়া মনে হয়। ইংরেজি শব্দ তাহার ভিতরে যাঁটি অপরিচিত ভাব সমাবিষ্ট, তাহাকে বাঙ্গালা মূর্ত্তি দিতে হইবে, তেমন একটি বাঙ্গালা কথা পাওয়া গেল না; এদিকে সংস্কৃত ধাতুর খনি, টপ করিয়া একটা ধাতু তুলিয়া লইয়া তাহার এদিকে

এক ঘা ওদিকে এক ঘা দিয়া আমরা কখনও কখনও কাজ চালাই না কি? অভিধান দেখা অনেকেই দোষ বলিয়া মনে করেন; কেন না বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিখাইবারই ভাষা, শিখিবার ভাষা নহে। আরও দেখুন, অনেক স্থলে বাঙ্গালার অর্থ করিতে হইলে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়া তবে তাহা বুঝা যায়। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা ক্যাল ক্যাল চাহিয়া অগত্যা লেখকের জয় জয়কার করিয়া ক্ষান্ত হন। আজি কালি আমরা গড়গড়ার মাথায় কলিকা বসাইয়া দিলে চাকরকে 'ধন্তবাদ' না দেওয়া অশিষ্টাচার মনে করি। আত্মীয়-স্বজনের বা বন্ধু-বান্ধবের সম্পদে বিপদে আমরা এখন 'সহানুভূতি' ঠেলিয়া দিই। সহানুভূতি ঠেলিয়া দিয়া 'যোগদান' করিতে পারি ত যোগদান করি, আর যোগদানে অসুবিধা বুঝিলে চা-চুরুটে 'মনোযোগ প্রদান' করি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মা, অদৃষ্ট, জন্মান্তর, ঈশ্বর, জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, দেবতা, প্রকৃতি, কর্ম্ম, গুণ প্রভৃতি শব্দে কি বুঝিতেন, সে প্রশ্নের ভার প্রত্নখোরদের উপর অর্পণ করিয়া আমরা অনেক পরিমাণে স্বাধীনতার এবং সভ্যতার সুখাস্বাদনে বদ্ধপরিকর হইতে পাই এবং সাহিত্যের ষড়রসে বিভোর হইয়া অকুতো সাহসে—(তয়ে ওকার) পরস্পরের করকম্পন করিতে থাকি। এ সব অভ্যুদয়ের লক্ষণ কি অধোগতির প্রমাণ, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। তবে, ভাষার সংস্কার প্রসঙ্গে এগুলিও যে ভাবিবার কথা, ইহা আমি মনে করি।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার প্রসার এবং পুষ্টি হইতেছে তাহা একহিসাবে বিস্ময়জনক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন গ্রন্থ বাহির হইতেছে। প্রবন্ধপত্রের এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে নিভৃত পল্লীগ্রামেও ভাষা চর্চ্চা বিস্তৃত হইতেছে। কত কত সদ্বক্তা বাঙ্গালা ভাষাতে কত উপদেশ দিতেছেন, কত ব্যাখ্যান করিতেছেন, কত কত বিষয়েরই আলোচনা করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষা নিরাশ্রয়, বাঙ্গালা ভাষা অনাথ, তবু যে বাঙ্গালা ভাষার এমন প্রসার, কে বলিবে যে ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে? গবর্ণমেণ্টের কাছে, আপিসে আদালতে, বাঙ্গালা ভাষার আদর ত নাইই, বাঙ্গালা ভাষার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতটুকু বাঙ্গালা ও অঞ্চলে আগে চলিত, তাহার এক আনাও এখন আর চলে কি না সন্দেহ। এখন বাঙ্গালী হাকিম বাঙ্গালী সাক্ষীর জবানবন্দি আর বাঙ্গালায় লিখিতে পান না। বাঙ্গালী উকিল মোক্তার বাঙ্গালী হাকিমের কাছেও বাঙ্গালায় বহস্ করেন না কিম্বা করিতে পারেন না। এমন অবস্থায় যেটুকু বাঙ্গালাও আদালতে চলে, তাহা ইংরেজির আওতায় নিতান্ত বিবর্ণ, শীর্ণ এবং শ্রীবিহীন। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় যে বাঙ্গালাটুকু প্রবেশ করিতে পায়, তাহাও কতকটা সংস্কৃতের চাপে, কতকটা ইংরেজির ভাপে, চণ্ডীমণ্ডপের কলাবৌএর মতন জড়সড়। তবু দেখুন বাঙ্গালা ভাষার প্রকোপ! একি সোজা কথা! শুধু গবর্ণমেণ্টের ঘরে কি স্কুলে আদর পায় না

বলিয়াই যে, বাঙ্গালা ভাষাকে নিরাশ্রয়, অনাথ বলিতেছি, তাহা নহে। বর্ষাকালের ঝিঙ্গাপাতায় চাঁদের আলো যেমন একটুকু ঝিকিমিকি করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, বৈঠকখানার আলাপে আপ্যায়িতে বাঙ্গালা ভাষা ততটুকুও ঝিকিমিকি করিতে পায় কি না সন্দেহ! তবু দেখুন বাঙ্গালা ভাষা কেমন করিয়া, কোন্ দিক দিয়া, ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। এ অবস্থা কেবল অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিকদের করুণা কটাক্ষের গুণেই হইতেছে। কিন্তু করুণাই ত? বোধ করি, এখনও কেহই বাঙ্গালা ভাষার কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী নহে। যাঁহারা বাঙ্গালার আদর যত্ন করেন বরং তাঁহারাই বাঙ্গালাকে অনুগ্রহ করেন। মেষ বৃষ আদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন্ রাশির অধিকারে কে আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে, ত্রিশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল পূর্ব্বে পঞ্চানন্দের লেখাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বাঙ্গালা সাহিত্য কুম্ভরাশি। যেটুকু শোভা বা সমাদর তাহা কেবল রমণীকক্ষে। এখন আর ঠিক সে অবস্থা নাই, কিন্তু অনেকটুকু 'কিন্তু' এখনও আছে। আশা হইতেছে যে, সে 'কিন্তু' আর দীর্ঘকাল থাকিবে না। এখন হইতে একটুকু ভাল করিয়া লাগিলে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালি বাঙ্গালা ভাষার গৌরবে বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে আর কুণ্ঠিত হইবে না। অসাধারণ অধিকারীরা, তখন অলঙ্কার স্বরূপে অন্য ভাষার সেবা করিবেন। কিন্তু তোমার আমার মতন লোককে, দেশের রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে তখন আর ইংরেজির মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি, আজি যে সংস্কারের সূচনা হইতেছে তাহার ফলে সেইদিন সত্বর উপস্থিত হউক।

জাত মানি না কেন? (১)

আমরা যে একেবারেই জাতি মানি না, তাহা নহে, বরং এক হিসাবে আমরা খুবই জাতি মানি। এই যে কন্যাদায়ে চারিদিকে হাহাকার, গগন-মেদিনী-কাঁপানো আর্ত্তনাদ, এ ত কেবল জাতি মানার দরুণ। শুনিয়াছি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্রাহ্মণসন্তান ভিন্ন অপর জাতিকে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই; এবং করেন না। এস্, পি, সিন্‌হা—যাঁহার জাতিনাম সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ,—উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ; তাঁহার আত্মীয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি আপন কন্যার নিমিত্ত একটী উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ বর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া, শেষে অগত্যা এক বৈদ্য সন্তানকে জামাতা করিয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর ভিতরে বাঙ্গালী কায়স্থেরাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতিমার্গে এখন উধাও ধাবন্ত। কিন্তু প্রশান্ত-সাগরোপম অতি-বড় সদুদারহৃদয় কোনও

(১) "প্রবাসী"—১৯শে আষাঢ়, ১৩১৬ সাল।

কায়স্থও, কোনও ফিরিঙ্গীকে, কি মুসলমানকে, কি ব্রাহ্মণকে, কি নমঃশূদ্রকে কন্যাসম্প্রদানের পাত্র মনোনীত করিতে উদ্যত হইয়াছেন বা প্রস্তুত হইয়াছেন, অদ্যাপি এমন কথা আমার কর্ণগোচর হয় নাই। সকল জাতিতেই—সকল শ্রেণীতেই—সকল সম্প্রদায়েই এই ভাব দেখিতে পাই। বিবাহ সম্বন্ধে জাতি লইয়া এখনও এমনি টানাটানি।

তথাপি বলিতে হয় যে, আমরা জাতি মানি না। বিবাহে জাতিবিচার করাতে বুঝা যায় যে, জাতিরক্ষাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তবু বলি যে, আমরা জাতি মানি না। যে প্রকার শৌচাচার-পরায়ণ হইলে জাতি রক্ষা করিতে পারা যায়, যে প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা হইলে জাতি থাকিতে পারে, যে প্রকার ভাব-ভঙ্গীতে, চাল-চলনে জাতিধর্মের পুষ্টি হয়, সে প্রকার শৌচাচার, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভঙ্গী, চাল-চলন, আমরা পালন করি না। কাজে কাজেই বলিতে হয় যে, আমরা জাতি মানি না। পৃথিবীর আর কোনও দেশে জাতি নাই, জাতি আছে কেবল আমাদের এই দেশে। মনুষ্য-সমাজে কোনও সম্প্রদায়েই জাতি নাই—জাতি আছে কেবল হিন্দুদের ভিতরে। অথচ জাতি থাকিতেও আমাদের জাত্যভিমান নাই। জাতি না থাকাতেও সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রায় সকল মানুষেরই জাত্যাভিমান কত প্রবল!—কত পরিস্ফুট! খৃষ্টান খৃষ্টান বলিয়াই কত অভিমান করে! মুসলমান, মুসলমান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে কেমন আত্মগৌরবের ভাব অনুভব করে। এ ভাব দেখি না—কেবল হিন্দু-সন্তানেরা তাহাতেই বলি যে আমরা জাতি মানি না।

মাথা-গণতিতে হিন্দুদের সংখ্যা কমিতেছে। অন্ততঃ মুসলমান প্রভৃতির সংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে, হিন্দুর সংখ্যা সে হারে বাড়িতেছে না—এই খেদে কেহ কেহ কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। সে কান্নার রোলও আমার কর্ণে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এ কান্না কে কাঁদে? যে কাঁদে সে পুরাণো দলের হইলে পিরালী, আর নূতন দলের হইলে বিলাত-ফেরত। যে হিন্দু-সন্তানের জাতিতে বা জাত্যংশে এখন পর্যন্ত সামাজিক খুঁৎ বাহির হয় নাই, সে হিন্দুসন্তান বোধ করি এ কান্নায় 'যোগদান' করে নাই। তবেই বলিতে হয় যে, আমরা জাতি মানি না।

জাতি যদি মানিতাম, তাহা হইলে আমাদের মাথার মণি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রধান পুরুষেরা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের লোভে জাতি দিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেন না। আয়ু থাকিতে কেহ মরে না, আয়ু ফুরাইলে কেহ বাঁচে না;—পড়িয়া শুনিয়া বুঝিয়া শুনিয়া এ তত্ত্বের মর্ম্ম জানিয়া, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা উপবাস স্বীকার করিতেন, তবু জাতি দিতে কখনও উপযাচক হইতেন না। জাতি মানিলে, অর্থ-কাম-সর্ব্বস্ব ম্লেচ্ছ কখন হিন্দুর ছেলের দৃষ্টিতে আদর্শরূপে পরিগণিত হইত না। জাতি মানিলে হিন্দুর কুলবধূ বসন-ভূষণে, হাব-ভাবে, বিলাস-ব্যসনে, বারাঙ্গনাকে কখনও আদর্শ করিত না।

বেশ প্রণিধান করিয়া দেখ দেখি, এখনকার পুরুষদের আদর্শ কাহারা? আর এখনকার স্ত্রীলোকদের আদর্শই বা কাহারা? তাহার পর বলো যে, বাস্তবিক আমরা জাতি মানি না।

আমরা জাতি মানি না, ইহা নিশ্চয়। এখন কি কারণে জাতি মানি না, তাহা ভাবিয়া দেখা ভাল। কার্য্য যখন দেখিতেছি; কারণ তখন আছেই।

পান্তা ভাতও ভাত, গরম ভাতও ভাত। কিন্তু ব্রাহ্মণকে পান্তা-ভাত খাইতে নাই—গরম ভাত খাইতে আছে। ইহার কারণ এই যে, অন্ন পাকের পর এক প্রহর পরেই অন্নের সুরস শুকাইতে থাকে; আর ভাতে জল দিয়া রাখিলে সেই ভাত পান্তা হয়। ক্রমে তাহাতে অম্লরসের সঞ্চার হয়; তাহাতে মাদকতা জন্মে। সেই অন্ন গাঁজাইলেই ক্রমশঃ তাহা হইতে মদ হয়। সহজে এবং সত্বর গাঁজাইবার নিমিত্ত আমাদের দেশের শুঁড়ি পান্তাভাতে "বাকড়" দেয়। কতকগুলা গাছগাছড়ার ছাল-শিকর একত্র বাঁটিয়া, এই 'বাকড়' প্রস্তুত হয়। এই বাকড় দেওয়াতেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে অন্নরস গাঁজিয়া মদে পরিণত হয়। শুক্‌না ভাত—মদের গোড়া, পান্তা ভাতও মদের গোড়া। "বাকড়" পড়িলে সোণায় সোহাগা হয়, মদ শীঘ্রই জমিয়া উঠে। এই কারণেই যাতযাম গতরস পূতি-পর্য্যুষিত অন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই দূষিত অন্নে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে আলস্য আইসে, অজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়; ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-হানির শঙ্কা হয়। টাট্‌কা-টাট্‌কা ভাত খাওয়াই ব্রাহ্মণের উচিত। আর মদ খাইলে ব্রাহ্মণের জাতি যায়।

আমাদের জাতি-ধর্ম্মকেও জিয়াইয়া জাগাইয়া রাখিয়া, টাট্‌কা টাট্‌কা জাতিধর্ম্মের সেবা করা উচিত। মনে হয় যে, মুসলমানের আমল হইতে আমাদের জাতিধর্ম্ম জিয়াইয়া রাখিতে এবং জাগাইয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের জাতি-ধর্ম্মটা বড় বাসি হইয়া গিয়াছে—কতক শুকাইয়াছে, কতক পান্তাও হইয়াছে। আর তাহার উপর ম্লেচ্ছ-শিক্ষার "বাকড়" পড়িয়াছে। কাজে কাজেই হিন্দু-সন্তানের অন্তঃকরণে উচ্চাটন-কর মদের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দু-সন্তান এখন এই মদে মাতোয়ারা। হিন্দু-সন্তান এখন অজ্ঞান, অলস, উদ্‌ভ্রান্ত এবং বহ্বল। আর কি জাতি মানিতে পারে?

আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে; কাম-ক্রোধ-লো- আছে। ইহারা আমাদের ভিতরে আছে; আর বাহিরে আমাদের মন ভুলাইবার অনন্ত পদার্থ আছে। স্বভাবতই আমরা সেই অনন্ত পদার্থের দিকে ছুটিতে থাকি। এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং স্ত্রী-সঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাস্তবিক জীবন ধারণ করিবার নিমিত্তই পান-ভোজন আবশ্যক সন্তানার্থেই স্ত্রী-সঙ্গের প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা এখন কয়জনে বুঝে, আর কয়জনেই ব

জানে? আমরা যে পান-ভোজন করি, প্রায়শই তাহা রসনার অনুরোধে নয় কি? কিছু খাইবার সময়ে সুস্বাদের দিকেই আমাদের মন পড়িয়া থাকে না কি? বাস্তবিক এখন আমরা যে ভাবে চলিতেছি, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস ভিন্ন আমাদিগকে আর কিছু বলা চলে না। হিন্দুয়ানী ত দূরের কথা, সামান্য মনুষ্যত্বও আর আমাদের নাই। তাহার উপর যুটিয়াছে ম্লেচ্ছ-সংসর্গ আর ম্লেচ্ছ-কুশিক্ষা। আমরা এখন "সভ্য" হইতেছি; আর "উন্নতি" বলিতেছি। যাহার ভাল কাপড়-চোপড়, যাহার ভাল ঘর বাড়ী, যাহার খুব গাড়ী-ঘুড়ি, সে খুব "সভ্য"—খুব "উন্নত।" সোজা কথায় বলিতে হয়, যে ব্যক্তি যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে পারে, ইন্দ্রিয়ের বিলাসে বিভোর হইয়া থাকিতে পারে, ইন্দ্রিয়সেবাকে সর্ব্বস্ব মনে করিতে পারে, সে ব্যক্তি ততই অধিক "সভ্য"—ততই অধিক "উন্নত।" আজি কালি যাহাকে "বিদ্যা" বলা হয়, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাই ম্লেচ্ছ-শিক্ষা।

কিন্তু হিন্দুর শিক্ষা অন্য প্রকার। হিন্দুর পুরুষার্থ চারি প্রকার। তন্মধ্যে প্রবৃত্তির দিকে তিন,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; নিবৃত্তির দিকে এক,—তাহার নাম মোক্ষ। যাহারা অর্থ-কাম-সর্ব্বস্ব তাহারা মোক্ষ বুঝিতে ত পারেই না, ধর্ম্মও বুঝিতে পারে না। ধর্ম্মে ইন্দ্রিয় ক্রমে নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়; অর্থ কাম সেবাতেও ধর্ম্ম,—মনুষ্যকে সংযত করিয়া রাখে; উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না। ধর্ম্ম,—ইহকালের সকল কাজের উপরেই পরকালকে বড় করিয়া রাখে; সকল কাজেই স্বর্গ-নরকের এবং জন্মান্তরের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমে ক্রমে মানুষের বশীভূত করিয়া আনে। এখন আমি ইন্দ্রিয়ের দাস; কিন্তু ধর্ম্ম মানিয়া চলিলে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়েরাই আমার দাস হইয়া পড়ে। তখন, আমি মোক্ষ সাধনেরও অধিকারী হইতে পারি। ইহাই হিন্দুয়ানীর শিক্ষা। এখন যে "হিন্দু" "হিন্দু" একটা রব উঠিয়াছে, তাহাতে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার সাধটা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু হিন্দুয়ানী রাখিবার কোনও চেষ্টা দেখা যায় না। হিন্দুয়ানী-বর্জ্জিত আর ম্লেচ্ছামী-ভরা হিন্দু—এ এক অদ্ভুত সামগ্রী।

সুশিক্ষার অভাবে আর কুশিক্ষার প্রভাবে আমরা বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাম ভয়ঙ্কর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই আমরা জাতি মানি না। জাতি মানিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়া বসিয়াছি; তাহাতেই আমরা জাতি মানিতে পারি না। অর্থ-কামকে সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিলে, ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়ের দিকে সর্ব্বদা অসংযত ভাবে ছুটিতে দিলে, জাতি মানিবার সামর্থ্য অবশ্যই হারাইতে হয়। আমরা সাবান দিয়া শৌচকর্ম্ম করি; সাবান সুগন্ধ আছে; সাবান সুদৃশ্য। তাই আমরা ভুলিয়া যাই যে, সাবান অশুচি। চর্ব্বিতে অশৌচ বাড়ায়। কিন্তু আমরা এখন ঠিক উলটা কাজ করি। তাহাতেই শৌচে সাবান ব্যবহার করি। পিপা

হউক আর নাই হউক, আমরা মুসলমানের কি মেথরের জল খাইতেও কুণ্ঠিত হই না। পয়সা খরচ করিয়া লেমনেড খাই, আর জাতি খোয়াই। সকল দিকেই এই ভাব।

ধর্ম্ম রক্ষা করিলে তবে জাতি থাকে। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিলে কিছুতেই জাতি থাকে না। সকলের সামর্থ্য সমান নয় বলিয়াই আমাদের ভিতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি প্রকার জাতিভেদ আছে। যাঁহার সামর্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যে অধিক সহিষ্ণু হইতে পারে, যে অধিক সংযত হইতে পারে, যে অধিক সত্যপালন করিতে পারে, ব্রাহ্মণধর্ম্মে তাহারই অধিকার। ব্রাহ্মণের জাতি রাখিতে হইলে বিস্তর কায়িক ক্লেশ, লৌকিক অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। সহ্য করিতে পারিলে তবে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা করা হয়। ব্রাহ্মণের জাতি মানা হয়। সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্রের ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত সুখসাধ্য। কঠোরতা ক্রমেই কম, ইন্দ্রিয়সেবার মাত্রা অধিক। এ কথায় যদি কাহারও অবিশ্বাস হয়, তিনি ব্রাহ্মণের রক্ষণীয় নিয়ম এবং নিষেধ পালন করিয়া দেখিতে পারেন, কোনও ব্রাহ্মণই তাহাতে আপত্তি করিবে না; কোনও শাস্ত্রই তাহাতে বাধা দিবে না।

কিন্তু গোল ঐখানেই—উপনিষদের বিচার করিয়া বড় হইতে সকলেই উদ্যত, কিন্তু উপনিষদে যে কাহার অধিকার, এটা কেহ ভাবিতে চাহে না। গৃহস্থের বিহিত কর্ম্ম বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়; তাই আমরা এক লম্ফে ঔপনিষদিক হইতে উদ্যত। সে-ও যে একপ্রকার ইন্দ্রিয়-সেবা, ইহা এখন আমরা আর বুঝিতে পারি না। কিন্তু বুঝি আর না বুঝি, উপনিষদ্ যে কাব্য বা উপন্যাস নহে, ইহা নিশ্চয়।

যাঁহার বুঝিবার শক্তি আছে, তিনি বুঝুন যে, বাস্তবিক আমরা জাতি মানি কি না। তিনি বুঝুন যে, জাতি মানিতে হইলে জাতি-ধর্ম্মপালন করিতে হইবে। জাতি-বিহিত শৌচ-আচার-উপাসনা করিতে হইবে এবং জীবনরক্ষার্থে যে জাতির যে জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই জীবিকাতেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। জাতি মানা বড় কষ্টসাধ্য বলিয়াই আমরা এখন জাতি মানি না। ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া করিয়া আমরা অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি; তাহাতেই আমরা জাতি মানি না। কু-শিক্ষার প্রভাবে আমরা চেতনা হারাইয়াছি, তাহাতেই আমরা জাতি মানি না। জগদম্বার কৃপা যদি হয়, তবেই আমরা আবার জাতি মানিতে পারিব; আবার হিন্দু বলিয়া স্ব স্ব অধিকার লাভ করিতে পারিব। ভরসা,—জগদম্বা। জগদম্বার কৃপা ভিন্ন উপায়ান্তর আর নাই।

পি, সি রায়ের "মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।

[১]

যিনি জাতিতে কায়স্থ, নামে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন, তিনি ম্লেচ্ছ দেশে গিয়া সায়ন্স শিখিয়া পুনরায় এদেশে আসিয়া ডক্টর পি, সি, রায় হইয়াছেন। ইনি সায়ন্সের ডক্টর। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার। শুনিতে পাই, ইনি যে সায়ন্স শিখিয়াছেন, সে সায়ন্সে ইঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা জন্মিয়াছে। ইস্কুল কলেজের ছেলেরা ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধাও করে। হয়ত স্কুল কলেজে পড়া ব্রাহ্মণের ছেলে বেদবাক্যে বিশ্বাস করে না; কিন্তু পি, সি, রায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও মিথ্যা হইতে পারে—এমন কল্পনাও তাহারা করিতে পারে না। পি, সি রায় যে কেবলই ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের শ্রদ্ধাভাজন, তাহা নহে; ইংরেজীপড়া বিস্তর বয়োবৃদ্ধ খোকাও পি, সি রায়কে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া গুরুর আসনে বসাইতে প্রস্তুত,—এমন কথাও কেহ যদি বলে, তাহা হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না। কাজে কাজেই বাঙ্গালী হিন্দুর বাজারে পি, সি রায়ের কোনও কথা বাহির হইলে, জাত্যভিমানী হিন্দু মাত্রেরই সেদিকে নজর রাখা ভাল।

নির্ব্বাসিত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি-এ, সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' নামক কাগজে পি, সি, রায়ের এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।" সেই প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত বা বিতরিত হইতেছে।" "মস্তিষ্কের প্রাখর্য্যে বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর আর কোনও জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে পথে এই শক্তি নিয়োজিত করিলে নানা সুফল প্রসব করিত, সে পথে ইহার নিয়োগ হয় নাই। তাই জগতের সমক্ষে বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তি-নিদর্শন-স্বরূপ দেখাইবার অতি অল্প বিষয়ই আছে। মুসলমান-শাসনকালে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৃত্তি ন্যায়ের নিষ্ফল কূটতর্কে ও স্মৃতির জটিল ও স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধি ও ব্যবস্থা প্রণয়নে ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল। সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই।" এই কথা প্রতিপন্ন করাই ডাঃ পি, সি রায়ের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পি, সি রায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে "আজ বর্ত্তমান জগতের ভীষণ জীবন-সঙ্ঘর্ষের দিনে আপনাদের জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের টোলে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায়-সাংখ্যের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে

"বঙ্গবাসী"—১০ই পৌষ, ১৩১৬ সাল।

হইবে? আমরা আজকাল বারিধি-তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গমালা গণিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব? ক্ষুদ্র জলাশয়ে আবদ্ধ হইয়া ভাবিব আমরা বেশ আছি? অথবা নিরাশার তীব্র দংশনের ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ভাবিব—বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা ও দীক্ষা ভ্রান্তিমূলক, উহা মানব হৃদয়ে জ্বালাময়ী তৃষ্ণাজনন করিয়া সুখ, শান্তি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার পথ সমাকীর্ণ করে?"

উত্তম প্রশ্ন। তবে বাগাড়ম্বর না থাকিলে আরও ভাল হইত। আর, প্রশ্নচ্ছলে নিজের মনোমত উত্তরের আভাষ না দেওয়াই উচিত ছিল। অধিকন্তু রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের নাম করিয়া ন্যায় ও সাংখ্যের নির্দ্দেশ করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যিনি বিচারার্থী, তাঁহার এমন প্রমত্ততা নিন্দনীয়। রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধকার, কুল্লুক ভট্ট মনু-স্মৃতির টীকাকার। পি, সি রায় জানেন কি না জানি না, ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পি, সি রায়ের প্রশ্ন উত্তম। তিনি যে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটা সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে মঙ্গলের বিষয় হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার প্রশ্নের তাৎপর্য্য আমরা এই প্রকার বুঝি যে, আমাদের "জাতীয় অস্তিত্ব বজায়" রাখা বাঞ্ছনীয়। এখন কথা এই যে, আমাদের দেশের লোকে প্রাচীন রীতির শিক্ষা পাইলে এই 'জাতীয় অস্তিত্ব বজায়' থাকিবে, না কি "বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত" হইলে 'জাতীয় অস্তিত্ব' বজায় থাকিবে?

এইখানে ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক যে, আমাদের 'জাতীয় অস্তিত্ব'টা কি প্রকার পদার্থ। দুঃখের বিষয় এই যে, 'জাতীয় অস্তিত্ব' কাহাকে বলে, তাহা পি, সি, রায় বলেন নাই।

স্বয়ং পি, সি, রায় বঙ্গদেশবাসী কায়স্থের সন্তান। মনে করা যাউক যে, তিনি কায়স্থ জাতিসম্ভব বিশ্বাস, জীবিকা, আচার, ব্যবহার, শৌচ, শুদ্ধি, সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। আর কেফাতুল্লা মিঞার ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ, বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ ছিলেন। এখন যদি পি, সি, রায়ের সহিত কেফাতুল্লার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সন্তান-সন্ততির 'জাতীয় অস্তিত্ব' বজায় থাকিবে, কি থাকিবে না? পি, সি রায় যদি একটি বিলাতী মহিলাকে আপন ঘরণী করেন, তাহা হইলে কি উভয় পক্ষেরই 'জাতীয় অস্তিত্ব' বজায় থাকিবে? না কি এক পক্ষের 'জাতীয় অস্তিত্ব' নষ্ট হইবে? না কি উভয় পক্ষের জাতীয় অস্তিত্ব নষ্ট হইবে? এবিষয়ে পি, সি, রায়ের স্পষ্ট অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে না পারিলে, প্রশ্নের প্রকৃত ভাব নিরূপণ করা বা প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। জাতিতে জাতিতে ভেদ আছে, ইহা স্বীকার করিলেই

'জাতীয় অস্তিত্ব' শব্দের একটা অর্থ দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যদি এক জাতীয় হয়, তাহা হইলে, 'জাতীয় অস্তিত্ব' শব্দের কোনও অর্থই থাকে না। মানুষ থাকিলেই মানুষের অস্তিত্ব থাকে; কিন্তু মানুষটা যদি কাক হইয়া যায়, কি শিয়াল হইয়া যায়, তবেই তাহার 'জাতীয় অস্তিত্ব' বজায় থাকে না। সুতরাং কথা এই—ম্লেচ্ছশিক্ষাগ্রস্ত হইয়া আমরা যদি ম্লেচ্ছ হইয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের 'জাতীয় অস্তিত্ব' থাকে কি না? পি, সি, রায় কি মনে করেন যে, এথ্‌নলজিকাল বেরাইটি এবং জাতি একই প্রকার পদার্থ? আর তিনি কি সেই অনুচ্চার্য্য "এথ্‌ন" বজায় রাখিবার জন্যই এত ব্যাকুল?

আর একটা কথা। ন্যায়-সাংখ্যের গবেষণা আর বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবন একই উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া কি পি, সি, রায় মনে করেন? এই যে আমাদের দেশের যোগী তপস্বীরা যোগ তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন, আর কামার কুমার, ছুতার চামার প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানরশ্মি না হউক কোনও একটা যুগাব্দের জ্ঞান প্রতিভার রশ্মির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলে,—এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য কি একই? কথা এই যে, জ্ঞান-গবেষণা আর শিল্প-সেবা পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর নিমিত্তেই কল্পিত। এদেশের কামার কুমার কস্মিন্ কালেও ন্যায়-সাংখ্যের চর্চ্চা করে নাই। আর ন্যায়-সাংখ্যের সেবাকারী মহাপুরুষেরাও কখনও চামড়া পাইট করিতে শিখেন নাই, জুতা শেলাইও শিখেন নাই।

যাউক। কথার খুটিনাটি ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলি যে, যে শিক্ষার গুণে সমগ্র মানবজাতি শান্ত, উদ্বেগবিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সে শিক্ষাতে যদি সম্প্রদায়-ভেদ করিতে হয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কর্ম্মের ভেদ করিতে হয়, শৌচের আচারের ব্যবহারের ও উপাসনার ভেদ করিতে হয়, তাহা হইলে সে সকল ভেদও মানব জাতির সুখশান্তিরূপ মূল উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্ব প্রকারেই আদরণীয়। 'জাতীয় অস্তিত্ব' থাকুক আর নাই থাকুক; সুখশান্তি যদি থাকে, তবে আবার চাই কি? 'জাতীয় অস্তিত্ব' না রাখিতে পারিলেও যদি সুখ-শান্তি থাকে, মনুষ্য জাতির সুখময় শান্তিময় অস্তিত্ব থাকে; আর পক্ষান্তরে 'জাতীয় অস্তিত্ব' বজায় রাখিবার খাতিরে যদি প্রত্যেক প্রাণীকে দিবা রাত্র ছট্‌ফট্ করিতে হয়; তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বলিব যে, 'জাতীয় অস্তিত্ব' জাহান্নমে যাউক, আর আমাদের সুখময় শান্তিময় অস্তিত্ব বজায় থাকুক।

লোকে বলে যে, বাবুর দলের যাঁহারা বড় লোক, তাঁহারা শিক্ষাগুণে অতীব উদারচরিত। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'জাতীয় অস্তিত্ব'রূপ সংকীর্ণ গণ্ডী তাঁহারা বাধিতে চাহেন কেন? আমরা সংকীর্ণদৃষ্টি ক্ষুদ্রমনা স্বজনবিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু, 'জাতীয় অস্তিত্বে'র ভাবনা ভাবা, জাতি জাতি করিয়া দিবারাত্রি পুতু পুতু কর

আমাদের শোভা পায়। উদারচরিত সুপ্রসারিত-হৃদয় বাবুদের 'জাতীয় অস্তিত্বে' আবার কাজ কি? যেন তেন প্রকারেণ অস্তিত্ব থাকিলেই তাঁহাদের যথেষ্ট হওয়া উচিত। লেজ না গজাইলেই, চারি পায়ে চলিতে না হইলেই, আর পরস্পরে কামড়া কামড়ি করিয়া শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইতে পারিলেই, তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ লাভ হইল মনে করা উচিত।' আর একবার বলি, পি, সি রায়ের প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই,—"আজ বর্ত্তমান জগতের ভীষণ জীবন সংঘর্ষের দিনে" কোন পথ আমাদের অবলম্বনীয়। ডাঃ পি, সি রায় তাঁহার প্রবন্ধের ভিতরেই কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করি,—"জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বন্ধন ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শান্ত উদ্বেগবিহীন জীবনযাত্রা-প্রণালী আবিস্কৃত হইয়াছিল, বৈদেশিক ইতিবৃত্তগণ প্রশংসিত যে সুন্দর পল্লীমণ্ডল সংগঠিত হইয়াছিল যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোসিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন," ভারতবর্ষীয় যে সমাজ শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতীয়গণের তুলনায় অনেক কম, ভারতবর্ষের যে প্রাচীন পুণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবনসংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়; আমরা যেন সে সকল কথা না ভুলি।"

আরে রাম! রাম! রাম! পি, সি রায়ের এ কথার উপর আর কি কথা কহিতে আছে? স্বয়ং পি, সি, রায় বলিতেছেন যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণের যাহা চরম স্বপ্ন, তাহা এই ভারতবর্ষে স্বপ্ন ঘুচিয়া শান্তে পরিণত হইয়াছিল। কিসের গুণে এমন হইল, তদুত্তরে স্বয়ং ঐ পি, সি রায় বলিতেছেন যে, জাতিভেদের গুণে, স্মৃতিশাস্ত্রের গুণে, সামাজিক ব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলার গুণে ভারতবর্ষ এই মনীষিবাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছিল। তবু কি তিনি বলিতে চান, যে, এ দেশে জাতিভেদ নষ্ট করিতে হইবে? স্মৃতিশাস্ত্রকে কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইতে হইবে? সামাজিক সুব্যবস্থা এবং সুশৃঙ্খলা ধ্বংস করিয়া বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবে? আর, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উন্মার্গগামী হইয়া শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া কণ্টকের বনে নিরন্তর লম্ফ ঝম্প করিতে হইবে? আমরা ত বলি যে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি মাথায় থাকুক, কিন্তু আমরা সুখে থাকিতে পারিলে সাধে সাধে ভূতের পাল ডাকিয়া আনিয়া কিল খাইতে অসম্মত। পি, সি রায় "ভূতের" কারবার করিয়া থাকেন; পঞ্চাশ্ ষাটটা ভূত নাকি তাঁহার মস্তিকে ঢুকিয়া নিয়ত হুটোপুটী করিয়া থাকে। সুখে থাকিতে ভূতের কিল তাঁহাকে ভাল লাগে, লাগুক, আমরা পঞ্চভূতের উৎপাতেই অস্থির; পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, আর ভূতে আমাদের কাজ নাই, ভূতগ্রস্ত মানুষেরও প্রয়োজন আমাদের নাই।

পি, সি রায় মনে মনে বড় জ্বালাতন হইয়াছেন, তাহাতেই সুখশান্তিও তাঁহার ভাল

লাগিতেছে না। জ্বালাতন হইবার কারণ কি, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যতদিন মানুষের স্বাভাবিক দুরাকাঙ্ক্ষা না বিদূরিত হইবে, যতদিন মানুষের মনে তাহার সহচরগণের উপর প্রাধান্য লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন এক জাতি অন্য জাতিকে নিজের স্বার্থের জন্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, ততদিনের মধ্যে যে জাতি নিজেদের সমাজকে সোসিয়ালিজমের আদর্শে গঠিত করিবে, সে জাতিকে যে শীঘ্রই অন্যের দাসত্বে জীবন কাটাইতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।"

পি, সি রায় এখানে ভূতের গোলে পড়িয়াছেন। আর আগাপাছা ঠিক নাই, প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আমাদের সমাজকে সোসিয়ালিজমের আদর্শে গঠিত করিতেছি না। ধরিয়া লইলাম যে, আমাদের জাতিকে অন্যের দাসত্বে জীবন কাটাইতে হইতেছে বা হইবে। কিন্তু সে দাসত্বের সঙ্গে সোসিয়ালিজমের আদর্শে সমাজ গঠনের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকুক আর না থাকুক, জাতিভেদমূলক ও স্মৃতিশাস্ত্র-মূলক সমাজের সঙ্গে সে দাসত্বের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি প্রকারে উপপন্ন হইল, তাহা ত বুঝিলাম না? পি, সি রায়ও বুঝাইয়া দেন নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ কি প্রকারে তাঁহার কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল বা মোটেই উদাহরণস্থল হইবে, তাহাও বুঝিলাম না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের কোনও জাতি আজিও অন্য কোনও জাতির দাসত্ব করে নাই এবং কখনও করিবে না। পি, সি রায়—আপন উক্তি যদি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তবেই আমাদের প্রত্যুক্তিরও প্রতিপত্তি করিব, নচেৎ তাঁহার অমূলক বাদের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আয়ুক্ষয় করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র যে মূলে প্রতিষ্ঠিত, সোসিয়ালিজম্ তাহার নিকট দিয়াও যাইতে জানে না।

পি, সি রায়ের উক্তির মধ্যে একটুকু প্রচ্ছন্ন পেটরিয়টিজম্ আছে, মনে হইতেছে। তিনি খুলিয়া বলেন নাই বটে, কিন্তু ইংরেজ গবরমেণ্ট এবং ইংরেজ ব্যবসাদার তাঁহার মাথায় ঢুকিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের এই দাসত্বের কথা দেখাইয়াছেন, এইরূপই আমাদের মনে হইতেছে। কিন্তু আমরা কেঁচো খুঁড়িতে কাঁকড়া উঠাইতে চাহি না। এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবীতে অন্য কোনও জাতির জন্মই যখন হয় নাই, তখন হইতেই আমাদের সমাজ ষোল আনা গড়া-পেটা আছে। শাস্ত্রমূলক অভ্রান্ত সত্যমূলক ভগবান্নির্ম্মিত আমাদের এই সমাজ; তাহাতেই এত উৎপাত অত্যাচার সহ্য করিয়া আজিও আত্মগৌরবে গরীয়ান্ আছে। যাহারা অতি চঞ্চল, যাহারা আশু সুখদুঃখের অতিরিক্ত আর কিছু বুঝিতে পারে না, পূর্ব্বাপর ক্রমচিন্তায় সামর্থ্য মাত্র যাহাদের নাই, তাহারাই মনে করিতে পারে যে, আমরা বুঝি পড়িয়া গিয়াছি। আর বুঝি আমরা উঠিতে পারিব না। কিন্তু আমরা পড়ি নাই। দীর্ঘ সুদীর্ঘ অত্যতিদীর্ঘকাল পরে আমরা একটু বিশ্রাম করিতেছি মাত্র; নিদ্রাবস্থায় জীব-

সেন হেন পুরুষকেও, কুম্ভকর্ণ হেন রাক্ষসকেও, অক্ষম অসাড় বলিয়া মনে হইতে পারে। যে যাহা মনে করিবে করুক, ভীম ভীমই থাকেন, কুম্ভকর্ণ কুম্ভকর্ণই থাকে। পি, সি রায়ই বলুন, আর অন্য কেহই বলুন, আর্ত্তের প্রতি আমরা নিষ্ঠুর হইতে পারিব না—অতিথিকে বিদ্বেষ করিব না,—ভিখারীর উপর কুকুর লেলাইয়া দিব না,—আমরা ধর্ম্ম ধরিয়া থাকিব, বর্ণাশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিব, ভগবৎ-কৃপায় আমাদের অনিষ্ট কখনই হইবে না।

পি, সি রায়ের "মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার।" *

২]

"টাকা, টাকা, টাকা! হা টাকা, যো টাকা। ধর্ম্ম যাউক, কর্ম্ম যাউক, কুল যাউক, শীল যাউক,—যেমন করিয়াই হউক, টাকা করা চাই।"—এই একটা কথা। আর একটা কথা,—"ইংরেজকে মারিতে হইবে; ইংরেজকে তাড়াইতে হইবে; ইংরেজ আমাদের পরম শত্রু; ইংরেজ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।" ইংরেজি শিক্ষার প্রসার যত বাড়িতেছে, উপরের দুই কথায় হাওয়ার যে গতিক বুঝা যায়, সেই হাওয়া দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে; এইরূপ হইবারই কথা। ইংরেজি বা ইউ-রোপীয় কুশিক্ষার ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। ছেলে বেলায় ইংরেজি ভাষাতেই ঘুড়ির গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটা এই,—"ঘুড়ি উড়িতে উড়িতে লকের অর্থাৎ ঘুড়িবাঁধা দড়ির যতদূর দৌড়, ততদূর পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াও, ঘুড়ি মনে করিতে লাগিল, 'এই লকেই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই লকে যদি আমি না বাঁধা থাকিতাম, তাহা হইলে উধাও উড়িয়া হায় আমি আরও কত উচ্চেই না উঠিতাম।' এই মোহে মত্ত হইয়া ঘুড়ি লকের গায়ে ঝাঁকি মারিতে লাগিল। It tugged and pulled, at last it broke, ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে ঘুড়ির লক ছিড়িয়া গেল। লক ছেঁড়ার ফলে, যাহা ঘটিবার, তাহাই তখন ঘটিল। লাট খাইতে খাইতে, হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, টলিতে টলিতে, ঘুড়িখানি আসিয়া ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।"

এ দেশের অনেকেই এখন বুঝিতেছে না যে, আমাদের যেটুকু আস্ফালন, তাহা ইংরেজের লকেরই গুণে। আমাদের লক যদি ছিড়িয়া যায়, ইংরেজের সঙ্গে যদি আমাদের হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হয়, তাহা হইলে আমাদের দশা যে কি হইবে, তাহা কেহ ভাবিতেছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায়শঃ সকল ইংরেজিওয়ালাই এখন যেন উন্মত্ত—উদ্দাম তাণ্ডব করিতেছে। ইস্কুলের ছোক্‌রা হইতে, মোটরগাড়ী-হাঁকানে বাবু পর্য্যন্ত

---

* 'বঙ্গবাসী' ১৫ই পৌষ ১৩১৪ সাল।

প্রায় কেহই ভাবিতে চাহে না যে, যাহার কিছু টাকা হইয়াছে, যাহার যে পদ, সম্পদ লাভ হইয়াছে, কিম্বা যে কেহই আজি কালি ধন-মানের আশা করে, সে কেবল ইংরেজেরই বাঁধনের জোরে। মোক্ষ চিন্তার ত কথাই নাই, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নিরন্তর অর্থের ভাবনা ভাবিলে, আর কামের লালন পালন করিলে, সর্ব্বনাশ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না,—ইহা কয়জনে বুঝিতেছে? কয়জনেই বা লোককে এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে?

পি, সি রায়ের প্রবন্ধও এই ধুয়ারই গান। প্রবন্ধে মোক্ষের নাম গন্ধ ত নাই-ই, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে রসাইয়া মোটে এই কথাটি আছে—'হে হিন্দু সন্তান! ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়; জাতি নষ্ট কর; এখনও যেটুকু সুখ শান্তি বা স্বচ্ছন্দতা আছে, তাহা পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়া 'বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান 'ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হও।' এ কথার অর্থ কি? সোজা অর্থ এই যে,—বেদকে অমান্য কর, স্মৃতি ভুলিয়া যাও, দর্শন শাস্ত্রের কথা লইয়া আর এক ক্ষণও নষ্ট করিও না, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া ইউরোপের "বিজ্ঞান" সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়, সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিল্প-কলার শরণাগত হও।" জিজ্ঞাসা করি, শিল্প-বিজ্ঞানের এমন দাসত্ব করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছে কেন? শিল্প-বিজ্ঞানে কি হয়? টাকা ছাড়া আর কিছু হয় কি? স্বর্গলাভ হয় কি? জন্মান্তরে সুখ-সমৃদ্ধির উপায় হয় কি? তাহা হয় না। মনে করা যাউক যে, তাহাতে ধনোপার্জ্জন হয়। ধন-বলে যে বল, তাহাই। ধনবলে প্রয়োজন কি? প্রথম প্রয়োজন,—ইংরেজকে তাড়ান। দ্বিতীয় প্রয়োজন,—চীনের সঙ্গে কি জাপানদের সঙ্গে এক খাতায় নাম লেখান। ইহা বই আর ত কিছু হয় না।

পাছে কেহ মনে করেন যে, পি, সি রায়ের কথার কল্পিত কদর্থ করিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহার অন্যান্য গ্লানি করিতেছি,—তাই আর একবার পি সি, রায়ের নিজ মুখনিঃসৃত মনঃক্ষোভের পুনরাবৃত্তি করিব। পি, সি রায় বলেন যে, জাতিভেদের গুণে, স্মৃতির গুণে, আমাদের সামাজিক বহুল সুব্যবস্থার গুণে, এই ভারতবর্ষ সুখের এবং শান্তির আস্পদ ছিল, এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে, সে সুখ-শান্তিকে সাধে সাধে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব ধন শাস্ত্রের অমৃতময় উপদেশ ভুলিয়া গিয়া, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে শিল্প-বিজ্ঞানের সেবায় মনোনিবেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। কেন কর্ত্তব্য?—না, দুরাকাঙ্ক্ষ প্রাধান্যলাভ-লোলুপ স্বার্থপর বিদেশীর দাসত্ব এড়াইবার নিমিত্তে এই শিল্প-বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। পি, সি রায়ের এ উপদেশে বিস্মিত হই নাই। বিস্মিত না হইবার কারণ এই যে, তিনি কখনও সুশিক্ষা পান নাই; প্রচুর পরিমাণে কুশিক্ষাই পাইয়াছেন। বিস্মিত হই নাই বটে, কিন্তু দুঃখিত হইয়াছি। যাহাদের অন্নকষ্ট নাই, কোন

প্রকার পদ-প্রতিষ্ঠা যাহাদের আছে, তাহারাও দিগবিদিগ দৃষ্টি না করিয়া ঐ টাকার কথা আর ইংরেজ-তাড়ানের কথাই কেন কয়, এই ভাবিয়াই দুঃখ হয়।

এদিকে ইংরেজ তাড়াইবার জন্য বাবুর দল যেমন ব্যস্ত, ইংরেজিয়ানা আরও আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্যে ততোধিক ব্যস্ত। যিনি যত বড় পেটরিয়ট—কাঙ্গালিনী বাঙ্গালা ভাষার উপর কৃপা করিয়া যাহাকে 'স্বদেশী' বলা হয়—তিনি সেই পরিমাণে মেকী ইংরেজ বা মেকী ইউরোপীয়, খাইদের মাত্রা তাঁহার আত্মায় ততই বেশী। কোট হ্যাট পরিবার সুযোগ পাইলেই আমার স্বদেশী মহাশয় ধুতি চাদর ফেলিয়া দেন। ধুতি চাদর যদি নিতান্তই রাখিতে হয়, তাহা হইলে, একটা গেঞ্জি, একটা উইস কোট, একটা কোট, আর সঙ্গতি থাকিলে, কলার ও নেক্‌টাই থাকা চাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান স্বদেশী হইয়া শিখা কাটেন, যজ্ঞসূত্র ছেঁড়েন। মেথরের কি মুসলমানের পাক নহিলে অন্ন রোচে না। বিদ্বান্ বলিতে বুঝিতে হয়, যে স্বদেশী মহাশয় আর যাহা কিছু জানুন বা না জানুন, আপন পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত জানেনই না, শিখাইয়া দিলেও মানেন না। 'স্বদেশী' কি না! বলিহারি স্বদেশীগিরি!

নাসিকের কালেক্টর সাহেবকে বোম্বাই প্রদেশের এক ছোক্‌রা গুলি করিয়া খুন করিয়াছে। ছোক্‌রা নাকি ব্রাহ্মণসন্তান। তারের খবরে দেখিতেছি, ধরা পড়িয়া ছোক্‌রা নাকি বলিয়াছে I have alone my duty,—"অর্থাৎ সাহেবকে খুন করিয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি।" কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে যে, সাহেবকে খুন করাই হউক, আর কুকুর বিড়ালকে খুন করাই হউক, খুন করাটা ব্রাহ্মণ-সন্তানের কর্ত্তব্য? কাঁচা গাছ কাটিলে যে ব্রাহ্মণ-সন্তানের হিংসাত্মক পাপ হয়, খুন করা কি তাহার কর্ত্তব্য হইতে পারে? কিন্তু সাহেবেরা আমাদের শাস্ত্র মানে না, তাহারা আমাদের জাতিভেদ বুঝে না, আমাদের কাহার কি কর্ত্তব্য, কাহার কি অকর্ত্তব্য, তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গমই হয় না। তাই, একখানা সাহেবী কাগজে এই উপলক্ষে লিখিয়াছে,—

"Brahminism in its most hideous form is for the moment unmasked. Its demon has got its unholy sacrifice. Its lust for cruelty is momentarily appeased * * * There can be no longer tolerated this Barhminical fanaticism which throughout ages has been the negetion of all the most helpful and fruitful ideals inspiring mankind and which now in seeking to survive by murder and terrorism had placed itself beyond the pale of protection or pity.

It has never been unything but a curse to this land—World wide old oppression of man over follow-man—which is perhaps

the greatest scandal in human history and the time has come when it must be taken up the roots."

ইহার তরজমা করিব না। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ্যরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচের মুখস এইবার খসিয়া পড়িয়াছে। রক্তপানে ব্রাহ্মণের যে স্বাভাবিক পিপাসা, তাহা এইবার পরিতৃপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যজাতির যাহা কিছু মঙ্গলজনক, ব্রাহ্মণ্য আবহমান কাল হইতে তাহার জাতশত্রু। এদেশের মাটী হইতে বামনাইটা শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া না ফেলিলে নিস্তার নাই।

সাহেব লেখকের বিষম রাগ হইয়াছে। তাহার উপর ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে সাহেব লেখকের সিকি পয়সার জ্ঞানও নাই। এ অবস্থায় সাহেব লেখক চটিয়া ক্ষেপিয়া কটূ কাটব্য বলিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পি, সি, রায়ও যে এই কথা বলেন। ইংরেজীয়ানামুগ্ধ ইংরেজদ্বেষী মাত্রেই যে এই কথা বলে, তাহার কি? পি, সি, রায়ের পুথিতেও ব্রাহ্মণদের উপর এই গালিবৃষ্টি আছে; বাবুদের মুখেও অহরহঃ ঐ খই ফুটিতেছে। ইঁহারা চার্ব্বাকের ধ্বজা-পতাকা ধরিয়া ছুটাছুটি করিতে চান; শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বন্ধনে বিব্রত হইয়া "স্বাধীন চিন্তা"র বৈজয়ন্তী উড়াইতে চান।

বিস্তর জায়গা জুড়িয়া বসিলাম। প্রবৃত্তি যদি হয়, তবে সময়ান্তরে আর যাহা বলিবার আছে, বলিব।

পি, সি রায়ের "মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"।

[৩]

পি, সি রায় লিখিয়াছেন যে,—"রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের টীকাটিপ্পনী শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিয়া, যদি উঁহারই আদেশ অভ্রান্ত সত্য মানিয়া সেই অতীতপ্রায় কূটশিক্ষায় মনোনিবেশ আমাদের গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, আর বর্ত্তমানের নূতন আমেজ নূতন উদ্দীপনা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাচীনের প্রচলন স্থির ধীর বলিয়া আদৃত হয়, জানি না এ মৃতপ্রায় জাতি নূতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষে আর কতদিন বাঁচিতে সক্ষম হইবে। স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবন-নদের উৎস, এই উৎস যে দিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালী জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সহস্র বৎসরকাল এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত—আলস্য এবং অন্ধ বিশ্বাসরূপ গভীর কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনের প্রস্রবণকে বন্ধ করিয়াছে। "যখনই

১ "বঙ্গবাসী"—২৪শে পৌষ, ১৩১৭ সাল।

স্বাধীন চিন্তা, বিচারশক্তি, ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, চরিত্রমধ্যে যখন স্বীয় অভিমত পোষণ করিবার সাহস চলিয়া যায়, তখন পরের গ্রাসে আহার করিবার প্রবৃত্তি ততই বাড়িয়া উঠে। ফলতঃ এরূপ জীবন ইতর প্রাণীর জীবন অপেক্ষা অল্পমাত্রই বিভিন্ন, কেননা প্রাকৃতিক আদেশ প্রতিপালনই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় নহে।”

দেশী বাঙ্গলায়—সোজা বাঙ্গালায় উপরের উদ্ধৃত কথাগুলির অর্থ করিলে, ইহাই বুঝা যায় যে, রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের টীকা টিপ্পনী মানিয়া চলিলে এ মৃতপ্রায় জাতি—বোধ করি ইহার অর্থ হিন্দু জাতি—আর অধিক দিন বাঁচিতে পারিবে না। আলস্য এবং অন্ধ-বিশ্বাস, স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী। “স্বাধীন চিন্তার” বিচার শক্তির হ্রাস হইলে লোকে আর স্বীয় অভিমত অনুসারে চলিতে পারে না, নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। নূতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষ ঘটিলেই বর্ণিত অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু “নূতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষ” এড়াইয়া চলিতে পারিলে কি প্রকার ফল দাঁড়াইতে পারে, তাহা পি, সি রায় বলেন নাই। অথচ পি, সি রায়কে প্রাচীন রীতি নীতির পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিবারও হেতু দেখিতে পাই। কেননা, তিনি লিখিয়াছেন যে, “প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান্ আদর্শ ভুলিলে আমাদের চলিবে না।”

পি, সি রায় মাথা মুণ্ড কি বলিতেছেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন; কেন না, এক দিকে তিনি রঘুনন্দনকে মানিতে দিবেন না, এদিকে আবার “প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান্ আদর্শও” তিনি ভুলিতে দিবেন না। যাহারা পি, সি রায়ের উপদেশ অনুসারে চলিতে ইচ্ছুক, তাহারা করিবে কি? প্রাচীন রীতি-নীতি শিখিতে হইলে রঘুনন্দনের নিকট শিখিতে হইবে। রঘুনন্দনের নিকট না শিখিলে প্রাচীন হিন্দু জাতির “মহান্ আদর্শ” জানিবার উপায়ান্তর নাই; হিন্দু জাতির আদর্শ হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু সে শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া বুঝা তোমার আমার মত লোকের কর্ম্ম ত নহেই; প্রগাঢ় শাস্ত্র-জ্ঞান না থাকিলে সে আদর্শ কেহই ধরিতে পারে না—কেহই চিনিতে পারে না, কেহই সে আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে না। রঘুনন্দন কেমন কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, যাহারা তাহা জানে না—তাহারাই রঘুনন্দনকে সামান্য মনুষ্য মনে করিতে পারে।

“প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান্ আদর্শ” কি? যে আদর্শের পরিচয় জানিয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর হইতে পুনরায় নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিতে হয়, যাহা কিছু বর্জ্জিতে হয়, রঘুনন্দনই তাহা আমাদিগকে নিত্য নিত্য জানাইয়া দিতেছেন। যে শৌচ আচার উপাসনার ফলে মানুষ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে ইহলোকে সুখী হইতে পারে,পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে, এবং জন্মান্তরে পুনরায় সৌভাগ্য লইয়া আসিতে পারে অথবা নিত্য মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইতে পারে, সে শৌচের; সে আচারের, সে উপাসনার উপদেশ আর কোথায় পাইব? বেদ

সংহিতার উপর—বৈদিক ব্রাহ্মণের উপর—বেদান্ত-উপনিষদের উপর যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত, তাহা লইয়া কি, তাহার কথা লইয়া কেবল জল্পনা কল্পনা করিলে—কেবল "স্বাধীন চিন্তা" করিলে, সে আদর্শ বুদ্ধিগোচর হইবার নহে। আচার করিতে হইবে—অনুষ্ঠান করিতে হইবে—বিধি-নিষেধ জানিতে হইবে—বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, তখন সে আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা হইতে পারে।

এই যে "স্বাধীন চিন্তা—স্বাধীন চিন্তা" করিয়া পি, সি, রায় মহারোল তুলিয়াছেন, তাহা কাণে শুনিতে বাঙ্গালা কথা হইলেও বাস্তবিক হিন্দুর কথা নহে, উহা ম্লেচ্ছ-ভাবেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। স্বাধীন চিন্তার বস্তুতঃ কোন অর্থ ই হয় না। কিছু না কিছু মানিয়া না লইলে—মূল সত্যস্বরূপে কোন কিছু ধরিয়া না লইলে—যে চিন্তাই কর—যে ভাবনাই ভাব—যে বিচারেই অগ্রসর হও, তাহাতে নিজের পাগলামী ভিন্ন আর কিছু প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। পি, সি রায় বলিতেছেন যে, "যাঁহারা এ দেশের মনের উপর ইংরেজী ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন, বা ইহারা এদেশের মনের উপর সংস্কৃত ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত।"

হারবার্ট স্পেনসর বা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বলিয়া কোনও কথা মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। নিজের যুক্তি ও বিচারের দ্বারা উহার যথার্থ্য প্রমাণিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই স্বাধীন চিন্তার মূলসূত্র। কি সর্ব্বনাশের কথা! কি বিকট মূর্খত্বের নিদর্শন! যদি সকল কথাতেই আগাগোড়া নিজের যুক্তি ও নিজের বিচার খাটাইতে হয়, তাহার পর সদসৎ নিরূপণ করিয়া নিজের বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিত্য নিত্য পান ভোজন করিয়া আমরা যে জীবন ধারণ করি, সে পানভোজন পর্য্যন্ত যে বন্ধ হইয়া যায়—জীবন ধারণ করা যে অসম্ভব হইয়া উঠে—ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করাও উন্মত্ততা। "স্বাধীন চিন্তা" এই বাক্যের সঙ্কুচিত অর্থ স্বীকার করিতেই হইবে। কতকগুলা তত্ত্ব অথবা কোন কোন বিশেষ তত্ত্ব মানিয়া লইয়া তাহার পরে যে কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহা যিনি না মানেন, তাঁহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

এই সঙ্কুচিত অর্থে ভারতবর্ষের অতি প্রচীন ঋষি যেমন "স্বাধীন চিন্তার" পক্ষপাতী ছিলেন, আজিকার শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষও তেমনই "স্বাধীন চিন্তার" পক্ষপাতী। তর্কের দ্বারা বিচার করিতে শাস্ত্রেই উপদেশ আছে, আজিও সেই উপদেশ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া থাকি। সে উপদেশ কি প্রকার, তাহা দেখ—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম জানিতে হইলে, ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু সে তর্ক বেদশাস্ত্রের অবিরোধী হওয়া আবশ্যক।

যদি বেদশাস্ত্রের সত্যতাতেও তুমি বিশ্বাস না কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তাহা কখনও বুঝিতে পারিবে না। ফল দাঁড়াইল এই যে, তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করা আবশ্যক; কিন্তু সে তর্কের মূলে বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য বিশ্বাস থাকা চাই। ইউক্লিডের জ্যামিতি বুঝিতে হইলে, প্রতিপাদ্যের প্রতিপত্তি বা সম্পাদ্যের সম্পত্তি করিতে হইলে, কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব এবং কয়েকটী স্বীকার্য্য স্বীকার না করিলে চলে না। তেমনি বেদশাস্ত্রের অভ্রান্ত সত্যতা না মানিলে ঐহিক বা পারলৌকিক কোন ব্যাপারেরই শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে পারা যায় না। যে "জাতিভেদ ও স্মৃতি এবং সামাজিক বহুল ব্যবস্থার গুণে" ভারতবর্ষ এত সুখের স্থান ছিল এবং এখনও বহুল পরিমাণে সুখের স্থান আছে, সে জাতি-ভেদ, সে স্মৃতি, সে সামাজিক ব্যবস্থা সমস্তই বেদশাস্ত্রমূলক।

বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস করা আবশ্যক, কিন্তু সে বিশ্বাস সকলের হয় না, সে বিশ্বাস জন্মিতে যে সৌভাগ্য আবশ্যক, জন্মান্তরীণ কর্ম্মদোষে, অথবা সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষার অভাবে সে সৌভাগ্য সকলের থাকে না। সৌভাগ্য থাকে না বলিয়া বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু বিশ্বাস ত করাইয়া দেওয়া যায় না। যাহার বিশ্বাস হয়, তাহার হয়, যাহার বিশ্বাস হয় না, তাহার হয় না. ইহাতে মানুষের হাত নাই। সকল লোকেরই কোন স্থানে না কোন স্থানে দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে, উত্তরকে পূর্ব্ব মনে হয়, পশ্চিমকে দক্ষিণ মনে হয়। সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া, সেখানকার লোকের কথা শুনিয়া নিজের ভ্রম স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু মনের ভ্রান্ত ধারণা যায় না। এই যে দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা কি কোনও প্রকার "স্বাধীন চিন্তার" ফল? আর এই যে দিগ্‌ভ্রমকে দিগ্‌ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, অথচ তদ্বিপরীত ধারণা মন হইতে দূর হয় না, অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যই ইহার একমাত্র কারণ। বিশ্বাসমাত্রই ভাগ্যাধীন। প্রকৃতে বিশ্বাস, অপ্রকৃতে অবিশ্বাস, সৌভাগ্যের ফলেই জন্মিয়া থাকে। অপ্রকৃতে প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস, প্রকৃতে অপ্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস সর্ব্বত্রই দুর্ভাগ্য-জন্য। বেদশাস্ত্রে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলেও, মনের ধাঁধাঁ একেবারে না গেলেও, বেদশাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে পারে, সেই হিন্দু। আর যে সংশয়াত্মা তাহার বিনাশ নিশ্চিত।

বিশ্বাস সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক। পি, সি রায় লিখিয়াছেন যে, "অন্ধ বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির মূল হইতে পারে না।" এই যে "অন্ধ বিশ্বাস" ইহাও ইংরেজিরই তর্জ্জমা। এ কথা হিন্দুবুদ্ধিপ্রসূত নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বাস কি অন্ধ না হইয়া কখনও চক্ষুষ্মান্ হইতে পারে? বিশ্বাস যে স্বভাবতই অন্ধ। যাহা নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহা ত বিশ্বাস নহে, তাহা জ্ঞানই! পরোক্ষ জ্ঞানকে নিজের জ্ঞান স্বরূপে স্বীকার করিয়া যাইলেই, তাহা বিশ্বাসপদবাচ্য হয়। আবার, "অন্ধ

বিশ্বাস" যদি জাতীয় উন্নতির মূল হইতে না পারে, তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও ত কোনও জাতির উন্নতি হইতে পারে না। কোনও জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি মাত্রেই ত বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয় না। সকল জাতিতেই অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি যথাসম্ভব প্রশস্ত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তদ্ভিন্ন সকল লোকই যে অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রায় নিরেট নির্ব্বোধ, তাহা কি পি, সি, রায় মানেন না? না কি তাহা জানেন না? অথচ সে সকল জাতির সঙ্গে তাঁহার অল্পাধিক পরিচয় আছে, তন্মধ্যে তাঁহার বিবেচনায় যে জাতির উন্নতি হইয়াছে, তাহাদের সে উন্নতি কেমন করিয়া হইল? সে জাতির নিরেট বর্ব্বরেরাও কি "স্বাধীন চিন্তা" করিয়া জাতির উন্নতি করিয়াছে? তাহা নহে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই তর্কের দ্বারা বিচার করিয়া তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেন, অন্যে সেই তত্ত্ব বুঝিয়াই হউক অথবা না বুঝিয়াই হউক, সত্য বলিয়া মানিয়া লয় এবং শ্রেষ্ঠে যে প্রকার আচরণ করেন, ইতর লোকে সেই আচরণেরই অনুকরণ বা অনুসরণ করে। আমাদের গীতাশাস্ত্রে আছে যে—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

শ্রেষ্ঠের আচরণ দেখিয়া ইতর জনে অনুরূপ আচরণ করে, আর শ্রেষ্ঠ-যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোকেও তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লয়। গীতাতে আরও আছে,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

অর্থাৎ, যাহারা কর্ম্মাসক্ত, মনে যাহারা করে যে, কর্ম্ম করিলেই ফল পাওয়া যায়, কর্ম্ম না করিলে ফল পাওয়া যায় না, সে সব লোকের বুদ্ধিভেদ করিতে নাই; সুমার্জ্জিত বিচারশক্তি যাহাদের নাই, "স্বাধীন চিন্তার" অধিকার তাহাদিগকে দিলে তাহাদের উৎসন্ন যাইবার পথই পরিষ্কৃত এবং সুগম করিয়া দেওয়া হয়।

"জাতিভেদ ও স্মৃতি এবং সামাজিক বহুল ব্যবস্থার গুণে" ভারতবর্ষ এককালে পরম সুখের স্থান ছিল এবং হিন্দু সমাজ পুণ্য সমাজ ছিল এবং এখনও কতক কতক আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও পি, সি রায় বৃশ্চিকদংশনের জ্বালায় যে ছট্‌ফট্ করিতেছেন, "নূতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষে" ভারতবর্ষের "দাসত্ব"ই তাহার একমাত্র কারণ। পি, সি রায়ের প্রবন্ধে যে কাব্যের ঝঙ্কার এবং অলঙ্কারের টঙ্কার আছে, তাহা বাদ দিয়া "স্বাধীন চিন্তা" প্রভৃত বিশুদ্ধ বিচারাংশ যদি কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দুঃখসহকারে বলিতেছি—হতাশমনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পর্ব্বতপ্রমাণ তৃণস্তূপে ভগ্ন সূচ্যগ্র সন্ধান করিয়া বাহির করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু পি, সি রায়ের প্রবন্ধে বিচার-বুদ্ধির নিদর্শন আবিষ্কারের সে সম্ভাবনা নাই।

পি, সি রায়ের "মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"। (১)

[৪]

পি, সি রায়ের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে যাহারা সুশিক্ষার অভাবে কিম্বা কুশিক্ষার প্রভাবে আমাদের শাস্ত্রের কথা ও সমাজ-বন্ধনের পরিচয় জানে না, এবং জনাইয়া দিলেও উদ্দাম ইন্দ্রিয়গ্রামের উত্তেজনায় অথবা ভীষণ তমোগুণ জন্য আলস্য বশতঃ কোনও কিছু মানে না এবং সমাজের দ্রোহিতা করে, নিজের এবং পরের সর্ব্বনাশ করে, তাহারা সহজেই ত "মনসা" বলিয়া, পাছে পি, সি রায়ের কথা তাহাদের পক্ষে "ধুনার গন্ধ" হইয়া দাঁড়ায়, সেই ভয়ে তাঁহার দুই চারিটা বড় বড় ভুল দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে হওয়াতেই, আমাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। পি, সি রায়ের প্রবন্ধ সত্য-মিথ্যা-বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। নানাস্থান পূর্ব্বাপর-বিরোধ-দোষে দুষ্ট হইয়াছে এবং মোটের উপর উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় হইয়াছে ; ইহা জানাইয়া দিলেও যাঁহারা সে প্রবন্ধ পড়িয়াছেন বা পড়িবেন, তাঁহারা সাবধান হইলেও উপকারের সম্ভাবনা আছে।

দেখিতেছি, সত্যানুসন্ধানে পি, সি রায়ের প্রবৃত্তি আছে ; কেননা তিনি লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির "তীক্ষ্ণবুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়ের নিষ্ফল কূটতর্কে ও স্মৃতির জটিল ও স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই।" সত্যের স্বরূপ কি, সত্যের আকার কেমন ? পি, সি রায় কি তাহা জানেন ? সামান্য মনুষ্যের জাগ্রদ্দশায় যাহা যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, পরমার্থতঃ তাহা যে সত্য নহে, এ কথা পি, সি রায় কখনও শুনিয়াছেন কি ? যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণের সাহায্যেও যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকে আমরা স্থূল পদার্থ বলি ; আর যাহা কোনও প্রকারেই, কোনও যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হয় না, তাহার নাম সূক্ষ্ম পদার্থ। পি, সি রায় স্থূল-সূক্ষ্মের এই প্রভেদ অবগত আছেন কি ? যোগ সাধনার বলে—তপস্যার বলে, ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানে, মৃত্যুর এধারে এবং ওধারে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে পারা যায়, পি, সি রায় সে বিষয়ের কোনও সংবাদ রাখেন কি ? এ সব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইবার চেষ্টা তিনি যদি কখনও না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি যে সত্য, আর কি যে সত্য নহে, তাহা স্থির করিবেন কেমন করিয়া ? তিনি বলিতে পারেন যে,—আমি ওসব বিশ্বাস করি না। বাস্তবিক তিনি বিশ্বাস না করিলেই আপদ্ চুকিয়া গেল না কি ? কি যে সত্য, কি যে সত্য নহে, তাহা কি তাঁহার বা তাঁহার দলের লোকের বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করিবে ? আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, এই দৃশ্যমান দেহমাত্রই আমি নহি, এই দেহের অতিরিক্ত

---

(১) "বঙ্গবাসী"—২রা মাঘ, ১৩১৮ সাল।

আত্মা আছে বলিয়াই কিছুকাল এ দেহ থাকে, আত্মা সরিয়া গেলেই পাঞ্চভৌতিক এই দেহ ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। আত্মার আর দেহের এই বিয়োগই মৃত্যু। মৃত্যুর পরে এই আত্মা প্রথমত প্রেত ভাবাপন্ন হয়, তাহার পর স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গে সুখভোগ, নরকে যাতনা ভোগ করে এবং ভোগান্তে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া অদৃষ্ট অর্থাৎ প্রাচীন কর্ম্ম অনুসারে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া আবার সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে থাকে।

পুনঃপুন এই জন্মান্তরপ্রাপ্তি শাস্ত্রে সংসার বা সংসারচক্র নামে পরিচিত। "সত্যানুসন্ধান" করিতে যাহার প্রবৃত্তি আছে—সামর্থ্য আছে,—অবসর আছে,—সুযোগ আছে—এই সকল শাস্ত্রীয় কথা শুনিয়া তাঁহার কি করা উচিত? আমি ও-সব মানি না, আমি ও-সব বিশ্বাস করি না,—এই কথা বলিয়া মাথা নাড়িয়া দিলেই পি, সি রায়ের "সত্যানুসন্ধানে"র প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে; কিন্তু সকল লোকে ত তেমন "সত্যানুসন্ধানে" সন্তুষ্ট হইবে না।

শাস্ত্র-বাণী সত্য বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন বা করিবেন, তাঁহারা ঐ আত্মা, ঐ জন্মান্তর, ঐ স্বর্গ নরক এবং কর্ম্মফল না মানিয়া ত থাকিতে পারিবেন না। আবার ঐটী মানিলেই সুতরাং জাতিভেদও মানিতে হইবে, কর্ম্মভেদও মানিতে হইবে। ব্রাহ্মণের ছয় প্রকার কর্ম্ম বিহিত আছে—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত জীবিকা; কিন্তু এ জীবিকা বা এ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বা শূদ্রের নহে। ব্রাহ্মণ জাতি যদি যথাসম্ভব আপন কর্ম্মেই নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ধনস্পৃহায় কখনই তাহাকে চঞ্চল বা ব্যাকুল করিতে পারে না। আর সেই চঞ্চলতা বা ব্যাকুলতা উদ্রিক্ত না হইলেই অর্থকে কৃমি-কীট বলিয়া পরিগণিত করিতে পারা যায় এবং নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনে কালযাপন করা সম্ভব হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি শিল্পের জন্ত ছুটাছুটি করে—কেবল ধন ধন করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়ায়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত ধনের নিমিত্ত ভীষণ জীবন-সংগ্রাম করিতে থাকে তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যে কিম্বা অন্য জাতির মধ্যে আর জ্ঞানের স্থান,—সুখের সুযোগ, শান্তির সম্ভাবনা হইতে পারে কি?

পি, সি রায় নিজেই বলিবেন, তাহা হইতে পারে না, কেননা তিনি নিজেই খেদ করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"হায়! যে দেশে অর্থ কৃমিকীট বলিয়া পরিগণিত হইত, যে দেশে নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনই আজীবন-ব্যাপী কর্ম্ম ছিল, যে দেশের তপোবনে বিহঙ্গ কলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আবৃত্তির স্বর কানন-ভূমিকে মুখরিত করিত, সেই দেশে আজ বিদ্যার্জ্জন—মসীবৃত্তি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় মাত্র।" খেদ ত বুঝিলাম, খেদের কারণও বুঝিলাম, কিন্তু মসীবৃত্তি ছাড়িয়া কল-কারখানা শিখিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেই কি আবার এদেশে অর্থ—কৃমিকীট বলিয়া

পরিগণিত হইবে? না কি নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনই আজীবন-ব্যাপী কর্ম্ম হইবে। না কি দেশের তপোবনে বিহঙ্গ-কলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আবৃত্তির স্বর কানন-ভূমিকে মুখরিত করিবে?

পোড়া কপাল আমাদের—নহিলে এমন লেখাও পড়িতে হয়? "স্বাধীন চিন্তা"র এমন গর্ভস্রাব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়?

পি, সি রায়ের জানা উচিত যে, প্রাচীনকালে—অত্যতি প্রাচীনকালে অথবা একালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এইরূপ বর্ণভেদ অথবা তদনুগত জাতিভেদ সমানভাবে আমাদের সমাজের, ধর্ম্মের এবং কর্ম্মের মূল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পি, সি রায় জানেন না যে, ব্রাহ্মণের আদর্শকে একমাত্র আদর্শ মনে করিয়া এবং শূদ্র প্রভৃতিকে একবারেই ভুলিয়া গিয়া তিনি প্রাচীন সমাজের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজের কথা নিজে বুঝিতে পারিলে কখনই লিখিতে পারিতেন না যে "ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়।" প্রায়শঃ ব্রাহ্মণের পতন হইয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা যদি মুচির কাজে লাগিয়া পড়ে, আর মুচির ছেলেরা বেদ লইয়া টানাটানি করে, তাহা হইলে পি, সি রায়ের খেদ এ জন্মে আর নিবৃত্তি হইবে না। পি, সি রায় যদি ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের কর্ম্মে নিবদ্ধ থাকিতে অনুরোধ করিতেন, আর শিল্পাদি তামসী-বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্মেই যাহাদের অধিকার, তাহাদিগকে অর্থের লোভ দেখাইয়া সেই পথে উৎসাহিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মস্তিষ্কের অপব্যবহারও হইত না, এ গণ্ডগোলও উঠিত না। অথচ—কিবা বলিব! এই পি, সি রায়ই উপদেশ দিয়াছেন যে, "প্রাচীন হিন্দুজাতির মহান্ আদর্শ ভুলিলে আমাদের চলিবে না।" বিস্ময়োল্লাস গদ্গদ্! নহিলে এমন কথাও কেহ লিখে যে, জাতিভেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্র এবং সামাজিক সুব্যবস্থাই হিন্দুজাতির শিক্ষাদর্শের মূল, অথচ সেই জাতিভেদই নষ্ট করিতে হইবে, স্মৃতিশাস্ত্র অমান্য করিতে হইবে, করিয়া বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসাগরে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে মূর্খত্বের কলসী গলায় গাঁথিয়া ঝাঁপ দিয়া মরিতে হইবে। আমার এ বয়সে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয় ত শোভা পায় না, নহিলে করিতাম,—হে পি, সি রায়! আপনি অগ্রণী হইয়া এ জাতিটাকে রক্ষা করুন না কেন?

ঝুমীর গানের যেমন ভণিতা নাই, পি, সি রায়ের প্রবন্ধেরও তেমনি ল্যাজা-মুড়া নাই। যেখানে মুড়া মনে হয়, সেই খানেই ল্যাজ বাহির হইয়া পড়ে। আর যেখানে ল্যাজ দেখি, সেইখানেই মুড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক সহযোগে বিচারের গাঁথুনী করিলে এইরূপ হইবারই কথা! পরস্পর-বিরুদ্ধ অসমঞ্জস কত কথাই যে এ প্রবন্ধে আছে, তাহা খতিয়ান করিয়া বলা কঠিন, সব কথা বুঝাইয়া বলিতে প্রবৃত্তিও হয় না, অতএব এবার এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

পি, সি রায়ের "মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার"।

[৫]

কোনও অনিষ্টের প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা হইলে, সর্ব্বাগ্রে সেই অনিষ্টের স্বরূপ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। অনিষ্টের আকার প্রকার উত্তমরূপে না জানিতে পারিলে, সে অনিষ্টের প্রকৃত প্রতিকার কি, তাহা স্থির করা অসম্ভব। রোগ চিনিলে তবে সে রোগের ঔষধ স্থির করিতে পারা যায়। রোগ চিনিতে গোল হইলে, ঔষধ ব্যবস্থাতেও গোল হইবার কথা। অনিষ্ট বা রোগই "হেয়"। অনিষ্ট দূরীভূত হইলে, রোগ প্রশমিত হইয়া আরোগ্যে উপনীত হইলে যে অবস্থা ঘটে, তাহাকে "হান" বলে। হান এবং হেয় স্থির হইলে, অনিষ্ট এবং ইষ্টের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেলে, তখন সেই অনিষ্টের নিদান বা কারণ কি, তাহার সন্ধান করিতে হয়। ঐ নিদান বা কারণকে আমরা "হেয়-হেতু" বলিয়া থাকি। হেয়-হেতু নিরূপিত হইলে তখন উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিতে পারা যায়। সেই যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার নাম "হানোপায়"।

পি, সি রায়ের মনে ধারণা হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তানের বর্ত্তমান অবস্থা হেয়, এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া উচিত। আমিও ঐরূপ মনে করি। আমারও মনে ধারণা এই যে, বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় এবং এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। এই এক প্রধান বিষয়ে পি, সি রায়ের সহিত আমার মিল আছে বলিয়াই—আমি তাঁহার লেখার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইউরোপের সামাজিক আদর্শকে যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের এই সমাজকে উন্নত সমাজ বা সভ্য সমাজ বলা চলে না। আমাদের সমাজকে অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্য এবং অবনত সমাজ বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। আর হিন্দু আদর্শের সহিত তুলনা করিলেও আমরা যে সামাজিক হিসাবে নিতান্ত পতিত হইয়াছি—উৎসন্ন যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছি, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এখন বিচার্য্য এই যে, বর্ত্তমান অবস্থার নিরাকরণ করিয়া কোন্ আদর্শে আমাদের সমাজকে আবার খাড়া করা উচিত। ইউরোপের আদর্শ—আর প্রাচীন হিন্দুর আদর্শ,—এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্ আদর্শকে "হান" বিবেচনা করা উচিত। এখন আমরা কোন্ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পথ ধরিব? আমাদের সমাজ যাহাতে ইউরোপীয় সমাজের সদৃশ হয়, সেই চেষ্টাই এখন ধরিব? না কি, আমাদের সমাজ—পুনরায় যাহাতে প্রাচীন হিন্দু আদর্শে দাঁড়ায়, সেই পক্ষেই চেষ্টা করিব?

---

১ "বঙ্গবাসী"—১ই মাঘ, ১৩১৬ সাল।

"স্থানের" পরিচয় ইউরোপে পাইব? না কি, আমাদের প্রাচীন ঋষিদের নিকট লইব?

এই স্থান সম্বন্ধেও, ইষ্টের সম্বন্ধেও পি, সি, রায়ের সহিত আমার মত বিরোধ নাই। পি, সি রায় আমাদের ইষ্টের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ, যথা,—

(১) ভারতবর্ষে এক শান্ত উদ্বেগবিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিহীন জীবনযাত্রা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(২) ভারতবর্ষে সুন্দর পল্লীমণ্ডলসমূহ সংগঠিত হইয়াছিল। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ সেই পল্লীমণ্ডলসমূহের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পাশ্চাত্য দেশের কাউন্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণ ও সোসিয়ালিষ্টগণ আমাদের ঋষিগণের আবিষ্কৃত জীবনযাত্রা প্রণালী এবং আমাদের পল্লীমণ্ডলগঠনকে পরম পুরুষার্থরূপে কল্পনা করেন।

(৩) ভারতবর্ষীয় সমাজ শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতিগণের তুলনায় অনেক কম।

(৪) ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ,—পুণ্যসমাজ। এই প্রাচীন পুণ্যসমাজের তুলনায় অন্য দেশের দারুণ জীবনসংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়।

(৫) জাতিভেদ থাকাতে স্মৃতি শাস্ত্রের ও ঋষিদের ব্যবস্থার গুণে হিন্দুসমাজ এমন পুণ্যসমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমার বিবেচনাতেও পি, সি রায়ের উপরি লিখিত সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত। পাশ্চাত্য সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র, সুতরাং স্বেচ্ছাচারী। কেবল আইনের দ্বারা যে যতটুকু বাঁধা থাকে, সে ততটুকু পরিমাণেই স্বেচ্ছাচারকে দমনে রাখে; আইনের গণ্ডী ছাড়াইলে যাহার যাহা খুসী সে তাহাই করে। এইরূপ ব্যক্তিগণের সমষ্টি লইয়াই পাশ্চাত্য সমাজ—যথাকথঞ্চিৎ গঠিত। শাস্ত্রের বন্ধনে, হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থার গুণে হিন্দু-সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তিকেই আচারে ব্যবহারে নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকিতে হয়। হিন্দু-সমাজে এক একটী ব্যক্তি এক একটী পরিবারের অবয়ব বা অঙ্গমাত্র। কোনও ব্যক্তিই কোনও বিষয়ে স্বয়ং পূর্ণ অধিকারী নহে,—নিজের হিতাহিতকে সমগ্র পরিবারের হিতাহিতের অধীন করিয়া রাখিতে হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বাধ্য। এক এক পরিবারের একজন মাত্র কর্ত্তা। পরিবারের মধ্যে কৃতী, গুণবান্, কর্ম্মকুশল, উপার্জ্জনক্ষম যত জনই থাকুন না কেন, সকলেই এক কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কর্ত্তাকে পরামর্শ দিতে, কর্ত্তার সহিত মন্ত্রণা করিতে—পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিরই অধিকার আছে বটে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্ত্তারই হাতে। গ্রাস বাস পৃথক্ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই কর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। এমন যে এক একটী পরিবার,

তাহাও আবার শাস্ত্র অনুসারে পরিচালিত; সে হিসাবে পরিবারের কর্ত্তাও প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা নহেন, শাস্ত্রই পরিবারের কর্ত্তা। সুতরাং এইরূপ ব্যবহারগুণে এক একটী পরিবার বাস্তবিক এক একটী ধর্ম্মের আশ্রম মাত্র। এ প্রকার, পরিবারসমষ্টি লইয়া যে সমাজ, তাহা যে সর্ব্বপ্রকারে পুণ্যসমাজ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজের এক এক পরিবার যেমন, আমাদের এক একটী পল্লীমণ্ডলের সংস্থানও সেইরূপ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরিবারসমষ্টি লইয়া এক একটী পল্লীমণ্ডল সংগঠিত। এক একটী পল্লীমণ্ডল আপন আপন পল্লীর রাজা। ন্যায় অন্যায়ের বিচার, ভাল মন্দের বিচার, সামান্য দণ্ড মণ্ড সকলই সেই পল্লীরই আয়ত্ত, সেই পল্লীরই হাতে। নিত্য আহার্য্য ব্যাপারের নিমিত্ত কাহাকেও নিজ পল্লীর বাহিরে যাইতে হয় না, পর-পল্লীর মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। এক একটী পল্লী যেন এক একটী শান্তিকুঞ্জ, প্রীতির নিকেতন,—প্রত্যেক পল্লী একই বেদনায় ব্যথিত, একই ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত। ঠিক যেন এক একটী পল্লী এক একটী মানবদেহ। সেই পল্লীর অন্তর্গত এক একটী পরিবার যেন সেই দেহের এক একটী অঙ্গ, আর এক এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগুলি 'যেন' সেই একই দেহের উপাঙ্গমাত্র। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু কেহই স্বাধীন নহে, স্বেচ্ছাচারী নহে, সকলকেই এমন ভাবে কাজ করিতে হয় যে, প্রত্যেক কার্য্যই যেন সমগ্র পল্লীর এবং প্রত্যেক পরিবারের ও প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারজনক হয়। এমন পল্লীমণ্ডল যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং মনীষিগণ-বাঞ্ছিত, ইহা আর বলিতে হইবে কেন? এইরূপ পল্লীমণ্ডলের সমবায়েই হিন্দুসমাজ সংগঠিত।

যেখানে জাতিভেদে কর্ম্মভেদ নির্দ্দিষ্ট থাকে, যাহার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, সে সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করে; যাহার যাহা অকর্ত্তব্য, সে তাহাতে বিমুখ থাকে, তাহা হইলে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুচিত হইলেই, ঈর্ষা, অসূয়া, সুতরাং কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকাতে নিরন্তর যে মারামারি কাড়াকাড়ি চলিতেছে, ধনীতে আর দরিদ্রে যে ঘেষাঘেষী নিরন্তর উপদ্রব জন্মাইতেছে, তাহাকে "জীবন-সংগ্রাম" নাম দেওয়াই ঠিক। এ জীবন-সংগ্রাম হিন্দু সমাজে অবশ্যই নিবৃত্ত থাকে। পশুদের ভিতর নীচ জন্তুদের ভিতর জীবন সংগ্রাম অপরিহার্য্য। কেননা, "জীবন-সংগ্রাম" স্বভাবসিদ্ধ কাম ক্রোধ লোভাদির ফলেই ঘটিয়া থাকে। যেখানে অহরহঃ "জীবনসংগ্রাম" চলে, সেখানে (Suivial of the fittest) "চাচা আপনা বাঁচা"—ইহাই সুতরাং জীবন যাত্রার মূল নীতি হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিগণের অন্তঃ-প্রকৃতিকে দমন করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের উপকারে প্রযোজিত করাই হিন্দুসমাজের লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে

হয় বলিয়াই হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা কুণ্ঠিত থাকে। যিনি অক্ষম, তিনি সক্ষমের ক্ষমতার ফলভোগে বঞ্চিত হন না, আর যিনি সক্ষম তিনি স্বীয় শক্তিকে ঈশ্বরদত্ত জানিয়া অক্ষমের নিকট আপনাকে ঋণী বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন। হিন্দুসমাজ যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল কারণেই সমাজে শান্তি বিরাজ করে এবং সমাজ উদ্বেগবিহীন হইয়া চলিতে থাকে।

পাশ্চাত্য সমাজে জাতিভেদ নাই, কর্ম্মভেদ নাই, স্মৃতিশাস্ত্রের বশ্যতা নাই, সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজে নিয়ত দারুণ "জীবনসংগ্রাম" চলিয়াছে। পি, সি রায় পাশ্চাত্য সমাজকে দাবানলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমি অন্য প্রকার উপমা দিয়া বলি যে, পাশ্চাত্য সমাজ ভীষণ, বীভৎস শ্মশান ক্ষেত্র। হিন্দুর দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য মানবসমষ্টি সমাজ পদবাচ্যই নহে।

হিন্দু সমাজ মনীষিগণের বাঞ্ছিত, পি, সি রায়ের বাঞ্ছিত, আমারও বাঞ্ছিত। কিন্তু পি, সি রায়ের শঙ্কা এই যে, বর্ত্তমান সময়ে উক্ত আদর্শের অনুকরণ সম্ভবপর নহে। এ কথা আমি মানিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু কি যে সম্ভবপর আর কি-ই অসম্ভব, তাহা ভবিষ্যতের কন্দরে নিহিত আছে। ঝটিকার সময়ে বিপন্ন হইয়া বুদ্ধিকে যখন বিকল করে, তখন মনে হয় বুঝি এ ঝটিকার বিরাম হইবে না, যেন উত্তাল তরঙ্গমালা আর বিলীন হইবে না, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আর প্রশান্ত হইবে না। তখন মনে থাকে না যে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" কিন্তু এভাব সামান্য জনের ভাব, যিনি প্রাজ্ঞ, যিনি ধীর, যিনি পরিণামদর্শী, যিনি ভবিষ্যদ্বিশ্বাসী, যিনি শাস্ত্রে গুরুতে শ্রদ্ধাবান্, এভাবে ভাবিত হওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত নহে। বুক বাঁধিয়া শৌর্য্যে নির্ভর করিয়া ভগবচ্চরণে একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। সর্ব্বফলৈকদাতা যে ফল দিবেন, মাথা পাতিয়া সেই ফলই গ্রহণ করিও, কিন্তু কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইও না। মনে রাখিও যে,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

উপরে যে সব কথা বলিলাম, তাহাতে "হেয়" সম্বন্ধে এবং "হান" সম্বন্ধে পি, সি রায়ের সহিত আমার মিলই আছে বলিতে হইবে। প্রভেদের মধ্যে পি, সি রায়ের অন্তঃকরণে শঙ্কার ভাব প্রবল, আমার মনে আশ্বাসের উৎসাহ। পি, সি রায় আমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, শঙ্কা জন্য ক্লৈব্য তাঁহার পক্ষে অশোভন।

যাহা হউক, "হেয় হেতু" সম্বন্ধে অর্থাৎ কি কারণে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পি, সি রায়ের কথার একটু আলোচনা এখন করা যাউক।

পি, সি রায়, ছোট ছোট আবান্তর কথা বিস্তরই কহিয়াছেন, প্রত্যেক কথার পৃথক্ বিচার করিতে হইলে প্রকাণ্ড পুঁথি রচিতে হয়। তবে তাঁহার উক্তির স্থূল তাৎপর্য্য এই বুঝিয়াছি যে, 'শাস্ত্রের ভেকি' যিনি যত খাটাইবেন, তিনিই তত হিন্দু

সাধারণের নিকট 'জ্ঞানদ্বার রুদ্ধ'। সামাজিক নিয়মের ফলে আজকাল বাঙ্গালীর সমাজে ভীষণ মিথ্যাচারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। "যে সকল কঠোর নিয়ম পুনরায় সমাজে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে, সে সকল নিয়ম আমাদের পূর্ব্ব গৌরবের দিনে প্রচলিত থাকিলে পুরাকালে ভারতবর্ষের গৌরব কিছুতেই হইত না, ইহাই পি, সি রায়ের ধারণা। দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বীয় অভিমত প্রকট করিতে গিয়া পি, সি রায় বলিয়াছেন যে "ভাব দেখি, যদি সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব ও তৎপুত্র মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীকে ধীবরকুলেই কালযাপন করিতে হইত, যদি চণ্ডালরাজ গুহকের মিত্র চণ্ডাল আলিঙ্গনকারী রঘুকুলপতি রামচন্দ্রকে জাতিচ্যুত হইয়া চণ্ডাল বংশেই বাস করিতে হইত, যদি গোপগৃহপালিত গোপান্নভোজী শ্রীকৃষ্ণকেও জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকিতে হইত, তবে তোমরা হিন্দুধর্ম্মের গৌরব করিতে কি লইয়া?"

এই দৃষ্টান্তে পৌরাণিক তিনটী উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে। (১) ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত, (২) শ্রীরামচন্দ্রের গুহকচণ্ডালকে আলিঙ্গন, (৩) শ্রীকৃষ্ণের গোপান্ন ভোজন।

যে যে উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া পি, সি রায় এই দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণ হইতে গৃহীত। অন্য পুরাণেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ স্থলে সে সকল পুরাণের নির্দ্দেশ অনাবশ্যক এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পি, সি রায় পুরাণকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন কি? পুরাণলিখিত বৃত্তান্ত সকল সত্য, ইহা তিনি মানেন কি? যদি পুরাণের প্রামাণ্য তিনি স্বীকার না করেন, যদি পুরাণগুলিকে তিনি কবিকল্পিত সামান্য কাব্য মাত্র মনে করেন, তাহা হইলে পুরাণ হইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য এবং শঠতার কার্য্য। নিজে যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, প্রতিবাদীকে পরাস্ত করিবার নিমিত্তে যদি তাহাই অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করি, তাহা হইলে প্রকৃত বিচারকের মত ব্যবহার করা হয় না। আবার তদুপরি উপাখ্যানের একদেশ যদি গ্রহণ করি, অন্য দেশ যদি বর্জ্জন করি, এইরূপে খণ্ডিত উপাখ্যানের এক অংশ প্রচার করি, অন্য অংশ গোপন করি, তাহা হইলে মিথ্যাবাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। যিনি এমন করেন, তিনি বিচারক নহেন, তিনি বঞ্চক। এখন দেখুন, ব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে মহাভারতে কি লেখা আছে? পরাশরের ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসের জন্ম। ব্রহ্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা মহাভারতে স্বীকৃত। বসুরাজের ঔরসে ও মৎস্যরূপা অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে সত্যবতীর জন্ম। বসুরাজ ধীবর নহে, অদ্রিকা মোটেই মানুষী নহে, দেবযোনিসম্ভবা। ব্যাসদেবের ধীবর-কুলে জন্ম, পি, সি রায় ইহা কোথায় পাইলেন? ব্রহ্মা হইতে পরাশর পর্য্যন্ত কেহই ধীবর নহেন। সুতরাং

ব্যাস ধীবর হইতে পারেন না। শুকদেব গোস্বামীরও পিতৃকুলে মাতৃকুলে কেহই ধীবর ছিলেন না, শুকদেবের নাম উল্লেখ করিয়া পি, সি. রায় কোন্ সাহসে ধীবর-কুলের প্রসঙ্গ করেন। চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিলে অর্থাৎ স্পর্শমাত্র করিলে জাতি-চ্যুত হইতে হয়, পি, সি রায় ইহা কোন্ বেদে, কোন্ স্মৃতি-সংহিতায়, কোন্ পুরাণে পড়িয়াছেন? চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিলে কাহারও জাতি যায় না, পুরাকালে যাইত না, এখনও যায় না। তাহার উপর পি, সি রায় মানুন আর নাই মানুন, শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম। পি, সি রায়ের বুদ্ধিতে ব্রহ্মবস্তু ধারণা হইবে কি? কেমিষ্টের কামারশালে ব্রহ্ম দর্শনের আশা বড় অল্প। তাহার পর পূর্ণাব-তার শ্রীকৃষ্ণের কথা। কোপ করিব না, একটুকু হাস্য রসেরই আস্বাদন করা যাউক। উপনয়নের পূর্ব্বে নির্ব্বোধ বালক শ্রীকৃষ্ণ যদি গোপান্ন ভোজন করিতেন, তাহা হই-লেও ত তাঁহার জাতি যাইত না। কেনন', অনুপনীত ব্রাহ্মণ-তনয়েরও জাতি যায় না। আবার, শ্রীকৃষ্ণ গোপগৃহে অন্নভোজন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? ক্ষীর সর নবনী ত জাতিনাশক পদার্থ নহে। তদুপরি, গোপ এখনকার গোয়ালা নহে। গোপবৃত্তি হইতেছে বৈশ্যবৃত্তি, আবার পি, সি রায় শুনিয়া রাখুন, নন্দরাজ পূর্ব্বে দ্রোণ নামক বসু ছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পি, সি, রায় পতিত করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ, তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্বেরাও ক্ষত্রিয়, তিনি ব্রাহ্মণ-অন্নব্যতীত ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করিয়া থাকিবেন, শূদ্রান্ন কখনও ভোজন করেন নাই, ম্লেচ্ছান্নের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে বিলাতও যান নাই। পি, সি রায় যে মনে করিয়াছেন, নানারূপ অপবাদ দিয়া মিথ্যা রটাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে "সেক্কর" দলে ভর্ত্তি করিয়া লইবেন, সেটীর যো নাই। পি, সি রায় হিন্দুশাস্ত্রের হেলে ধরিতেও কখনও শিখেন নাই, কেউটের দিকে হাত বাড়ান কেন?

কথা বাড়িয়া যাইতেছে, এইখানেই উপসংহার করা যাউক। শাস্ত্রপ্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করাতেই, অজ্ঞান এবং আলস্য বশতঃ শাস্ত্রবিহিত আচার বর্জ্জন করাতেই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অধিকন্তু কুশিক্ষার প্রভাবে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি। পি, সি রায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে আমাদের হানোপায় মনে করিয়া-ছেন, রক্ষার উপায়স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন, সে উপায়ে হিন্দুজাতির সদ্গতি হইবে না। তুবড়ীবাজির মতন কিয়ৎকাল ফুরফুর করিলেও, বিজ্ঞানে স্থায়ী আলোক নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্য সমাজ দাবা-নলের সহিত তুলনীয় হইত না, শ্মশানের সহিত উপমেয় হইত না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী বলিয়া থাকেন যে, একদিকে বিলাস ও অন্য-দিকে বিলাপ, ইহাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুগল ফল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ফলে সমাজের একপ্রান্তে ভোগবিলাসের প্রকট মূর্ত্তি আর অবশিষ্ট অঙ্গে ভীষণ হাহাকার।

বিজ্ঞান-চর্চ্চার এ পরিণাম পি, সি রায় যদি স্বীকার নাও করেন, তবে বলিব যে, হিন্দু সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে হইলে, ধর্ম্মমূলক জাতিভেদ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম-ভেদ কেহ যেন বিস্মৃত না হন। বিজ্ঞানের চর্চ্চা যদি করিতে হয়, বিজ্ঞানকে জীবিকার নিমিত্তে যদি আশ্রয় করিতে হয়, তবে তমঃপ্রধান বৈশ্য-শূদ্রের নিমিত্তে বিজ্ঞান থাকুক, ওপথে ব্রাহ্মণকে নামাইবার চেষ্টা কেহ করিও না।

ঘৃণা ও পাপ-বোধ সমান নহে। *

শিক্ষার কথা ভাবিতে গেলেই, তিনটী শব্দ আমার মনে আসে। যে ব্যক্তি শিক্ষা পায় নাই, তাহাকে বলি,—অশিক্ষিত। যাহার ভাল শিক্ষা হইয়াছে, তাহাকে বলি,—সুশিক্ষিত। আর যাহার মন্দ শিক্ষা হইয়াছে, তাহাকে—কুশিক্ষিত বলি। আরও মনে হয় যে, সুশিক্ষিত ত ভালই, কিন্তু কুশিক্ষিতের অপেক্ষায় অশিক্ষিতই ভাল।

সম্প্রতি কুশিক্ষারই প্রবল স্রোত বহিতেছে। এই কুশিক্ষার ফলে "বাবু" দলের উৎপত্তি হইয়াছে। "বাবুরা" হিন্দুর ছেলে বটে, কিন্তু হিন্দুর শিক্ষা কয়জন "বাবু" পাইয়া থাকেন, বলিতে পারি না। "বাবু" দলের লোক প্রায়ই কুশিক্ষিত। আমাদের দেশের যে সকল লোককে এখন আমরা অশিক্ষিত লোক বলিয়া থাকি, বাবুদের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়,—সেই অশিক্ষিতেরাই যেন স্বর্গ, আর "বাবু"রাই যেন সাক্ষাৎ নরক।

পৃথিবীতে নানা সমাজ বা নানা সম্প্রদায় আছে। মুসলমান আছে, খৃষ্টান আছে, বৌদ্ধ আছে, পার্শী আছে, হিন্দু আছে,—কত সমাজই আছে। যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারি যে, নিজ সমাজের গৌরব করে না, আপন সমাজকে ভাল বলিয়া মনে করে না,—এমন ব্যক্তি অতি বিরল। কেবল কুশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই দেখিতে পাই যে, কি লক্ষ টাকার রোজগেরে, আর কি পঞ্চাশ টাকার রোজগেরে—প্রায় সকলেই আপন সমাজকে ঘৃণাই করিয়া থাকেন। ঘৃণা করেন বটে, কিন্তু তালে ঠিক নাই। বাপ মা মরিলে, আদ্যশ্রাদ্ধ করেন না,—এমন হিন্দু-সন্তান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অতি বড় পাপিষ্ঠ পামর, সর্ব্বপ্রকার বর্ণজ্ঞানবর্জ্জিত বলিলেও যাহার উপযুক্ত নিন্দা করা হয় না,—সেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহিমা কীর্ত্তন করে, জয়ঘোষণা করে, আর,—হরি

---

* 'বঙ্গবাসী'—১২ই ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

হয়, গীতার ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত করে। ইহাদের চরিত্রে সামঞ্জস্য নাই; আচারে পৌর্ব্বাপর্য্য নাই; বুঝিবার শক্তি কিছুমাত্র নাই, অথচ ইহাদের বুদ্ধির অভিমান এত যে, তাহা হিমালয়ের চূড়া ছাড়াইয়া উঠে। আসল কথা,—ইহারা অভাগা। প্রাচীন দুষ্কৃতির ফলে, ইহাদের এইরূপ অবস্থা। রূঢ় কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু যাঁহার ভাবিবার শক্তি আছে, তিনি ভাবিয়া দেখিবেন যে, অসঙ্গত কিছুই বলিতেছি কিনা,—যে দোষ যাহার নাই, এমন ব্যক্তির উপর সে দোষের আরোপ করিতেছি কিনা। আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা। নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে; আমি স্বরূপ ভাষণই করিতেছি।

যাউক, শিক্ষার কথা কহিতে গিয়া, যাহা বলিলাম, তাহাতে বাস্তবিক শিক্ষার নির্দ্দেশ করা হইল না। আমি যাহাকে সুশিক্ষা বলি, এখন তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করা যাউক।

বেদ অভ্রান্ত সত্য, বেদ প্রমাণ। যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা মিথ্যা। দেহধারী কোনও জীবেরই শরীরমাত্র সর্ব্বস্ব নহে। দেহ ছাড়া, সকলেরই দেহী অর্থাৎ আত্মা বা জীবাত্মা আছে। যখন মৃত্যু হয়, তখন দেহীর এবং দেহের বিয়োগ হয় মাত্র। দেহটা পড়িয়া থাকে, দেহী স্বীয় কর্ম্মফল অনুসারে নরকে বা স্বর্গে যায়; তাহার পর পুনরায় সমুচিত জন্ম লাভ করে। বাষ্প, বিদ্যুৎ, অগ্নি, জল, বন্দুক, তরবারি, কুঠার, কর্ত্তরী, প্রভৃতি যত প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র এ জগতে আছে বা হইতে পারে, তাহা ছাড়া, মন্ত্র নামে আর এক প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র আছে। জলের যেমন ক্লেদনশক্তি আছে, অগ্নির যেমন দাহনশক্তি আছে, বায়ুর যেমন শোষণশক্তি আছে,—বিশেষ বিশেষ মন্ত্রেরও তেমনি বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে। কিন্তু শক্তি আছে বলিয়াই, যে-সে ব্যক্তিই মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে না। ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। যিনি জন্মগুণে এবং শিক্ষাগুণে যে মন্ত্রের প্রয়োগে যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই সে মন্ত্রপ্রয়োগের অধিকারী। অন্যের নিকট সে মন্ত্রশক্তি ফলদায়ক হয় না। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায় যে, শিশু বা অজ্ঞ ব্যক্তি ব্রিচলোডিং রাইফল ও বারুদ-কার্তুজ পাইলে, হয় প্রয়োগ করিতেই পারিবে না, না হয়, নিজের কোনও না কোনও অনিষ্ট করিয়া বসিবে। মন্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। যিনি হিন্দু, তিনি যে-কোন জাতিই হউন না কেন, উপরি-উক্ত কথাগুলি তাঁহাকে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। তাঁহার ভাগ্যে থাকে, তিনি এ সব কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিবেন; আর দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার বিশ্বাস দুর্ব্বল, তিনিও হিন্দুকুলে থাকিতে হইলে, এ কথাগুলি অবশ্যই মানিবেন। যাঁহার বুদ্ধির অভিমান আছে, যিনি অল্প পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে তার্কিক হইয়াছেন, এ কথাগুলি জানিয়া রাখিলে, হিন্দুর প্রথম শিক্ষা তিনি পাইবেন।

সকল বর্ণের কথা কহিয়া পুঁথি বাড়াইব না। ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাই কুশিক্ষিত হইয়া

সকলের অপেক্ষায় নিজের স্ব-সম্প্রদায় এবং সমগ্র সমাজের অধিকতর অনিষ্ট করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মণদের শিক্ষা ধরিয়াই দুই চারিটি কথা বলি।

পৈতা বলিয়া সুতীর সূতা গলায় দিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। আবার, ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিলেও, একেবারে পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় না। প্রথমে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম আবশ্যক; তাহার পর ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা আবশ্যক। এই শিক্ষা যাহার সফল হয়, তাহারই ব্রাহ্মণ-জন্মও সফল হয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিতে, ব্রাহ্মণ-শিশুর পিতা-মাতা প্রকৃত ব্রাহ্মণ-বীজের ধারক এবং ব্রাহ্মণ উৎপাদনে সমর্থ,—ইহাই বুঝিতে হইবে। যিনি ব্রাহ্মণ-পত্নী হইবেন, প্রথমতঃ তাঁহার যথাবিধি মন্ত্র-সংস্কার হওয়া আবশ্যক। এই যথাবিধি মন্ত্র-সংস্কারই বিবাহ।

যেখানে বিবাহে যতটুকু ত্রুটি, সেখানে ব্রাহ্মণত্বও সেই মাত্রায় খণ্ডিত হইবে। তাহার পর, যে গর্ভে ব্রাহ্মণ প্রথম স্থান লাভ করিবেন, সে গর্ভেরও যথাবিধি মন্ত্র-সংস্কার আবশ্যক। এই সংস্কারের নাম গর্ভাধান। তখনও পিতার বীজগত বা মাতার গর্ভগত যে সকল দোষ বা মলিনতা থাকিবার আশঙ্কা আছে, সেই আশঙ্কার নিরাকরণ অর্থে পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন নামক আর দুইটি বৈধ মন্ত্রসংস্কার আবশ্যক; তাহার পর ব্রাহ্মণ জাতকের ভূমিষ্ঠ হইব'র পরই জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ নামক সংস্কারগুলি ক্রমশঃ আবশ্যক। এই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ জন্মের যেন দ্বিতীয় অধ্যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার, সে পর্য্যন্ত প্রথম অধ্যায়। গুরুর নিকট উপনীত হওয়া অবধি মানবকের জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত। দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত শিশুর নিজের করণীয় কিছুই নাই; তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু করণীয়, তাহা তাহার পিতার বা অপর গুরুজনের। কিন্তু এই তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাতে তাহার নিজের কর্ত্তব্যেরও সূত্রপাত। ব্রাহ্মণ-শিশু তখন সাবিত্রী গ্রহণ করে, গুরুশুশ্রূষা করিতে শিখে, ভিক্ষাচরণ করে, অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মচর্য্যবিহিত অন্যান্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। অধিকন্তু সাবিত্রী গ্রহণে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র বেদ বেদাঙ্গ গ্রহণ করিতে থাকে। যিনি আমরণ ব্রহ্মচারী থাকিবেন না, তাঁহার এই সকল ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, তিনি গুরুর অনুমতি লইয়া স্নাতক হন। যোগ্যতা অনুসারে কেহ হন ব্রতস্নাতক, কেহ হন বিদ্যাস্নাতক, কেহ হন বেদ বিদ্যা উভয় স্নাতক। যিনি স্নাতক হন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যেরও অবসান হয়। তিনি দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হন। ব্রাহ্মণ-বালকের শিক্ষার তৃতীয় অধ্যায় এখানে সমাপ্ত হইল।

ব্রহ্মচারীর যেমন শৌচ আছে, আচার আছে, এবং উপাসনা আছে—গৃহস্থেরও সেইরূপ শৌচ আছে, আচার আছে, এবং উপাসনাও আছে। তবে, কি, শৌচে, কি আচারে, আর কি বা উপাসনায়—ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্যে নানা

প্রকার ভেদ। গৃহস্থ হইয়া কেহ যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মপালন করে, তাহা হইলে তাহার পাপ হয়।

গৃহস্থের কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করাও এক প্রকার শিক্ষা। যিনি করেন না, তিনি পতিত হন; যিনি করেন, তাঁহার ঊর্দ্ধগতি হয় বা উৎকর্ষ হয়। গৃহস্থকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিতে হয়। শয্যাত্যাগ কালে দেবতা ও ঋষিদিগকে স্মরণ করিতে হয়। পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, পৃথিবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, ভূতলে শয্যা হইতে প্রথমে পাদক্ষেপ করিতে হয়। তাহার পরে, নির্হার অর্থাৎ মলমূত্র-ত্যাগ। তৎসম্বন্ধেও নানাপ্রকার নিয়ম আছে, তাহার প্রতিপালন করিতে হয়। তাহার পরে মৃৎশৌচ—তদনন্তর জলশৌচ, পরে অতৈল স্নান এবং তর্পণ, এবং তাহার পরে সন্ধ্যা-বন্দনা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এতদূর হওয়া আবশ্যক। তাহার পর কুশপুষ্পাদি আহরণ করিয়া ক্রমশঃ পঞ্চযজ্ঞের সমাধান, তৎপরে ভোজন। ভোজনান্তে অপরাহ্ণে পুরাণাদি শ্রবণ বা পাঠ; তাহার পর সায়ংসন্ধ্যা; আবশ্যক হইলে আবার ভোজন, তাহার পর শয্যা গ্রহণ। এই সকল ব্যাপারও যথানিয়মেই করিতে হয়। স্ত্রী-গমন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বা নিষেধ আছে, তাহাও অবশ্য প্রতিপাল্য।

পঞ্চ যজ্ঞের কথা বলিয়াছি। (১) ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, (২) দেবযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) ভূতযজ্ঞ বা বলি এবং (৫) নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা। এইগুলিকে পঞ্চযজ্ঞ বলে। তিনটি যজ্ঞের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া মন্দ নহে। ভূতযজ্ঞে যে বলি দেওয়া হয়, তাহার মন্ত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, সমস্ত ভূতের অর্থাৎ প্রাণীর সহিত আমাদের কি প্রকার সম্বন্ধ, সমস্ত প্রাণীর নিকট আমরা কিরূপ ঋণী এবং সমস্ত প্রাণীর ঋণ শোধ করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বদ্ধ। ভূতযজ্ঞে সকল প্রাণীকেই আহার দিতে হয়। নৃযজ্ঞে অতিথিসেবা জাতিনির্ব্বিশেষে অবশ্য কর্ত্তব্য। ভোজন দিবার শক্তি না থাকিলে, অর্দ্ধ-ভোজন; তাহাতেও অশক্ত হইলে, চারিমুষ্টি, নিতান্তপক্ষে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষাও দিতেই হইবে। আর তৃতীয় কর্ম্ম যাহা বলিতেছিলাম, তাহা তর্পণ। এই তর্পণ কর্ম্মে জলদান করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে ঋণমুক্ত হইতে পারি। তর্পণে দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর হইতে আরম্ভ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের বান্ধব, অবান্ধব, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, কেহই বাদ পড়ে না। শ্রাদ্ধেও ঐরূপ সর্ব্বজীবের সহিত জন্মজন্মান্তরে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইরূপ শিক্ষার ফললাভ যিনি যে পরিমাণে করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ। এইরূপই ব্রাহ্মণের শিক্ষা। প্রশ্ন করিতে পারা যায় যে, এইরূপ শিক্ষা যিনি পাইয়াছেন, তিনি মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক,

কোনও প্রাণীকে কখনও ঘৃণা করিতে পারেন কি? ঘৃণা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি?

জনকতক কুশিক্ষিত বাবু সমাজে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত করিয়া, লোকের অন্তর্দাহ জন্মাইয়া, সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞানকে ক্ষেপাইয়া তোলা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। কেন না, ইন্দ্রিয়গ্রামের তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইবার নিমিত্তে প্রায় সকলেই ত' সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছে।

ধিকি ধিকি যে আগুন ভিতরে জ্বলিতেছে, ফুৎকারে তাহাকে সমিদ্ধ করাতে বাহাদুরী কি? কিন্তু বাহাদুরী থাকুক আর নাই থাকুক,—জনকতক "বাবু" আদাজল খাইয়া এই অশুভ কার্য্যে লাগিয়া পড়িয়াছেন। অজ্ঞ লোককে ইঁহারা বুঝাইতে চাহেন, যেহেতু ব্রাহ্মণে চণ্ডালের জল স্পর্শ করে না, কিংবা শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ করে না, কিংবা কাহাকেও কাহাকেও স্পর্শ করে না, অতএব ব্রাহ্মণেরা সেই সেই জাতিকে ঘৃণা করে। যাহাদের মন বিদ্বেষ-কালিমায় নিতান্ত কলুষিত, তাহারাই এইরূপ মনে করিতে পারে। বুদ্ধির শুদ্ধি থাকিলে, এ ভাব কখনই জন্মে না। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে যে কর্ম্ম করিতে হয়, আত্মোন্নতি সাধন করিতে যে প্রকার আচরণ করা আবশ্যক, তাহা কখনও ঘৃণামূলক বা দ্বেষমূলক হইতেই পারে না। দেহসর্ব্বস্ব নাস্তিকেরা বসন্ত রোগে আক্রান্ত বা প্লেগে পীড়িত পরমাত্মীয়কেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন মহারোল উঠে যে, 'সিগরিগেশন' করিতে হইবে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ বর্জ্জিত করিয়া রোগীকে রাখিতে হইবে। সে সময়ে আত্মীয়-স্বজনের চিত্ত যে কাতর হয় না, তাহা নহে, তবে আত্মরক্ষার ভাবই প্রবলতর হইয়া উঠে। সে আত্মরক্ষা আর কিছু নহে—কেবল দেহরক্ষা মাত্র। আত্মায় বিশ্বাস থাকিলে, এ দেহরক্ষার জন্য কেহই ব্যস্ত হয় না। কিন্তু আত্মায় যাহার বিশ্বাস আছে, ইহলোককেই একমাত্র লোক সে ব্যক্তি মনে করে না, তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা কিরূপ, নাস্তিকে তাহা বুঝিতে পারে কি? হিন্দু শিখিয়া রাখে যে, এই একই দেহের নাভি হইতে নিম্নভাগ অমেধ্য বা অপবিত্র। নাভি হইতে মুখের নিম্ন পর্য্যন্ত পবিত্র। আর মুখ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। আমাদের উরু, আমাদের পা কি আমাদের ঘৃণার বস্তু? পায়ে কাঁটা ফুটিলে, মাথা পর্য্যন্ত চিম্ চিম্ করে না কি? কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে হাত চঞ্চল হইয়া উঠে না কি? তবু পা ঘৃণার বস্তু নহে; কিন্তু অপবিত্র। পা'ও কখনও হাতের কাজ করিব বা মাথার কাজ করিব বলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে না। নিজ শরীরের অন্তর্গত মল নিঃসরণ করিয়া মৃজ্জলের দ্বারা হস্ত পদাদির শৌচ সাধন করিতে হয়। আচমন করিয়া এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বাহিরের এবং অন্তরের শুদ্ধিবিধান করিতে হয়। এ সব ঘৃণা জন্য নহে, আত্মত্রাণের নিমিত্তেই করিতে হয়; চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই করিতে হয়।

আর এই কলুষিত দেহ যাহাতে ভগবৎ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠার যোগ্য হয়, সেই অভিপ্রায়েই কাজ করিতে হয়।

আবার আত্মোৎকর্ষ করিতে হইলে, আরও কঠোর-নিয়মের বিধান আছে। আমি ব্রাহ্মণ, আমার উপনীত পৌত্র আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করে না, আমার কন্যার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করে না। ইহা কি ঘৃণা জন্য? যাহাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, দণ্ডবৎ হইয়া প্রণতি করে, শাস্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে না,—ইহা কি ঘৃণা? না কি,—নাস্তিকের অবোধগম্য অতি মহান্ ভাব? শাস্ত্রের বশে যে চলিতে পারে না, সেত, কামুক, ক্রোধী, লোভী বলিয়াই শাস্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে না। তাহার ইন্দ্রিয়গণই তাহার চালক। ইন্দ্রিয়ের সুখ-বিলাসই সে বুঝিতে পারে। অথচ তাহাকেও যদি একথা বলা যায় যে, প্রথমে বশে চলিতে না শিখিলে, কখনই অন্যকে বশ করিতে পারা যায় না,—সে তখন বলে যে, হাঁ ইহা সত্য বটে। এই যে, “সত্য বটে” বলে, তাহার কারণ এই যে, শাস্ত্রের বশ্যতা স্বীকারে যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, তাহার সহিত তুলনায় লৌকিক বশ্যতা, বশ্যতাই নহে।

যিনি যে পরিমাণে সুশিক্ষিত, তিনি সেই পরিমাণে বিধির বশে চলেন; ঘৃণার বশে, লোভের বশে, কিংবা অন্য পাপবৃত্তির বশে চলিতে কুণ্ঠিত হন। শাস্ত্রের আদেশ এই যে, চণ্ডালে জলস্পর্শ করিলে, যে ব্রাহ্মণ সে জল স্পর্শ করে, তাহার পাপ হয়, যে চণ্ডাল ব্রাহ্মণকে আপন জল স্পর্শ করাইতে ইচ্ছা করে, তাহারও পাপ হয়। পাপের ভয় আর ঘৃণা,—সমান কথা কি?

জাতিভেদ।

আপনি আমার কাছে জানিতে চাহিয়াছেন যে, জাতিভেদ ভাল না জাতিভেদ মন্দ? টপ্ করিয়া এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আগে দুই একটা অন্য কথা বলি; তাহার পর আপনার জিজ্ঞাসার সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব।

বাবু-বুদ্ধি আর হিন্দু-বুদ্ধি।

আপনিও বাবু, আমিও বাবু, তবে আপনি কিছু বেশী বাবু—আর আমি কিছু কম বাবু। আমাদের এই বাবু-জাতির বুদ্ধিটা কিছু মার্জ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না ভালই হউক বা মন্দই হউক কিছু কাল ধরিয়া আমাদিগকে পড়াশুনা করিতে হইয়াছে। চষা জমিতে শস্য না লাগাইয়া ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে যেমন আগাছা হইবেই হইবে, তেমনি বাবু-বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াও ভাল সামগ্রীর উপর কার্য্য করিতে না পাইয়া বিষম উৎপাতের হেতু হইয়া উঠে। সত্য কথা বলিতে কি, বাবুদের শিক্ষা বড় কম; অথচ বুদ্ধির নাড়াচাড়া বড় বেশী। তাহার ফলে বাবু-বুদ্ধিতে এই একটা বিষম অভিমান গজাইয়া উঠে যে, আমরা অর্থাৎ বাবুরা এক প্রকার সব-জান্তা। আমরা যাহা জানি না, তাহা জানিবার যোগ্যই নয়, আর আমরা যাহা জানি তাহা নিখুঁত, নির্দ্দোষ এবং চৌরস। আপদের গোড়াই এইখানে। বাবুরা হিন্দুর ছেলে; কিন্তু হিন্দুয়ানীর "হ" পর্য্যন্ত জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দোষ দিতেছি না—স্বরূপ কথাই বলিতেছি। বাবুরা হিন্দুয়ানী শিখিবার সুযোগই মোটে পান না। ছয়, সাত, আট বৎসর বয়সের সময় ইস্কুলে ঢুকিয়া ষোল বৎসর বিশ বৎসর পরে যাহাকে বাহির হইয়া আসিতে হয়, সে কবে কোথায় হিন্দুয়ানীর কোন্ কথা শিখিবে? তাহাতে আবার হিন্দুয়ানীর ভাষা সংস্কৃত। ইস্কুল কলেজে যে সংস্কৃত পড়া হয়, তাহাতে বড় জোর সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিলেও পৌছিতে পারা যায়, কিন্তু ভিতরে যাইবার—ভিতরে কি আছে তাহা দেখিবার—সুবিধাও তাহাতে হয় না। আর হিন্দু পরিবারের মধ্যে বাস করায় হিন্দুসন্তানের সঙ্গে ব্যবহার করায় যেটুকু হইবার কথা, সংসর্গের ঘনিষ্ঠতা হয় না বলিয়া তাহার ফলও ফলে না। কাজেই সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ে কিম্বা সংসারে প্রবেশ করিয়াও হিন্দু-সন্তান কিম্ভূত কিমাকারই হইয়া উঠেন, আর সেই কিম্ভূত কিমাকারকেই আমি 'বাবু' বলিয়া থাকি।

১৩১৭ সালে "নায়ক" হইতে পুনর্মুদ্রিত এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

ইংরেজী গন্ধে বাসিত হইয়া 'বাবু' বস্তুত ইংরেজের শিষ্যই হন। কিন্তু এমন গুরুদ্রোহী শিষ্য বোধ করি জগতে আর কোথাও হয় না। ইংরেজের গৌরবে ইহাঁরা গর্ব্বিত, অথচ ইংরেজকে ইহাঁরা দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না। ইস্তক চুলকাটা নাগাদ পথ হাঁটা,' সকল বিষয়েই ইংরেজের যথাশক্তি নকল করাকেই বাবুরা পরম পুরুষার্থ মনে করেন; অথচ ইংরেজের উপর এমন হাড়ে চটা আর কোথাও ত দেখি না। বাবুর বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু সুশিক্ষা কিছুই হয় না—তাহাতেই এই আবর্জ্জনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

যাউক, যে জাতিভেদের কথা উঠাতে এসব বলিলাম, এইবার সেই জাতিভেদ সম্বন্ধে কিছু বলিতেই হইবে বলিয়া ভূমিকাটুকু করিতে হইল। জাতিভেদ বুঝিতে হইলে বাবুদের এই সব-জান্তা ভাবটা ছাড়িতে হইবে। ছাড়িতে না পারিলে যথা-সম্ভব কমাইতে হইবে। নহিলে আমার কথা কহাও বৃথা, আর অন্যের সে কথা বুঝিবার চেষ্টা করাও বৃথা।

জাতি কি?

মনে রাখা আবশ্যক যে, জাতি শব্দটা সংস্কৃত। দুই প্রকার অর্থে 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ হয়। 'জাতি' শব্দের এক অর্থ 'জন্ম'। অন্য অর্থ—সামান্য বা পরস্পরের সমানতা। মোটামুটী বুঝিতে হইলে সামান্য শব্দে বহুব্যক্তির সমান ধর্ম্মকে বুঝায়। যত মনুষ্য আছে সকল মনুষ্যেই কতকটা সমান ধর্ম্ম দেখা যায়—তাহারই নাম 'সামান্য'। মানুষের বেলায় সেই সামান্যকে 'মনুষ্যত্ব' বলে। এই মনুষ্যত্বই জাতি।

এইরূপ 'গোত্ব', 'অশ্বত্ব' 'ঘটত্ব' 'পটত্ব' ইত্যাদি যে সামান্যের দ্বারা গো, অশ্ব, ঘট, পটকে চেনা যায়, সেই সেই সামান্যই এক একটী জাতি।

এখন এই যে মনুষ্যের জাতিভেদের কথা বলা হয়, তাহাতে এই 'জাতি' শব্দে ঐ দুই অর্থই আছে। প্রথম অর্থে, মানুষে মানুষে আকৃতি-প্রকৃতিগত কতকটা সমতা আছে, তজ্জন্য সকল মানুষকে মানুষ বলে। আর, জন্ম হইবা মাত্র সেই 'সামান্য' লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া মানুষের সন্তানকেই মানুষ বলে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সব মানুষই এক জাতি, না কি মানুষের ভিতরেও একাধিক জাতি আছে?

জাতিভেদ—আকৃতিভেদে ও প্রকৃতিভেদে।

ইউরোপের বিদ্বান্ লোকে বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ এক জাতি নহে—নানা জাতিতে বিভক্ত। যেমন মঙ্গোলীয় জাতি, নিগ্রোজাতি ইত্যাদি। হিন্দুরা যখন জাতিভেদের কথা বলেন, তখন এ ভাবে জাতিবিভাগ করেন না। ইউরোপের লোকে যে ভাবে বিভাগ করেন, সে ভাবে জাতি বলিতে হইলে আমরা

সে জাতিকে 'আকৃতি-গ্রহণা' জাতি বলি। অর্থাৎ স্থুল দৃষ্টিতে জন্মগত যে আকৃতি-ভেদ দেখা যায়, সেই আকৃতি-ভেদকে অবলম্বন করিয়াই এই জাতিভেদ করা হইয়া থাকে। আমরাও অর্থাৎ হিন্দুরাও এই ভেদ স্বীকার করি। আকৃতিভেদ অনুসারেই মনুষ্যজাতি, পক্ষীজাতি ইত্যাদি বলিয়া থাকি। কিন্তু মনুষ্যের ভিতর জাতিভেদের কথা যখন বলি, তখন একটা সূক্ষ্ম অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই জাতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের তারতম্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা এই জাতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি; আমাদের এই জাতি 'প্রকৃতি-গ্রহণা' জাতি।

এখন ভাবিয়া দেখুন, এই যে 'প্রকৃতি' পদার্থ, ইহা আমাদেরই ইন্দ্রিয়ের অগোচর। মানুষের প্রকৃতির বিকাশ হইবার পরে তাহার কার্য্য দেখিয়া সেই প্রকৃতি বিষয়ে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে অনুমান বড় দুর্ব্বল। আর অঙ্কুর অবস্থায় অর্থাৎ শৈশবে প্রকৃতির কিছুই বুঝা যায় না। তখন অগত্যাই অর্থাৎ উপায়ান্তর নাই বলিয়াই আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হয় যে, এই শিশুটীর প্রকৃতি ইহার মাতাপিতার অনুরূপই হইবে। ইহাকেই আমরা বলি 'জন্ম' বা 'জাতি-গত প্রকৃতি' বা 'জাতি।' ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি যে সব জাতির কথা আমরা বলি, তাহা এই জন্মগত অর্থেই বলিয়া থাকি। আর ব্যক্তি হিসাবে বহু ব্রাহ্মণ, বহু কায়স্থ আছে বলিয়া আমরা ব্রাহ্মণ-জাতি বা কায়স্থ-জাতি বলিয়া থাকি।

বর্ণভেদ।

মানুষের সন্তান যখন হয় নাই, তখন গোড়াতে মানুষের প্রকৃতি-গত যে ভেদ হইয়াছিল, তাহার নাম বর্ণভেদ। মূলে সেই বর্ণ চারিপ্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। তাহার পরে ব্রাহ্মণ হইতে যাহার জন্ম, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ হইল, ক্ষত্রিয় হইতে যাহার জন্ম, জন্মের দ্বারা সে ক্ষত্রিয় হইল, বৈশ্য হইতে যাহার জন্ম সে জাতিতে বৈশ্য হইল এবং শূদ্র হইতে যাহার জন্ম হইল, সে জাতিতে শূদ্র হইল।

এই যে বর্ণভেদ, ইহার মূল হইল প্রকৃতি-ভেদ অর্থাৎ গুণভেদ। সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন লইয়া প্রকৃতি। আর এই তিনকে এক একটী গুণ বলে। গুণ বলিলে সত্ব, রজঃ ও তমঃই বুঝিতে হইবে।

সঙ্কর জাতি

এই যে বর্ণভেদ, ইহাই মূলের প্রকৃতি-ভেদ বা গুণ-ভেদ। এবং এই গুণ-ভেদকে বিশুদ্ধ বা অমিশ্র গুণভেদ বলা যায়। কালক্রমে ব্রাহ্মণ পুরুষ শূদ্রস্ত্রী কিম্বা শূদ্রপুরু

ও ব্রাহ্মণস্ত্রী মিলিত হইলে মিশ্রপ্রকৃতির সন্তান উৎপন্ন হইতে থাকে। এই মিশ্রকে সংস্কৃতে সঙ্কর বলে। সঙ্কর দুই প্রকার, উচ্চ জাতির পুরুষ এবং নিম্ন জাতির স্ত্রী হইতে সন্তান জন্মিলে তাহাকে অনুলোম সঙ্কর বলে, আর নিম্ন জাতির পুরুষ ও উচ্চ জাতির স্ত্রী হইতে সন্তান জন্মিলে, সে সন্তানকে প্রতিলোম সঙ্কর বা বিলোম সঙ্কর বলে।

জন্মগত বর্ণভেদই জাতিভেদ।

এখন আমরা যে জাতিভেদের কথা বলিয়া থাকি তাহা বস্তুতঃ জাতিগত বা জন্মগত বর্ণভেদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ণ চারি প্রকার, যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইদানীং সঙ্কর গণনা করিয়া বিস্তর জাতি হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সেই চারই আছে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, সঙ্কর হইলেও সঙ্কীর্ণজন্মা ব্যক্তি কোন না-কোন বর্ণেরই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

বর্ণভেদ মানুষের করা নহে।

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্।" এ কথার অর্থ এই যে বর্ণভেদ মানুষের কল্পিত কৃত্রিম পদার্থ বা সামাজিক ভেদমাত্র নহে। বর্ণভেদ রাজার করা নহে, সমাজের করা নহে, কোন মানুষের করা নহে। কেননা ভগবান্ বলিতেছেন যে, পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণ ময়া সৃষ্টং—আমারই সৃষ্টি করা। ইহাতে বুঝা গেল যে পশু হইতে পক্ষীর, পক্ষী হইতে উদ্ভিদের ভেদ যেমন ঈশ্বরের করা, মানুষের ভিতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি প্রকার ভেদও তেমনই ঈশ্বরেরই করা। সুতরাং জাতিভেদ ভাল কি জাতিভেদ মন্দ, এমন প্রশ্নই হইতে পারে না। আগুনের একপ্রকার ধর্ম্ম, জলের অন্য প্রকার ধর্ম্ম। আগুন পোড়ায়,—মানুষকে পোড়ায়, গরুকে পোড়ায় আবার অন্নব্যঞ্জন পাক করিবার সময় জ্বালানি কাঠ-কয়লাকেও পোড়ায়। জল যাহাকেই ভিজাইতে পারে তাহাকেই ভিজায়। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, আগুনে জলে যে জাতিভেদ আছে তাহা ভাল কি মন্দ, অথবা আগুন ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্নের যেমন উত্তর দেওয়া চলে না, তেমনই মানুষের ভিতরে যে জাতিভেদ আছে তাহা ভাল কি মন্দ কিছুই বলা যায় না। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই কখনও ভাল কখনও মন্দ—কাহারও পক্ষে ভাল, কাহারও পক্ষে মন্দ। কিন্তু ভালই হউক বা মন্দই হউক যাহা আছে তাহা আছেই। তদ্দ্বারা আপন আপন ভাল করিয়া লইতে পারিলেই ভাল, আর ভাল না করিয়া লইতে পারিলেই মন্দ।

শাস্ত্রে বিশ্বাস।

দুর্ভাগ্যক্রমে বাবুদের জাত্যুচিত শিক্ষা না থাকাতে বড়ই গোল বাধিয়া যায়। বাবু হঠাৎ আপত্তি করিয়া বসেন যে, ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ ছিলেন কি আছেন,

ইহাই আমি মানিব কেন? তাহার পরে ঈশ্বর চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন,—গীতাতে একথা থাকিলেও গীতাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিব কেন?

এই আপত্তির খণ্ডন করিতে হইলে বিস্তর কথা বলা আবশ্যক হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে সব কথা বলিবার অবসর নাই, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভগবদ্গীতার কথাতেই এই আপত্তি খণ্ডিত হইতেছে। আর ভগবদ্গীতাই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। যে বিষয়ের প্রমাণ আছে, তাহা অস্বীকার করা কখনই উচিত নহে।

প্রমাণ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

দেখুন মানুষের জ্ঞান প্রমাণাধীন। প্রমাণ না থাকিলে আমাদের কোনও জ্ঞানই হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থাৎ কাণ না থাকিলে আমাদের শব্দজ্ঞান হয় না, ত্বক্ না থাকিলে আমাদের স্পর্শজ্ঞান হয় না, চক্ষু না থাকিলে আমাদের রূপজ্ঞান হয় না,—এসব স্থলে শব্দজ্ঞানের পক্ষে কাণই প্রমাণ, স্পর্শজ্ঞানের পক্ষে ত্বক্ই প্রমাণ এবং রূপজ্ঞানের পক্ষে চক্ষুই প্রমাণ। এই যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি আছে, ইহাদিগকে আমাদের শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ইহা ছাড়া নিজের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞানও আমাদের হইয়া থাকে। সে সব স্থলে যে বস্তু যাহার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে, তাহার প্রমাণকেই আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া থাকি। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে না, সেখানে দায়ে পড়িয়াই পরোক্ষ প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরোক্ষ প্রমাণকে যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে বিস্তর বিষয়ের জ্ঞানই আমাদের হইতে পারে না; কেননা আমাদের জ্ঞানই প্রমাণের অধীন। প্রমাণ নাই অথচ জ্ঞান হইল এমন কখনও হইতে পারে না।

বেদাদি শাস্ত্র—প্রমাণ।

এখন ভাবুন যে, আমাদে মৃত্যুর পর আমরা থাকি কি থাকি না? যদি থাকি, তবে কি আকারে এবং কি প্রকারে থাকি—মাতৃগর্ভে আসিবার পূর্ব্বে পিতৃঔরসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, আমি ছিলাম, কি ছিলাম না, এসব বিষয়ের জ্ঞান কোন্ প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে? প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা হইতেই পারে না। কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতীত যে বিষয়, পরোক্ষ প্রমাণ অবলম্বন না করিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার কোনও উপায় নাই।

হিন্দু কে?

আমরা বিশ্বাস করি—হিন্দু সন্তানমাত্রেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে—বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিপুরাণ এবং তন্ত্র অসন্দিগ্ধ প্রমাণ—প্রকৃষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ। শাস্ত্র যাহা বলেন, তাহা কখনই মিথ্যা নহে; আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিস্তর ভ্রম

হইয়া থাকে, কিন্তু বৈদিক প্রমাণে, শাস্ত্রীয় প্রমাণে, ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। যিনি ইহা না মানেন, তিনি অন্য যাহা হইবেন হউন, তিনি হিন্দু নহেন। আর হিন্দু ভিন্ন কোনও ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই—বলিবার প্রয়োজনও আমাদের নাই। এই কারণে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে ভজাইয়া হিন্দুধর্ম্মে আনিবার বিধান নাই। মুসলমান আমাকে মুসলমান করিয়া লইতে পারে, খৃষ্টান আমাকে খৃষ্টান করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যিনি জাতিতে হিন্দু নহেন—জন্মগুণে যিনি হিন্দু নহেন, হিন্দু তাহাকে হিন্দু করেও না এবং হিন্দু করিতেও পারে না। জাতি অর্থাৎ জন্মের উপর আমাদের এতই নির্ভর।

গীতার বর্ণভেদ।

শুনিয়াছি গীতা অনেকেই পড়েন, গীতার প্রশংসাও নাকি করেন। কিন্তু গীতার কথা সকলে বুঝিতে পারেন, সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এমন আমার মনে হয় না।

কর্ম্মদোষে জাতিনাশ।

উচ্চতর জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিম্নতর জাতির কোন ব্যক্তি সেই উচ্চতর জাতির ভিতর স্থানলাভ করিতে পারে না বটে, কিন্তু কর্ম্মদোষে সে নিম্নতর জাতি পাইতে পারে। তাহা হইলেও এমন মনে করা উচিত নহে যে, জাতিভেদ মানুষের করা সামাজিক বিভাগ মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, জন্মগুণে যাহার যে প্রকার প্রকৃতি লাভ হয়, এক জন্মে সে প্রকৃতির উৎকর্ষ করিতে পারা যায় না; কিন্তু কর্ম্মদোষে অপকর্ষ করিতে পারা যায়। যিনি শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি সেই জন্মে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি কর্ম্মদোষে সেই জন্মেই শূদ্রত্ব পাইতে পারেন। ইহার রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ধর্ম্ম কি পদার্থ, ধর্ম্ম কেমন করিয়া হয়, ধর্ম্ম কেমন করিয়াই বা নষ্ট হয়, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক।

প্রকৃতিভেদে জাতিভেদ হয়—অথবা বলা উচিত যে, বর্ণভেদ হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন সেই কথা আরও একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম।

সত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সমষ্টিকেই প্রকৃতি বলে। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে, প্রত্যেকের প্রকৃতি অন্যের প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়াই সেই সকল পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়া থাকে। বৃক্ষের মধ্যে বটের প্রকৃতি হইতে অশ্বত্থের প্রকৃতি ভিন্নরূপ। সেইজন্যই বট হইতে অশ্বত্থকে পৃথক্ দেখা যায়। এইরূপ এক জন্তুর প্রকৃতি হইতে অপর জন্তুর প্রকৃতি পৃথক্। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতিও পৃথক্

পৃথক্। অর্থাৎ এক এক জাতীয় পদার্থের সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণের পরিমাণ অন্য জাতীয় পদার্থের সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের পরিমাণ হইতে ভিন্নরূপ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের তারতম্যই সমস্ত ভেদের কারণ। গুণ-তারতম্যের যখন এতই মাহাত্ম্য, তখন তিনটি গুণেরই স্থূল পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ।

সত্ত্বগুণ লঘু এবং প্রকাশক। তমঃগুণ গুরু এবং বরণক। রজঃগুণ চঞ্চল এবং উপষ্টম্ভক। সত্ত্বগুণ লঘু অর্থাৎ হালকা। যাহাই হালকা তাহাই আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ দেখা দেয়। নিদ্রাবস্থা অপেক্ষা জাগ্রত অবস্থায় সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তাহাতেই জাগ্রত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ অধিক পরিমাণে করিতে পারা যায়। চৈতন্য যত অধিক সত্ত্বগুণও তত অধিক বুঝিতে হইবে। আর তমঃগুণ সত্ত্বগুণের ঠিক বিপরীত। তমঃগুণ গুরু অর্থাৎ ভারি, এবং বরণক অর্থাৎ চৈতন্য আবরণ করিয়া দেয়, ঢাকিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করে। নিদ্রার সময়ে তমঃগুণের বাহুল্য হয়, তখন চৈতন্য ঢাকা পড়ে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, জগতের যে কোন বস্তুর সত্তা আছে, যাহা কিছু আত্মপ্রকাশ করে, তাহা সত্ত্বগুণেরই গুণে। সত্তাই তাহার সত্ত্বগুণের পরিচায়ক।

এই সত্ত্বগুণ, এবং ইহার বিপরীত যে তমঃগুণ, উভয় গুণের এই এক ধর্ম্ম আছে যে, ইহারা যেমন থাকে তেমনি থাকে, আপন চেষ্টায় আপন পরিমাণের কম-বেশী করিয়া লইতে পারে না। সত্ত্বগুণও অচল, তমঃগুণও অচল। এই সত্ত্বগুণকে এবং তমঃগুণকে যে গুণ চালিত করে, সেই গুণের নাম রজঃগুণ। রজঃগুণ যদি কাহারও তমঃগুণকে বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির সত্ত্বগুণ তখন কমিয়া যায়, আর যদি সত্ত্বগুণকে বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার তমঃগুণ কমিয়া যায়, এই কারণে রজঃগুণকে চল বা চঞ্চল বলে। যেখানে চাঞ্চল্য দেখা যায়, সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, রজঃগুণের ক্রিয়া হইতেছে। ক্রিয়া মাত্রেই রজঃগুণজন্য হইয়া থাকে। যখন আমি সৎকর্ম্ম করি, তখন রজঃগুণের দ্বারাই আমাকে তাহা করিতে হয়; আর যখন আমি অসৎ কর্ম্ম করি, তখনও রজঃগুণের দ্বারাই আমাকে তাহা করিতে হয়। এই জন্যই রজঃগুণকে, চল বা চঞ্চল বলা হইয়াছে। আর রজঃগুণ উপষ্টম্ভক, অর্থাৎ ধরিয়া রাখে বা আটকাইয়া রাখে। রজঃগুণ উপষ্টম্ভক বলিয়াই কোন বস্তুর সত্ত্বগুণ তমঃগুণকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারে না; অথবা তমঃগুণও সত্ত্বগুণকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে না। এই হিসাবে রজঃগুণই একপ্রকার রক্ষক। যে প্রকৃতিতে যেমন মাত্রায় সত্ত্বগুণ এবং তমঃগুণ থাকে, রজঃগুণই সেই মাত্রা বা পরিমাণ মোটামুটি স্থির করিয়া দেয়।

গুণভেদে প্রকৃতিভেদ।

সত্ত্ব হইল—লঘু এবং প্রকাশক। তমঃ হইল—গুরু এবং বরণক। আর রজঃ—চল এবং উপষ্টম্ভক। সর্ব্বত্রই সকল আধারেই সকল বস্তুতেই এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ আছেই আছে। ইহারই নাম প্রকৃতি। গুণের তারতম্য আছে বলিয়াই প্রকৃতিভেদ হয়। এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তির যে ভেদ, প্রকৃতিভেদই তাহার কারণ। আবার একজাতি হইতে অন্য জাতির যে ভেদ, প্রকৃতিভেদই তাহারও কারণ। তিন গুণের তারতম্যের এক একটা সীমা পর্য্যন্ত এক একটা জাতি হয়। কিন্তু এক একটা জাতির মধ্যে যতগুলি ব্যক্তি থাকে, তাহাদের প্রত্যেকে ঐ তিন গুণের পরিমাণ সম্বন্ধে ইতরবিশেষ হইলেও, কোনও ব্যক্তিই সেই জাতীয়-গুণত্রয়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। দেখুন জীবগণের মধ্যে পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ সকলেই তমঃপ্রধান, আর মনুষ্য রজঃপ্রধান। অথচ এক-জাতীয় পশুর মধ্যেই প্রত্যেকের গুণত্রয়ের পরিমাণের ভেদ আছে। কোনও জাতীয় পক্ষীই কিম্বা কোনও জাতীয় পশুই স্ব স্ব জাতির নির্দ্দিষ্ট গুণ-পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রত্যেকেই সেই সীমার মধ্যেই থাকে। ঐরূপ মনুষ্য জাতির ভিতরেও প্রত্যেক মনুষ্যই মনুষ্যের জাতীয়-প্রকৃতিকে অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিমাণকে ছাড়াইয়া যায় না। মনুষ্যের ভিতর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধম, সেও রজঃপ্রধান আর মনুষ্য জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তিনিও রজঃ-প্রধান। এইরূপে পশুপক্ষীরা পরস্পরে যতই ভিন্ন হউক না কেন, সকলেই তমঃপ্রধান।

মানুষ রজঃপ্রধান।

মনুষ্য রজঃপ্রধান জাতি; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যেই সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণই আছে। কেবল, পশু-পক্ষীর সহিত তুলনায় মনুষ্য জাতির রজঃ গুণের পরিমাণ তো অধিক বটেই, সত্ত্ব গুণের পরিমাণও পশু-পক্ষীর তুলনায় অধিক। আবার মানুষের ভিতর ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায় ক্ষত্রিয়ের সত্ত্বগুণ অল্প, বৈশ্যের আরও অল্প, শূদ্রের তাহা অপেক্ষাও অল্প। এই যে গুণগত ভেদ, ইহা কুত্রাপি মানুষের করা নহে। যে কারণে নানাজাতীয় পক্ষী সৃষ্ট হয়, সেই কারণেই মনুষ্যের ভিতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রেরও সৃষ্টি হয়।

মানুষের কর্ম্মাধিকার।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, পশু পক্ষীর সহিত তুলনায় মনুষ্যজাতির রজঃ-প্রাধান্য নিবন্ধন এই এক বৈলক্ষণ্য আছে যে, শাস্ত্রে যাহাকে "কর্ম্ম" বলে, মনুষ্যই

তাহা করিতে পারে, কিন্তু পশু পক্ষী পারে না। পশু পক্ষী প্রভৃতি হইতে ইহাই মনুষ্যের জাতিগত অর্থাৎ জন্মগত ভেদ।

ঐশ্বর্য্য।

মনুষ্যের প্রকৃতি রজঃপ্রধান বলিলে বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য অধিক। ইতর প্রাণীদের ঐশ্বর্য্য নাই বলিলেও চলে। ইতর প্রাণীদের যে ঐশ্বর্য্য আছে, সে ঐশ্বর্য্য নিতান্তই ক্ষীণ। . ঈশ্বরের ভাব বা ঈশ্বরের কার্য্যকেই ঐশ্বর্য্য বলে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি রক্ষা করেন, এবং সৃষ্টির নাশ অর্থাৎ প্রলয়ও করেন। মানুষেও কতকটা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে। ইতর প্রাণীরাও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় না করে এমন নহে, কিন্তু সে একপ্রকার না-করাই। মানুষেরা গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, কল কারখানা তৈয়ার করে, অন্নাদি পাক করে, তপস্যাদির সাধন করে—এ সমস্তই মানুষের ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ। মানুষে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, এ সব কার্য্যে সেই ঐশ্বর্য্যেরই পরিচব পাওয়া যায়। উই পোকাতে মাটির ঢিপি করে, বাবুই পাখী সুন্দর বাসা করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে পারে না। সকল উই ঢিপিই প্রায় এক প্রকার, সকল বাবুইর বাসাই প্রায় এক প্রকার। আর মানুষে যাহা করে, তাহার প্রকার বোধ করি গণিয়া উঠা যায় না। ইহাতেই বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় করিবার শক্তি আছে; ইতর প্রাণীদের ঐশ্বর্য্য নাই। জাতিভেদ বা প্রকৃতিভেদই ঐশ্বর্য্যের এই তারতম্যের কারণ। অন্য কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলা যায় যে, ইতর প্রাণীরা সংস্কারের বশে কাজ করে, আর মানুষে পুরুষকার অবলম্বন করিয়া কাজ করে। পদেপদেই মানুষে মনে করে যে, আমিই কর্ত্তা, আমি এ কাজ করিতে পারি, আমি এ কাজ না করিতেও পারি, আমি কোনও কাজের অন্যথাও করিতে পারি। ইহাই মানুষের প্রভুত্ব বুদ্ধি, ইহাই মানুষের অহঙ্কার—ইহাই মানুষের ঐশ্বর্য্য। ইতর প্রাণীদের এত ঐশ্বর্য্য নাই। এই ঐশ্বর্য্যের গুণেই মানুষের প্রকৃতিতে এই প্রভুত্বের ভাব প্রবল বলিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, আর ইতর প্রাণীরা নিকৃষ্ট।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব।

আবার মানুষের ভিতর ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু এ কথা বুঝিতে হইলে আর একটা তত্ত্ব জানা আবশ্যক। সে তত্ত্ব এই যে, মানুষের প্রকৃতি সাধনাসাপেক্ষ, ইতর প্রাণীদের প্রকৃতি সাধনানিরপেক্ষ। মানুষের প্রকৃতিতে যেটুকু মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ পশু প্রভৃতির সহিত তুল্য ধর্ম্ম, কেবল তাহাই সিদ্ধ থাকে অর্থাৎ কালক্রমে আপনা আপনি বিকশিত হয়, কিন্তু মানুষের অন্য অন্য শক্তি সিদ্ধ থাকে না। সে সকল শক্তিকে সাধনার দ্বারা ফুটাইতে হয়। ইতর

প্রাণীদের প্রকৃতিতে সাধনার কোন অপেক্ষা থাকে না। কেবল কালক্রমেই অর্থাৎ যথাকালে ইতর প্রাণীদের মধ্যে যাহার যে শক্তি আছে, তাহা আপনা আপনি বিকশিত হয়, কিন্তু মানুষের সমস্ত শক্তি কালক্রমে আপনা আপনি বিকশিত হয় না। যিনি সাধনা করেন, তাঁহার শক্তি বিকশিত হয়, যিনি সাধনা করেন না, তাঁহার শক্তি বিকশিত হয় না। এই কারণেই আজি কালি লোকে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব দেখিতে পায় না; অনেক ব্রাহ্মণকে শূদ্র অপেক্ষাও অধম দেখিতে পায়। আর এইরূপ হইবারই তো কথা। কেননা ব্রাহ্মণসন্তান যে সকল ব্রাহ্মণ-শক্তির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার উপযুক্ত চাষ না হওয়াতে অগত্যা সে বীজ বীজই থাকিয়া যায়। অঙ্কুরই দেখাইতে পারে না,—ফল কি প্রকারে দেখাইবে? ব্রাহ্মণের প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের ভাগ অধিক বটে, কিন্তু সে গুণ ত সিদ্ধ বা বিকশিত গুণ নহে। উপযুক্ত সাধনা করিলে সে গুণের বিকাশ হইতে পারে, এই মাত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সাধনা করিলেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিকশিত হইতে পারে, সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের বীজ রক্ষা পাইতে পারে, আর কু-পথে গেলে ব্রাহ্মণের অধোগতি অনিবার্য্য।

গুণভেদে কর্ম্মভেদ।

বর্ণভেদ সম্বন্ধে গীতা-বাক্যের একাংশ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ বাক্যের আর এক অংশের কথাও এখানে বলা ভাল বোধ হইতেছে। সেই অংশ বুঝিলেই জাতিভেদের উদ্দেশ্যও অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চারি প্রকার মনুষ্য প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন চারি প্রকার গুণবীজ নিহিত থাকে। যে কর্ম্ম করিলে সেই সেই গুণবীজ যথাকালে সম্যক্ ফলজনক হইতে পারে, ভগবান্ স্বয়ং সেই সেই কর্ম্মেরও বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান্ এরূপ বিধান করিয়া না রাখিলে সেই সেই গুণের সম্যক্ বিকাশ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা মানুষে কেমন করিয়া জানিবে?

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাউক। মনে করুন, একটী মনুষ্য-শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, এখন তাহার সম্বন্ধে কোন্ কর্ম্ম করা যাইবে, আর সেই শিশু যখন সমর্থ হইবে, তখনই বা সে এমন কর্ম্ম কি করিবে, যাহা করিলে সে শিশু আপন জাতির উচ্চতম অধিকার, উচ্চতম শক্তি লাভ করিতে পারে? এখন আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে—ঐ গীতাবাক্য অনুসারেই—আমরা প্রথমে দেখি যে, ভূমিষ্ঠ শিশুটী কোন্ জাতি? যদি দেখি যে শিশুটী ব্রাহ্মণ মাতা-পিতার সন্তান, তাহা হইলে জাতি দ্বারা অর্থাৎ জন্মের দ্বারাই শিশুর বর্ণ স্থির করিয়া লইলাম। স্থির করিলাম যে, শিশুটীও ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে তখন জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ। এখন তাহাকে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ করিতে হইলে

কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে তাহা স্থির করিতেও আমাকে দুর্ভাবনায় পড়িতে হইল না। কেননা ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণের যাহা কর্ম্ম শাস্ত্রে তাহার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। সেই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলেই যথাকালে ব্রাহ্মণ-শিশুটী প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে। তাই ভগবান বলিয়াছেন যে—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই যে ভেদ, ইহা গুণগত অর্থাৎ প্রকৃতি-গত ভেদ। কিন্তু জন্মকালে সে প্রকৃতি বীজ রূপেই থাকে। যদি সেই গুণের পুষ্টি করা হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণের পূর্ণাধিকার লাভ হইতে পারে। যে কর্ম্মের দ্বারা সে গুণের পুষ্টি হইতে পারে, তাহাও নিরূপিত রহিল। অতএব বুঝা গেল যে, বর্ণবিশে-ষের ভেদ গুণগত, এবং গুণের পুষ্টি হয় কর্ম্মের দ্বারা। জাতিভেদ যেমন ভগবান্ করিয়া রাখিয়াছেন, যে কর্ম্মের দ্বারা জাতিগত উৎকর্ষ লাভ হইবে, তাহাও ভগবান্ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাকে এখনকার লোকে educatiou বলে—শিক্ষা বলে,—গীতার ঐ বাক্যে "কর্ম্ম" শব্দে তাহাই বুঝিতে হয়। তাহাতেই শাস্ত্রান্তরে আছে—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে, বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্ ॥"

যে সকল সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করা যায়, সে সকল সংস্কার সকল বর্ণের একই প্রকার নহে, বর্ণে বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার। বেদাধ্যয়ন বিষয়েও পার্থক্য আছে এবং এই সংস্কার, অধ্যয়ন ইত্যাদিই ভগবদ্বাক্যের—"গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"বাক্যের অন্তর্গত কর্ম্ম শব্দের তাৎপর্য্য। ওকালতি করা কি হাকিমি করা, এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়া কি বিলাতে বিকট বিদ্যা উপার্জ্জন করা, ভগবদ্-গীতার "কর্ম্ম" শব্দে বুঝায় না। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—

"পুরাণ বসন ভাতি, রমণী জনার জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।" আর আমরা বলিতেছি যে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি নষ্ট করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে হইলে অসাধারণ যত্ন করা আবশ্যক।

হিন্দুরই জাতিভেদ আছে।

অন্যে তো মনে করিতেই পারেন, অনেক হিন্দু-সন্তানেও মনে করেন যে, জাতিভেদ মানুষের করা একটা সামাজিক বিভাগ মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জাতি-ভেদ জন্মের দ্বারাই ঘটে। ব্রাহ্মণের সন্তানই ব্রাহ্মণ হয়, বৈদ্যের সন্তানই বৈদ্য হয়, কায়স্থের সন্তানই কায়স্থ হয়, কিন্তু বয়স হইলে কোনও বিশেষ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কেহ কোনও বিশেষ জাতি প্রাপ্ত হয় না। কোনও নিম্ন জাতির সন্তান বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যজন যাজন করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই যজন যাজনের ফলে ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, এমনটি হয় না। একথা সকলেই জানেন, তথাপি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন

যে, হিন্দু ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জাতিভেদ আছে। বাস্তবিক জাতিভেদ আর কোথাও নাই। জীবিকার নিমিত্তে ব্যবসায়-ভেদ আছে বটে, এক এক ব্যবসায়ে এক এক পৃথক্ সম্প্রদায়ও থাকিতে পারে, কিন্তু জাতিভেদ কুত্রাপি নাই। জন্মের দ্বারা জাতি-বিশেষের মধ্যে পরিগণিত হওয়া কেবল হিন্দুর ভিতরেই আছে, আর কোথাও নাই।

যাহা যাহা বলিয়াছি, একবার তাহার সার সংগ্রহ করা যাউক,—

১। বিলাতী বুদ্ধি লইয়া কিম্বা লৌকিক বুদ্ধি লইয়া হিন্দুদের জাতিভেদ বুঝিতে গেলে কিছুতেই ঠিক বুঝা যাইবে না। আগাগোড়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুরা মনুষ্যের ভিতর যে জাতিভেদের কথা বলেন, তাহা বাস্তবিক বর্ণভেদ।

২। বর্ণ চারিটী মাত্র,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। দুই বর্ণের মিশ্রণে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সঙ্কর জাতি। সুতরাং মূল বর্ণ এবং সঙ্কর জাতি গণনা করিয়া কালক্রমে বিস্তর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে যতই ভিন্ন ভিন্ন জাতি হউক না কেন, জন্মের দ্বারাই এই সকল জাতির ভেদ ঘটিয়া থাকে।

৩। জন্ম অনুসারে যে সকল ভেদ হয়, তাহাতে এক এক জাতিতে এক এক প্রকার গুণের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই যে গুণভেদ, ইহারই নাম প্রকৃতি-ভেদ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। পশু আদি সমস্ত নিম্নতর জাতিই তমঃপ্রধান। সত্ত্ব রজঃ তমঃ সকল জাতিতেই আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে তমোভাবেরই প্রাধান্য থাকে। মনুষ্য জাতি রজঃপ্রধান জাতি; কিন্তু উহারই মধ্যে, অর্থাৎ রজঃগুণের প্রাধান্য থাকিলেও মনুষ্যের ভিতর ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণের বীজ অধিক পরিমাণে থাকে, ক্ষত্রিয়ে সত্ত্ব রজঃ এই দুই গুণের বীজাধিক্য থাকে, বৈশ্যে রজস্তমঃ এই দুই গুণের বীজ অধিক হয় এবং শূদ্র তমঃগুণেরই বাহুল্য হয়। কিন্তু পশু প্রভৃতির সহিত তুলনায় শূদ্রজাতিরও রজঃ গুণ বেশী।

৪। সঙ্কর জাতি নানাপ্রকার হইলেও হয় ব্রাহ্মণের, না হয় ক্ষত্রিয়ের, না হয় বৈশ্যের, না হয় শূদ্রের—এই চারি বর্ণের মধ্যে কোনও একটা বর্ণের ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চারি প্রকার ভিন্ন পাঁচ প্রকার বর্ণভেদ কখনই ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইতে পারিবে না। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, ম্লেচ্ছ জাতিরাও বোধ হয় শূদ্রেরই মধ্যে। কিন্তু তাহারা এতই অধম, এতই সত্ত্বগুণহীন যে, তাহাদিগকে পশ্বাদির মধ্যে গণনা করিলেও বুঝি বিশেষ দোষ হয় না। কেন না, বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব সকল তাহাদের বুদ্ধির অধিগম্যই হয় না। প্রকৃতিভেদেই অর্থাৎ গুণভেদেই জন্মভেদ অর্থাৎ জাতিভেদ হইয়া থাকে এবং প্রকৃতি ভেদে বুদ্ধিরও ভেদ হইয়া থাকে। যাহার সত্ত্বগুণ অধিক, তাহার বুদ্ধি উজ্জ্বল, যাহার তমঃগুণ অধিক, তাহার বুদ্ধি মলিন। যাহার সত্ত্বগুণ অধিক, তাহার সুখও

অধিক; যাহার তমঃগুণ অধিক, তাহার মোহ বা অজ্ঞানই অধিক। যাহারা ম্লেচ্ছ, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞান।

৫। এক এক বর্ণে যে এক এক প্রকার প্রকৃতির সঞ্চার হয়, সে প্রকৃতি স্ফুট প্রকৃতি নহে। সেই বর্ণের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তবে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। আর সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিলে প্রকৃতির অধোগতিই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কল্পিত ধর্ম্মভেদ থাকাতেই বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এখন একটু বিস্তারিত করিয়া বুঝাইব যে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে।

কিন্তু ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে হিন্দুদের মতে সংসার-চক্র কি প্রকার, তাহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক।

বেদে আছে,—সুতরাং হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর পর তিন প্রকার গতি হইতে পারে। যিনি কেবলই পুণ্যবান্ তিনি অর্চ্চিরাদি মার্গে• একেবারে স্বর্গলোকে গিয়া থাকেন। যিনি পাপ পুণ্য উভয় প্রকার কর্ম্মই করেন, তিনি যমালয় দিয়া গমন করেন এবং স্বর্গ নরক ভোগ করেন। আর যাহারা নিতান্ত পাপকর্ম্মা, তাহারা জায়স্ব ম্রিয়স্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেবল নরকযন্ত্রণাই ভোগ করে। কিন্তু সকলকেই আবার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর আবার মৃত্যু, আবার জন্ম। এই যে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ, ইহারই নাম সংসারচক্র। এই সংসারেরই আর একটা নাম জন্মান্তরপরিগ্রহ।

স্বর্গেরও ক্ষয় আছে, নরকেরও ক্ষয় আছে। স্বর্গে সতত পরম সুখ, কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে সুখ ফুরাইয়া যায়। তখন স্বর্গবাসীকে ফিরিয়া আসিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। নরকে অতি ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু কালক্রমে সে ভোগও ফুরায়। তখন আবার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্ম। ইহা চারি প্রকার। কাহারও জন্ম উদ্ভিদ হইতে হইয়া থাকে। উদ্ভিদ হইতে যাহার জন্ম হয়, সে উদ্ভিজ্জ। কাহারও জন্ম স্বেদ অর্থাৎ কেবল উত্তাপের ফলেই হইয়া থাকে, যেমন ডাঁস মশা ইত্যাদি। ইহাদিগকে স্বেদজ বলে। কাহারও জন্ম অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে হয়। ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে। আর কাহারও জন্ম একেবারেই মাতৃগর্ভ হইতে হয়। ইহাদিগকে জরায়ুজ বলে। যিনি এ জন্মে ব্রাহ্মণ, তিনি অন্য জন্মে ম্লেচ্ছ হইতেও পারেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি লতা গুল্মও হইতে পারেন। আবার এ জন্মে যাহা লতা বা গুল্ম হইয়া আছে, বারান্তরে তাহাই ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

কিরূপে এমন হয়, এইবার তাহা শ্রবণ করুন। স্থান দুই প্রকার। যে স্থানে কর্ম্মও করা যায়, ভোগও হয়, তাহার নাম কর্ম্মভূমি। এই ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি যেহেতু এই ভারতবর্ষেই কর্ম্ম হইয়া থাকে; অন্যত্র কর্ম্ম করা যায় না। অন্য স্থান

যত আছে, পৃথিবীতেই কি, আর স্বর্গাদিতেই কি, যেখানে যত স্থান আছে, সমস্তই ভোগভূমি। সেখানে কেবলই সুখভোগ বা দুঃখভোগ কিম্বা সুখ-দুঃখ উভয় ভোগ হয়। কিন্তু কর্ম্ম করা যায় না। স্থান যখন দুই প্রকার, দেহও তেমনই দুই প্রকার। কোনও কোনও দেহ কেবলই ভোগদেহ। আর কোনও কোনও দেহ ভোগ এবং কর্ম্ম এই উভয়েরই সাধন। এদেহে সুখ দুঃখের ভোগ ত হয়ই, আবার নূতন কর্ম্ম, সুতরাং নূতন অদৃষ্টেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই যে কর্ম্ম বলিতেছি, ইহা বিধিবোধিত কর্ম্ম। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করিতে বলে, বা যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করে, সেই কর্ম্ম। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ আদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহার এক একটী কর্ম্ম করা হইলে পর কর্ম্মটী ফুরাইয়া যায়। আর দৃষ্টির গোচর থাকে না। সেই কর্ম্মটী তখন অদৃষ্ট হয়। সৎকর্ম্ম করিলে তাহা শুভাদৃষ্ট অসৎ কর্ম্ম করিলে অশুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট হয়। এই শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট জীবাত্মাকে আর ছাড়ে না। সংস্কার রূপে—সূক্ষ্মরূপে জীবাত্মাতেই থাকিয়া যায়। সেই অদৃষ্টেরই ফলে স্বর্গ ভোগ বা নরকের যাতনা ভোগ কিম্বা স্বর্গ নরকের উভয় প্রকার ভোগ আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর্গ নরক ভোগ হইলেও সে অদৃষ্ট নিঃশেষ ভাবে ফুরায় না, কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবাত্মাতে থাকিয়া যায়। তখন সেই কিঞ্চিৎ পরিমাণ অদৃষ্টকে ভোগ করিবার নিমিত্তে অর্থাৎ সুখ দুঃখ পাইবার নিমিত্তে জীবাত্মাকে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যদি কেবল ভোগদেহেই জন্ম হয়, তাহা হইলে সে দেহে নূতন কর্ম্ম অর্থাৎ নূতন অদৃষ্ট হয় না, কেবল সুখ-দুঃখের ভোগই হইয়া থাকে। আর যদি ব্রাহ্মণাদিরূপে কর্ম্মদেহ এবং ভোগদেহ উভয় প্রকার দেহ লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখের ভোগ ত হয়ই, অধিকন্তু আবার নূতন কর্ম্ম এবং নূতন অদৃষ্টের সঞ্চার হইয়া থাকে।

মনে করুন—আমি ব্রাহ্মণ। আমি এ ব্রাহ্মণ-দেহ কেমন করিয়া লাভ করিলাম? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে—আমার পূর্ব্ব জন্মের এমন সুকৃতি এবং শুভাদৃষ্ট ছিল, যে, তাহারই ফলে আমি এই উত্তম দেহ লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার দুষ্কর্ম্মও অনেক ছিল। তাহার ফলে আমি নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছি, হয় ত দরিদ্র হইয়াছি, কখনও শোক পাইতেছি, কখনও অন্য প্রকার দুঃখ পাইতেছি। আবার এজন্মে যে সকল সৎকর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফলে নূতন শুভাদৃষ্ট হইতেছে, যে সকল অসৎ কর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফলে নূতন দুরদৃষ্ট জন্মিতেছে। এই সকল শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট অনুসারে মৃত্যুর পর আমার স্বর্গ-নরক ভোগ হইবে, এবং জন্মান্তরে নূতন দেহ লাভ এবং ভোগদেহ হইলে আবার সুখ-দুঃখ ভোগ

কর্ম্মদেহ হইলে আবার নূতন অদৃষ্টের সঞ্চার হইতে থাকিবে। এই যে কেহ ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, কেহ সুন্দর হয়, কেহ কদাকার হয়, কেহ বুদ্ধিমান্ হয়, কেহ জড় হয়, পূর্ব্বের সঞ্চিত অদৃষ্টই তাহার কারণ। যাহার যেমন অদৃষ্ট থাকে, তাহার তেমনই জাতি লাভ হয়, আয়ু হয় এবং সুখ-দুঃখের ভোগ হয়।

একবার কর্ম্মদেহ লাভ করিয়া এত সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম করিতে পারা যায় যে, সেই এক জন্মের উপার্জ্জিত অদৃষ্টকে ভোগ করিতে বহু জন্ম আবশ্যক হয়। এক একবার কর্ম্মদেহ লাভ করিয়া বহুবার নূতন জন্মলাভের যোগাড় হইয়া থাকে।

এই কারণে শাস্ত্রে কর্ম্মকে তিনভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহার নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। আর যে সকল শুভ এবং অশুভ অদৃষ্টের ফলভোগ করিতে বর্ত্তমান জন্ম লাভ করিয়াছি, সেই সকল অদৃষ্টের কারণ স্বরূপ যে কর্ম্ম, তাহার নাম প্রাক্তন কর্ম্ম বা প্রারব্ধ কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম অনুসারে বর্ত্তমান শরীরের আরম্ভ হয়। তাহাতেই সেই সকল কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। সুখদুঃখরূপ ফল, জাতিরূপ ফল এবং আয়ুরূপ ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে যে কর্ম্ম, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। যাহার যেমন প্রারব্ধ, সে তদনুরূপ পরমায়ু লইয়া আসিয়াছে এবং তদনুরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে ও করিবে।

ভোগ-দেহে নূতন কর্ম্ম হয় না। শূদ্রের নিম্নে যে সকল মনুষ্য আছে, তাহাদের দেহ ভোগ-দেহ। ভারতবর্ষ ছাড়া যত স্থান আছে, সে সমস্তই ভোগভূমি। ভোগ-ভূমিতে কর্ম্ম হয় না। এইজন্যই ব্রাহ্মণাদির সন্তানকে আমেরিকা প্রভৃতি ভোগভূমিতে যাইতে নাই। ভোগভূমিতে গেলে তাহার কর্ম্ম বন্ধ হয়; সুতরাং জাতি যায়।

কর্ম্মদেহ লাভ করিয়া কর্ম্মভূমিতে যে সকল কর্ম্ম করিবার বিধান আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। সেই সকল ধর্ম্মের নামই পুণ্য বা সৎকর্ম্ম। আর যে সকল কর্ম্মের নিষেধ আছে, তাহারই নাম অধর্ম্ম বা পাপ। ব্রাহ্মণাদির দেহ কর্ম্মদেহ। সেই কারণে ব্রাহ্মণাদিরই পাপপুণ্য হইতে পারে, অন্যের পাপপুণ্য হইতে পারে না। আমরা যখন ধর্ম্মশব্দ বা অধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করি, তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের এই অর্থ মনে রাখিয়া শব্দ ব্যবহার করা উচিত। বলিয়াছি ত শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মেরই নাম ধর্ম্ম এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই নাম অধর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম ভবিষ্যৎকালে সুখ-দুঃখের কারণ হয় বলিয়াই ইহাদিগকে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলা হয়। আবার এই সকল কর্ম্মের ফলে শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, দয়া, অস্তেয়, অহিংসা প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ জন্মে, সে সকল সদ্গুণকেও ধর্ম্ম বলে। যে সকল অসদ্গুণ জন্মে, তাহাদিগকে অধর্ম্ম বলে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলে বলা যায় যে, সে ধর্ম্ম করিতেছে বা পুণ্য

করিতেছে। সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে বলা যায়, তাহার অধর্ম্ম বা পাপ হইতেছে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, সন্ধ্যা-বন্দনাদি বিধিবোধিত কর্ম্ম—ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের হেতু। সেই যে হেতু, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "অদৃষ্ট" হইয়াই থাকে। মৃত্যুর পর তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। এইজন্য হেতুকেও আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি; আর সেই সেই হেতু হইতে যে ফল জন্মে, তাহাকেও ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি। এই ধর্ম্মাধর্ম্মই আমাদের জাতিভেদের মূল।

ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এক অধিকারে যাহা ধর্ম্ম অন্য অধিকারে সেই কর্ম্মই অধর্ম্ম হইতে পারে। এক অবস্থায় যাহা ধর্ম্ম অন্য অবস্থায় সেই কর্ম্মই অধর্ম্ম হইতে পারে। এইজন্য ধর্ম্ম ছয় প্রকার,—(১) সামান্য ধর্ম্ম; (২) বর্ণধর্ম্ম; (৩) আশ্রম-ধর্ম্ম; (৪) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম; (৫) নিমিত্ত-ধর্ম্ম; (৬) গুণধর্ম্ম।

বর্ণ যেমন চারি প্রকার, আশ্রমও তেমনই চারি প্রকার। ব্রাহ্মণের চারি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ক্ষত্রিয়ের তিন আশ্রম—ক্ষত্রিয়ের কেবল সন্ন্যাস নাই। বৈশ্যের দুই আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য। শূদ্রের এক আশ্রম, কেবল গার্হস্থ্য।

স্ব স্ব বর্ণোচিত অধিকার লাভ করিবার নিমিত্তে বিবাহ, গর্ভাধান প্রভৃতি যে সকল সংস্কারের বিধান আছে, সে সকল সংস্কারের অভাব বা ত্রুটী হইলে ধর্ম্ম করিবার অধিকারও কমিয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের ত্রুটি থাকিলে ব্রাহ্মণাদির গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরও হানি হয়। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, জাতিভেদের সম্যক্ উপকার লাভ করিতে হইলে উপরি-লিখিত ছয় প্রকার ধর্ম্ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। যে যে কর্ম্ম করিলে যে যে ধর্ম্ম প্রতি-পালিত হয়, তাহা শাস্ত্রেই বিহিত আছে। শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোথায় তাহা পাওয়া যাইবে? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিনকাল সমানভাবে যাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, সে কেমন করিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিবে? এক জন্মের কর্ম্মফল যখন জন্মজন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়, তখন যে ব্যক্তি ইহকাল পরকাল স্পষ্ট দেখিতে পায় না, সে ব্যক্তি কেমন করিয়া নিরূপণ করিবে যে, সৎকর্ম্ম কোন্‌টা আর অসৎ কর্ম্মই বা কোন্‌টা?

এই দেখুন, জাতিভেদ আছে বলিয়াই ব্রাহ্মণের ছয় প্রকার কর্ম্ম শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে,—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ। এই ছয় কর্ম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপনা, এবং প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের জীবিকা। অন্যপ্রকার জীবিকা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণের হানি হয়। জীবিকাকেই বৃত্তি বলে। এক এক জাতির এক এক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে।

কেবল যে জাতিভেদ অনুসারে বৃত্তিভেদ করিলেই জাতি রক্ষা পায়, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন যে সকল সংস্কার ও কর্ম্ম বিহিত আছে, সে সকল সংস্কার ও কর্ম্ম পালন করাও আবশ্যক। এই কর্ম্ম চারি প্রকার,—(১

নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) প্রায়শ্চিত্ত। যে কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাই নিত্যকর্ম্ম; যেমন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদি। নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম; যেমন শ্রাদ্ধাদি। পিতা প্রভৃতির মৃত্যু না হইলে এমন কর্ম্মের "নিমিত্ত" উপস্থিত হয় না, তাহাতেই এ সকল কর্ম্মকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। যে কর্ম্ম করিলে পুণ্যলাভ হয়, তাহা কাম্য কর্ম্ম। আর শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম না করিলে কিম্বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে যে দুরদৃষ্ট জন্মে—যে পাপ হয়, তাহা খণ্ডন করিবার নিমিত্তে সে সকল কর্ম্মের বিধান আছে, সে সকল কর্ম্মের নাম প্রায়শ্চিত্ত। পাপনাশের নিমিত্তেই প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক।

পাপের দুই প্রকার শক্তি। এক শক্তিতে নরক হয়, আর অন্য শক্তিতে ব্যবহার-বিরোধ হয়। মানুষে মানুষে যে সংসর্গ, তাহারই নাম ব্যবহার। অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম একাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া করিতে হয়, তাহাকেই সংসর্গ বা ব্যবহার বলে। এই সংসর্গের গুরু লঘু ভেদ আছে। যেমন বিবাহ গুরু সংসর্গ, কিন্তু আলাপ করা লঘু সংসর্গ। কতকগুলি পাপ এমন আছে, যাহা করিলে সেই পাপকর্ত্তা অব্যবহার্য্য হয়। সে পাপকর্ত্তার সঙ্গে গুরু সংসর্গ করিলে সংসর্গকারীও অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। এই যে বিলাত-ফেরতকে গ্রহণ করা হয় না, বিধবার বিবাহের দলকে সমাজে স্থান দেওয়া হয় না, তাহারই নাম অব্যবহার্য্য করা। অব্যবহার্য্য করিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের সহিত ব্যবহার অর্থাৎ গুরুসংসর্গ করিলে সংসর্গীরও ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এখন দেখুন—জাতিভেদ কেমন সামগ্রী। জাতিভেদের সহিত ধর্ম্মের কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জাতিভেদের উপর পরকালের মঙ্গলামঙ্গল কতই নির্ভর করে। এ জাতিভেদকে সামাজিক বা লৌকিক বিভাগ মাত্র মনে করা নিতান্ত ভ্রম।

জাতিভেদ থাকাতেই অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে। জাতিভেদের গুণে যাহার যেমন অধিকার এবং সামর্থ্য, সে সেইরূপ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে আজিও,—এ ভয়ঙ্কর অধঃপাতের দিনেও হিন্দুরা জগতের ঈর্ষার স্থল হইয়া রহিয়াছে; এবং হিন্দুরা এত নির্য্যাতিত,—এত নিপীড়িত হইয়াও একাল পর্য্যন্ত আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর যে দেশে যাইবে যাও, সর্ব্বত্রই দারিদ্র্যের, দুঃখের, হিংসার, দ্বেষের, চরম সীমা দেখিতে পাইবে। হিন্দুর তত দুর্দ্দশা আজিও হয় নাই,—কখনই হইবে না। কেননা হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন। হিন্দুর জাতি সেই সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে জাতি যায় এমন কর্ম্ম কেহ করিয়া ধর্ম্মহীন হইও না। যে ধর্ম্মহীন হইবে, তাহার ইহকালে এবং পরকালে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

বিবাহ-বিভ্রাট।

বা

শিক্ষা-বিভ্রাট।*

প্রথমেই বলা উচিত যে, পুস্তকের নামকরণে ভুল হইয়াছে, ইহা এক প্রকাণ্ড দোষ। এই ভুলে অনেকের মূল কথা সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াছে। পুস্তকে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক 'বিবাহ-বিভ্রাট' নহে; আমি তাহাতে 'শিক্ষা-বিভ্রাট'ই দেখিতে পাই। সেইজন্য বলিতেছি, নামকরণে ভুল হইয়াছে, স্পষ্টাক্ষরে পুস্তকের নাম দেওয়া উচিত ছিল 'শিক্ষা-বিভ্রাট।'

বাস্তবিক বিবাহ ব্যাপার উপলক্ষ মাত্র করিয়া, অধুনাতন শিক্ষার সমালোচনাই গ্রন্থকর্ত্তা করিয়াছেন। গ্রন্থের গল্পাংশের সার সংগ্রহ করিলেই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। গল্পটি এই—

নন্দলাল নামক একটি বালক 'এণ্ট্রান্স পাশ' করিয়া কলেজে এল-এ পড়িতেছে, সুতরাং পুরা ইংরেজ হইবার কামনা তাহার মনে বিলক্ষণরূপেই প্রবল। নন্দলাল মনের মত সঙ্গী খুঁজিয়া লইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বিলাসিনী কারফরমা নাম্নী 'শিক্ষিতা' যুবতী, মিষ্টার সিং নামক বিলাত-প্রত্যাগত 'পূর্ণ পুরুষ' প্রভৃতির সংসর্গে এবং সহবাসেই নন্দলাল স্বীয় জ্ঞান-পরিধি বর্দ্ধিত করিতেছিলেন।

পুত্রের শিক্ষা-গৌরবে, নন্দলালের পিতাও গর্ব্বিত। ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে এবং সংসার প্রতিপালন করিতে নন্দলালের পিতা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইচ্ছা যে, বিবাহ-বাজারে উচ্চ দরে ছেলের পাশ বেচিয়া তিনি বধূমুখ দর্শন করিবেন এবং ঋণদায়েও সেই সঙ্গে মুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়া লইবেন।

ক্রমে নন্দলালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। শেষে বিবাহও হইল। বিবাহের রাত্রিতেই নন্দলাল টাকাগুলি হস্তগত করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। 'শিক্ষিত' বন্ধুদের সহিত আগে হইতেই ষড়যন্ত্র করা ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

নন্দলালের পিতা হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছেলেকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ছেলে পলাইল, টাকাগুলিও হাতছাড়া হইল।

গল্প ত' এই; ইহার উপর পত্র পুষ্প ফল যেমন থাকিতে হয়, তেমনি আছে। এখন অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র অঙ্কনের জন্য বিবাহ-সূত্রে এই গল্প গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল সমাবেশের সুবিধার

---

* বিবাহ-বিভ্রাট। (সামাজিক নাট্যলীলা)—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। —"নবজীবন", বৈশাখ, ১২৯২ সাল।

জন্ত। পাত্রপাত্রীগণের স্বভাব-চরিত্র যেরূপ, তাহাই এই বিবাহ-ব্যাপারে প্রকটিত হইয়াছে। বিবাহ উপলক্ষে তাহাদের স্বভাব-চরিত্র নূতন করিয়া গঠিত হয় নাই। এ বিবাহ না উপস্থিত হইলেও, যাহার যেমন চরিত্র তেমনই থাকিত। সেই জন্যই বলিতেছি যে, উপস্থিত বিভ্রাট যদিও বিবাহ উপলক্ষে ঘটিয়াছে, কিন্তু পুস্তকখানিতে আগাগোড়া শিক্ষা-বিভ্রাটেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাই এইবার দেখাইব।

এ নাটকের প্রধান কৃতিত্ব এই কয় জনের,—মিষ্টার সিং, নন্দলাল, বিলাসিনী, গোপীনাথ এবং স্বী। বাকি যাহারা আছে, তাহাদের প্রয়োজন কেবল পৃষ্ঠপূরণার্থে। মূল কথা, ঐ কয়জনের চরিত্র লইয়া। কি ভাবে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, দেখা যাউক। কিন্তু আরও দুই চারি কথা এইখানে বলিয়া রাখিতে হইবে।

খৃষ্টান ইংরেজ আর হিন্দু বাঙ্গালী এক জাতীয় মনুষ্য নহে; ইংরেজী সমাজ এবং আমাদের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মূলে প্রতিষ্ঠিত, ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সংগঠিত; সংক্ষেপে বলা যাউক, ইংরেজী রুচি এবং আমাদের রুচি, ইংরেজী আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা,—অধিক কি,—ইংরেজের মন এবং আমাদের মন নানা রকমে পৃথক্ ভাবাপন্ন। এ কথাগুলি সর্ব্ববাদিসম্মত কি না, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু সর্ব্ববাদি-সম্মত হউক আর না হউক, এ কথাগুলি বলা আমি আবশ্যক বোধ করি। কারণ, অনেককেই দেখিতে পাই যে, তাঁহারা মুখে এই পার্থক্য স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁদের আচরণ ঠিক বিপরীত। এখন অসঙ্কোচে বলা যায় যে, সাধারণত 'শিক্ষিত বাঙ্গালী' এক প্রকার 'কাঁটালের আমসত্ব'।

যে ব্যক্তি যে সমাজভুক্ত, তাহাকে সেই সমাজের উপযুক্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইল, তবে শিক্ষার প্রণালীও অবশ্যই ভিন্নরূপ হইবে, শিক্ষার ফলও ভিন্নরূপ হইবে। একথা নিত্যই আমাদের মনে থাকা উচিত, কিন্তু থাকে না, এই দুঃখ। থাকে না, এই জন্য বলিতেছি যে, এখনকার সকলেরই ঝোঁক ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী প্রণালীর শিক্ষার উপর। ইহাতে দুইটি ফল হাতে হাতে হইতেছে; এক, আমাদের জাতীয় শিক্ষার অনাদর, সুতরাং আমাদের সমাজের ধ্বংসমুখে অবনতি; অপর বাঙ্গালী-ভিত্তির উপর ইংরেজী সমাজের পত্তন, সুতরাং এক বিকৃত পদার্থের উৎপত্তি; তাহাকেই আমি 'কাঁটালের আমসত্ব' বলিতেছি।

"বিবাহ-বিভ্রাট" পুস্তকে এই তত্ত্বই সতেজে উদাহৃত হইয়াছে; এবং এই পুস্তকের প্রধান কৃতী বলিয়া উপরে যাহাদের পরিচয় দিয়াছি, তাহাদের চরিত্র অঙ্কন করিয়া বিকৃত শিক্ষার বিকৃত ফলের এক প্রকার ক্রম নির্ণয় করা হইয়াছে।

Boiling point অর্থাৎ টগ্‌বগ্‌-ফুটন্ত ইংরেজী শিক্ষা পাইলে বাঙ্গালী যাহা হয়, মিষ্টার সিং তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নন্দলালের চরিত্রচিত্রে ঐ শিক্ষার গতি ও বেগ বুঝা যায়। বাধা-বিঘ্ন না পাইলে সকল নন্দলালই ক্রমে মিষ্টার সিং এ পরিণত হইয়া উঠে। যেটি তাহা হইতে পারে না, বাধায় ব্যাহত, বিঘ্নে রুদ্ধগতি হইয়া যায়, সেও এক বিকট জীব হইয়া উঠে।

অথচ এই কুশিক্ষাই এখন দেশমধ্যে বহুলপ্রচার এবং প্রবল। যাহার যত নিকট সম্বন্ধ, সে সেই পরিমাণ বেগে এই শিক্ষা-তরঙ্গের দ্বারা আহত। কাহারই পরিত্রাণ নাই। সাক্ষী নন্দলালের পিতা গোপীনাথ সরকার; বেচারা ইংরেজী শিক্ষা না পাইয়াও ছেলের 'পাশের' ধাক্কায় হিন্দুয়ানি ভুলিয়া গিয়াছে, অথবা ভুলিতে বসিয়াছে।

অন্তঃপুরেও ঢেউ লাগিয়াছে। এই কুশিক্ষার কত আদর, কত গৌরব, তাহা গোপীনাথের স্ত্রী 'গিন্নি'র কথাতে গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন। ছেলের বিবাহে গোপীনাথ যে টাকা পাইবেন স্থির হইল, তাহা হইতে দেনা শোধ করিলে বিশেষ কিছু থাকে না, গোপীনাথ এই ভাবনা ভাবিতেছেন, সেই সময়ে গিন্নীর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন যে প্রকার হইল, তাহা মনের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক ধারণা করিবার উপযুক্ত। গোপীনাথ বলিলেন,—

"গিন্নি! এ যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না।

গিন্নী। হুঁ হুঁ, গুরুর কথা না শোন কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাচকা টানে; আমিতে বলেছিলুম, অত কমে রাজী হইও না; নন্দলাল কি আমার চার হাজারের! কর্ত্তাপণা করা অমন মেনীমুখোর কাজ নয়।

গোপী। কি জান, এই দিতেই তাদের সর্ব্বনাশ হবে।

গিন্নী। তাদের সর্ব্বনাশ হ'ল তো আমার কি! আহা, কি আমার সাতপুরুষের কুটুম গো। নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে, এতে পোড়ারমুখো মিন্‌সের টাকা খরচ কোত্তে হাতে আগুন লেগে যায়! আর সে মাগীই বা কেমন! মেয়ের মা—চোখ-খাগীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়, গায়ে গয়না-টয়না নেই?—বেচুক না?

গোপী। আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হ'য়ে যাক না; নন্দকে আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন—সম্প্রদানের সময় একটা কোট ক'রে বস্‌বে।

গিন্নী। আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর, আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের জন্ম কোটোর যদি ভাল-মন্দ হয়—নন্দর জন্মদিনে পাশ বাড়বে—দেখো দেখিন— এখন ছেলের ফের বে দিয়ে আমি দোতালা বাড়ী, আর নিজের গা-ভরা গয়না কোত্তে পারি কি না।"

হিন্দু-কুলবধূর কথা শোন। অর্থ, অর্থ, অর্থ বৈ আর চিন্তা নাই, আর কথা নাই।

নব-বধূটি মরিয়া যাউক, ছেলের আবার বিবাহ হইবে, আবার বেশি বেশি টাকা ঘরে আসিবে। কি ভয়ানক ব্যাপার! আর এই ধনলালসার মূল নন্দলালের সেই অপূর্ব্ব শিক্ষাতে নিহিত। "নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে।" পঞ্জিকাতে লেখা থাকে, কলিতে অন্নগত প্রাণ, আরও এক কথা লিখিয়া রাখিতে হয়—আধুনিক শিক্ষাপ্রভাবে বঙ্গদেশে 'পাশ'গত সর্ব্বস্ব।

শিক্ষার পরোক্ষ বা গৌণফলে হিন্দুর অন্তঃপুর কলুষিত হইতেছে, তাহাতে উন্নতিশীল সংস্কারক-দলের চক্ষু ফুটা দূরে থাকুক, মহিলাগণকে যত্ন-সহকারে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য ইঁহাদিগের যত্ন। যত্ন করিতে হয় করুন, কিন্তু ফলবিষয়ে আর অন্ধ থাকিবার যো নাই। চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া ভবিষ্যপট দেখাইবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার বিলাসিনী কারফরমাকে চিত্রিত করিয়াছেন।

'বিবাহ-বিভ্রাটে'র অভিনয়ে ঝী বড় প্রতিপত্তিশালিনী। সকল চক্ষুই ঝীর উপর সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সকল কর্ণই ঝীর বাক্যামৃত পান করিবার জন্য সদা লালায়িত। ইহা হইবারই কথা। একা ঝী একদিকে, নাটকের অন্যান্য প্রধান পাত্রপাত্রীগুলি সকলে মিলিয়া অপর দিকে। যদি মিষ্টার সিংএর শিক্ষা, বিলাসিনীর শিক্ষা, নন্দলালের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাহা হইলে ঝী ভয়ঙ্কর অশিক্ষিতা। সুতরাং ঝীর সঙ্গে সকলকারই বিরোধ। বাস্তবিক, হিন্দুর শিক্ষাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া 'ঝী' সকলেরই কর্ম্ম-সমালোচনা, শিক্ষা-সমালোচনা এবং ব্যবহার সমালোচনা করিতেছে। এমন ক্ষেত্রে সমালোচকের যেমন হওয়া উচিত, ঝী তেমনই হইয়াছে; ঝী কোরফাপ জানে না, সকল সময়ে সকলকেই স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দেয়, অথচ ঝী 'ফিলসফার' নহে; একটা সাদাসিধা মানুষ মাত্র। সেইজন্যই তাহার কথার এত তীব্রতা, তাহার সমালোচনার এত তীব্রতা।

নাটকোক্ত সকল ব্যক্তির সকল কথা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে, আমার অবকাশে কুলাইবে না, 'নবজীবনে'ও স্থান হইবে না। তবে, উপরে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার সম্যক্ উপলব্ধির জন্য পুস্তকের উপর বরাত দিয়া এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিলেই বোধ করি আমার অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইতে পারিবে।

মিষ্টার সিং বিলাতী শিক্ষাগুণে এখন পূর্ণ পুরুষ। উমাচরণ গুপ্তের মাতৃবিয়োগ হইল। গুপ্ত মহাশয় 'কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে' বেড়াইতেন। এ কথা শুনিয়া মিষ্টার সিং অবাক্ হইলেন; বলিলেন,—"নেংটো গা, নেংটো পা, লেডীর সাম্‌নে"—কি ভয়ানক।

বাড়ীতে থাকিলে মিষ্টার সিংহকে "বাপত ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে," সুতরাং তিনি গোয়াবাগান গলিতে বাসা লইয়া আছেন, আর খাড়ী যান মাঝে মাঝে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা আর কি হইতে পারে?

সিংহ। তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে ?

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কোচ্ছেন, এক রকম ঠিকও হয়েছে।

সিংহ। তাঁর মত নেই অথচ টাকার যোগাড় কচ্ছেন কি রকম ?

নন্দ। তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

বিলা। বিবাহ ? কিরূপ পাত্রী ?—কি পাশ করেছে ?—কি মতে বিবাহ ?

নন্দ। সে সব বিশেষ কিছু জানা যায় নি, বাবাও টাকার কথা ঠিক কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবার অপেক্ষায় আছি।

বিলা। কিরূপ পাত্রী জানেন না, দেখ্‌তে কেমন—আপনার চেয়ে বড় কি ছোট—কতদূর লেখাপড়া জানে—আপনাকে বশে রেখে চালাতে পারবে কি না—কিছুই জানেন না ? হয় তো কোন অপবিত্র সেকেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে! এসব না জেনে—না ঠিক ক'রে আপনি বিবাহ কত্তে যাচ্ছেন ?

নন্দ। দেখুন আমি এক ঢিলে তিন পাখী মারবো। সমাজকে শাসিত করবো, বাবাকে শিক্ষা দিব, আর আমার শ্বশুর হবার যে বেয়াদবি রাখে, তারে শাস্তি দিব। বাবা যেমন লাভের লোভে একটা জানোয়ার জুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই জানোয়ারের বাপ যেমন বাবাকে ঘুষ দিয়ে আমার মত Educated manকে একটা পোঁটাপড়া মূর্খের সহচর ক'রে দিচ্ছেন, আর সমাজ যেমন এসব দেখেশুনেও বিন্ধ্যাচলের মত গা ঢেলে দিয়ে প'ড়ে আছেন—আমিও তেমনি বাগেযোগে টাকাটা হাত ক'রবো অথচ বিবাহ Null and Void হবে।

বিলা। কিন্তু বালিকার দশা কি হবে ?

নন্দ। There are ten thousand bachelors to choose from; যাকে ইচ্ছাফের বে কোত্তে পারে। I will get one milk-white wife with a pair of cat's eyes.

* * * * *

সিংহ। আপনার Husband খুব তো Docile.

বিলা। পতির প্রধান গুণ স্ত্রীভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে ব্যাভিচারী, পুরুষ-বেশ্যা; আর আমরা যদি স্বামীকে দমন কোত্তে না পারব, তবে আমাদের high educationএর ফল কি ?

[সিংহের প্রস্থান।

তবে নন্দবাবু বিবাহ কত্তে চল্লেন ?

নন্দ। [illegible] আপনার মত graduate. আহা গৌরবাবুর কি অদৃষ্ট !

বিলা। কি, jealousy হয় না কি?

নন্দ। কার না হয়? আমি বিলাত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি Miss থাক্‌তেন?

বিলা। Wife তো widow হয়।

নন্দ। Would to God, সে দিন কি হবে!

বিলা। আপনি science পড়েছেন, God বল্লেন যে, God মানেন না কি?

নন্দ। রাম! ওটা কথার কথা বল্লেম, যেদিন Ganot কিনেছি—সেদিন বুঝেছি God নেই।

* * * *

সংক্ষেপে বলি, পুস্তকের সকল স্থানই এইরূপ মূল্যবান্ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইঙ্গিত বুঝিলে ত!

আমি স্বীকার করি যে, এই নাটক আমাদের কলঙ্কে এবং কুৎসায় নির্ম্মিত। কিন্তু সে দোষ গ্রন্থকারের, না আমাদের? এত যে জাতীয়তার ভাণ, এত যে দেশ-ভক্তির ছলনা, এমন করিয়া না আঁকিলে কি ইহার প্রতিশোধ হয়? যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমাদের ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে শিক্ষাগুণের সঞ্চার করিতে হইবে, 'চাদর নিবারিণী' অথবা 'ভাত কাপড় নিবারিণী' সভা ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাতকারী গ্রন্থকারের গুণগান করিতে করিতে কিছুকালের জন্য 'ঝী'কেও আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে হইবে।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

সম্পূর্ণ।